বঙ্গশাল
অষ্টম বর্ষ
১০ম সংখ্যা
মাঘ
১৩৪৯

কলকাতায় বোমা !

[অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ]

কলকাতায় বারবার পাঁচবার বোমাবর্ষণ হোলো। যারা ঐ সময়ে কলকাতায় ছিলে তারা বোমার এই শব্দ শুনেছো, তারপর তার ধ্বংসলীলার পরিচয়ও পেয়েছো। যারা কলকাতায় ছিলেনা তারা তোমাদের কলকাতাবাসী আত্মীয়স্বজনের জন্য চিন্তিত হয়েছো এবং আছো। ইতিমধ্যে বোমার জন্য কলকাতায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে চিঠিপত্রে তার আভাস পেয়ে থাকবে। কিন্তু অনেকে আছো যারা কলকাতায় বোমাবর্ষণের খবর পেয়েছো কেবলমাত্র সংবাদপত্রের মারফৎ এবং তার ধ্বংসলীলার ছবি কাগজে দেখেছো।

এই বোমাবর্ষণের পেছনে যে নৃশংসতা আছে সে কথা আজ না বললেও বুঝতে পারবে। এই নৃশংসতার সৃষ্টি হয়েছে বর্ত্তমান যুদ্ধরীতির ফলে।

আমাদের দেশে ক্ষাত্রধর্ম্ম ছিল "সম্মুখ সমর।" সাবমেরিণ-যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে য়ুরোপেও এই রীতি ছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের রীতি সর্ব্বাঙ্গীণ-সমর বা টোট্যাল ওয়ার (Total War)। এইরূপ যুদ্ধে সামরিক বা বেসামরিক প্রভেদমূলক কোনো সংজ্ঞা থাকে না। সমগ্র জনসাধারণের প্রচেষ্টা সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে সমস্ত দেশের সীমানায় পরিব্যাপ্ত হয়। তখন শত্রুর লক্ষ্যস্থল হয় এই যুদ্ধপ্রচেষ্টার উৎসগুলিকে বিনষ্ট করা এবং ঠিক সেই অনুপাতেই স্বপক্ষীয় দলকে সাবধান হতে হয় যাতে এই উৎসগুলি শত্রুর দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে। এই জন্যই ব্ল্যাক-আউটের প্রয়োজন হয়, যাতে সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি শত্রুর দৃষ্টিপথবর্ত্তী না হয়। কামুফ্লাজের (camouflage) ব্যবস্থাও এই জন্যই হয়। এমন কি যাতে সংবাদপত্রের ভিতর দিয়েও অসাবধানে কোনো খবর শত্রুর কর্ণগোচর না হয় তার জন্য যুদ্ধ-

কালে সামরিকবিভাগ কর্তৃক সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবং জনসাধারণকে বারেবারে সাবধান করা হয় যাতে তাঁরা অসংযত বাক্যের দ্বারা শত্রুর গুপ্তচরের কাছে মূল্যবান্ সংবাদ গোচর না করেন।

এই সকল কারণে সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির নিশানা পাওয়া শত্রুর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে বেসামরিক জনসাধারণের বিপদের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। শত্রুর বোমার বিমানগুলি লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না পাওয়ায় ইতস্ততঃ বোমা নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং তাতে নিরপরাধ জনসাধারণের জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই এ, আর, পি বা বিমাণ-আক্রমণ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

কলকাতায় যে পাঁচবার জাপানী বিমানের হানা হল তাতে এ, আর, পি ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকা সম্ভব নয়। দেখা গেল যে যারা ব্যাফ্‌ল্-ওয়াল (baffle-wall) এর পেছনে বা আশ্রয়কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কোনো আঘাত লাগে নি, যে সব হতভাগ্যেরা তা নিতে পারে নি তারাই হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ হতাহতের মোট সংখ্যা অতি অল্পই হয়েছে।

"জ্যোৎস্না-হসিত নীল আকাশ"-এর বক্ষ বেয়ে বোমারু বিমানগুলি এসেছিলো; সেই অপরূপ শুক্লা জ্যোৎস্নার সহায়তা পেয়েও শত্রুর অধিকাংশ বোমাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নিক্ষিপ্ত বোমাগুলি হাল্কা ওজনের মানুষ-মারা বোমা। বিশেষজ্ঞরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে সামরিক লক্ষ্যবস্তু বিনষ্ট করা এই বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল না, এর উদ্দেশ্য ছিল নিরপরাধ ভারতবাসিদের প্রাণসংহার করা। এইরূপে ভারতবাসিদের মনে আতঙ্ক বিস্তার করতে পারলে অশিক্ষিত আতঙ্কগ্রস্ত কলিকাতাবাসীরা কলকাতা ত্যাগ করে পলায়ন করবে এবং তাতে শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি জাপানীদের এই অভিসন্ধি সার্থক হতে দেবো?

এ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর নেই। অনেকে মনে করেছিলেন, হয়ত বা এখনও করেন, যে জাপানী আমাদের বন্ধু। জাপানী আজ যে-পথে তার উন্নতির ধ্বজা ধরে চলেছে সে হল পাশ্চাত্য পথ। এ পথে আছে স্বার্থের সংঘাত, দম্ভের আস্ফালন, অর্থনীতির বিপাক; এবং সকলের পেছনে আছে বিজ্ঞানের ধ্বংস-বৈজয়ন্তী। এ পথ ভারতের পথ নয়। ভারতবর্ষ কারুর শত্রু নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ স্বার্থান্বেষী, দাম্ভিকের বন্ধুও নয়। জাপান যে প্রাচ্যের মহান্ আদর্শ ভুলে গিয়ে ভুলপথে চলেছে, জাপানের প্রাক্তন পরম সুহৃদ্ সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথও তীব্রভাষায় জাপানী কবি নগুচিকে একাধিক পত্রে জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যে-জাপানকে ভালোবাসে সে জাপান তোজোর জাপান নয়। সে জাপান আজ থাকলে চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হত না, ভারতবাসীর মনে ভীতিসঞ্চার করবার জন্য বোমারু বিমান পাঠাতো না।

আজ যদি আমরা সত্যি সত্যিই ভীত, সন্ত্রস্ত হই, তাহলেই তোজোর জাপানকে মেনে নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, জাপানীর কাছে আমরা অতি হেয়, ঘৃণ্য জীবরূপে প্রতিপন্ন হবো। স্বাধীন দেশ হবার দাবী যদি বা কিছুমাত্র থেকে থাকে, আমাদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারের দ্বারা আমরা সেই দাবী নষ্ট করবো।

এ কথা হয় তো বলা যায় যে নিরস্ত্র জাতির পক্ষে পলায়নই প্রশস্ত পন্থা। কিন্তু এ কথা যারা বলে প্রকৃত জনযুদ্ধ কাকে বলে জানে না; নয় ত তথাকথিত সশস্ত্র জাতির জনসাধারণ সম্বন্ধে তাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। পূর্ব্বেই বলেছি এটা সর্ব্বাঙ্গীন যুদ্ধ; সৈন্যবাহিনী এখনও প্রয়োজন, কিন্তু যে জনবাহিনী তাদের পেছনে কাজ করে তারা সকলেই হাতিয়ার নিয়ে কাজ করে না, তারা কাজ করে ফ্যাক্টরীতে, ডকে, রাস্তাঘাটে ইত্যাদিতে, জাতীয় যুদ্ধপ্রচেষ্টার নানাদিকে। কেউ গাড়ী চালাচ্ছে, কেউ টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করে, কেউ বা মিলে মজুরী করে, কেউ বা রাস্তা তৈরী করছে, কেউ রোগীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হয়েছে, ইত্যাদি নানারূপে প্রত্যেকে সামরিক কাজের একটি অংশ বেছে নিয়েছে। দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে আত্মোৎসর্গ, জনযুদ্ধের সেইটাই হল সবচেয়ে বড় আদর্শ; হাতিয়ার থাক বা না থাক আমাদের সবকাজেই এই আদর্শ প্রয়োগ করা যায়। আজ যদি আমরা আমাদের এই দুর্দ্দিনে কর্ত্তব্যবিমুখ হয়ে পালিয়ে যাই, তা'হলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন, কল্পনার বিলাসেই পর্য্যবসিত হবে, বাস্তব রূপ আর নেবে না।

সুখের বিষয়, আমরা এখনও এই গ্লানি থেকে দূরে আছি।

কলকাতা থেকে দুশ্রেণীর লোক পালিয়েছে। এক, যারা বাংলাদেশকে কোনকালেই নিজের দেশ বলে ভাবে নি। আর দ্বিতীয়, যাদের জন্য বিমান আক্রমণ প্রতিষেধক কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। মাড়োয়ারি ভাটিয়ারা ত আসে অর্থের সন্ধানে, তাদের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক, সোণার শিকলের সম্পর্ক। জাপানী বোমায় যে সেই শিকল ছিঁড়ে যাবে তা আর বিচিত্র কি? কিন্তু দুঃখ হয় তাদের জন্য যারা থাকে বস্তীগুলিতে, এবং সারা জীবন খেটেও যাদের সম্বল খালি লোটা ও কম্বল। বেঁচে থাকবার জন্যই তাদের আপ্রাণ চেষ্টা, সেই বেঁচে থাকার ব্যাপারটাই যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে আর তাদের ঠেকাবে কে? বোমার কাছে বস্তীর কি-ই বা মূল্য! আশা করা যায় যে এবার থেকে এই বস্তীগুলির নিরাপত্তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি ব্যবস্থা করবেন। কারণ এই সার্ব্বজনীন যুদ্ধে আমরা একটা জিনিষ এই শিখেছি যে যতই আমরা আমাদের শ্রেণীগত সভ্যতার বড়াই করি না কেন, এই সভ্যতার উপাদান যোগায় ঐ কুলিমজুরের দল, কারণ ওরা না থাকলে আমাদের বেঁচে থাকাই একটা বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে।

তোমরা যখন বড় হবে, এই শিক্ষার মধ্যে বড় হয়ো যে আমাদের জীবনে খুটিনাটি কাজেরও দাম বড়ো কম নয়! ঝি-চাকর-ছোটলোক বলে ঘৃণা করবার অধিকার কোনো মানুষেরই

নেই। আভিজাত্য বা বংশমর্য্যাদার কোনো মূল্যই নেই যদি না সেই মর্য্যাদা, সত্যিকারের মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। গরীব দুঃখীদের পরিশ্রম আমাদের কাছে এতই সহজলভ্য যে ওর সত্যিকারের মূল্য আমরা সহজে ধারণাই করতে পারি না। ষ্টেশনে কুলী না পেলে বুঝতে পারি যে চার পয়সা বা দু'আনা মূল্যের যে পরিশ্রম, তার সত্যিকারের মূল্য কি। তেমনই আমরা, অভ্যস্ত হয়েছি সভ্যতার আনুসঙ্গিক যন্ত্রগুলির সঙ্গে। কলকাতায় সন্ধ্যার দিকে বাবুরা যখন ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাড়িমুখো যান, পাছে ট্রাম বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে, তখনই বোঝা যায় আজকের দিনের যন্ত্রসভ্যতা আমাদের কিরূপ পঙ্গু করে দিয়েছে। গ্রীষ্মে মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানটি খারাপ হয়ে গেলে মনে হয় হাত পাখাটুকু নাড়বার শক্তিটুকুও বুঝি বিজ্ঞান আমাদের কাছ থেকে হরণ করেছে। আমাদের এই পরাধীনতা কে দূর করবে? আজ বোমার ভয়ে গরীব দুঃখীরা পালাচ্ছে তাই আমাদের অনেকেরই একটু অঙ্গ চালনা করবার অবসর হয়েছে, আশা করা যায় এতে কলকাতাবাসীর শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হয় ত বা একটু স্বাস্থ্যসঞ্চার হবে। বাড়ির মেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে কর্ত্তাদের হাতপুড়িয়ে রান্না শিখতে হচ্ছে; আশা করা যায় গিন্নীরা ফিরে এলে তরকারিতে একটু লবণ বেশী হয়ে গেলে কিংবা ডালটা একটু ফিকে হলে আর চোখের জল ফেলবার কারণ হবে না, কর্ত্তা বুঝবেন এই সব ধৈর্য্যশীলা, স্নেহশীলা রাঁধুনীদের মূল্য কি। আমাদের দেশে মেয়েরা এখনও বাজার করতে বেরোন নি, কিন্তু বিলাতে দেখেছি, এখানেও সাহেব পাড়ায় দেখা যায়, বাজারের কাজটা মেম সাহেরেরাই করতে ভালবাসেন। কর্ত্তাকে যদি বোমার গুণে রান্না শিখতে হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা বাজার হাটটাই বা করবেন না কেন?

যাক, কথায় কথায় অবান্তর কথা এসে পড়লো। দেশ ছেড়ে পালানোর মধ্যে বীরত্ব ত নেইই, বুদ্ধিও বেশী আছে বলে মনে হয় না। অনেকেই পালিয়েছেন এই মনে করে যে একটা বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ বুঝি বা আরম্ভ হোলো। এই বোমাবর্ষণ বুঝি বা আসন্ন জাপানী আক্রমণেরই ভূমিকা।

কিন্তু স্থিরচিত্তে ভেবে দেখতে হবে যে যে-কদিন বোমাবর্ষণ হয়েছে তাতে কি এরূপ একটা ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত হবে? আজ বাংলাদেশে যে বিরাট সৈন্যসমাবেশ হয়েছে এবং বিমান আক্রমণ পরিপন্থী যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে তার কি কিছুই মূল্য নেই? তা ছাড়া ভারতবর্ষের মত একটা মহাদেশ আক্রমণ করার মত রসদ বা লোকবল কি জাপানের আছে? ভুললে চলবে না যে জার্ম্মাণী তার অধিকৃত দেশগুলি থেকে সৈন্যসংগ্রহ করেছে, কিন্তু জাপানীদের এখনও সে সুযোগ হয় নি। এখনও প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তিপরীক্ষা চলছে, নৌবহরের যাতায়াত এখনও বিপদসঙ্কুল। অপরপক্ষে দেখা যায় কলকাতায় যে বোমাবর্ষণ হয়েছে তার বহুগুণ তীব্র বোমাবর্ষণেও লণ্ডনের অধিবাসিগণ বিচলিত হন নি। জাপানীদের ভারত আক্রমণ আসন্ন ত নয়ই, একেবারেই হবে কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ মিত্রপক্ষের বর্ম্মা-অভিযান রীতিমত আরম্ভ হবার আর বেশী দেরী নেই এবং সে অভিযান আরম্ভ হলে ভারত-আক্রমণের সম্ভাবনা আরও পেছিয়ে যাবে।

অবশ্য ভবিষ্যতে আরও ঘোরতর বোমাবর্ষণ যে হবে না তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। জাপানের প্রচণ্ড শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। বর্ম্মা, মালয় ইত্যাদি স্থান অধিকারের ফলে সে শক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। এই সব স্থান থেকে ভারতবর্ষের উপর বিমান আক্রমণ আরও সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অপরপক্ষে মিত্রশক্তিও আজ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের শক্তিপরীক্ষার চরম মীমাংসার উপর এই শক্তির ভাগ্য নির্ভর করছে। কাজেই বোমাবর্ষণের আশঙ্কা থাকলেও তার ধ্বংসকারিণী শক্তি যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে তা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

তবে একথাও সত্যি যে শত্রুর এই শক্তিকে প্রতিহত করতে গেলে জাতীয় সংহতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র সৈন্যসামন্তের দ্বারা এই শক্তি প্রতিহত হবে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শত্রুকে প্রতিরোধ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়ে রাখতে হবে। অপর পক্ষে আমরা যদি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই তাহলে জাপানের ভারত-আক্রমণের পথ আরও সহজ সুগম হয়ে উঠবে।

যাঁরা মনে করেন বিজয়ী জাপান আমাদের স্বাধীনতা পুষ্পাঞ্জলির মত আমাদের কাছে নিবেদন করবে, তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেন আরেকবার পড়ে দেখেন। বিশেষ করে' জাপানের নিজের ইতিহাস।

যাঁরা এইভাবে দেশের স্বাধীনতা ভিক্ষা করেন তাঁদের দেশ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

এমন কি অরাজকতার মধ্য দিয়েও যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাও অর্জ্জন করতে হয় বাহুবলে, বুকের রক্তে ও চোখের জলে।

দেখাতে হবে আমাদের সেই শক্তি, সেই সাহস, সেই আত্মত্যাগ।

বিদ্যার দেবী

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

যুদ্ধের সাইরেণ দিকে দিকে বাজ্‌ছে,
টর্পেডো জলে আজ চঞ্চল—
বিদ্যার দেবী তবু ঐ দেখ সাজ্‌ছে,
বাতাসে ওড়ে' তাঁর অঞ্চল!
বোমারু বিমানে সারা পৃথিবীর নভোরে
ছেয়ে গেছে—নিঃশ্বাস রুদ্ধ
তবু আজ নহবৎ বাজছে, কী ক'বরে?
—পাশাপাশি পূজা আর যুদ্ধ!!
ধরণীর পথ আজ ধূসরিত যেন গো
মানবের রক্তের গঙ্গা—
ভাবি মনে বিদ্যার দেবী আজ কেন গো
আসিয়াছে নিয়ে জয়ডঙ্কা?
মৃত্যুর সাথে মোরা করিবারে 'হ্যাণ্ডসেক্'
প্রস্তুত ঘরে ঘরে হ'য়েছি;
মরুভূমি-জীবনের ক্ষণিকের প্রিয় লেক্'—
—বিদায়ের ব্যথা সবে স'য়েছি!
প্রেম আজ শ্মশানের ভস্মের মতো দূরে
হতাশার সমাধিতে কাঁদিছে;

দূর হ'তে কতোদূরে আসিয়াছি ঘুরে ঘুরে
পূজা—আজ স্বপ্ন সে' লাগিছে!
যতোখুসী 'সাইরেণ' হুইসেল্ দিক্‌না
পূজা মোরা নিশ্চয় ক'রবোই;
পূজাহীন—জীবনের অর্থটা ঠিক্‌না—
মঙ্গল ঘট মোরা ভ'রবোই।
আমরা তো বাঙালী গো বঙ্গের বাসী হে—
বশ্যতা বৃথা মোরা মেনেছি;
পবিত্র হই মোরা অশ্রুর রাশীতে—
ভারতের ভারতীরে মেনেছি!
বিদ্যার দেবী তাই আমাদেরই ঘরেতে
যুদ্ধেরও মাঝে ঠাঁই পায় গো;
আমাদের কাছে স্নেহ শিখিয়াছে পরেতে—
পূজা তাই আমাদের চায়গো
শেষ নাই আমাদের—পৃথিবীর শেষ আছে,
এ ভারতে বাজে জয়ডঙ্কা;
দেবতার শুভাশীষ আছে আমাদের কাছে
—যাক্ ব'য়ে রক্তের গঙ্গা!!

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামের চরণ বন্দি হনুমান রঙ্গে,
করে গমন বিভীষণ আর লক্ষ্মণের সঙ্গে।

বানরগণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে মাথা চুলকান। একটি ফল খেয়ে নিদ্রিত শ্রীরাম। রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হয়ে রাত দুপুরের কাছাকাছি সময়ে লক্ষ্মণ বিভীষণ আর হনুমান গড়ের ধারে ধারে গিয়ে এক স্থানে পৌঁছলেন। হনুমান বল্লেন—"এ দিকে লঙ্কা নয়, এ যে বটতলার দিকে যাচ্ছি।"

বিভীষণ বলছেন—"বটতলাতেই আমাদের যেতে হবে। ঐ যেখানে হাড়কাঠ দেখা যাচ্ছে, নিকুম্ভিলের মন্দিরের উঠানে, ঐখানে চলো সাবধানে কথাটি কোয়োনা।"

—"কেন, হাড়কাঠের কাছে কেন?" বলেই হনুমান লক্ষ্মণের হাত ধরে বলেন—"ফিরে চলেন।" বিভীষণ আর এক হাত ধরে বলেন—"আগায়ে চলেন।" লক্ষ্মণ না আগান না পিছান—খাড়া দাঁড়িয়ে—এমন সময় মাথার উপর আকাশে আলোর দুটো ছড়ি নীল্ পীত্, নীল্ পীত্ করে ঢাক পেটাতে সুরু করে দিলে!

লক্ষ্মণ বলেন—"বিভীষণ, ও কি দেখা যায়?

—"নিকুম্ভিলের আকাশ পদীপ!"

—"নিকুম্ভিলে কে? কুম্ভকর্ণের কেউ নাকি?"

—"কেউ নয়, চল দেখবে—

বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলে,
মেঘনাদ যজ্ঞ করে, নাম নিকুম্ভিলে।
কুম্ভীরের মতো মুখ গম্ভীরার মাঝে
দোর দিয়ে ইন্দ্রজিত যজ্ঞাসনে আছে।
শ্বাস করে নিয়মিত অগ্নিকুণ্ড পুজে,
নিকুম্ভিলার নাম জপে দুই চক্ষু বুজে।
অনাহারে যজ্ঞশালে আছে দিন রাত্রি
এই বেলা কর তারে যমালয়ের যাত্রি।
যজ্ঞের আহুতি দিয়ে যদি বাহির হয়
যুদ্ধে আর তার নাই পরাজয়।
সকলে মারিবে সেই একেশ্বর,
তাহারে মারিবার এই অবসর!"

এই বলতে বলতে এক লাথিতে দুদ্দাড় করে দুই কপাট ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করেই

যজ্ঞ দ্রব্য ছড়ায়ে ফেলে চার ভিতে
গড়ায়ে ফেলে ঘৃত কুম্ভ চোখ না খুলিতে।

ইন্দ্রজিত চোখ খুলে দেখেন হনুমান

হনুমান বীর যেন সিংগীর প্রতাপ
যজ্ঞী ভাসায় করি প্রস্রাব।

হনুর মূর্ত্তি দেখেই—"মনু" বলে ইন্দ্রজিত লাফিয়ে পলায়ন করবে, সামনে দেখে লক্ষ্মণ, বিভীষণ!

তখন কুপিল মেঘনাদ, বলে মহাবলী
তিনজনের সনে করে ঠেলাঠেলি।
হনুমান কম্পবান খাইয়া প্রহার
তথাপি না ছাড়ে মন্দিরের দ্বার।
বিভীষণ বলেন, বাছা আর পালাবে কোথা
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা!

যেমন বিভীষণ এই কথা বলা, অমনি পূজোর কোসা ছুঁড়ে মেরেছে ইন্দ্রজিত বিভীষণের মাথায়। বিভীষণ চিৎপাৎ—তেলো ফেটে রক্তপাত। পড়ে পড়েই বলছেন—"লক্ষ্মণ শীঘ্র বেটাকে পেড়ে ফেল।"

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি এককালে ব্রহ্মবান ঝাড়াও যা, ইন্দ্রজিত পড়াও তা! নীল-পীত নীল-পীত করে আকাশ পদীপের আলোর ছড়ি দুটো নিভে লঙ্কাপুরী অন্ধকার!

বাস্ আর কথা নেই! হনুমান লক্ষ্মণ আর বিভীষণকে দুই বগলে নিয়ে এক লম্ফে গড় পার হয়ে 'জয়রাম' বলে বানর কটকে প্রবেশ—"বধ হয়েছে, বধ হয়েছে" বলে!

বিভীষণ আর লক্ষ্মণকে নামিয়ে দিতেই দুজনে অজ্ঞান।

—"কে বধ হল? কে বধ হল?" দেখে ক'ন জাম্ববান।

সুসেন বানর বলে—"বিভীষণ না লক্ষ্মণ?"

লক্ষ্মণ, বিভীষণ তখন কাতর স্বরে বলছেন—"না না আমরা মরিনি।"

হনুমান বলছেন—"ইন্দ্রজিত বেটা মরেছে; কিন্তু কোসার ঘায়ে বিভীষণের তেলোর খোসা ছাড়িয়ে দিয়েছে। আর ভাই-লক্ষ্মণকে হাতা পেটা করে বুড়ো আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ করে ছেড়েছে।"

তখন সুসেন বৈদ্য সৈদ্য সৈদ্য চোট্ শুদ্ধি পাতা বাঁটান,
এর মাথায় পটী বাঁধেন, ওর আঙুলে ফেটা জড়ান।
উভয়ের শরীর হৈল পূর্ব্বের সমান।
হনু বলেন, অবাক হনু—কি কব তোমারে,
তোমার সমান বদ্যি নাই ত্রিসংসারে।
জাম্ববান বলেন ভাই হনুমানের কিছু ওষুধ কর
লোমকূপে বিঁধেছে ইন্দ্রজিতের শর
সুসেন বলেন, আমি কি চিনিনা, কারে বলে চোর কাঁটা, কারে বলে শর!
হনুমান বলেন, এরেই বলে বদ্যি
ত্রিভুবন ঘুষবে তোমার এ কীর্ত্তি!
সবারই গায়ে অমন কাঁটা দেয় ভয় খেলে নয় পড়লে পিত্তি।

বলে হনুমান রামচন্দরের কাছে গেলেন। ইন্দ্রজিত পাতের খবর পেয়ে—

আনন্দের অবধি পান প্রভু রঘুনাথ
হনুমানের অঙ্গেতে বুলান নিজ পদ্মহাত।
কাঁটা দূর হয়ে চিক্কণ হল গাটা,
সুশীতল ভোলোর ভিতর হতে লেজের ডগাটা।

এই বলে কাঁছা গুজতে গুজতে চাঁইবুড়ো ময়দার খাঁনা কিনতে পুঁথি হাতেই দৌড়লেন শেয়ালদার হাটে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সর্দার বলতে লাগল, "এটাই আমাদের নাটকের নিয়ম। যার মৃত্যুর কথা থাকবে ষ্টেজে তাকে মরতেই হবে। চল শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখবে চল। সেখানে গেলে দেখতে পাবে কত লোক এসেছে রাবণের চিতা দেখতে।" গেলাম শ্মশানঘাটে। গিয়ে দেখলাম সর্দারের কথা মিথ্যা নয়—বহু লোক এসেছে সেখানে।

অদৃশ্য বাঘ আমাদের সঙ্গেই ছিল, সে আমাকে চুপে চুপে বলল, "মরা মানুষের গন্ধ আমার একটুও সহ্য হয় না, চল এখান থেকে পালাই, শ্মশানের ভীড় দেখে লাভ কি?"

আমি বললাম, "আরও একটু থাক, সর্দার নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডেকে এনেছে, তার সময় হ'লেই এখান থেকে চলে যবে।"

বাঘ বলল, "তা হ'লে তোমরা বস, আমি একটু ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে এখন আমাদের ফেলে?"

"বেশি দূরে নয়, বড় ক্ষিদে হয়েছে একটু জলযোগ করে আসি।"

"কোথায়?"

"যে লোকটার মাথা নেই দেখেছ তো? সেই লোকটাকে দেখে তখন আমার বড় লোভ হয়েছিল, তাকে খেয়ে আসি।"

"বল কি, নাট্যকারকে খাবে?"

"খেলে বোধ হয় এদেশেরই উপকারই করা হবে, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না, আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘুরে আস্‌ছি।"

বাঘকে আর ঠেকানো গেল না, সে নাট্যকারকে খেতে চলে গেল।

সর্দার বলল, "তোমাদের শ্মশানে এনেছি আমাদের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে। শোন, আমাদের রাজার বিচারে এখানে যাদের মৃত্যুদণ্ড হয়, তাদেরই এখানে এনে নাটকের প্যাঁচ ফেলে মারা হয়। এতে যে লোকটি মরে, সে মরার আগে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যায়। রাজার কাছে যে লোকটি হয় অভিযোগকারী, স্টেজে সেই হয় হত্যাকারী।"

সর্দার এইটুকু মাত্র বলেছে এমন সময় একটা লোক ভীড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ হো হো হো হো করে হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেল। কি সাংঘাতিক তার হাসির শব্দ, ভীড়ের সকল কোলাহল ছাপিয়ে উঠল সেই হাসি। সেই লোকটি যেন হাসির অনেকগুলো পটকা ফাটিয়ে চলে গেল। ভীড়ের মধ্যেকার সবাই সেই সঙ্গে হাসতে লাগল।

মণ্টু আর নিতাইও তা দেখে খুব এক চোট হেসে সর্দারকে প্রশ্ন করল, "লোকটা কে বল তো সর্দার?"

সর্দার বলল, "সে এক কাহিনী, আমার কাছে এসে বস, বলছি।"

আমরা সর্দারের কাছে এগিয়ে গেলাম, সর্দার বলতে লাগল, "ঐ লোকটির নাম খিলং, কিন্তু খিলংএর গল্প বলতে হ'লে পং নামক একটি লোকের কথা আগে জানা দরকার। পং আমাদের শহরেরই লোক, বড়ই কৌতুকপ্রিয়। সে নানারকম গল্প বলে আসর জমাতে পারে। অনেকে তার গল্প শুনে খুব মজাও অনুভব করে। যে লোকটি আজ রাবণ সেজে স্টেজের উপর মারা গেল এবং যার চিতা দেখতে আমরা এসেছি, সে ঐ পং। আগেই অবাক হয়ো না, সবটা শোন। পং কি অপরাধে শাস্তি পেল, সব শুনলে বুঝতে পারবে। খিলংএর হাসির শব্দ শুনেছ। খিলং এক অদ্ভুত লোক। কোনো কারণে যদি সে কৌতুক অনুভব করে তা হ'লে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে এমন হাসতে থাকে যে তাকে তখন ছ'সাতজন লোকে চেপে না ধরলে কাছের লোকের বড়ই বিপদ। হাসির সময় সে পাশের লোককে কামড়াতে থাকে।

"একদিন এই খিলং আমাদের রাবণ বধ পালা দেখতে এসেছিল। হঠাৎ এক সময় হনুমানের লেজ দেখে সে আর হাসি থামাতে পারে না। চীৎকার ক'রে, হো হো হিহি ক'রে, সমস্ত থিয়েটার ঘরে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। যত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় হাস কেন, ততই সে ক্ষেপে যায় আর মাঝে মাঝে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, হাহা হনুমানের লেজ, হো হো হনুমানের লেজ, হি হি হনুমানের লেজ। তা দেখে স্টেজের উপর হনুমান (সেও মানুষ তো!) হাসতে আরম্ভ করল। শেষে রাবণ, রাম এবং যত রাক্ষস আর বানর সৈন্য ছিল তারা সবাই মিলে হাসতে আরম্ভ করল। রাম রাবণকে মারতে ভুলে গেল, রাবণ বানর সৈন্যদের গাল দিতে ভুলে গেল, রাম রাবণের গলা জড়িয়ে ধ'রে হাসতে লাগল। থিটোরের ম্যানেজার তাদের থামাতে গিয়ে থামাতে পারল না, উল্টে সে নিজেই হাসতে আরম্ভ করল। হনুমান হাসতে হাসতে ম্যানেজারের ঘাড়ের উপর প'ড়ে তাকে চিৎ ক'রে ফেলল। ম্যানেজার এক বানর সৈন্যের লেজ ধ'রে মাটিতে গড়াতে লাগল। দর্শকদের কথা আর না বলাই ভাল। তারা ততক্ষণ চেয়ার ভেঙে, থিয়েটার

ঘরের দরজা জানালা ভেঙে হাসতে হাসতে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে। ম্যানেজার যতই সবাইকে শাসন করতে যায়, ততই তার হাসির তেজ বাড়তে থাকে। রাবণকে শাসন করতে গিয়ে দেখে রাবণ রামকে জড়িয়ে ধ'রে মাটিতে গড়াচ্ছে, রাবণ রামের পেটে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, রামও রাবণকে ছাড়ছে না। ম্যানেজার অনেক চেষ্টা ক'রে গম্ভীর হয়েছিল কিন্তু এই দৃশ্য দেখে সে আবার হাসতে লাগল। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়েও নিস্তার নেই, যেদিকে তাকায় সেই দিকেই হো হো হি হি।

"স্টেজের উপর যে লোকটি হাসি থামিয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবে মনে করছে, হনুমান তারই পায়ে লেজ জড়িয়ে চিৎ করে ফেলছে, সে সময় কারোই কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। হনুমান মাসে মাত্র দশটি টাকা মাইনে পায়, অন্য সময় ম্যানেজারকে দেখে ভয়ে কাঁপে, কিন্তু সেদিন ম্যানেজারের গায়ে লেজ জড়িয়ে চিৎ ক'রে ফেলতে তার কোনো সঙ্কোচই নেই!

"এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটার পর সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, কারো আর কথা কইবার সামর্থ্য রইল না। কিন্তু তবু রাম, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি মিলে অভিনয়ের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু স্টেজের উপর কেউ আর দাঁড়াতে পারল না। রাবণ ছিল খুব শক্ত লোক, সে অনেক কষ্টে রামের কাছে এগিয়ে গিয়ে বুক খুলে দিয়ে বলল, রাম, আর যুদ্ধ করতে হবে না, তুমি যা যা করবে তা আমার জানা আছে, শেষ অবধি আমাকে মারবে তো? তা নাও, এই বুক পেতে দিচ্ছি, এখনই মার, মুখস্থ করা পার্ট আজ আর বলতে পারব না, তুমি কোনো কথা না ব'লে সোজা তোমার তীর আমার বুকে বিঁধিয়ে দাও।

"রাম তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, তার কথা বলার ক্ষমতাই নেই, সে বলল, ভাই রাবণ, তোমাকে আজকের মতো ক্ষমা করলাম। তুমি যে সুড়সুড়ি আমার পেটে দিয়েছ তা মনে করলে এখনও হাসি পাচ্ছে। রাবণ বলল, ভাই রাম, তুমিই কি আমাকে ছেড়ে কথা বলেছ? আমি মোটা মানুষ, তাতে কি কষ্ট যে পেয়েছি তা আর কি বলব! কিন্তু কে ঐ লোকটা যে আমাদের এমন ক'রে হাসিয়েছে?

"রাম বলল, ওকে আগে কখনো দেখিনি, এখন একবার ভাল ক'রে দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনেছি পালিয়ে গেছে। হনুমানের লেজ দেখে যে কারো এত হাসি পেতে পারে তা আমি ধারণাই করতে পারিনি, আজকের কথাটা আমি কোনো দিন ভুলব না।"

"রাম আর রাবণ এই সব আলোচনা করছিল এমন সময় ম্যানেজার সেখানে এসে বলল, আজ আর অভিনয় করতে হবে না, তোমরা এখন বাড়ি যাও, আমি রাজার কাছ থেকে রাবণের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নেব, তাকে বোধ হয় এবারে আর মরতে হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবার কোনো অপরাধ করে তা হ'লে কিন্তু তখন আর ক্ষমা করা হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই খিলং। ওকে পেলে ভবিষ্যতে ওকেই রাবণ সাজানো হবে। রাম একথা শুনে বলল, না ম্যানেজার মশাই, এমন কাজ কখনো করবেন না, সে রাবণ সাজলে আরও মুস্কিল হবে। হনুমানের লেজ দেখে যে লোকটা এত হাসতে পারে, হনুমানের লেজ ছুঁলে যে সে কি করতে তা ভাবলেও ভয় হয়। তা হ'লে রাম আর তাকে মারতে পারবে না, সেই হয়তো রামকে মেরে ফেলবে। ম্যানেজার ভেবে দেখল কথাটা ঠিক।

"কথাটা রাজার কানে গেল। রাজা তাকে ধরিয়ে আনলেন। লোকটা খিলং ছাড়া আর কেউ নয়। খিলং রাজার সামনে একবার হাসার উপক্রম করেছিল, কিন্তু তাঁর অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে যায়।

"রাজা প্রশ্ন করলেন, তুমি লেজ দেখে হেসেছ কেন? খিলং তার উত্তরে প্রকাশ করল, হনুমানের লেজ দেখে তার হাসি পায়নি, আর লেজ দেখে যে হাসি পেতে পারে সে রকম কল্পনাও তার হয়নি। তার পাশে পং নামক

একটি লোক বসে ছিল সেই নাকি লেজের একটা অসঙ্গতি প্রথম লক্ষ্য করে। হনুমানের লেজ মেরুদণ্ডের ঠিক শেষ প্রান্ত থেকে না বেরিয়ে পাঁচ ছ' ইঞ্চি বাম দিকে স'রে ভুল জায়গা থেকে বেরিয়েছিল। পং সেইটে দেখিয়ে দেওয়াতে তার হঠাৎ হাসি পায় এবং তারই ফলে এই কাণ্ড। সাক্ষী ডাকা হ'ল, সবাই সেটা সমর্থন করল। তখন রাজা মনে মনে দুজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন। পং এবং থিয়েটারের ড্রেসার। বিচারে শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল ড্রেসার নিরপরাধ, পংই অপরাধী। তাই তাকে আজ রাবণ সাজতে হয়েছে এবং তার ফলে মরতে হয়েছে।"

সর্দারের মুখে এই কাহিনী শুনে আমরা তো অবাক! ভারি ইচ্ছে হ'ল খিলংকে দেখতে।

আমার পাশেই কখন রয়্যাল বেঙ্গল অদৃশ্য ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। সে চাপা গলায় আমাকে বলল, "নাট্যকারকে শেষ করেছি, মন্দ লাগল না খেতে, এখন মন অনেকটা খুশী আছে—চল এবারে তোমাদের সঙ্গেই খানিকটা বেড়ানো যাক।"

বাঘের এই কথা শুনে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কখন কি বিপদ হয়, হ'লে আমরা তিনজনে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ব। কিন্তু বাঘ সঙ্গে থাকতে আর আমাদের ভয় নেই।

আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, পরের ঘটনা থেকেই তা বেশ বোঝা গেল।

[ক্রমশঃ

দারু-শির

[৺রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

প্রত্যূষে পুঁথি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপনীত হইলাম। দেখি এক সৌম্যমূর্ত্তি মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট। উভয়ের যথাবিহিত চরণ-বন্দনা করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব কহিলেন, "মহর্ষি, এই বালকের কথাই বলিতেছিলাম; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

যাঁহাকে মহর্ষি সম্বোধন করা হইল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার নিকটে আসিলেন ও সস্নেহে আমার মস্তকে তাঁহার পদ্ম-হস্ত বুলাইলেন। আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত। আমাকে বলিলেন, "বৎস, চল আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

তাঁহার সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিলাম। অগ্রে তিনি ও পশ্চাৎ আমি জলে অবতরণ করিলাম। জলমধ্যে নিমজ্জিত হইবামাত্রই আমার মনে হইল যেন আমার পদনিম্নে মৃত্তিকা সরিয়া যাইতেছে এবং আমি ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে নীত হইতেছি। ভরসার মধ্যে আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হয় নাই; যাহা ঘটিতেছিল তাহা

সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম। চক্ষুদ্বয় চাহিয়া কিংবা মুদিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই; তবে মনে কোন ভয় উদয় হয় নাই; সাহসে ভর করিয়া কি ঘটে অপেক্ষা করিতেছিলাম। মনে হল যেন পাতাল প্রদেশে নীত হইয়াছিলাম। প্রথমেই দেখিলাম সম্মুখে সোজা প্রশস্ত রাস্তা, আর তাহার উভয় পার্শ্বে সারি সারি দোকান। কলিকাতায় যেমন বড় বড় দোকানে বড় কাঁচের জানালার ধারে, সুশোভন দ্রব্য সামগ্রী দর্শকগণের মন আকৃষ্ট করে, সেদেশে জানালার পার্শ্বে বিবিধবর্ণের মনুষ্যমুণ্ড (পরে জানিয়াছিলাম দারু-নির্ম্মিত) সাজান আছে। দেখিয়া মনে হইল এত মুণ্ডের কি প্রয়োজন? সারি সারি প্রায় পাঁচ সহস্র দোকান; সব দোকানেই শুধু মুণ্ড; এ যে কৃত্রিম মুণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও আশ্চর্য্য কলাকৌশল ঠিক জীবিত মুণ্ডের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তবে কি এদেশের বালকবালিকারা শুধু মুণ্ড লইয়াই খেলা করে? এ কি খেলনার বাজার?

ভরসা করিয়া একটি দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানদার নিকটে আসিয়া আমায় ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল; পরে আমার হাত ধরিয়া একটী গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। সেখানে দেখিলাম ছোট, বড়, মাঝারি, সহস্র সহস্র মুণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। কি চাই জিজ্ঞাসা করায় (তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারি নাই—ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলাম) আমি বলিলাম, "কিছুই চাই না; আমি বিদেশী আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এত মুণ্ড প্রস্তুত হইতেছে কেন, ইহার প্রয়োজনই বা কি?" দোকানদার আমার ভাষা বুঝিতে পারিল না; পরে গ্রামোফোন যন্ত্র আনিয়া, যন্ত্রের সম্মুখে প্রশ্ন আবৃত্তি করিতে বলিল। আমি আবৃত্তি করিলাম; তখন আমার প্রশ্নের রেকর্ডখানি অপর একটি গৃহে লইয়া গেল; এবং ক্ষণকাল পরে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া দেয়াল সংলগ্ন একখানি মানচিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেখানি এশিয়ার মানচিত্র; তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ দেখাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ দোকানদার আলমারির উপর হইতে একটী মুণ্ড পাড়িয়া কানে হাত দিয়া দম দিল—মুণ্ড পরিষ্কার বাংলা ভাষার কথা কহিতে লাগিল।

পরে জানিতে পারিয়াছিলাম এই সকল দোকানে যাবতীয় মুণ্ড আছে, তাহাদের ভিতর অদ্ভুত কলকব্জা সন্নিবিষ্ট এবং দুই কানে দম দিলে কথা কয়। প্রত্যেক ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নম্বর আছে। মুণ্ডগুলি নম্বর অনুসারে পরিচিত। বাংলা ভাষা বা মুণ্ডের নম্বর—৯ (নয়)।

৯ নম্বর মুণ্ডের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, সে দেশের লোক মুণ্ড লইয়া জন্মায় না। মুণ্ডহীন কবন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কারণ গৃহস্থ সন্তান-সম্ভাবনা হইলেই একটী বা দুইটী মুণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখে। পাঁচ টাকা হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত মুণ্ডের দাম। ধনী লোকেরা বেশী দামের মুণ্ড ব্যবহার করে; গরীব লোকেরা কম দামের মুণ্ড ব্যবহার করে। এই দুই শ্রেণীর মুণ্ডের কলকব্জার তারতম্য হেতু ধনীরা গরীবদের কথা বুঝে না; গরীবরা ধনীদের কথা বুঝে না। তিন বৎসরের অধিক কোন মুণ্ড চলে না; এবং এই তিন বৎসরের ভিতরও মুণ্ডগুলিকে বারংবার মেরামত করিতে হয়। মুণ্ড মেরামতের দোকান এদেশে সর্ব্বত্রই আছে। এদেশের যত দোকানী—সব বিদেশী; তাহারা শুধু বিক্রয় করে; দেশীয়রা শুধু খরিদ্দার, তাহাদের একখানও দোকান নাই। যত শিক্ষক সব বিদেশী; যত ডাক্তার সব বিদেশী; যত বিচারক সব বিদেশী; যত কারিগর সব বিদেশী; মোটের উপর যত বুদ্ধির কাজ সব বিদেশীর হাতে; কেননা বিদেশীর যে মুণ্ড তাহা আসল অর্থাৎ মস্তিষ্ক সংযুক্ত রক্তমাংসের। একঘেয়ে যত কাজ, যেমন জমি চাষ, মোট বহা, লেখাপড়া শেখা, বক্তৃতা করা, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা ইত্যাদি, এদেশের কবন্ধেরা করে—নকল কাষ্ঠ ও লৌহ সংযুক্ত যন্ত্র-মুণ্ডের সাহায্যে। এক এক জন লোকের নানা কার্য্যের জন্য নানা মুণ্ড থাকে; যে মুণ্ড পরিয়া পথ চলা যায়, সে মুণ্ড পরিয়া বক্তৃতা শোনা বা দেওয়া যায় না; পথিক ও বক্তার মুণ্ড স্বতন্ত্র। এইরূপ খেলা

করিবার সময় বালক-বালিকাদের যে প্রকার মুণ্ডের প্রয়োজন হয়, স্কুলে সে মুণ্ডে কোন কাজ হয় না; অন্য মুণ্ড পরিতে হয়। ফলতঃ যে যে কাজ করিতে যাইবে, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুণ্ড প্রয়োজন। যাহার যতপ্রকার মুণ্ড আছে, সে তত প্রকার কাজ করিতে সক্ষম। গরীবেরা ধান কাটার মুণ্ডে কাপড় বুনিতে পারে না; সুতরাং যে ধান কাটে সে ইহা ভিন্ন কিছু জানে না। যে কাপড় বুনে সে ধান কাটা জানে না। ৯ (নয়) নম্বরের সহিত আলাপ করিয়া দেশটী দেখিতে বড় কৌতূহল হইল এবং দোকানদার দয়া করিয়া কিছুদিন দোকানে থাকিবার অনুমতি দিল।

মুণ্ড-মেরামতের দোকানে গিয়া দেখিলাম যে, সেগুলি আমাদের দেশের নাপিতের দোকানের মত। সারি সারি চেয়ার; প্রত্যেক চেয়ারের সম্মুখে একখানি ছোট টেবিল; দেয়াল-সংলগ্ন আর্শি; আর্শির উপর দেয়ালে ঝুলান রবারের নল ও কাঁচের ফুঁদেল। খরিদ্দার দোকানে আসিবামাত্র একখানি চেয়ারে বসান হইল; মুণ্ডটী খুলিয়া লইয়া গলার গহ্বরে কাঁচের ফুঁদেল ও রবারের নল সাহায্যে খানিকটা দুধ-সাগুর মত তরল পদার্থ, খরিদ্দারের উদর মধ্যে প্রেরিত হইল; পরে পাছে মাছি, কীট-পতঙ্গ বা ধূলা গলার গহ্বর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, এইজন্য গলায় একটী ঢাক্‌নি দেওয়া হইল। মুণ্ড-বিহীন খরিদ্দার অচল অটল চেয়ারে বসিয়া রহিল; ক্ষণপরে মুণ্ড মেরামত হইয়া আসিল; গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল; দাম দিয়া খরিদ্দার চলিয়া গেল। দেখিলাম, মেরামতের দোকান, মুণ্ড-বিক্রয়ের দোকান হইতে সংখ্যায় অনেক বেশী।

হাসপাতালে প্রবেশ করিলাম। রোগী আসিলেই তাহার হাতে একটী নম্বর-যুক্ত টিকিট আঁটিয়া, তাঁহার মুণ্ডটী খুলিয়া লওয়া হয়। কারণ কবন্ধের মুণ্ড চিকিৎসার বিষয় নহে। চিকিৎসাধীন কাল মুণ্ডহীন অবস্থায় কাটাইয়া আরোগ্য হইলে মুণ্ড পরিয়া চলিয়া যায়। হাসপাতালে মৃত এমন রোগীর মুণ্ড; তাহার আত্মীয়গণ দাবী না করিলে নীলামে বিক্রয় হয়। নীলামে পুরাতন মুণ্ডগুলি খুব সস্তায় বিক্রয় হইল দেখিলাম। গরীবেরা ঐরূপ মুণ্ড ক্রয় করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে লাগায়। বলা বাহুল্য, এখানকার ডাক্তারগণ আদল মুণ্ড বিশিষ্ট। হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রক্তহীন। তাহার কারণ চীৎকার করিবার মুণ্ড নাই। মার, কাট, যাহাই কর, রোগী হাত-পা ছুঁড়িবে মাত্র—চীৎকার করিতে অক্ষম। রবারের নল ও ফুঁদেল সাহায্যে খাওয়ান হয়—রোগীর নিকট হইতে কোন বিষয়ে নালিশ নাই।

কৌন্সিলঘরে গিয়া দেখিলাম, সকলের কাঠের মুণ্ড। সভ্যগণ অধিকাংশ ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) নম্বরের মুণ্ড (ইংরাজ ভাষায় কথা কহিবার মুণ্ড) পরিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় অনুসারে মুণ্ড পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়; যেমন গ্রীষ্মকালে দেশের সর্ব্বত্র পানীয় জলের সুব্যবস্থা হওয়া উচিত কিনা, এই বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য সকলেই ৪৯-প বা ৪৯-জ মুণ্ড পরিয়া বসিলেন। পরক্ষণে যখন ছাগমাংস ভোজন নিষিদ্ধ করা উচিত এই বিষয় আলোচিত হইল, তখন সকলেই ৪৯-অ বা ৪৯-ন মুণ্ড পরিয়া আসিলেন। বক্তৃতা বক্তার ইচ্ছানুসারে হয় না; অর্থাৎ বক্তা দাঁড়াইয়া যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন না। তাঁহার মুণ্ডে যেরূপ রেকর্ড সন্নিবেশিত করিয়া দম দেওয়া আছে, তিনি তাহাই আবৃত্তি করেন মাত্র। প্রত্যেকেই বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া স্বীয় কর্ণদ্বয় বার বার পরখ করিয়া ল'ন যে, দম ঠিক আছে। ভোট দিবার প্রথা এই যে উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন ঘরে না গিয়া, একটি প্রকাণ্ড হলঘরে প্রবেশ করিয়া হাতাহাতি করেন; ফলে স্কন্ধ হইতে মুণ্ড বিচ্যুত হইয়া গড়াগড়ি যায় ও কবন্ধেরা জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান করেন! যে দল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুণ্ডপাত করিবেন, তাঁহাদেরই জয় হইল গণ্য হইবে। হাজির-খাতায় প্রত্যেক সভ্যের মুণ্ডের নম্বর লেখা থাকে। এবং গলায় মুণ্ড বসাইবার জন্য যে লৌহ নির্ম্মিত কলার (Collar) আছে তাহাতেও সেই নম্বর থাকে। এখানে বলা উচিত যে, মোটরগাড়ীর মত প্রত্যেক মুণ্ডের একটী নম্বর আছে; জন্মমাত্রেই একটী নম্বর রেজেষ্টারী করিতে হয়। কৌন্সিলের লোকেরা মুণ্ড কুড়াইয়া লইয়া, তাহার নম্বর মিলাইয়া, সভ্যগণের গলায় বসাইয়া দেয়। ভোটান্তে সভ্যগণ

মুণ্ড পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আবার কৌন্সিল-ঘরে বসেন, কার্য্য চলিতে থাকে। রাত্রে কার্য্য চালাইবার প্রয়োজন হইলে, সভ্যগণ কপালে এক টুকরা কাঠ সরাইয়া বোতাম টিপেন, মুণ্ডের ভিতর বৈদ্যুতিক আলো আছে—জ্বলিয়া উঠে। কৌন্সিল—ঘরে স্বতন্ত্র আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। বলা বাহুল্য, এদেশে লণ্ঠনের প্রয়োজন নাই; বিদেশীয়গণ শুধু লণ্ঠন ব্যবহার করেন। দেশীগণ কপাল-সংলগ্ন আলোর সাহায্যে পুস্তক পাঠ, পথচলা প্রভৃতি কার্য্য করেন।

আদালতে বিচারক আসল মুণ্ড বিশিষ্ট বিদেশী। বাদী-প্রতিবাদী এদেশের আদালতে আসিলেই তাহাদের মুণ্ড খুলিয়া লওয়া হয়। এই জন্যে অভিযোগকারী স্বীয় মুণ্ডে নালিশ করিতে পারে না; অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ মুণ্ডে জবাব দিতে পারে না; উভয়কে দম দেওয়া ভাড়াটে মুণ্ডে নালিশ ও জবাব করিতে হয়। এদেশে ফাঁসি নাই; খুন করিলে যাবজ্জীবন মুণ্ডহীন হইয়া থাকিতে হয়। জেলে ঢুকিলে হাসপাতালের মত মুণ্ড খুলিয়া লওয়া হয়। জেল হইতে বাহির হইবার সময় মুণ্ড ফেরৎ পাওয়া যায়। কবন্ধদের জন্য শুধু এক স্থানে দাঁড়াইয়া যে কাজ চলে সেই কাজ দেওয়া হয়। এই কারণে এদেশের জেলে কল-কারখানা বেশী; এক হাতে বা দুই হাতে চাকা ঘুরাইলে যাবতীয় কাজ হইবে এমন বন্দোবস্ত। জেলে সাড়া শব্দ নাই; কোন নালিশ নাই; জলের মত কাজ-কর্ম্ম চলিয়া যায়; খাদ্য, ফুঁদেল ও রবারের নল সাহায্যে কবন্ধ-কয়েদীর উদরে প্রেরিত হয়।

স্কুল-কলেজে বিদ্যা শিক্ষা শুধু মুণ্ডের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ঘণ্টায় ছাত্রদের মুণ্ড পরিবর্ত্তন করিতে হয়; মুণ্ড-পরিবর্ত্তনে শিক্ষকগণ (সকলেই বিদেশী) ছাত্রদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। গণিত পড়িবার মুণ্ডে ইংরাজি পড়া হয় না; ভূগোল পড়িবার মুণ্ডে ইতিহাস পড়া হয় না; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কারণ এক মুণ্ডে ছাত্রগণ একাধিক বিষয় শিখিতে পারে না। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যয়সাধ্য মুণ্ড রাখিতে হয়। আবার পড়িবার মুণ্ডে বাজার করা চলে না। সুতরাং ছাত্রেরা কেহই বাজারে জিনিষ-পত্র কিনিতে পারে না; নিজের সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না। ছাত্র জীবনে এমন অভ্যাস হইয়া যায়, যে, পরে পড়াশুনার মুণ্ড বদলাইয়া কাজ কর্ম্মের মুণ্ড আর কেহ পরিতে চায় না। ফলে এই দেশে দেখিলাম, ছাত্র-মুণ্ড লোক সংখ্যা অত্যধিক; কাজ কর্ম্মের মুণ্ড বিশিষ্ট লোক নিতান্ত অল্প।

ধর্ম্ম চর্চ্চা সকলেই করে। কিন্তু ওই মুণ্ডের ভিতর দম দেওয়া যাহা আছে তাহাই আবৃত্তি করে মাত্র। বলে ধর্ম্মের মুণ্ডগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও ভাল। যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার ভিতর সন্নিবেশিত আছে, কত দেবতা, কত মুনি ঋষি, কত মহাত্মা, কত সাধুদের কথা, উপদেশ মন্ত্র-তন্ত্র, আরও কত কি! বরং পড়াশুনা ও কাজ কর্ম্মের মুণ্ডস্থিত রেকর্ড পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মের রেকর্ডগুলি পরিবর্ত্তন করা উচিত, একথা মনে করাও পাপ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন এইগুলি না বুঝিয়া আবৃত্তি কর?" উত্তর করিল, "পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়াছে, তাহাই করি; কেন, তাহা জানি না; ও যে কি তাহা বুঝি না; যেমন শুনিয়াছি এবং শুনি তাহাই জানি এবং বলি; আমাদের মানে বুঝিবার ক্ষমতা নাই—কেননা কাঠের মুণ্ড সেই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত; যদি কখনও রক্ত মাংসের মুণ্ড পাই, তাহা হইলে মানে বুঝিব।"

কোন কাজ-কর্ম্মে সভা সমিতিতে, যেখানে কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয়, সেখানে যদি কেহ না যাইতে পারে, তবে লোক মারফৎ নিজের দম দেওয়া মুণ্ড প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠান চলে। এক সভাপতির পেটের অসুখ হওয়ায়, তিনি তাঁহার মুণ্ড পাঠাইলেন। মুণ্ড ভীষণ রবে এক ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিল। পুরো হতের পা ভঙ্গ হইয়াছে; তাহার মুণ্ড আসিয়া গৃহস্থের বাড়ী চণ্ডীপাঠ করিয়া গেল। ছাত্রের বক্ষে বেদনা, তাহার পরিবর্ত্তে মুণ্ড আসিয়া পড়া

বলিয়া গেল। এইরূপ নির্ব্বাচনে মুণ্ড ভোট দিয়া যায়; হাট-বাজারে করে; আদালতে বক্তৃতা করে; পথে-ঘাটে ছড়া কাটে; দোকানে দর বলে। অবশ্য বাহক দিয়া মুণ্ড পাঠাইতে হয়। এরূপ প্রথায় অনেক সুবিধা হয় দেখিলাম।

এদেশে স্ত্রী ও পুরুষের মুণ্ডে কোন প্রভেদ নাই; কেননা কাহারও গোঁফ-দাড়ি নাই। স্ত্রী-পুরুষ ইচ্ছামত গোঁফ-দাড়ি ধারণ করিতে পারে। মাথার কেশ ও পরিচ্ছদ বিষয়ে একই নিয়ম। যাহার যাহা ইচ্ছা সেইরূপ পরচুলা ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন।

কখন যে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি তাহা মনে হয় না; সন্দেহ হয় স্নান করিতে আদৌ যাই নাই। ঋষিদেব ও মহর্ষি হাসিতেছেন দেখিলাম। মহর্ষি বলিলেন, "বৎস, তুমি যে দেশের বিষয় বলিতেছিলে, তাহা এখনও বর্ত্তমান! এ দেশ মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল; ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া সমগ্র জাতি আত্মহত্যা করিয়াছিল; এখন কবন্ধ হইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কালান্তরে তোমাকে আর একটী আশ্চর্য্য দেশ দেখাইব; এখন অধ্যয়ন কর।" মহর্ষি চলিয়া গেলেন; আমি পুঁথি খুলিয়া বসিলাম।

মাটি নিয়ে খেলা

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

ধূলোমাটি নিয়ে খেলতে খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভালোবাসে। বালির পাহাড় বানিয়ে তাতে সুরঙ্গ খুঁড়ে কত খেলেছি ছোটবেলায়—তাও মনে পড়ে। এখনও সুবিধে পেলেই সে সুযোগ ছাড়ি না। বালির পাহাড় শুকিয়ে গেলেই পড়্‌তো ধসে—কি দুঃখটাই না হ'ত! ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ধূলো বালিতে ব'সে পা ছড়িয়ে কত খেলা খেলে—ইঁট পাথরগুলো সাজায় বাগান করে—বড়দের ধমক খায়, তবু শোনে না—ধূলো মাটির ওপর তাদের কত টান! এমনি ক'রে কত ছেলে মেয়েরা নিজের মনে খেলতে চায় কিন্তু গুরুজনদের ধমক খেয়ে আর পারে না! কেউ কেউ আবার একগুঁয়ে—কথা শোনে না তারা—তাদেরই হয় জিত।

মাটি নিয়ে খেলেছিল সবাই। বহুকাল আগে হয় তো এমনি ক'রেই খেলতে খেলতে—মানুষে আবিষ্কার করেছিল যে মাটির পাত্র বানিয়ে তা' পুড়িয়ে নিলে তাতে' জল বা যে কোনো জলীয় পদার্থ রাখা যায়। ভাব্‌লে আশ্চর্য্য

লাগে। আজকাল ঐতিহাসিকরা বহু পুরোণো মাটির পাত্র মাটির তলা থেকে আবিষ্কার ক'রে তার থেকে ইতিহাস লিখে ফেলেছেন—মোটা মোটা বই! এই সব মাটির পাত্রের গায়ে তারা এঁকে ছিল—নানান রকম জন্তু জানোয়ার, মানুষ ফুল, ফল—লিখেছিল নানান সাংকেতিক চিহ্ন!—তাই নিয়ে আজকালকার পণ্ডিতরা গবেষণা চালিয়ে বহুকাল আগের লুকোনো তথ্য আবিষ্কার কর্‌ছেন। যাক্ সে সব পণ্ডিতদের কথা—আমি পণ্ডিত নই, খেলা কর্‌তেই ভালোবাসি। মাটি নিয়ে খেলার কথাই আলোচনা করা যাক্!

ইস্কুল পালিয়ে, গুরুজনদের কথা অমান্য ক'রে রং তুলী, কাদামাটি নিয়ে খেলা করাটাকেই বড় কাজ বলে ধরে' নিয়েছি। সেই খেলাই চল্‌ছে দিন রাত।—যতই খেল্‌ছি ততই ভালো লাগ্‌ছে নেশা চলেছে বেড়ে দিনের পর দিন! কাদামাটি নিয়ে খেলার নেশা বড় ভীষণ! মাটি দিয়ে কি না করা যায়! খুরি, কলসী, কুঁজো জালা থেকে আরম্ভ ক'রে তোমার মুখটা বাঁদরের চেহারাটা ভুলু কুকুর বা পুষি মেনি সবই গ'ড়ে ফেলা যায়!

কুমোরের চাক চল্‌তে দেখেছ? সেই চাকের ওপর গড়ে ওঠে ছোট্ট পিদ্দীম থেকে আরম্ভ ক'রে খুরি, গেলাস ঘটি বাটি ফুলদানী আরো কত কি! যদি সুযোগ সুবিধে হয় ত' একবার চালিয়ে দেখো—একতাল মাটি ঝাঁ ক'রে গেলাস হ'য়ে যায়—ফুলদানী হ'য়ে যায়,—মজা নয় মন্দ!

আমি মাটি দিয়ে মূর্ত্তি গড়ি—তা'তে চাক চালাবার দরকার হয় না। পাথর কুঁদে মূর্ত্তি কর্‌তে গিয়ে হায়রান হ'য়ে পড়ি! পাথর কুচো ও ধূলোয় নাক বন্ধ হ'য়ে আসে; মাথার ঘাম পায় পড়ে'; কিন্তু ঐ যে নেশা, সেই নেশাতে বিভোর হ'য়ে সব ভোলা যায়—দিনের পর দিন কাজ করা যায়! রং তুলী দিয়েও ছবি এঁকে দিনের পর দিন কাটানো যায়! সে নেশাও বড় কম নয়!

ছোট্ট ছোট্ট কত যে পুতুল হল

একটা পাথরের মূর্ত্তি শেষ কর্‌তে—লাগ্‌লো অনেক দিন। পাথরটা কাট্‌তুম রোজ, ক্রমে ক্রমে মনের ভেতর যে মূর্ত্তিটা ছিল তা' আকার নিল পাথরটায়। একটা জিনিষ তৈরী কর্‌তে লেগে গেলো অনেকদিন! পাথরটা কাট্‌তুম যেখানে—সেখান থেকে দেখ্‌তে পেতুম কুমোরের চাক্! ছেলেগুলো বুড়ো কুমোরটার কাছে চাক্ ঘোরানো ও মাটির খুরি গেলাস ফুলদানী করা শেখে! পাথরটা কাট্‌তুম আর মাঝে মাঝে দেখ্‌তুম তাদের কুমোরের চাকের ওপর

মিনিটে মিনিটে কিছু না কিছু একটা গড়ে' উঠ্‌ছে।—দশ আঙুলের খেলা যেন! ঝাঁ ক'রে—হ'য়ে গেল 'কাপ', সুতো দিয়ে কেটে আলগোছে সেটাকে তুলে নিয়ে রেখে দিচ্ছে! ভাঙ্‌ছে—আবার গড়ছে! কত রকম গড়নের জিনিষ গড়ে উঠ্‌চে!

পাথরের মূর্ত্তিটা শেষ হল!—শীতও পড়্‌লো! কুমোরের চাক ঘুর্‌ছে—শীতে যেন ঘোরে একটু বেশী! ঠাণ্ডায় জল-কাদার কাজ যেন ভালই হয়! জলের 'জাগ্' তৈরী হল। সুতো দিয়ে কেটে তুলে রাখ্‌তেই আসি সেটা নিয়ে পড়ে গেলাম—এখানে সেখানে তুব্‌ড়ে—এখানে ওখানে কিছু মাটি লাগিয়ে হাতল লাগিয়ে—হ'য়ে গেল মানুষের-মুখ-'জাগ্'! কুমোরের চাকের ওপর গড়ে' উঠ্‌লো একটি ফুলদানী—সেটাকে নরম থাক্‌তে থাক্‌তে টিপেটুপে, এখানে সেখানে জোড়া তাড়া দিয়ে হ'য়ে গেল—'কোঁদল গিন্নী কলসী মাথে!' এমনি করে পাথর কাটার পর—খেলা চল্‌লো

মানুষ-মুখো-'জাগ্'—কোঁদল-গিন্নী

কুমোরের চাকে গড়া জিনিষ নিয়ে। এক একটা কিছু হয় আর হাসির রোল ওঠে! ছুটি আরম্ভ হল। আমার ত' সব সময়েই খেলা—আমার কাজ মানেই খেলা। সে ত আর বন্ধ করা যায় না—তাই ছুটিতেও চল্‌লো খেলা পুরো দমে! দিন রাত মাটি, মাটি, আর মাটি! ছোট্ট ছোট্ট কত যে পুতুল হল! শীতের রাতে আগুনের ধারে বসেও গড়ি'—রোদে শুকিয়ে যাওয়া ছোট ছোট পুতুলগুলো এক একটা হাঁড়িতে পুরে তার ওপর ঢাক্‌না রেখে আগুনের ওপর রেখে দিই। আগুনে পুড়ে সেটা লাল হয়—সকালে সেটা ধুয়ে মুছে তুলে রাখি! যে পুতুলটাকে কষ্টি পাথরের মতো কালো রং কর্‌বার ইচ্ছা হয়, সেটাকে পুড়োবার সময় খানিকটা তুষ দিয়ে দিই হাঁড়িতে! তুষের ধুঁয়োতে পুতুলটার কালো রং ধরে! মনে হয় যেন কালো পাথরে গড়া পুতুল!

ছুটিটা কোথা দিয়ে কখন যে কেটে গেল বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না! স্কুল খুলে গেলো। দলে দলে ছেলেদের দল আসে আর দেখে—ভুতুম পেঁচা—কাগা বগা,—কেউ বাদ যায় নি। স্কুল খুলে যায়, খেলা কিন্তু ফুরোয় না। মাটি নিয়ে এই যে খেলা—এ চল্‌বেই। এর শেষ নেই! আদিম যুগ থেকে এর সুরু—পৃথিবী যতদিন থাক্‌বে—মাটি ততদিন থাক্‌বে, সেই মাটিতে চাষী চাষ কর্‌বে—সেই মাটিতে ছেলেমেয়েরা খেল্‌বে। তোমরা যারা এখনো মাটি নিয়ে খেলোনি তারা একবার চেষ্টা ক'রে দেখো! কালিয়া পোলাও খেতে হ'লেও হাত নোংরা হয় তা' ধুতে হয় খাবার পর। কাদামাটি নিয়ে খেল্‌লেও হাত নোংরা হয় বটে—কিন্তু একবার যদি সে খেলার যথার্থ স্বাদ পাও তবে বুঝ্‌তে পার্‌বে কালিয়া পোলাও খাওয়ার চেয়েও এতে আনন্দ পাওয়া যায় অনেক বেশী!

কবিতা

অজিতা

শ্রীকল্যাণী মিত্র মজুমদার

এক

পড়া যেন নেই তার! খেলাতেই মন।
হুটোপুটি কে গেল শিখিয়ে?
এত যে চঞ্চল! তবু গড়নে এমন,
ঠিক যেন গড়া লোহা দিয়ে!

তবু লাবণী ভরা মধুর অতুল
চেহারাটি, চোক নাহি ফিরে,
সজীব খেলার কি ও মোহন-পুতুল?
সব মেয়ে অজিতারে ঘিরে!

দৌড়িয়ে কে কখন পারে ওর সাথে?
লাফে, ঝাঁপে, রান্নায় প্রথম।
বছরটি ফুরোলেই শেষ পরীক্ষাতে
মেডেল গুলো নেবার ও যম!

বেজায় সবার সাথে তেমনি মিশুক,
ছোট, বড়, কিছু ভেদ নেই,
বেশ কি ভূষায় মন নেই একটুক,
দেখ যদি, অবাক হবেই!

এলো চুলগুলো তার উড়ছে হাওয়ায়,
কোন কাজে নেই তার ভয়,
সাহসে উজল-আভা চোকের মায়ায়
কাজ এসে, হেসে কথা কয়!

ইস্কুলে সভা আর খেলা কি উৎসব
অজিতারে সবখানে পাবে,
তারে নিয়ে সকলের যত কলরব,
যত কাজ—অজিতা গুছাবে!

ঘর সাজাবার ভার, 'পিক্‌নিকে' রাঁধা,
'স্পোর্টস্' আর গানে ও সাঁতারে,
দূরে যেতে দলেবলে, বাঁশী ঠিক সাঁধা—
যাবে আগে—জলে কি পাহাড়ে!

মুখে আঁকা দৃঢ় পণ হাসি ঢল ঢল,
গায়ে জোর সীমে তার নেই,
এবার খেলার মাঠে লাঠি খেলা হল,
'সব-সেরা' সে খেলাতে সে-ই!

দুই

সে গড়েছে মেয়েদের "শুশ্রূষা-দল"
ছোট বড় মেয়েদের নিয়ে,
রোগী হোক, দুখী হোক, অন্ধ, অচল,
বিপদে যে, সাথী হবে গিয়ে!

কোথায় অসুখ কার, কার কি বিপদ
তার দল দেখো আছে সেথা,
সাহস, সহায়, সেবা কাজে দ্রুতপদ,
গায়ে বল, বুকেতে মমতা!

হোক না আঁধার রাত, ঝিঁঝিঁ ডাকে দূরে,
লাঠি আর বাঁ হা'তে লণ্ঠন,
অজিতার দল কোথা—পথ ঘুরে ঘুরে,
দোরে ঠিক দিয়েছে দর্শন!

ভুগেও বিষম রোগে হেড মিষ্ট্রেস
সেরেছেন, ওদেরি সেবায়,
মণিয়ার মেয়ে—জলে ডুবে বুঝি শেষ!
ওরা ছিল—প্রাণ তাই পায়!

সেদিন বামুন পিসি চলেছেন স্নানে,
শিং নেড়ে আসে কালো গাই,
ক্ষেপা সে ভীষণ গরু, সকলেই জানে,
লাঠি নিয়ে তাড়াল ওরাই!

তিন

ছুটিতে, দেশের গাঁয়ে গিয়াছে অজিতা
ভারি খুসী!—লিখেছে সে চিঠি।
তবু মা আঁধার রাতে রন সচকিত',
আর অজিতার সাথেই লাঠিটি!

গাঁয়ে কশিয়ালীরা নাকি ঘরে এসে ঢুকে'
ছোটদের মুখে নে' পালায়;
কাঁদলে খোকন্, মা গো সব কাজ চুকে!
ঘুম নেই ভয়ের জ্বালায়!

বাবাও ভাবেন খুব। বেহারী সজাগ,
বলে "ভয় নেই দিদিমণি!
যাও নিদ্ খুব, হোক শেয়াল কি বাঘ,
পাকা লাটি—শিয়রে দেখনি?"

নিঝুম নিশুতি রাত, ত্রাগ্, ঝন্ ঝন্,
খট্ খট্ শব্দ কি জোর!
খ্যাঁকশিয়ালী তো নয়, বাক্স বাসন
পড়ে যায়। "চোর"! "চোর"! "চোর"!

পাড়ার লোকেরা ছোটে, তবু সে চোরেরা
যেন ক্ষুদে' ডাকাতের মত
লাঠি ছুরি নিয়ে উঠে, কী দারুণ এরা!
অজিতা তো প্রায় থতমত!

বেহারী কাঁপছে পড়ে দারুণ ঘা খেয়ে,
পড়সীরা ছুটে এলো চলে'
বাবা ও খোকনকে রেখে এসে ধেয়ে—
তালা দেয় অজিতা শিকলে।

যেন কী লড়াই এক সে নিশুতি রাতে!
সাম্‌লে নে, উঠে বেহারীও,
একটুকু পরে পথ পায় কি পালাতে
চোর দল, দুরন্ত যদিও?

দু'জন পড়ল ধরা দুই উঠোনেতে,
রং মাখা বুনো চেহারার,
যেটা প'ল অজিতার লাঠির জোরেতে,
ছিল সেটা—ওদের সর্দ্দার!

সাড়া পড়ে গেল দেশে! অজিতা যখন
ফিরে এল আবার ইস্কুলে,
দেশ জোড়া নাম তার হয়েছে তখন,
পড়ছি কাগজ খুলে খুলে।

বড় বড় আখরেতে লেখা ওর নাম।
আর যারা পেরেছে ও পারে
সেই থেকে বিস্ময়ে আসে অবিরাম
দেখিতে বিজয়া অজিতারে।

জলধরের উইল

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জলধরকে দেখ্‌তে খুব সাধারণ বোকা ছেলের মতো ছিলো। কালো রঙ্‌ দোষের নয়, কিন্তু তার রঙ্‌ ছিলো এমন ফ্যাকাশে কালো ধরণের যে একবার ছাড়া দু'বার তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হোতো না। তার গালে কতকগুলি বিশ্রী দাগ। সেগুলো ব্রণরও হোতে পারে, বসন্তেরও হোতে পারে। দাড়ি সে কামাতো না, জুল্পিগুলো গালের অনেকটা নীচে এসে পৌঁচেছিলো আর সমস্ত মুখময় খাপছাড়া খাপছাড়া দাড়ি ছিলো।

ম্যাট্রিক পাশ করে আমি হোষ্টেলে যে-ঘরে জায়গা পেয়েছিলুম তার পাশের ঘরেই থাক্‌তো জলধর। তার সঙ্গে কারুরই বিশেষ ভাব ছিলো না, আমারও নয়। সে-ও কারুর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা কর্‌তো না, কিন্তু কি জানি কেন আমার সঙ্গে সে নানা ভাবে আলাপ কর্‌তে চাইতো। এই গায়ে-পড়া আলাপ কর্‌বার চেষ্টা দেখে আমি মনে খুব বিরক্ত হতুম। কিন্তু মুখে কড়া কথা বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই যখন সে কলেজের ছুটির পর আমার সঙ্গে নানা আজেবাজে কথা বল্‌তে বল্‌তে হোষ্টেলে ফিরে আস্‌তো কিংবা আমি ফুটবল খেলা দেখ্‌তে গেলে আমার সঙ্গে বিনা নিমন্ত্রণেই আস্‌তো খেলা দেখ্‌তে, তখন মনে-মনে দারুণ বিরক্ত হলেও মুখে কিছুই বল্‌তে পার্‌তুম না। ফলে সে ভাব্‌তো আমি তার বন্ধু এবং একমাত্র বন্ধু।

ফার্ষ্ট ইয়ারে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটিতে হোষ্টেল খালি হয়ে এলো। জলধর অনেক দিন ধরে বলেছিলো আমাকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ভদ্রতা করে আমি আপত্তি কর্‌তে পারি নি। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে যাবার পর সে আমাকে বেজায় চেপে ধর্‌লো। বল্‌লো, "শেয়ালদা থেকে আমরা বিকেলের গাড়িতে উঠ্‌বো। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই নঙ্গীতে পৌঁছুবো। সেখানেই আমার বাড়ি। একটুও অসুবিধে হবে না।"

আমি হাঁ-না কর্‌তে লাগ্‌লুম। বাড়ি যাবো বলে আপত্তিও কর্‌তে পারি না। কারণ আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে দু'-তিন দিনের মধ্যে মা-বাবা কল্‌কাতায় আস্‌ছেন। শেষে নিতান্ত অনিচ্ছে সত্ত্বেও রাজী হতে হোলই। তবে বল্‌লুম, "কিন্তু ভাই কাল্‌কেই ফিরে আস্‌তে হবে। পরশু বাড়ির সবাই এসে পড়বেন। তা' ছাড়া বোনের বিয়েতে আমি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবো এটাও ভালো দেখায় না।"

জলধর যেন হাতে স্বর্গ পেলো। বল্‌লো, "নিশ্চয়ই। তোমাকেই বা আমি ধরে রাখতে চাইবো কেন? তবে একলা-একলা গ্রামে যেতে ভালো লাগে না। তাই বল্‌ছিলুম।"

গ্রীষ্মের ছুটি যে-দিন হয়ে গেল সেদিন বিকেলেই আমরা শেয়ালদায় এসে ট্রেণে চড়্‌লুম। জলধর দু'জনের টিকিট কিন্‌লো। আমাকে কিছুতেই কিন্‌তে দিলো না। শুধু টিকিট কেন, মানিব্যাগ বার করবার সুবিধেই আমাকে সে দেয়নি। কেবলই বলেছে, "সে কি কথা ভাই! তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আর তুমি কিনা খরচ দেবে! এ কি কখনো হয় নাকি?"

ট্রেন ছাড়্‌লে আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, "দেশে কে-কে আছো?"

"কে কে?" জলধর এক অদ্ভুতভাবে হাস্‌লো। সে হাসিকে করুণ বলা চলে আবার চলেও না। সন্ধ্যেবেলাকার বাইরের চলন্ত আলোয় তার কালো ফ্যাকাশে মুখ যেন আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হয়তো এটা আমার দেখ্‌বারই ভুল, কিন্তু দেখ্‌বার ভুল—আমার বড় একটা হয় না। একটু থেমে বল্‌লো, "বল্‌তে গেলে কেউই নেই। যিনি অ ছেন তিনি আমার বুড়ি দিদিমা।" আরো একটু থেমে বল্‌লো, "তবে তিনি না থাক্‌লেই ভালো হোতো!"

আমি ট্রেনের বাইরেকার চলন্ত পুকুর-কুঁড়ে-পথ-গাছ দেখ্‌ছিলুম। জলধরের অদ্ভুত কথা শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে বল্‌লুম, "তাঁর মানে?"

কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিলো না। সম্ভবত আমার প্রশ্ন সে শুন্‌তে পায়নি। আর শুন্‌তে পেলেও সে যদি উত্তর দিতে চায় তা হলে তাকে জোর করে আদায় কর্‌তে যাবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আসলে তাকে তো আমি কোনো দিন নিজের বন্ধু বলে ভাবিনি। নেহাৎ ভদ্রতা করেই আসা। তাই যেমন চেয়েছিলুম সেই রকমই রইলুম।

জলধর খানিক পরে বল্‌লো, "ছেলেবেলাতেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আমি যখন থার্ডক্লাসে পড়ি তখন আমার বাবা মারা যান। মার যে কি অসুখ হয়েছিলো বাবাকে অনেকবার সে-কথা জিগ্‌গেস করেছিলুম কিন্তু কোনোবারই তার সঠিক উত্তর পাইনি। এই প্রশ্ন কর্‌লেই বাবা কি রকম যেন ভয় পেতেন।—জানো, শুন্‌লে অবাক্‌ হবে নিজের বাড়িতেই বাবা যেন অনেকটা চোরের মতো থাক্‌তেন! সে অন্য কথা, যাক্‌। তারপর বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমি বেশ বড় হয়েছি। কিন্তু কি যে তাঁর হয়েছিলো আমি তো ঠিক্‌ বুঝলুম না। সকালে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন আর বিকেলেই মারা গেলেন। আর এখনো স্পষ্ট মনে আছে বাবা যখন মারা গেলেন তাঁর গায়ের রঙ্‌ খড়ির মতন শাদা। একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না, একেবারে খড়ির মতো! দিদিমাকে জিগ্‌গেস্‌ করেছিলুম বাবার কি হয়েছিলো। তিনি এক রকম ধমক্‌ দিয়েই বলেছিলেন, কি আবার হবে? কিছু না হলে কি মানুষ মরে না?—তুমি ভাই শুন্‌লে আশ্চর্য হবে যে আমার বাবা হাজার হলেও দিদিমার জামাই তো! কিন্তু বাবা মারা যাবার সময় কিংবা তার পরেও তিনি কোনদিন কাঁদেন নি।" তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লো, "জানো সবাইকার ধারণা আমার দিদিমার অনেক সম্পত্তি আছে। অনেক মোহর-গিনি আছে। অনেক জহরৎ মনি-মুক্তো আছে। আমারো তাই মনে হয়। অবশ্য কোনদিন আমি কিছু দেখি নি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোথাও তাঁর অনেক লুকানো সম্পত্তি আছে। সেই জন্যই আমি তো যাই। নইলে আমি একলা মানুষ, নিজের পড়ার আর থাকার খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারি। কিন্তু জানো ডাক্তারি পড়্‌তে বিলেতে আমাকে যেতেই হবে। যেমন করেই হোক। আর তার জন্যে দরকার অনেক অনেক টাকার। আর সেই অনেক অনেক টাকার লোভেই আমি এখনো দিদিমার কাছে যাই!"

জলধর নিজের এতো কথা কোনদিন আগে বলেনি। তার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে কি যে বলা উচিত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না! তবে তাদের পারিবারিক এই গোলমালের মধ্যে আমাকে জড়ানোর জন্যে মনে মনে চটেই উঠ্‌লুম। ভাব্‌ছিলুম ভবিষ্যতে তার গ্রামে যাবার নেমতন্ন কর্‌লে সোজাসুজিই না বোলে দোবো। তা ছাড়া সত্যি বল্‌তে কি, জলধরের এই সব এলোমেলো কথা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে উঠ্‌লো।

আমার মুখের দিকে চেয়ে জলধর হঠাৎ খুব লজ্জিত হয়ে পড়্‌লো। বল্‌লো, "নিজের কথা বলে তোমাকে বিরক্ত কর্‌ছি বলে ভাই তুমি নিশ্চয়ই খুব রাগ করোছো, নয়?"

আমি অত্যন্ত ভদ্রলোক! মনে-মনে দারুন বিরক্ত হলেও সে-কথা মুখে প্রকাশ কর্‌তে ভদ্রতা আমাকে বাধা দেয়। তাই বল্‌লুম, "না-না, রাগ কর্‌বো কেন?"

তবু আমি যে খানিকটা বিরক্ত হয়েছি এ-কথা বোধ হয় জলধর আঁচ করেছিলো। তাই বল্‌লো, "কি করবো ভাই, আমার মন সব সময়েই এমন অশান্তিতে ভরা থাকে যে কাউকে বল্‌তে না পার্‌লে আমি বোধ হয় পাগলই হয়ে যাবো। তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ বন্ধু নেই। এ-সমস্ত কথা এতোদিন কাউকেই বল্‌তে পারি নি। আজ তোমাকে বলে নিজেকে খানিকটা হাল্কা লাগ্‌ছে।—একেবারে কোনো বন্ধু না থাকা যে কত দারুন রিভীষিকা সে কথা যদি তুমি জান্‌তে!"

কিছু একটা বলা উচিত বলে মনে হোলো। তবু ঠিক যে কি বলা যায় তা বুঝ্‌তে না পেরে জান্‌লার বাইরে চেয়েই রইলুম। জলধরও আর কোনো কথা বল্‌লো না। ছোটোছোটো ষ্টেশন পেরিয়ে ট্রেন যখন নদীতে পৌঁছুলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে জলধর বল্‌লো "এখান থেকে আমাদের বাড়ি মিনিট দশেকের পথ। হাঁট্‌তে অসুবিধে হবে কি?"

"পাগল নাকি?" আমি বল্‌লুম।

কুলির মাথায় নিজের ছোটো স্যুটকেস ও বিছানাটা চাপিয়ে জলধর বল্‌লো, "চল তা' হলে। অনেকক্ষণ কিছু খাই নি। ক্ষিদে পেয়ে গেছে।"

যখন জলধরদের বাড়ি পৌঁছুলুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জায়গাটা একেবারেই পাড়াগাঁ। তাই যদিও এখন সন্ধ্যে রাত্রি তবুও মনে হয় যেন অনেক রাত। অন্ধকারে বাড়িটা ভালো করে দেখা গেল না তবু স্বচ্ছ আকাশের তলায় গাঢ় কালো বাড়িটা যে বেশ বড় তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম। বাড়ির চারদিকে অনেকটা জমি। কিছু ফুল গাছ আর অনেকগুলো পুরোনো বড়-বড় গাছ আছে। আম-কাঁটালের গাছ বলেই মনে হোলো।

এতো বড় বাড়ি কিন্তু দোতালার ছোটো একটি ঘর থেকে কেরোসিনের মৃদু এক ফালি আলো ছাড়া আর কোথাও কোনো আলো নেই। দেখলে মনে হয় না এখানে কেউ আছে।

বাড়ির একতলার সাম্‌নেই বারান্দা, বাঁ দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। অন্ধকারে চোখ এক রকম সয়ে গিয়েছিলো। তাই আব্‌ছা-আব্‌ছা বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম।

জলধর কুলিটাকে বিদায় করে একটু লজ্জিতভাবে বল্‌লো, "তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না। এক দৌড়ে ওপরে গিয়ে আলোটা নিয়ে আসি। চাকরটাকেও ডাকি। এমন বেয়াড়া লোক। লিখ্‌লুম আজ আস্‌বো, কোথায় আলো নিয়ে ষ্টেশনে আস্‌বে, তা নয়। সাম্‌নেও একটা আলো জ্বালিয়ে রাখে নি।"

জলধর এক-পাও বাড়ায় নি, এমন সময় এক অদৃশ্য জায়গা থেকে খন্‌খনে কাঁপা-কাঁপা গলায় শোনা গেল, "চাকরের ওপর চট্‌ছিস্ কেন? তোদেরই জন্যে খাবার আন্‌তে তাকে পাঠিয়েছি। একটু দাঁড়া, আলো নিয়ে আসছি।"

প্রথমে আমি একটু চম্‌কেই গিয়েছিলুম। জলধর বুঝ্‌তে পেরেছিলো কিনা জানি না। খুব চাপা গলায় সে বল্‌লো, "ওই আমার দিদিমা।" তারপর গলা চড়িয়ে বল্‌লো, "তুমি কষ্ট কোরো না দিদিমা, আমিই যাচ্ছি আলো আন্‌তে।" কিন্তু জলধর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার আগেই দেখলুম সিঁড়ির একেবারে ওপরে আলো নিয়ে তার দিদিমা রাখছেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোর পেছনের দেয়ালে তাঁর ছায়াটা মস্ত বড় হয়ে কাঁপছে, মাথায় কাপড় টানা, তবে বার কয়েক তাঁর চোখ দুটো যেন চক্‌চক্ করে উঠলো। অত বুড়ো মানুষের ও-রকম উজ্জ্বল চোখ আমার কাছে অস্বাভাবিক বলেই মনে হোলো। তার হয়তো সেটা আমার চোখের ভুল।

ওপরে উঠে জলধর তার দিদিমাকে প্রণাম কর্‌লো। আমিও দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম

কর্‌লুম। কিন্তু আমার কাঁধের ওপর মনে হতে লাগ্‌লো সেই উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি বিঁধছে। বেশ অস্বস্তি লাগ্‌ছিলো সত্যি। কিন্তু এমনি আমার স্বভাবও খানিকটা লাজুক ধরণের। কারুর বাড়ি নতুন এসে বরাবরই দেখেছি অস্বস্তি হয়।

"এই তোর বন্ধু অবিনাশ?" বৃদ্ধা জিগেস্ কর্‌লেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "বেশ বেশ। খুব খুসি হলুম তোমাকে দেখে।—অত রোগা কেন?" আমি কোনো রকম সন্তোষজনক উত্তর দেবার আগেই তিনি জলধরকে বল্‌লেন, "হাঁ, তোরা মুখ-হাত ধুয়ে আয়। নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। আমি চা-জলখাবার আনাচ্ছি।"

জলধর বল্‌লো, "চলো, মুখ হাত ধুয়ে আসি।"

আমরা খানিকটা যেতেই জলধরকে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধা বল্‌লেন, "তোর পাশের ঘরেই অবিনাশের শোবার বন্দোবস্ত করেছি। ঘরটা দেখিয়ে দিস্।"

মুখ হাত ধুয়ে আমার ঘর দেখ্‌তে গেলুম। পুরোনো আমোলের এক মস্ত খাটে আমার জন্যে বিছানা পাতা হয়েছে। বিছানা ও মশারি বেশ পরিষ্কার। খাটের পাশেই ছোটো একটা টেবিল। সেখানে নতুন একটি মোমবাতি ও দেশ্‌লাই আর এক গেলাস জল কাঁসার ছোটো রেকাব ঢাকা। বিছানার পাশেই মস্ত এক জান্‌লা, বাইরে অন্ধকার বলে কিছু দেখা গেল না। ঘর থেকে বেরিয়েই একটি বারান্দা, সেই বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। সেটা জলধরের ঘর।

আমাদের দু'জনকে সাম্‌নে বসিয়ে জলধরের দিদিমা জলখাবার আর চা খাওয়ালেন। বিশেষ কথা তিনি বলেন না। শুধু নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন। জলধরও দেখ্‌লুম বিশেষ কথা বল্‌লো না। তাদের দু'জনের সম্পর্ক যে খুব মধুর নয় তা বাইরে থেকেই মনে হোলো।

খাওয়া শেষ হলে জলধর বল্‌লো, "চলো একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি। গঙ্গার তীরটা খুব খারাপ লাগ্‌বে না। একটু না বেড়ালে ক্ষিদে হবে না।"

তাঁর দিদিমা বল্‌লেন, "যাচ্ছো যাও। কিন্তু বেশি দেরী কোরো না।" তারপর জলধরের মুখের দিকে চেয়ে একটু অদ্ভুত স্বরে বল্‌লেন, "বুড়ো মানুষগুলো না থাক্‌লেই ভালো হোতো নয়?"

আমি একটু অপ্রস্তুত হলুম। জলধর কি তার হাবে-ভাবে কিংবা কথাবার্তায় সে-রকম কিছু প্রকাশ করে থাকে? মরুক্ গে যাক্, সে যা খুসি করুক্, কিন্তু আমাকে সে এই আবহাওয়ার মধ্যে টেনে আন্‌লো কেন? তার এই খিট্‌খিটে মেজাজের বুড়ি দিদিমার কথা আগে ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম তা' হলে নিশ্চয়ই এখানে আস্‌তুম না।

তাদের বাড়ির মধ্যে যতক্ষণ ছিলুম ততক্ষণ সর্বদাই কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি বোধ করেছি। বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। অনেকক্ষণ আমরা নিঃশব্দে চল্‌লুম। তারপর জলধর প্রথম কথা বল্‌লো, "জানি না ভাই দিদিমা কি করে যেন সব কথা জানতে পারে! আস্‌বার সময় বল্‌ছিলুম না এখানে আসি দিদিমা'র টাকার জন্য, দিদিমার জন্য নয়, সে-কথা ঠিক জান্‌তে পেরেছে! কিন্তু কী করে যে জান্‌তে পারে ভগবান জানেন!"

জলধরের ওপর দারুণ বিরক্ত হয়েছিলুম। তাই ঝাঁঝের সঙ্গেই বল্‌লুম, "কি করে আবার জান্‌তে পারবে! তিনি তো আর সবজান্তা নন। তুমি নিশ্চয়ই এমন ভাবে কথা বলো কিংবা এমন হাবভাব দেখাও যাতে তোমার মনের কথা তিনি সহজেই বুঝ্‌তে পারেন।"

জলধর শুধু বল্‌লো, "তাই কি ?" তারপর আরো খানিক পরে বল্‌লো, "হয়তো তাই।" আর কোনো কথা বল্‌লো না। আমিও কোনো কথা বল্‌লুম না। এখানে আসার জন্তে নিজের ওপরেই দারুন রাগ হতে লাগ্‌লো। অন্ধকারে গঙ্গার তীরে বেড়াতে বেড়াতে ঠিক করলুম কাল সকালের প্রথম গাড়িতেই যেমন করে হোক পালাতে হবে। এখানে আর নয়।

রাত্রে ভাত খেতে বসার সময় দেখলুম দিদিমার মেজাজ অনেকটা ভালো। বল্‌তে গেলে বেশ যত্ন করেই খাওয়াতে লাগ্‌লেন। শেষে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভাই খুব খুসি হলুম। জলধরটা দারুন কুনো। ওর যে কেউ বন্ধু থাক্‌তে পারে আমার তো তা বিশ্বাসই হয়নি। এখানে যতদিন ছিলো ততদিন কারুর সঙ্গে মিশ্‌তো না। কলেজে উঠে তোমার সঙ্গে যে আলাপ করেছে তাতে খুব খুশি হয়েছি। মাঝে মাঝে ছুটি ছাটাতে ওর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসো।"

আবার সেই ভদ্রতা করে উত্তর দিলুম, "নিশ্চয়ই আস্‌বো।" কিন্তু মনে মনে বল্‌লুম, "পাগল! আবার এ-মুখো হই!"

ঠিক সেই সময়েই জলধরের দিদিমা বল্‌লেন, "ছিঃ ভাই! মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই। আমি জানি এখানে তুমি আর আস্‌বে না।"

আমার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠ্‌লো। আপত্তি করে কি যেন বল্‌তে গিয়ে কতকগুলো আবোল-তাবোল কথা বলে চুপ করলুম। দেখি জলধর আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমাকে চাইতে দেখেই চোখ নামিয়ে মন দিয়ে তার ভাত খেতে লাগ্‌লো। দেখলাম তার দিদিমার চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে।

খাওয়ার পর আমার ঘরে যখন এলুম তখন প্রায় রাত দশটা। বিছানায় বসে এম্‌নি খানিক গল্প করতে লাগ্‌লুম। কিন্তু কোন গল্প জম্‌লো না। তা' ছাড়া আমার খুব ঘুম পেতে লাগ্‌লো। দু' চারবার হাই তুল্‌তেই জলধর বল্‌লো, "খুব ঘুম পেয়ে গেছে দেখ্‌ছি। ঘুমাও তা' হলে। কাল সকালে আমাদের গ্রামটা দেখিয়ে আন্‌বো। রাত্রে কোনো দরকার হলে আমাকে ডেকো। পাশের ঘরেই আছি।"

জলধর চলে গেল। দরজা বন্ধ করে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত ছিলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়্‌লুম ঘুমিয়ে।

যখন ঘুম ভাঙ্‌লো তখন রাত কটা বুঝ্‌তে পারলুম না। ঘরে-বাইরে চারিদিকেই ঘন অন্ধকার। আমি কোথায় সেটা বুঝ্‌তে দু' চার মিনিট লাগ্‌লো। তারপর একে একে সব কথা মনে এলো। কিন্তু কেন যে ঘুম ভাঙ্‌লো কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না। মনে হোলো যেন কোনো অস্বাভাবিক কারণেই ভেঙেছে।

আমি কখনো ভয় পাই না। তবু সেই রাত্রে এক অপরিচিত ঘরে শুয়ে সত্যি কথা বল্‌তে কি, একটু গা ছম্‌ছম্ করতে লাগ্‌লো। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম একটু ভয় পেলুম। তারপর নিজের দুর্বলতায় নিজের কাছেই লজ্জিত হলুম।

কিন্তু ঘুম আর এলো না। সেই গাঢ় অন্ধকারে চোখ বুজে কিংবা খুলে থাকা সমান। তবু ঘুমের আশায় চোখ বুজে শুয়ে রইলুম।

কতক্ষণ চোখ বুজে জেগেছিলুম জানি না। হঠাৎ মনে হোলো বারান্দায় যেন কার অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। কে যেন একবার আমার ঘরের সাম্‌নে দিয়ে হেঁটে গেল। শোন্‌বার ভুল কিনা বোঝবার জন্তে প্রায় নিঃশেষে বন্ধ করে পড়ে রইলুম, তার পরেই শুন্‌লুম আমার দরজায় খুব মৃদু টোকা পড়্‌ছে আর জলধর খুব চাপা ধরা গলায় ডাক্‌ছে, "অবিনাশ, অবিনাশ···"

[আগামী বারে সমাপ্য

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না"

শ্রীতিলোত্তমা মজুমদার

ঐ যে সাম্‌নে দেখা যায়, সেটা আমাদের ছোট বেলার খেলার মাঠ না ? তারি মাঝে চারটে থাম দেয়া ছোট্ট একট ঘর, তারি পাশে ঐ যে ডুমুর গাছ যার ওপর আমরা কত খেলাই না খেলেছি। ডুমুর গাছের পাশে অনেক দোল্‌না পাশা পাশি টাঙ্গান, ছোট ছোট চৌকান্ মাঠ, লাল সুরকি দিয়ে ভাগ করা রয়েছে। মাঠটার চারপাশে বড় বড় পিচের চওড়া রাস্তা। মাঠের উত্তর দিকে শিখদের গুরু দোয়ারা, দক্ষিণে সারি বেঁধে সাদা সাদা বাড়ী গুলো দাঁড়িয়ে। রুণু একমনে মাঠের দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছে। আজ সেই মাঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ বা দোল্‌না দুল্‌ছে, কেউ ক্রিকেট্ খেলছে, সবাই যেন রুণুদের অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে।

রুণুর মনে পড়ে, প্রথম যখন সে তার ছোট ভাই বাবলুকে নিয়ে ঐ বাড়ীগুলোর আর ঐ মাঠের সাথে পরিচিত হয়েছিল। তখন রুণুর পরণে ছিল লাল রংয়ের ফ্রক্। প্রথম সে সকলের সঙ্গে ভাব করতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না, তাই সে একটা ছোট্ট গলির মাঝে দাঁড়িয়ে বাবলু আর তার নূতন পরিচিত বন্ধুদের খেলা দেখছে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দাদাদের মত, কেউ সমবয়সী, কেউ বা ছোট ইত্যাদি নানারকম। রুণু একা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে যায়, মাঝে মাঝে ডাক দেয়, "বাবলু, ওরা কি আমায় খেলাবে ?" বাবলু সেও নূতন, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পায়। খানিক বাদে ওদের মধ্যে একজন বলে, "বাবলু! ও তোমার কে ? ওকে খেলতে ডাকো।" রুণু মনে সাহস সঞ্চয় করে হাতে ধরে ক্রিকেট ব্যাট্। এমনি করে তাদের ভাব হয়ে যায়।

রুণুদের বাড়ী প্রায় আধ মাইলের রাস্তা। রোজ বিকেলে রুণু, বাবলু আর সব সাঙ্গপাঙ্গ ঘাড়ে ব্যাট ও ষ্টাম্প নিয়ে পথ বেয়ে খেলতে যেত। তখন রুণু বাবলুর স্কুলের বিশেষ বালাই ছিল না, তাই তারা বিকেলের প্রত্যাশায় হাঁ করে বসে থাকতো। তাদের দলের মধ্যে রুণু আর নুটু এই দুজন মেয়ে আর বাকি সব ছেলের দল, কিন্তু সেই ছোট বেলায় দলে ছেলেমেয়ের কোন প্রভেদ ছিল না, তাদের মনে ছিল শুধু সঙ্গী পেলেই হ'ল।

রুণুর কিন্তু একটা ভীষণ দুর্বলতা ছিল, সে কাব্‌লী বা টমি দেখলে ভয়ে আধখানা হয়ে যেত। তাই খেলা শেষে সন্ধ্যে বেলায় কেউ বাড়ী না পৌছালে তার চলতো না। সেইজন্য সদলবলে সকলে রুণু বাবলুকে পৌছাতে যেত। নিকটেই একটা কবর ছিল, সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়ে সে পথ দিয়ে যেতে ভয় পেতো। সেই সময় ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইনের বইটা সিনেমায় হচ্ছিল। দুষ্টুমি করে দলের যারা বড়, তারা রুণু বাবলুকে বাড়ী পৌছাবার পথে সেই কবরটার কাছ দিয়ে যেত আর ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইনের পার্টগুলো মাঝে মাঝে আওড়াতো—'রক্ত চাই, রক্ত।' রুণু বাবলু মুখে দেখাত যে তারা মোটেই ভয় পায়নি কিন্তু—প্রকৃতপক্ষে তাদের রক্ত হিম হয়ে যেত। ক্রিকেট খেলার পর যখন সময় থাকতো তখন তারা 'চোর পুলিশ' 'কানা মাছি', 'কক্-ফাইট্' খেলায় মেতে যেত।·····

রুণুর ভাবা যেন আর শেষ হয় না। সত্যি আজ সবাই বড় হয়েছে, কেউ বা কলেজে, কেউ বা চাকরীর চেষ্টায়, এমন কি তার ছোট ভাই বাবলু পর্য্যন্ত তার চেয়ে লম্বা হয়েছে। সে এখন আর স্কুলে যায় না, কলেজের পড়াও একরকম শেষ করতে চলেছে। রুণুর সঙ্গে নুটু যাচ্ছিল, সে রুণুকে ঠেলা দিয়ে বল্লে, "এই রুণু, দোকান ছাড়িয়ে কোথায় চলেছিস্, বই কিনবি না ?" রুণু চমকে ওঠে, "তাই তো বড় ভুল হয়ে গেল, তবে আজ থাক অন্যদিন হবে।"

রুণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ীর পথ ধরে·····

অষ্টম অধ্যায়

মস্কো

নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে জলজ গাছপালা ; পায়ের তলায় শৈবালদলের পিচ্ছল স্পর্শ কিংবা সঙ্কটময় জলাভূমি ; কোথাও শৈলপৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে রক্তবর্ণ লতা। এ হচ্ছে স্তব্ধতার স্বদেশ। বৃক্ষমালার উপর দিয়ে উড়ে যায় বাজপাখীরা ; কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় না গীতকারী পাখীদের কণ্ঠস্বর। আকাশের নীলিমা অম্লান নয়, ময়লা। দূরে দূরে কুয়াশা ভেদ ক'রে দেখা যায় পৃথিবীর গায়ে আবের মতন মাটির স্তূপ—সেগুলো হচ্ছে চিরমৌন মানুষের সমাধি।

ভ্রমণকারী ইবন বতুতা লিখেছেন : "এ হচ্ছে ছায়াচারের মুল্লুক। এখানে যারা বাস করে, কেউ তাদের দেখা পায় না। এখানে গ্রীষ্মের দিন এবং শীতের রাত্রি হচ্ছে সুদীর্ঘ।"

তৈমুরের সেনাদল মনে করলে, তারা এমন কোন দেশে এসে পড়েছে যেখানে মানুষের বসতি নেই। এ মরুভূমি নয় বটে, কিন্তু মানুষের চিহ্নহীন এ দেশ হচ্ছে মরুর চেয়ে ভয়াবহ। গুপ্তচরেরা দিকে দিকে ছুটে গেল, কিন্তু একজনমাত্র মানুষকে আবিষ্কার করতে পারলে না কোথাও !

তৈমুর তাঁর পুত্র ওমর সেখকে ডেকে বল্‌লেন, "বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। যেমন ক'রে পারো, হৈম সংঘের খবর আনো।"

দিন-কয় পরে খবর এল, সুদূরের বৃক্ষহীন প্রান্তরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সত্তরটি ভস্ম-স্তূপ পাওয়া গেছে। দুই এক দিনের ভিতরে অনেক লোক সেখানে খেল ছাউনি ফেলে আগুন ফেলে রান্নাবান্না ক'রেছিল।

এই সামান্য সূত্রকেই তৈমুর মনে করলেন অসামান্য ! ছোট্ট আর একদল সৈন্য নিয়ে তখনি তিনি ছুটলেন সেই দিকে। পথে পড়ল সুমেরু গামী টোবল নদী। তৈমুর সাঁৎরে নদী পার হয়ে ছেলের সঙ্গে যোগ দিলেন।

তারপর তৈমুরের চরেরা দৈবগতিকে হঠাৎ একদিন প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন দশজন শত্রু সৈন্যকে গ্রেপ্তার ক'রে ফেললে। বন্দীদের মুখ থেকে খবর পাওয়া গেল, তোক্তামিস সসৈন্যে যাত্রা করেছেন পশ্চিম দিকে।

আরো কিছুদিন একই লুকোচুরি খেলা চলল। তৈমুর বুঝলেন, এ বড় সহজ শত্রু নয়। এরা দেখা দেয় না, কিন্তু লুকিয়ে সব লক্ষ্য করে। এরা পিছিয়ে যায়, কিন্তু যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতন ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়তে পারে। দরকার হ'লে এরা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে এক দিনে একশো মাইল পার হয়ে যায়।

তবু তিনি দমলেন না, থামলেন না ! তোক্তামিসকে হাঁপ ছাড়বার ছুটি না দিয়ে ঝড়ের মতন এগিয়ে চললেন। একেবারে উরল নদীর ওপারে।

তোক্তামিস দেখলেন, নাছোড়বান্দা তৈমুরের হাত ছাড়ানো অসম্ভব। জনহীন খাদ্যহীন দিকবিদিকহারা

মরু-প্রান্তর, বেগবতী নদীর পর নদী, তুষারের ঝটিকা, বর্ষার প্রবল ধারা,—তবু তৈমুর আসছেন তাঁর পিছনে পিছনে ! অবশেষে হতাশ হয়ে তোক্তামিস সসৈন্যে ফিরে দাঁড়ালেন।

তৈমুর তো তাহাই চান। এত কষ্টের পর তাঁর আঠারো সপ্তাহ ধ'রে আটারো শত মাইল ব্যাপী পথ-চলার শেষ হ'ল ! আজ এস্পার কি ওস্পার ! হয় জয়, নয় মৃত্যু !

নিজের দলের দিকে ফিরে তৈমুর হুকুম দিলেন, "সৈন্যগণ, ঘোড়া থেকে নেমে পড় ! বাকি যা খাবার আছে, সব খেয়ে শেষ ক'রে ফেল ! তারপর অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর !"

যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। শত্রুরা সংখ্যায় বেশী, কিন্তু তাতাররা তখন মরিয়া। তারা জানে, এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে তাদের একজনকেও আর দেশে ফিরতে হবে না। মৃত্যুপণ ক'রেই তারা লড়তে লাগল। তারা শত্রুর কাছে দয়াও চাইবে না, শত্রুকে দয়াও করবে না।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে তোক্তামিসের দল সংখ্যাধিক্যের জন্যে যখন প্রবল হয়ে উঠছে, তৈমুর তখন নিজের রক্ষীদল নিয়ে পর্ব্বত-প্রাচীরের মতন শত্রুদের উপরে ভেঙে পড়লেন। তার বিষম চাপ সহ্য করতে না পেরে তোক্তামিস নিজের ফৌজ ফেলে সভয়ে পলায়ন করলেন। নায়ককে হারিয়ে শত্রুদের সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে গেল—তাতাদের হাজার হাজার তরবারি করলে রক্তসাগরসৃষ্টি !

সেইদিন হ'ল য়ুরোপবিখ্যাত মহা-পরাক্রান্ত হৈম সংঘের পতন ! যুদ্ধ ক্ষেত্রে একলক্ষ মৃতদেহ ফেলে বাকি মোগলরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে। তাতাররা ছুটল তাদের পিছনে পিছনে।

তারপর আরম্ভ হ'ল লুণ্ঠন। ডন নদীর দুই তীরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে চলল হত্যা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নিষ্ঠুর লীলা। বাঁদী করবার জন্যে যে কত হাজার নারীকেও বন্দী করা হ'ল তার আর সংখ্যা নেই। তাতাররা গরু, মেষ ও উট এবং ক্ষেতের ফসল কিছুই ছাড়লে না। আর এত সোনা-রূপো হীরে-জহরত নিয়ে এল যে প্রত্যেক তাতার সৈনিকের পেটের ভাবনা ঘুচে গেল জীবনের মত !

আট মাস পরে বিজয়ী তৈমুর আবার নিজের রাজধানী সমরখন্দে ফিরে এলেন।

কিন্তু এর পরেও তোক্তামিসের জ্ঞান হ'ল না। তিন বৎসর যেতে না-যেতেই তিনি আবার কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তটে এসে দস্যুতা সুরু করলেন।

তৈমুর জ'লাতন হয়ে লিখে পাঠালেন : "তোক্তামিস, তোমার বুকের ভিতরে কোন্ সয়তান আছে ? তুমি নিজের সীমানার মধ্যে শান্ত হয়ে থাকতে পারো না কেন ? তুমি কি গত যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়েছ ? তুমি আমার শত্রুতাও দেখেছ, বন্ধুত্বও দেখেছ। অতএব ব'লে পাঠাও তুমি আমার শত্রু হবে, না বন্ধু হবে ?"

তবু তোক্তামিসের হুঁস হ'ল না, আবার এলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ হ'ল এবং এবারের যুদ্ধে তৈমুর হেরে যেতে যেতে কোনক্রমে বেঁচে গেলেন। রণক্ষেত্রের এক চিত্রে দেখতে পাই—কোণ্ ঠাসা, রক্তাক্ত তৈমুরের তরবারি ভেঙে গিয়েছে, তাঁর অল্প কয়েকজন সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চারিপাশ দিয়ে তাঁকে আগ্‌লে রেখে লড়াই করছে প্রাণপণে।

অবশেষে সাহায্য এল। তৈমুর আহত সিংহের মতন আবার আক্রমণ করলেন, মোগলরা আবার পালিয়ে গেল। এবং অনেকে তৈমুরের পক্ষে এসেও যোগ দিল। এর পর থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আর তোক্তামিস ও হৈম সংঘের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

তৈমুর এবার সাক্ষাৎ যমের মতন রুসিয়ার দিকে দিকে ছুটে বেড়াতে লাগিলেন,—আগুনের কবলে প'ড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কত সহর, কত গ্রাম এবং আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মর্ম্মভেদী মৃত্যু হাহাকারে !

মস্কো-নগরে ব'সে রুসিয়ার গ্রাণ্ড প্রিন্সরা ভয়ে থর-থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সৈন্যশ্রেণী সাজাতে লাগলেন—তাঁরা জানতেন, জয়ের কোন আশা নেই, তবু তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে !

মস্কোর পথে পথে বেরুলো ভীত নর নারীর মিছিল। খৃষ্ট-জননীর মূর্ত্তি নিয়ে মিছিলের জনতা অগ্রসর হয় এবং পুরুষ ও নারীরা নতজানু হয়ে রাস্তার ধূলোয় ব'সে প'ড়ে জোড়হাতে সক্রন্দনে ব'লে ওঠে—

"ভগবানের মা, রুসিয়াকে রক্ষা কর !"

ক্রমশঃ

চলন্তিকা

জাপান যখন মহাযুদ্ধে যোগ দিল, তখন অনেকেই মনে করে ছিলেন যে আর দু' এক মাসের মধ্যেই কলকাতায় বোমা পড়বে। কিন্তু দু'এক মাসের জায়গায় যখন পুরো এক বছর পেরিয়ে গেল, তখন আবার অনেকে ভেবেছিলেন, যে কলকাতা বুঝি বোমাবর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেল। ইতিপূর্ব্বে কলকাতায় যতবার বিমান-আক্রমণের সতর্কধ্বনি করা হয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই (কেবল একবার ছাড়া) দিনের বেলায় এবং সেগুলির কোনটাই সত্যিকারের বোমাবর্ষণের সূচনা করে নি। কিন্তু ২০শে ডিসেম্বর রাত্রে ১০-১৭ মিনিটে যখন বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হল, তখন অনেকেই বিমানহানার আশঙ্কা করেছিলেন। সেদিন পরিষ্কার চাঁদনী রাত থাকায় বিমান-বোমারুদের খুব সুবিধা হয়েছিল। তারপর আরো চারবার বিমান-আক্রমণ হয়েছে। এ বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য যে এ পর্য্যন্ত পাঁচবারের বিমানহানায় ক্ষতি গুরুতর হয়নি। ২৪শে ডিসেম্বর রাতে যে বিমানহানাটি হয়, সেটি ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত বিমানহানা হয়েছে, বোধহয় তাদের মধ্যে দীর্ঘতম। তিনঘণ্টা ধরে এই আক্রমণ চলে। ইংরাজী নববর্ষের দিনে একটা বিমানহানা অনেকে আশঙ্কা করছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ দিন কোন বিমানহানা হয় নি। যাহাকে, কলিকাতার ও সহরতলীর বাসিন্দাদের একটা অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হ'ল। মনে হয় প্রাথমিক ভয় সকলেরই কেটে গিয়েছে।

কলকাতা ছাড়াও চট্টগ্রামে ও ফেণীতে কয়েকবার বিমানহানা হয়ে গেছে। এর জবাবে আর, এ, এফ এর বিমানগুলিও ব্রহ্মের নানা জাপানী ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে এসেছে ও এখনও করছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনী ব্রহ্মের আরাকান প্রদেশের কয়েকটি জাপানী ঘাঁটি পুনরধিকার করেছে। জাপানীরা কোন বাধা দেয়নি। ওদিকে লালফৌজ ককেশাস অঞ্চল থেকে নাৎসী শত্রুদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় এলাকার মিত্রপক্ষরাই আস্তে আস্তে জয়লাভ করছে। উত্তর আফ্রিকায়ও মিত্রপক্ষ বেশ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এপর্য্যন্ত সেখানে মিত্রপক্ষীয়দের অগ্রগমন থামে নি।

কিছুদিন আগে এড্‌মিরাল দাঁরলা এক ফরাসী অতিতায়ীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছেন। ইতিপূর্ব্বে দাঁরলা জার্ম্মাণপন্থী ছিলেন বলে স্বাধীন ফরাসীরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। ক্রমে সেই ভাব অসন্তোষে পরিণত হয় ও সেই অসন্তোষ অবশেষে এই হত্যার আকার নেয়। হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে। এড্‌মিরাল দাঁরলা ফ্রান্সের পতনের পর মার্শাল পেঁতার মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। পরে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি জল, স্থল ও নৌবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক হন। ১৯৪১ এর আগষ্ট মাসে তাঁকে আরও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৯৪২ এর নভেম্বরে মিত্রপক্ষীয়দের উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণকালে তিনি উত্তর-আফ্রিকায় ছিলেন। সেই সময়ে তিনি জার্ম্মাণ পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগ দেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রে আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সার সিকান্দার হায়াৎ খাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতে একজন অসাম্প্রদায়িক ও পরিশ্রমশীল রাজনীতিজ্ঞের অভাব ঘটল। তিনি প্রথম জীবনে একজন সৈনিক ছিলেন এবং গত মহাযুদ্ধে একটি সৈন্যদল পরিচালনা করবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে ইনিই প্রথম ভারতীয়। সার সিকান্দার কিছুকাল আটক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯-৩০ সালে ইনি প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯২৯ সালের আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন। ১৯৩০-৩৫ সালে ইনি পাঞ্জাবের রাজস্ব-সচিব এবং ১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালে পাঞ্জাবের অস্থায়ী-গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌর বদলে এবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এই বিজ্ঞান কংগ্রেস সারা ভারতের বিজ্ঞানীদের মিলনক্ষেত্র। বর্ত্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির দরুণ অনেকেই এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি, বিশেষ করে যে সকল বৈজ্ঞানিক দূর বিদেশে থাকেন। এবারের অধিবেশনে কোন জাঁকজমক ছিল না বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলাপ আলোচনা বেশ ভাল ভাবেই হয়েছিল। নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুপস্থিতিতে গত বৎসরের সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়া এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আগামী বছরের জন্যও পুনরায় পণ্ডিত নেহেরুকেই সভাপতি করা হয়েছে। তবে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে যদি পণ্ডিত নেহেরুর ব্যাপারে কোন সাড়া না পাওয়া যায়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের সনামধন্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করবেন। আগামী বৎসরের অধিবেশন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

কলিকাতার পূর্ব্ব-ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলায় দিলীপ বসু শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকান খেলোয়াড় হল্ সারফেস এর কাছে একেবারে সোজাসুজি ভাবেই হেরে গেলেন। অথচ এই বিদেশী খেলোয়াড়টিকে দিলীপ সিন্ধু প্রদেশের টেনিস প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। হল্ সারফেস্ সেদিন ফাইনালে খুব চমৎকার খেলেছিলেন।

এবার বোম্বাইতে যে নিখিল-ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন খেলা হয়, তা'তে বাংলার নাম-করা খেলোয়াড়গণ কেহই দুঃখের বিষয় সুনাম কিনতে পারেন নি। কেবলমাত্র ম্যাডগারকার কোয়াটার-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। পাঞ্জাবের খেলোয়াড় প্রকাশনাম, বোম্বাইর বন্দনেকার, পুনার মহিলা খেলোয়াড় দুই বোন মিস্ তারা ও সুন্দর দেওধর এঁরা কয়েকজন বিশেষ সাফল্যলাভ করেছেন। নীচে ফলাফল দেওয়া হ'ল :—

প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ১৫-৯, ১৫-৩ পয়েণ্টে বন্দনেকারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন। মিস তারা দেওধর (পুণা) ১০-১২, ১২-১০, ১১-৯ পয়েণ্টে মিস্ সুন্দর দেওধরকে (পুণা) পরাজিত করেন। ডবলস্‌এ দুই ভাই প্রকাশনাথ ও অশোকনাথ এবং মিস্ সুন্দর ও তারা দেওধর জয়লাভ করেন।

—পি, এস্

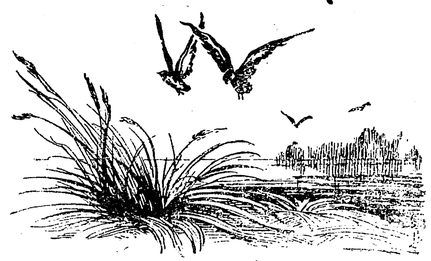

রংমশালধারী ভাইবোনেরা।

তোমাদের যে সব চিঠি পেয়েছি তাতে তোমাদের কিশোর মনের উদ্বেগের ছায়া দেখেছি, শুনেছি তোমাদের কিশোর মনের জিজ্ঞাসা, কি আমাদের কর্ত্তব্য এ দুর্দ্দিনে ? কোলকাতায় উপর্য্যুপরি ৫ দিন বোমা পড়েছে, তুমি কেমন আছ ?···অন্য কোথাও সরে যাও···আমাদের এখানে চলে এসো···।

তোমাদের কাতর আহ্বান দিদিভাই এর নিরাপত্তার জন্য। আনন্দ পেলাম তোমাদের কথা ভেবে। আমি জানি তোমাদের ঘরে আছে আমার ঘর, যে সব ঘরে আছে আমার সোনার ভাইবোনেরা। যদি দরকার হয়, তোমাদের কাছে যাবো বৈকি কিন্তু শুধু কি পালিয়ে বেঁচে থাকা যায় ? আর এমনি করে বেঁচে থাকাই কি আমাদের কাম্য ? আমরা যে জীবন যাপন করি, সে জীবন জীবন নয়। তাই প্রার্থনা করি, মৃত্যু যদি আসে তা যেন নব জীবনের সূচনা করে। আমাদের চারধারে রয়েছে কর্ত্তব্যের আহ্বান। সে ডাকে সাড়া দাও, মানুষকে সেবা দাও, সাহায্য দাও, নিজেকে দেশসেবার যোগ্য করে তোলো। কলকাতা ছেড়ে যারা গ্রামে ফিরে গেছ অথবা কোনও বিদেশে গেছ, তাদের কাজ হচ্ছে মানুষের মনে সাধারণের মনে বাঁচবার ও জ্ঞান অর্জ্জন করার বাসনাকে জাগিয়ে দেওয়া। শুধু দুটো খাওয়া, একটা নিদ্দিষ্ট ঘরে থাকা, বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করা এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধন করাই জীবন নয়। এই পরিচিত অভ্যস্থ জীবনের পিছনে পড়ে আছে তোমার দেশ, তোমার জাতি, তোমার আমার অন্য সবার ভাইবোনেরা। তাদের দুঃখ কষ্ট, অভাব বেদনা, আনন্দ যখন তোমাদের সকলের মনের তারে একই সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে—সেদিন দেশ ও জাতি জাগ্রত হবে। সে মহাদিনের তপস্যার ফল রয়েছে তোমাদের হাতে। সেদিন তোমাদের অন্তরের ব্যাকুল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সমাপ্তি হবে। তাই বলি তোমাদের বেঁচে থাকা দরকার জাতি ও দেশের ভবিষ্যত নায়ক হিসাবে। কিন্তু বাঁচবে কেমন করে ? যেখানেই থাক ক্ষুদ্র সুখ আনন্দ ছেড়ে, সমষ্টির সুখ, আনন্দের দিকে তাকাও, সঙ্ঘবদ্ধ হও। প্রাত্যহিক জীবনে যেটুকু করা দরকার, যেটুকু খাওয়া পরা দরকার সেটুকুই করো। অভিভাবকদের দায়িত্ব ও চিন্তার কতক অংশের অধিকারী হয়ে তোমরা জানিয়ে দাও, তোমাদের মন আছে, দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতা আছে, সংসারে তোমাদের মস্ত স্থান আছে। যেখানেই যাও, তোমাদের অধীত শিক্ষা, লব্ধজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সমষ্টির মাঝে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করো, মহা আলোক শিখা জেলে সে আলোর স্পর্শ দাও তাদের যারা রয়েছে অন্ধকারে। নিজেদের জীবন থেকে অপ্রয়োজনীয়ের কুআচার ও কুপ্রথার মুখোস খসিয়ে দাও। নিজেকে বন্দী করে রেখোনা একটা ঘরে বা একটি পরিবারে, নিজেকে ছড়িয়ে দাও বহুর মাঝে, মানুষকে দাও মানুষের সম্মান। এই হোক তোমাদের কর্ত্তব্য জাতির দুর্দ্দিনে।

জগন্নাথ দাস (গ্রাঃ ১৮০৪) পাটনা—তোমার কবিতা পৌঁছে দিয়েছি। ভয় নেই—আমরা ভাল আছি।

প্রবোধ বসু (১৭৭৪) কাঁথি—তোমার চিঠিখানা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পড়বার মত, যাহোক আমি পড়েছি এবং বুঝেছি সব। প্যারডি লেখায় তোমার হাত ভাল দেখছি। যাঁদের বিচার করবার কথা, প্রকাশ করা না করা তাঁদেরই হাতে—তবে ভাল লেগা হলেই ছাপা হয়। যাঁর কথা লিখেছ তাঁকে পণ্ডিত মূর্খ উপাধি দিও। অনেক সময় শিক্ষিত লোকরাই আমাদের ও দেশের ক্ষতি সব চেয়ে বেশী করে। গল্প লেখার যে ধারা বেছে নিয়েছ তার দাম সব চেয়ে বেশী, এগুলোকে ইংরাজীতে বলে Topical, বাংলায় সাময়িকী বলবো কি ?

অমিয় মোহন বসু (ঢাকা)—এত সহজেই কি নিরুৎসাহ হলে চলে ? তোমার পাঠান ষ্ট্যাম্প পেয়েছি সুবিধা মত পাঠাবো। যদি না থাকে তাহলে গ্রাহক হয়ে কি হবে ? এর উত্তর নেই। নিজের বিবেচনায় কাজ করো। গ্রাহক ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয় না। নাম আমার 'দিদিভাই', অনেকবার বলেছি। কবিতাটা কোথায় পড়েছ সঠিক জানিও।

সুহাসদাস, বিমল ও পরিমল রায় (মণির বাজার)—গ্রাঃ নম্বরের জন্য আর কতবার বলবো ? হ্যাঁ, ভাল হলে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। পরিমল ! তোমার কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি।

চিন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১৪১০) পাটনা—তোমার চিঠি পেলাম। প্রশ্ন যেখানে উঠেছে সেখানেই নিষ্পত্তি হলে ভালো হতো। বাংলা ভাষার মধ্যে যে সব বিদেশী ভাষা আছে তা ব্যবহার হতে হতে বাংলা ভাষা হয়ে গেছে, কাজেই বিদেশী হলেও তাকে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু বাংলা চিঠি লেখার মধ্যে অনাবশ্যক ইংরাজী শব্দ এসে যদি হানা দেয় তাহলে বিরক্তিকর মনে হয় না কি ? উৎকৃষ্ট চালএ কাঁকরের মত কচকচ করে লাগে। নিজেকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা যদি বাংলায় থাকে তা'হলে কেন মিছে ইংরাজী বা বিদেশী ভাষার সাহায্য নেবে ? অবশ্য বেড়া দিয়ে কাউকে ঘিরে রাখলেই তাকে রক্ষা করা যায় না, কাজেই বেড়া দেবার কথাই আসে না। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার রূপ কি চিরকাল এই ছিল ? কালোপযোগী হবার জন্য ভাষার রূপান্তর ঘটে। প্রাকৃত বাংলা নানা সময়, শাসন ও সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে এসে বর্ত্তমান বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে। আসতে আসতে নানা শাসন ও সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে নানা শব্দ কুড়িয়ে নিজেকে সমৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুড়োনোটাই সমৃদ্ধি নয়। তাছাড়া বর্ত্তমান বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা। জাতীয় জীবনের উন্মেষের সঙ্গে সবার চোখ পড়েছে, বিদেশী আওতা বাঁচিয়ে কেমন করে স্বাধীনভাবে চলা যায়। জীবনের লক্ষণ দেখা গেছে। সুতরাং এখন যদি বিদেশী ভাষার সাহায্য না নেওয়ার মনোবৃত্তি আসে তাহলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। স্বাবলম্বীর লক্ষণ। এটা তোমার মতে "বৃদ্ধা শুচিবাই গ্রস্তার মত সকল ভাষার পরশ থেকে সন্তর্পনে বাঁচিয়ে বিশুদ্ধ রেখে দিই, তবে সে যে বৃদ্ধার মতই মর মর হয়ে থাকে"—এ কথা আমার মনে হয় ঠিক নয়, যুক্তি হিসাবে তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় হাজার হাজার চিঠি লিখেছেন কিন্তু ইংরাজী ভাষায় পত্র কণ্টকিত করেন নি। তাহলে কি বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী জানতেন না বা বাংলা ভাষাকে তিনি বৃদ্ধার মত মর মর রাখতে চেয়েছিলেন ? তুমি কি বলো ? সম্ভব হলে এ বিষয় আবার একদিন আলোচনা করবো। হ্যাঁ, তোমার গোয়েন্দাগিরির জন্য কি পুরস্কার দেবো ? কিন্তু জানতো গোয়েন্দারা অনেক সময় 'তিনকড়ি'কে ধরতে গিয়ে সহরের 'এককড়ি' নামের তিন ভদ্রলোককে ধরে এনে 'তিনকড়ি' ধরেছে বলে প্রমাণ করেছিল। তোমার প্রমাণটা অনেকটা সেই রকম নয় তো ?

মিনতি চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) ১৬৩৩। বিতর্ক আলোচনাটা আর একটু বড় করে পৃথক্ ভাবে লিখে পাঠিয়ো।

অসীম দেব গোস্বামী (কলিকাতা) ১৬৩৩। পোষ্টকার্ডের অপর দিকটায় রংমশালের প্রতীক চিহ্ন এঁকে যা লিখেছ তা তোমাদের সকলের মনের কথা। এটা আমার ভালো লাগলো। আগামী বছরের কথা আগামী বছর জানে। 'এও কি ভগবানের চাবুক' যে তোমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে তা তোমাদের চিঠি থেকে জানতে পেরেছি। দেশের জন্য দুঃখ বোধ তোমাদের মধ্যে জাগ্রত হোক।

সুনীলকুমার মণ্ডল (টালিগঞ্জ) ১৮৬৯। তোমার প্রকাণ্ড চিঠিখানা পড়লাম। আমাদের রীতি নীতি তো তোমাদেরই। 'অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত নীতি নিয়ম এখানে কিছু নেই। এই অস্বাভাবিকতা থেকে ছেলেমেয়েদের মুক্ত করতে চাই। গ্রাহকরাই রংমশালদলে এবং চিঠির বাক্সে যোগ দিতে পারে, লেখনী বন্ধু ইত্যাদির

অধিকারী হয়। ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। তুমি বরং একবার অফিসে এসে খোঁজ নিয়ে যেও। রবীন্দ্রনাথের অনেক বই আছে—গল্পসল্প, খাপছাড়া, শিশু, নৈবেদ্য, শিশু ভোলানাথ, মুকুট—বিশ্বভারতীতে ২নং (কলেজ স্কোয়ার) গিয়ে দেখে নিয়ে কিনতে পারো।

পরিমল কান্তি রায় ১৮-৬৬ (মন্দির বাজার) তোমার পুরাতন চিঠি পেলাম। কই ডাকটিকিট তো পাঠাওনি ?

দিলীপকুমার কানুনগো (চট্টগ্রাম) ১৮৭৩। রংমশালের মূল্যবৃদ্ধি করে অথবা ছোট অক্ষরে রংমশাল ছাপিয়ে কিম্বা সাহায্য গ্রহণ করে রংমশাল বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব (যা তোমাদের দু'টি ভাই গতমাসে করেছিল) সে বিষয় তোমার মতামত জানিয়েছ। রংমশালের আলো যেন না নেভে এই তোমাদের প্রার্থনা। এই প্রার্থনার সঙ্গে আমাদেরও আন্তরিক যোগ আছে। কাগজের অভাবের জন্য ঐ বিভাগগুলো—ঠিকমত যায় না। অন্য পত্রিকার অনুকরণ রংমশাল করবে না।

সুরথকুমার, পিণ্টুরাণী, মিণ্টুরাণী বসু (রংপুর) ১১১৮। রংমশাল বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানগ্রহণ করা ও রংমশালের বার্ষিক মূল্য ৪৲ করার প্রস্তাব করেছ। চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো তারপর দেখা যাক কি হয়।

শ্রীরা ঘোষ। (ধুবড়ী) ১৮৩৮। তোমাদের স্কুল থেকে মেদিনীপুরে সাহায্যের জন্য ২০৲ পাঠান হয়েছে জেনে খুসী হলাম। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে ধন্য করো। দেশ তোমাদের মত ছেলেমেয়ের সেবা চায় যে।

বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায় (মালদহ) ১২৮৭। যেদিন প্রথম বোমা পড়েছে সেই দিনই দুপুরে তুমি কলকাতা ছেড়েছ, বোমার আওয়াজ শোনোনি বলে দুঃখ করেছ। কী বলবো কী রকম! তবে শুনেছি এগুলো নাকি নিতান্তই শিশু—যুবক ও বৃদ্ধদের দেখবার আশায় বসে আছি।

লালমোহন ভট্টাচার্য্য (কালীঘা) ১৫৮৬। 'নিশ্চয়ই পালিয়েছেন না হয় উদ্যোগ করছেন'—কোনটাই সত্যি নয়। বরং যেখানে থাকি সে বাড়ীর সামনে, পেছনে বোমা পড়েছে—মাথাটা বেঁচে গেছে। ভয় কি ? বোমা ব্ল্যাক আউটের মত গা সহা হয়ে যাবে। ম্যালেরিয়া আর সাপের কামড়েও তো মানুষ মারা যায়! পড়ার নেশা যত ধরে ততই ভাল।

জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ঢাকা) গ্রাহক না হলে চিঠির উত্তর তো দেওয়া হয় না ভাই। সুন্দর আন্তরিকতা ভরা চিঠি। নিজে বড় হও, সুন্দর হও, সুস্থ হও। প্রার্থনা করি তোমরা সব নিরাপদে, সুস্থ শরীরে থাকো।

ইতি তোমাদের—

দিদিভাই

নূতনা ধাঁধা

(শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে)

এক গোষ্ঠ তৃপথ গামী—
সাত সমুদ্র পিয়ে পানী।
নবম বৃক্ষতলায় শোয়
দ্বাদশজন রাখালে দোয়॥

এক গোষ্ঠ মানে—১ পাল গরু। বলত-ঐ-পালে কতগুলি গরু ছিল ?

❖ পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর ❖

নদী = ১৩, সমুদ্র = ৭, চন্দ্র = ১, বসু = ৮, বাণ = ৫, বেদ = ৪, নেত্র = ৩
(১৩ − ৭ + ১) × ৩ = (৮ = ৫ + ৪) × ৩ = ২১

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে :

গৌর গোপাল মিশ্র, আমাদপুর ; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী ; শিবু, মীরা, তরুণ ও তপন, ইত্যাদি, ভাগলপুর ; শান্তিময়, রামানন্দ ও কুমারী রানু মুখোপাধ্যায়, ফয়জাবাদ ; যুথিকা দেবী, কলিকাতা ; রূপবাণী রায়, কলিকাতা ; বিমল রায় ও সুহাসকুমার দাস, প্রভৃতি, ২৪ পরগণা ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর ; প্রনবানন্দ মান্না, অম্বর নাথ ; অনিতা গঙ্গোপাধ্যায়, বীরভূম ; আশীষ দত্ত, শ্রীহট্ট ; অসিমদেব গোস্বামী, কলিকাতা ; অরুণা দাস গুপ্ত, বরিশাল ; শ্রীনাথ রায়, শ্রীনগর ; সাধনচন্দ্র বসু, কলিকাতা ; মায়ারাণী মিত্র, বর্দ্ধমান ; জগন্নাথ দাস, পাটনা ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, নদীয়া ; নেপাল মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া ; চিত্ত, রণজিৎ ও নিত্য, ভোলা ; লালমোহন ও অমূল্য ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ; বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায়, নিমাসরাই ; স্বপনকুমার গুহ, ঢাকা ; রজতকুমার দাস, জামসেদপুর ; আত্রেয়ী ও দীপক রায় চৌধুরী, কলিকাতা ; সুভাষরঞ্জন বসু, ঢাকা ; সাধনা ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ ; কল্পনা বসু, ডায়মণ্ডহারবার ; গোপাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সেওড়াফুলী ; বিকাশ সবিতা প্রভৃতি, কলিকাতা।

কথাসাহিত্য সম্রাট

পৃথিবীর মেঘলোক
নিখিল-ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)
দুই টাকা

দক্ষিণারঞ্জনের

পৃথিবীর সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)
দেড় টাকা

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

—উষারাগের মত উজ্জ্বল নূতন রাজসংস্করণ ১৸০—

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌টাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

রংমশাল:

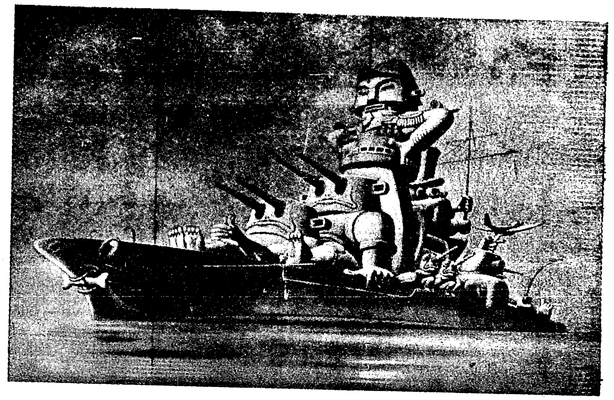

কিম্ভূত মানোয়ারী জাহাজ
বর্ত্তমান যুদ্ধ সজ্জার ব্যঙ্গরূপ
শিল্পী—বরিস্ আরৎসিভ্যাসফ্

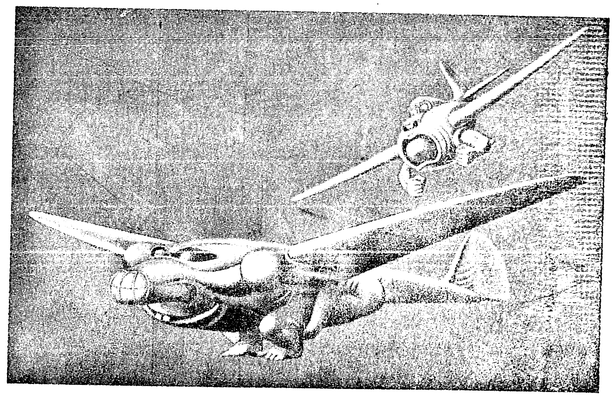

গরুড় পক্ষী যুদ্ধ-বিমাণের ব্যঙ্গরূপ
শিল্পী—বরিস্ আরৎসিভ্যাসফ্

"সম্প্রতি"র সৌজন্যে

সবুজ পাতা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

মেল ! মেল !
পাখা মেল !
শীতের ঢাকন্ খুলে ফেল !
কুয়াসাতে সূঁচ বিঁধিয়ে নতুন রোদ আজ মুখে মাখ !
শুনেছ গান দখিন্ হাওয়ার ? আর ঘুমনো চলছে না'ক !

হিম নিশুতির নিদপুরীতে
যে ছিল ঘুম নিঝুম গীতে,
শিশিরের ওই শিশি ভেঙে সে গানেরা পালিয়ে গেল !
চোক মুছে আজ ওঠে পড়, আলোর আগুন বুকে এল !

রোদের সোনার খড়্গ নিয়ে,
স্বর্গপথের আবছা দিয়ে—
সবুজ হাসির উছল ডালায় তপ্ত উজল আসন পাত !
মুকুল কুঁড়ির গন্ধমালায়, দখিন্ হাওয়ার নাচে মাত' !

BLEED THROUGH.

মৌ-বীরেদের রথের চাকায়
সুর আকাশে ধরছে না আর !
জেগে পড়ার এগিয়ে পড়ার যুদ্ধের কি, বাজনা বাজে-?
ফুলের দেশ-ও উঠল জেগে জ্যো'স্না ঢালা পথের মাঝে !

কুহক বনের দুর্গ থেকে
সব সাথীরে চলছে ডেকে,
হাঁক দিয়েছে সেনাপতি কুহু স্বরের তরোয়ালে !
অজানা পথ যাচ্ছে খুলে জল পাহাড়ের অন্তরালে !

রাঙিয়ে দিয়ে চোকের আশা
কাঁপিয়ে দিয়ে মনের ভাষা
হরিণদলের পায়ের ধূলোর চলে যাওয়ার চকমকিতে
চমকে' দিয়ে ডাকছে বাতাস আবির খেলার রাজ্যটিতে !

মাঠের মাটী উঠছে দুলে'
পাতায় লতায় ধূলোয় ফুলে,
ঝড়ো হাওয়া দিয়েছে দোল্, বেজেছে ঢাক আকাশ চীরে !
উঠতে হবে, যেতে হবে, নতুন দিনের নদীর তীরে !

শুক্‌ন বালু দলে' পায়ে,
আস্‌ছে-ঊষার বিজয়···নায়ে
তরুণ দলে কে যাবে আজ উড়িয়ে আলোর নিশানটিকে ?
সেই কথাটি রাখতে এলেম চিরসবুজ মন্ত্রে লিখে !

জলধরের উইল

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"অবিনাশ, অবিনাশ·····'

বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি টেবিল হাতড়ে দেশলাইটা নিয়ে কাঠি জ্বালিয়ে দরজাটা খুল্‌লুম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখ্‌লুম বাইরে অবিনাশ দাঁড়িয়ে, ভয়ে আর উত্তেজনায় তার মুখ খড়ির মত সাদা। আমার হাতের জলন্ত কাঠিটাকে পরের মুহূর্তে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সে একরকম ঠেলেই ঘরে এলো তারপর দরজায় খিল লাগিয়ে বল্‌লো, "আলো জ্বালাও।"

মোমবাতি জ্বালিয়ে দেখ্‌লুম জলধর কোনো কারণে খুব ভয় পেয়ে গেছে। টেবিল থেকে জলের গেলাস তুলে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে সে বল্‌লো, "আমার ভাই একটুও ভাল লাগ্‌ছে না। এ-বাড়িতে আর আসবো না। আজ রাত্রে এর আগে দুবার ঘুম ভেঙে গেছে। দুবারেই মনে হয়েছে মাথার শিয়রে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এক দৃষ্টিতে তার ঠাণ্ডা চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে চোখ কোনো জীবন্ত লোকের নয়। সে মরা মানুষের। তৃতীয়বার ঘুম ভাঙ্‌তেই আমি আর সামলাতে না পেরে তোমার কাছে এলুম। অন্ধকারে যতক্ষণ এসেছি আর তোমার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকেছি ততক্ষণ মনে হয়েছে আমার পেছু পেছু কে যেন এসেছে, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আমার কাণের কাছে মুখ এনে খুব ফিস্‌ফিস্ করে সে বল্‌লো, "আমি চিনতে পেরেছি। আমার দিদিমা !"

সেই রাত্রে বুঝলুম যে ভয় জিনিষটা সাংঘাতিক সংক্রামক। আমারও বেশ ভয় ভয় করতে লাগ্‌লো। বললুম, "তোমার আর ওঘরে গিয়ে কাজ নেই। এসো আমার বিছানায় শুয়ে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্।" আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে আমরা দুজনে ঢুক্‌লুম।

জলধর বল্‌লো, "তুমি শুয়ে পড়বার পর আমিও পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম কিছুতেই না আসায় ভাবলুম ছাতে গিয়ে একটু পায়চারি করি। বেরিয়ে দেখি দিদিমার ঘরের বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়া আলো আসছে। ভাবলুম এত রাত্রে বুড়ি কি করছে দেখা যাক্। আমার কেমন যেন কৌতূহল হোলো। আমি চুপি চুপি জানলার একটা ফাঁকে চোখ লাগিয়ে চেয়ে রইলুম। দেখি আমার দিকে পিছন ফিরে দিদিমা বসে, তার সামনের মেঝেতে এক রাশ মোহর আর কতকগুলো জ্বলজ্বলে পাথর। বুড়ি বোধ হয় গুন্‌ছিলো। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে জানলায় চোখ দিয়ে দাঁড়ালুম সেই মুহূর্ত্তে তার গোণা বন্ধ হোলো। তারপর ঠিক সেইভাবে বসেই সে দুলে দুলে হাস্‌তে লাগলো ; কখনো জোরে, কখনো নিঃশব্দে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম সে জানতে পেরেছে আমি এসেছি। মনে হোলো দেখে ফেলে ভালো করিনি, আমার ভাল হবে না। আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে ছিট্‌কিনি বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম। আর আশ্চর্য্য, যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়লুম ঘুমিয়ে। তার পরের কথা তো তোমাকে বলেইছি।" জলধর আবার জল খেলো। তারপর নিজের মনেই বললো, "কাল আমিও তোমার সঙ্গে এ বাড়ি ছেড়ে পালাবো। আর এ-মুখো নয়। এখন বুঝতে পারছি বাবা কেন মারা গিয়েছিলেন।"

ভোর হতে না হতেই জলধর বিছানা ছেড়ে উঠে বল্‌লো, "চলো, দিদিমা জানবার আগে পালাই।" দেখলুম তার গত রাত্রির ভয় একটুও কমে নি। কিন্তু দিনের আলোর অদ্ভুত একটা যাদু আছে। রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটাই আমার

কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হোলো। তবু এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হলো না। জলধরের সঙ্গে চুপিচুপি ভোর বেলাতেই বাড়ি ছেড়ে এলুম, যদিও মনে হতে লাগলো তার দিদিমার সঙ্গে দেখা না করে আসাটা অত্যন্তই অভদ্রতা হচ্ছে।

শেয়ালদায় পৌঁছেই সোজা মামার বাড়ি এলুম। জলধর যে কোথায় উঠ্‌লো জান্‌লুম না। মামাতো বোনের বিয়ে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করা গেল, তারপর গ্রীষ্মের ছুটির বাকী দিনগুলো সবাই মিলে পুরিতে গিয়ে রইলুম।

কলেজ আবার খোল্‌বার পর জলধরের সঙ্গে দেখা হোলো। মনে হোলো সে অনেকটা শুকিয়ে গেছে। এবারে গোড়া থেকেই সাবধান ছিলুম। তাকে বিশেষ প্রশ্রয় দিই নি। তাকে দেখ্‌লেই আমার রাগ হোতো। মনে মনে ভয় পেতুম হয়তো কোনোদিন তাকে সোজাসুজি কোনো রূঢ় কথা বলে বসি।

জলধর এর পরেও কিছুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। তার দিদিমার সম্পত্তি আর বিলেতে ডাক্তারি পড়্‌তে যাবার কথা বলেছে। কিন্তু স্পষ্টই আমি অন্যমনস্কতার ভান কর্‌তুম। আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার নেমতন্ন কর্‌লে আমি নানা আছিলায় প্রত্যাখ্যান কর্‌তুম. আমার সঙ্গে গল্প কর্‌তে এলে গম্ভীর হয়ে থাক্‌তুম। কিছুতেই তাকে সহ্য কর্‌তে পার্‌তুম না। শেষের দিকে দেখতুম সে আর বড় একটা কাছে আস্‌তো না। দূরের বেঞ্চে বসে মাঝে মাঝে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌তো। এখন সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়্‌লে তার জন্য সত্যিই খুব কষ্ট হয়। তখন কিন্তু, আশ্চর্য্যর বিষয়, আমার রীতিমতো রাগ হোতো।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বি-এ ক্লাসে ভর্‌তি হয়ে জলধরের কোন খোঁজ পেলুম না। কয়েক-বার তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কেউই তার বন্ধু ছিলো না। ফলে কেউই খবর দিতে পারে নি। একবার কার কাছে যেন শুনেছিলুম জলধর মেডিক্যাল কলেজে ভর্‌তি হয়েছে আর সেখানে প্রথম পরীক্ষায় প্রথম হয়ে একটা স্কলারশিপ্ পেয়েছে।

এর পর আরো অনেকদিন কেটে গেল। আমি এম্-এ পাশ করে চাকরির চেষ্টায় নানা দিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌লুম। আমার কলেজের অনেক বন্ধুকেই ভুলে গেলুম কিন্তু যাকে কোনোদিন বন্ধু বলে গ্রহণ করিনি সেই জলধরের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়তো। ইতিমধ্যে মাঝারি একটা চাকরি পেয়ে লাহোর চলে গেলুম এবং বছর দুই পরে নানা কারণে সেই চাকরিতে জবাব দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলুম।

তখন শীতকাল। নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টায় আবার ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও বিশেষ সুবিধে দেখ্‌ছি না। কয়েক হাজার টাকা পেলে কল্‌কাতাতেই একটা ভালো বই-এর দোকান কর্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু টাকা দেবে কে! ভাব্‌ছিলুম আবার কলকাতার বাইরে কোনো এক দূর দেশে চাকরি নিয়ে চলে যাবো কিনা। এমন সময় সেদিন দুপুরে কলেজ ষ্ট্রীট আর হ্যারিসেন রোডের চৌমাথায় আমার সঙ্গে জলধরের দেখা হয়ে গেল। প্রায় বছর ছয় সাত পরে তার সঙ্গে দেখা। তবু তাকে চিন্‌তে একটুও অসুবিধে হোলো না, তার চেহারা একটুও বদ্‌লায় নি; সেই লম্বা জুল্‌পি, মুখময় এখানে সেখানে দাড়ি, সেই ফ্যাকাশে কালো রঙ্। জলধর একটুও বাড়ে নি। বরঞ্চ যেন শুকিয়ে গেছে।

বোধ হয় সে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলো। আমার ডাক শুনে চম্‌কে চাইলো, তারপর অত্যন্ত খুসি হয়ে বল্‌লো, "আরে অবিনাশ যে! কী খবর? কতদিন ধরে যে তোমাকে খুঁজ্‌ছি!"

কি জানি কেন জলধরকে দেখে সেদিন খুব খুসি হয়ে গেলুম! দেখ্‌লুম তার শারীরিক কোন পরিবর্তন

হলেও মানসিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 'এই ক' বছরে তার হাবে ভাবে কথায়-বার্ত্তায় নতুন একটা ধার এসেছে। সে যেন অনেকটা চালাক হয়ে গেছে, তার জড়তা গেছে কেটে।

বল্‌লো, "চলো। কিছু খাওয়া যাক্। তোমার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে।" হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিলো না। বল্‌লুম, "চলো।"

ওয়াই, এম্, সি, এতে ঢুকে আমরা অম্‌লেট আর চা নিলুম।

জলধর বল্‌লো, "কবে এলে লাহোর থেকে?"

বল্‌লুম, "এই তো ক'য়েক মাস হোলো। আবার হয়তো কলকাতা ছাড়্‌তে হবে। যা বাজার, এখানে চাকরি পাওয়া আমার কপালে নেই।"

"শুন্‌লুম তুমি নাকি বই-এর দোকান কর্‌বে ভাব্‌ছো?" জলধর হঠাৎ প্রশ্ন কর্‌লো, "তার কী হোলো?"

কী আশ্চর্য! সে কথা কৈ কাউকেই তো বলি নি! জিগ্‌গেস কর্‌লুম, "সে কথা জান্‌লে কী করে?"

"কে যেন বল্‌ছিলো", মুখ নীচু করে পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে জলধর বল্‌লো, "তা কতদূর হোলো সেই ব্যবসার?"

হেসে বল্‌লুম, "অনেক দূর! এতোদূর যে নাগাল পাওয়াই শক্ত!—ব্যবসার টাকা কে দেবে ভাই?"

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জলধর চায়ের পেয়ালা শেষ কর্‌লো। তারপর হঠাৎ বল্‌লো, "ভালো কথা, একটা ভালো খবর দিই। আমার দিদিমা মারা গেছে, জানো? বুড়ির সত্যিই অনেক মোহর আর হীরে-মুক্তো ছিলো। সেগুলো পাওয়া গেছে। এদিকে আমিও এম্-বি পাশ করেছি। সেই টাকা দিয়ে এবার বিলেতে যাবো ডাক্তারি পড়্‌তে।"

আশ্চর্য হয়ে বল্‌লুম, "সত্যি নাকি?"

হেসে জলধর বল্‌লো, "হাঁ ভাই, সত্যি। সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। প্যাসেজ্ বুক করেছি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার খুব ইচ্ছে ছিলো। তুমি ছাড়া তো আমার অন্য কেউ বন্ধু নেই। তুমি আমাকে ভুল্‌তে পারো কিন্তু আমি কখনো তোমাকে ভুলে যাই নি।"

মনে মনে জলধরের কাছে এই প্রথম লজ্জিত বোধ কর্‌লুম। বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "না না তোমাকে ভুল্‌বো কেন? এখানে তো ছিলুম না তাই তোমার কোনো খবর নিতে পারি নি।"

"যাই হোক," জলধর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লো, "তোমাকে আমার খুব দরকার ছিলো বল্‌ছিলুম না? সেই কথাই বল্‌ছি। আমার কোনো আত্মীয় নেই, তুমি ছাড়া আমার কোনো বন্ধুও নেই। তাই একটা উইল করেছি যদি আমার কিছু হয় তা হলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি পাবে। আমার অনুরোধ তুমি আপত্তি কোরো না ভাই। তবে একমাত্র সর্ত আছে, কোনো গরিব ছেলেকে পড়াবার খরচ ঐ টাকা থেকে তুমি দেবে। আমি তো নিজে দেখেছি গরিব ছাত্রদের কত কষ্ট!—বল তুমি অমত করবে না?"

জলধরের মাথা খারাপ হোলো নাকি? বলে কি? অন্য কেউ একথা বল্‌লে আমি নিঃসন্দেহে ভাব্‌তুম আমাকে সে বোকা বানাতে চাইছে। কিন্তু জলধরের দিকে চেয়ে আর তার স্বর শুনে অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু বাস্তব জীবনে এ রকম ভোজবাজি যে হয় তা কে জান্‌তো।

জলধর আবার বল্‌লো, "উইলটা আমার পকেটেই আছে, ভালো করে রেখো।" এই বলে সত্যি-সত্যিই উইলটা বার করে দিলো। পরীক্ষা করে দেখ্‌লুম তার ভেতর কোনো ফাঁকি নেই। জলধরের সম্পত্তির পরিমাণ

কুড়ি হাজার টাকা, কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কে সে টাকা আছে। তার অবর্তমানে এই সমস্ত টাকার মালিক আমি নিজে। অবশ্য সেই দরিদ্র ছাত্রের উল্লেখও আছে।

উইলটা নিয়ে বললুম, "আশা করি এটা কোনদিন ব্যবহার করতে হবে না। বিলেত থেকে সসম্মানে ডাক্তারি পাশ করে তুমি নিজেই গরীব ছাত্রের পড়বার ব্যবস্থা করবে।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে জলধর বললো, "যাক্, আমার প্রধান দায়িত্বটা চুকলো। চলো, ওঠা যাক্। দেশে দিন দুয়েকের মধ্যে একবার যেতে হবে। কতকগুলো জিনিষপত্র নিয়ে আসতে হবে, কতকগুলো ব্যবস্থাও করতে হবে।"

বাসে ওঠার সময় সে বললো, "চলি তা হলে ভাই। এই বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।"

সংশোধন করে আমি বললুম, "বিলেত যাবার আগে। কিন্তু তাই বা কেন? তোমাকে সি-অফ করতে নিশ্চয়ই ষ্টেশনে যাবো।"

বাসে উঠে জলধর বললো, "বেশ।"

বাড়ী আসতে আসতে হঠাৎ মনে হলো আগামী কাল সকালে জলধরের গ্রামের বাড়িতে গেলে কেমন হয়। তার দিদিমা তো মরে গেছে, এবার গেলে সমস্ত দিনটা নিশ্চয়ই ফুর্ত্তিতে কাটানো যাবে। এই সারপ্রাইজ দিলে জলধরও নিশ্চয়ই খুব খুসি হবে। কেমন একটা মমতাও হোলো তার ওপর। বেচারা আগে কতবারই না আমাকে বলেছে তার দেশে যাবার কথা।

পরের দিন ভোর বেলায় ট্রেণ ধরে জলধরের গ্রামে যখন পৌঁছুলুম তখন বেলা ন'টা। শীতকাল, এখানে সেখানে কুয়াসা রয়েছে। ষ্টেশন থেকে তার বাড়ি পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম। এতই সোজা পথ যে আরো দশ বছর পরে এলেও চিনতে অসুবিধে হোতো না।

দূর থেকে বাড়িটা দেখ্‌লুম। কি শ্রীই হয়েছে। চূণবালি খসে খসে গেছে। জান্‌লা-দরজাগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। বাড়ির গেট ঠেলে ভেতরে এলুম। নানা আগাছায় চারিদিক ভরা। দেখ্‌লেই মনে হয় এখানকার কোনো জিনিসের ওপরেই মালিকের বিন্দুমাত্রও মমতা নেই। প্রথমবার যেখানে এসেছিলুম আজও সেই জায়গায় থেমে জলধরের নাম ধরে ডাক্‌লুম। কোনো উত্তর এলো না। ভাব্‌লুম বাড়িতে তো আর অন্য কেউ নেই। নিজেই তাকে খুঁজে নি। হয়তো এখনো সে ঘুম থেকে ওঠে নি। ওপরে উঠে জলধরের নাম ধরে আবার বার কয়েক ডাক্‌লুম। তারপর একে একে ঘরগুলো পরীক্ষা করতে লাগ্‌লুম। প্রত্যেকটা ঘরই দারুণ অপরিষ্কার। চারদিকে ইঁদুর মাকড়সার রাজত্ব। আশ্চর্য, এমন বাড়িতে মানুষ কখনো রাত্রিবাস করতে পারে! জলধরের ঘরের দরজা ঠেলে আবার তাকে ডাক্‌লুম। দেখ্‌লুম সেখানেও কেউ নেই। একটা জান্‌লা সশব্দে খুলে গেল আর সমস্ত ঘরময় বয়ে যেতে লাগ্‌লো উত্তরের উদাস বাতাস। কি রকম যেন দমে গেলুম। তবে কি কোনো কারণে জলধর কাল আসে নি? কাছাকাছি কাউকে জিগ্‌গেস্ করলে হয়তো খবর পাওয়া যাবে এই ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম। কিছু দূরেই একটা মুদির দোকান ছিলো। কয়েকজন বুড়ো আধবুড়ো লোক সেখানে বসে তামাক টান্‌ছিলো আর আড্ডা জমিয়েছিলো। তাদের কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস্ করলুম, "বল্‌তে পারো কাল রাত্রে জলধর এসেছে কিনা?"

প্রশ্ন শুনে তারা সবাই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলো। একজন বললো, "জলধরবাবু? তিনি আস্‌বেন কি কর্ত্তা, ছ'মাস আগে যে কল্‌কাতার মেডিক্যাল কলেজে তিনি মারা গেছেন।"

"বল কি?"

"হাঁ, কর্ত্তা তাই! আপনার বোধ হয় কিছু ভুল হয়েছে!"

বল্‌লুম "বোধ হয়।" তারপর অন্য কথা না বলে সোজা স্টেশনে চলে এলুম। ট্রেণ আস্‌তে কিছু দেরি ছিলো। একটা বেঞ্চিতে বসে পকেট থেকে জলধরের উইলটা বার কর্‌লুম। পকেটেই সেটা ছিলো। না, ভুল আমার হয়নি। শীতকালের রোদে উইলটা আবার দেখ্‌লুম; স্পষ্ট, সত্যি একটি কুড়ি হাজার টাকার উইল। তাতে কোনো ফাঁকি নেই।

রাতের পাহারা

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

রাতের গ্রাম পাহারা দেবে কে?
বাঁকা চাঁদ ব্যস্ত হয়ে ভাবে।
চারিদিক্ নিশুতি নিঝুম্,
খোকাদের চোখে ঘুম্‌ঘুম্
নিবু নিবু উজলা পিদিম্,
নিশুতি পরীরা যদি নাবে?
চাঁদ শুধু ঢোলে আর ভাবে।

তার ঘড়ি হয়ে গেলে শেষ
শুধু রবে ছোট ছোট তারা—
একানড়ে ভারী খুশী দেখে
গাঁয়ে মোটে নেই কারো সাড়া।

হঠাৎ সে কার সাড়া পেল?
ছুট্‌ দিল ফেলে থলি ঝুড়ি?
রাতের পাহারা জাগে নীচে!
কুকুররা উনরী ধুনরী॥

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিত হচ্ছে খুন, সেইকালে প্রেমিলা-নাটশালে চলছে মায়াসীতা কাটার ধুম। মজা দেখতে রাজা রাবণ সপার্ষদ উপস্থিত। লঙ্কাবাসী দলে দলে কিবা উচ্চ কিবা নীচ।

দেখতে মায়া সীতার খেলা
বসে গেছে রাক্ষসী খোক্কসাদের মেলা।
চারদিকে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ,
অমাবস্যার চাঁদ বেড়ি যেন তারাগণ!
এক সুতে গাঁথা যেন পারিজাত মালা
মণ্ডলাকারে বসে অপ্সরীর বালা।
গন্ধর্বী কিন্নরী দেবী দানবী রাক্ষসী
রাবণেরে ঘিরে আছে এক এক রূপের শশী।
নীলবর্ণ রাবণ সে পীত বস্ত্র ধারি
নীল পীতালৈকৃটিক আলোক বাহারি
মন্দোদরী রাণী বিবিয়ানি সাড়ি
বসেছেন হীরার মপ্ চেনে বিদ্যুৎ সঞ্চারি।
সভাস্থ সকলে স্তব্ধ করিছে শ্রবণ
টকি কল ধরেছে গীত উদ্বোধন।

এই বলেই উদ্বোধন গীত ধরলেন চাঁইবুড়ো—

মহাশক্তিমান্ মহা মান্যমান
শমন দমন রাবণ রাজা প্রজায় করেন অভয় দান।
আমরা লঙ্কাবাসী পরলোকের ভয় না বাসি
ইহলোকেই খাই দাই আর বাজাই কাঁসি।
স্ফূর্ত্তি খেলাই ফুর্ত্তিতে কাঁচা খোর
দিব্বি আছি স্ফূর্ত্তি খেলে বর্ত্তে মাটির ওপোর।
ও তোর স্বর্গও নাই, নরকও নাই, নিশ্চিন্ত সবাই
বাজাই তোরঙ্গ বাঁশী নিশি ভোর।
শাসন করেন আপন শক্তিতে রাবণ,
পালন করেন আপন শক্তিতে,
নাশও করেন আপন ইচ্ছাতে রাবণ;
পারেন ধন দিতে মান দিতে মলে দিতে কান।

কেলাপ্ কেলাপ্ সেলাপ্ সেলাপ্ শব্দের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল রমণী ফৌজ চলেছে—মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে বীরবালা প্রেমিলা মায়াসীতা কোলে —"রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী - আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে!" বলেই যেমন

খড়্গ উত্তোলন করলেন প্রেমিলা অমনি দপ্ করে নীল পীত আলো বন্ধ—লঙ্কা সহর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে থাকে থাকে হনুমানের চেহারা চমকায় আর দর্শক রাক্ষসদের মুখ ভেঙিয়ে যেন নিভে যায়। সীতার করুণ স্বর অন্ধকারে পষ্ট শোনা যায় কখনো—"একবার দেখা দাও কমল লোচন।" আবার থেকে থেকে শোনা যায়—"জনকরাজার কন্যা আমি কুল-নারী।" আবার ঘর্ঘর করে যেন ঝড়ের গর্জ্জন, তারপরেই বজ্রাঘাতের মত 'জয়রাম' শব্দ, আর কিছু দেখাও যায় না, শোনাও যায় না। নিশাচররা অন্ধকারের জীব অন্ধকারেই মরে পড়ল যে যার ঘরে। 'জয়রাম' শব্দ শুনেই ধুক্‌পুক সবার! অপ্সরীরা মরি মরি করছে, এমন সময় লণ্ঠন হাতে ভগ্নীদূতী—

"মহারাজ সর্ব্বনাশ দৌড়ে দেখুন।"

—"কি দেখবো, কি দেখবো?"

—"ইন্দ্রজিত হয়েছেন খুন!"

—"কি বল্লি লো ভগ্নীদূতী?"

ভগ্নদূত কাছেই ছিল' বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ।

—"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা দূত!" বলেই রাবণ মন্দোদরীর কোলে ঢলে পড়া। মন্দোদরী মহোদরের কোলে, মহোদর মহোদরীর কোলে! বীর নারী প্রেমিলা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাত-পা শক্ত করে ফিট সীটে বসে বসেই। ঝড়ে জলে অন্ধকারে সে রাত্রি প্রভাত। পাত্র মিত্ররা দেখে এসে বল্লে—"এক মুঠে ধরে আছেন হনুমানের লোম, আর মুঠোয় বিভীষণের দাড়ির গাছ কতক, বুকে লক্ষণের নাম লেখা শর, ভাসছেন রক্তগঙ্গায়!

হায় হায় শব্দ উঠল ঘরে ঘরে।

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ।
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন
শ্রীরাম রাবণ দোঁহে বাজে মহারণ।
লাগ ঝমাঝম্ বাদ্য বাজে, কাঁপে বসুমতী
রণে চলেছে ছত্রিশ কোটি রাক্ষসের পতি।
রাবণ করিল লোহার রথে আরোহন
ভয় পেয়ে দম বন্ধ করিল পবন
রবি রথ ফিরাল গতি সশঙ্কিত ত্রিদশপতি
ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বরুণ যম
রণ-বাদ্য বাজে লাগ ঝমা ঝম্ ঝম্!
রাক্ষস ফৌজ করে কুচ কাওয়াজ
দুম্ দাম্ দুপ্ কামান বন্দুক দেয় আওয়াজ।
বজ্জর গর্জ্জে যেন হুড়মুড়—
কাঁপন ধরে লেজে বানরগণ গাছে গাছে গা ঢাকে সুড়মুড়।
পুত্রশোকে জ্বলন্ত হুতাশন
সিংহনাদ ছাড়ি রণ লাগায় রাবণ
রম্ রমা রম্ লাগ ঝমা ঝম্।
গন্ধমাদন বানর হল আগুয়ান
ভঙ্গ দিল লেজ তুলে খেয়ে পঞ্চবাণ।

নীল বীর তিন বাণে হলেন অস্থির,
দুই শত বাণ বিঁধে কান্দে হনুমান
বলে রক্ষা কর রাম !
নয় বাণেই জম্বু মন্ত্রী জাম্বুবান।
দশ বাণে গয় গবাক্ষ দেখে অন্ধকার
আশি বাণে সুসেন বদ্যির নাভি ছাড়ো ছাড়ো একদম।
কে কারে অযুধ করে দশানন লড়ে ক্রোধে হুতাশন
লাগ ঝমা ঝম্ ঝম্।
এর কাটা গেল লেজ, ওর ভাঙলো পা
গোদা আর ভোঁদা খোঁড়া বোঁচা দুইজন
দাপট ছাড়েনা তবু, পলায় আর বলে লাগ ঝমা ঝম্।
রাবণ বলে পশু মেরে কিবা প্রয়োজন—
চল কোথা আছে রাম লক্ষ্মণ !
রাবণের রথ আসে বিজুলী চমকার
রথ শব্দে লাখ লাখ বানর পলায়।
রাবণের রথ দেখে চমকিত বিভীষণ
গদা হাতে চিত্রার্পিতবৎ হয়ে রণ।
গর্জ্জিয়া রাবণ করে বিভীষণে কষাঘাত
রণক্ষেত্রে বিভীষণ ছিটকে পড়িল দশ হাত
এই সময় পড়বি তো পড় সামনে লক্ষ্মণ দৈবাৎ।
বাস্ আর কোথা আছে—
ইন্দ্রজিতের শোক জ্বলে উঠেছে বুকের কাছে।
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল
দেখিব মানুষ বেটা কত ধরে বল।
তোর বাণে ইন্দ্রজিত পড়িল আমার
মারি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার।

বাঘের মতো গর্জ্জন করে রাবণ শক্তিশেল ছাড়লেন মহাবেগে লক্ষ্মণের বুক ভেঙ্গে !

শমনের ভগ্নি শেল শক্তি নাম ধরে
যারে লাগে শক্তিশেল সেই জন মরে।
সূর্য্যের কিরণ যেন শেল পাট ধায়
সামান্য বাণে তারে ঠেকানো কি যায় !
রামের বাণেতেও গেল নাহি রুখে
শূন্য ভরে পড়ে গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ চূড়া
বাহিরে রহিল শুধু শক্তি শেলের গুঁড়া।
শেল বিন্ধে লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস—
মাটিতে পতিত বীর না নড়েন পাশ।
ভয়েতে লক্ষ্মণে ছেড়ে পলায় বানর,
ডঙ্কা মেরে লঙ্কায় চলে রাজা লঙ্কেশ্বর।

রম্ রমা রম্ লাগ ঝমা ঝম।
জাম্বুবান কাঁদে, কাঁদেন বিভীষণ,
হনুমান হাঁকে কোথা হে রঘুনাথ পড়িল লক্ষ্মণ !
অলক্ষণ বুঝে রাম এলেন সত্বর
লক্ষ্মণের দশা দেখি হলেন ফাঁপর।
বলেন এ কাজ করিল কোন নিশাচর !

হনুমান বল্লেন— আর কে, সেই বেটা লঙ্কেশ্বর !"

—"কোথা গেল সে, মরেছে না বেঁচে আছে ?"

—"চেয়ে দেখেন, ঐ রথ যেতেছে আট ঘোড়ার, পৌঁছলো বলে গড়পারের কাছে !"

—"যাবি কোথা !" বলে রাম সম্বর্ত্ত বাণ ছাড়তেই—

ঘূর্ণারর্ত্তে ঘুরে রথ আসে ফিরে যেথায় রাম
আট ঘোড়ার কান ধরে যেন টান দিয়েছে সম্বর্ত্ত বান।

রাবণ শুদ্ধ আট ঘোড়ার রথ রামের সামনে হাজির।

—"কোথা হে রাক্ষসেশ, বালকটারে প্রহার করে আর গোটা কতক বানর মেরে যুদ্ধ শেষ ভাবছো নাকি ?"

রাবণ বল্লেন—"তাই তো, তুমি যে আছ বাকি !"

—"আছি না তো কি ? বলি লক্ষ্মণকে মারলে কেন তাই শুধোচ্ছি।"

তখন রাবণ রাগতঃ হয়ে বলছেন—

ন্যায় যুদ্ধে আমি মেরেছি লক্ষ্মণে,
অন্যায় যুদ্ধে মেরেছে ও আমার নন্দনে—
ছিল সে যখন অগ্নি আরাধনে।
পূজার ঘরে রাত দুপুরে ঢুকলো চোরের প্রায়
অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, ইন্দ্রজিত অসহায়।
অন্যায় যুদ্ধে পুত্র নিহত আমার—
ন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণে আমি করেছি সংহার।
এতে দোষী কোরোনা ব্রহ্মরাক্ষস বিশ্রবা নন্দনে।

রাম চুপ—মুখে আর কথা নেই। রাবণ বল্লেন—"আমি পেয়েছি অনেক পুত্র শোক, তুমি পেলে একটি ভায়ের শোক। এরে বলে অদৃষ্টের মার—পরিত্যাগ কর ক্রোধ !"

রাম কি জানি কি ভেবে বল্লেন—"আচ্ছা যাও আজ। পরে তোমার আমার সম্মুখ যুদ্ধেই বোঝা পড়া হবে।" এই বলে রাম সম্বর্ত্তবাণ সংহার করতেই রাবণের রথ ছাড়া পেয়ে চতুর্গুণ বেগে সন্ সন্ গড়পার।

লাগ্ ঝমা ঝম্ বন্ধ হল লঙ্কা গড়ের সিংহদ্বার !

এই বলে পুঁথি গুড়িয়ে চাঁই বুড়ো সিংগীর বাজারে বিস্মিশাক কিনতে দৌড়লেন।

শ্রীমাণিক রায়

এ্যালুমিনিয়ম্ থেকে কাপড়—

এ্যালুমিনিয়ম্ হচ্ছে সমস্ত ধাতুদের মধ্যে সব চেয়ে হাল্কা। রোমাণ্‌রা এর প্রথম আবিষ্কার করে, 'এ্যালুমেন্' কথাটা তাদের। কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রে ডেভি ধাতুটির প্রথম নামকরণ করেন—এ্যালুমিনিয়াম্। বৈজ্ঞানিকরা এখন এই এ্যালুমিনিয়ম্ থেকে পৃথিবীর সব চেয়ে হাল্কা পোষাক বানানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ্যালুমিনিয়মকে সিল্কের মতো সূক্ষ্মতম সুতোয় পরিণত করা যায়—সিল্কের মতো সুন্দর আর নরম। এ্যালুমিনিয়মের কাপড়ে যে কোনো রঙের ছোপ্ ধরে। সাটিনের মতো ভাঁজ করে রাখাও চলে, আবার আমাদের বাঙালী ধুতি শাড়ীর মতো ঢেউ খেলানো বাহার খুল্‌তেও কোনো বাধা নেই। এই এ্যালুমিনিয়ম্ বস্ত্রে সাহেব মেমের টুপি, হাত-ব্যাগ, মোজা, এমন কি জুতো পর্য্যন্ত বানানো সম্ভব হবে।

এ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার বৈচিত্র—

পালকের মতো হাল্কা এই এ্যালুমিনিয়মে কী না হয়? এই ধাতু এবং এর মিশ্র-ধাতুর ব্যবহার আমাদের সভ্যজীবনে ক্রমশই বাড়ছে। এরোপ্লেন্, রেলগাড়ী আর মোটর তৈরির কল কারখানায় এ্যালুমিনিয়মের অজস্র ব্যবহার। এমন কি, গ্রামোফোন, পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নির্ম্মাণ কার্য্যেও এই ধাতুর বিশদ্ ব্যবহার করা হয়। ঘটি বাটি পেয়ালা পিরিচ্ প্যান্ প্রভৃতি গার্হস্থ্য বাসন কোশনের রাজ্যেও এ্যালুমিনিয়মের অধিকার দিনকে দিন বিস্তৃত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক শিল্প দ্রব্য এবং ডাক্তারি অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও এ্যালুমিনিয়মের যথেষ্ট দখল দেখা যায়। অথচ গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধাতু এত দুর্ল্লভ বস্তু ছিল যে এর এক পাউণ্ডের (আধ সেরের কিছু কম) দাম ছিল সাড়ে সাতশো টাকা। এখন এক টন্ (সাতাশ মনের কাছাকাছি) এ্যালুমিনিয়মের দাম এক হাজার টাকা মাত্র। পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি চল্‌তি ধাতুর মধ্যে এ্যালুমিনিয়মের হচ্ছে চতুর্থ স্থান! ক্রমশঃ আরো নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় স্থান এর হবে বৈজ্ঞানিকরা এমন আশা করেন।

কাঠের বাড়ী ঘর—

আগাগোড়া পুরো বাড়ীটাই কাঠ দিয়ে তৈরি করার পরীক্ষণা হাল্ সহরের বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়াররা কিছুদিন থেকে করছিলেন। কাঠের কাঠামোর এই ধরণের একটা বাড়ীর নমুনা ঐ সহরে সম্প্রতি তাঁরা খাড়া করেছেন। বাড়ীর মধ্যে এক আধখানা কাঠের ঘর, কিম্বা খানিকটা ইটের খানিকটা কাঠের—এরকম ঘর দেখতে পাওয়া খুব বিরল নয়, কিন্তু এই নতুন কাষ্ঠ অট্টালিকা একেবারেই সে জাতীয় না। এর মধ্যে ইঁট বালি চুণের সংস্পর্শও থাক্‌বে না—গোটা বাড়ীটাই আপাদ মস্তক কাঠ হয়ে থাক্‌বে।

কাষ্ঠ-কলার পরাকাষ্ঠা!

কেবল তাই নয়, কাঠে যাতে ঘুণ্ না ধরে, তার ব্যবস্থাও সেই বৈজ্ঞানিকেরাও করেছেন—এমন একটা প্রক্রিয়া বার করেছেন যাতে ঘুণ তার ত্রিসীমানা দিয়ে ঘেঁষবেনা। এই কারণে বেশ টেঁক্‌সই তো হবেই, তাছাড়াও

ইটের তৈরি বাড়ী ঘরের চেয়ে সস্তাও হবে ঢের। সস্তা হবার একটা বড় কারণ, এসব বাড়ী বানানোর মজুর খরচা বেশী পড়বে না। কয়েকজন মাত্র লোক লাগ্‌লেই বড়সড় একখানা বাড়ী কয়েকদিনের মধ্যেই তুলে ফেল্‌তে পারবে। হাল্ সহরে এই ধরণের একটা বাড়ী বানাতে পনের দিন মোটে লেগেছিল।

অট্টালিকার কাষ্ঠহাসি!

একমাত্র ভয় ছিল আগুণ লাগার! বৈজ্ঞানিকরা তারও দাবাই-বার করেছেন। গার্হস্থ্য কাঠদের গোড়াতেই একপ্রকার অগ্নি প্রতিরোধক রাসায়নিক দ্রব্যে ডুবিয়ে নেয়া হয়—তার ফলে আগুণ লাগার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না বল্‌তে গেলে। তাছাড়া এই সব কেঠো বাড়ীর আরেকটা প্রকাণ্ড গুণ, এর দেয়ালের ভেতর দিয়ে কোলাহল চলাচল করতে পারে না। ন' ইঞ্চি ইঁটের দেয়াল যে গোলমাল ঠেকাতে অক্ষম, তিন ইঞ্চি কাঠের দেওয়ালের সামনে সে-মুখরতা লজ্জায় মৌন হয়ে থাকে।

এরকম কাঁচ ভাঙ্‌তে পারো?

বিলিতি একটা বয়েৎ আছে, কাঁচের বাড়ীতে বাস করে' কাউকে ঢিল্ মারা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি একরকমের কাঁচ বার করেছেন, ঢিলের বিরুদ্ধে যাকে ঢালের মত ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঁচের কাজ হলেও তাকে কাঁচা কাজ বলা যায় না। ফিলাডেল্‌ফিয়ার একটি মেয়ে এই জাতীয় একটা কাঁচের সার্সির আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন আর একজন নামকরা বেস্‌বল্ ছোঁড়ন্দাজকে সেই সার্সিতে বল্ ছুঁড়ে মারতে বলা হয়। তিনি বল্ ছুঁড়তে দ্বিধা করেন নি, তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে কসুরও করেননি কিছু, কিন্তু তাঁর বাহুবল আর বেস্‌বলের প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে কাঁচ ভাঙা দূরে থাক্ একটু চিড্ খায়নি পর্য্যন্ত! সে বল্ যেমন সগর্ব্বে এসেছিল, কাঁচের ধাক্কার কাছে পরাজিত হয়ে তেম্‌নি পত্রপাঠ তাকে অধোমুখে ফিরে যেতে হয়েছে। আসলে এ কাঁচ হচ্ছে দুটো সাধারণ কাঁচের জোড় লাগানো মাত্র—কিন্তু সদ্য আবিষ্কৃত পলিভিনিল নামক যে পদার্থের সাহায্যে এই জোড় লাগানো হয় তাতেই তার এই আশ্চর্য্যরকম জোর বেড়ে যায়।

বাঁহাতি ছেলেমেয়ে—

যে সব ছেলেমেয়েদের ডান হাতের চেয়ে বাঁহাতে জোর বেশি আর ঝোঁক্‌টাও বেশি রকম,—তারা সব কাজে বাঁহাত দিয়েই আগে লাগে আর বাঁহাতকেই বেশি লাগায়। তাদের যদি ডান হাতে লিখতে অভ্যস্ত করা হয় তাহলে তার ফলে তারা নাকি তোত্‌লা হয়ে পড়ে—এরকমটা দেখা যায়। এর কারণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে মস্তিষ্কের দুভাগের মধ্যে এক ভাগ অন্যটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী—যারা ডান হাত খাটায় তাদের বাঁদিকের মাথা, আর যারা বাঁহাত খাটায় তাদের ডান ধারেরটা। কাজেই বাঁহাতি ছেলেমেয়েদের ডানহাতে অভ্যস্ত করলে তাদের দুর্ব্বল দিকের মস্তিষ্কের জোর পড়ে, আর তার জন্যেই তাদের তোত্‌লামি দেখা দেয়।

এটা বহুকালের প্রাচীন ধারণা। সম্প্রতি, আমেরিকার সিরাকজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারি জে, হেল্‌টম্যান এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি তাঁর এক হাজার ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, হাতের কার্য্যকারিতার অদলবদলে—কাজকর্ম্মের হস্তবিনিময়ে—গড়ে ৭৭ জন ছেলের মধ্যে একজন মাত্র তোত্‌লা হয়ে পড়ে। অতএব, আর কি, বাঁ হাতের কাজ ডান হাত নাই বা জানলো?

এই ট্যাক্সি !

শ্রীশামুক

তোমাদের অনেকের আমি মুখ চিনি। অথচ সামনে গিয়ে যদি বলি, আমি কে, তোমরা চিনতে পারবে না নিশ্চয়ই। তোমাদের কয়েকজনের নামও জানি। কি করে, বলবো ?

আমি শুনতে পাই, এই সুধীর অত ঝুঁকিস না, লাবু আমার কোলে অমন নাচ্ছো কেন শাড়িটা তালগোল পাকিয়ে গোল্লায় গেল যে।

আমার সামনে একটা ছোট আয়না থাকে টুপ্ করে দেখে নি সুধীর কে লাবু কে—কি রকম দুষ্ট ছেলেমেয়ে ওরা—অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকে ওদের মিষ্টি মুখ।

এখনো বুঝলে না আমি কে ? আমি মানুষ আবার ঠিক মানুষ ও নয় যেন। আমি হ'লাম—এই ট্যাক্সি ! কতবার ত' ট্যাক্সি চড়েছ, ভাল করে দেখেছ কোনদিন কে চালাচ্ছে ? মনে রেখেছ তাকে ?

এই ট্যাক্সি ! হয় ষ্ট্যাণ্ডে চুপ করে দাঁড়িয়ে, নয়তো রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছি। ডাক শুনি—এই ট্যাক্সি ! কাছে এসে গেলাম। তোমাদের মধ্যে ছোট যারা ততক্ষণ ধেই নাচন সুরু করেছে। দরজা খুলে দি, চুপ করে শুনি কোথায় যাবে, পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যাই। মোটারখানা তোমাদের মাঝে মাঝে মনে থাকে, নম্বরটাও বা কিছুক্ষণ, কিন্তু—মানুষটি, উঁহু—জলে দাগ কাটার মত মিলিয়ে যায় তখুনি।

আমি হ'লাম সেই—এই ট্যাক্সি। কলকাতার রাস্তায় আমার আস্তানা।

দেখছ যারা ঘোড়ার গাড়ি বা গরুর গাড়ি চালায়, এক মিনিট চুপ নেই তারা। পশুদের সঙ্গে কথা বলে, ধমকায়, মারে, আদরও করে। যাত্রীদের সঙ্গে গল্প করে, দর কসাকসি করে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে চেঁচায়। যখন একেবারে কিচ্ছু করবার থাকে না, গলা ছেড়ে বেসুরো গান ধরে।

কিন্তু কোলকাতার পথে শুনেছ কোনদিন মোটর ড্রাইভার এসব করছে কিছু। একেবারে না। মেসিন চালাই, সেজন্য আমরা হাত-পাওয়ালা মেসিন ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ কত রকমের মানুষের সঙ্গে আমাদের নিত্যকার মেলামেশা। কেউ লাফিয়ে মোটরে উঠে বলে দেয় কোথায় যেতে হবে, ভারী ব্যস্ত মানুষ। কেউ ধীরে সুস্থে শুধু বলে বলে যায়—ডাইনে, বাঁয়ে, সিধা। রেড রোডের ফাঁকা রাস্তায় কেউ বলে, ধিমে চালো। থেংরাপটির ভিড়ের মধ্যে কেউ বা বলে উঠে, জোরসে। কেউ সিটের উপর আলতো বসে আড়চোখে চেয়ে থাকে মিটারের দিকে, দেখে কতগুলো দুয়ানি টিক্ টিক্ করে লাফিয়ে উঠছে। কেউ পাখীর ডানার মত হাত মেলে শুয়ে পড়ে ঠ্যাং দুটো তুলে দেয় আমার কাঁধের পাশে।

মাঝে মাঝে বকুনি খেতে হয় আবার। যেমন দেখ একদিন এক বুড়ি ঠাকুমাকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁর নাতি নাতনিদের সঙ্গে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলেন,—ও ড্রাইভার, বাবা হাওয়ায় দম আটকে মারবে নাকি ? তুমি বাছা একটি পবননন্দন !

পবননন্দন মানে বুঝলে ? হনুমান ! হনুমানকে এই হনুমান বললে সেও দাঁত খিঁচিয়ে দেয়। আমি মানুষ হনুমান, চুপ করে গাড়ির গতি কমিয়ে দি।

সব চেয়ে ভালো লাগে যখন তোমরা দল বেঁধে আমার সঙ্গে থাকো। যখন আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঝুঁকে দেখ কত জোরে চালাচ্ছি, পায়ের কাছে কলকব্জা নিয়ে করছি কি। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দি। হু হু করে ছুটে যাই। আমার আয়না দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি হাওয়ার চাপে তোমরা চোখ পিট্ পিট করছো—অবিরাম কথা বলছো আর হাসছো—তোমাদের রেশমী চুলগুলি মাথার উপর নাচছে।

সময় সময় তোমাদের সঙ্গে লম্বা পাড়ি জমাই—দক্ষিণেশ্বর, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এমনি কোথাও। যেতে যেতে সব শুনেনি কে কে আসবে, কি কি করবে, কত কত খাওয়া হবে। পৌঁছে তোমরা খেলা সুরু কর, আমি পিছনে দাঁড়িয়ে দেখি। পাথর, ইট এই সব মূল্যবান জিনিষ বইবার দরকার হলে আমি হাজির। আমার কাঁধে উঠে গাছে চড়াটা তোমাদের যে খুব সুবিধা সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর তোমরা যখন হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচ, গান গাও—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি

—আমারও ঠিক তেমনি করতে ইচ্ছা করে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের হাত ধরে।

একবার তোমাদের দলের এক খুদে মানুষ আমাকে কি রকম বিপদে ফেলেছিল সে কথা বলি।

সে দিনটা ছিল বড় ভাল। সকাল থেকে অনেক রোজগার হ'ল। বিকালে মেট্রো সিনেমায় একটা দলকে পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ি রেখে একটু আরাম করে যাক। দু'পা এগিয়েছি এক ভদ্রলোক সুটকেশ হাতে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে চেঁচিয়ে উঠেন—এই ট্যাক্সি জল্‌দি !

ট্রেণ ধরবার তাড়া। ছুটলাম তাকে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে। একে নামিয়ে দেখি অন্য একটা ট্রেণ এসে গেছে, পিল্ পিল্ করে লোকেরা বেরিয়ে আসছে। ভাবলাম দেখি যদি জুটে যায় বরাতে অন্য যাত্রী।

জুটে গেলও। দুজন নেপালী চাকরের সঙ্গে ফুটফুটে এক ছোট্ট খুকু। দু'পাশে দুজনের হাত ধরে কখনো ঝুলতে ঝুলতে কখনো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল।

একজন নেপালী হাত দেখাতেই দরজা খুলে দিলাম। কোথায় পৌঁছাতে হবে বললে না। শুধু ইসারা করে ঐদিকে চল। সারকুলার রোড দিয়ে দৌড়ে উত্তর দিকে যেতে যেতে ভাবি যাবে হয়তো দমদমা কি ব্যারাকপুর কি অমনি কোথাও।

শহর ছেড়ে গ্রামে ঢুকলাম। তবু সোজাই চলেছি অন্য দিকে যেতে বলে না। নেপালী দু'জন নিজেদের ভাষায় কি কথা বলছিল অনর্গল। খুকু বারকতক জিজ্ঞাসা করে, আর কতদূর, থাপা ? ওদের একজন ভাঙ্গা বাঙ্গালায় উত্তর দেয়—বেশী দুর নয়। আয়না দিয়ে দেখি খুকু অবাক চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠে নানা দিকে—একটা মন্দির থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসে বাতাসে—আমরা তখনও এগিয়ে চলেছি।

খুকু বেশ চুপ করে বসেছিল যেন একটা তন্দ্রার মধ্য দিয়ে। হঠাৎ বারবার বকতে সুরু করে—আমায় বাড়ি নিয়ে চল থাপা।

কথাটা কাণে বেসুরো লাগে আমার। কিন্তু ট্যাক্সি যে চালায় তার কি যাত্রীদের সম্বন্ধে কৌতুহল দেখাবার ? চুপ করে থাকি।

খুকু কেঁদে উঠে। থাপার গায়ে আছড়ে পড়ে—আমায় বাড়ি নিয়ে চল। খুকু ক্ষেপে গেল যেন।

আয়না দিয়ে অস্পষ্ট দেখি থাপা নিজের হাত থেকে কি একটা দেখায় আর খুকু ভয়ে শিউরে কান্না চাপতে গিয়ে জোরে কেঁদে ফেলে।

এত ভাল কথা নয় ! ষ্টিয়ারিং সোজা রেখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেলাম পিছনে ব্যাপার কি। দেখি থাপার

হাতে এক থোলা ভোজালী। ব্যাস ঐ পর্য্যন্তই! ততক্ষণে অন্য নেপালী তার হাতের লাঠি দিয়ে ধাঁই করে বসিয়ে দিলে আমার মাথায়।

অত সহজে কাবু হবার শরীর আমাদের নয়। জলে ভিজে আর রোদ্দুরে পুড়ে সারা দেহের মত মাথাটাও বোধ হয় বেশী শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলাম বিপদ—বিপদ একটা কিছু সামনে এসেছে। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে, কুঁকড়ে মাথা নীচু করে ঝপ্ করে ব্রেক কসে দিলুম আচমকা। জানি মুখ থুবড়ে পড়বে সকলে। খুকুর জন্য একটু ভেবেছিলামও যদি লেগে যায়, কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না।

নেপালী দুটো সামলে নেবার আগে আমি ষ্টার্ট দেবার হাণ্ডেল বাগিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। আরো সাহস হ'ল দেখে যে উলটো দিক থেকে একটা মোটরের হেড লাইট এগিয়ে আসছে।

কিন্তু দেখেছ তো আমাদের কি ভাবে বসতে হয়—একেবারে ভিতরে ঢুকে। সুতরাং একটু সময় নিল বৈকী। ও দুটো পাকা শয়তান। কুকুরের মত গাড়ি থেকে লাফিয়ে—হাওয়া! আমি গাড়ি ছেড়ে খুকুকে ছেড়ে ধরতে যাই কি করে?

দেখি খুকু মুখ থুবড়ে পড়ে উঠে বসেছে, ঠোঁট সামান্য একটু কেটে গেছে, আর ভীষণ কাঁদছে। ওরা কে বলে না, কোথায় বাড়ি বলে না, বাবার নাম কি তাও বললো না। করি কি? গাড়ি ফিরিয়ে শেয়ালদাতে আবার যাই যদি ওর বাপমায়ের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ নেই। খুকুকে বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করি তার বাড়ি কোথা, আমি তাকে পৌঁছে দিতে চাই—আমি ছেলেধরা নই। খিদে পেয়েছে ভেবে বিস্কুট কিনে দিলাম। কিন্তু বলে না কিছু, শুধু কাঁদে। বিস্কুট নিলে না।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শেষে হাত দেখায় ঐদিকে। খুকুর হাতের ইসারায় ঘুরলাম কত জায়গায়। এ গলি সে গলি এ পাড়া সে পাড়া। রাত্রি হয়ে গেছে তবু বাড়ির সন্ধান মিললো না। ভয়ে খুকুর মাথা খারাপ হয়ে গিছলো নিশ্চয় সেজন্য বাড়ি কোনদিকে ভুলে গিছলো। ঘুরে ঘুরে আমারও মাথা খারাপ হবার জোগাড়। চলতে চলতে এক চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম।

পুলিশ হাত দেখায়, তার পাশে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে যাই। পুলিশ ফিরে দেখে একটি ছোট-মেয়ে আমার একমাত্র সওয়ারী আর সে কাঁদছে।

অবাক কাণ্ড! পুলিশ কাছে এসে ঝুঁকে দেখতেই খুকুর মুখে কথা ফুটে গেল। বলে,—আমায় নিয়ে যাচ্ছে এরা। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাকে। দেখ একবার!

পুলিশ হুইসেল বাজাতেই আরো দুটো যমদূত কোথা থেকে ছুটে এল। তারপর আমায় এই মারে ত সেই মারে! আমি যে ছেলে ধরা চোর সে বিষয়ে ওরা যেন নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। আমার কথা এতটুকু কানে দিল না। খুকু শুদ্ধ গাড়ি শুদ্ধ ধরে নিয়ে গেল থানায়।

থানায় গিয়ে জানা গেল বালীগঞ্জ থানা থেকে সব জায়গায় খবর দিয়েছে যে অমুক লোকের অমুক নম্বর বাড়ি থেকে একটি ছোট মেয়ে ও একজন নেপালী চাকরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ মেয়ের এত বয়স, চুলের রং এই রকম, চোখের রং এই রকম, আর সাদা ফুলকাটা ফ্রক পরা। সমস্ত হুবহু মিলে গেল আমাদের খুকুর সঙ্গে।

ফোন করে বাবা মাকে আনানো হ'ল। বাবা মার সে কি আনন্দ খুকুকে ফিরিয়ে পেয়ে আর খুকুও এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা ঠিকঠাক বলে গেল। বোঝা গেল ওদের চাকর আরেক জনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে খুকুকে ভুলিয়ে চুরী করে পালাচ্ছিল।

রেহাই পেলাম আমি! বিস্কুটগুলি খুকুকে দিয়ে চলে এলাম। আনন্দের চোটে আমার ভাড়া দেবার কথা কারুর মনে হ'ল না, আমিও চাইতে পারলাম না। মিটারে উঠেছিল অনেকগুলো টাকা। যাকগে খুকুকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এই আসল কথা। আবার ত' কত লোক ডাকবে—এই ট্যাক্সি!

পূর্বানুবৃত্তি

রাবণের চিতার কাছ থেকে আমরা রওনা হলাম রাজবাড়ির দিকে। যেতে যেতে দেখি রাস্তার লোকেরা খুব ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে চলেছে; আর তারা এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে যেন আমরা তাদের শত্রু। আমরা বিদেশী লোক, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তা তারা কেউ জানে না, যদি তাদের কোনো অনিষ্ট করি এই তাদের ভয়।

একদল লোক দেখলাম, চেহারা তাদের ভয়ানক বিশ্রী, গায়েও তাদের ভীষণ শক্তি, আমাদের দেখে তারা গোপনে কি যেন পরামর্শ করতে লাগল, তারপর খুব জোরে ছুটে পালিয়ে গেল। চার দিকেই যেন কেমন একটা ভাব। এ সব দেখে সর্দারের মুখেও যেন কেমন একটা ভয় ফুটে উঠল। আমাদেরও ভয় হ'ল তা দেখে!

সর্দার বলল, এরা কোনো আইন মানে না, ভয়ানক হিংস্র এদের স্বভাব, আমাদেরও বড় একটা মানে না। শহরে এরা খুব একটা কমই আসে, তাই আজ এদের দেখে খুব সন্দেহ হচ্ছে, হয় তো এরা কিছু গোলমাল বাধাতে পারে। হয়তো জানতে পেরেছে শহরে বিদেশী লোক এসেছে তাই শহরে এসে এরা তোমাদের দেখে গেল:—কিন্তু শেষকালে তোমাদের কোনো অনিষ্ট ক'রে না বসে!

নিতাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করে, আমরা এখন কি করব?

সর্দার বলল, ওরা যদি আক্রমণ করে তা হ'লে তোমাদেরও পাল্টা আক্রমণ করতে হবে, না হ'লে ওরা তোমাদের মেরে ফেলতে পারে। আর যদি সাহস না পাও তা হ'লে এখুনি এদেশ থেকে পালিয়ে যাও।

নিতাই একথার উত্তরে কিছু না বলে আমার দিকে চাইল। আমি কি করব ভাবছিলাম। সত্যিই ওরা যদি দল বেঁধে আমাদের মারতে আসে তা হ'লে আমরা তিনটি বালক তাদের রোধ করব কি করে? কিন্তু পালিয়ে যাওয়া যে আরও লজ্জাকর। বড় সমস্যায় পড়া গেল! এমন সময় বাঘ আমাকে চুপে চুপে বলল তার মাথায় একটা মতলব এসেছে। বাঘ বলতে লাগল, "ওরা যদি আক্রমণ করে তবে আমি একাই তোমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারব। অবশ্য ওদের প্রত্যেককে আমি মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু আগেই তা করব না, আমি ওদের নিয়ে খুব একটা মজা করব। তুমি সর্দারকে বল, তোমরা পালাবে না, ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে একটুক্ষণের জন্য দূরে যাচ্ছি, ভয় নেই খুব শীগগিরই ফিরে আসব।"—এই বলে বাঘ চলে গেল।

আমি বাঘের কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে সর্দারকে বললাম, "আমরা পালাব না যুদ্ধই করব, তারা আসুক।"

নিতাই একথা শুনে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক আওয়াজ বার করল, তা শুনে চমকে উঠে তার দিকে চেয়ে দেখি নিতাই কাঁপতে কাঁপতে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। বেশি ভয় পেলে সে এই রকম ছোট হ'য়ে যায়, কিন্তু সে যে এত ছোট হ'য়ে যেতে পারে তা কল্পনাই করতে পারিনে।—হ'ল ঠিক একটি মার্বেলের মতো। তার এই অবস্থা দেখে হাসিও পেল, দুঃখও হ'ল। কি আর করা যায়, তাকে ওরকম অবস্থায় বাইরে রাখা যায় না, হয় তো

কখন পায়ের নীচে পড়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে! তাই তাকে তুলে মণ্টুর পকেটের মধ্যে রেখে দিলাম। পকেটে বসে সে কাঁপতে লাগল।

সর্দারের কথাই ঠিক। আমরা দেখতে পেলাম সেই ভীষণ লোকগুলো বড় বড় লাঠি নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। ঝড়ের আকাশের একপ্রান্তে কালো মেঘের একটুখানি আভাস দেখা যায়, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সেই কালো মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে। এই কালো দৈত্যের মতো লোকগুলোও তেমনি ক'রে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। সংখ্যায় তারা অনেক, প্রায় একশো হবে! সর্দার নিজেই তাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, বলে গেল, "আমি রাজার কাছে যাচ্ছি খবরটা দিতে, দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

মণ্টু ইতিমধ্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে এখনও বাঘের কথা কিছুই জানে না, তবু সে যে ছেলেমানুষ হ'য়েও এতগুলো অসভ্য লোকের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত এতে তার প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা হল। জিজ্ঞাসা করলাম, "পারবে লড়তে ওদের সঙ্গে?"

মণ্টু বলল, "পারব কিনা জানি না, কিন্তু লড়াই করতেই হবে, এতে যদি মরি সেও ভাল।"

মণ্টুর সাহস দেখে আমি সত্যিই চমকে গেলাম। মনে খুব আনন্দও হ'ল। বললাম, "ঠিক কথা, আমরা যুদ্ধই করব, পালাব না।"

চেয়ে দেখলাম শত্রুর দল অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মণ্টু বলল, "আমার পকেটটা ভিজে উঠছে কেন?"

পকেট ভিজে উঠছে! মণ্টু বলে কি? পকেট ভিজবে কেন। চেয়ে দেখি সত্যি, মণ্টুর পকেট ভিজে উঠেছে এবং তা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। কাছে গিয়ে পকেট পরীক্ষা ক'রে দেখলাম পকেটের মধ্যে নিতাই চিঁ চিঁ করে কাঁদছে আর তার চোখের জলে পকেটের এই দুর্দশা। পকেট থেকে নিতাইকে বের করে দিলাম। তাকে কোথায় রাখি সে এক সমস্যা—এদিকে সময়ও বেশি নেই।

শত্রুদল ভয়ানক চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

তাদের গোলমাল শুনে শহরের লোক ছুটে এল মজা দেখতে। আমরা যেখানে ছিলাম সেটা একটা মাঠের মতো। সেই মাঠের চারিদিকে সবাই এসে ভীড় করল।

আমাদের শত্রুরা তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

নিতাইকে অগত্যা আমার মানিব্যাগের মধ্যে রাখলাম—সে ভয়ে আরও ছোট হ'য়ে একটা মুক্তোর মতো হয়ে গেছে!

শত্রুপক্ষ আরও এগিয়ে আমাদের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল। তাদের দলপতির হাতে এক প্রকাণ্ড লাঠি। সে এই লাঠি তার মাথার উপর বন্‌বন্ ক'রে ঘোরাতে লাগল, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারবে এই তার মতলব। আমি মণ্টুকে বললাম, "লাঠির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, লাঠি ছুঁড়লেই মাটিতে শুয়ে পড়বে, তা হ'লে হয়তো লাঠির হাত থেকে বেঁচে যাব।"

বলতে বলতেই লাঠি তীর বেগে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমরা সেজন্য প্রস্তুতই ছিলাম, নইলে কাউকে আর বাঁচতে হ'ত না। আমরা শুয়ে পড়াতে লাঠি আমাদের পিছনে এসে পড়ল। উঃ সে কি ভীষণ শব্দ! শুনেই আমাদের মাথা ঘুরে গেল।

কিন্তু কোন সাহসে আমরা এতগুলো দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি? আমাদের না আছে অস্ত্র, না আছে

লড়াইয়ের যোগ্যতা! দুখানি হাত মাত্র আমাদের সম্বল! কিন্তু এছাড়া আরও একটি জিনিস আছে, সে হচ্ছে আমাদের মনের জোর আর সাহস। আমাদের এই সাহস দেখেই তো ওরা সোজাসুজি আমাদের কাছে আসতে পারছে না। পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে।

আমাদের অবশ্য আর একটা ভরসা আছে। বাঘ আমাদের বলেছে, সে এমন একটা কাণ্ড করবে যাতে আমাদের ওরা কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। কিন্তু কোথায় বাঘ?

এদিকে শত্রুপক্ষ আমাদের মারতে না পেরে আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। তাদের দলপতি আশা ভঙ্গের দরুণ চটে গিয়ে লাফাতে আরম্ভ করল এবং আরও বেশি গর্জন করতে লাগল। তার পাশেই যে লোকটা ছিল সে তার লাঠিখানা দিল দলপতির হাতে।

লাঠি পেয়ে দলপতি আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। সে আবার মাথার উপর লাঠি ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে যেমন সে লাঠিখানা আমাদের দিকে ছুঁড়বে এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

দলপতি কোন অজ্ঞাত কারণে লাঠিশুদ্ধ চিৎপটাং! যেন একটা পাহাড় ভেঙে পড়ল।

"কি, হ'ল, কি হ'ল" বলে সবাই ছুটে গেল দলপতির কাছে। এমন সুস্থ জোয়ান লোকটি হঠাৎ চিৎপটাং হ'ল কেন?

দেখা গেল দলপতি তার পেট হাতে চেপে ধ'রে "ওরে বাপ্‌রে-মারে, কি হ'ল রে" ব'লে ভীষণ চীৎকার করছে। চীৎকার শুনে সবাই মিলে তার পেট টিপে দিতে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতি একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। সুস্থ হ'য়েই উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই তার মনে আবার হিংসা জেগে উঠল। চোখ দুটো তার আগুনের মতো জ্বলতে লাগল, এবারে সত্যিই আর আমাদের নিস্তার নেই।

কিন্তু এবারেও দলপতির আশা পূর্ণ হ'ল না। সে লাঠিখানা তুলে ধ'রে দাঁতে দাঁত চেপে আমাদের দিকে ছুঁড়বে বলে প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় আবার চীৎকার এবং আবার চিৎপটাং!

আগের মতো সবাই আবার এল তার শুশ্রূষা করতে। কিন্তু দুবার পড়ে যাওয়াতে সে এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর তার যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি নেই। সে আর সবাইকে আদেশ দিল আমাদের আক্রমণ করতে। আদেশ পাওয়া মাত্র তারা একে একে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু একে একে প্রত্যেকেই তারা দলপতির মতোই পেটে হাত দিয়ে চীৎকার করতে করতে পড়ে যেতে লাগল। এই ভাবে যখন অন্ততঃ পনেরো জন লোক পড়ে গেল, তখন সবার খেয়াল হ'ল, এর মানে কি? প্রত্যেকের মুখে ঐ একই কথা, "এর মানে কি?"—মানে না বুঝে সবাই ক্রমে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। জীবনে তাদের এমন বিপদ কখনও হয়নি।

দর্শকের মধ্যেকার কেউ কেউ আমাদের দেখিয়ে বলতে লাগল, "এই নতুন মানুষের ছেলেরা আসলে মানুষ নয়, ওরা নিশ্চয়ই দেবতা বা আর কিছু হবে।" অন্য লোকেরা বলল, "দেবতা-টেবতা নয়, সাধারণ মানুষ, তবে হয়তো কিছু মন্ত্র-তন্ত্র জানে—এই একটা ব্যাপার দেখেই ফস্ ক'রে কিছু বলা ঠিক নয়।"

ওরা নিজেরা কিছুই ঠিক করতে পারল না, বড় ধাঁধায় পড়ে গেল। কয়েকটা লোক ছুটে চলল রাজাকে ডেকে আনতে। সর্দার অনেক আগেই রাজার কাছে গেছে তা বলেছি।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। সত্য কথা বলতে কি ওদের যে কি হ'ল তা আমরাও বুঝতে পারছি

না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের এত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে! কে সে? মনে হ'ল বাঘ, কিন্তু ঠিক না জানতে পেরে মনে সন্দেহ রয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্যে এই সময় হঠাৎ একটা আনন্দ কোলাহল জেগে উঠল। তাকিয়ে দেখি ওদের রাজা এসে পড়েছে। তাকে এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো রাজা। মুখের চামড়া দুধারে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো গর্ত্তের মধ্যে এত ঢুকে আছে যে দেখাই যায় না। ঠোঁট দুটো অত্যন্ত পুরু, নাক খুব লম্বা এবং মোটা, অন্য পাহাড়ী লোকদের সঙ্গে মেলে না। রাজা খুব খাটো, খুব মোটা, মাথাটা একটা কুমড়োর মতো। পোষাক নানা রঙের। রাজার সঙ্গে কয়েকজন দেহরক্ষী, তাদের প্রত্যেকের হাতে বল্লম আর ঢাল। রাজার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, দেখলে মনে হয় যেন বড় দুঃখী। মুখের দুধারে যে চামড়া ঝুলছে, মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে ওর সকল দুঃখ পোরা আছে। রাজা কোনো দিন হেসেছে কিনা সন্দেহ হয়, যেন সময় পেলেই বসে বসে কাঁদে। রাজার সঙ্গে আমাদের সেই সর্দারও রয়েছে, তার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেছে, কাজেই তার সঙ্গে সিংহাসনও এসেছে। রাজা সিংহাসনে বসেই পকেট থেকে বাদাম ভাজা বা'র ক'রে খেতে লাগল এবং আমাদের দিকে চাইতে লাগল। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল রাজার মন্ত্রী, তারও পাশে দাঁড়িয়ে সর্দার। রাজা আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মন্ত্রীকে আদেশ দিল, "ওদের এদিকে ডেকে আন।"

রাজার গলার কি জোর! অতটুকু মানুষ, কিন্তু মনে হ'ল যেন একটা সিংহ গর্জ্জন করছে। রাজার আদেশে মন্ত্রী দেহরক্ষীদের আদেশ দিল আমাদের ধ'রে নিয়ে যেতে। দেহরক্ষীরা এগিয়ে আসতে লাগল।

চকিতে দেখতে পেলাম একটু দূরে একটা লোককে তিন চারজন লোক হাত-পা ধ'রে ঠেকিয়ে রেখেছে, আর দুজন লোক তার মুখ চেপে ধ'রে আছে। লোকটা যে কে দূর থেকে বোঝা গেল না, কিন্তু একটা ধস্তাধস্তি চলছে বেশ বোঝা গেল।

(ক্রমশঃ)

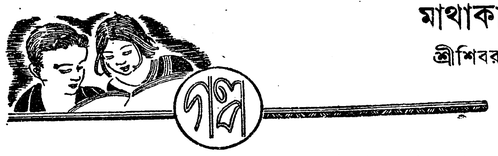

মাথাকাটা মিমির

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(নরওয়ের উপকথা)

অ্যামিলিয়াস্ ছিল সেই গাঁয়ের কামার। ছত্রাকার বাদাম গাছের তলায় ছিল তার কারখানা। সেইখেনে সে সারাদিন হাঁপড় চালাতো আর হাতুড়ি পিট্‌তো। ঘোড়ার খুরের নাল তৈরি করাই ছিল তার প্রধান কাজ।

তাছাড়া, সৈনিকদের সে লোহার টুপিও তৈরি করে' দিত। লৌহবর্ম্ম তৈরি করতেও তার জুড়ি সেই তল্লাটে কেউ ছিল না।

কিন্তু মিমিরের সঙ্গে ছিল তার বেজায় রেষারেষি।

"নিজেকে একবার নেড়ে চেড়ে দ্যাখো!"

মিমির সেই গাঁয়ের আরেকজন কামার। মিমিরের নামডাক ছিল তলোয়ার বানানোর। আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র—যেমন বর্ম্ম কি শিরস্ত্রাণ—সে বড় একটা তৈরি করত না, করতে ভালোও বাস্‌ত না। মারাত্মক হাতিয়ার বানানোই ছিল তার কারবার। আর তাতেই ছিল তার আনন্দ।

দুদিকেই সমান ধার এমন তলোয়ার নির্ম্মাণে মিমিরের সমকক্ষ কেউ সেখানে ছিল না। তার ইস্পাতের যেমন ছিল ধার, তেমনি ছিল শক্তি। অ্যামিলিয়াস্ যে সব শিরস্ত্রাণ কি লৌহ-বর্ম্ম গড়ত, মিমিরের তৈরি তলোয়ারের আঘাতে তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেত। অথচ মিমিরের তলোয়ারের ধার একটুও ক্ষইতো না।

মিমিরের দর্প চূর্ণ করতে অ্যামিলিয়াস্ করল কি, খুব পুরু করে' আর শক্ত করে' নতুন এক লোহার বর্ম্ম বানালো। আর তার শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে সদা সর্ব্বদা সেটা নিজের গায়ে দিয়ে বেড়াতে লাগল। আর সবাইকে বলে বেড়াতে লাগ্‌ল—এ হেন বর্ম্মভেদ করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোথাও কোনো মিঞার নেই! কোনো করাতের সাধ্য নেই যে একে চেরে কি কোনো তরবারির ক্ষমতা নেই যে দুফাঁক্ করতে পারে।

মিমিরের কাণে কথাটা গেল যখন, তখনি সে নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে কামারশালায় গিয়ে নতুন ধরণের তলোয়ার বানানোয় লেগে গেল। অল্পক্ষণেই সম্পূর্ণ নতুন প্রক্রিয়ায় সে তলোয়ারটা তৈরি করে' ফেল্‌লে। তারপর সেই তলোয়ার হাতে অ্যামিলিয়াসের খোঁজে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তিন টাকা দামের সস্তা হীরের মত তলোয়ারটা তার হাতে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগ্‌ল।

বর্ম্মপরিহিত অ্যামিলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতে তার দেরি হোলো না। মিমিরকে দেখে অ্যামিলিয়াস্ বল্লে —"তোমার ওই ছুরিটা যদি আর কখনো কাজে লাগানোর না ইচ্ছা থাকে, যদি চির দিনের মত ওটাকে ভোঁতা করতে চাও, তাহ'লে আমার এই বর্ম্মটায় একবার ঠুকে দেখতে পারো।"

মিমির তার হাতটা একবার নিজের জামায় ঘষে নিয়ে তলোয়ারটাকে আকাশের উপর দিয়ে খেলিয়ে নিয়ে এল। চকিতের জন্যই! তবু মনে হোলো অ্যামিলিয়াস্‌কে ভেদ করে হাওয়ার ভেতর দিয়ে শন্ শন্ করে' শিস্ দিয়ে চলে এল যেন হাতিয়ারটা। অ্যামিলিয়াস্ হাস্‌ল কেবল আর বল্‌ল, "চালাও, চালাও! আশে পাশে কোথায় যেন ঠাণ্ডা লোহার আমেজ পেলুম মনে হোলো—কিন্তু কোথ্‌থাও লাগেনি। কিছুই হয়নি আমার।"

"নিজেকে একবার নেড়ে চেড়ে দ্যাখো তো।" মিমির বল্‌ল কেবল। আর যেই অ্যামিলিয়াস্ নিজেকে নাড়তে গেল, অম্‌নি নিখুঁত দু'টুক্‌রো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দ্বিধাগ্রস্ত অ্যামিলিয়াস্!

নবম অধ্যায়

কবি হাফিজ ও সর্দ্দার আক্ বোগা

"ভগবানের মা, রুসিয়াকে রক্ষা কর!"

মস্কো সহরের পথে পথে, আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে জাগছে এই কাতর প্রার্থনা!

রুসরা দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দেখে বুঝেছে, অস্ত্রের দ্বারা তৈমুরকে বাধা দিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা হ'ল দেবতার দ্বারস্থ।

রুসরা বলে, ভগবানের মা তাদের প্রার্থনা ঠেলতে পারেন নি। কারণ রুসিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা তোক্তামিসকে দমন ক'রেই তৈমুর আবার নিজের দেশে ফিরে গেলেন। মস্কো সহরে তখন বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। এমন একটা ছোট সহর তৈমুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

মস্কো বাঁচল, কিন্তু রুসিয়ায় মোগল-সাম্রাজ্যের পতন হ'ল। তৈমুর শত্রুর বেশে রুসিয়ায় গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের ফলেই রুসরা স্বাধীন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রথম সুযোগ পায়।

রুসিয়ার পর পারস্যের পালা।

পারস্যের গৌরব-সূর্য্য তখন অস্তমিত। বহুকাল ধ'রে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে অলস ভাবে ব'সে থেকে পারস্যের পুরুষত্ব তখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তার যশ আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই। সম্রাট আমীর ওমারাও ও রাজপুত্ররা বিপুল বিলাসে কালযাপন করেন, কবিদের রচিত প্রশস্তি তাঁদের আত্মপ্রসাদকে আরো বাড়িয়ে তোলে, বড় বড় সহরের পথে পথে আরামে ঘুরে বেড়ায় রেশমী পোষাক পরা ভিখারীরা!

এরি মধ্যে কবি হাফিজের মুরুব্বি পারস্যের সম্রাটের মৃত্যু হল। সমস্ত ইরাণ দেশ তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এক একজন রাজকুমারের অধীন হয়ে পড়ল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। শীতের ম্লান সূর্য্যের আলোকে আচম্বিতে একদিন দেখা গেল, ইরাণের বুক মাড়িয়ে ইস্পাহানের দিকে এগিয়ে আসছে তৈমুরের দুর্দ্দান্ত তাতার বাহিনী!

ইস্পাহানের কর্ত্তারা বাধা দিলেন না, বরং হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তৈমুরকে সাদর অভ্যর্থনা করতে।

তৈমুর বললেন, "ইস্পাহাণীদের জীবন ভিক্ষা দিলুম। যদি নিষ্ক্রয়ের টাকা পাই, সহরও লুট করা হবে না।"

ইস্পাহাণী আমীর-ওমরাওরা বললেন, "অবশ্য, অবশ্য! নিষ্ক্রয় দেওয়া হবে বৈকি!"

কিন্তু ইস্পাহানের সাধারণ বাসিন্দারা কর্ত্তাদের এই কাপুরুষতা সমর্থন করলে না। এক ডানপিটে কামার কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে সকলকে উত্তেজিত ক'রে তুললে। ইস্পাহাণীরা ক্ষাপ্পা হয়ে তাতারীদের আক্রমণ করলে। সহরের পথে পথে ছুটল রক্তস্রোত। তিন হাজার তাতারী মারা পড়ল।

বিষবৃক্ষের ফল ফলতে দেরি হ'ল না। বজ্রকঠিন স্বরে তৈমুর বললেন, "হত্যা কর! প্রত্যেক তাতারীর হাতে আমি একটা ক'রে ইস্পাহাণী মুণ্ড দেখতে চাই।"

তারপর দেখা গেল ইস্পাহানের রাস্তায় রাস্তায় সাজানো রয়েছে সত্তর হাজার নরমুণ্ডের পাহাড়!

ইস্পাহানের পরে এল সিরাজ নগরের পালা। কিন্তু সিরাজের বুদ্ধিমান বাসিন্দারা ইস্পাহানের দুর্দ্দশা দেখে তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রয়ের টাকা চুকিয়ে দিলে।

সিরাজে থাকতেন কবি হাফিজ। তাঁর নাম ফিরত দেশে দেশে। তৈমুর কাব্যের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে একদিন কবিকে ডেকে পাঠালেন। কবিকে আসতে হ'ল।

হাফিজ একটি কবিতায় এই মর্ম্মে লিখেছিলেন—"সিরাজের সুন্দরী কন্যার পায়ের তলায় আমি বোখরা কি সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে পারি।"

তৈমুর কঠোর স্বরে বললেন, "এ কবিতা তুমি লিখেছ?"

কবি বললেন, "রাজার রাজা, ওটি আমারই রচনা বটে।"

তৈমুর বললেন, "কত যুদ্ধ ক'রে কত কষ্টের পর আমি সমরখন্দ জয় করতে পেরেছি। আর তুমি কিনা এক কথায় তুচ্ছ এক নারীর পায়ে সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে চাও?"

কবি হেসে বললেন, "হুজুর, এমনি অমিতব্যয়িতার ফলেই আজ আমি ভিখারীর মতন দীন হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি!"

কবির জবাব শুনে তৈমুর খুসি হ'লেন। হাফিজের ভাগ্যে জুটল প্রচুর পুরস্কার।

বলা বাহুল্য, দেখতে দেখতে কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধের পর সমস্ত ইরাণ দেশ হ'ল তৈমুরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। মধ্য-এসিয়ায় ও ইরাণ দেশে কেউ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না (১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে)। তৈমুরের বয়স এখন তিপান্নো বৎসর। কেবল লোক দেখাবার জন্যে মাথার উপরে তিনি এখনো জেঙ্গীজের এক বংশধরকে রেখে পালন করছেন বটে, কিন্তু এই খাঁ খানান হচ্ছেন তাঁর হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। তিনি গদীর উপরে ব'সে নিশ্চিন্ত মনে ভালো খাবার-দাবার খান, শিকারে যান বা খেলাধূলো আমোদপ্রমোদ নিয়ে থাকেন।

কি-রকম সব দুর্দ্ধর্ষ লোক ছিলেন তৈমুরের সহচর, এখানে তারও একটু পরিচয় দিলে মন্দ হবে না।

নাম তাঁর সর্দ্দার আক্ বোগা—লম্বায়-চওড়ায় চেহারাখানি তাঁর দানবের মতন বিরাট, তাঁকে দেখলেই বুকটা ভয়ে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। তাঁর প্রকাণ্ড ঢাল লোহায় তৈরি এবং ভারি ধনুকখানি হচ্ছে পাঁচ ফুট লম্বা।

একদিন ইরাণ দেশের এক পল্লীগ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়ীর সামনে একলা বসে আক্ বোগা গোগ্রাসে পোলাও-দ্যালিয়া কোপ্তা-কাবাব ধ্বংস করছেন, এমন সময়ে গাঁয়ের জনৈক মুরুব্বি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিলে, পুকুরের ধারে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ইরাণী সৈনিকের উদয় হয়েছে।

আক্ বোগা নিশ্চিন্ত ভাবে মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা! যাও, গাঁয়ের লোকজন নিয়ে এস, তারপর খানা খেয়ে আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব।"

মুরুব্বি বললে, "হুজুর, ওরা দলে ভারি, আপনি পালিয়ে গেলেই ভালো করবেন।"

আক্ বোগা বললেন, "আরে না, না, আমি আক্রমণ ক'রে ওদের ঘোড়াগুলো কেড়ে নেব। ইরাণীরা শেয়ালের পাল, আমার মতন নেকড়ে-বাঘকে দেখলেই চম্পট দেবে।"

মুরুব্বি বোগা-সাহেবকে চটাতে ভরসা করলে না, গাঁয়ের জনকুড়ি লোককে কোন রকমে ডেকে আনলে।

আক্ বোগা নিজের ঘোড়ার উপরে চ'ড়ে এগিয়ে গেলেন এবং ইরাণীদের দেখেই বিকট হৈ-হৈ রবে চীৎকার ক'রে উঠলেন্।

ইরাণী সৈনিকরা সবিস্ময়ে নিজের নিজের ঘোড়ার উপরে উঠে বসল।

তাই দেখেই গাঁয়ের লোকেরা দিলে টেনে লম্বা!

কিন্তু আক্ বোগা পালাবার ছেলে নন, তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে মাথার উপরে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে চ্যাঁচাতে লাগলেন, "হা রে রে রে রে, যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি!"

কিন্তু ইরাণীরা যুদ্ধ দেবার নামও করলে না। তারা ভাবলে, এ লোকটা হচ্ছে দলের অগ্রদূত মাত্র, একা কখনো চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে আক্রমণ করতে আসে? আক্ বোগা যত জোরে হৈ-হৈ করেন, তারাও তত বেগে ছুটে পালায়!

আক্ বোগা শেষটা হতাশ ভাবে গ্রামে ফিরে এসে ঘৃণা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ইরাণীরা হচ্ছে শেয়ালের পাল; কিন্তু এই গাঁয়ের লোকগুলো হচ্ছে ভীতু খরগোস!"

ক্রমশ

খোকার প্রতিজ্ঞা

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

পত্রিকাতে লিখ্‌বো আমি
কোরেছি এই মনে।—
লিখ্‌ছে তাতে হাজার লেখা
কতোই জনে জনে!!
আমার মনের কথা যতো
লিখবো আমি তাতে।
কোনও মতে পাঠিয়ে দেবো
সম্পাদকের হাতে!!
মা আমারে ধম্‌কে বলেন—
লিখ্‌বি কিরে তুই,—
একটুখানি বাচ্চা ছেলে—
উঠ্‌লি ফুঁড়ে ভুঁই?
কতো রকম কথাই যে মা
জাগ্‌ছে আমার বুকে,
রাগিস্‌নে মা তোর কাছে তা'—
বল্‌বো মনের সুখে!
হবোই আমি মস্ত জ্ঞানী
ভরবে যশে দেশ।
মা তোর কতো গরব হবে
বল্‌বি তখন 'বেশ'—!
পরের ব্যথা কোরবো গো দূর
'দয়ার-সাগর' যেন।
বড়োর মতো বড়ো আমি—
নাই বা হবো কেন?—
হবো আমি মস্ত কবি
রবি কবির চেয়ে,—
বিশ্ব-বাসীর সারা বুকে—
গান রবে মোর ছেয়ে!
সবাই বলে—কবি হলেই
হয়না নাকি বীর।—
বিপক্ষে এই "কথার" আমি—
মিথ্যে কথাটির!!—
সকাল বেলায় ধোরবো "লেখা"
সন্ধ্যে বেলায় "লাঠি"।
অন্যায়রে ঠেঙিয়ে বীরের
প্রমাণ দেবই খাঁটি!!
"দেশ-বন্ধু"র চেয়ে অনেক
কোরবো বেশী দান।
সব কিছু মোর বিলিয়ে দেব,
রাখবোনাও—প্রাণ!!
সে প্রাণ আমার কোরবে সদাই
পরের উপকার!
মাথায় নেবো পায়ের ধূলো
তোদের দুজনার॥
দেশের যতো বড়ো আছেন—
চল্‌বো সবার সাথে।
ভাই বলে সব কাঙাল ছেলের
ধোর্‌বো হাতে হাতে।
হাসিস্‌নে মা আমার মনের
এম্‌নি তরোই রোখ্।—
—'বড়ো'—আমায় হ'তেই হবে
যেমন কোরেই হোক্!!

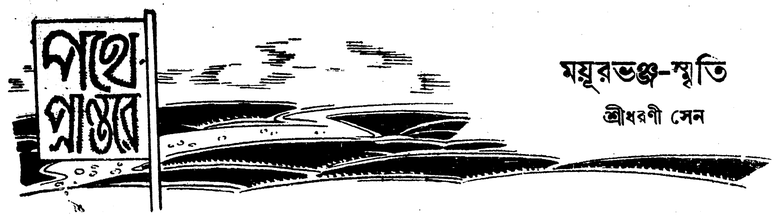

ময়ূরভঞ্জ-স্মৃতি

শ্রীধরণী সেন

আমার কয়েকজন কিশোর বন্ধুর আব্দারে আজ আমি এই ভ্রমণ-স্মৃতিটি লিখতে বসে খুব আনন্দ পাচ্ছি এবং তাদের ভ্রমণ-পিপাসু উৎসুক মনের উদ্দেশ্যে আমার এই ছোট কাহিনীটি উৎসর্গ করছি। এ'টি পড়ে যদি তাদের কেউ ময়ূরভঞ্জ যাবার প্রেরণা পায়, তাহ'লে জানবো আমার লেখাটি সার্থক হয়েছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে আমরা প্রথম বেড়াতে যাই ১৯৩৯-৪০ সালের শীতের সময়। হাওড়া থেকে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে ১৩৩ মাইল দূরে রূপ্‌সা ষ্টেশনে যেদিন আমরা পৌছলাম, সেদিন বড়দিনের ছুটির প্রথম রাঙা প্রভাত। ষ্টেশনের অপর দিকে দেখলাম আমাদের জন্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ছোট খেল্‌না গাড়ী অপেক্ষা করছে। এখান থেকে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা মাত্র ৩৩ মাইল কিন্তু আমাদের খেল্‌না গাড়ী ঝক্‌ঝক্ করে এঁকেবেঁকে বনবাদাড় পাহাড় পার হয়ে তিন ঘণ্টায় সেখানে পৌছল! তিন ঘণ্টায় ৩৩ মাইল একটা রেকর্ড্, আমাদের এক বন্ধু এঞ্জিন-ড্রাইভারের সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক্ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা কোন রকমে তাঁকে নিরস্ত করলাম। যাহোক খেল্‌না গাড়ীকে সেলাম ঠুঁকে আমরা ষ্টেশনের কাছেই সুদৃশ্য 'বিশ্রাম ভবনে' গিয়ে উঠলাম। এই বিশ্রাম ভবনগুলি ময়ূরভঞ্জের গর্ব্বের জিনিষ এবং রাজ পরিবারের আতিথেয়তার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

পূর্ব্ব-ভারত রাজ্য সমষ্টির মধ্যে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যটি হ'ল প্রধান। ময়ূরভঞ্জের রাজারা প্রাচীন ভঞ্জদেও রাজ-পরিবারের অন্তর্গত। রাজারা এবং রাজ্যটি খুব প্রগতিশীল। বারিপদা সহরে নানা শিক্ষা ও শিল্প কেন্দ্র, কলকারখানা, অফিস আদালত, কাউন্সিল ভবন, মিউজিয়ম্, মার্কেট, উদ্যানবীথি, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়া, বড় বড় রাস্তাঘাট, টেলিফোন, কলের জল ও বিজলী আলোর সুব্যবস্থা আছে। কেবল দূর গ্রামে কোথাও কোথাও জলকষ্ট, অভাব অনটন চোখে পড়ে। আশা করা যায়, সেটুকুও একদিন থাকবে না। ময়ূরভঞ্জের রাজাগণ বংশানুক্রমে প্রগতিশীল ও উৎসাহী, সজ্জন, অতিথিপরায়ণ ও দয়ালু। এই রাজবংশে বাঙ্গালী প্রীতিও সুবিখ্যাত।

কিন্তু ময়ূরভঞ্জের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য্যই এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই বিষয়ে ময়ূরভঞ্জ অনেক দেশীয় রাজ্যই অতিক্রম করে গিয়েছে। গভীর বনভূমি, বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, নদনদী, পশুপাখী ও আদিম মানুষ জাতির মহাতীর্থ হ'ল এই ময়ূরভঞ্জ রাজ্য।

ময়ূরভঞ্জের সেই আসল্ সৌন্দর্য্য কিন্তু সহুরে বারিপদায় নেই, আছে একটু দূরে দূরে। সেই দূরের পথে আমরা একদিন পাড়ি দিলাম।

বেশী দূরও নয়, বারিপদা থেকে মাত্র মাইল ১২ উত্তর-পশ্চিমে কুলিয়োনা নামে একটি গণ্ডগ্রামে আমাদের সংসার পাতলাম। আজ কিন্তু সে গ্রামটি আর নেই, শুধু নামটি আছে। এই নামটি ময়ূরভঞ্জের মানচিত্রে একদিন বিখ্যাত হয়ে উঠল, যেদিন কুলিয়োনার কোলেই ময়ূরভঞ্জের প্রাচীনতম ইতিহাসের নিদর্শন পাওয়া গেল। প্রস্তরযুগের একটা অতি বিরাট সভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ এখানে নানা বিচিত্র পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল। সেও এক আশ্চর্য্য কাহিনী, যা' অনেকদিন মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল।

পাতা-ছাউনি আমাদের ডাকবাঙ্গলোটি ছিল শাল মহুয়া বনের এক প্রান্তে ঠিক ছবির মত। ময়ূরভঞ্জের বুড়ো নদী বুড়াবলাঙ্গা কুলিয়োনার নীচে দিয়ে বয়ে যায়, সাঁওতালী ও অন্যান্য আদিজাতিদের গ্রাম থেকে বাজনা ও মাদল শোনা যায়। আর আমাদের বাংলোর বুক ঘেঁষেই সেই মন ভুলানো রাঙামাটির পথ চলে যায় অনেক অনেক দূরে। সেই পথে পা ফেলে আমরাও গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, পাহাড়ে প্রান্তরে সারাদিন টো টো করে ঘুরতে লাগলাম।

ঘুরতে ঘুরতে কত বিচিত্র জিনিষ চোখে পড়ে। কত আলাপ পরিচয় ঘটে ফল ফুল বনের পাখীর সঙ্গে, আর মানুষের সঙ্গে। একদিন একটি সাঁওতালী ছেলে নিয়ে গেল ক্ষেত খামার পার করে এক পাহাড়ী নদীর ধারে। হেসে দিয়ে বললে, ঐ আমার ভাই। দেখি, তীর ধনুক হাতে একটি ছোট্ট সাঁওতালী ছেলে জলের ধারে একটা সাঁকোর ওপর কালো পাথরের নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে, জলে তার নিখুঁৎ ছায়া ফুটে উঠেছে। কিন্তু যেই জলে মাছে একটু কাঁপন তুলেছে অমনি সে তীর ছুড়েছে। এরা পাকা তীরন্দাজ, সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তীর ছুড়ে মাছ ধরা এই প্রথম চোখে দেখলাম।

এমনি আর একদিন একটা প্রকাণ্ড বন পার হয়ে এক মেঠো পথ ধরে চলেছি। পথের ধারে এক রকম লাল-ফুলের দিকে আমার এক বন্ধু নজর দিতে বললেন। কাছে গিয়ে দেখি ফুলের রেণুর মধ্যে কয়েকটা লাল পিঁপড়ে ও একটা সবুজ মাকড়সা মরে পড়ে আছে। এই ফুল পোকামাকড় চুষে খায়। এদেরই ইংরাজিতে বলে Insectivorous plant. এই ফুলের রঙে ও রসে আকৃষ্ট হয়ে পোকা মাকড় যেমন ওর মধ্যে গিয়ে পড়ে, অমনি ফুলের লালায় আটকে যায়। সেখান থেকে ফেরবার পথে একটা মস্ত শাল গাছের আগডালে এক জোড়া ধনেশ পাখী দেখলাম।

একদিন আমাদের পাচক ঠাকুর লক্ষ্মীদাস বললে যে রাতে বাংলোর ধারে হরিণ আসে। শুনে আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তাহ'লে ক'দিন রাতে এই হরিণের অদ্ভুত ডাকই শুনেছিলাম। এরা Barking deer বলে একজাতের হরিণ। এর পরে এক চাঁদনি রাতে জোড়া হরিণ দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করলাম। শুনলাম মহুয়া ও অশন বনে ভাল্লুক আসে উই আর মধু খেতে। অশন বনে বড় বড় উইর ঢিপি দেখেছিলাম, রীতিমত দরজা জানালা দেয়া ঘরবাড়ী। এই ঢিপির একতলায় সংসার করেন এক বিঘৎ প্রমাণ স্থূলদেহী উইরাণী। উই যে এত বড় হতে পারে জানতাম না। কালো ভাল্লুক ঢিপি ভেঙ্গে মাটির তলায় তার থাবা বাড়িয়ে উইরাণীকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উইরাণীকে খুঁজে পাওয়াই ভার ; ভাল্লুক—raid-এ মাটির এমন নীচে তিনি shelter নেন যে আক্রমণকারী অনেক সময় বেকুব বনে যায়। কিন্তু উইরাণী নিজের বুদ্ধির দোষে যদি ভাল্লুকের থাবাগত হন, তাহলে খাইয়ে ভাল্লুক খুড়ো বলেন, এমন সুখাদ্য নাকি দুনিয়াতে নেই।

হরিণ হ'ল, ভাল্লুক হ'ল ; এবার বাঘের পালা। তা'ও শোনা গেল (শুধু শোনাই ভাল)। মাইল ৩ দূরে বুড়ামারার জঙ্গলে নাকি নেকড়ের চলাফেরা আছে। আর দু'একদিন আগে নদীর ওপারেই একটা গ্রামের প্রান্তে গরুর-পালে বাঘ পড়ে একটা বাছুর মেরে রেখে ও একটা নিয়ে গিয়েছিল। এসব শুনে আমরা যাকে বলে রীতিমত রোমাঞ্চিত হলাম। পরে শুনলাম দূরের পাহাড়ী জঙ্গলে দলে দলে বুনো হাতি দেখতে পাওয়া যায়। এবার আমাদের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হ'ল। এখানকার ফরেষ্ট রেঞ্জার মশাই একদিন হাতি শিকারের গল্প করলেন ; তাঁর বাড়ীটাও একটা শীকারের মিউজিয়াম ; বন্য পশুদের মাথামুণ্ড ছালচামড়ায় দেয়াল জম্‌জম্‌ করছে। বললেন : মশাই এক আসাম ও হাজারিবাগের জঙ্গল ছাড়া এমন শীকারের জায়গা আমি আর কোথাও দেখিনি।

এখানকার বন জঙ্গলের সঙ্গেও যেমন পরিচিত হচ্ছি, তেমনি অবাক হচ্ছি। কত রকম বিচিত্র গাছগাছড়া তার ঠিক ঠিকানা নেই। একজাতের শালগাছ দেখলাম, যার থেকে পানীয় জল বেরোয় একসঙ্গে প্রায় আধসের-তিন পোয়া। জলটা একটু কষা বটে কিন্তু তৃষ্ণা মেটে। ঝাকড়া বা মওনা বলে এক রকম গাছ আছে যার ফল বেটে জলে

ছেড়ে দিলে জলের মাছের চোখ ফুটে যায়। অশন বা আসন গাছের বন আগেই দেখেছি—এর পাতাও মানুষের খুব উপকারী। এর পাতা কোকুন বা গুটিপোকাদের খেতে দেওয়া হয়। জুয়াঙ জাতিরা আজও এর পাতার পোষাক পরে। গরীব গৃহস্থ এর পাতায় পাত্রে আহার করে। তারপর অতাপি গাছ যা থেকে এখানকার লোকেরা ঝুড়ি তৈরি করে। এসব ছাড়া অনেক রকম ঔষুধী গাছপালা এখানে পাওয়া যায় যেমন চরলা, কালমেঘ ইত্যাদি। এখানকার জঙ্গল থেকে বহুপ্রকার কাঠ বাইরে চালান যায়। রেল লাইনের মধ্যিখানে যে তক্তাগুলো শোয়ান থাকে সেগুলো বেশীর ভাগই ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলের শালকাঠ।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পাশেই যে এক সময় সমুদ্র ছিল তার ভালরকম পরিচয় আমরা একদিন পেলাম। বুড়াবলাঙ্গার ধারেই চুনা পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে আমরা কতকগুলি খুব প্রকাণ্ড ও ভারী ঝিনুকের গোলার মত দেখতে পেলাম। যার খোলা সেই সামুদ্রিক প্রাণীর নাম হ'ল Ostrea, এরা মেরুদণ্ডহীন ও এদের বয়স অনেক হাজার বছর। আজ এদের কঙ্কাল আমরা চুনা পাথরের মধ্যে স্তরিভূত হয়ে আছে দেখতে পেলাম। এক জায়গায় এক সঙ্গে অনেকগুলি জড়াজড়ি করে চুনা পাথরের-সঙ্গে আঁটগাঁথুনি হয়ে গিয়েছে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গা থেকে ঠুক্‌ ঠুক্‌ ঠকাঠক্‌ শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে এক কুমোর গাঁয়ে হাজির হলাম। দেখি নরম মাটির পাত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেটান হচ্ছে, চিকন্‌ করা হচ্ছে, টপ্‌না কাটা হচ্ছে। ঘরে ঘরে ঘুরছে চাকি আর তার ওপর ম্যাজিকের মত গড়ে উঠছে কত রকমের পাত্র পাত্রী। একটি কুমোর-ঘরের দাওয়ায় বসে আলাপ জমালাম। বাপ মা, আর ছেলে, বৌ, নাতি। বাপের নাম লছমন, সে বুড়ো হয়েছে। ছেলের নাম ষষ্ঠী, সে জোয়ান্‌, চাকি চালায়, বললে, বাবু আবার আসবেন।

নিশ্চয়ই গেলাম অনেকবারই তাদের খোঁজ খবর করতে। কেমন করে তারা হাঁড়িকুড়ি গড়ে, কত তাদের রোজগার হয়, সব আস্তে আস্তে জানতে লাগলাম। শীঘ্রই তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। ষষ্ঠীর দুই ছেলে ; বড় ছেলের নাম দশরথ, ছোট্ট কচি ছেলেটির এখনও নাম দেয়া হয়নি, শীঘ্রই নাকি হবে। ক্ষুদে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বললাম, এর নাম রাখো—পঞ্চরথ। ষষ্ঠী এক গাল হেসে বললে, তাই হবে। দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে তাই শুনে ষষ্ঠীর বৌ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সেদিন ছিল মকর সংক্রান্তির আগের দিন। ষষ্ঠীর মা পরিচ্ছন্ন বাটি করে মাংস এনে দিলে, ষষ্ঠীর বৌ মাজা বাসনে চিঁড়েমুড়ি এনে দিলে। সত্যি এরা কত ভাল লোক, গরীব হলেও এরা ভালবেসে দিতে জানে।

তারপর দিন বুঝি মকর সংক্রান্তি ; ঘরে ঘরে ভোজ, কোথাও কীর্ত্তন চলেছে। একদল বাথুরী পালা গান ও নাচ করতে করতে গ্রামে গ্রামে পয়সা তুলছে। সাঁওতালরাও উৎসব বেশে। মাদল ও বাঁশী বাজছে।

আমরা মাঠে বসে গল্প গুজব করছি, বেশ রাত হয়ে আসছে, হঠাৎ দেখি লণ্ঠন ও লাঠি হাতে কারা আসছে। লছমন্‌ ও ষষ্ঠী কুমোর এলো, ঝোলা থেকে বার করলো এক গাদা আলুসেদ্ধ, পিঠে, ঘি, আর গুড়। হেসে বল্লে, বাবু তোমরা সবাই খাবেন। পয়সা দিতে গেলাম, নিলে না। নমস্কার করে চলে গেল। বসে বসে আমরা এদের কথা ভাবতে লাগলাম। শীতের সময় এদের রোজগার মন্দ হয় না কিন্তু গরমের সময় এদের একটা পরিবারের রোজগার মাত্র ৪৲-৫৲ টাকা। হাঁড়িকুঁড়ির বদলে চাল ডাল নুন কিনতে হয়। শিল্পীর জাত বলে এদের আত্মসম্মান আছে কিন্তু কেউ মূল্য দেয় না। কত পরিশ্রম কত কায়দা করে একটি মাটির পাত্র এদের গড়ে তুলতে হয়। লোকে তার দাম দেয় একটি পয়সা মাত্র।

এখানকার সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের যত দেখছি তত ভাল লাগছে। অনেক জায়গায় এদের

দেখেছি কিন্তু এই ময়ূরভঞ্জেই এদের ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। বনের পশুপাখির মত এরা সরল, সুন্দর ও স্বাধীন। এদের সমাজ, সংসার, পূজাপার্ব্বন, ভগবান সবই আছে। কিন্তু তাদের ভাবনা করবার কিছু নেই। সব সময় হেসেই তারা আছে। এদের কাহিনী আজ বলতে সাহস করছি না কারণ অনেকগুলি পাতা জুড়ে এরা বসবে।

এমনি করে নানা আনন্দের মধ্যে আমাদের ছুটি কাটছে। হঠাৎ একদিন আমাদের বাংলোতে ময়ূরভঞ্জের তখনকার দেওয়ান শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এলেন। সকলে মাঠে বসে এক সঙ্গে চা খাওয়া হল, তাঁরা সঙ্গে মিষ্টি ও নিম্‌কি এনেছিলেন। এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের ভাঁড়ারে এমন খাবারদাবার ছিল না যা দিয়ে তাঁদের সংবর্দ্ধনা করি। সেটা তাঁরা আন্দাজ করেই সঙ্গে অনেক খাবার এনেছিলেন এবং উল্টে আমাদেরই খাইয়ে দিলেন। তবুও আমরা লুচি তরকারী করে তাঁদের না খাইয়ে ছাড়লাম না। আমরা বসে গল্প করছি হঠাৎ কাছে পিঠের এক গরীব পাঠশালার ছেলেরা এসে সার বেঁধে দাড়িয়ে দেওয়ান সাহেব র সুখ্যাতি করে প্রশস্তি পাঠ করতে লাগল। দেওয়ান সাহেবের স্ত্রী তাদের সকলকে মিষ্টি খেতে দিলেন ও নিয়োগী মহাশয় কিছু টাকা পুরস্কার দিলেন। এই পাঠশালার মাষ্টারমশাই বড় ভাল লোক। তিনি আবার গ্রাম্য ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টারও।

এর পরের দিনও একজন রাজ অতিথির পায়ের ধুলো পড়লো আমাদের বাংলোয়। তিনি আর কেউ ন'ন, ময়ূরভঞ্জের বিধবা বড় রাণী (৺রাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেওর স্ত্রী)। সম্পূর্ণ পর্দ্দানসীনা হয়ে তিনি এলেন। আমাদের বাংলোর বড় ঘরটিতে প্রস্তর যুগের যে সমস্ত পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র আমরা সাজিয়ে রেখেছিলাম, তিনি সেগুলি দেখলেন। শুনেছি প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পে তাঁর স্বামীর গভীর অনুরাগ ছিল।

কয়েকদিন পরে বেশ গরম পড়ে এলো। রাতে শীত দূরে থাকে, বসন্তের হাওয়ার আমেজ পাওয়া গেল। পাপিয়া ও বেনে বৌ খুব ভোরে ডাকতে লাগল। রং বেরংএর নতুন নতুন পাখীর দেখা মিলতে লাগল। বনতিতির, ঘুঘু, খঞ্জনা, মৌচুষকি, দুর্গা টুনটুনি, ফিঙে কাজলপাতি আরো কত পাখী শাল-মহুয়া বনে সারাদিন খেলা করতে থাকল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাংলোর উত্তর দিকে একটা প্রকাণ্ড শালগাছের আগড়ালে এক জোড়া কলাবিজনা পাখী (Ibiz) এসে বসল।

আমাদের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। তাই টো টো করে ঘোরাটাও আমাদের চতুর্গুণ বেড়ে উঠল। নদীর ধারে ধারে, নীল পাহাড়ের কোলে কোলে, শাল মহুয়ার বনে বনে চল্‌তে লাগল আমাদের অভিযান। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের গায়ে নতুন বাদামী রং ধরল। স্থির করলাম আমরা এখানকার কুঁকুড়া-উড়া (মুরগীর লড়াই) উৎসবটি দেখে তবে যাবো।

উৎসবের আগের দিন হাটতলা বেড়িয়ে এলাম। আজ থেকেই হাটে যেন লোক ধরে না। নানা জিনিষ কেনাবেচা চলছে। পরের দিন সুরু হল কুঁকড়া-উড়া উৎসব। মুরগী নিয়ে বাজিকররা জায়গায় জায়গায় ভীড় বসিয়েছে। জোড়া জোড়া মুরগী বিপুল বিক্রমে লড়ছে আর হল্লা উঠছে। পালকে পালকে ধুলোয় ধুলোয় হাওয়া ঘুরপাক খাচ্ছে, ব্যাপারীরা চীৎকার করে জিনিষ বেচ্‌ছে। এক জায়গায় দেখলুম সাঁওতালী মেয়েদের খুব ভীড়, ব্যাপারীরা তাদের পায়ে মল পরাচ্ছে। সে কি কাণ্ড! পা কেটে তাদের রক্ত পড়ছে, চোখে জল কিন্তু মুখে তাদের হাসি। খুব সেজে গুজে তারা এসেছে, মল পরা হলেই তারা নাচতে যাবে। রাত যত বাড়ছে ভীড় তত বাড়ছে। একদিকে সাঁওতালীরা নাচগান সুরু করে দিয়ে হাটতলা জাঁকিয়ে তুলছে। মাদল, চড়্‌বড়ি, নাগর ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা সব এক সঙ্গে বাজছে। গোল হয়ে পা ফেলে ফেলে হাতে হাত দিয়ে তারা নাচছে।

বেশ রাতে আমরা বাংলো ফিরে এলুম। চেচামেচি ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসতে লাগলো। ঢাকের বাজনা থামল। কেবল মাদল ও বাঁশী বাজতে থাকল। সাঁওতালী মেয়েরা সুর করে গান গাইতে গাইতে দূরের গ্রামে চলে গেল।

অবশেষে কুলিয়োনাতে আমাদের বিদায় রাত্রি এল। ভারি মন খারাপ লাগছে। চাঁদের আলোতে অস্পষ্ট বনভূমি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। শিরশিরে উদাস হাওয়া গায়ে লাগছে, তাতে কচিপাতা ও বন ফুলের মিষ্টি গন্ধ বয়ে আনছে। কুলিয়োনার কাছ থেকে বিদায় নিতে কিছুতেই যেন মন সরছে না। কুলিয়োনার রাঙামাটি, মহুয়া বনের মিষ্টি হাওয়া, আধরাতে হরিণ শিশুর অস্ফুট ডাক, সাঁওতালী বাঁশীর মোহন সুর, কুমোরদের ভালোবাসা ফেলে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে।

পরদিন ভোরে শাল মহুয়া বনে পাখীরা ডেকে উঠল। সোনালী রোদে সবুজ পাতা কাঁপছে। গভীর সুখে প্রকৃতি লীলায়িত হয়ে উঠছে। চলে যাবার সময় মনে মনে কুলিয়োনাকে শুধু বললাম—

আমাদের ভুলিয়োনা॥

চলন্তিকা

সম্প্রতি চীনদেশ থেকে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ এদেশে এসেছে। এটি নাকি চীনের আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। চীনের হোনান প্রদেশের অসংখ্য নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় নিজেদের সন্তানদের পর্য্যন্ত বেচে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে নিজের চোখের সামনে তাদের সন্তানের মৃত্যু হতে দেখেছে। হাজার হাজার লোক খাদ্যের অভাবে বিষাক্ত গাছের শিকড় পর্য্যন্ত খাচ্ছে ও তাতে মারা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে একটি গাছও দেখা যাচ্ছে না, কারণ বুভুক্ষু নরনারীরা সব গাছের শিকড় খেয়ে ফেলেছে। এই কাহিনী যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি করুণ। চীনদেশ যখন জাপানের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হচ্ছে, সেই সময় এই দুর্ভিক্ষ সেখানে ভগবানের অভিশাপের মত দেখা দিয়েছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে হুগলী নদীর উপর নূতন হাওড়ার পুলটি খোলা হয়েছে। এই পুলটির উপর সবরকমের যানবাহন চলাচল এখনো আরম্ভ হয় নি বটে, তবে আশা করা যায় শীঘ্রই হবে। এখন পুলের উপর ট্রামলাইন খোলা হয়েছে ও নিয়মিত ট্রাম চলাচল হচ্ছে। এতে হাওড়া ও কলিকাতার বাসিন্দাদের এবং দৈনিক যাত্রীদের একটা মস্ত সুবিধা এই হল যে, হাওড়ার ট্রামলাইন ও কলকাতার ট্রামলাইন একসঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হল। এই নতুন পুলটি গত চারপাঁচ বছর ধরে তৈরী হতে প্রায় সকলেই দেখে থাকবেন। এই পুলটির একটা বিশেষত্ব এই যে, এটি দোতালা। বাঙ্গলাদেশে দোতালা পুল এই প্রথম।

সম্প্রতি তুরস্ক থেকে যে সাংবাদিক দল ভারতবর্ষে এসে পৌছেছিলেন, কলকাতায় ও নানাস্থানে তাঁদের অভ্যর্থনা হয়ে গেছে। এঁদের উদ্দেশ্য সত্যকারের ভারতবর্ষকে জানা। এঁরা এই অভ্যর্থনা-সভায় কয়েকটি চমৎকার

কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন যে তুরস্কদেশে জাতীয়তার স্থান আগে, ধর্ম্মের স্থান তার পরে। ধর্ম্মের জন্যে সেখানে কোনরকম জাতিবিদ্বেষ নেই। এঁরা কলিকাতা নগরীকে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন নগরীর সমান মর্য্যাদা লাভ করতে পারে।

জার্ম্মাণী গ্রীষ্মে, বর্ষায় ও শরৎকালে বিদ্যুৎগতিতে ককেশাস অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, এখন রাশিয়া সেইরকম কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আঘাতের পর আঘাতে তারা জার্ম্মাণীকে ককেশাস, মস্কো, লেলিনগ্রাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে হটিয়ে দিয়ে এখন ইউক্রেণ অঞ্চল পুনরধিকার করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এই অঞ্চলটির রাশিয়ার একটি শস্যসম্পদপূর্ণ অঞ্চল। জার্ম্মাণী এবছর যে রকম পরাজিত হচ্ছে, তাতে আগামী গ্রীষ্মে তার পক্ষে আর সামলে ওঠা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গত শুক্রপক্ষে জাপানী বিমান পরপর বাঙলার বহু জায়গায় বোমাবর্ষণ করেছে। তাদের আক্রমণের তিনটি প্রধান লক্ষ্য ছিল, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেণী। কলিকাতা অঞ্চলে তারা দু'রাত্রি (১৫ই ও ১৯শে জানুয়ারি) দেখা দিয়েছিল বটে, তবে ক্ষতি করতে এসে বরং তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ছ'টি বিমান ধ্বংস হয়েছে।

নিউগিনির যুদ্ধে জাপান আমেরিকার কাছে পরাজিত হলেও, চীনে সে এখনও তার আক্রমণশক্তি বজায় রেখেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন আশঙ্কা করছেন যে, জাপান শীঘ্রই অষ্ট্রেলিয়ায় একটা বড়রকমের আক্রমণ চালাবে।

এবারে মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা: ক্যাসাব্লাঙ্কায় চার্চিল-রুজভেল্ট ও আদানায় চার্চিল ইনেনু সাক্ষাৎকার। এই দু'টি ব্যাপারই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ; ব্রিটেন ও তুরস্কের এই মৈত্রীতে অনেকে মনে করছেন যে, তুরস্ক মিত্রপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করবে। ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আফ্রিকার যুদ্ধ ও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ। যাহোক, এই দুই সম্মেলনই যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে, বিশেষ করে ইউরোপে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলিকাতা ও দেশের জিনিষপত্রের দাম শুধু সাংঘাতিক রকম বাড়েনি, দুষ্প্রাপ্যও হয়েছে। চাল চিনি চা তেল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের দরদস্তুরে কোন বাঁধুনি নেই। এরপর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত কয়লা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে কয়লা চালানির মালগাড়ি সুবিধামত পাওয়া যাচ্ছিল না। তা যখন কিছু পাওয়া গেল, বিলি ব্যবস্থা ও দামের টানাটানি রয়ে গেল। কয়লার ডিপোতে এক রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হ'ল। টালিগঞ্জে একটি ছেলে সেদিন মারা পড়ল। যারা কয়লার কারবার করেন তাঁদের যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে বটে কিন্তু জনসাধারণ খোদ্দেরের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য ও সৌজন্যতা তাঁরা যেন ক্ষুন্ন না করেন। কাগজের অভাব এখন মেটেনি। পয়সা ভাঙ্গানির গোলযোগ অবশ্য এবার কিছু মিটবে বলে আশা করা যায়। প্রথম ট্রাম কোম্পানি নতুন কুপনের একটা সুব্যবস্থা করেছেন! দ্বিতীয়, ছোট ছোট নতুন একপয়সা বাজারে চালু করা হয়েছে।

ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় লাহোরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি আলিগড় ইউনিভার্সিটিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছেন। পাঞ্জাব আগাগোড়া ভাল খেলেছে।

আমার বন্ধুরা!

নতুনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। মাঘ মাস গেল। বসন্ত কি না এসে থাকতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই নতুন হাওয়া দেখা দিয়েছে। শীতের আর্দ্রতা আর বসন্তের উষ্ণ আমেজ আছে এই হাওয়ার ভিতর। তাই এই নতুনের হাওয়ায় অকারণ খুসিতে আনন্দ জাগে মনে প্রাণে। শীতের অকরুণ স্পর্শে বনে বনে, গাছে গাছে পাতা ঝরা উৎসব সুরু হয়েছিল, আজ সেই শীর্ণ, শুষ্ক ডালে নতুন হাওয়ার কাঁপন লেগেছে। গাছে গাছে জাগছে নতুন পত্র সবুজ, শ্যামল, প্রাণময়। বনে বনে জাগছে আনন্দধ্বনি। এক যায় আর আসে, এই আসা যাওয়া নিয়েই প্রকৃতি, এই নিয়েই জীবন।

কিন্তু আমাদের জীবনে চারিদিকে দেখো—সেই মৃত্যুমুখর সমারোহ, সেই শীর্ণতা, দীনতা আমাদের চারিপাশে। নতুনের হাওয়া আজও তো আমাদের জীবনে এলো না। নতুন হাওয়ার স্পর্শে মৃতের দেশে প্রাণ কি জাগবে না?

বসন্ত যখন আসি আসি করছে তার আগে থেকেই প্রকৃতি নিজেকে তৈরী করে নেয় বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। বনে বনে, পত্রে পুষ্পে, দেখি এই বসন্তের আহ্বান। আহ্বান করলেই কি পাওয়া যায়? চাইলেই কি পাওয়া যায় সব জিনিষ? চাওয়া ও পাওয়ার অধিকারী হতে হয়, গ্রহণ করার দায়িত্ব জাগাতে হয়, নিজের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে সে কথাই বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয়। সুস্থ, সুন্দর জীবন ফিরে পেতে চাই, শোষণ ও অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চাই, মানুষকে দিতে চাই মানুষের সম্মান। কিন্তু দেওয়ার অধিকারী কি আমরা হয়েছি, পাবার অধিকার কি অর্জ্জন করেছি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের নিঃশব্দ ত্যাগ, সংযম ও চেষ্টার ভিতর দিয়ে?

প্রাত্যহিক জীবনে চিন্তায় ও কর্ম্মে নিজেদের তৈরী করো, যোগ্য করো, উপযুক্ত করো। একদিন জাগবে নতুন হাওয়া, সে সুন্দর দিনের জন্য আজ এই অতি দুর্য্যোগে অবিচলিত থেকে প্রস্তুত হতে হবে। বসন্তের বাতাস তোমাদের মনে সেই বাণীই বহণ করে আনছে তা কি শুনতে পেয়েছ?

রংমশালের আলোয়—

…যেদিন প্রথম রংমশাল পেলাম হাতে, সেদিন কি মনে হচ্ছিল জানো? মনে হচ্ছিল, এই রংমশালের মশাল যেন আমরা চিরদিনই জ্বালিয়ে রাখতে পারি।……আমরা হিন্দু-মুসলমান ভাই বোনেরা কেন্দ্র করে, শত্রু মিত্র ভেদাভেদ, দলাদলি ভুলে গিয়ে একত্র হতে পারি। পরস্পরের ভিতর যেন এ কথাই স্মরণ থাকে, আমরা একই মায়ের সন্তান। এই মহান আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে আমরা যেন গৌরব অর্জ্জন করতে পারি। পারুল সেন (কালীঘাট)

…কত আকাঙ্ক্ষা, কত উচ্চাদর্শ, জাতীয়তার দিক থেকে কত মহৎ হবার দাবী করেছ, আমরা তোমার সোণার ভাইবোনেরা যেন তার উপযুক্ত হই, যোগ্য যেন হই এই আশীর্ব্বাদ করো। সত্যিকারের কামনার পিছনে একটা

সত্যিকারের মহৎ আদর্শ থাকে ; আমাদের মনে সেই মহত্বের আদর্শে জাগ্রত করো।…তোমার চিঠির কথাগুলোর মাঝে এমন কিছু পেলাম যা আমার বহুদিনকার স্তিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছে। তোমার চিঠি লিখছি, ৭ই মাঘের আলো এসে ঘরে ঢুকেছে, এমনি করে তোমার প্রেরণা আমাদের মধ্যে আসুক…। সাধনচন্দ্র বসু (কালীঘাট)

লেখনী বন্ধু—যারা নতুন, তারা অনেক সময় লেখনী বন্ধু কি তা সব সময় ঠিক করে উঠতে পারে না। তাই তোমাদের একাধিক পত্রে একই প্রশ্ন পাই। চিঠিপত্রের মারফৎ গ্রাহকদের ভিতর বন্ধুত্ব পাতানোই লেখনী বন্ধুর সূত্রপাত। দূরের বন্ধু যারা তাদের সঙ্গে হয়তো সামনাসামনি পরিচয় কোনদিনও হবে না, তবু সেই দূরত্বটাকে সীমার মাঝে টেনে আনতে পারে—এই লেখনী বন্ধু। একে অন্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের বিনিময় করতে পারবে, তাছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে, যেটা অত্যন্ত দরকার। বোনেদের সঙ্গে বোনেরা, ভাইদের সঙ্গে ভাইরা বন্ধুত্ব করবে। নাম ও তিন পয়সার ডাক টিকিট পাঠালেই বন্ধু পাঠান হয়।

তোমাদের চিঠির উত্তর—

অক্ষয়কুমার (গ্রাঃ ১৪০৭ মেদিনীপুর) তোমার নির্ভুল হলে আমাদের বা পোষ্টাপিসের ভুলও হতে পারে তো ? রাগ করেছ কেন ? ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি থাকবে ? কাগজের অভাব—আমার স্থানটা নাকি ছেড়ে দেবো ?

রেখা বসু—(১৩৩৬ কিষাণগঞ্জ) ওখানে দল গঠন করছ জেনে সুখী হলাম কিন্তু দল গড়াটাই প্রধান কাজ যেন না হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কাজ করবার চেষ্টা করো, অন্ততঃ মেয়েদের ভিতর। সে কাজের কথা কি আমায় বলে দিতে হবে ?

সাধনচন্দ্র বসু (৩৫২৩ কালীঘাট)—তোমার চিঠি ও কার্ড পেলাম। অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করবো।

অপূর্ব্বনারায়ণ মজুমদার (নদীয়া)—দু' বছর চিঠি দিয়েও আমার কাছ থেকে জবাব পাওনি ? আমার মনে হয় এমন অন্যায় কাজ আমি কখনও করিনি ! তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেই তো প্রতি মাসে হাজির দিই এই ডাকবাক্সে।

মায়ারাণী মিত্র (বর্দ্ধমান—১৪৬৩)—তোমারও অভিযোগ—পোষ্টকার্ডে লেখা চিঠির জবাব আমি দিই না ? আমি তো জানি সব রকম চিঠির জবাবই আমি দিই। গল্প যথাস্থানে গেছে। ইন্দিরাদিকে রান্না ও সেলাই সম্বন্ধে লিখতে বলেছ, জানাবো তাঁকে। যখন আসবেন ঐ সম্বন্ধেই তিনি বলবেন। তাঁর ঠিকানা ? রংমশাল অফিসেরই ঠিকানা—দিদিভাইএর পাশের বাড়ী বা পাশের ঘরেই থাকেন—তা বুঝি জানো না ?

নেপাল মুখোপাধ্যায় (১৪৯২ বাঁকুড়া)—তোমার প্রশ্নের উত্তর তো প্রথমেই দিয়েছি। 'তুমি' তেই আমি বেশী খুসী হই।

আশীষ দত্ত (শ্রীহট্ট ১৫৬৯)—পৃথিবীতে ভালো ভাষা কোন্‌টা, এই প্রশ্ন করে তুমি জবাব চেয়েছ কিন্তু ভালো ভাষা বলতে তুমি কি বোঝ সে কথার জবাব আমায় আগে জানাতে হবে যে।

গীতা ঘোষ (৩৩৫—বালিগঞ্জ) কেন তোমায় চিনবো না ? তোমার বাবা একজন অধ্যাপক না ? এতদিন রংমশালে আছ অথচ এ মহলের দিকে পা বাড়াওনি যে ? কার সঙ্গে ভাব করতে চাও ?

সত্যেন্দ্রনাথ কাঞ্জী (১৮৭৪—বাঁকিপুর) বিচারকের কাছে কবিতা গেছে। এক সময় ইচ্ছা হয় তোমাদের মত আমি যদি গল্প কবিতা লিখতে পারতাম। একদিনেই কেউ স্বনামধন্য হয় না। সাধনাতেই সিদ্ধি আসে একথা সর্ব্বদা মনে রেখো।

পারুল সেন (কালীঘাট) তোমার দীর্ঘ চিঠি মন দিয়ে পড়লাম। টিকিট পাঠালে শিবানী ঘোষ ও রহিমা খাতুনের ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো। আমার ফটো ? তা তো তোমাদের মনের ভিতর রয়েছে। নিজের দিকে তাকালেই আমায় দেখতে পাবে।

পরি, সুহাস ও বিমল রায় (১৮৬৬ মন্দির বাজার) 'মন্দির বাজার' মণির বাজারে পরিণত হয়েছে ছাপার ভুলে। ছাপাখানার বড় ভূতের দৌরাত্ম্য, জানো না বুঝি ? আর 'মণি'র দাম অনেক তাতো জানো ? পরি ! তোমার লেখা যথাস্থানে গেছে। তোমরা নাম জানিও লেখনী বন্ধুর, তাতে আমার সুবিধা হয় ভাই। প্রীতি নিও সকলে।

ইতি—শুভার্থিনী

দিদিভাই

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌টাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

নূতন ধাঁধা

[By courtesy of the little Lady Cleopatra]

না ভাবছ ওরে বাবা সে হয় নাকি ? খুব হয়, চেষ্টা করলে কি না হয়। প্রতি অক্ষরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ধরে তা প্রমাণ করা যায়। যে অক্ষরে যে সংখ্যাটি ধরবে তার অদল বদল করবে না। শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসে যাও আর কষে বার করো কোন্ অক্ষর—কত সংখ্যা ধরলে এই ধাঁধাটির সমাধান করা যায়।

[খুব চেষ্টা করেও যদি না পারো, তাহলে তোমাকে চুপি চুপি বলে দিচ্ছি—ঘ=৭ ধরলে ধাঁধাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।]

সংখ্যাক্ষর সমস্যা

ন ব জ ল
জ ল র ব
ঘ ন ব ন

—অর্থাৎ, নবজল এবং জলরব যোগ করলে ঘনবন হয়। কিন্তু কেমন করে হয় বলতে পারো ?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

২৫২টি গরু

নির্ভুল উত্তর দাতাদের নাম—

বিমান, বাপ্পা, বাচ্চু ও আশীষ দত্ত, শ্রীহট্ট ; গিরিন্দ্রনাথ রায়, নৈহাটি ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া ; অমল, সুধীর, নীতু ও অধীররঞ্জন দাস, বরিশাল ; প্রতিভা নিয়োগী, ময়মনসিং ; সতীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, পাটুলী, বর্দ্ধমান ; অরুণা দাসগুপ্তা, বরিশাল।

দুইখুনী

উপহারের সুন্দর বই

পশুপাখীদের সুখ-দুখের কথা

দাম মাত্র বারো আনা

রংমশাল কার্য্যালয়

৯১।১১এ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা

বড় বড় পুস্তকের দোকানেও পাওয়া যায়

কারিগর—শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বল্গা হরিণ

রংমশাল

সম্প্রতির সৌজন্যে

বঙ্গশান

অষ্টম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

চৈত্র
১৩৪৯

তৃপ্তি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মান, যশ, উচ্চপদ, ধনরত্ন-খনি
যদি কিছু না জুটে জীবনে,
আপনারে হতভাগ্য তবু নাহি গণি,
তবু ভালবাসি এ ভুবনে।
দুর্লভ বিধির দান এ ইহজীবন
জীবনই বা ক'দিনের তরে!
সেটুকুর উপভোগে এত আয়োজন!
এত ভার সে জীবন'পরে!
জন্মাবধি নীলাকাশ তারকা-খচিত,
পূর্ণিমার চারু চন্দ্রালোক
বনশ্রী পুষ্পিত শ্যাম শোভায় রচিত
আজো মোর জুড়াতেছে চোখ।

মেঘের গম্ভীর মন্দ্র, বিহগের গান,
তটিনীর মৃদু কলস্বন,
অলিগুঞ্জ আজো মোর জুড়াতেছে কাণ,
আজো কেহ নয় পুরাতন।
গাহন গহন নীরে, সুরভি সমীর,
বটচ্ছায়া শীতল মধুর,
স্নিগ্ধ স্পর্শে আজো মোর জুড়ায় শরীর,
আজো মোর শ্রান্তি করে দূর।
পয়োধরে রবিকরে দান বিধাতার
পুষ্পে ফলে রয়েছে সঞ্চিত,
অফুরন্ত নিত্য নব বৈচিত্র্য তাহার
এই দানে কে করে বঞ্চিত ?
সুলভ বিধির দান দুর্লভ জীবনে।
হ্রদনীরে মীনের সমান,
তার মাঝে আছি আমি, রাশীকৃত ধনে,
এর বেশি কি করিবে দান ?
নিরুদ্বেগ উপভোগ তৃপ্তি সুখময়
স্বল্প শ্রমে প্রচুর বিশ্রাম,
অযাচিত পাই বলি, তুচ্ছ তাহা নয়,
জানি আমি তার কত দাম।

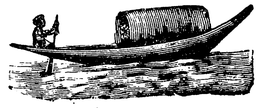

দশম অধ্যায়

ভারতবর্ষে

তৈমুর আজ বনস্পতির মত ; তাঁর মাথা-ছাড়িয়ে উঠেছে আর সকলের মাথার উপরে।

আশপাশের রাজা-রাজড়ারা ভয় পেয়ে একসঙ্গে জোট বাঁধলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবীণ হচ্ছেন বোগদাদ এবং মিশরের সুলতান।

বোগদাদ প্রাচীন সহর, তার প্রতিষ্ঠা ৭৬৩ খৃষ্টাব্দে। আরব্য-উপন্যাসে অমর হারুণ অল্ রশিদের রাজধানী রূপে বোগদাদ সুখ-সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ ক'রেছিল। তৈমুরের সময়ে বোগদাদের সুলতান ছিলেন আমেদ।

সুলতান আমেদ জানতেন, বোগদাদের ঐশ্বর্য্য তৈমুরকে লুব্ধ ক'রে তুলবেই। তাই তিনি আগে থাকতেই তৈমুরকে খুসী রাখবার জন্যে দামী দামী ভেট পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু তৈমুর কি এত সহজে খুসি হবার ছেলে ? হাত বাড়ালেই যেখানে সাত রাজার ধন মাণিক পাওয়া পাওয়া যায়, সেখানে দু-একখানা রঙিন কাঁচের টুক্‌রো পেয়ে তুষ্ট হতে পারে কে ? তৈমুর বোগদাদ দখল করবার জন্যে যাত্রা করলেন।

যুদ্ধ অবশ্য হ'ল। কিন্তু সুলতান আমেদ ছিলেন সৌখীন ব্যক্তি। ফুলের বাগানে আরামে ব'সে ঠাণ্ডা সর্ব্বৎ পান করতেন আর কবিতা লিখতেন। জন্ম-যোদ্ধা তৈমুরের সামনে দাঁড়িয়ে তরবারি চালনা করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের নামে হ'ল প্রহসনের অভিনয়। সুলতান দারুণ আতঙ্কে অন্তঃপুরের ছেলেমেয়েদের পিছনে ফেলেই সিরিয়ার মরুভূমি পার হ'য়ে দামস্কাস সহরে গিয়ে হাজির হ'লেন। দামাস্কাস তখন মিশরের সুলতানের অধীন।

তৈমুর সমরখন্দে ফিরে এলেন। কিন্তু এত বড় হ'য়েও তিনি তৃপ্ত হ'তে পারলেন না—তাঁর মন তখন হারিয়ে গিয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীমতার মধ্যে।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভারতবর্ষ।

প্রধাণ প্রধাণ সর্দ্দারগণের ইচ্ছা নয় যে ভারতবর্ষে যান। এমন কি তৈমুরের পৌত্র মহম্মদ সুলতানও বললেন, "ভারতের পথে অনেক বাধা। প্রথমত, বড় বড় নদী ; দ্বিতীয়ত, দুরারোহ পর্ব্বত ও দুর্ভেদ্য অরণ্য ; তৃতীয়ত, বর্ম্ম-ধারী সৈন্য ; এবং চতুর্থত, নরহত্যাকারী হস্তীদল।"

একজন ভারত-ফেরৎ ওমরাও বললেন, "ওখানকার জলহাওয়া ভারি খারাপ, আমাদের সৈন্যেরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন হ'য়ে পড়বে।"

কিন্তু আর একদল বললে, "ভারত হচ্ছে রত্নাকর। ভারতের ঐশ্বর্য্য পেলে আমরা বিশ্বজয় করতে পারব।"

আর একদল বললেন, "ভ্রমণকারী ইবন বতুতার মতে পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজা আছেন ছয়জন: কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট, চীনের সম্রাট, তাতারের অধিপতি, বোগদাদের নরপতি ও মিশরের সুলতান। আমীর তৈমুর যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে চান তবে তাঁকে এঁদের সকলকে বশীভূত করতে হবে।

তৈমুরেরও মনের বাসনা তাই। অনন্ত আকাশে থাকে একমাত্র সূর্য্যই। তিনিও হ'তে চান দুনিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা। এর জন্যে পৃথিবী যদি রক্তে ডুবে যায়,—ডুবে যাক্। সে রক্তসাগরে সাঁতার দেবার শক্তি তাঁর আছে।

তৈমুর বললেন, "আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করব। ভারতের ধনরত্ন এনে আমি সমরখন্দের পায়ে ঢেলে দেব। আমি তাতার যোদ্ধা, আমাকে বাধা দেয় কে? তাতারীর তরবারি হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তরবারি। তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস কর না?"

উৎসাহিত হ'য়ে সর্দ্দারেরা একবাক্যে বললেন, "হাঁ প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি।"

—"তবে প্রস্তুত হও।"

এক লক্ষ তাতার যোদ্ধা বিপুল আগ্রহে রণসজ্জায় সজ্জিত হ'তে লাগল।

যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার জন্যে এত পরামর্শ, এত আয়োজন, তার অবস্থা কল্পনাতীত রূপে শোচনীয়।

আর্য্য ভারতবর্ষের অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধনের শৌর্য্য কাহিনী তখন অতীতের সুখস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। মুসলমানরাও এসে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাও তখন জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। তোগলক বংশীয় উন্মত্ত সম্রাট মহম্মদের খামখেয়ালীতে সাম্রাজ্যের গৌরব-সূর্য্য হয়েছে অস্তমিত। তিনি জীবিত থাকতেই সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা আরম্ভ হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ফিরোজ শা (১৩৫১—৮৮ খৃঃ) বুদ্ধিমান ও সুশাসক হয়েও এবং প্রাণপণে চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যকে অধঃপতনের কাল থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফিরোজ সার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য গেল রসাতলে।

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে বিদ্রোহী মুসলমান ও হিন্দু যোদ্ধারা ছোট-বড়-মাঝারি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করলেন। দিল্লীর সম্রাট বলতে আর ভারতের সম্রাট বোঝায় না—দিল্লী তখন ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র। ভারতের একাধিক রাজা তখন দিল্লীর অধিপতির চেয়ে শক্তিশালী। ধরতে গেলে দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজ্য বা শক্তি তখন সীমাবদ্ধ ছিল দিল্লী নগরের চার দেওয়ালের মধ্যেই। মোগল সাম্রাজ্যেরও শেষদিকে দিল্লীশ্বরের অবস্থা হয়েছিল এই রকম।

তখনো ভারতবর্ষে কয়েকটি ছোট-বড় রাজ্য ছিল। কিন্তু সেগুলি দিল্লী থেকে এতদূরে অবস্থিত ছিল যে, পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোনরকম সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। অথচ ভারতীয় রাজনীতির প্রধান রঙ্গমঞ্চই ছিল পশ্চিম ভারতবর্ষে—কারণ সেকালে ঐখানেই ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে বারংবার। এবং একমাত্র এই কারণেই দিল্লীশ্বর তখনো ছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি।

দিল্লীশ্বরের আমীর-ওমরাওরা যখন আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঘরোয়া বিবাদে নিযুক্ত, আচম্বিতে তখন সংবাদ এল, দিগ্বিজয়ী তৈমুরের আবির্ভাব হয়েছে ভারতবর্ষে।

তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ সিন্ধুনদ পার হয়েছেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্যেরা পরাজিত হয়ে মুলতান নগরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেও আত্মরক্ষা করতে পারে নি। পীর মহম্মদ মুলতান অধিকার করেছেন (১৩৯৮ খৃঃ)।

এর পরে যে রক্তাক্ত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল, আগামী বারে তা বর্ণনা করব।

ক্রমশঃ

ঘগাতীরের যুদ্ধ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাবণ দিব্যি ছাড়া পেলো দেখে বিভীষণ ভাবছেন, এখন রাম ভজি না রাবণ? বানররাও ভাবছে, তাইত এখন কোন দিকে যাই? রাম ভাবছেন, লক্ষ্মণকে কেমন করে বাঁচাই?

খুনের দায়ে পড়েছে লক্ষ্মণ
দেখ কিবা ঘটালো অলক্ষণ
অঘটন ঘটল পটীয়সী মায়া
বলে এসে, হারালাম ভায়া আর জায়া
কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী,
রাক্ষসের দেশে এসে ধনে প্রাণে মরি।

এই ভাবছেন আর লক্ষ্মণকে কোলে করে কাঁদছেন রাম, এমন সময়—

রামেরে সুষেন কন জোড় হাত করি—
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি।

রাম বল্লেন—"পরীক্ষা করে দেখ বাঁচে যদি লক্ষ্মণ।"

হনুমান অমনি কেঁদে বলছেন—"লক্ষ্মণ গেলে রাম যাবে, রাম গেলে হনুবন!"

সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি সবাই কেঁদে বল্লেন—"হায় হায় বড় মার মেরে গেল রাবণ।"

তখন সুষেণ বলছেন লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করে—

"হৃদয় সুস্থির আছে নির্ম্মল লোচন
লক্ষণে বুঝা যায় মরিবেনা লক্ষ্মণ।
সাবধানে শেলটা করা চাই মোচন
বন্ধ করা চাই রক্ত মোক্ষণ।"

শুনে জাম্বুবান বল্লেন—"আরে মশয়, শেল ওপড়ালে যে আরো রক্তপাত হবে।"

—"আরে আমি আছি কি করতে। বার করনা আস্তে-আস্তে শেলটা টেনে তোমার বড় বড় নখে ধরে!"

—মশয়, এ কি চোর কাঁটা পেলেন, আমি ও ছুঁতে পারব না।"

সুগ্রীব একবার শেলটা ধরেই বল্লেন—"নাঃ, এ যে নড়েনা!

বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি,
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি।
সাহস করিয়া হনু নাহি দেন টান,
টানের চোটে পাছে যায় লক্ষ্মণের প্রাণ।
টানিতে হনুমান না পান সাহস
"যার টানে প্রাণ যাবে তারি অপযশ।

বলে হনুমান "রাম হারলাম" বলে টান ছাড়লেন। তখন রাম ধনুক-বান সুগ্রীবের হাতে দিয়ে একেবারে—

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে শেলে দিল টান—
উপড়িয়া শেল পাট কৈল খান খান।

সুষেণ অমনি বেলসুঁটোর: বেলেস্তারা লক্ষ্মণের বুকে চাপিয়ে—গাঁদাল পাতা, গাঁদাল পাতা—বলে গন্ধমাদনের দিকে হাত বাড়াতে গন্ধমাদন বল্লেন—"যে কটা পাতা ছিল আপনার আমাশয়ে লাগিয়ে দিয়েছি।

—"বাস্ আমার মাথা খেয়েছো!

এখন গিরি গন্ধমাদনে যাও এই রাতে,
যদি চাও লক্ষ্মণে বাঁচাতে।
রাতের মধ্যে পাতা আনো তো সহজে বাঁচাই,
রাত পোহালে বাঁচাতে শিবের সাধ্য নাই।
প্রাণ যাবে সূর্য্য তেজে এই বুঝে সুঝে
পাতা আনতে যাও! ভাব কি চক্ষু বুজে?"

গন্ধমাদন বল্লেন—"কোথা গিরি গন্ধমাদন, কোথা রাবণ পুরী
যেতে পারি আসা শক্ত রাতের মধ্যে ঘুরি।"

রাম বল্লেন—"লক্ষ্মণের না দেখি এবারে অব্যাহতি
এত দূরে যেতে আসতে পোহাবে চার ঘটি।
কেনে বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে!
লক্ষ্মণ মরিলে কি হবে ঔষধে!"

তখন পবননন্দন বলছেন—"স্থির হন প্রভু, শান্ত কর মন
এ রাতে ঔষধ আনি জীয়াবো লক্ষ্মণ।"

তখন সুষেণ বলছেন—"দেখ নীল বর্ণ ফল ফুল শিম বর্ণ পাতা,
রাঙা বর্ণ ডাঁটা গাঁদালের লতা—
পাতার আগায় শিং আছে নয়টা।"

—"মশায় অত আমি চিনতে পারব না, গন্ধমাদন শুদ্ধ এনে দিচ্ছি, পাতা বেছে নেবেন।"

—"ভাল, গন্ধে ধরে নেবো, যাও তো তুমি এখন।

সুগ্রীব বল্লেন—"পারবে তো হনু?"

রাম বল্লেন—"পথ আঠারো বৎসর
আসতে কি পারবে রাতের ভিতর?"

হনু বল্লেন—"তোমার দয়ায় দেব ঔষধ আনি।"
এত বলি মহাবীর দিলেন উঠানি
রাত্রি তখন এক প্রহর যায় যায় জানি।
উভলেজ করিয়া সারিল, দুই কান—
রামজয় দিয়া চলিল হনুমান।
দুর্জ্জয় মহাবীর চলে অন্তরীক্ষে
গায়ের বাতাসে ঝড় পাথরে বিরিক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে থাকি রারণ নিরীক্ষে।

রাবণ বলছেন—"ও মামা, একি দেখি?"
কালনেমি বলছেন—"কি দেখলে বাবা, ভূতটুত নাকি?

অনেকে মরেছে অনেক হয়েছে অপঘাত
বিস্ময় নয় যে হয় ভূতের উৎপাত।

—"মামা, ভূত নয়, পবনের সুত ওষুধ আনতে যান গন্ধমাদনেতে, করি অনুমান।"
—"যাক না তাতে ভয় কি?"
—"মামা, ভয় খুব আছে। রাতের মধ্যে ওষুধ যদি আসে, লক্ষ্মণ যদি বাঁচে!"
—"তা বাঁচাতে পারে বাঁচাক না, তোমার কি তাতে।"
তখন রাবণ রেগে বলছেন—"কোন মতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে।"

কালনেমি বলছেন—"তা আমাকে ধমকাও কেন বাবা? আমি হাজির আছি, যা করতে হয় বল করি।"
স্থির হয়ে তখন রাবণ বলছেন—

"চিরদিন করি মাতুল ভরসা তোমার
আজি মামা কর কিছু তুমি উপকার।
গন্ধমাদনেতে যেয়ে করহ উপায়—
যাতে বানরা বেটা ওষুধ না পায়।
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর,
এই ভার দিলাম তাই তোমার উপর।"

মামা বল্লেন—"ভার দেবার বেলায় ত দিলে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত মামাকে একটা নতুন সামা তো দিলে না, জামা জোড় না হয় নাই দিয়েছ।"

—"আহা মামা, যাও, কাজটা কর উদ্ধার
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য জানিও তোমার।"

—"আহা তা তো জানি, অর্দ্ধেক ভাগ আমারই আছে,
তুমি না দিলেও আছে—
কিন্তু বাপু কোন যুক্তি খাটবে না ঘরপোড়ার কাছে।
যেতে পারি—
কিন্তু ভয় করে ভারি।
বানর প্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ
নিকটে পাইলে কিলায়ে ফাটাবে ঘট।
আমি মলে লঙ্কার কে খাবে অর্দ্ধেক—
এই ভেবে আমার লাগিতেছে ঠেক।"

রাবণ চোখ পাকল করে চাইতেই মামা বলছেন—

"কর বাবা ক্রোধ সংবরণ।
তোমারই ক্ষতি মরে যদি তোমারই মামা—
অষ্ট বাহু, চারি মুণ্ড, অষ্টলোচন।"

—"তবে এখন সুযুক্তি কন।"
—"রও বাবা, হাতে কলমে কর তো আগে চুক্তি লিখন।"

—"এই নাও, অর্দ্ধ লঙ্কা লব ডঙ্কা লিখে দিলাম চুক্তি।"
—"তবে শোনো এখন রাবা ভেবেছি যা যুক্তি।
গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি
গন্ধকালী হ্রদে এক আছে কুম্ভীরাণী।
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান
সরোবরে কুম্ভীরের না রাখে সন্ধান।
উহার আগে যাবো আমি তপস্বীর বেশে,
মায়াতে আশ্রম পাতি বসিব হরিষে।
হনুমান গেলে তার করিব আদর,
স্নানকালে দেখায়ে দিব সেই সরোবর।
তারপরে যদি থাকে অদৃষ্টের লেখা,
কুম্ভীরে খাওয়ায়ে হনু, আমি ফিরব একা।
চুক্তি লেখা হয়েছে, পরে মত পালটিও না বাবা!"

রাবণ বল্লেন—"আগে তো বধিয়া হনু আইস মম আগে
লঙ্কাপুরী লবে তখন আধাআধি ভাগে।"

—"এই কথাবার্ত্তা কয়ে এদিকে গেল মামা, ওদিকে গেল ভাগিনা।
তারপরে যা হল তার ভাষ্য,
ক্রমশঃ প্রকাশ্য,
পুঁথি হারাই তো থেকে যাবে অপ্রকাশ্য।"

এই বলে তাকের পরে পুঁথি রেখে চাঁইবুড়ো গন্ধবণিকদের বাড়ি ভোজ প্রবন্ধের চেষ্টায় গেলেন।

পাগ্‌লামির মহৌষধ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বিখ্যাত সাহিত্যিক অমুক চন্দ্র অমুক অত নম্বর ঠিকানা হইতে জানাইয়াছেন যে আমাদের 'মোক্ষম্ রসায়নের' এক শিশি মাত্র সেবন করিয়াই তাঁহার পাগ্‌লামি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে—এই ধরণের একটা বিজ্ঞাপন, ট্রামে কিম্বা বাসে, খবরের কাগজে কিম্বা পিএম্‌বাকুচীর পাঁজিতে, সিনেমা স্লাইডে কিম্বা ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্ম্মে, কোথাও না কোথাও হয়ত তোমাদের নজরে পড়ে থাক্‌বে।

বলাবাহুল্য, উক্ত অমুক চন্দ্র অমুক আর কেউ না, স্বয়ং আমি। তবে বিখ্যাত সাহিত্যিক আমি কোনোদিনই ছিলুম না। অন্ততঃ ওই বিজ্ঞাপনের আগে তো নয়ই। যদ্দুর জানা যায়, যত জনা আমার বই পড়েছে তার চেয়ে তার বেশি, হাজার গুণ বেশি লোক, ট্রাম বাসে চড়ে, খবর কাগজ পড়ে, পাঁজি ওল্‌টায়, সিনেমা দ্যাখে আর হাওড়া শেয়ালদায় দৌড়াদৌড়ি করে' থাকে। তারা সবাই ওই বিজ্ঞাপন পড়েছিল। আর বল্‌তে কি, তার ফলেই এই যা একটু আমি বিখ্যাত হয়েছি। আমার প্রশংসাপত্রে ওষুধটার কিছু সুবিধা হয়েছিল কি না জানি নে তবে ঐ বিজ্ঞাপনের দৌলতে আমার বইয়ের এক আধটু চাহিদা হোলো।

কিন্তু পাগ্‌লামি আমার ছিল কি না, কিম্বা থাক্‌লেও সেরেছিল কি না, সম্পূর্ণরূপেই সেরে গেছে কিনা সে কথা আমি বল্‌তে পারব না। যদি বলো যে পরের টাকার প্রত্যাশা করাটাই পাগ্‌লামি তাহলে বল্‌ব—মাসি কি কারো পর? মাসি যে মার চেয়েও আপনার গো!

এই যুদ্ধের কিছুদিন আগের কথা বল্‌ছি। সেই সময়ে আমি একটা পাব্‌লিসিটির আপিসে বিজ্ঞাপনের কপি লেখার কাজ করতাম। (জীবনে কতো দুর্গতিই যে গেছে!) ঘি-তেল, সন্দেশ, ওষুধ, বিস্কুট্-বার্লি লোহা-লক্কর সব কিছুর বিজ্ঞাপনই আমাকে লিখতে হোতো। ওটা ছিল আমার গল্প লেখার উপ্‌রি কাজ। সারাদিন যে কামার শালায় হাতুড়ি পেটে, সেও যেমন সন্ধ্যাবেলা তাস পিট্‌তে বসে—আহা, তারও তো এক সময়ে ব্যায়াম করা দরকার!—আমারও তেম্‌নি, এই কাজটা, গল্পলেখার ওপরে হলেও, এতে দস্তর মত এক্‌সারসাইজ্ হোতো। তাসখেলার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। প্রথম বিজ্ঞাপন লেখার কাজ আমার হাতে এল ঐ মোক্ষম্ রসায়নের মারফতে। অতএব ওকেই প্রথম এক হাত নিলুম। প্রচারের সবচেয়ে বড়ো আর্ট্ আত্মপ্রচার, কাজেই ওষুধের সঙ্গে নিজেকেও জাহির করতে ছাড়লুম না। রথদেখার সাথে কলাবেচার এই সুযোগে যে নিজের অর্থনাশ নিজেই ডেকে আন্‌ছি তা যদি আমি জান্‌তাম! উক্ত মহৌষধ না খেলেও ওর সাহায্যে যে আমারও পাগ্‌লামি সারবে তা কে ভাব্‌তে পেরেছিল!

তারপর এইতো সেদিন, শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা। আমার বন্ধু শশাঙ্ক। এক রেস্তরাঁয় বসে চা খাচ্ছি শশাঙ্ক এসে উদয় হোলো। তাকে দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লাম, "ভাই, জীবনে ছোটখাট ব্যাপারে যা বিপর্য্যয় আনে বড় বড় কাণ্ডও তার কাছে লাগে না। এমন কি এত বড় যুদ্ধও তার কাছে কিছু নয়!"

"যাও, তোমাকে চা খাওয়াতে হবে না।" শশাঙ্ক রাগ করে বল্ল: "সামান্য এক কাপ্ চা খাওয়াবে তার জন্য এত ভণিতা!"

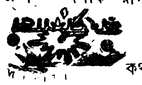

শশাঙ্ককে দেখে সশঙ্কিত হইনি, বলা কথা তাকে বল্লাম। বল্লাম: "তোমার কথা বল্‌ছি না। আমার এক মাসির কথাই বল্‌ছি। তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। থাক্‌বার মধ্যে এক বোন্‌ঝি—আমাদের বিনি—আর তস্য ভ্রাতা শ্রীমান্—"

"বুঝেছি।" বল্ল শশাঙ্ক : তস্য ভ্রাতা কে বুঝতে পেরেচি। আর বল্‌তে হবে না।"

"আর অগাধ টাকা। তিনকুলে থাকবার মধ্যে এই। মাসির বয়েস প্রায় সত্তর আর গত পনের বছর ধরে তিনি শয্যাগত। মৃত্যুমুখে উপনীত হয়ে রয়েছেন, বল্‌তে কি! কখন্ যান্ কিছু ঠিক নেই। থাকলেও খুব দূরে নয়, কাছাকাছিই, এই তারকেশ্বরে। নিজেও যেমন সেকেলে, তেম্‌নি এক সেকেলে জরাজীর্ণ অট্টালিকায় বাস করেন। একালের সব কিছু তাঁর দুচোখের বিষ। আজকালকার নভেলে যেসব মেয়েদের দেখা যায় তাঁদের ওপর তিনি হাড়ে চটা। সে যুগের ঠাকুমাদের দেখেচ কি? আমার মাসিমা তাঁদেরই এক রানী সংস্করণ। তাঁর ডাক্তার—গঙ্গারাম কী যেন নাম তাঁর—তিনি আবার আমার মাসির চেয়েও বয়সে বড়ো। দেখলে মনে হয় বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছেন।"

"ইয়া ইয়া দাড়ি গোঁফ?" শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলে।

"ইয়া দাড়ি, ইয়া গোফ! আর তাঁর চিকিৎসাও তেম্‌নি সেকেলে ধরণের। তাঁর চিকিৎসা গুণে মাসিমা গত পনের বছরে বিছানা থেকে একবারও নড়েছেন কিনা সন্দেহ। কেউ তাঁকে একদিনের জন্যও রুগ্নকক্ষের বাইরে আসতে দ্যাখেনি।"

"তা যাই হোক্, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে তো ঠিক! চিকিৎসার বাহাদুরি আছে বই কি!"

"কাজেই আমিই মাঝে মাঝে গিয়ে মাসির সঙ্গে দেখা করে' আসি। মাসির আর হয়ে ওঠে না, এই দু'মাস আড়াই মাস অন্তর। কি করব, রুগ্ন মাসির দেখা শোনা তো করতেই হয়।—"

"মাসীর অনেক টাকাকড়ি আছে বলে না?" শশাঙ্ক জিজ্ঞেস্ করে। "মাসী মারা গেলে তোমরাই পাবে তো?"

"আহা, সেইজন্যেই যাই নাকি! তাই তুমি বলতে চাও?" আমি আহত কণ্ঠে বলি : "অবশ্যি মেসোমশাই যেসব শেয়ার্ কিনে রেখে গেছেন, এই যুদ্ধের দরুণ তাদের অনেকগুলোর দর এখন ভয়ঙ্কর চড়েছে সন্দেহ নেই, তাছাড়া থোক্ দশ বিশ হাজার নগদ যে নেই তাও নয়, কিন্তু তাই বলে' আমাকে অতটা স্বার্থপর তুমি ভেব না। অত টাকাকড়ি না থাক্‌লেও মাসিকে দেখতে তবুও আমি যেতাম। তবে কি না, সময়াভাবে গত পাঁচ ছ মাসের মধ্যে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

"তোমার সময়াভাব?" শশাঙ্ক অবাক্ হয়ে যায়।

"ভারী আমার সময় দেখেচ! বলে, ভাব করবারই সময় পাচ্ছিনে! কিন্তু সে কথা যাক্। হয়েচে কি, কাল হঠাৎ সেই মাসীর এক চিঠি এসে হাজির। তিনি দিনকতর জন্য কলকাতা আস্‌চেন। আমাদের বাসায় উঠ্‌বেন লিখেচেন।"

"তিনি শয্যাগত না, বল্লে না তুমি?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করে।

"শয্যাগতই বই কি!" আমি জবাব দিই : "আর তাতেই তো বিনি আর আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। তিনি খুলে তো কিছু লেখেন নি। আস্‌চেন, এই মাত্র। অ্যাম্বুলেন্স্ গাড়ীতে আস্‌বেন কি ষ্ট্রেচারে করে আস্‌বেন কে জানে।"

"ভারী মুস্কিলের কথা তো!" শশাঙ্কর মন্তব্য হয়।

"মুস্কিলের কথাই! সত্যি বল্‌তে, আমরা যেকোনো মুহূর্ত্তে তাঁর শোক সংবাদ শোনার জন্যেই এতদিন প্রস্তুত ছিলাম,—তিনি এভাবে এসে আমাদের দেখা দেবেন তার জন্য কখনই—"

"প্রস্তুত ছিলে না।" শশাঙ্ক আমাকে বল্‌তে বাধা দেয় : "বুঝতে পেরেচি। খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু কি

করবে বলো ভাই! দুনিয়াটাই এই রকম। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েচ তো, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না! এও সেই রকম। বল্‌ব কি ভাই, আমারও এক প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, পাকা আমটি যেন, বিস্তর বিষয়-আশয় আগ্‌লে দিব্যি টিকে রয়েছেন। তাঁর সম্পত্তি পাবার আশায় আশায় আমার পিতামহ মারা গেলেন, পিতাও গেলেন—এখন আমি তাঁর একমাত্র নাতি কায় ক্লেশে কোন রকমে বেঁচে আছি। খুব সম্ভব, আমাকেও না মেরে তিনি মরবেন না।" শশাঙ্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

"না, আমার সে কথা নয়।" আমি চম্‌কে যাই : "মাসী দেহরক্ষা করুন্ আমি তা চাই না। বরং আরো দীর্ঘজীবিনী হয়ে আরো সুদীর্ঘ কাল তিনি বেঁচে থাকুন। অন্ততঃ আরো ন মাস কি ছ মাস বাঁচুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর এই কলকেতায় আসা—এতেই আমি বড়ো ঘাব্‌ড়ে গেছি। তিনি রাণী ভবানীর আমলের মানুষ—একেলের আমাদের চালচলন সইতে পারবেন কিনা কে জানে। বিনির জন্যেই আমার আরো ভাবনা। গঙ্গারাম ডাক্তারকে ওঁকে সগর্ব্বে বল্‌তে একবার শুনেছিলাম, আমার বোন্‌ঝি মোটেই একেলে মেয়ের মতো না। সে যুগের সেই দময়ন্তী না কার মতো! এখন, বিনি যা ফ্যাশান্ দুরস্ত মেয়ে, তাকে কি দমন করা, আই মীন্, দময়ন্তী করা যাবে?

"বুঝিয়ে বলো! বলো যে, মাসী চটে গেলে তোমাদের উড়িয়ে দিয়ে পোষ্যপুত্র নিয়ে বস্‌তে পারে, যাদবপুরেও টাকাটা দিয়ে যেতে পারে—এই সব ভালো করে বোঝাও। বিনি তো আমাদের অবোধ নয়!" বলে শশাঙ্ক।

"তাছাড়া, বাড়ী ঘরের কথাও ভাবতে হয়। কোথাও যদি সেকেলে কিছুর একটু ছিটে ফোঁটাও থাকে! সব একেলে আস্‌বাব পত্র, আর্টিষ্টিক্ ছবি যত দেয়ালে, বুঝতেই পারছ তো! একেবারে আধুনিক আব্‌হাওয়া! এসব নিয়ে এখন কি করি, কোথায় যাই—আর কালই আবার তিনি আস্‌ছেন। দ্বিতীয় ভাগ না প্রথম ভাগে কোথায় পড়েছিলাম, মাসী তুমিই আমার ফাঁসির কারণ—আমার তাই হোলো দেখ্‌ছি।"

শশাঙ্ক বিস্তর সহানুভূতি প্রকাশ করল। তাতে কান না দিয়ে, চায়ের দাম না দিয়েই, আমি বিমর্ষ মুখে রেস্তরাঁ ছেড়ে উঠে এলাম।

হপ্তাখানেক পরে আবার শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা। সেই রেস্তরাঁতেই। আমি সরবৎ পান করছি—ঢাউস্ এক গ্লাস্ সরবৎ নিয়ে মনের দুঃখে ব্যাপৃত আছি—খুব সিপ্ করছি—নিজেকে সান্ত্বনাদানেই বোধ হয়—এমন সময়ে শশাঙ্ক এসে হাজির।

"কি হে, কি খবর? তোমার সেই মাসী নিরাপদে এসে পৌঁছেচেন তো?" শশাঙ্ক আমাকে সম্ভাষণ করে।

"দ্যাখো, পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আইন্ করে' পাগ্‌লামি করার নির্দ্দিষ্ট একটা বয়স বেঁধে দেয়া উচিত। দেয় না কেন যে আমি তাই ভাবি। সত্তর বছর পেরিয়ে কেউ যদি—"

"তোমার মাসির কথা বল্‌চ?" শশাঙ্ক বাধা দিয়ে ওঠে : "তিনি আবার কি পাগ্‌লামি করলেন্? তিনি তো শয্যাগত বলেই শুনেচি।"

"শয্যাগত?" আমি তপ্ত স্বরে বলি : "শয্যাগতই বটে! ষ্ট্রেচারে শুয়ে নয়, ফড়িংএর মত উড়তে উড়তে বলা উচিত—ইষ্টিশন্ থেকে সটান্ হেঁটে এসে তিনি উপস্থিত! আধুনিক কায়দায় শাড়ী ব্লাউজ পরণে, মুখে হিমানী, পাউডার, এমন কি পায়ে হাই হীল্ জুতো অবধি। চেনাই যায় না মাসীকে! বয়েস যেন চল্লিশ বছর কমে গেছে এম্‌নি চেহারা আর তেম্‌নি উৎসাহ!—

"অ্যাঁ?" শশাঙ্কর চোয়াল্ ঝুলে পড়ে।

"তবে আর বল্‌ছি কি? এধারে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া—বিনি আর আমি, সারাদিন ধরে খেটে খুটে, প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করে, একেলে আস্‌বাবপত্র সমস্ত সরিয়ে সেকেলে সতরঞ্চি, আসন পিঁড়ি এইসব আম্‌দানি করে' বাড়ীটাকে তো কোনোরকমে দময়ন্তীর যুগের মতো এনে দাঁড় করিয়েছি—আর্টিষ্টিক্ ছবি আর আধুনিক সিনেমা ষ্টারদের হটিয়ে, শকুন্তলা, সূর্পনখা, সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি সব্ সাজিয়ে রাখা হয়েছে—এমন কি রান্নাঘরের দেয়ালে একখানা বড় সাইজের হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড এনে টাঙিয়ে দিয়েছি পর্য্যন্ত—"

"কী সর্ব্বনাশ!" চোয়াল গুটিয়ে নিয়ে কোন রকমে বল্লে শশাঙ্ক।

"সর্ব্বনাশ বল্‌তে! এ যুগে বাস করে সেকেলে মেয়ের মত অপদার্থ হয়ে থাকার জন্যে বিনিকে কী যাচ্ছেতাই না করলেন! আমাকে বল্লেন কূপমণ্ডুক! আর এটা যে বিংশ শতাব্দী এই কথাটাই উনবিংশবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

"কি—কি—সব্‌বো—নাশ্!" শশাঙ্কর আবার চোয়াল ঝুলে যায়।

"তবে রান্নাঘরের লঙ্কাকাণ্ডের ছবিটা মাসীর খুব পছন্দ হয়েচে। হনুমানের মুখখানা নাকি বুড়ো গঙ্গারাম ডাক্তারের মতো। সেই হতভাগা ডাক্তারই নাকি তাঁকে তিলে তিলে খুন্ করছিল। প্রায় নাকি মেরে এনেছিল—মাসীর নিজের মুখের কথাই বল্‌চি। খুব তাঁর বরাত জোর তাই গঙ্গাযাত্রার হাত থেকে বেঁচে গেছেন।"

"তাহলে তোমার মাসি কি করচেন এখন?" শশাঙ্ক জিগ্যেস্ করে।

"কি আর করবেন? সারাদিন টো টো করে সহরে ঘুরছেন। মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেট থেকে একেলে জিনিসপত্র কিনে এনে নিজেদের সাজাই আর ঘর বোঝাই করচেন। আধুনিক লেখকদের উপন্যাস কিন্‌চেন—বুদ্ধদেব বোস্ ইত্যাদির! সারা রাত জেগে তাই পড়চেন, আর রাতদিন ধরে উঠে পড়ে বিনিকে মডার্ণ মেয়ে বানাতে লেগেচেন। বিনির তো প্রাণান্ত!"

"আহা!" শশাঙ্ক আমার বোনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে: "আর তোমার কি দশা?"

"আমি শুধুই গৃহান্ত। তারপর শুন্‌ছি তিনি নাকি ন্যাশনাল্ ওয়ার্ ফ্রণ্ট্ না কি জনযুদ্ধ না কিসে যোগদান করবেন! অল্‌রেডি মেয়েদের এ-আর্-পি-তে নাম লিখিয়েছেন। জাপানীদের না তাড়িয়ে তিনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না। উনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

"তা উনি পারবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যোয়ান্ অব আর্কের মত—এই সত্তর বছরের তরুণীর পক্ষে—কিছু অসম্ভব না।" বল্ল শশাঙ্ক। "কিন্তু এ রকম আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কিসে হোলো, তাই ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছি।"

"আমার জন্যই।" আমি সখেদে বল্লাম: "এককালে মোক্ষম্ রসায়ন বলে একটা ওষুধের আমি বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছিলাম। পাঁজির পাতায় সেই রসায়নের প্রশংসাপত্র কবে জানি মাসিমার চোখে পড়ে। আমার প্রশংসা পত্র দেখেই আরো তাঁর বিশ্বাস হয়। মোক্ষম্ রসায়ন হচ্ছে পাগলামির মহৌষধ। অন্ততঃ ওষুধ ওলারাও তাই বলে থাকে। বিজ্ঞাপনটা পড়ে মাসির হঠাৎ ধারণা হোলো যে গঙ্গারামের চিকিৎসাটা আসলে পাগলামি ছাড়া কিছু না। গঙ্গারামের পাগলামি—অথবা পাগলামির ফল দূর করার জন্য মাসিমা ওষুধটা আনিয়ে খেতে আরম্ভ করেন। গঙ্গারামকে না খাইয়ে নিজেই খেতে সুরু করে দিলেন। আর তার ফলে—"

"আর বল্‌তে হবে না, বুঝতে পেরেছি। মহৌষধের ঠিকানাটা দিয়ো। তোমাকে সারাবার জন্য আমাকেই তা খেতে হতে পারে।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ে, আমাকে কিছু আর বল্‌তে দেয় না।

——(ঃঃ)——

কাহিনী

মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

ইতিহাসে তোমরা অনেক বড় বড় রাজাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী—অনেক বড় বড় বীরের বীরত্বের গল্প পড়েছ। এঁদের বীরত্বের মাপকাঠি হ'চ্ছে যে এঁরা কত রাজ্য জয় করেছেন—স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে কত লোক হত্যা করেছেন। অবশ্য এজন্য অনেক সময় তাঁদের নিজেদের জীবনকেও বিপন্ন করতে হয়েছে। এসব তাঁরা করেছেন নিজেদের সর্ব্বগ্রাসী রাজ্যলিপ্সা মেটাতে অথবা পাশবিক শক্তির গর্ব্বে অন্ধ হয়ে মিথ্যা বীরত্বের উন্মাদনায়। মানুষের সুখদুঃখের কোন মূল্য এঁদের কাছে ছিল না। নির্য্যাতিতের বুকফাটা বেদনা, আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন কোনদিন এঁদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নাই। মানুষের রক্তে এঁরা শ্যামল ধরণীকে রাঙিয়ে দিয়েছেন—গ্রামের পর গ্রাম—রাজ্যের পর রাজ্য এঁরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছেন। এঁদের বীরত্বের মহিমায় কত স্ত্রী স্বামী হারিয়েছে—কত শিশু অনাথ হ'য়েছে, কত বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রহারা হয়েছে। এঁদের কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হ'য়েছে চোখের জলের মহাসাগরের পারে, যেথান থেকে উঠ্‌ছে অবিশ্রান্ত একটানা বেদনার ঐক্যতান, দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার। কিন্তু সত্যিকারের বীরের কথা সাধারণ ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। আজ আমি তোমাদের এমন একজন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের পূত কাহিনী শোনাব, যিনি স্বেচ্ছায় আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন এক কদর্য্য মৃত্যুর সঙ্গে এবং অবশেষে মরণের কোলে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর বীভৎসতার মধ্যেও ফুটিয়ে তুলেছেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও সুষমা।

দুই ভাই তারা বেলজিয়ামের কোন এক ধর্ম্মবিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখছিল পাদ্রী হবার জন্য। শৈশব হতেই এই দুই ভায়ের ধর্ম্মের প্রতি একটা সত্যিকারের আকর্ষণ ছিল। ধর্ম্মকে এরা কখন ব্যবসা বা গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বলে মনে করত না। মানুষের দুঃখকষ্টে এদের কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠত। পাপকে এরা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করত; পাপীর জন্য এদের প্রাণ কেঁদে উঠত। তাই দুর্ব্বল মানুষকে সৎপথে চালনা করা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল। এই দুঃখকষ্টময় পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে যদি কিছুমাত্র সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে এরা সাহায্য করতে পারে তবেই তাদের জীবন ধন্য।

বড় ভাই ঠিক করেছিল সে ধর্ম্মপ্রচারক হবে। সে চলে যাবে তার প্রিয় জন্মভূমির সুখনীড় ছেড়ে বহু দূরে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপারে দক্ষিণ সাগর দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে সে করবে মানুষের সেবা, ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন। সভ্যজগতের বাইরে অসভ্য বর্ব্বরদের মধ্যেই হবে তার কর্ম্মক্ষেত্র। তাদের কাছে সে বলবে যিশুর প্রেমের বাণী ভগবানের অপার মহিমার কথা। এই সব অন্ধ মূক মুখে সে দেবে ভাষা—তাদের নিষ্ঠুর কঠিন হৃদয়ে দেবে সে স্নেহ ও ভালবাসা। হয়ত এই অসভ্য ও হিংস্র মানুষদের জীবনকে সে করে তুলবে সুন্দর ও মহিমান্বিত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন হ'ল তার ভীষণ অসুখ। জ্বরে তার সদাপ্রফুল্লমুখখানি হয়ে গেল মলিন। কোথায় গেল তার উজ্জ্বল চোখের সেই জ্যোতিঃ, মুখের সেই সুন্দর হাসি! যত দিন যায় সে শুধু শুকিয়ে যেতে লাগল—যেন জীবনে নবপ্রভাতে শুভ্র ফুলের গুচ্ছ ঝরে পড়বে তার গন্ধ বিলিয়ে দেবার আগেই। ছোট ভাই সব সময়ে তার কাছে

কাছেই থাকে—একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার ঐ বেদনাকাতর মুখখানির প্রতি। মনে হয় দাদা বুঝি তাকে কি বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। হৃদয়ের মর্ম্মস্থল থেকে কি কথা যেন ঠেলে বেরুতে চায় কিন্তু পথ পায় না। ছোট ভাই দেখে আর ভাবে। তার দাদা তাকে কি ব'লতে চায়! একি শুধু রোগ যন্ত্রণার অব্যক্ত আর্ত্তনাদ? না—না—কী ব'লতে চায় ঐ নির্ব্বাক ঠোঁট দুটি?—তাইত! হঠাৎ যেন সে সব বুঝতে পারে—হাঁ শুনতে পেয়েছে সে মৃত্যুকাতর সহোদরের নির্ব্বাক ভাষা! তখন সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ভাইয়ের শয্যাপ্রান্তে। তার জ্বরতপ্ত ললাটের ওপর সস্নেহ চুম্বন এঁকে দিয়ে ব'লল, "দাদা, আমি শুনতে পেয়েছি তোমার মনের কথা, বুঝতে পেরেছি তোমার বুকের ব্যথা। কেন ভাবছ ভাই! কোন ভয় নাই, ব্রত তোমার নিষ্ফল হবে না। মনে তোমার কোন ক্ষোভ রেখ না। তোমার অনারব্ধ কাজের ভার আমি নিলাম। তোমার হয়ে আমিই যাব দক্ষিণ সাগরদ্বীপে প্রেমের বার্ত্তা নিয়ে।" ছোট ভায়ের কথা শুনে রোগীর মুখের ভাব এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল। হঠাৎ তার মলিন মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—দু'চোখ বেয়ে তার নেবে এল শ্রাবণের ধারা। মুখে সে কিছুই ব'লল না—শুধু দুই হাতে তার ভায়ের হাতদুটি সে আনন্দে চেপে ধরল।

এর কিছুদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে যোশেফ দামিয়ার কাছে খবর এল যে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে—সে তার বড় ভাইয়ের বদলে দক্ষিণসাগর দ্বীপপুঞ্জে প্রচারক হয়ে যেতে পারে। এতে তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে যেন একটা মস্ত সুখবর পেয়েছে। একলাফে সে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে খেলার মাঠে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রল। যাকে দেখছে তাকেই সে জড়িয়ে ধরছে। সবাইত তার আনন্দ দেখে অবাক্! হঠাৎ তার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাথা তার মোটেই খারাপ হয় নাই। এতদিনে সে তার ঈপ্সিত সুযোগ পেয়েছে। ভগবানের নাম কীর্ত্তনের চেয়ে—মানুষের সেবার চাইতে তার কাছে প্রিয় আর কিছুই নাই। স্নেহময় ভায়ের অনারব্ধ কাজের চেয়ে তার কাছে আর বড় কর্ত্তব্য কিছুই নয়। তাই পিতামাতার আঁখি জল, বন্ধুবান্ধবের স্নেহবন্ধন তাকে বাঁধতে পারল না। হাসি মুখে প্রিয়জনদের কাছে চির বিদায় নিয়ে, জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল অজানা দেশের উদ্দেশে তার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করতে।

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর ঘুরে আসে। দামিয়াঁ কিন্তু অক্লান্তভাবে সমান উৎসাহ নিয়ে অসভ্যদের মাঝে তার কর্ত্তব্য করে যায়। দিন নাই রাত নাই, সে কাজ করে যায় যন্ত্রের মত এইভাবে অবিরাম—কিন্তু তার প্রতিটী কাজেই ফুটে উঠ্‌ত দরদ ও আন্তরিকতার স্নিগ্ধ পরশ। এমন ভাল বুঝি কেউ কোনদিন বাসে নাই! এমন বন্ধু তাদের কোনদিন হয় নাই। যিশুর বাণী প্রচারের চাইতে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করা সে শ্রেয় বলে মনে ক'রত। সে ত আর বেতনভোগী সাধারণ পাদ্রী নয়—কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েও সে আসে নাই। মানুষের সেবাই যে তার ধর্ম্ম তার ইহকাল পরকাল।

দিন চলে যায়—বছরের পর বছর ঘুরে আসে—একই ভাবে এই কর্ম্মবীর কাজ করে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রাণদিয়ে ভালবাসে সে—শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সে পায়। এমনি সময়ে একদিন তার কাছে সেখানকার ধর্ম্মকর্ত্তা বিশপ্ দুঃখ করে বলেন যে মোলকাই দ্বীপের কুষ্ঠ উপনিবেশে সেবা করতে পারে এমন কোন লোক তিনি পাচ্ছেন না। এই কুষ্ঠ উপনিবেশটী ছিল সভ্যজগতের বাইরে ক্ষুদ্র একটী দ্বীপে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এর কোন সংযোগ ছিল না। যাতে এই কুৎসিত ব্যাধি বিস্তার লাভ না করতে পারে সেইজন্য কোন সুস্থ লোককে এই হতভাগ্যদের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হত না। বন্ধুবান্ধবহীন—আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হতভাগ্য কুষ্ঠেরা এই ক্ষুদ্র উপনিবেশে বন্য পশুর মত জীবন যাপন করত। না ছিল তাদের সত্যিকারের বাড়ী ঘরদোর, না ছিল তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার

কোন বন্দোবস্ত। এমন কি ভগবানের কথাও যাতে তাদের মাঝে মাঝে মনে পড়ে তারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। সত্যি এই ঘৃণিত অবহেলিত কুষ্ঠেরা ভগবানের করুণা থেকেও যেন বঞ্চিত ছিল।

আগ্রহের সঙ্গে দামিয়াঁ বিশপকে ব'লল, "আমায় কেন ওখানে পাঠান না প্রভু! আমি ওদের সেবা করে ধন্য হব।" আশ্চর্য্য হ'য়ে বিশপ ব'ল্লেন—"অ্যাঁ—কি ব'লছ তুমি—দামিয়াঁ! তুমি যাবে ওখানে? না-না, ভাল করে ভেবে দেখ তুমি কি ব'লছ। এত ছেলে খেলা নয়। এযে চরম ত্যাগ, এযে স্বেচ্ছায় ঘৃণিত মৃত্যু বরণ করে নেওয়া। উঃ সে কী ভয়ানক মৃত্যু! তিলে তিলে তোমায় মরতে হবে—অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে—সভ্য লোকালয় হতে অনেকদূরে, সুস্থ মানুষের আঁওতার বাইরে আর এক পৃথিবীতে। কেউ তোমায় দেখবে না, কেউ তোমায় খোঁজ পর্য্যন্ত নেবে না। এমন কি শেষ মুহূর্ত্তও কেউ তোমার মুখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত দিতে আসবে না। না-না, ভাল করে ভেবে দেখ।"

মধুর হেসে দামিয়াঁ ব'লল, "আমি ভেবে দেখছি প্রভু, মন আমার ঠিক করে ফেলেছি—আমি যাব। ঐ ঘৃণিত, পরিত্যক্ত সর্ব্বহারা কুষ্ঠেদের মধ্যেই আমার স্থান দয়াল ভগবান ঠিক করে রেখেছেন। যেতে আমার হবেই—কোন বাঁধাই আমায় টলাতে পারবে না। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন পিতা।"

রুদ্ধকণ্ঠে মুগ্ধ বিশপ আবেগের সঙ্গে ব'ল্লেন—"তবে যাও বৎস—আমি তোমায় বাঁধা দেব না। জানি না তোমার আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আমার আছে কি না। তবে প্রকৃত ধর্ম্মের যদি কিছুমাত্র বুঝে থাকি, আমি জোর গলায় ব'লতে পারি তুমিই শুধু সত্যিকারের খৃষ্টান—তোমার স্থান নিশ্চয়ই হবে ভগবানে কোলে, যিশুরই পার্শ্বে।"

ফাদার দামিয়াঁ চলে গেলেন মোলকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে। নতুন করে আবার আরম্ভ হ'ল তাঁর কর্ম্মজীবন। তিনি কুষ্ঠেদের ডেকে ব'ল্লেন, "ওরে, আমার হতভাগ্য ভাইরা! তোরা আয়, তোরা আয়। কেন কুণ্ঠিত হ'য়ে দূরে সরে যাচ্ছিস্? আমি যে তোদের ভাই। কেন ভুলে যাস্ তোরাও যে মানুষ—মানুষের মত বাঁচবার তোদেরও অধিকার আছে। সত্যিকারের মানুষ তোদের হ'তেই হবে। আমার ভগবান যে তোদেরও ভগবান—তোদেরও যে তিনি সমান ভালবাসেন।" এইভাবে স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে এই ধর্ম্মবীর অচিরেই তাদের হৃদয় জয় করে ফেল্লেন। তারপর আরম্ভ হ'ল কাজ, এদের সত্যিকারের মানুষ গড়বার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম। এদের নিয়ে তিনি বাড়ীঘর তৈরী করলেন—পানীয় জলের ব্যবস্থা ক'রলেন—লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হ'ল। নিজের হাতে তিনি তাদের ক্ষত ধুয়ে, ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিতেন, তাঁদের দুঃখে সহানুভূতি জানাতেন—তাদের বুকে আশা জাগিয়ে তুলতেন—সাহস দিতেন। এমন কি এদের জন্য তিনি একটী গির্জ্জাও করেন। আর এই সঙ্গে চ'লত তার এই কালব্যাধির তথ্যানুসন্ধান। এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর চ'লল তাঁর অক্লান্ত সেবাব্রত। ফাদার দামিয়াঁ হয়ে উঠলেন তাদের প্রকৃত পিতা, এই কুষ্ঠাশ্রমের কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী।

দিন যায় মাস যায়, বছরের পর বছর ঘুরে আসে—একইভাবে চ'লল তাঁর ধর্ম্মসাধনা। একদিন গরম জল ঢালতে গিয়ে তাঁর পায় পড়ে যায়—কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—তিনি কিন্তু কিছু মাত্র তাপ বুঝতে পাল্লেন না। সন্দেহ হল, তিনি গিয়ে একজন ডাক্তার দেখালেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে ডাক্তার বল্লেন, "হাঁ ফাদার, বড়ই দুঃখের কথা আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।" এই নিদারুণ কথা শুনে দামিয়াঁ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। বরং ঈষৎ হেসে তিনি বল্লেন—"ভালোই হয়েছে—ভগবানের অসীম করুণা, আজ আমি এদের সত্যিকারের একজন হ'লাম।" তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "দয়াল প্রভু, এই ক'রেছ ভাল। আমাদের কুষ্ঠেদের প্রতি তোমার স্নেহ যেন চিরদিনই থাকে।"

দিন যায়, দামিয়াঁর অসুখ ক্রমেই বেড়ে চলে—আস্তে আস্তে তাঁর জীবনীশক্তিও কমে আসতে থাকে। কিন্তু তবু এইভাবে চলে তাঁর কর্ম্মসাধনা। বরং রোগের যাতনা উপেক্ষা করে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজ করে যান—যাতে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁর সাধনা শেষ করে যেতে পারেন। কিন্তু শেষে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েন—এবং অবশেষে তাঁর জীবন প্রদীপ নিঃশেষ হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে নেবে এল সমগ্র কুষ্ঠাশ্রমের ওপর ঘোর বিষাদের ছায়া। কে যেন নির্ম্মমহস্তে তাদের জীবনীশক্তি কেড়ে নিল। শুকিয়ে গেল তাদের আনন্দের উৎস। কোন কাজই আর ভাল লাগে না—কিছুতেই আর উৎসাহ নাই। মন তাদের সব সময় পড়ে থাকে তাদের প্রাণের দেবতার কাছে। যুবকযুবতীর কণ্ঠে সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল—শিশুরা গেল খেলা ভুলে। শুধু ঘুরে ফিরে সবাই আসে বারবার ফাদার দামিয়াঁর গৃহদ্বারে। খোঁজ নেয় তিনি কেমন আছেন। সবারই আপ্রাণ চেষ্টা কিসে তাঁর যাতনার একটুও লাঘব হবে—কিসে তিনি সেরে উঠবেন। বারবার তারা ভগবানের কাছে আকুল মিনতি জানায়, একি করলে প্রভু! করুণার অবতার, যদি কৃপা করে দেবদূতকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছ, তাঁকে ছিনিয়ে নিও না। আমরা তাহলে কি করে বাঁচব প্রভু? আমাদের যে আর কেউ নেই। তার চেয়ে আমাদের নিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও!"

তাঁর শেষ শয্যার পাশে দুজন পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনী হাঁটু গেড়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। একজন রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "ফাদার, আপনি যখন ভগবানের কাছে চলে যাবেন তখনও নিশ্চয়ই এই হতভাগ্যদের কথা ভুলে যাবেন না!"

মিষ্টি হেসে দামিয়াঁ বল্লেন, "না-না-ভুলতে আমি এদের কখনও পারব না। আমার যদি কিছুমাত্র পুণ্য থাকে তবে এদের সবার জন্যই ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করব।"

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই পুরোহিত বল্লেন, "আপনার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে প্রভু—আপনার ঐ আলখাল্লাটি আমায় দিতে হবে।"

আস্তে আস্তে দামিয়াঁ প্রতিবাদ জানান, "না-না—তা হয় না। ওটা যে কুষ্ঠের বীজাণুতে ভরা।"

দৃঢ়কণ্ঠে পুরোহিত আবার তাঁর প্রার্থনা জানান, "না প্রভু ঐটী আমার চাইই। ঐ মহামূল্য গাত্রাবরণই হবে আমার ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।"

ধীরে ধীরে দামিয়াঁর মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মা এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বোধহয় ভগবানের কাছে তাঁর আজীবনের ব্রত সমাপন করতে চলে গেল।

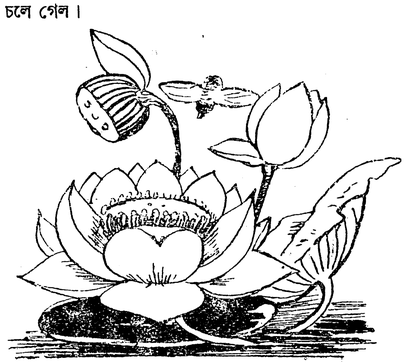

কবিতা

রংমশালের সুর

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

রংমশালের লাল রঙে আজ
হাসোরে কিশোর দল!
বেদনায়-নীল পাষাণে ঝরুক্
খুশীর ঝর্ণা জল!!

রংমশালের রঙে—
পুরোণো পৃথিবী, দেখেছ কি কেউ
জাগিছে নতুন ঢঙে!!!

জাগোরে কিশোর! জাগোহে যুবক!
দুঃখের সাহারায়!
বৃদ্ধ দাঁড়াও—মৃত্যুর আগে
—মুক্তির পাহারায়!!

সহজ সরল দীপ্ত সতেজ রংমশালের হাঁক্—
শুনে রাখো শুধু ছোটদেরই তরে নয়
অন্ধ ও বিরাট সকলেরই কথা কয়,—
ছোটছোট কোরে ব্যাকুল ভঙ্গিতে ডাকে সে বড়োর
ডাক!

বাঁকা কথা আর বাঁকা কাজে কাজে
পৃথিবীটা গ্যাছে বেঁকে!
কোথা কে আছিস সিদে হয়ে দাঁড়া
সহজ জীবনে জেগে!

সোজা কোরে দিতে এই ধরণীরে
সাদা কথা ক'য়ে চল!
মৃত্যুকে মেরে জাগাইতে প্রাণ
ফেলে দেরে ছুড়ে ছল্!!

রংমশালের বাণী—
চেয়ে দেখ্ জাগে গাঁয়ের সবুজে
ডাকে দিয়ে হাত্ ছানি!

ওই যে নদীর পাশ-ঘেঁসা ছোট
পাতার কুটীর দ্বারে—
সরল কাহার কাঁকুতি ফিরিছে
চেয়ে দেখ বারে বারে!

আম বাগানের নিঝুম্ নিরালা
চির-ঘুমহীন ছায়া
দেখেছ কি যতো জ্বালা ঘুচাইতে
রচিয়া রেখেছে মায়া!

ফিরে আয়! ফিরে আয়!
নকলের যাদু ছিন্ন করিয়া
আসলের ঘন-ছায়!!
ফিরে আয়! ফিরে আয়!!

আরাম কেবল অনারামে হায়—
জীবন কোরেছে কালি!
ক্রূর যাদুকর ঢেলেছে তোদের—
নয়নে—তপ্ত বালি!

সেই বালি ওই অন্ধ জীবন
জ্বালায়ে পোড়ায়ে ধীরে,—
কহিছে—আশীষ্ দিয়ে গেনু আজ,
এখনো চল্‌রে ফিরে!!

ফিরে চল! ফিরে চল!—
তরুণ যুবক কিশোর বৃদ্ধ
আর মড়া শিশু দল!!
ফিরে চল! ফিরে চল!—

মাকালে রঙীন্ মেকীরে জড়ায়ে
কাঁদিবিরে আর কতো?
—মাটীর জীবনে—খাঁটি হ'য়ে জাগ্
সিদে-মানুষের মতো!!

দ্বারে চুপি-দেয়া মৃত্যু কবর
ভেদ করি ওঠ জেগে!
তোদের হাসির ফাঁস্ এঁটে যাক্—
পিশাচের গলে লেগে!!

বেঁচে থাকা আজ চাই!
সময় এখনো আছে চল ল'বি
সত্যের বুকে ঠাঁই!!—

রংমশালের সুর—
কহে—শোনো ওই জাগরে সুদিন
নাহি আর বেশী দূর!!—

কাহিনী

রাশিয়ার বীর কিশোর কিশোরী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

[দেশরক্ষার আহ্বানে সোভিয়েট ভূখণ্ডের লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরী কতখানি সাড়া দিয়েছে বা শত্রু-নিধন কার্যে তাদের পিতামাতার সঙ্গে কী উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে, এখানে সমগ্রভাবে তার পরিচয় দেবার অবকাশ নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বীরত্বের কাহিনীগুলি থেকেও পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাবে, সোভিয়েটবাসী বালক-বালিকার কী জ্বলন্ত দেশপ্রেমের বহ্নিশিখায় পররাজ্যলোভীর দল পতঙ্গের মতন নিঃশেষে জ্বলে' যায় !]

মানিয়া

জার্মানরা নভোসেলাই গ্রামখানি দখল করবার পর, গ্রাম সোভিয়েটের সভাপতি মিখাইল পাইরেস্কো আত্মগোপন করেন এবং স্থানীয় গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন জার্মানদের উচ্ছেদ করবার জন্যে। স্ত্রী ওল্‌গা আর তেরো বছরের মেয়ে মানিয়াকে তিনি রেখে যান।

ফ্যাসিষ্টরা ওল্‌গাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিখাইলের খোঁজ পাবার জন্যে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। কিন্তু তিনি স্বামীর কোন রকম সন্ধান দিতে অস্বীকার করায় নাৎসীরা তাঁকে গ্রামের মাঝখানে খোলা মাঠে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করে। আর সেই দৃশ্য চোখের সামনে দেখিয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে তারা গ্রামের সমস্ত লোকদের সন্ধীনের খোঁচায় তাড়িয়ে ফাঁসীকাঠের কাছে এনে হাজির করে।

মানিয়া বড় বড় চোখ মেলে মায়ের এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড দেখলে। হাত দু'টি দিয়ে নিজের বুকখানি সে এমন করে চেপে ছিল যেন এই বর্বরতায় কোমল বুক তার অসহ্য বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে !.....

কাঁদবারও তার অবসর নেই। সেইখান থেকে জার্মান অধিনায়ক মানিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে এল হেড-কোয়ার্টারে। অনর্গল রুশ ভাষায় কথা বলে' সে তার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করতে লাগ্‌লো। এই লোকেরই হুকুমে যে একটু আগেই তার মার ফাঁসী হয়েছিল, নিজের চোখে না দেখ্‌লে সে একথা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারতো না।

"এখানে বোসো, খুকি," সে বল্‌লে, "ভয় পেওনা ; ভয় কিসের ?"

বালিকা উত্তর দিলে, "আমি ভয় পাইনি।"

"বেশ, বেশ। ভয় পাবে কেন। তোমাকে আমি ক-ত ভালবাসি। কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল কিনে দেব তোমায়। হ্যাঁ, দেখো, তোমার মা-টা ভারী পাজী ছিল। সে আমাদের একটা কথারও জবাব দিলে না। কিন্তু তুমি ভা-রী লক্ষ্মী মেয়ে ; তুমি আমাদের সব বল্‌বে, কেমন ?"

"হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব খবর দেব।" বল্‌লে মানিয়া।

"আচ্ছা বলো তো, তোমার বাবা কোথায় গেছে ? আমরা তাঁর কোন ক্ষতি ক'রবো না। তাকে শুধু এখানে ফিরিয়ে আন্‌বো আর তারপর তুমি কেমন বাবার কাছে থাক্‌তে পারবে। আর তা' না হ'লে একলা থাক্‌তে নিশ্চয়ই ভয় ক'রবে তোমার। আমার কথা বুঝ্‌তে পেরেছো তো ?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

"ভাল—এখন সব কথা খুলে বলো আর আর আমি লিখে নি।" অফিসার একটা বড় ছুরি তুলে নিয়ে পেন্‌সিল্‌টা চেঁচে নিলে আর লেখবার জন্যে তৈরী হল।

"কিন্তু মনে রেখো," সে সাবধান করে' দিলে, "একটাও মিথ্যে কথা বলা চল্‌বে না। মিথ্যে বল্‌লে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব।"

চোখে তার সেই হিংস্র দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্যে ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌লে মানিয়া—যে হিংস্র চোখে তার মাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলবার হুকুম দিয়েছিল এই জার্মাণ শয়তান !

"মিথ্যে কথা আমি বল্‌বো না,"—শান্তস্বরে মানিয়া জানালে।

"এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। নাও এই মিষ্টিটা খাও। আরো অনেক মিষ্টি আর চক্‌লেট দেব তোমায়—সব খবর বলে ফেল্‌বার পর।"

মানিয়া টেবিলের কাছে গিয়ে অফিসারের পাশে একটা চেয়ারে বস্‌লো ; আর কপালের ওপর কুঁকড়ে-পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমী চুল মাথার ওপর দিকে তুলে দিয়ে একটা পেন্‌সিল হাতের মধ্যে নিয়ে ঘোরাতে লাগ্‌লো। উৎফুল্ল অফিসার মাথা নীচু করে' লেখবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। তারপর মানিয়া হঠাৎ টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা তুলে নিলে আর দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি ছোট হাতখানিতে কেন্দ্রীভূত করে' প্রতিহিংসায় আত্মহারা হয়ে অফিসারের বুকে ছুরিটা আমূল বিঁধে দিলে।.....

লাল ফৌজ এর কিছু পরেই গ্রামখানি পুনরুদ্ধার করে। মানিয়া পাইরেস্কোর দেহ—নাৎসীরা তাকে কেটে ফেলেছিল—কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু যে ঘরের মধ্যে তাকে জার্মানরা ধরে' এনেছিল, তার সামনে লাল ফৌজের সৈনিকেরা একটি শোভন সমাধিস্তূপ গড়ে' দিলে মানিয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। স্তূপের ওপর কাষ্ঠফলকে লাল ফৌজের তারকাচিহ্নিত এই লিপি আজও জ্বল্‌জ্বল করে : "মানিয়ার উদ্দেশে—লাল ফৌজ।"

সাশা

জ্‌লোবিনের কাছে একটি সমবায় কৃষিক্ষেত্রে নাৎসীরা এর সভাপতির সমগ্র পরিবারবর্গকে একের পর এক অত্যাচার করে' খুন করে। সভাপতি তিশ্‌কেভিচ, তাঁর বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী আর দু'টি শিশুকন্যাকে তীক্ষ্ণ সঙ্গীনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সকলের চোখের সামনে হত্যা করলে জার্মানরা। শুধু তিশ্‌কেভিচের চোদ্দ বছরের ছেলে সাশা বাইরে থাকায় এই কসাইবৃত্তি থেকে মুক্তি পেলে।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে সে দেখ্‌লে, ত'ার বাবা, মা, ঠাকুমা, আর ছোট দুই বোনের বিকৃত, রক্তাক্ত মৃতদেহ ফ্যাসিষ্ট্‌রা ঘরে ফেলে রেখে গেছে !

দু'হাতে চোখ ঢেকে সাশা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে নিকটবর্তী জ্‌লোবিন সহরে গিয়ে তার রক্ষা-কার্যে যোগ দিলে। তুমুল যুদ্ধের পর শুধু রাশি রাশি ট্যাঙ্কের জোরে জার্মানরা শহর দখল করলে।

সাশা লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করতে লাগ্‌লো : শত্রুর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি আর সামরিক শকটের সারি হুড়্‌ হুড়্‌ করে' রাস্তার ওপর দিয়ে চলে' যাচ্ছে। সে খানিক অপেক্ষা করলে। তারপর একখানা বিরাটকায় সামরিক লরীতে চেপে নেতৃস্থানীয় জার্মানরা যখন এসে ঢুক্‌লো—সে ছুটে রাস্তায় নেবে এসে প্রাণপণে একটা হাত বোমা ছুঁড়লে লরীখানার ওপর। সমস্ত আরোহী সমেত গাড়িটা চূর্ণ হ'য়ে গেল আর সেই বিস্ফোরনের প্রবল ঝাপ্‌টায় কিশোর ছিট্‌কে পড়লো স্পন্দনহীন, প্রাণহীন দেহে।

জার্মাণ ফ্যাসিষ্ট্‌রা ক্ষিপ্ত পশুর বর্ব্বর আক্রোশে সাশার মৃতদেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কেটে ফেললো।

আঁদ্রে

আঁদ্রে কোঁদ্রাতিয়েভ্ নামে একটি স্কুলের ছাত্রের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যে গেরিলাদলে ছিল, তারা জার্মান অধিকারভুক্ত একটি শহর আক্রমণ করবে স্থির করলে। সেও দলের গেরিলাদের সঙ্গে সেই অভিযানে অংশ নিলে। গেরিলারা গিয়ে চৌকিদারকে প্রথমে সাবাড় করে' ফ্যাসিষ্টদের একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধোপকরণের গুদামে আগুন ধরিয়ে দিলে। সেই আগুনে গোলাবারুদ, বোমা আরো নানারকম সামরিক সরঞ্জাম আর খাবারের টিন ধ্বংস হয়ে গেল। সেই গেরিলাদের হাতে ৮৫ জন জার্মাণ অফিসার আর সৈনিক হত হ'ল আর শত্রুর বহু সামরিক সামগ্রী দখল করলে। আঁদ্রে নিজে শত্রুসৈন্যের হেডকোয়ার্টারের পেছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিল আর ষোলো জন অফিসার হতাহত করেছিল বাড়িটা বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দিয়ে। সেই ভীষণ বিস্ফোরনে সে নিজের প্রাণও বলি দিয়েছিল!

লীদিয়া জামিলেভা

আল্মা-আটা সহরে সামরিক হেডকোয়ার্টারে এসে একটি মেয়ে রনাঙ্গনে যাবার অনুমতি চায়। ফৌজে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে অবিলম্বে যোগাদানেচ্ছু মেয়েদের "আক্রমন" প্রতিহত করতে করতে এখানকার অধিনায়ক ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন; তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জবার দিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে-কেউ যেতে চাইবে, তার যুদ্ধ করতে না জানা থাক্লে চল্বেনা। তবে সে যদি শুশ্রূষা-বিদ্যা বা এ্যাম্বুলেন্সের কায জানে তা'হলে তিনি তার বিষয় ভেবে দেখ্তে পারেন এবং তার নাম লিখে নিতে রাজী আছেন।

"কিন্তু আমি শুশ্রূষার কায জানি, আমি একজন নার্স্" মেয়েটি সাগ্রহে বল্লে: নাম তার লীদিয়া জামিলেভা। "তা' ছাড়া আমি এরোপ্লেন চালাতে পারি, আর....."

"আর কী?" অধিনায়ক জান্তে চাইলেন; তাঁর একটু কৌতূহল হ'ল।

"আমি প্যারাচুটে নাব্তে পারি।" "ডুবুরি হ'তে পারি।" "স্নাইপার হতে পারি।"

উনিশ বছরের এই মেয়েটির দিকে তিনি বিস্মিত প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষন।

"আর পাহাড়ে উঠ্তেও পারি আমি," লীদিয়া জামিলেভা যোগ করলে।

অধিনায়ক প্রথম সুযোগেই তার অনুরোধ রক্ষা করবার কথা দিলেন। আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে লীদিয়া চলে গেল। প্রসঙ্গক্রমে সে উল্লেখ করেনি যে সে নিজে শুধু একজন ডুবুরি নয়, অন্য ত্রিশজন ডুবুরিকে সে শিক্ষাও দিয়েছে, এদের মধ্যে ক'একজন আবার লাল নৌবাহিনীতে ছিল। একথাও সে বলেনি যে গত বসন্তকালে সে এক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। এই বসন্তের বন্যা প্লাবনে একটি বড় সেতু ভেসে যাবার মতন অবস্থা হয়। তখন প্রয়োজন হ'ল মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে একজন ডুবুরির সেই তুষার শীতল জলের মধ্যে নেবে গিয়ে স্তম্ভগুলির শক্তি এবং বন্যা স্রোতে তাদের কি রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তার পরীক্ষা করা। সেই অনুসারে তাহলে ব্যবস্থা করা হবে। সেতুটি রক্ষা করেছিল এই মেয়ে লীদিয়া।

জোশিয়া

এক দূর সাগর-তীরস্থ প্রদেশ থেকে আগত অতিথিবর্গ এবং লাল ফৌজের সৈনিকরা প্রকাণ্ড খরযান ভরিয়ে ফেলেছিল। যোদ্ধাদের জন্যে তা'রা নিয়ে এসেছিল নানারকম উপহার ও অভিনন্দন।

যুদ্ধের বিষয় তাদের মধ্যে আলোচনা চল্ছিল। সুচান্ খনির শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি এক সদা-হাস্য মুখ বৃদ্ধের অনুরোধে একটি সুন্দরী মেয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল বল্বার জন্যে।

এই সুনয়নী কিশোরীটির নাম জোশিয়া। জোশিয়ার সাহসিকা এবং নির্মম স্নাইপার বলে সুখ্যাতি ছিল।

একবার'সে একাই দশজন জার্মান ফাসিষ্ট্ নিহত করেছিল। যুদ্ধের আগে তাকে খেলাধূলায় আখ্ড়ায় প্রায়ই দেখা যেত। যেমন ওস্তাদ খেলোয়াড় ছিল, সে বন্দুক ছুড়তেও তেমনি পারদর্শীনী। দিনের বেলায় সে কায কর'তো আর সন্ধ্যের পর পড়তে যেত শিল্প-বিদ্যালয়ে, কারণ ইলেক্ট্রিকের এঞ্জিন'য়ার হবার তা'র বড় ইচ্ছে ছিল!

তারপর বাধ্লো যুদ্ধ এবং তার ফলে জীবনে তা'র বহু পরিবর্তন ঘটে গেল। তার তরুণ মনে দু'টি মাত্র ভাব দানা বেঁধে উঠ্লো: ভালবাসা আর ঘৃণা; স্বদেশের প্রতি ভালবাসা আর তা'র প্রিয় মাতৃভূমির সীমান্তে যে আক্রমনকারী দল ঢুকেছিল হত্যা লুণ্ঠন আর জঘন্য অত্যাচার চালাবার জন্যে—তাদের প্রতি জলন্ত ঘৃণা।

গুলি ছোড়ায় তা'র অসাধারণ দক্ষতার জন্যে সৈন্য দলের পশ্চাদ্ভাগে সে নতুন সৈনিকদের গুলি চালানো শেখাতে লাগ্লো: একদিন একদল ওস্তাদ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যা'বার জন্যে তৈরী হ'ল, তখন জোশিয়া আর থাক্তে পারলে না। সেও তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসৈনিক হ'য়ে রণাঙ্গনে চলে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সে খুব কাজের মেয়ে হয়ে উঠ্লো; সারাদিন সে লড়াইয়ের কোন-না-কোন ব্যাপারে ব্যস্ত থাক্তো। একদিন জার্মানদের ট্রেঞ্চ থেকে অনতিদূরে একটা কায়ে অপেক্ষা করবার সময় হঠাৎ একটি ধূসর মূর্তিকে উপস্থিত হ'তে দেখ্লে সে আর ওম্নি ভালো করে' জোশিয়া বন্দুকে নিশানা করলে! তারপর একটিমাত্র গুলির আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রু মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শুরুতেই এই সাফল্যের জন্যে দলের কাছে অনেক অভিনন্দন পেলে সে।

মেয়ে হ'লেও তাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের রীতি-নীতির সঙ্গে লাল ফৌজ শীগ্গীরই মানিয়ে নিলে। মেয়ে হলেও তা'র ওপর অধিনায়কের সুশৃঙ্খল ও কঠিন আইন কানুনের কিছুই কম হ'লনা। ঠিক পুরুষ সৈনিকের মতন ব্যবহার পেতে লাগ্লো জোশিয়া। তার লম্বা সামরিক কোট গায়ে চড়িয়ে সে যখন কোন যুদ্ধাভিযানে বেরুতো লাল সৈনিকরা তাকে অভিনন্দন জানাতো, মঙ্গল কামনা করতো, সফল হয়ে আবার ফিরে আস্বার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতো।

একটি অভিযানের পর জোশিয়া আর ফিরলোনা। তেরো জনকে শেষ করে' ইবার সে বেরিয়েছিলো চতুর্দশ নাৎসীকে সাবাড় করতে। নিশানা করে' সে অব্যর্থ গুলি ছোঁড়বার ঠিক পরই আর একটা গুলি গর্জে উঠ্লো এবং সেই সঙ্গে এই সোভিয়েট কিশোরীর বীর হৃদয়ের স্পন্দন চিরদিনের জন্যে থেমে গেল। যে রুশ সেখানকার ফাসিষ্টদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে' তুলেছিল, তা'র জন্যে এক জার্মান বন্দুকধারী ছিল ওৎ পেতে এবং এই সুযোগ সে হাতছাড়া করেনি।

ষ্ট্রেচারে করে' জোশিয়াকে নিয়ে আসা হ'ল। ভীষণ যুদ্ধে অবিচলিত কতো কঠোর-হৃদয় সৈনিক, অসংখ্যবার যা'রা মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নির্মম সংগ্রামে মেতে উঠেছে, তারাও সেদিন এই বালিকার অপূর্ব বীরত্বের কথা স্মরণ করে' ফেলেছিল অশ্রুবিন্দু।

তারপর একদিন স্বচ্ছ সুন্দর প্রভাতে গাছের ছায়ায় তাকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমাধিস্থ করলে তার সহযোদ্ধা কম্রেড্রা। গভীর মৌনতার মধ্যে এই বীর বালিকার দেহ কবরে নাবানো হ'ল।

তার বিদায় অভিনন্দনে ভয়ঙ্কর শব্দে বাহিনীর বন্দুক গুলি গর্জে উঠ্লো: ফাঁকা কার্তুজ নয় এবং তার কবরের ওপরেও নয়। সেই শত শত জলন্ত গুলি ছুটলো রনাঙ্গনে—জোশিয়ার আততায়ীর মৃত্যু-সন্ধানে।

এই নির্ভীক আর উন্নতশির সোভিয়েট কিশোরীর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হ'ল ২৬ জন ফাসিষ্টের বিদেহ।

দূরের ঐ লোকটির দিকে আর দৃষ্টি রাখা গেল না, রাজার দুজন দেহরক্ষী আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু তারা দুএকপা আসতেই পূর্বের আহত দলপতি চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওগো তোমরা ওদের দিকে এগিয়ে যেয়ো না, তোমরা কিছুতেই ওদের ধরতে পারবে না।"

কিন্তু তারা এ কথায় কান দিল না, কেননা রাজার আদেশ তাদের পালন করতেই হবে।

আহত দলপতি বলল, "কি আর করব, আমার কথা যখন শুনলে না, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই, যাও আদেশ পালন কর।"

দেহরক্ষীরা তালে তালে পা ফেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, আর বোধকরি হাত পনেরো এলেই আমাদের ধরে ফেলবে। দর্শকেরাও ইতিমধ্যে আনন্দে খুব চেঁচাতে শুরু করেছে আর সেই সঙ্গে আমরাও অনিশ্চিত ভয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সমস্ত জনতাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে একজন দেহরক্ষী আগের ঐ দলপতির মতোই চিৎ হ'য়ে পড়ে পেটে হাত দিয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় দেহরক্ষীরও সেই দশা ঘটল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। তখন রাজা নিজে উঠল সিংহাসন ছেড়ে।

রাজার মুখ বর্ষার ঘন মেঘের মতো কালো এবং গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। দুজন বলবান দেহরক্ষী হঠাৎ চিৎ হ'য়ে পড়ে গেছে, মস্ত ভাবনার কথা। রাজা খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, এবং পকেট থেকে অনেকগুলো বাদাম ভাজা এক-সঙ্গে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, সে নিজেই এসে ধ'রবে আমাদের।

রাজাকে উঠতে দেখে আমাদের মনে জাগলো কৌতূহল। এতক্ষণে আমাদের মনের ভয় সব কেটে গেছে, তার উপর আমাদের মনে ভরসা জেগেছে যে আর আমাদের কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। ভাবলাম রাজাও নিশ্চয়ই চিৎ হ'য়ে পড়ে যাবে এবং এতগুলো লোকের সামনে তার লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

রাজাকে উঠতে দেখে সর্দার তার পা জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, "মহারাজ, আপনি এমন কাজ করবেন না, দেখছেন তো দেহরক্ষীরা অবধি হার মেনেছে, আপনি কি করে পারবেন?"

রাজা গম্ভীরভাবেই সর্দারকে বলল, "তোমরা কেন চিৎ হ'য়ে পড়লে সেটা আমার নিজের একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।"

সর্দার এর উত্তরে আর কিছু বলতে সাহস করল না। সে রাজার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা প্রশ্ন করল, "কি ক'রে মাটিতে পড়লে বল তো সর্দার।"

সর্দার বলল, "হঠাৎ কি যেন একটা, যেন কারো মাথা, পেটে ভয়ানক জোরে এক গুঁতো মারল, টাল সামলাতে পারলাম না।"

"সবই কি ঐ একই কারণে পড়ে গেছে।"

"আজ্ঞে মহারাজ, ঐ একই কারণে।"

"আমার পেটে ইস্পাতের বর্ম বাঁধা আছে, দেখাই যাক না তার অদৃশ্য মাথায় কত জোর।" এই ব'লে এগিয়ে কিন্তু খুব যে সাহসের সঙ্গে তা নয়, কেননা দেখলাম, রাজা একখানা হাত দিয়ে পেট চেপে ধ'রে খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। ভাবখানা এই যে যেমন ক'রে হোক পেটটা বাঁচাতে হবে, মোটা রাজার পেটে যদি চোট লাগে তা হ'লে বড় মুস্কিল হবে। রাজার সঙ্গে এগোতে লাগল তার দেহরক্ষীরা, তারাও রাজার অনুকরণে (আত্মরক্ষার তাগিদেও বটে) নিজের নিজের পেট চেপে রাখল।

আমরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি কখন রাজা চিৎ হ'য়ে পড়ে। একবার ভয় হচ্ছে যদি না পড়ে। কিন্তু যাক্ মুহূর্ত্তেই সকল ভয় দূর হ'য়ে গেল। রাজা কয়েক পা এগিয়ে আসতেই—এবারে আর চিৎ নয়—উপুড় হ'য়ে মাটিতে পড়ে "পিঠ গেল, পিঠ গেল" বলে কেঁদে উঠল। দেহরক্ষীরা একলাফে রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠ টিপে দিতে লাগল। উপুড় হ'য়ে পড়তে দেখে আমরা ত ভাবনায় পড়লাম, আক্রমনের রীতি বদল হবার কারণ কি? পরেই মনে হ'ল নিশ্চয়ই এ আমাদের বন্ধু বাঘের কাজ, নইলে এমন রসিকতা আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ জাত-শিকারী না হ'লে শিকারের দেহে দুর্বলতম জায়গা কোন্‌টি তা আর কেউ কি ক'রে জানবে?

রাজা যখন পেট সামলাতে ব্যস্ত তখন পিঠের কথা তার একেবারেই মনে হয়নি। অথচ দুদিক একসঙ্গে না সামলালে বিপদের হাত থেকে বাঁচা যায় না, আর নির্বোধ রাজা এই কথাটাই জানত না।

কিন্তু রাজার পতনের মত এমন বিপজ্জনক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আর একদিকে আর এক মজার কাণ্ড ঘটল। সেই যে-লোকটির মুখ চেপে ধরে কতকগুলো লোক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সবার দৃষ্টি পড়ল এবারে তার দিকে। রাজা উল্‌টে পড়ার পর তাকে আর কেউ সামলাতে পারল না, সে একেবারে দুর্দান্ত হ'য়ে উঠল। আর সন্দেহ রইল না যে, সেই লোকটি স্বয়ং খিলং। সে এমন জোরে হেসে উঠল এবং হাসির সঙ্গে সঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল যে তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারল না। এতক্ষণ সবাই এইটেই ভয় করছিল, আর সেইজন্য সবাই তার মুখ চেপে ধ'রে রেখেছিল।

কিন্তু খিলং-এর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, হাসি পেলে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। সে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াতে লাগল, তা দেখে দর্শকেরা কেউ হাসি চাপতে পারলে না, সবাই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। রইল শুধু রাজা, তার দেহরক্ষীরা, সর্দার, আর রইলাম আমরা। কিন্তু তা ছাড়াও আরও একজন রইল। কিন্তু রইল বললে ঠিক হবে না, কারণ খিলং সেই যে হাসতে আরম্ভ করেছিল, সেই থেকে তার হাসি আর থামেনি। খিলং-এর হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, সে যখন হাসে সে সময় তার সর্বাঙ্গ হাসতে থাকে—তার হাত পা হাসে সবচেয়ে বেশি, তার মুখ চেপে ধরলেও তার হাসির ব্যাঘাত হয় না।

খিলং-এর হাসি দেখতে লাগলাম মাঠের উপর। সে মাটিতে পড়ে হাসছে আর গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এমনি করে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে আধ মাইলেরও বেশি চলে গেল গড়াতে গড়াতে। শেষে আর তাকে দেখাই গেল না। খিলং-এর ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে, কারণ রাজা সেদিকে মোটেই লক্ষ্য করেনি—তার মনোযোগ এখন অন্য দিকে, মানে আমাদের দিকে, নইলে খিলং-এর সেদিন বেঁচে থাকতে হ'ত না।

রাজা আমাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, "একি কাণ্ড! সামান্য দুটো ছোট ছেলের (দুটো ছেলে এইজন্য

যে মণ্টুকে রাজা আর দেখতে পায়নি, সে পকেটে আছে) এমন ক্ষমতা যে এতগুলো লোক তাদের কাছে হার মেনে গেল। কিন্তু……এরা মানুষ তো ?''

রাজার মনে এই কথা জাগতেই সে তার দেহরক্ষীদের সঙ্গে গোপনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল। আমরা কিন্তু একই জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। বাঘ এসে চুপে চুপে আমাকে বলল, ''ওদের আচ্ছা জব্দ করেছি, আর আমাদের কোনো ভয় নেই, এখন আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত। তবে এতগুলো লোকের পেটে আর রাজার পিঠে গুঁতো মারতে মারতে আমার মাথায় বেশ একটু ব্যথা হয়েছে।''

আমি বললাম, ''কাছে এগিয়ে এসো, তোমার মাথাটা একটু টিপে দিই।''

বাঘ বলল, ''উঁহুঁ,মাথা টেপাবার মতো সময় আমার হাতে নেই, আমার আরও অনেক কাজ বাকী আছে।—তবে একটা কাজ কর তো ভাল হয়, তোমার পকেটে অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি আছে ? থাকে তো ডজনখানেক দাও, একবারে খেয়ে ফেলি, আমার আবার দু-একটায় কাজ হয়না।''

আমি বললাম, ''অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি তো আমার পকেটে নেই, কি করা যায় বল তো ?''

বাঘ বলল, ''তা হ'লে তো আর কোনো উপায়ই নেই—থাক, আমার মাথা ব্যথা একটু পরে আপনা থেকেই সেরে যাবে। তপস্যায় বসতে পারলে এখুনি সেরে যায়, কিন্তু এখন আর সময় নেই আমাকে এখন সব দিক দেখতে হবে। তোমরা রাজার দিকে লক্ষ্য রাখ, আবার ওরা যেন কি মতলব আঁটছে।''

রাজার দিকেই লক্ষ্য রাখলাম। দেখলাম রাজা উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং ঐ সঙ্গে দেহরক্ষীরাও! তাদের মুখের ভাব এবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম, সে এমন একটা ভাব যা লিখে বোঝানো যায় না। রাজা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে বলল, ''আর আমরা আপনাদের আক্রমণ করব না।''

কথাটা শুনে বিশ্বাস হ'ল, বলার ভঙ্গীতে বেশ আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল। রাজা বলতে লাগল, ''আমি বুঝতে পেরেছি আপনারা মানুষ নন দেবতা, আজ ভাগ্যগুণে আপনাদের দেখা পেয়েছি। এতক্ষণ না বুঝে আপনাদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছি তার জন্য আমার ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আপনারা আমার প্রতি কৃপা করুন।''

আমি দেখলাম এ এক মজা মন্দ নয়, রাজা আমাদের দেবতা মনে করেছে! মণ্টুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটু পরামর্শ করে নিলাম, বাঘের সঙ্গেও দুএকটা কথা হ'ল, এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক করলাম রাজার ভুল ভাঙব না। রাজাকে বললাম, ''এখন তা হ'লে বুঝতে পেরেছ আমরা কে ?—আমরা স্বর্গ থেকে মানুষের ছদ্মবেশে নেমে এসেছি তোমাদের দেশে। তোমরা আমাদের উপর যে অন্যায় করেছ সে জন্য আমরা মনে কিছুই করিনি, কারণ তোমরা তো আর আমাদের চিনতে পারনি। তবে অন্যায় যে একেবারেই করনি তা নয়। ধর, দেবতা না হ'য়ে যদি আমরা মানুষই হতাম তা হ'লেই কি আমাদের উপর এই রকম অত্যাচার করা তোমাদের ঠিক হত ?''

রাজা অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলতে লাগল, ''কথাটা ঠিকই বলেছেন, মানুষের উপরেই বা আমরা অত্যাচার করব কেন ? ওটাও আমাদের অন্যায়। যাই হোক, আর কখনও এমন কাজ করব না। কিন্তু দেবতা, যদি আমাদের উপর আপনারা এতটা দয়াই প্রকাশ করলেন তখন একটি অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।''

মণ্টু বলল, ''নিশ্চয় রাখব, বল কি তোমার অনুরোধ।''

রাজা বলল, ''আপনারা চলুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাদের নিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেইখানে আপনাদের পূজা করব। নতুন একটা মন্দির গড়াব, আপনাদের যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না।''

মণ্টু বলল, ''সে কি ভাল হবে ? স্বর্গ ছেড়ে দুএকদিনের জন্য এসেছি। আমরা স্বর্গের স্কুলে পড়ি, তিনদিন মাত্র আমাদের ছুটি, সেই ছুটিতে ব্যাঘ্রবাহনে আমরা এখানে এসেছি, ছুটি ফুরোবার আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।''

রাজা প্রশ্ন করল, ''ব্যাঘ্রবাহন কি ?''

আমি বললাম, ''আমাদের এক বাহন আছে তার নাম রয়্যাল বেঙ্গল, তাকে আমরা হিমালয়ের এক গুহায় রেখে এসেছি।''

রাজা আর একটু এগিয়ে এসে বলল, ''দোহাই দেবতা, আপনারা আমাকে ফাঁকি দেবেন না, আপনাদের অন্ততঃ দিন সাতেক আমার মন্দিরে থাকতেই হবে। সাতদিন পরে পূর্ণিমা, সেই পূর্ণিমায় আপনাদের খুব ঘটা ক'রে পূজা দেব, তারপর আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাবেন।''

আমি বললাম, ''সে হয় না রাজা, স্কুল কামাই করলে আমাদের জরিমানা হবে, স্বর্গের বড় কড়া নিয়ম।''

রাজা বলল, ''জরিমানা কত লাগবে বলুন, আমি রাজকোষ থেকে তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনাদের কিছুতেই ছাড়বো না।''

এই কথা বলে রাজা আমাদের খুব ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করল, তা দেখে দেহরক্ষীরাও আমাদের পায়ের ধুলো নিল, কেবল সর্দার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল ; কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়, সেও এগিয়ে এসে আমাদের প্রণাম করল, কিন্তু তার মনে তখনও কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে এটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু খানিকটা মজা করার জন্য নিজেদের দেবতা ব'লে স্বীকার ক'রে এ কি হ'ল ? শেষে সত্যিই মন্দিরে দেবতা হয়ে থাকতে হবে নাকি ? মণ্টুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম, ''সে বলল, ক্ষতি কি ?''

ঠিক এই সময় পকেটটা খুব ভারী মনে হ'তে লাগল, পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড! আমার মানিব্যাগ ছিঁড়ে নিতাইয়ের মাথা বেরিয়ে পড়েছে। নিতাই বলল, ''শীগগির আমাকে মুক্ত ক'রে দাও।''

নিতাইকে ব্যাগ ছিঁড়ে মুক্ত করলাম, সে মাটিতে নেমে চট্ ক'রে আগের মতো বড় হ'য়ে গেল। এতক্ষণ সে ছোট হয়েছিল ভয়ে, কিন্তু পকেটে থেকেই রাজার কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে তার বিপদ কেটে গেছে, তাই আনন্দে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছিল।

মানিব্যাগটা আমার হাতেই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে যে গোটাকত পয়সা ছিল, গেল কোথায়? নিতাই বলল, ''ভয় নেই, সেগুলো আমার পকেটে আছে, ব্যাগ ছিঁড়ে গিয়েছিল বলেই পয়সাগুলো আমার পকেটে পুরেছি।''

নিতাইয়ের পকেট থেকে এইভাবে বেরিয়ে আসা দেখে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার আর সন্দেহ রইল না যে আমরা খাঁটি দেবতা। রাজা এবং আর সবাই তখন নতুন ক'রে নিতাইয়ের পায়ের ধুলো নিল। সর্দারের মন তখনও সন্দেহে দুলছে !

রাজা বলল, ''আপনারা এখানে আর একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'' বলেই তিনি দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন, ''লোক ডাক, শোভাযাত্রার আয়োজন কর, আর তিনটি সিংহাসনের বন্দোবস্ত কর।''

সর্দার বলল, ''একটি এখানেই আছে।''

রাজা বলল, ''তা হ'লে আর দুটো আনলেই হবে।''

দেহরক্ষীরা ছুটে গেল শোভাযাত্রার আয়োজন করতে। সর্দার সব দেখে শুনে হতভম্ব হ'য়ে বসে রইল।

রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ''আমার দেশটা আপনাদের কেমন লাগল বলুন।''

আমি বললাম, "সত্যিই খুব চমৎকার। এরকম দেশ আমরা বোধ হয় আর দেখিনি, ভারি ভাল লেগেছে আমাদের। বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছে তোমাদের হোটেল, তোমাদের ডাক্তার, তোমাদের পাঠশালা, তোমাদের থিয়েটার আর তোমাদের নাট্যকার। তা ছাড়া তোমাদের পথঘাটও আমাদের কাছে খুব মনোরম মনে হয়েছে। যত আবর্জনা সব রাস্তার উপরে ফেলা হয় এবং সমস্ত পথে যে রকম দুর্গন্ধ, তাতে মনে হয় তোমাদের সহ্য করার ক্ষমতা অন্যদেশের মানুষের চেয়ে খুব বেশি। তোমাদের হোটেলে এঁটো ভাত খাওয়ার ব্যবস্থাতেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবার মধ্যে বেশ বেড়ে গেছে নিশ্চয়।"

রাজা একটু হেসে বলল, "কজন লোক এটা বুঝতে পারে?"

আমি বললাম, "লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, তোমাদের তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যা ভাল মনে করবে তাই করবে।"

রাজা খুসী হ'য়ে বলল, "যদি একটু উৎসাহ দেন তা হ'লে তাই করব।"

এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করতেই শোভাযাত্রার দল এসে হাজির হ'ল, তাদের সব নানা রঙের পোষাক সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্র।

আমরা তিনজন তিনটে সিংহাসনে গিয়ে বসলাম। এমন হাসি পাচ্ছিল যে কি বলব! সিংহাসনের নীচে বাঁশ বেঁধে প্রত্যেকটি সিংহাসন চারজন ক'রে লোক ঘাড়ে তুলে নিল। আমাদের অনুসরণ ক'রে চলল হাজার হাজার লোক—তাদের চীৎকার আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কান ফেটে যেতে লাগল।

পথের দুধারে লোক আর ধরে না। স্বর্গ থেকে তিনটে ক্ষুদে দেবতা স্কুলের ছুটিতে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে, কথাটা শহরের মধ্যে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই ঘর থেকে বেরিয়েছে আমাদের দেখতে। আমরা সিংহাসন থেকে তাদের প্রণাম গ্রহণ করতে লাগলাম।

শোভাযাত্রা সমস্ত শহর ঘুরে একটা ছোট পুকুরের ধারে এসে থামল। সেই পুকরের ধারে ছোট একটা মন্দির ছিল, সেইখানে আপাতত আমাদের থাকার জায়গা ঠিক হ'ল। হাজার হাজার লোক এল আমাদের দেখতে আর পায়ের ধূলো নিতে। কিন্তু অত ধূলো পাব কোথার? বললাম, আমরা কাউকে পায়ের ধূলো দিই না, আমরা এখন মানুষের ছদ্মবেশে আছি, এ অবস্থায় আমাদের ধূলোর কোনো দাম নেই।"

কিন্তু কারো কানেই সে কথা গেল না, আমরা মন্দিরের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সবাই সেইখানকার ধূলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে যেতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, জায়গাটায় মস্ত এক গর্ত হ'য়ে গেছে।

ক্রমশঃ

ঋতু-ছড়া

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

গ্রীষ্ম

আকাশের কোণে আগুন লাগল বুঝি
আগুন গরম সব বাতাস—
তপ্ত বাতাসে ঘুরে ঘুরে ওঠে ধুলো,
শীর্ণ ডালের আঙুল আকাশে মেলে
ছায়া চায় গাছ গুলো।
বৈশাখ চলে লাল প্রান্তর পথে
শ্বাসে তার কাঁপে শুকনো ঘাস॥

বর্ষা

খোয়াইএর সীমা সবুজ হোলো যে দেখি,
পাগল কোপাই ঘর ছেড়ে কোথা চলে?
"বর্ষা এসেছে খবর পাঠাল সেকি!"
শুধায় অবাক কেয়া ঝোপ দলে দলে।
সাঁওতাল দল বাজায় কোদাল ফেলে
মাদলে বাঁশীতে কাজরী নাচের সুর,
খুসী তালবন তাল দেয় সাথে সাথে
তেজা পাতা নড়ে আনন্দে ভরপুর॥

শরৎ

হঠাৎ কী হোল
সবাই পালাও কোথা?
এসেছে শরৎ তাকে আর ভয়টা কি?
শান্ত কোপাই, জানেনা কিছুই যেন,
তীরে তীরে কাশ জেগে দেয় মাথা ঝাঁকি।

বসন্ত

হঠাৎ আগুন জ্বলে পলাশের বনে,
"কেন রে, ওরঙে রঙাবি চুনট সাড়ী!"
বসন্ত বৌ ডেকে সারা আমবনে।
"তুলে দে মাথায়, মৌয়ার ঝুড়ি ভারী—
ঘরদুর সেই ভুবন ডাঙার কোণে।"
সূর্য্যও চলে, দেবে যে আকাশ পাড়ি।
ফাল্গুন খেলে আবীর ছড়ান খেলা
হঠাৎ রঙীন করে আকাশের কোণ
বাঁশীতে নাচেতে তারি আনন্দ মেলা
চলে ঘরে ঘরে মৌয়া মাতাল মন।
শালবন তার মুকুলে সে সুর শোনে
সারারাত ধরে তারাদের স্পন্দনে॥

এবার পূজোতে পৈছ্যা দিতেই হবে
বোনটি বলেছে,
কোমরে জড়িয়ে শাড়ী—
বৈজু ভাবে তা হাটপানে যেতে যেতে
ছাগলকে তাড়া দেয়, "চল, তাড়াতাড়ি॥"

হেমন্ত

সোনার হাসিতে আউশ ভরেছে ক্ষেত
ফসল কাটার ধুম চলে ঘরে ঘরে—
কাজ সারাদিন সময় কোথায় বেশী
গাওনা নাচের সময় মিলবে পরে।

হিমরাতে সব তারা মিটি মিটি জ্বলে
গাছপালা দেখে তাই কানাকানি করে,
সোনালী আঁচল কুয়াশার জালে ঢেকে,
হেমন্ত জাগে, নিশাসে শিশির ঝরে॥

শীত

আমলকী বনে পাতা খসে সারাদিন
কাটে সারাদিন মাঠে মাঠে যত চাষী
মৌমাছিদের গুঞ্জন থেমে যায়
সোনালী সবুজ ক্ষেতে পউষের হাসি।
পউষ এলগো, ধানকাটো তাড়াতাড়ি
পউষ এলগো, পাতা আনো ধুনী জ্বালো,
কাজ কর তার সাথে পোষলার গান
আঁধারে ফুল্‌কী, কাঁকণেতে জ্বলে আলো॥

চলন্তিকা

এ মাসের সব চাইতে বড় খবর, মহাত্মা গান্ধীর তিন সপ্তাহ কাল অনশন। গত ১৯৩৯ সালের অনসনের পর এইটিই প্রথম অনশন। অনশনের দ্বিতীয় সপ্তাহে গান্ধীজীর অবস্থা যেরকম উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছিল, তাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল, যে একটা মারাত্মক কিছু হতে পারে। পুণায় আগা খাঁর প্রাসাদ থেকে কি খবর আসে, তা শোনবার জন্যে সকলেই আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করে থাকত। পৃথিবীর নানাস্থান থেকে অসংখ্য লোক মহাত্মার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং মহাত্মাজীর অমূল্য জীবন রক্ষা করবার জন্যে অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ কিংবা ভারত-গবর্ণমেণ্ট কেউই তাঁদের কথায় কাণ দেন নি। ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের বহু সভ্য, আমেরিকার অসংখ্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এবং ভারতের বিশিষ্ট মণীষিগণ মহাত্মার মুক্তি দাবী করে বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো, ভারত সচিব মিঃ এমারি, ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের কাছে জরুরী 'তার' করেছিলেন। গত ৩রা মার্চ্চ সকাল ৯টায় গান্ধীজী তাঁর অনশনব্রত সমাপ্ত করেছেন। দারুণ শারীরিক সঙ্কটের সময়ও গান্ধীজী তাঁর নিজ অলৌকিক শক্তিবলেই সে সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছেন। এখন সারা পৃথিবী গান্ধীজীর নিরাপদভাবে অনশন ভঙ্গের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছে। একজন মনীষি বলেছেন, "গান্ধীজীই ভারতবর্ষ, গান্ধীজী ছাড়া ভারতবর্ষের কথা ভাবতেই পারা যায় না।"

গত শরৎকালে জার্ম্মাণবাহিনী ককেশাসে প্রবেশ করে গ্রজনী তৈল খনির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এবারের শীতে তাদের তো ককেশাস ছেড়ে দিতে হয়েছেই, উপরন্তু তাদের ক্রমে ক্রমে রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের অধিকৃত অঞ্চলগুলিও ছেড়ে দিয়ে সরে আসতে হচ্ছে। নীপার নদীর ধারে লালফৌজ ও নাৎসী বাহিনীতে প্রবল যুদ্ধ চলছে। বলাবাহুল্য, জার্ম্মাণরা কোন জায়গাতেই টিকতে পারছে না। এখন লাল ফৌজের জয়জয়কার পড়ে গেছে। উত্তর আফ্রিকায় মার্কিণ ও জার্ম্মানবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধটা টিউনিসিয়া রণাঙ্গণে হচ্ছে। ওদিকে গত শুক্রপক্ষে জাপানী বোমারুদল আর কলকাতার আকাশে আবির্ভূত হয় নি। দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে দুটো বড় বড় নৌযুদ্ধে জাপানীদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে!

সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে একটি নূতন ধূমকেতু সম্প্রতি দেখা গিয়েছে। এই সম্পর্কে মনে পড়ে যে, গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভারতে একটি ধূমকেতু দেখা যায়। সেই ধূমকেতুর মাত্র দুবছর পরেই আবার এই ধূমকেতুর আবির্ভাব! গতবারের ধূমকেতু (অনেকের মতে) রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ ও সুদূর প্রাচ্য যুদ্ধের সূচনা করেছিল। সেই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষকে আজ সামরিক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বর্ত্তমান ধূমকেতু কোন্ নূতন যুদ্ধের বা মঙ্গলামঙ্গলের সূচনা করে দেখা যাক।

এবারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবে যে বিপুল ঘাটতি হয়েছে, তা পূরণ করবার জন্যে ভারতের নানা জিনিষের ওপর নতুন ট্যাক্স নাকি ধার্য্য করা হবে, যেমন ঘি (বনস্পতি), তামাক প্রভৃতির ওপর

ট্যাক্স বসবে। এ ছাড়া টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ডাক (পোষ্ট কার্ড) ও কর্পোরেশন ট্যাক্স আরও বাড়াবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। এই ট্যাক্স-বৃদ্ধির ফলে আমাদের যে আরো অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একে ত এই দরিদ্র-দেশে জিনিষপত্রের অসম্ভব দাম বাড়ার জন্যে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, তারপর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত দুঃখ-দুর্দ্দশা আরো বেশী বাড়ল। বনস্পতি ঘি, তামাক ও ডাকবিভাগের খরচ বাড়ার জন্যে সাধারণ লোকদের যতটা আর্থিক কষ্ট ভুগতে হবে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের জন্য ততটা হবে না। কর্পোরেশন-ট্যাক্স বাড়ানোতে ভারতীয় নাগরিকদেরও বেশ অসুবিধায় পড়তে হবে।

গভর্ণমেণ্ট থেকে নানা রকমের উপায় উদ্ভাবন করা হচ্ছে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য, কিন্তু তা আর কাজে পরিণত হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই এখন আছি। সম্প্রতি চালের দাম ২৫।২৬ টাকা, হওয়ায় চারদিকে হাহুতাশ পড়ে গিয়েছে। চাল-ডালের দর বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও বাঁধা দরে অধিকাংশ সময়েই তা পাওয়া যাচ্ছে না। চাল, ডাল, চিনি, তেল ইত্যাদির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের সামনে লম্বা সার বেঁধে খদ্দেরদের দাঁড়াতে হচ্ছে। তাতেও যে সকলেই মাল পাচ্ছে, তাও নয়। অনেকেরই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এরকম শোচনীয় অবস্থা বুঝি এর আগে আর কখনও আসে নি। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান না হলে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র মত আর একটা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়াটা আশ্চর্য্য নয়। সম্প্রতি প্রস্তাব করা হয়েছে, যে বাংলা দেশ থেকে চাল অন্যত্র রপ্তানী করা বন্ধ হোক্। এটা খুবই ন্যায্য প্রস্তাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোনা যাচ্ছে যে, রপ্তানী নাকি এখনও চলছে।

পয়সার অভাব মেটাবার জন্যে এক রকম অদ্ভুত পয়সা প্রায় একমাস আগে বাজারে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাও এখন অদৃশ্য হয়েছে। ইতিমধ্যে সিকি, আনী, দুয়ানী প্রভৃতি খুচরা মুদ্রাগুলিও বাজার থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এখন টাকা ও আধুলিরই চলতি দেখা যাচ্ছে। এমনিভাবে খুচরা মুদ্রাগুলি কোথায় যে অদৃশ্য হচ্ছে, তা সত্যিই ভাবনার বিষয়।

আমেরিকাবাসী বিখ্যাত দৌড়-বীর গ্রেগরী রাইস সম্প্রতি ওয়াসিংটনে আড়াই মাইল মাত্র ১২ মিনিট ২৩-৩।২০ সেকেণ্ডে দৌড়ে পৃথিবীর এক নতুন রেকর্ড করেছেন। এই নিয়ে ৬১ বার পরপর রাইস জয়লাভ করেছেন। ১৯৪০ সাল থেকে কোন দেশেরই দৌড়-বীর তাঁকে আজও হারাতে পারেনি।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং, জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কনট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

তানিয়া ও আমরা

ইন্দিরা দেবী

সেদিন একটা গল্প পড়ছিলুম—গল্পটা এদেশের নয়, ওদেশের অর্থাৎ রাশিয়ার, যেখানে সব মানুষ সমান, যেখানে মানুষ পেয়েছে মানুষের সম্মান, যেখানে মেয়েরা পেয়েছে মানুষের মান। মেয়েরা যে কেবলমাত্র অন্তরের অন্তপুরে বা অন্দরমহলের পর্দানসীনা হ'য়ে নারী জীবন ধন্য করে দেয়নি, মেয়েরা ঘরের কাজ করেছে, স্ত্রী, মা বোনের গুরুতর দায়িত্ব তারা হাসি মুখে বরণ করে নিয়েও। প্রয়োজন মতো তারা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাণ দিয়েছে প্রাণ নিয়েছে হাজারে হাজারে তবু তারা হার স্বীকার করে নি, মাটি ছেড়ে দেয় নি। মেয়ে বলে, স্ত্রীলোক বলে মেয়েদের অক্ষম করে রাখা হয় নি।

সেই দেশের একটি মেয়ের গল্প পড়ছিলুম! বয়স তার কত হবে? বছর পনেরো—দশম শ্রেণীতে সে পড়ছিল। সুখে কাটছিল দিন, এমনি সময়ে হিট্‌লার বিশ্বাসঘাতকতা করে রাশিয়ার ওপর তড়িৎ-আক্রমণ চালাল। হঠাৎ আক্রমণে রাশিয়া হটে আসতে লাগ্‌লো, ছেড়ে আসতে লাগ্‌লো, নগর, জনপদ শিল্পপ্রধান দেশ, দু'হাতে পুড়িয়ে দিয়ে আসতে লাগল অনেক শ্রমের ফুল ফোটান মাটি। নিজের হাতে গড়া সুন্দর ঘর, ক্ষেত-খামার পুড়িয়ে দিয়ে রাশিয়ার জনসাধারণ পিছু হটে লাগ্‌ল। পাছে শত্রুর হাতে এই সব শস্য, খাদ্য-ভাণ্ডার, শিল্প-উৎপাদন কেন্দ্র শত্রুকে অধিকতর বলশালী করে, তাই চারিদিকে সুরু হলো, "পোড়া মাটির" নীতি। একটা সুন্দর দেশের চেহারা আগুনে পুড়ে কালো হ'য়ে এল।

ঐ যে পনেরো বছরের মেয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে, নাম তার তানিয়া। বুকে ছিল হঠাৎ জ্বলে উঠ্‌ল যুদ্ধের আগুন। তানিয়া বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো দেশের কাজে। রাত্রির অন্ধকারে নাৎসীদের ঘোড়ার আস্তাবল জ্বালিয়ে শত্রুকে দুর্ব্বল করতে চাইল সে। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়ে গেল। পরণে তার পুরুষের পোষাক। টুপি ধরে টান দিতেই রেশমের মতো চুলে লাগ্‌ল বাতাসের দোলা। তারপর সুরু হলো অত্যাচার। সে অত্যাচারের কথা তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। মানুষ যে পশুতে পরিণত হয় এবং তার চেয়েও নিচে নাম্‌তে পারে তা নাৎসী সেনা ও সেনাপতিরা প্রকাশ করল। সারারাত্রি ধরে তাকে মার ধোর করা হল, সারারাত্রি তাকে ডিসেম্বরের শীতের ভেতর খালি পায়ে তুষারের ওপর হাঁটান হল। ডিসেম্বরের শীত কোলকাতার বা দার্জ্জিলিঙএর মত নয়, রাশিয়ার এই নিদারুণ শীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে নাৎসী সেনাদের। কিন্তু শত অত্যাচারও আনিয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা তারা বলতে পারলো না। পরদিন সকালে রাস্তার ওপর তার গাঁয়ের লোকদের সামনে প্রকাশ্যে তাকে ফাঁসী দেয়া হল। কিন্তু ফাঁসির দড়ি গলায় পরে সে কি মৃত্যুভয়ে কেঁদেছিল? স্থির হয়ে তার গাঁয়ের লোকদের সে বলেছিল: হার স্বীকার করো না, যুদ্ধ করে যাও। জার্ম্মানদের বলেছিল, আমি একা নই, আমার মতো আছে লাখ লাখ, সবাইকে ফাঁসী দিতে পারবে?

—এমনি মেয়ে দেখি রাশিয়ায়—এমনি মেয়ে দেখি চীনে—এমনি মেয়ে দেখি ইংলণ্ডে ও পোল্যাণ্ডে —এমনি মেয়ে দেখি ফ্রান্সে। কিন্তু এমনি মেয়ে এ দেশে কি দেখা যাবে?

ওদের চোখে যখন স্বাধীনতার স্বপ্ন, দেশসেবার স্বপ্ন, দুঃখ জয়ের প্রতিষ্ঠা—আমাদের চোখে তখন পুতুল খেলার নেশা, বিলাসিতা ও বিভ্রম জাগানোর প্রতিজ্ঞা—

কিন্তু যুগ বদলাচ্ছে। মেয়েরা জাগছে। এ দেশের ভাবী কালের স্বাধীনতার স্বপ্ন চোখে, দেশ সেবার ও দুঃখজয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভাবী গৃহিণীর বৈঠকে মেয়েরা আপনাদের মুক্তি যজ্ঞের তপস্যায় মগ্ন আছে কি?

বছরের শেষে এই প্রশ্ন গেঁথে দিয়ে যেতে চাই দেশের ভাবী গৃহিণীদের অন্তরে অন্তরে।

বছরের শেষ মাস এলো। এই শেষ মাসের শেষে আস্‌বে নতুন বছর। কিন্তু নতুন বছরে নতুন জীবন আস্‌বে কি আমাদের? বর্ত্তমান বছরের শেষে শেষ হ'বে কি আমাদের অসহ বেদনা?—বছরের শেষ মাস নিয়ে আসে নানা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, যার কোন সদুত্তর বর্ত্তমান পৃথিবীর মরণ-মুখর আর্ত্তনাদের ভেতর খুঁজে পাইনে। কেবল চোখে পড়ে মানুষের কল্পণাতীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ, কেবলই কাণে এসে বাজে সমস্ত দেশের বেদনা-ক্লিষ্ট সকরুণ আর্ত্তনাদ। কোথায় এর শেষ কে জানে। শুধু জানি যে তোমরা জেগেছ, শুধু জানি তোমরা ভাবতে সুরু করেছে দেশবাসীর মর্ম্মকথা, শুধু জানি তোমরা তোমাদের কচি কোমল কিশোর হাত কাজের দিকে এগিয়ে দিয়েছ। সহস্র রকমের ব্যর্থতার ভেতর এই আমার পরম সান্ত্বনা। জানি ছোটরাই একদিন বড়ো হয়, ছোটদের ভেতর দিয়েই যুগে যুগে আবির্ভাব হয় বড়ো মানুষের!

আজকে বছরের শেষে বছরের শেষ কথা রেখে যাই তোমাদের মাঝে। যত কষ্ট যত দুঃখই আসুক না কেন—তোমাদের মাঝ দিয়েই আমরা দেখতে পাবো— একটা জাতির একটা দেশের একদল মানুষের নবজন্ম। সাধনা ও সিদ্ধি তোমাদের হাতে, তা কি তোমরা সবাই জানো? দেশের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও জাতির নেতাকে ভগবান রক্ষা করবেন—তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেছ, তোমাদের সঙ্গে আমিও যে ছিলুম। এসো এবার চিঠির জবাব দিই—

চিত্তরঞ্জন পাল (গ্রাঃ ১২৩৮ সিলেট) তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালুম। গ্রাহক হলেই আমাকে চিঠি লেখা যায়। **কল্যানী বিশ্বাস (গ্রাঃ বহরমপুর ১৮৫৪)** তোমার দু'খানা পোষ্ট কার্ড পেয়েছি। ধাঁধার উঃ দুটি ঠিক হয়েছে। খামের চিঠি পাইনি, মীরাকে তোমার কথা বলেছি। **বিমল, সুহাস, পরি ও বেরা (গ্রাঃ ১৮৬৬ মন্দির বাজার)** চিঠি পেলুম, লেখনী—বন্ধু তো গেছে—দেখা পাও নি? **বিমল দত্ত (গ্রাঃ ১৩৬৬ মেদিনীপুর)** ইংরেজিতে ঠিকানা কেন? চিন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠির জবাব পাওনি ক' সংখ্যা আগেকার রংমশালে? তোমার প্রার্থনার সঙ্গে সমস্ত ভাইবোনেদের প্রার্থনা আছে জেনো। **রেখা বসু (গ্রাঃ ১৩৩৬?)** নিজের ঠিকানা দাও না কেন? চিন্ময়ের চিঠির উত্তর খুঁজে পড়ো, দল গঠনের চেষ্টা করো, হাল ছেড়ে দিও না, তীর মিলবেই একদিন। **দিলীপকুমার কানুনগো (গ্রাঃ ১৮৭৩ চট্টগ্রাম)** প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য যেটা অন্তরে ঘা দিয়েছে তার সত্যতা তো অস্বীকার করতে পারো না? রচনার বিচার ভার তো আমার ওপর নয়। **দেওয়ান তৌফিকর রহমন ও নছিয়া খাতুন (গ্রাঃ ১৩৪১ রাজসাহী)** তোমাদের চিঠি মন দিয়ে পড়লুম—তোমাদের চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করি নি—তা কেমন করে ভাবতে পারলে? অভিমান করে দূরে চলে যেতে চাও কিন্তু দূরে গিয়ে কি থাকতে পারবে? তোমাদের বিদায় তো আমি দিতে পারি না—কেমন করে তোমরা বিদায় নেবে দেখি! প্রশ্নের উত্তর আগামী বারের জন্য তোলা রইল। রাগ কমবে তো? **সুরথ বসু (গ্রাঃ ১১১৮ রংপুর)** বন্ধুর স্মৃতির জন্য প্রতিযোগিতায় পদক দিতে চেয়েচ! পদক পাঠিয়ে দিও। আগামী মাসে বিষয় নির্ব্বাচন করে দেবো কেমন?

মীরা সান্যাল (গ্রাঃ ১২৮৩ রাজসাহী) ইন্দিরাদিকে তোমার কথা জানিয়েছি। **জ্যোতির্ময় ঘোষ** (গ্রাঃ ? ঢাকা) গ্রাঃ নম্বর দাও নি কেন? যা পাঠিয়েছ যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। "জাপানী বোমায় যদি মারা যাও তাহলে আমাদের আর একজন "প্রিয় দিদিভাই কে হবে?"—প্রশ্নের উত্তরটা তোমাদের সকল ভাইবোনের ওপর ছেড়ে দিলুম। তবে জাপানী বোমায় আমি মরবো না—এ আমি জানি। **সাধনা সরকার (গ্রাঃ ৭৬৫ গৌহাটী)** হঠাৎ মনে পড়লো বুঝি? রেখা দাস গুপ্ত তোমার চিঠির উত্তর দেয়নি—তাকে উত্তর দিতে বলছি। **প্রবোধ চন্দ্র বসু** (গ্রাং ১৭৭৪ **মেদিনীপুর**) ইচ্ছে ছিল তোমার চিঠি খানা তোমার ভাইবোনদের উপহার দিই কিন্তু স্থানাভাব। ভারি মজার চিঠি খানা। লেখনী বন্ধু আমায় করবে? আমি তোমাদের সকলের। ঠিকানা তো জানো। **ভ্রমর** (গ্রাঃ ১৮৪ **পাটনা**) ভুল করেছ শুধ্‌রে নিলেই হল—সেজন্য এত করে ক্ষমা চেয়েছ কেন? তোমার প্রার্থনার সঙ্গে আমাদের সকলের যোগ আছে জেনো। **অতুলচন্দ্র মাহাত** (গ্রাঃ ১৩৮৫ **মেদিনীপুর**)—তোমার প্রশ্নগুলো পেয়েছি। এমন কতকগুলো প্রশ্ন করেছ যার কোন মানেই হয় না—যেমন বাংলায় বাঘ কত? বাংলার কবি কত? বাকি প্রশ্ন গুলোর জবাব আগামী বারের জন্য তোলা রইল। **সাধনচন্দ্র বসু** (গ্রাঃ ১৫২৩ **কালীঘাট**) তোমার চিঠি পেলুম, পরিমলবাবুকে বল্‌ব আষাঢ়ের দেশের কতগুলো ফটো তুলে তোমাদের উপহার দিতে। **রবীন্দ্রনাথ মজুমদার** (গ্রাঃ ১৫২৫—**খাগড়া**) শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে এসেছ শুনে খুব খুসী হলুম। সমস্ত পৃথিবীর তীর্থ এটি। অবনীন্দ্রনাথের মতো মজলিসী মানুষ খুব কম দেখেছি। কত বড় অথচ কত সহজ সরল। এমন মানুষ আর হয় না। জীবনকে সুস্থ সুন্দর ও ব্যবহারিক জীবন সহজ করবার জন্যে মানুষের অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। কাজেই ও সবগুলোর প্রয়োজন আছে। **নেপাল মুখোপাধ্যায়** (গ্রাঃ ১৬৯২ **বাঁকুড়া**) গতবারে গ্রাঃ নম্বর ছাপাতে ভুল হয়েছিল, তোমারই ঠিক। লেখনী বন্ধুর কথা এর আগে তো বলেছি একটু খুঁজে পড়ে নিও। **রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস** (গ্রাঃ ? **কলিকাতা**) গ্রাঃ নম্বর দাও নি কেন? তোমার লেখা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। পোঃ কার্ড পাঠিয়েছ কিন্তু কি করবো এটা নিয়ে? **সনৎকুমার রুদ্র** (গ্রাঃ ১৮৭৭ **কলিকাতা**) চিঠি পেলুম তোমার। আষাঢ়ের দেশ খুব ভালো লাগ্‌ছে? যাঁর লেখা চেয়েছ—ভবিষ্যতে তাঁর লেখা তোমাদের উপহার দেবো দিশ্চয়। "রংমশালের রঙীন নিশান আজও উড়ছে। এর চেয়ে সুখের আর কী আছে?"—এ শুধু তোমার একার অন্তরের কথা নয়, একথা তোমার সকল ভাইবোনের প্রাণের কথা। **অধীর রঞ্জন দাস** (গ্রাঃ ১৩৪২ **বরিশাল**)—হ্যাঁ, কলিকাতায় আছি আর থাক্‌বও। "দিদি আপনার কাছে অনুরোধ রংমশাল যেন বন্ধ না হয়"—এতউত্তর কি দেবো? তোমাদের সঙ্গে আমারও এ প্রার্থনার যোগ আছে। **অমিয়া চট্টোপাধ্যায়** (গ্রাঃ ? **পুরুলিয়া**) গ্রাঃ নম্বর দাও নি কেন? তোমার ও তোমার বন্ধুর লেখা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। চিঠিখানা বেশ লাগ্‌ল। আমার জন্যে মন কেমন করে? তোমাদের জন্য আমারও ঠিক এমনটি হয়। **অমিয় মোহন বসু (—ঢাকা)** চিঠির বাস্কে গ্রাহক গ্রাহিকাদের চিঠির উত্তর দেবার নিয়ম, তবু তোমার বেলা সে নিয়ম ভঙ্গ করলুম। গ্রাহকদের লেখা মাঝে মাঝে ছাপা হয়ে থাকে। গ্রাহক না হলে গ্রাহকদের পাতায় লেখা ছাপা হয় না। তবে অন্যত্র (রংমশালে) ছাপা হতে পারে। যারা রংমশালে লেখে তারা কি সবাই গ্রাহক?—তা কি কখন হয়। বড়ো চিঠি তবু মন দিয়ে পড়েছি। বিচারের ভার তো আমার নয় ভাই। তবু যাতে তাড়াতাড়ি সব খবর পাও তার ব্যবস্থা হচ্ছে। ডাক টিকিট পেলুম, চিঠি শিগ্‌গির যাচ্ছে। গত বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি রংমশাল পাওয়া যাবে।

অপূর্ব্ব লাল মজুমদার (গ্রাঃ ১৭৮৩ **কৃষ্ণনগর**)—তোমার চিঠি পড়লুম। ছাপার ভুলে ও

রকম হয়েছে, ইচ্ছে করে কেউ কি ও রকম করে নাকি? তোমার পাঠান ঠিকানায় রংমশাল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তোমার লেখনী বন্ধু, তোমায় জবাব দেয় নি? অত্যন্ত অন্যায়। তাকে আর একবার লিখো। আমি তো লিখ্‌তে জানি না তবু তোমার জন্যে চেষ্টা করব—ঠিকানা দিয়ে ডাক টিকিট পাঠিও। **গীতা ঘোষ** (গ্রাঃ ৩৩৫ **বালিগঞ্জ**) আমাকে আপনি না বলে তুমি বল্‌লেই আমি খুব খুসী হই। লেখনী বন্ধু পেতে গেলে তিন পয়সায় ডাক টিকিট পাঠাতে হয়—যাকে যাদের লেখনী বন্ধু হিসাবে চাও তাদের নাম ও গ্রাঃ নম্বর জানিও কেমন? **গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (গ্রাঃ ১৭২২ **পাটাভোগ**) তোমাদের কাউকে আমি ভুলি না, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছ?—আমার স্নেহাশীষ তোমাদের সমস্ত শুভ ও সুন্দর কাজের পিছনে আছে তা জানো না বুঝি? নিজের দেশ ও জাতির সেবা তোমাদের কাম্য হোক্। **'কালো মেঘ'** (গ্রাঃ ১৮৯৫ **কলিকাতা**) চিঠি পত্রের ভেতর ছদ্মনাম ব্যবহার করা ঠিক নয়—। ও তুমি নবাগত? তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালুম। লেখনী বন্ধু পেতে গেলে নিজের নাম ঠিকানা বয়েস এবং যাকে বা যাদের লেখনী বন্ধু হিসাবে চাও—তার বা তাদের নাম ও গ্রাঃ নম্বর জানাতে হবে, সঙ্গে তিন পয়সার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে। রংমশাল অফিসে গেলে লেখনী বন্ধুর দেবার অসুবিধা আছে। ছাপার ভুলে ওরকম হয়েছে। ভূতের দৌরাত্ম্য কমাবার জন্য পরিচালক মশাইকে রোজা ডাকবার জন্যে বলেছি তোমার কথামতো। **সুজিত কান্ত রায় ও বাণীকান্ত রায়** (গ্রাঃ ১৩০৪—**নৈহাটী**) তোমাদের বড় চিঠিখানা মন দিয়ে পড়লুম। প্রত্যেক পত্রিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান সমান নয়। কাজেই রংমশালে যা ছাপা হয় নি তা অন্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যা শুনেছ ভুল, বাজে এবং মিথ্যে কথা এ আমি তোমাদের বল্‌তে পারি। অন্য পত্রিকা কি করে তা জানি না কিন্তু রংমশালের প্রত্যেক গ্রাহকগ্রাহিকার লেখা মন দিয়ে পড়ে বিচার করা হয়—যাদের ওপর এভার তাঁরা কোন রচনা উপযুক্ত মনে করলে গ্রাহক গ্রাহিকার পাতায় স্থান দেয়া হয়ে থাকে। যদি গ্রাহকদের লেখা বিচার করা নাই হয় তবে মাঝে মাঝে গ্রাহকদের লেখা তোমরা দেখ্‌তে পাও কি করে? অনেক সময় রচনা ভালো হলেও ছাপাবার জায়গা করা যায় না কাগজের অভাবে। তা তো তোমরা সবাই জানো। "রংমশাল যেন বন্ধ হয়ে না যায়"—সে প্রার্থনায় আমারও যোগ আছে। তোমাদের অন্যান্য অনুরোধ রক্ষা করা হবে আগামী মাসে। **বরুণ রায়, অধীর, যতীন্দ্র**—তোমাদের চিঠি অত্যন্ত দেরীতে পাওয়ার দরুণ সবার উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ল না ভাই। বরুণ! তুমি ফিরে এসেছ জেনে ভারী আনন্দিত হলাম। তোমার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগুক সেই প্রার্থনা করছি। আজকে এ বছরের মত তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বছরের শেষে একথাই তোমাদের বারংবার বলি—নিজেদের যোগ্য করো দেশ জাতি ও মানুষের সেবার জন্যে।

আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসা তোমরা সবাই নিও। ইতি,

দিদিভাই

ভীড় করেছে রংমশালীর দলে
কেউ বা জলে কেউবা তারা স্থলে,
অজানা পথ রাত্রি দিনে
পায়ের কাছে পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

—রবীন্দ্রনাথ

নূতন ধাঁধা

ড্রাইভার কে--?

একটা ট্রেন চালায় তিনজন লোক ; তাদের নাম আলি, মাথুর ও আয়ার। তাদের মধ্যেই একজন হ'ল গার্ড, একজন ড্রাইভার ও একজন ফ্যায়ারম্যান্। এখন ঐ ট্রেনেই তিনজন যাত্রী ছিল, তাদেরও নাম—আলি, মাথুর ও আয়ার। মাথুর বাস করে দিল্লীতে ; গার্ড থাকে কলিকাতা ও দিল্লীর মাঝামাঝি। আয়ারের মাহিনা মাসিক ২৯০৲ টাকা। আলি হোটেলে ফ্যায়ারম্যানকে মেরেছিল। গার্ডএর পড়্সী যাত্রীদের একজন যে মাহিনা পায়, গার্ড পায় তার ৭ ভাগের ঠিক এক ভাগ। গার্ডের নামে যে যাত্রী সে কলকাতায় থাকে।

বল ত ড্রাইভার কে ? তার নাম কি ?

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

১নং—ন-৬, ব-৪, জ-১, ল-২, র-৩, ঘ-৭ ও ২নং—ন-৪, ব-৬, জ-২, ল-৮, র ৩, ঘ-৭।

১নং	২নং
৬৪১২	৪৬২৮
১২৩৪	২৩৩৬
৭৬৪৬	৭৪৬৪

আরও কয়েক প্রকার উত্তর করা যায়। বিষ্ণুপুরের যশোধন ভট্টাচার্য্য প্রায় ১৫ রকমের উত্তর দিয়েছে।

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম :

রেখা বসু, কিষণগঞ্জ ; কল্যাণী বিশ্বাস, বহরমপুর ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, কৃষ্ণনগর ; পিণ্টু, মিণ্টু ও সুরথ বসু, রংপুর ; গোপা, মা ও আশীষ দত্ত, শ্রীহট্ট ; সাবিত্রী, সতী ও গণেশ মুখোপাধ্যায়, পাটাভোগ ; প্রতিমা রাণী সাঁতরা, হাসনাবাদ ; যতিন্দ্রমোহন দে, শ্রীহট্ট ; গিরিজানাথ রায়, নৈহাটী ; মায়া ও দিলীপ গুপ্ত, লক্ষ্ণৌ ; বি, এ, ক্লাব, উলুবেড়িয়া ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর ; চিত্ত, নিত্য, বিনয় ও বিমান, ভোলা ; কল্যাণকুমার জানা, ভোগপুর ; শ্যামাচরণ রায়, কুবিরপুর ; শ্যামাপ্রসাদ, সৌরেন্দ্র ও নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়, বাদু ; শিশির মিত্র, বোম্বাই ; প্রণবানন্দ মান্না, অম্বরনাথ ; তরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ দিল্লী ; সিটি ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, দিল্লী ; গৌরগোপাল মিশ্র, মেমারী ; কুমারী যুথিকা দেবী, ভবানীপুর ; নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিহার ; কালোমেঘ, কলিকাতা ; সাধনচন্দ্র বসু, কালীঘাট ; দিলীপকুমার কানুনগো, চট্টগ্রাম ; নেপাল মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া ; আশুতোষ দত্ত, শ্রীহট্ট ; সুশীল, সুধীর ও অধীররঞ্জন দাস, বরিশাল ; চিত্তরঞ্জন পাল, সিলেট ; সতীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, পাটুলী ; গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ, হাওড়া ; পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, হাওড়া ; বৈদ্যনাথ দত্ত, পুরুলিয়া।

বি শে ষ বি জ্ঞ প্তি

আগামী বৈশাখে রংমশালের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হবে। যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাদের চাঁদা এই চৈত্রে শেষ হয়ে গেল, তাঁরা যেন অবিলম্বে নূতন বছরের চাঁদা মণি-অর্ডার যোগে রংমশাল কার্য্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। মণি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সকলের সুবিধা। ২২শে চৈত্রের (৫ই এপ্রিল) মধ্যে আমাদের কাছে চাঁদা পৌঁছালে, আমাদের কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। যাঁদের কাছ থেকে ২২শে চৈত্রের মধ্যে আমরা চাঁদা পাবো না, তাঁদের বৈশাখ সংখ্যা আমরা ভি-পি করে পাঠাব। সে ক্ষেত্রে তাঁরা যেন দয়া করে ভি-পি ফেরৎ না দেন।

আমরা নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদেরও আহ্বান করছি। রংমশালের বর্ষারম্ভ বৈশাখ থেকে। বার্ষিক চাঁদা—৩৲, ষান্মাসিক চাঁদা ১৷৷০ ; নীচের ঠিকানায় চাঁদা পাঠাতে হয়। রংমশালের অন্যান্য খবর নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য।

পরিচালক—রংমশাল কার্য্যালয়।
৯১।১১-এ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

১লা চৈত্র, ১৩৪৯।

বঙ্গশ্রী

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ.

বার্ষিক সূচীপত্র

অষ্টম বর্ষ

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫০

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখকলেখিকা	পত্রাঙ্ক
অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথ (জীবনী)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫৬
অদ্বৈত মহাপ্রভু (জীবনী)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৩৬০
অনঙ্গ পণ্ডিতের গল্প (গল্প)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪
অপমৃত্যু (গল্প)	শ্রীসুগত দাস গুপ্ত	৭৩
অভিশপ্ত বংশ (উপন্যাস)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	১৪৫,২৩১,২৯৪,৩৪০,৩৮৫,৪৩৮,৪৬৮,৫০৮
অস্তরবির আলো (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	২১৯
আজব হলেও গুজব নয় (সংগ্রহ)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪৭৮
আটলান্টিক চার্টার (প্রবন্ধ)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন	১৩৪
আদিম পৃথিবীর মাছ, সরীসৃপ ও পাখী (প্রবন্ধ)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮১
আঁধার থেকে আলোর দিকে (প্রবন্ধ)	যাদুকর শ্রীঅশোক সরকার	৪৬৬
আফ্রিকার যুদ্ধ (প্রবন্ধ)	শ্রীগোপাল হালদার	১১৯
আবছায়া (গল্প)	শ্রীজ্ঞানদাস ভট্টাচার্য্য	৪৯৮
আমাদের লাইব্রেরী		৪৯,৩২৩
আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১
আশ্চর্য্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ (জীবনী)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	২২২
আশ্চর্য্য স্তালিনগ্রাদ (প্রবন্ধ)	শ্রীভানু গুপ্ত	১১৯
আষাঢ়ে দেশে (উপন্যাস)	শ্রীপরিমল গোস্বামী	১১,৮৪
একটি দুরন্ত ছেলে (জীবনী)	শ্রীবিমল বসু	২৬
একটি Skylarkএর কাহিনী (কাহিনী)	শ্রীমতী এলিনা কনোনেকো	১৪১

বিষয়	লেখকলেখিকা	পত্রাঙ্ক
একনিঃশ্বাসের গল্প (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৩
এস্‌প্লানেডে সন্ধ্যা (কবিতা)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৮৩
কঞ্জুষের পালা (পালাগল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৫,৩৪৬,৩৮৭,৪১৪
কনভয় (প্রবন্ধ)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত	৫৪৫
কবি-স্মৃতি (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৬১
কাঞ্চনমালা (রূপকথা)	শ্রীরঞ্জিত ভাই	৪৫১,৪৮৯
কাজ, মৃত্যু ও অমৃত (অনুবাদ)	শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪২০
কাজের লোক জগাপিসি (গল্প)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৫৯
কালিদাসের বিদ্যালাভ (গল্প)	শ্রীইন্দিরা গুপ্তা	৫৩৭
কোথায় পূজোর আমোদ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৩১৭
কার কবি রবীন্দ্রনাথ (জীবনী)	শ্রীকেশব গুপ্ত	১৬৩
কারুক্ষে হাত দেখিও না (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৬৩
কেনারামের চিঠি (কবিতা)	ঐ	৪৫৬
কেমন করে তোতলামি সারে (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৫৭
খেলার মাঠে	কে, ভট্টাচার্য্য	৩২১
খুকুর কৈফিয়ৎ (কবিতা)	শ্রীতড়িতকুমার ঘোষ	৫৩৫
গ্যাস (বিজ্ঞানের বিস্ময়)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত	৪৭২
গল্প হলেও সত্যি (গল্প)	শ্রীঅশোক সেনগুপ্ত	২৪২
গুরুতম সমস্যা (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু	৪১০
ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী (সচিত্র)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	চৈত্রের প্রচ্ছদপট
চতুর্ভুজ লোক (বিজ্ঞানের বিস্ময়)	শ্রীঅমরেশ রায়	৩০৪
চলন্তিকা	৪৩,৮০,১৫১,২১৬,২৫৯,৩২২,৪০৭,৪৪৭,৪৮৫,৫২১,৫৫৭	
চাতরার গাঁয়ে (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	২৯৮
চিঠি ও অটোগ্রাফের মূল্য	শ্রীঅধীররঞ্জন দাস	২৪৭
চিঠির বাক্স	দিদিভাই ৩৯,৮৭,২০৮,২৫৭,৩৬৬,৪০৮,৪৪৪,৪৮৩,৫১৮	
চীন জাপান যুদ্ধের ছয় বৎসর	এল্, কে, সেনচৌধুরী	১১৪
ছাতুবাবুর ছাতা (গল্প)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩১৩
ছুটি (কাহিনী)	শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৫১৫
ছোটদের ছড়ার গল্প (ছড়া)	শ্রীজ্ঞানদানন্দিনী দেবী	৫১১
ছোটদের মন (কবিতা)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৫২৭
জীবন (নাটক)	শ্রীঅখিল নিয়োগী	৫১
জার্ম্মানীর পথে (ভ্রমণ)	ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ৪৭৫,৫১২,৫৫০	
ঝড় (কাহিনী)	শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৩৪৪

বিষয়	লেখকলেখিকা	পত্রাঙ্ক
ট্রাফিক পুলিস (কবিতা)	শ্রীরাখাল তালুকদার	২৯৮
ডাক টিকিট সংগ্রহ	শ্রীমতী সাধনা বিশ্বাস	২৪৫
তয়েরি গল্প (নাটিকা)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২৬২
তালগাছ (কবিতা)	আজমাতুন্নিসা বেগম	২৪৮
তিউনিসিয়া ডায়েরী		১৩২
দখিণ হাওয়া (কবিতা)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৪৮৮
দ্বিতীয় রণাঙ্গন (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রমোদকুমার সেন	১১১
দেশবিদেশে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	১৮০
দেশরক্ষার জন্য জনযুদ্ধ	শ্রীঅন্নদা ভট্টাচার্য্য	১২৩
দুপুরের বিল (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	২৯৩
দৌড়াদৌড়ির কথা (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৫৫৪
ধাঁধার উত্তর	৫০,৯২,১৫৪,২৫৬,৩৭১,৪১১,৪৪৯,৪৮৭,৫২৫	
ননী খুড়োর খেতাব প্রাপ্তি (কবিতা)	শ্রীযামিনীমোহন কর	৪১৯
নব যুগের কাব্য (কবিতা)	শ্রীচিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৪৮
নাবিক (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	৪১৩
নামায়ণ (বিচিত্রা)	বেনামী	৩৫
নিঝুম দুপুর বেলা (কবিতা)	শ্রীঅজিত সেন	৭৬
নিশীথের চাঁদ (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	৪৯৭
নীলনদের দান (রূপকথা)	শ্রীমানবেন্দ্রনাথ পাল	৪০২
নূতন ধাঁধা	৫০,৯২,১৫৪,২৫৬,৩২৩,৩৭১,৪১১,৪৪৯,৪৮৭,৫২৫	
নূতন প্রশ্ন		৫২৫
পরলোক সংবাদ (কাহিনী)	রায় সাহেব ৺রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৬০
পাখি ও পালক (প্রবন্ধ)	ডাক্তার সত্যচরণ লাহা	৫০৫
পাখি পোষা (কবিতা)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৬৪
পাগল (গল্প)	শ্রীউষা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৯
পায়ের তলার চটি (গল্প)	শ্রীশামুক	৫০০
পাহাড়ের স্মৃতি (ভ্রমণ)	শ্রীপথিক	২৩৮
পিটার প্যানের গল্প (অনুবাদ)	শ্রীরাখাল তালুকদার	৩৫৩,৪৩১
পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য (প্রবন্ধ)	শ্রীশীস্পতিপ্রসাদ পাল	৬৯
প্রণাম (কবিতা)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৫৯
ফল্গুস্রোত (কাহিনী)	শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত	৪৮১
বাইশে শ্রাবণ (কবিতা)	শ্রীরাখাল তালুকদার	১৮৬
বালক রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া	শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য	১৭৮

বিষয়	লেখকলেখিকা	পত্রাঙ্ক
বাড়ি মেলা ভারি দায় (কবিতা)	শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্ত্তী	৩০৮
বাংলা ভাষার উন্নতির চেষ্টা	শ্রীসতীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ	২৪৪
বিছার বিচার (কবিতা)	শ্রীশঙ্করী দাসগুপ্ত	১০
বিজ্ঞানের বিস্ময় (বিজ্ঞান)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৫
বিপদ	শ্রীযশোধন ভট্টাচার্য্য	২৫১
বিশ্বভারতী (প্রবন্ধ)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৫
বিশ্ববার্ত্তা (বিজ্ঞানের বিস্ময়)	শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত	৫৪৮
বুদ্ধিমান মরুভূমি (রূপক)	শ্রীরূপক	৫৪৩
বেদনা আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ	৬৮
বৈশাখ এলো (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৩৪
ব্ল্যাক আউটের ট্রাজেডী (গল্প)	শ্রীদুর্গাদাস সাহা	৬
ভগবানের চাবুক (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮,৫৬,২২৭,৩১৮
ভাই ফোঁটা (কবিতা)	শ্রীসত্যব্রত বসু	৪২২
ভিয়েন (ভ্রমণ)	ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস	৩৫০,৩৯৪,৪৪১
ভোজবাজী (গল্প)	শ্রীবিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য	৪১৭
ভোমার বিপদ (কবিতা)	বেগম সালেমা খাতুন	২১
মধু-মঞ্জলি (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	৫০০
মধুমালা (কবিতা)	শ্রীরবীনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৩৮
মরুর বুকে শ্যামল কুঞ্জ (প্রবন্ধ)		৯৮
মহাবীরের পুঁথি (চিত্র)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩,৬৩,২২৩
মহাযুদ্ধ (নাটিকা)	শ্রীইন্দিরা দেবী	১৩৮
ম্যাজিকের কারসাজি (ম্যাজিক)	যাদুকর শ্রীঅশোক সরকার	৭৭
মায়া-মুকুর (নাটিকা)	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫২৯
মাগো তোমার তেমন ছেলে (ছড়া)	শ্রীসুধীরচন্দ্র গোস্বামী	৪৭১
মানুষের যাত্রা (প্রবন্ধ)	নিবেদিতা, সব্যসাচী ও ইন্দ্রানীল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৫
মারলে কি ছেলে ভাল হয় (গল্প)	শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক	৩৯৮
মোগল দরবারে নিকোটিন (গল্প)	শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৮৬
মুদ্রা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (সংগ্রহ)	শ্রীসাধনা বিশ্বাস	৫৩৯
যুদ্ধ ও ভারত (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন	৯৩
যুদ্ধের টুকিটাকি (সংগ্রহ)		১৩৬
যুদ্ধের ফেরে (কবিতা)	শ্রীসত্যব্রত বসু	৪২২
যাঁরা আমাদের স্মরনীয় (জীবনী)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৪২৩
রংমশালের আলো (কবিতা)	শ্রীসুধীরচন্দ্র গোস্বামী	৩৬২

বিষয়	লেখকলেখিকা	পত্রাঙ্ক
রংমশাল চয়নিকা		১৯৯-২০৫
রংমশাল বৈঠক	গ্রাহকগ্রাহিকা	৪৭,৪৮,৯০
রংমশাল শিশু-সাহিত্য আসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি		১৮৭-১৯৮
রঙএর যাদু (বিচিত্রা)	শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৯২
রবীন্দ্র পূর্ণিমা ১৩৫০ (কবিতা)	শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী	১৬০
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার	২৩৪
রুশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টা (প্রবন্ধ)	ডাক্তার সার এ. এফ. রহমান	১২৮
রেকর্ড ব্রেক (গল্প)	শ্রীইন্দিরা গুপ্তা	২৯৯
রেশনিং (কবিতা)	শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী	৩১৩
লেকের ধারে এক সন্ধ্যা (গল্প)	শ্রীশোভনলাল মুখোপাধ্যায়	৪৬২
শঙ্কাহরণের সাহিত্য চর্চ্চা (গল্প)	শ্রীসুদ্ধসত্ত বসু	৪২৭
শাঙন প্রাতে (কবিতা)	শ্রীরেবারানী রায়	২৩৫
শিব দুর্গার বিয়ে (ছড়া)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০৬
শিশুর সখা	শ্রীচিত্রিতা গুপ্তা	১৭৫
শিশুরবি (কবিতা)	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
শীল্‌ড্ গাইড্ (গল্প)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	৩৩৩
শৈশব স্মৃতি (প্রবন্ধ)	শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪৩৪
শ্রাবণ (কবিতা)	শ্রীআশীষ দত্ত	২৫০
সমাধান (কবিতা)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩০২
সম্মিলিত জাতির ঘোষণা		১৫৩
সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৭১
সাপের রোঝা তিন কড়ি (গল্প)	শ্রীশামুক	২৮৮
সাহিত্যিকের আত্মহত্যা	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৩৬
সেদিনও এমনি শাওন আকাশে (কবিতা)	শ্রীজগদীশ রায়	১১৬
Stratosphere-অভিযান (রেডিও নাটক)	শ্রীচিত্র গুপ্ত	৩২৭,৩৭৫
স্মৃতি পূজা (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ	১৭৯
স্মৃতির লিখন	শ্রীসুধীর খাস্তগীর	১৬৭
হল্যাণ্ডের চিত্রকর (প্রবন্ধ)	শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়	৩০৯
হারানিধি (কবিতা)	বেগম সালেমা খাতুন	৫৪১
হিমালয়ে কিছুদিন (ভ্রমণ)	শ্রীঅপূর্ব্বলাল মজুমদার	২৫৩

পৃথিবীর
মেঘলোক
নিখিল-ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)

দাশপাবলিশার্স

পৃথিবীর
সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)

—পথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

নির্মল ভাইয়ের পরিচালনায়—

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর সম্পাদনার, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ
গীতিকার কবি শৈলেন রায় ও ছোটদের বন্ধু স্বনামধন্যা
লেখিকা শ্রীইন্দিরা দেবীর সহ-সম্পাদনায়

ছোটদের সচিত্র মাসিক

প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা — 'ছোটদের আসর' — বার্ষিক : তিন টাকা

প্রতি মাসে পি. বি. সরকার স্মৃতিভাণ্ডার প্রদত্ত কুড়ি টাকা পুরস্কার বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিদের দেওয়া হবে। কেবলমাত্র গ্রাহকগ্রাহিকারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে।

এর বিশেষত্ব হচ্ছে সকল বয়সী ছেলে মেয়েদের আনন্দ ও শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা : শিশু-মহল : ছয় থেকে বারো বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য গল্প কবিতা রঙিন কালিতে বড়ো টাইপে ছাপা ; তাছাড়া আছে : গানের খাতা : ছোটদের জন্যে গান সুর স্বরলিপি সহ ; ছোটদের নাটিকা ; ভাই বোনের লেখা ; গল্প উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী এবং আরো অনেক কিছু। আগামী বৈশাখে তোমাদের অভিবাদন জানাবে।

তিন টাকা পাঠিয়ে আজই গ্রাহক হও

ছোটদের আসর
১৬, এ, ডফ্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

বিমল বসু
কর্মকর্তা

ক্ষুধা-চঞ্চল

আলোক চিত্রশিল্পী—শ্রীপরিমল গোস্বামী

আশীর্ব্বাদ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

তৃণ বনে চলো লাফিয়ে·:
ঝর্ণায় পড়ো ঝাঁপিয়ে !
সরিতে সায়রে
ছড়িয়ে যা' ওরে !
জড়িয়ে যা' ওরে, সমুদ্দুরের শ্বাসে !
ভাসাও তরণী, ঢেউভাঙা উল্লাসে !

মরু, অরণ্যে, মেঘে,
তুষার হিমেতে চলগে,
বালুর আগুনে, বৃষ্টিতে, বনে,
পাথরের বুকে·····
হাসো !
পাতালে, খনিতে, মাটীতে, মণিতে,
পৃথিবীরে ভালোবাসো !

বাতাসের ডাকে ডাকে
ঢেলে দাও আপনাকে,
অফুর আশায় বুকের ভাষায় অঝোর কাহিনী
বলো!
মনের পালক ঝড়ের ঝলকে আলোকে উড়ায়ে
চলো!

সামনে বাঁশীর সুরে,
পিছনে গহন পুরে,
কলমে কোদালে বীণে দূরবীণে মেলাও
একটি বার!
দিক ভরে এস পক্ষিরাজের সওয়ারের
শত সা'র!

পল্লী নগর,
বন্দর, ঘর,
দ্বীপ দেশ মহাদেশ,
বিমান পাখায় যত পথ যায়
দূর আকাশের শেষ,
মানুষে তারায় মিলে
লিখেছে সবুজে নীলে
যে কথার ফুল, যা হয়েছে ভুল,
লেখো তা' রঙিন্ হাতে,
গড়ে ওঠ বীর উন্নত শির
নব নব যোদ্ধাতে!

দুরন্ত আনন্দে,
নতুন অরুণ ছন্দে,
নতুন যাত্রি!
চলো চলো তার হীরেলী উৎসবে!
দিন ও রাত্রি
আলোতে আঁধারে চলা অবারণ হবে!

ঘণ্টাচীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্দ্ধেক লঙ্কার লোভ সামলানো সহজ নয়। চুক্তি পত্তরটি পাছে চুরি যায় সেই ভয়ে কাল-পেঁচীর কোটরে সেটি লুকিয়ে গাছ তলে বসে কালনেমী ভাবছেন—যাই কি না-যাই; ও কাল-পেঁচী তুই কি বলিস্!

—"আমি বলি আধখানা লঙ্কা নিয়ে আমাদের হবে কি? ছেলেপুলে তো কেউ নেই।"

—"কেন, আধখানা লঙ্কা পেলে নতুন সংসার পেতে বসব।"

কালপেঁচী খিঁচিয়ে বল্লে—"কত সাধ যায় রে চিতে।" বলে চুক্তিপত্তরখানা টেনে বার করে দিলে বাইরে। সেটা চল্লো সাদা দুখানা ডানা মেলিয়ে উড়তে উড়তে পলাতকা লক্ষ্মীপেঁচার মতো পুর ডিঙিয়ে সোজা উত্তর মুখে।

কালনেমী বল্লেন—"করলি কি কালপেঁচী।"

ব্রহ্মদত্যিনী কালপেঁচী বল্লে—"যাও কাগজের সাথে ছোটো। আমার বাসার কাছ ছেড়ে ওঠো।"

—"এই কথা, আচ্ছা চল্লেম।" বলে দৌড় কাগজের পিছনে। কালপেঁচী খিল খিল করে হেসে ঘরের দোরে খিল দিলে।

প্রথম প্রহর অতীত হয়-হয় তখন—রাবণ হাঁকলে 'কয় ঘড়ি!' ঘড়েল পাখী ডাক দিলে—'এ্যাঁক্ ব্যাক্!' রাবণ জেগে জেগেই ভাবছেন, এতক্ষণ মামা আমার পৌছলেন গন্ধমাদনে—গন্ধকালীর ঘাটের ধারে গাঁদাল তলায় আসন মেরে বসে গেছেন সেজে গন্ধকালীর হাকন্দবাবা—মাথায় টোপর, কোমরে বাঘ-ছাল, থঞ্জর, মস্ত গোঁফদাড়ি, চেহারা রাশভারি, চোখ দুটো ফেরাচ্ছে ডাবা ডাবা। এই ভাবতে ভাবতে রাবণ যুদ্ধশ্রমে নিদ্রাগত। ঘড়েল পাখীর একটু ঝিমকিনি এসেছে; এমন সময় "সুয্যি সুয্যি" বলে চেঁচিয়ে উঠেছে রাবণ।

সূর্য্যির মা চোখ কচলাতে কচলাতে এসে বলছেন—"সুয্যি তো গেছে ধূপ দিতে।"

—"আরে আমি মরি যে শীতে।"

—"শীত লেগেছে তো বহ্নিকে আগুন করতে বল।"

—"আরে তোমায় যা বলছি তাই কর।"

কালোকুলোতি সুয্যির মা—চাঁদের আলো যেন মাথার চুল সাদা। "যাই"—বলে চৌকাঠে দিয়েছে পা—অমনি দুপ্ শব্দে যেন ব্যোমকালীর তোপ প'লো।

রাবণ বলে উঠলেন—"এই ম'লো, ওরে দেখ বুঝি বুড়ি প'লো।"

ওদিকে সুয্যির মা-ও রব তুলেছে—"কি প'লো রে কি প'লো! ছাদ থিকে কে পড়ে ম'লো গো! ফিয়ে প'লো ধপাস্! ওগো দেখ গো মাসাস্!"

মাসাস্ রাক্ষসী উর্দ্ধশ্বাসে ছাতে উঠে বলছে হাঁপাতে হাঁপাতে—"আকালে তাল পড়েছে, বোধকরি ফেলেছে কোনো পিশাচ।"

পিশাচ ছাদে পাহারায় বসে ছিল—"আরে চিচ্চাস ক্যান্—আমি পিচাশ নই, পিশাচ। চখ খুলে দেখ বাতাস বেগে ধোপার মোটটা প'লো!"

মাসাসে পিশাচে গোল করছে, এমন সময় সহোদর এসে বল্লেন—

"পোঁটলা খোলো কোটালের সাক্ষাৎ
আকাশ হতে কি প'লো দেখি অকস্মাৎ।"

ভয়ে কেউ পোঁটলা খুলতে চায় না। এ বলে, পোঁটলা খুলে দেখা হোক। ও বলে, গেরোটা খুলে দেখা হোক।

একজন বল্লে—গন্ধ ছেড়েছে চাম্ চাম্!

আরে বলে—ভূত মুৎ না তো, করো না ছোঁবার নাম।

—"চামচিকের বাসা, চামচিকের বাসা।" বলতে বলতে পোঁটলাটা দু'আঙুলে তুলে সহোদর রাবণ রাজার সামনে উপস্থিত করে দিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে সরে দাঁড়াল।

তখন ওয়াক্ তুলে রাবণ পোঁটলা খুলে দেখেন অকুশল,
আকমাড়া কলে চেপ্টেছে যেন কালনেমি মামার সকল।
হাড়গোড় নেই যেন নাচাই পুতুলের ছিলকা আর ছল!
বুকে আঁটা আছে চুক্তি পত্রটি কেবল!

রাবণ বল্লেন—

"এ যে দেখি চেপ্টে গেছে কালনেমি মামা,
ঝাঁকড়া দাড়ি, ঝাঁটা গোঁপ, মায় লম্বাবুটি জামা,
কোথা গেল মাথার চুঁটি আর সামা!"

—"মামা লোকটি ছিলেন ভালো।" এই বলে মহোদর চুক্তি পত্তরটার দিকে যেমন হাত-বাড়ানে অমনি রাবণ সেটা কুটি কুটি করে মুখের মধ্যে দিয়ে গিলে ফেলালো।

—"চুক্তি-পত্তরটা গিলে ফেলালে বাবা?"

—"মামা তুমি?"

—"এই দেখ মামা, এই দেখ চুঁটি!"

—"তার ওটা কে চেপ্টে পড়ে আছে?"

—"ওটা আমার মায়াময় খোলোস বাবা! হনুমানের হাতে এটা ছেড়ে সট্কাতে হয়েছে তোমা তাড়াতাড়ি সাবধান করতে।"

—"চালাকি পেয়েছ, মামা সেজে ভুলোতে এয়েছো ভূত!

—"গালাগালি কর কেন বাবা?"

—"রাত এখন কয় প্রহর?"

সূর্য্যির মা বল্লেন—

"তিন প্রহর রাত সন্দ নেই তার,
কালপেঁচী দিলে তিন চীৎকার।
তৃতীয় প্রহর হলো, দুতিয়ার চাঁদ লুকালো
জোনাক নিভালো জ্বালালো বাতি তিনবার।"

—"তবে মামা, আঠারো বচ্ছরের পথ—গেলে আর এলে এতো প্রত্যয় হয় না তুমি করলেও ব্রহ্মার শপথ।"

—"বাবা, যদি শোনো হনুমান এসে গেছে গন্ধমাদন শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে লঙ্কাধামের ফটকের কাছে—প্রত্যয় করবে তো?"

রাবণ ভাবছেন কি জবাব করেন,—

এই সময়—জয় রাম ধ্বনি—
আকাশ ভেঙে পড়লো যেন রাবণের মাথায় অশনি।

—"ও সূর্য্যির মা, সূর্য্যিকে এখনি উঠতে বল, আর কেন দেরী—
চন্দরকে বল, হোক অস্তর, সূর্য্যকে বল, হোক উদয়
উল্টে যাক দিন-রাতের ঘড়ি যন্তর—
লক্ষ্মণ তো মরুক, তারপর যা হয়।"

কালনেমী বল্লেন—"বাবা, এ বুদ্ধিটা দশমাথায় আগে এলে হতো। এখন আর সূর্য্যিকে ওঠানোর উপায় নেই, তিনি হনুর বগলদাবা হয়ে গেছেন। লক্ষ্মণ চাঙ্গা হলে তবে ছাড়া পাবেন।"

—"তুমি এত খবর জানলে কেমন করে?"

—"এ বুঝলে না বাবা, হনুর পিঠে গন্ধমাদন কি শুধু এসেছে? ওষুধ এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধমাদন চেপে আমিও এসে পড়েছি। নয়তো আঠারো বছরের পথ মাড়াতে আমার জীবন কাবার। লঙ্কার ভাগ নিতে আসতে হত না তোমার মামার ইহজন্মে! এই বুঝেই খোলস ধরা খোলস ছাড়া। চুক্তি পত্তরটা চামড়ার পোঁটলায় আগে ভাগে পাঠালেম জরুরী বুঝে, না তুমি গিলে বসলে! ওর পিঠে গন্ধমাদন যাত্রার সব বিবরণ লেখা ছিল। হনুর কুম্ভীরী যুদ্ধের কথাগুলো পড়লে মজা পেতে। মাঝ-পথে রামের ভায়ের বাঁটুল খেয়ে যা পড়ান পড়েছিলেন—ভেবেছিলেম, তোমার বড় জোর কপাল!"

রাবণ বল্লেন—"তারপর?"

—"তারপর আর কি? তোমার কপাল মন্দ, তাই সেই রাতে নন্দিগাঁয়ে রামের দু'ভাই পর্ব্বত শুদ্ধ হনুমানকে আকাশে ঠেলে তুলে দিতে হাজির থাকে!"

—"সব আশা চূর্ণ করলে বীর হনুমান;
শক্তিশেল ব্যর্থ হল—
তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য, গেল মর্য্যাদা, গেল মান,
আর কেন রাখা তুচ্ছ এই প্রাণ।
মরিল ইন্দ্রজিত, বীর শূন্য লঙ্কা—
বাজলেই হয় রাবণের মরণের ডঙ্কা।"

কালনেমী বল্লেন—"ছি বাবা ও কথা বলতে নেই—

মনে পড়ে আছে তোমার আর এক নন্দন
মহীতলে আছে, নাম মহীরাবণ
বিপদ কালে তারে একবার করলে হয়না স্মরণ ?"

—"মামা, তুমি দেখছি ঘরভেদী ঘরপোড়া দুয়ে মিলিয়ে একজন।"—বলে রাবণ দোরের দিকে আঙুল দেখাতেই মামা বলছেন—"যাচ্ছি বাবা, বল তো আমিই না হয় দেখি যুদ্ধ করে।"

—"তোমার যুদ্ধে যদি হয় জয়—
সেটা হবে পরাজয়ের পরে পরাজয়
তারপরে পরাজয়।"

রাবণের এক চাপড়ে মামা সামাদানের মতো উল্টে পড়ে মাটির পিদুমের মতো খানিক তেল ছিরকুটে মুখ থুবড়ে পলতে নিভিয়ে সাবাড়।

—"রাত কাবার হয় হয়, এমন সময়—" বলে চাঁইবুড়ো আসর ছাড়লেন সে রাতে।

ব্ল্যাক আউটের ট্র্যাজিডী

শ্রী দুর্গাদাস সাহা

—হঠাৎ হাততালির আওয়াজে সমস্ত গড়ের মাঠটা কেঁপে ওঠে। সংগে সংগে বুকটাও কেঁপে ওঠে দুর্ভাবনায়। মোহনবাগানের 'মূর্তিমান একাদশকে' এঁকে বেঁকে নামতে দেখা যায়। যাক্ তবু ভাল—ডাহা দু'ঘণ্টা এই কাঠফাটা রোদে গ্যালারীতে নিশ্চল হয়ে বসে বসে আমাদের অবস্থাও গ্যালারীর মত অচল হয়ে গেছে। আমরা দাঁড়াই। রবি বলে—দেখ দুর্গা, কী ভীড়টাই জমেছে! মাঠে তিলধারণেরও স্থান নেই। ক্যালকাটার সব লোক বুঝি ক্যালকাটা মাঠে ভেঙ্গে পড়েছে। আমি উত্তর দিই—তা খেলাত দেখতে হবে। মোহনবাগান আর মহামেডানে—একেবারে বাঘে আর সিংহে। খানিক্ পরে আবার আমরা হাততালির শব্দে সচকিত হই। এবার অবতরণ করেন লীগ চ্যাম্পিয়ানের 'কীর্তিমান একাদশ!' সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের একটা চাপা উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে।

টসে জিতে মোহনবাগান চসে খেলা আরম্ভ করে দেয়। খেলা চল্লো—জোরসে চল্লো, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই বরাতের সঙ্গে বোঝাপড়ার শেষ হয়ে যায়। মোহনবাগানের গোলে গোল ঢুকলো। আমাদের বুক

দুর্ দুর্ করতে থাকে। মোহনবাগান এইবার একটা গোল দেয়। না, রেফারী হতচ্ছাড়া বলে 'অফ্‌সাইড্'। আর বেটা রেফারীকে!—কতকগুলো তেজাল দর্শক সমস্বরে চীৎকার করে তেজ দেখায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আধ্-খাওয়া ভুট্টা গতিশীল হয়ে এসে রেফারীকে অভিনন্দন জানায়। বিশ্রাম হয়ে গেলো। আবার খেলা আরম্ভ হয়। আমাদের বুকের রক্ত নিঙ্‌ড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ফ্ল্যাগ্ নেমে যায়, আমরা কায়মনে ডাকতে থাকি—হে মা কালী, মোহনবাগানকে জিতিয়ে, না হয় অন্ততঃ ড্র করিয়ে দাও মা। এখনও সময় আছে। কিন্তু আমাদের মিনতি বোধহয় মাঠের কোলাহল ছাপিয়ে কালীর কাছে গিয়ে পৌছালো না। আমাদের পাশের এক ভদ্রলোক ভিজে গলায় বল্লেন—মশাই পয়সাগুলো একেবারে জলে গেলো। এর চেয়ে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দাতব্য ক'রলে কর্তব্য হোত। বলেই খক্ খক্ করতে করতে ভদ্রলোক ভীষণ বিদ্‌ঘুটে এক কাশি জুড়ে দিল। খেলা শেষ হয়ে যায়। আমরা মুখ শুকনো করে অগত্যা বাড়ীর দিকে পা চালাই।

পথের সামনেই পড়ে 'মেট্রো সিনেমা'। মনটা বড় খারাপ তাই সিনেমা দেখে একটু চাঙ্গা হয়ে নেব মনে করি। রবিকে বলি—কিরে সিনেমা দেখবি নাকি? মেট্রোয় ভাল বই হচ্ছে—'গন্ উইথ দী উইণ্ড'। রবি বিমর্ষ মুখে বলে—না ভাই ও আমার দেখা। আর বাড়ীতে কাজ আছে নইলে বাবা বক্‌বে। ও সরে পড়ে। সুতরাং টিকিট কিনেই ক্ষুণ্ণ মনে সিনেমা-হলে প্রবেশ করি।

সিনেমা যখন ভেঙ্গে গেল তখন বেশ রাত হয়েছে। আকাশ মেঘলা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিকে ব্ল্যাক আউটের ঘন অন্ধকার। নিষ্কম্প রাত! গ্যাসপোষ্টের ঐ আবার আলো নাকি! ওতো আরও রাস্তাকে অন্ধকার করে দিয়েছে। রাস্তায় চলতে গিয়ে খালি পদে পদে হোঁচট আর ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে হয়। অন্ধকারে ঠাওর না পেয়ে এক লেড়িকুত্তার লেজ মাড়িয়ে দিতেই 'খ্যাঁক খ্যাঁক' করে ওঠে। আমি আঁৎকে উঠি। তার উপর মাঝে মাঝে ঐ এ-আর-পির-পাঁচিলগুলো হাঁজির ওপর ফাউ। অন্ধকারে কখন যে রূঢ়ভাবে আলিঙ্গন করবে তা কে জানে! গুণ্ডার কথা মনে হয়। গাটা শিউরে ওঠে। ভাবি কেন মরতে আজ কুক্ষণে সিনেমায় গে'ছলাম, আজকাল পাড়ায় পাড়ায় কত ভদ্রলোকের ওপর দিয়েই না ব্ল্যাক আউটের ট্র্যাজিডীর ঝড় বইছে। এইতো সেদিন আমাদের পাড়ার বিষ্টুখুড়ো মেছোবাজারে রাত্রে গুণ্ডার খপ্পরে পড়ে কি রকমই না নাজেহাল হয়েছিলেন! দুতিনটে চ্যাংড়া গুণ্ডা টিনের ছোরার মত কি একটা দেখিয়ে ভয় দেখালে। খুড়োর পকেটে কানাকড়িও না পেয়ে সার্টটা আর ছাতাটা কেড়ে নিয়ে একটা চাঁটা কসিয়েই বিদায় দিলে। ভীষণ ভয় পাই আমি এই সব ভেবে। একহাতে পকেটের সেফার্স পেনটা আর রিষ্ট ওয়াচটা চেপে ধরি। একেবারে দু'হাতকে একত্র করেই! প্রায় বাড়ীর কাছেই এসে পড়ি। মন থেকে ভয়টা কিছু সরে যায়। সামনের অন্ধকারময় গলিটার মধ্যে পা বাড়াই। দেখি গলির একটাও গ্যাস জ্বলছে না। বুঝি পাড়ার ফক্কর ছোঁড়াগুলো গ্যাসের গলার দড়ি ধরে টেনে আত্মহত্যা করেছে ওদের। তাই গলিটায় ভীষণ অন্ধকার—কাছের মানুষটিকেও চিনতে পারা যায় না। ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে পা চালাই। যাই দুতিন পা এগিয়েছি অমনি দুতিনটে ছোঁড়া হুমড়ি খেয়ে আমার গায়ে এসে পড়ে। ভয়ে আমি শিউরে উঠি। এত ঘুটঘুটে অন্ধকার যে কেবল আমি তাদের অস্তিত্ব পাই। অনেক কষ্টে আমি কণ্ঠকে কর্কশ করে নিয়ে বলি—কি মশাই কানা নাকি? দেখতে পান না। একটা ছোঁড়া কণ্ঠকে একটু বিকৃত করে নিয়ে বলে—কি বাছা পকেটে মাল-টাল আছে নাকি কিছু? ওর গলস্বর

শুনে আমি সভয়ে মনে করি ওরা বোধহয় মাতাল। ইতিমধ্যে আর একটা ছোঁড়া নিসঙ্কোচে আমার পকেটের ছিদ্রের মধ্যে হাত গলিয়ে দেয়। যেন ওর নিজেরই পকেট। আর একজন হাতে ছোরার মত কি একটা জিনিষ অন্ধকারের মধ্যে ঝক্ ঝক্ ক'রতে দেখি। পৈত্রিক প্রাণ খোয়ানোর দুর্ভাবনায় আমি মুষড়ে পড়ি। তবুও সাহসের শেষ কলিকাটুকু কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে অথচ দৃপ্ত কণ্ঠে আমি বলি—কি চান আপনারা?

"কি বাছা, পকেটে মাল-টাল আছে নাকি কিছু?"

পয়সা কড়ি কিছু নেই, পথ ছাড়ুন। সেই ছোঁড়া মাতালের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে আবার বলে—মশাই টুঁটি করেছেন তো টুঁটি চেপে ধরবো। দেখেছেন? হ্যাঁ, আমি খুব ভালভাবেই দেখতে পাই সূচীভেদ্য অন্ধকারেরই মধ্যে শানিত ছোরার ঝক্‌মকানি! আমার ভুঁড়ির দুর্গটাও কতটা ওর পক্ষে দুর্ভেদ্য আন্দাজ করে নিই। আমি আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হই। আমার এই ব্ল্যাক আউটের অভিযানের মূল্য-স্বরূপ সানন্দে দিয়ে দিতে হয় সেফার্স পেন, রিষ্টওয়াচ আর মানি ব্যাগ, পকেটের কেবল রুমালটা ওরা দয়া করে রেখে যায়। ওদের অসীম দয়াই বলতে গেলে। তারপর ওদের দলেরই একটি দয়াল আমার দুর্দশায় সহানুভূতি জানিয়ে সদ্য ছাঁটা গর্দ্দানে একটুখানি হাত বুলিয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে অন্তর্ধান করে।

অতঃপর বাড়ীর দিকেই যেতে হয়। নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিই—যাক্‌গে পেন আর রিষ্টওয়াচ। আবার ত বার্থ ডে আসছে। ভাগ্যিস প্রাণটাত আছে! বাড়ীতে কি কৈফিয়ৎ দোব তাই ভাবি। একরকম কাঁদ কাঁদ হয়েই বাড়ীতে ঢুকি। আমার অবস্থা বাবা মা চাক্ষুষ দেখেন। তবুও রহস্য বোঝেন না। সুতরাং নয়নদ্বয় যথাসম্ভব অশ্রুসজল করে আর্দ্র কণ্ঠে আমাকে এই ব্ল্যাক আউটের ট্র্যাজিডী সালঙ্কারে বিবৃত ক'রতে হয়। কিন্তু কিছুই হয় না। এক পশলা তিরস্কারের বৃষ্টি হয়। কিছু না খেয়েই আত্ম অভিমান করে অর্থাৎ অভিমান নিজের আত্মার উপর চাপিয়েই শুয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে উঠে বন্ধুদের সাবধান করার জন্যে বেরিয়ে পড়ি। তারা যেন আমাকে উদাহরণ স্বরূপ দেখে ব্ল্যাক আউটের গুরুত্ব ও ঘনত্ব ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। রাস্তায় শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করি—কি রে কোথায় যাচ্ছিস? ও বলে—আর কেন ভাই, এই একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পেন বিক্রী করতে। তুই কিনবি নাকি? ভাল পেন সেফারস্। ও সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পেনটা তুলে আমাকে দেখায়। আমি চীৎকার করে উঠি—আরে দেখি এযে আমার পেন! কাল রাত্রে কতকগুলো ছোঁড়া ভয় দেখিয়ে আমার পেন, হাতঘড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। এ পেন তুই কোথা থেকে পেলি! শঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বলে—

আগে এটা তোর পেন ঠিক কি না। আমি আর একবার পেনটা ভাল করে দেখেই বলি—এই দেখনা আর পেনের চিহ্ন—মাথায় এই চটা ওঠা দাগ। এতো মামার হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়েছিল। আমি আবার নিসন্দেহ হই।

ও বলে রবি তাকে দিয়েছে। বলে—তার পেন, সময় খারাপ, হাতটান তাই বিক্রী করে দিতে চায়। আমাকেও একটা রিষ্টওয়াচ দিয়েচে বিক্রী করতে। আমি বিস্ময়ের সুরে বলি—রবি! রবি দিয়েছে। রিষ্টওয়াচও আছে। কিন্তু রবির ত কোনকালে সেফার্স পেন ছিল না। ছিলত একটা ব্ল্যাকবার্ড। শঙ্কর বলে—আমারও তাই মনে হয়। আমি শঙ্করকে বলি-তুই চল আমার সঙ্গে রবির কাছে। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আমার টনক্ নড়ে ওঠে। রবিকে বাড়ীতে গিয়ে ডাকি। রবি নীচে নেমে আসে, আমার সঙ্গে শঙ্করকে দেখে ও চমকে ওঠে। মুখটা নিমেষের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু হেসে বলে—কিরে কি দরকার?

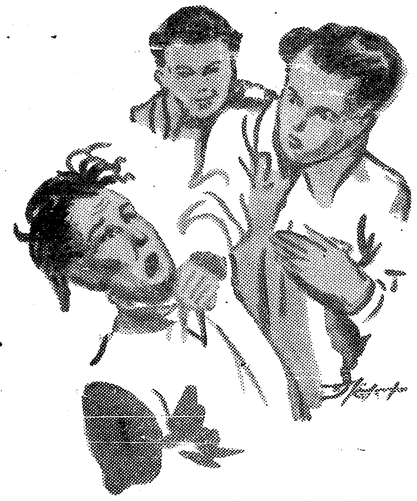

"ষ্টুপিড্! আমার পেনটি বেশ বাগিয়েছ।"

আমি ওর জামার কলারটা চেপে ধরি—স্কাউণ্ড্রেল! আমার পেনটি বেশ বাগিয়েছ। এ কারবার কতদিন শিখেছ? আবার শুনছি আমার রিষ্টওয়াচটাও সোনাকে দিয়েছিস্।

ও প্রথমে আম্‌তা আম্‌তা করে। আমি চোখ রাঙিয়ে বলি—তোর বাবাকে ডেকে আনব। পাড়াশুদ্ধু সবাইকে এনে তোর কীর্তি ফাঁস করে দেব। ও ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—ভাই তুমি আমায় ক্ষমা কর। আর কখনো এ কাজ ক'রবো না। কাল রাতে অন্ধকারে ঠাওর পাইনি। পরে তোমার গলার স্বর শুনে বুঝেছিলাম। আমার কিছুই দোষ নেই। ঐ বিজুয়ার পাল্লায় পড়ে আমি গোল্লায় গেছি। আমায় মাফ্ কর।

আমি রাগে আরও অসংবৃত হয়ে পড়ি। বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে ওর গালে সজোরে একটা চড় কষাই। —রাহাজানি? নিরীহ লোকদের ছোরা দেখিয়ে ভয় দেখান! উঃ কাল—কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম। আর একটু হলে ছোরার ঘায়ে প্রাণটা গিয়েছিল। হয়তো বা ভয়ে হার্টফেলও ক'রতে পারতাম।

ও মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সজোরে ওর মুখ থেকে হাতটা টেনে নামাই। মুহূর্তে রাগ ভুলে যাই—দেখি ওর চোখের কোনে জল। এই কি সেই রবি, না তার মুখোস?

বিচার বিচার

শ্রীশঙ্কর দাসগুপ্ত

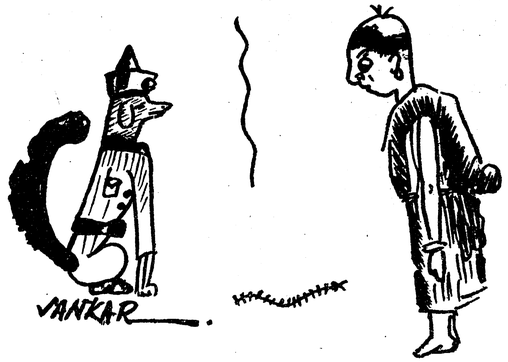

ওরে বিছে কেন মিছে
কামড়ালি নেড়িরে ?
ছোট মেয়ে পেয়ে বুঝি
এত তেড়ি বেড়িরে ?
একে ওটা মাথামোটা,
তায় ছিঁচকাঁদুনে !
জরিমানা দিলে তবে
ছেড়ে দেব জামিনে।
মানহানি কেস্ যদি
ঠোকে এসে নেড়িটা,
ডাহা তোর হবে ফাঁসি—
দেখেছিস্ দড়িটা ?

দোষ তোর নেই কিছু
বল্‌ছিস্ মিথ্যে !
যাকে তাকে কাম্‌ড়ানো
এই তোর বিদ্যে ?
হতভাগা, কিছু ঘুঁস
দে আমার পকেটে,
তার পরে সব ঠিক,
ছাড়া পাবি ফোকোটে।
কেস্ তোর করে' দেব
এক চোটে ডিস্‌মিস্—
পাঁচ টাকা দিলে আর
একসের কিস্‌মিস্ ॥

পূর্ব্বানুবৃত্তি

আমরা মন্দিরে বসে আছি আর ভাবছি কি মজাটাই না হ'ল! এখানে ক'টা দিন বেশ আরামেই কাটানো যাবে, খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে তো একেবারে নিশ্চিন্ত।

এতক্ষণে বাঘের দেখা পাওয়া গেল, সে আগের মতোই অদৃশ্য হ'য়ে আছে। সে বলল, "তোমাদের এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? দেবতা ব'লে পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু তার জের টানা কি হবে?"

মণ্টু বলল, "উপায় কি? একমাত্র উপায় ছিল আক্রমণকারীদের প্রথমেই মেরে ফেলা, কিন্তু তুমি না ক'রে যা করেছ তাতেই তো ওরা মনে করেছে আমরা দেবতা।"

নিতাই খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "আমরা দেবতা ব'লে পরিচয় দিয়েছি, তাতে আমাদেরই অন্যায় হবে, ওদের তো আর হবে না।"

বাঘ বলল, "যা হয়েছে বেশ হয়েছে, কেবল ভোগের সময় ব'লে দিও রোজ একটা ক'রে পুষ্ট ছাগ যেন এখানে রেখে যায়।"

সন্ধ্যায় বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের পূজো হ'য়ে গেল, খাবার ব্যবস্থা হ'ল খুবই চমৎকার, ছাগও একটা চেয়ে নিলাম। সেটা দুপুর রাত্রে বাঘের পেটে গেল।

সকালে মন্দিরের সামনে লোক আর ধরে না। সবাই এসেছে এক একটা বর প্রার্থনা করতে। ছেলে বুড়ো সবাই।

ভীড়ের মধ্যে একটি ছ'সাত বছরের মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়ল। তার মুখখানা বড় বিষণ্ণ, সেও এসেছে দেবতার কাছে কিছু চাইতে, কিন্তু চাইবার সাহস তার নেই, অত্যন্ত ভীরু, তাই সে করুণ চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। তার সেই চোখের দিকে চেয়ে, আমরা যে দেবতার অভিনয় করছি সেজন্য বড় লজ্জা হ'ল। হাজার হাজার লোভী স্বার্থপর লোকের মধ্যে ঐ একটি মেয়ে সঙ্কোচে জড়োসড়ো হ'য়ে আছে, জীবনে তার বোধ হয় কখনও কোনো ইচ্ছা পূরণ হয়নি, তার মুখখানা দেখে তাই মনে হয়।

আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, "হে ভগবান, এরা যে-পূজো আমাদের দিচ্ছে তা তুমি নিও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা ক'রো।"

কতকগুলো লোক ভীড় ঠেলে এসে মন্দিররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল, "দেবতারা কি এই পুকুরের জল খেয়েছেন?"

মন্দিররক্ষী বলল, "না।"

তারা অবার জিজ্ঞাসা করল, "ওঁরা কি এই জলে স্নান করেছেন?"

মন্দিররক্ষী বলল, "হ্যাঁ, করেছেন।"

কথাটা শোনামাত্র সেই লোকগুলো ছুটে গেল পুকুরের দিকে। গিয়ে ভক্তিভরে সেই জলে নেমে স্নান ক'রে চলে গেল। তারা চলে যাবার একটু পরেই আর একদল লোক এসে ঐ পুকুরে স্নান করল তারপর এল আর একদল, তারপর আর একদল। ক্রমে একশো থেকে দুশো, দুশো থেকে চারশো, শেষে হাজার হাজার লোক এসে নামল ঐ পুকুরে। পুকুরের জল ক্রমে পাঁকে পরিণত হ'ল, কিন্তু স্নানের শেষ হ'ল না। পাঁকের মধ্যে মোষ যেমন ক'রে গড়াতে থাকে লোকগুলোও তেমনি করে সেই পাঁকের মধ্যে গড়াতে লাগল। শেষে পাঁকও শুকিয়ে এল, পাঁক শক্ত মাটিতে পরিণত হ'ল, দলে দলে লোক এসে সেই শুকনো মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। তারপর যারা এল তারা সেই মাটি খুঁড়ে নিয়ে যেতে লাগল এইভাবে নিতে নিতে গভীর পুকুর আরও গভীর হ'য়ে গেল। তখন আবার জল দেখা দিল সেখানে, এবং তাইতে সবাই আবার মাথা ডোবাতে লাগল। এইভাবে চলল সারা দিন এবং সারা রাত।

পরদিন হাজার হাজার লোকের সর্দি জ্বর হ'ল, কিন্তু সবাই ডাক্তার ব'লে কেউ কারো চিকিৎসা করল না, সবাই এল আমাদের কাছে মাদুলি নিতে।

কিন্তু সর্দিজ্বরে কি মাদুলি দেব কিছুই জানতাম না। বাঘ কানে কানে ব'লে দিল, "তোমাদের পূজোর জন্য যেসব ফুল তোমাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে ঐ থেকে এক এক টুকরো ছিঁড়ে দাও, ঐসব টুকরো মাদুলিতে পুরে গলায় আর হাতে বাঁধবে।"

পাঁচ মিনিটে একগাদা ফুল শেষ হ'য়ে গেল, নৈবেদ্যের চাল ছিল, একটা একটা ক'রে দিতে দিতে তাও ফুরিয়ে গেল। শেষে বললাম, "আজ আর কিছু নেই, কাল এসো।"

মন্দিরের সামনের ভীড় অনেকটা কমে গেল। তখন বাঘকে বললাম, "ভাই বাঘ, আর ভাল লাগছে না। প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম খুব মজা হবে কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পেরেছি এরকম দেবতা সেজে থাকা মানুষের কাজ নয়। তা ছাড়া হাজার হাজার মানুষের প্রার্থনা পূরণ করতেই সব শেষ হ'য়ে গেছে, প্রথম দিনেই সবার সর্দি জ্বর হয়েছে, এর পর যে কি হবে তা ভেবেই পাচ্ছি না। অনে লোককে বর দিয়েছি, অনেক লোককে মাদুলি দিয়েছি, কিন্তু ওতে যদি কারো অসুখ না সারে তা হ আমাদের উপর ওদের আর ভক্তি থাকবে না, তখন হয় তো আবার আমাদের সন্দেহ করবে, হয়তো আর অনিষ্ট করতে চাইবে।"

বাঘ বলল, "মোটেই তা নয়। ওদের অসুখ যদি খুব বেড়েও যায়, এমনকি যদি অনেকে মারা যায়, তবু ভয় নেই। ওদের অসুখ যত বাড়বে ভক্তিও ওদের তত বেড়ে যাবে, ওরা ভাববে ওদের পাপের জন্যই অসুখ সারেনি। তখন আবার ওরা আমাদের কাছে আসবে। যদি কেউ আমাদের সুমুখেই মারা যায়, তা হ'লে সবাই বলবে, "লোকটা বড় ভাগ্যবান, একেবারে দেবতার চোখের সুমুখে মারা গেছে।"

মণ্টু বলল, "কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি?"

বাঘ বলল, "আপাতত পূজো পাওয়াটাই লাভ। কিন্তু আরও একটা কথা ভেবে দেখ। ওরা সাতদিন পরেই তোমাদের ছাড়বে তা মনে ক'রো না। আর যদি ছাড়েও তা হ'লেই বা যাবে কি ক'রে ওদের সামনে এখন মাটির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে তোমাদের লজ্জা করবে। ওরা আশা ক'রে থাকবে

তোমরা যখন স্বর্গ থেকে এসেছ তখন ওদের চোখের সামনে সোজা স্বর্গে উড়ে যাবে। তা যদি না পার, তা হ'লে ওরা তোমাদের চাতুরি ধ'রে ফেলবে।"

"তা হ'লে কি করা যায়?" নিতাই প্রশ্ন করল।

বাঘ বলল, "আজ রাত্রেই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল।"

মণ্টু বলল, "কিন্তু চারদিকে এত লোক, এত প্রহরী, দিনরাত তারা এই মন্দিরে রয়েছে, তাদের মনে পালাব কি ক'রে?"

বাঘ একটু ভেবে বলল, "সেই এক মুস্কিল। তবে তোমরা সুযোগ খুঁজতে থাক, সুযোগ পেলেই এখান থেকে পালাতে হবে।"

আমরা খুব গোপনে এইসব পরামর্শ করতে লাগলাম। রাত তখন দুপুর। মনে হ'ল যেন প্রহরীরা ঝিমিয়ে ব'সে ব'সে ঢুলছে। আমরা সেই সুযোগে পা টিপে টিপে পালিয়ে যাব সব ঠিক, এমন সময় বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ! শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের আসনে ফিরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। দেখি রাজা এবং রাজারাণী আসছে আমাদের পূজো দিতে। সঙ্গে একটা ছাগও এনেছে।

তারা ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমাদের পূজো দিয়ে চলে গেল। রাজারাণী আসাতে মন্দিরের প্রহরীরা সবাই জেগে উঠে আবার চারদিকে পাহারা দিতে লাগল—রাত্রে তারা আর ঘুমলো না।

বাঘ বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, আর একটা মতলব মাথায় এসেছে। আজ রাত্রে পালিয়ে যাওয়ার আশা ছাড়, যা হয় কাল দেখা যাবে।"

কিন্তু একটা দিন আমাদের পক্ষে যে কি রকম কষ্টকর হয়ে উঠল তা আর কি বলব! আমরা অনেকগুলো ভুল যা করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিছানা নিতে অস্বীকার করা। দেবতা ঘুমোবে ব'লে রাজা বিছানার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় তখন বলেছিলাম ঘুমোতে আমাদের বিছানা দরকার হয় না। তার ফলভোগ করছি এখন।

সমস্ত দিন ধ'রে হাজার হাজার লোকের পূজো পাওয়ার মতো কঠিন কাজ আর নেই। বুঝতে পারলাম এই কারণেই দেবতারা মানুষ থেকে তফাতে থাকেন।

দিনশেষে রাত এল। বাঘ কোত্থেকে অনেকগুলো খড় আর দড়ি সংগ্রহ ক'রে এনে বলল, "এই দিয়ে তিনটে দেবতার মূর্তি গড়াও, আমি মাটি আনছি।"

বাঘের এই কাজ দেখে সে যে কি মতলব আঁটছে তা সহজেই বোঝা গেল। সে চায় আমরা তিনটে মূর্তি গ'ড়ে আমাদের আসনে বসিয়ে রেখে পালিয়ে যাব। এতে সবাই ভাববে ওগুলো আমাদেরই মূর্তি এবং আমরা যে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছি তা আর ভাবতে পারবে না। আমরা তাড়াতাড়ি কোনো রকমে তিনটে মূর্তি গ'ড়ে লুকিয়ে রাখলাম। সে মূর্তি যে কি অপরূপ হ'ল তা আর বলে কাজ নেই। যা হোক, কোনো রকমে আরও একটা দিন কাটিয়ে দিয়ে রাত্রেই পালানো ঠিক ক'রে ফেললাম।

বিকেল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। সন্ধ্যার দিকে মেঘ আরও কালো হয়ে এল, সবাই বলল ঝড় উঠবে। ঝড়ের কথা শুনে আমাদের খুব আনন্দ হ'ল, কেননা সেই গোলমালে পালিয়ে যেতে আর অসুবিধা হবে না।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

অনঙ্গ পণ্ডিতের গল্প

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক অনঙ্গ পণ্ডিত মশাইয়ের দুদিনের কাহিনী তোমাদের বল্‌বো। এ থেকে পণ্ডিত মশাই সম্বন্ধে তোমরা যা খুশী ধারণা করে' নিতে পারো—শুধু একটি অনুরোধ, বিদ্যালয়ের প্রতি যেন বীতস্পৃহ হ'য়ে উঠোনা : তাহ'লে এই হতভাগ্য লেখকের প্রতি অতি অবিচার করা হবে। আর, বলাই বাহুল্য, এ কাহিনী তেম্‌নি সত্য—সমস্ত গল্পই যে অর্থে সত্য !

অনঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে শেষ ক্লাসটার কথা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইংরিজীর ঘণ্টা শেষ হ'তেই অনঙ্গ পণ্ডিত একটুও সময় নষ্ট না করে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ঘাড় নীচু করে এসে ক্লাসে ঢুক্‌লেন। চল্লিশের ওপর বয়েস, মাথায় একরাশ তেল চক্‌চকে চুল, এক মুখ দাড়ি, আধময়লা পাঞ্জাবী আর কাপড়, কোঁচানো চাদর কাঁধে আর পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো : এই বেশে পণ্ডিত মশাইকে সাত বছর দেখে আস্‌ছি, সেদিনও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে বিপুল সম্ভাবনায় নব পরিবর্তন আসে প্রকৃতির জগতে—পৃথিবীতে আসে নতুন নতুন আশা আর সমস্যা, আর তারি দোলা লাগে মানুষের সমাজে, সাজে, ; কত নব নব সৃষ্টি, আবার ধ্বংশ, তারপর পুনঃ সমন্বয়ে আবর্তিত হয় বিচিত্র প্রাণলীলা ! কিন্তু অনঙ্গ পণ্ডিত যেন সনাতন ভারতের মূর্ত প্রতীক !

চেয়ারের হাতলে তেল্‌চিটে চাদরটি সযত্নে ভাঁজ করে' রেখে, উনি টেবিল্‌টি কাছে টেনে নিয়ে বস্‌লেন। তারপর ডান হাতখানি সাম্‌নে উঁচু করে' বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখটির দিকে তাকিয়ে তাগাদা দিলেন : কই, কই, আরম্ভ করো। আজ হবে সীতাহরণম্‌। আগের দিন একশো কুড়ির শ্লোক পর্যন্ত হয়েছে।

বলে,' নখটিকে নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। এটি ছিল ওঁর বদ্ধ মুদ্রাদোষ। যতক্ষণ ক্লাশে থাক্‌বেন হয় এটিকে খুঁট্‌বেন আর নয়ত একদৃষ্টে এদিকে ঘাড় গুঁজে চেয়ে থাক্‌বেন। নখ থেকে চোখ সরানো কদাচিৎ, মুখ উঁচু করে' ক্লাসের কোনদিকে তাকানোও তেম্‌নি ! কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাঠ্য বিষয় থেকে আরম্ভ করে' ঘরে ক'খানি বেঞ্চ আছে, কোথায় কোন্‌ কোন্‌ ছেলে বসে, কা'র কেমন স্বভাব—এ সমস্তই পণ্ডিত মশাইয়ের যেন ওই নখদর্পণে !

তাই মাথা নীচু করে' থাকলেও ওঁর পড়ানোতে (এবং আমাদের ওঁর কান বাঁচিয়ে গল্প করতে) কোন অসুবিধা হ'ত না।

যা হোক, নির্দিষ্ট বেঞ্চ থেকে পড়া বলা শুরু হ'ল। কলের পুতুলের মতন একজনের পর একজন, এক বেঞ্চের পর আর এক বেঞ্চের ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠে, পড়া—অর্থাৎ গলধঃকরণ আর উদ্‌গীরণ ক্ষমতার পরিচয় —দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। আমাদের বেঞ্চের তখন পালা শেষ হয়েছে, আমরা ফিস্‌ ফিস্‌ করে' গল্প করছি, হঠাৎ অবিকল বেরালের ডাক শোনা গেল : মিঁউ মিঁউ।

আওয়াজ শুনে পণ্ডিতমশায়ের কান লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, ভ্রু-জোড়া কুঁচ্‌কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নখের দিকে চেয়ে রইলেন—অর্থাৎ আসামী অনুসন্ধান করতে লাগ্‌লেন।

বেরাল পুনর্বার তা'র অনস্বীকার্য উপস্থিতি ঘোষণা করলে : মেঁয়া—আ—ও !—

এবার যেন তা' আরো অকুণ্ঠিত, আরো উচ্চকিত।

হাতের নখটা একটু উঁচু করে' সেইদিকে তেম্‌নিভাবে চেয়ে পণ্ডিত মশাই গম্ভীর গলায় বল্‌লেন, কানাই ! ...থেকে একেবারে বেরাল ? দুদিনে এই অধঃপতন ! দুমাস পরে যে তোমায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না হে !

কানাই উঠে দাঁড়ালো এবং এইমাত্র আকাশ থেকে পড়েছে এম্‌নি মুখ-চোখ করে' বল্‌লে, সে কি, স্যার ?' আপনি একেবারে ধরেই নিলেন যে আমিই ডেকেছি ? না, স্যার, বেরাল টেরাল ডাক্‌বার আমার কখনো প্রবৃত্তি হয় না। আমার ভালো লাগে বাঘ ডাক্‌তে, ডেকে আরাম পাওয়া যায় রীতিমতন। পরশু তো স্যার ...অনেও ছিলেন কেমন চমৎকার বাঘ—

—চোপরও ফাজিল—পণ্ডিত মশাই গর্জন করে' দাঁড়িয়ে উঠলেন ও বসে পড়লেন। কানাইও সঙ্গে ...বসে পড়লো। (ও আজ জায়গা পাল্টে বস্‌লেও ওঁর চোখ এড়ায়নি।)

আমরা প্রাণপণে হাসি চেপে রইলুম। যেমন করে'ই হোক, হাসি চাপতেই হবে। ওঁকে যেমন কখনো ...তে দেখা যায় না, আমাদেরও হাসি উনি দেখতে চান না !

পণ্ডিত মশাই তখুনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে বল্‌লেন : নাও কে বল্‌ছিলে, বলো।

তারপর পুনরায় নখে মনোনিবেশ করলেন, যেন কিছুই হয়নি !

খানিক পরে ফটিক ভালমানুষের মতন দাঁড়িয়ে বল্‌লে : পণ্ডিত মশাই !

কোন উত্তর নেই।

—পণ্ডিত মশাই ! কাল ছোট ভাইটা আমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করে' একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

—কোন্‌ গর্দভ তা'র ছোট ভাইয়ের কাছে বোকা বনে, সে সব শোনাবারই কি জায়গা এটা ? ফটিক বাবুর তাই মনে হয় নাকি ?

—আমায় অমন করে' বল্‌বেন না, পণ্ডিত মশাই ! আমি কি জানি না যে আপনার ক্লাসে অবান্তর কথা বলা চলে না ? আমার ভাই যা জিজ্ঞেস্‌ করেছিল, সে হ'চ্ছে রাবণের বিষয়ে। তাই ভাব্‌লুম, আজ সীতা-হরণের ক্লাসে আপনাকে জিজ্ঞেস্‌ করলে ক্ষতি কী ? তা' আপনি যদি না শুন্‌তে চান্‌, হেড পণ্ডিত মশায়ের কাছেই যেতে হবে !

ফটিক ঠিক জায়গাটিতেই ঘা দিয়েছিল।

অনঙ্গ পণ্ডিত বুড়ো আঙ্গুলের দিকে চেয়ে গলা নরম করে' বল্‌লেন, কী প্রশ্নটা কী ?

—সে ভারী অদ্ভুৎ : রাবণ তাঁর দশ মাথা আর কুড়ি হাত নিয়ে বিছানায় শুতেন কী করে' আর কেমন করেই বা পাশ ফিরতেন ?

পণ্ডিত মশাই মিনিট খানেক চুপ করে' থেকে প্রায় একটা জার্মান বোমার মতন ফেটে পড়লেন : ফাজলামি ! আমার সঙ্গে ফাজলামি ? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি আজ !—সজোরে চেয়ার টেবিল ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্যে ঘরখানা যেন চৌচির হয়ে গেল।

ফটিক একটু ভয় পেয়ে বল্‌লে, হ্যাঁরে, হেড্‌ মাষ্টার মশাইকে ডেকে আনবেন না তো ?

—পাগল হয়েছিস? কানাই ওকে উৎসাহিত করলে: হেড মাষ্টারের ধার উনি ধ্যাঁষেন না কখনো। কিছু ভয় করিস্‌নি; বোধহয় 'ফাইন বুক' আন্‌তে গেছেন।

—ভয়? অনঙ্গ পণ্ডিতের ফাইন্‌-কে ভয় ক'রবে ফটিক শর্মা?

ইতিমধ্যে একহাতে ফাইন্‌-বই অন্য হাতে এককলম কালি নিয়ে বিড় বিড় করতে করতে উনি ক্লাসে ঢুক্‌লেন: ভালো করে' শিক্ষা দেয়া দরকার, ভালো করে' শিক্ষা দেয়া দরকার; সারা জীবন যা'তে ভুল্‌তে না পারে। একেবারে উৎসন্ন যেতে বসেছে সব! গুরুর সঙ্গে ঠাট্টা? রামায়ণ নিয়ে ফষ্টি নষ্টি?

ফটিক নিরীহ, বিনীতমুখে বল্‌লে, আমি কি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করলুম ভাব্‌ছেন, পণ্ডিত মশাই?

—করোনি, করোনি, শাখামৃগ? অনঙ্গ পণ্ডিত এবার ওর ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করলেন: আমি তোমার বাপের পকেট্‌ এ্যাফেক্‌ট্‌ (affect) ক'রবো!

জরিমানার এই অভিনব ভাবার্থ শুনে নতুন ছেলেরা চম্‌কে উঠ্‌তো। কিন্তু আমাদের ওটা কান-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমরা জান্‌তুম্‌ যে উনি একেবারে ফাইন্‌-এর উৎস সন্ধান করে' ফেলেছেন। কোন ছেলেকে জরিমানা করলে টাকাটা যে তার বাপের পকেট থেকেই আসে, এতো একেবারে ন্যায়ের যুক্তি!

পণ্ডিত মশাই ফাইন্‌-বই খুলে তা'তে কলমটা ছুঁইয়ে ভয়ঙ্কর ভীতি প্রদর্শন করতে লাগ্‌লেন, না, ফটিকের সম্মতি প্রার্থনা করতে লাগ্‌লেন, বলা শক্ত: করি, করি, বাপের পকেট এ্যাফেক্‌ট্‌ করি এইবার?

কণ্ঠস্বর যৎপরোনাস্তি করুণ করে' ফটিক বল্‌লে,—আমাকে ফাইন্‌ করে' যদি আপনি তৃপ্তি পা'ন করুন। কিন্তু তা'তে আমার বাবার পকেট এ্যাফেক্‌ট্‌ ক'রবেনা, affected হবে আমার পেট! বাবা-কে তো চেনেন্‌ না? ও কথাটা মনে রেখে এবার থেকে সাবধান থাক্‌বে!

পণ্ডিত মশাই একেবারে জল হয়ে গেলেন; ফাইন বই মুড়ে ফেল্‌লেন এবং শাসিয়ে রাখ্‌লেন—

এর পরেই ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল।

অনঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে সেই যে শেষ ক্লাস, একথা সেদিন কেউই জান্‌তে পারিনি। পরের দিন আমরা স্কুলে গিয়ে শুনলুম, দেশ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে সেই রাতেই পণ্ডিত মশাই দেশে চ'লে গেছেন।

দিনক'য়েক পর 'টেস্ট্‌' হয়ে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই ওঁর সঙ্গে আর দেখা হ'লো না।

তারপর একটি দুটি ক'রে দশ বছর কেটে গেছে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জীবনে যে শুধু বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে তা-ই নয়; কঠিন বাস্তবের নির্মম অভিজ্ঞতার ফলে দৃষ্টিকোণ গেছে আমূল বদ্‌লে। ভারত-জোড়া অধীনতা আর শিক্ষাবিহীনতা যে কী নির্লজ্জ লোভী চক্রান্তের ফল সেকথা আজ দিনের আলোর মতন পরিষ্কার! দেশকে দেখছি নতুন চোখে। দেশ মানে যে শিক্ষাহীন, অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন কোটি কোটি নরনারী—এ সত্য এখন মূর্ত হয়ে উঠেছে আর তাদের মুক্তির পথও তেম্‌নি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে দেশ ও সমাজের উন্নতি অবনতি কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক!……

আজ পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে এই দশ বছর পরে দেখা হ'তে তাই কিশোরকালের সেই সব দুর্বিনীত ব্যবহারের কথা মনে পড়ায় নিজেরই কাছে লজ্জায় যেন মাথা হেঁট হয়ে এল। ওঁর প্রতি কোন গভীর শ্রদ্ধায় নয়—বরং করুণায় বল্‌তে পারো। হ্যাঁ, করুণা-ই করতে ইচ্ছে হ'ল ওঁর ব্যর্থ জীবনকে, কেন বলি।

কাল ছাত্রদের যে সংস্কৃতি সভার আয়োজন করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে একটা কাযে পুরণো স্কুলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় হঠাৎ পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে দেখা। নমস্কার করে' দাঁড়ালুম।

সেই আগের মতন ক্যাম্বিশের জুতো, তেম্‌নি জামা কাপড় আর ভাঁজ করা চাদর আজও আছে! কিন্তু চুল পাক ধরেছে, মুখের মাংস গেছে কুঁচ্‌কে আর কপালে ফুটে উঠেছে একসার জরার রেখা!

—জয়ন্ত, খবর ভালো তো?—কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টিতে নীচুকরা ঘাড় একটু তুলে বল্‌লেন: এবার তুমি আই, এ, দেবে, না? তা' কেমন তৈরী হ'ল?

আমাকে চিন্‌তে পারেন্‌ নি, বুঝ্‌লুম; আর সেই আশ্চর্য্য স্মরণশক্তিও ওঁর নেই।

—পণ্ডিত মশাই, আমায় ভুলে গেছেন? আমার নাম প্রদ্যোৎ! আমি আই, এ, পাশ ক'রেছি বছর আগে।

ভ্রূ-জোড়া কুঁচ্‌কে আর আমার মুখের ওপর ভারী দৃষ্টির একটা প্রলেপ দিয়ে অনঙ্গ পণ্ডিত যেন অতীতের স্মৃতির স্তর ভেদ করতে লাগ্‌লেন খানিকক্ষণ ধরে'। তারপর বলে' উঠ্‌লেন: ওঃ, প্রদ্যোৎ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তা' বেশ, তা' বেশ; কিন্তু তোমায় যে আর চেনবার জো নেই—মাথায় কী বাবরি রেখেছো, এ্যাঁ? তারপর, কি কর্‌ছো এখন?

সে সব তো অনেক কথা। ওঁকে তা' বল্‌বার কোন প্রয়োজন বোধ হ'লনা। তাই বল্‌লুম, বিশেষ কিছু তো ক'রছি না।

পণ্ডিত মশাই রীতিমত অবাক হ'য়ে বল্‌লেন: সে কী? একেবারে কোন কাযই না? পাশ করার পর থেকে বসে' বসে' সময় নষ্ট ক'র্‌ছো না কি?

ওঁর এত আগ্রহ দেখে অগত্যা বল্‌লুম, এর মধ্যে পাঁচ বছর 'ডেটেনিউ' ছিলুম।

আমার কথাটা বোধহয় ঠিক শুন্‌তে পাননি, কিম্বা, মোটেই বুঝতে পারেন নি—মনে হ'ল। হয়ত ভাব্‌লেন কোন বড়ো চাকুরীর ব্যাপার বুঝি! তাই রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন: বেশ, বেশ, লেগে থেকে আখেরে গুছিয়ে নিও। জীবনে পয়সাই সব; কিন্তু রোজগার করা তো অত সহজ নয়—তার জন্যে চাই কঠিন সাধনা—তপস্যাও বল্‌তে পারো! এই ছাখোনা, আমার আজ উনিশ বছর হ'ল এই ইস্কুলে। তিরিশ টাকায় ঢুকেছিলুম, এখন উঠেছি চৌষট্টিতে। এটাকে যেমন করেই হোক্‌ আশীতে তুল্‌বোই! বুঝ্‌লে, আশী টাকা আমি ইস্কুল থেকে আন্‌বোই; এ আমার বহুদিনের ইচ্ছে।

আত্মগৌরবে পণ্ডিত মশাই শুক্‌নো মুখে হাস্‌বার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তা'তে মুখখানা আরো করুণ আর কেমন নির্বোধ দেখাতে লাগ্‌লো। সেই মুখভাবে আজ প্রথম অনঙ্গ পণ্ডিতের নিষ্প্রাণ, নীরস এবং নিষ্ফল জীবন আমার চোখের সামনে এমন পরিষ্কার ফুটে উঠ্‌লো, যে সেটা অনুভব করে' আমার শরীরের হাড় পর্য্যন্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল! কী শোচনীয় ব্যর্থতা, জীবনের কী মর্মান্তিক পরাজয়: অর্থোপার্জনের নিষ্ঠুর ফাঁসে প্রাণলীলার কণ্ঠরোধ! এর জন্যে দায়ী কি শুধু ওঁর সত্যকার শিক্ষার আদর্শের অভাব—না, সমগ্র সমাজ? এ-ই যদি শিক্ষার আদর্শ হয়, এরই নাম যদি উন্নতি, তাহ'লে কোথায় থাক্‌বে ভারতবর্ষের মুক্তি? আর এম্‌নি প্রাণহীন প্রাণধারণের আদর্শ কত পণ্ডিত কত ছাত্রদের বছরের পর বছর গলধঃকরণ করিয়ে যাচ্ছেন—কে তা'র হিসাব রাখে? হায়রে, আমাদের দেশের ছাত্র!

আমার আর দাঁড়াবার প্রবৃত্তি হ'ল না। এতদিন পরে দেখা হলেও পণ্ডিত মশাইয়ের সম্বন্ধে আমার সব কৌতূহলই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। দু'একটা কথা বল্‌বার পর বিদায় নিলুম।

আর অনঙ্গ পণ্ডিত সেই আব্‌ছা অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে নখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে এগিয়ে গেলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

একাদশ অধ্যায়

দিল্লী

সমরখন্দের আমীর তৈমুর,—যাঁর রক্তাক্ত তরবারির সামনে পারস্য, আফগানিস্থান ও মেসোপটেমিয়া পতন হয়েছে, সমগ্র এশিয়ায় যাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তিনিই আসছেন আজ একতাহীন, শৃঙ্খলাহীন, শক্তিহী প্রায়-অরাজক ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে!

দুর্ব্বল দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীনের* সিংহাসনই কেবল কেঁপে উঠল না, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমস্ত হি মুসলমানের প্রাণও কেঁপে উঠল দুরু-দুরু ক'রে। কারণ তৈমুরের কীর্ত্তি-কাহিনী কারুরই অজানা ছিল তৈমুর—তৈমুর! ভগবানের চাবুক তিনি, প্রহার করেন তিনি নির্ব্বিচারে, হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সকল বলি দিয়ে দেশে দেশে তিনি নরমুণ্ডের পিরামিড রচনা করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নৃশংসেরও নৃশংস! গজ্‌নীর মামুদের সংহার-মূর্ত্তি ভারতবর্ষ তখনো ভুলতে পারেনি, সুতরাং তৈমুরের নামে লো হৃৎকম্প হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

পৌত্র পীর মহম্মদ মূলতান দখল করলেন। কিছুদিন পরে তৈমুরও করলেন তাঁর সঙ্গে যোগদ তারপর নব্বই হাজার তাতার অশ্বারোহী নিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন—লক্ষ্য তাঁর দিল্লী।

কিন্তু ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হ'লেও দিল্লীর পথ নিষ্কণ্টক হ'ল না। মুসলমান, রাজপুত ও জাট নানাস্থানে এই বিদেশী দিগ্বিজয়ীকে বাধা দেবার জন্যে দলবদ্ধ হ'লেন, কিন্তু তাঁরা কেহই আত্মরক্ষা ক পারলেন না। পাক-পাটান, দীপালপুর, শিরা, ফতেবাদ ও তোহানা প্রভৃতি স্থানে যেখানেই অল্পে সংঘাত বাধল, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের রক্তধারায় মাটি হয়ে উঠল পিচ্ছল। কত সহর ও গ্রাম প হ'ল সমতল ক্ষেত্রে, বাসিন্দাদের নিক্ষেপ করা হ'ল নগ্ন অস্ত্রের মুখে, চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল আগু ধোঁয়ায়! হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক ছুটে চলল দিল্লীর দিকে—হতভাগ্যরা ভাবলে, পা তারা ভগবানের চাবুককে ফাঁকি দিতে পারবে!

যুদ্ধ যা হ'ল তা নামে মাত্র যুদ্ধ, তৈমুরের সামনে কেউ দাঁড়াতেও পারলে না, সুতরাং এ-সব বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। অধঃপতিত ভারতবর্ষের পঙ্গু পুরুষত্বের গগনভেদী আর্ত্তনাদ ক্রমে দিল্লীর কাছ গিয়ে হাজির হ'ল।

দিল্লীশ্বরের ডান হাতের মতন ছিলেন তখন মাল্লু খাঁ। কিছু সৈন্য সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লী বেরিয়ে তৈমুরকে বাধা দিতে এলেন।

* গত সংখ্যায় আমার অন্যায় অন্যমনস্কতার জন্যে একটি ভুল থেকে গেছে। "রংমশালে"র গ্রাহক শ্রীমান বন্ধু সেই ভুলটি দেখিয়ে দিয়ে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন, মহম্মদ তোগলকের পুত্র নয়, ভ্রাতু ইতি—লেখক

এর পর যে বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হ'ল, তা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। তৈমুরের সঙ্গে ছিল একলক্ষ হিন্দু দিল্লীর সৈন্যরা আসছে শুনে নির্ব্বোধরা আনন্দ প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলে না।

তৈমুর ভাবলেন, একলক্ষ সক্ষম বন্দী বিদ্রোহী হ'লে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তখনি হুকুম ন, "ওদের সকলকে হত্যা কর।"

সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত অস্ত্রে অস্ত্রে হ'ল ঝকমক্ বিদ্যুৎ-সঞ্চার এবং দেখতে দেখতে একলক্ষ মৃতদেহ পড়ল রক্তাক্ত পৃথিবীর উপরে! তাদের কাতর কান্না আজও জেগে আছে ভারতের প্রাণে।

ইতিমধ্যে মাল্লু খাঁ আবার পশ্চাৎপদ হয়ে দিল্লীর ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এর পর দুই পক্ষই চরম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগল।

তাতার সৈন্যরা আবার ভয় পেলে, কারণ তারা দেখলে তাদের বিরুদ্ধে দলে দলে হাতী প্রস্তুত হচ্ছে। ব অদ্ভুত, বিরাটদেহ জীবের শুঁড়ে শুঁড়ে বাঁধা নগ্ন তরবারি এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে ছোটখাটো দুর্গের সৈনিকে পরিপূর্ণ হাওদা। তাদের বিশ্বাস হ'ল, এদের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব।

সঙ্গের জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্র বিচার ক'রে বললেন, "হুজুর, মানুষ কখনো এমন আজগুবি জানোয়ারের দাঁড়াতে পারে না।"

তৈমুর অটল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বার তারিখে তিনি সসৈন্যে যমুনা নদী পার হয়ে ব্যূহ তে লাগলেন। হাতীদের বাধা দেবার জন্যে তিনি ব্যূহের সামনে স্থাপন করলেন পরস্পরের সঙ্গে াধা দলে দলে মহিষকে।

দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন ও তাঁর যোদ্ধা মন্ত্রী মাল্লু খাঁয়ের সঙ্গে ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার পদাতিক ও দশ ার অশ্বারোহী সৈন্য।

তাতাররা বুঝলে সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ। সুতরাং তাদের উৎসাহ বেড়ে উঠল।

ভারতীয় সৈনিকরা আক্রমণ করলে। নিপুণ সেনাপতি তৈমুরের আদেশে তাতারদের দক্ষিণপাশের সেনাদল ভারতীয়দের বামপাশকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলে পিছনদিকে গিয়ে হাজির হ'ল। তখন ভারতীয়রা আক্রান্ত হ'ল একসঙ্গে সম্মুখে ও পিছন থেকে।

ভারতের পক্ষে ফল হ'ল মারাত্মক। দিল্লীশ্বরের সমস্ত সৈন্য প্রাণভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেরী করলে না। এমন কি যাদের জন্যে এত দুর্ভাবনা, সেই হাতীর দলও পালিয়ে গেল ভীত গরুর মতন।

পরদিনই তৈমুর দিল্লীনগর অধিকার করলেন।

যুদ্ধ থেমে গেল বটে, কিন্তু দিল্লীর বিষের পাত্র তখনো পূর্ণ হ'ল না।

বিজয়ী ও দাম্ভিক তাতারদের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত ও মরিয়া হয়ে দিল্লীর হিন্দু বাসিন্দারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। বহু পরিবারের হিন্দু নারীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দিলেন আত্মাহুতি এবং পুরুষরা মৃত্যুপণ ক'রে তরবারি হাতে নিয়ে তাতারদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিল্লীর পথে পথে জাগল যোদ্ধাদের সিংহনাদ ও আর্ত্তনাদ। কিন্তু অসংখ্য তাতারী সৈনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাধারণ নাগরিকরা প্রাণদান ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না। দিল্লীর পথে পথে সাজানো হ'ল হিন্দুদের নরমুণ্ডের পিরামিড। বাকি হিন্দুরা হ'ল বন্দী। কথিত আছে, এমন তাতারী ছিল না, যে অন্তত বিশজন হিন্দু গোলাম সংগ্রহ করেনি।

পনেরো দিন ধ'রে দিল্লী লুট ক'রে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে তৈমুর স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথেও তৈমুরকে প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হ'ল। মীরাট, হরিদ্বার, কাংগ্রা ও জা প্রভৃতি স্থানে তিনি যে কত হিন্দু সংহার করলেন, তার হিসাব থাকলে পৃথিবী আজও শিউরে উঠত। বে বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই তৈমুরকে বেশী বাধা দিয়েছিল। তৈমুর অসংখ্য ভারতীয় শিল্পী কারিগরকেও বন্দী ক'রে নিয়ে গেলেন—সমরখন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর অভাব ছিল ব'লে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, একবারমাত্র যুদ্ধযাত্রা ক'রে তৈমুর ভারতবর্ষকে যতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রে গি ছিলেন, ততটা আর কেউ পারেনি; এদিক দিয়ে গজ্‌নীর কুবিখ্যাত দস্যু ও হত্যাকারী মামুদ পর্য্যন্ত তাঁ কাছে ম্লান হয়ে পড়বেন।

তৈমুরের পিছনে প'ড়ে রইল মরুভূমির মতন দীন উত্তর-ভারতবর্ষ। সমস্ত দেশ জুড়ে জাগল দুর্ভি ও মড়কের হাহাকার, পথ-ঘাট-মাঠ ছেয়ে রইল লক্ষ লক্ষ কাঙ্গালে, নগরের পর নগর হয়ে গেল ভারতে বুক থেকে অদৃশ্য। এমন-কি দিল্লী নগরও প'ড়ে রইল বিরাট এক ধ্বংসস্তূপের মত—সহরের ভিতরে মানুষে বসবাস রইল না বললেও চলে। ইতিহাসে পড়ি, তৈমুরের প্রস্থানের পর দীর্ঘ দুই মাসের ভিতরে দিল্লীনগ একটিমাত্র পাখীকেও উড়তে দেখা যায়নি!

কোন কোন ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, সমগ্র এসিয়ায় একেশ্বর হবার জন্যে তৈমুরের বাসনা ছিল তখনকার প্রাচ্যদেশের সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্য চীনকেও তিনি অধিকার বা বশীভূত করবেন। চীনে যাবা পথের পাশেই পড়ে উত্তর ভারতবর্ষ। পিছনে বা পাশে শত্রু রেখে পাছে তাঁকে বিপদগ্রস্ত হ'তে হয়, সে ভয়েই আগে থাকতে ভারতকে তিনি পঙ্গু ক'রে রাখলেন। এবং জয়ী হয়েও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দি দৃষ্টিপাত না ক'রে স্বদেশে ফিরে গেলেন। কারণ যাহাই হোক, তৈমুরের ভারত আক্রমণ যে তা যোদ্ধা-জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৩৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে আমীর তৈমুর সরমখন্দে ফিরে এলেন এবং তার এক হপ্তা প দেখি, ভারত-বিজয়কে স্মরণীয় করবার জন্যে তিনি এক বিরাট মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন। অ দুই লক্ষ নরহত্যা ক'রে তিনি যে দেশে ফিরে এসেছেন, এজন্যে তাঁর মনে একটিও দুঃখের রেখা পড়ল সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতের কথা ভুলে তিনি তাঁর মসজিদকে অপূর্ব্ব ক'রে তোলবার উপায় চি করতে লাগলেন।

মসজিদের বাইরের দেওয়াল যখন সম্পূর্ণ হ'ল, ভিতরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের জন্যে তখন নিযুক্ত হ'ল ভারত থেকে বন্দী-ক'রে-আনা দুই শত শিল্পীকে। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তারা গ'ড়ে ফে চারিশত আশীটি পাথরের থাম, মার্ব্বেলের ভিতর-দিককার ছাদ ও অলঙ্কৃত পিতলের দরজাগুলি। মস্‌জি নির্ম্মাণ সমাপ্ত!

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল, সমরখন্দের ক্ষুদ্র বাজার রাজধানীর উপযুক্ত নয় এবং বাজারে আনাগো করবার পথটিও বড় সংকীর্ণ! তখনি তিনি হুকুম দিলেন—"বড় ক'রে তোলো বাজারকে, তৈরি কর ও চওড়া একটি রাজপথ! সময় দিলুম বিশ দিন।" যথাসময়ে হুকুম তামিল করবার লোকের অভাব হ'ল তৈমুরের হুকুম—যমের হুকুম!

আমীর তৈমুরের বয়স এখন চৌষট্টি বৎসর। যদিও তাঁর দেহ আগেকার মতই বলিষ্ঠ আছে, ত

মাঝে এখন তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন। এখন তাঁর বিশ্রাম করবার সময়, কিন্তু বিশ্রাম সহ্য হয় না তে। আজও তিনি সেই দৃপ্ত তৈমুর—একা যিনি শত্রু-দুর্গের সিংহদ্বারের সামনে ছুটে গিয়েছিলেন করবার জন্যে। কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে এখনো তিনি শান্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না। এশিয়া মাইনর থেকে তাঁর সামন্ত রাজাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পুত্রদের অধীনস্থ দেশে নূতন শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে। বোগ্‌দাদ নগর শত্রুর করতলগত হয়েছে। এ-সব হচ্ছে নূতন আহ্বান!

তৈমুর সাড়া দিতে কালবিলম্ব করলেন না। দেশে ফেরবার চারমাস পরেই আবার তিনি করলেন া। সমরখন্দ তিন বছর তাঁর মুখ দেখতে পেলে না।

(ক্রমশ)

ভোমার বিপদ

বেগম সালেমা খাতুন

সহর হ'তে অনেক দূরের গ্রাম,
গতির যুগের নেইক গন্ধ নাম—
লাঙল চষাই ব্যবসা হোথায় তাই,
লেখাপড়ার আপদ বালাই নাই!
বাঁশ বাগানের ক্ষুদ্র ফাঁকে ফাঁকে,
তালের কুঁড়েয় সবাই ওরা থাকে!
সকাল হ'লে কাজেতে যায় চ'লে,
জট্‌লা করে গোহাল দেবে বাচাল মেয়ের দলে!
* * * *
কোলকাতাতে পড়্‌লো বুঝি বোমা!
সাতপুরুষের ভিটের নামে ফিরে এলো "ভোমা!"
ভিটের তো ভাই চিহ্ন কিছুই নাই!
বাস কর্‌বার হুকুম নিয়ে বাঁধ্‌লো কুঁড়ে তাই!
বন্ধুও তো জম্‌লো দু'একজন,
ভোমার সাথে কর্‌লো আলাপন!

ও পাড়ার ঐ চণ্ডীতলার গোপে,
তেল-বুলিয়ে গোঁপে,
মুড়ুলির গর্ব-সুখে বল্‌লে সবার কাছে—
যেখানে যে আছে—
ভোমার কাছে শুনেছে সে যতো
বিজ্ঞ-জ্ঞানীর মতো:

"যুক্ত-পক্ষ রাজার ছেলে আপন অসির জোরে
ইন্দ্রদেবের বজ্রখানি আন্‌লো বেঁধে ধ'রে;
তারেই আবার কেটে কেটে বাস্কমতন ক'রে
ঘোঁৎকা মতো দৈত্যশিশু দিলেন ভ'রে ভ'রে!
আর কোথা যায়! যেইখানেতে ফেলেন তিনি ছুঁড়ে
ভেঙে চুরে মেরে ধ'রে যায় সে আবার উড়ে!
এরেই নাকি এক কথাতে সবাই বলে বোমা,
এদেরই তো জ্বালার চোটে পালিয়ে এলো ভোমা!"

ভয়ে ভয়েই সবাই এলো সন্ধ্যে বেলায় তবে—
কথাগুলো সত্যি নাকি বুঝিয়ে দিতে হবে !
বল্‌লে ভোমা—"খুবই খাঁটী ; বিষম ভয়ংকর !
এর হাতে তো বাঁচাই সুদুষ্কর !
বজ্র হ'তে তৈরী কিনা ওটা,
পড়ার সময় শব্দের কী ঘটা !
খুলেই বলি শুন্‌বে যদি তবে—
কতোরকম বোমাই-না তৈরী হ'লো ভবে !
হোঁৎকা বোমা, ভোঁৎকা বোমা, কেউবা আবার ধেড়ে
বানিয়েছে কি বেড়ে !
কেউবা পড়ে আগুন জ্বালার পরে,
কেউবা পড়ে ধোঁয়া ছাড়ার তরে !
শব্দ কী-সে বিষম ভয়ংকর,
চম্‌কে নাড়ী, বুকের মাঝে বইতে থাকে ঝড় !
ভয়ের চোটে তাঁতিবাগান ছেড়ে দিলেম আমি,
হাতিবাগান এসে তবে থামি !
হায়রে আমার কপাল খানা মন্দ,
(যা' করেছি সন্দ !)—
পড়্‌লো বোমা পাশের বাড়ীর পাশে,
দুটো চারটে ভাঙ্‌লো বাড়ী ত্রাসে !
তারপরে তো যেথায় চলি আমি,
ও-বেটারও দৃষ্টি সেথা পড়্‌ছে দিবাযামী !
কী-ই করি বাস্ক খুলে দলিল পড়ে একি,
সাতপুরুষের ভিটে আমার এই গ্রামেতেই দেখি !"

সবাই বলে "বাবু মশাই পলাও হেথা হ'তে,
তোমার জন্যে পড়্‌বে বোমা মোদের বাড়ীর পথে !
তোমার তরে মোদের শুদ্ধ প্রাণের টানাটানি,
তোমার সাথে বোমাও হেথা আসবে চলে জানি
বল্‌লে ভোমা "ভয় কেন গো ? মানুষ সেতো নয়
দৈত্য কিম্বা ভূত যে সেটা এই তো মনে হয় !
পালিয়ে এলাম দূরের গ্রামে এই—
কেমন ক'রে আস্‌বে হেথা হোক্‌না সেটা যেই !"

তবুও সবার তরে,
সব সময়েই থাক্‌তে হ'লো ঘরে !
বুঝিয়ে দিলে বোমা যদি আসেই কোন মতে,
তা' হ'লে আর পড়্‌বে নাকো পথে !
প্রাণের মায়া আজকে কেমন ক'রে,
বাইরের এই আকাশ আলো সবই নিলো হ'রে
যদিই কভু বাইরে যেতে হয়—
সবাই বলে "পড়্‌বে বোমা, পলাও মহাশয় !"
ভাগ্য খানা মন্দ বড় হায়,
ঘরের ভিতর উস্‌খুসিয়ে প্রাণটা বুঝি যায় !
কর্‌লে কি শেষ মেষ,
বোঁচকা বেঁধে একটা রাতে হ'লোই নিরুদ্দেশ !
ঠিক করেছে গহণ মনের তলে,
মর্‌তে হ'লেও কোলকাতাতে যাবেই যাবে চলে
নিঃশ্বেসটা বন্ধ ক'রে ফেঁপে মরার চেয়ে
ঢের ভালো সে মৃত্যু বরণ কঠিন বোমা খেয়ে !
লোকের মুখের কথার বোমা শেষে,
পাঠাও তারে সত্যিকারের বোমা পড়ার দেশে

এক নিশ্বাসের গল্প !

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মেওয়া ফলে

বনমালীবাবুর চশমার কারবার। অনেক লোককে চক্ষু দান করে' তিনি বড়লোক। চক্ষু দান না বলে' চক্ষুরত্ন দান করেছেন বল্‌লেই বোধ হয় ঠিক হবে।

এখন বয়েস হয়ে গেছে, নিজের চোখেই ভালো দেখতে পান না—নিজের চশমা দিয়েও না। তবুও চক্ষুদানের কাজে ভালো দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না। কার্য্যভার ছেলের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে অবসর নেবার আগে ছেলেকে ডেকে তিনি কয়েকটি উপদেশ দিতে চাইলেন।

ছেলে তাঁর এম্‌নিতেই চৌকস্। তবু তাকে আরো একটু চোখা করবার মৎলবে তিনি বল্লেন—

"ছাখো বাপু, চক্ষুলজ্জা থাক্‌লে এই চক্ষুদানের কাজে সুবিধে করতে পারবে না। খদ্দের এলে কি বল্‌বে শোনো বলি। ফ্রেমে কাচ আঁট্‌তেই, খদ্দের যখন জিজ্ঞেস করবে, দাম কত ? তুমি বল্‌বে, দশ টাকা। দশ টাকা বলে' একটু সবুর করবে। সবুরে মেওয়া ফলে, জানো তো বাপু ! দেখবে খদ্দের দাম শুনে ভড়কায় কি না। তারপর যদি ছাখো খদ্দের তাতে চম্‌কালো না, তখন বল্‌বে, দশ টাকা হোলো তো ফ্রেমের দাম—লেন্‌সের দাম হচ্ছে আরো দশ। এই করবে, বুঝেচ ? এ যদি না পারো, এ কারবারে কখনো টাকার মুখ দেখতে পাবে না—নিজের চশমা চোখে লাগিয়েও নয়।"

পরের দিন থেকে ছেলে দোকানে বসেছে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েই বসেছে—সবুরে মেওয়া ফলাবে বলেই কেবল নয়, সে যে বাপ্‌কা বেটা, সেটাও দেখিয়ে দিতে চায়। এবং খদ্দেরও এসেচে যথারীতি।

ফ্রেমে চশমার কাচ লাগিয়ে দিতেই খদ্দের জিজ্ঞেস করেচে, দাম কত মশাই ?

ছেলে বল্‌লে, পনের টাকা। বলে' খদ্দেরের দিকে আড়চোখে চেয়ে নিল একবার—লোকটা টল্‌ছে কিনা !

কিন্তু তথাপি তাকে অটল দেখে ছেলে বল্‌লে, পনের টাকা কেবল ফ্রেমের দাম আর আপনার লেন্‌সের জন্যে আরো পনের। বলে' আরো একটু সবুর করল ছেলে—খদ্দের তখনো দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখলে সে। তখনো সে খাড়া আছে, পালিয়ে যায়নি দেখে, দৃঢ়কণ্ঠে ছেলে বল্ল এবার—

"পনের টাকা হোলো গে প্রত্যেকটি লেন্‌সে।"

নগদ্ পঁয়তাল্লিশ টাকা গুণে বাজিয়ে নিয়ে লোকটিকে সে চক্ষুদান করল।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল

এই সহরেই একজন ওস্তাদ্ ব্যবসায়ী আছেন, নাম তাঁর করতে চাইনে। তাঁর চুরুটের দোকান। নিজের ব্যবসার প্রসার করবার কায়দাটি তাঁর নিজস্ব। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দেরের কাছে আবেদন জানানোর ধারাটা তাঁর তেমন মনঃপূত নয়—তিনি নিজেই খদ্দেরকে ধরে' তাড়া করে' থাকেন।

তাঁর কায়দাটা হচ্ছে এই, নামজাদা লোকদের বেছে বেছে ভালো এক বাক্স দামী চুরুট তি পাঠিয়ে দ্যান্—আর সেই সঙ্গে দামের বিল্টাও। অবশ্যি, তার সাথে সৌজন্যপূর্ণ একখানা চিঠিও যে থাকে তা নয়। এইভাবে, তিনি কোনো ডাক্তারকে এক বাক্স নামজাদা চুরুট প্লাস্ আটচল্লিশ টাকা একখানা বিল্ নিম্নলিখিত পত্রের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন :

"মাননীয় মহাশয়,

চিকিৎসকরূপে আপনার যেরূপ খ্যাতি, আমার চুরুটের খ্যাতি তার চেয়ে হয়ত কম নয়। দুই খ্যাতিমান্ পরস্পর সম্মিলিত হোক্, কে না চায়? উক্ত বাসনার বশে, সাহসী হয়ে, এই সঙ্গে আপনার এক বাক্স আমার চুরুট্ পাঠালাম, পরখ করে' দেখবেন, আমার কথা সত্যি কিনা। আমার চুরুট্ ব্যবহার করে' আপনি যে খুসী হবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ আছি।"

ডাক্তারের কাছ থেকে তার জবাব এল :

"আপনি আমাকে কোনো কল্ দ্যান্নি। কিন্তু তাহলেও আমি আপনাকে তিনখানা প্রেস্ক্রপ্‌শন্ পাঠালাম। প্রেস্ক্রপ্‌সন্‌গুলি যে ভালো সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, পরীক্ষা করলে আপনি তার সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন। আপনার চুরুট্ ব্যবহার করে' আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করেছি আমার প্রেস্ক্রপ্‌সন্ ব্যবহার করে' আপনিও যে তার চেয়ে কিছু কম আরাম পাবেন না সে বিষয়ে আমার ভরসা আছে। আমার ষোল টাকা করে' ভিজিট্ আপনার জানা আছে বোধ হয়—অতএব এই তিন প্রেস্ক্রপ্‌সনেই আমাদের সব শোধবোধ হয়ে গেল।"

কুড়ের স্বর্গ

একজন পাদ্রী সাঁওতালদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করতে গিয়েছিল। তার সমস্ত কথা শু সাঁওতালদের একজন বল্লে :"যেরকম বুঝচি তুমি আমাকে সভ্য করতে চাও?"

"ঠিক ধরেচ।" জবাব দিল পাদ্রী।

"আমার কুড়েমির বদভ্যাস দূর করে' আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে কাজের লোক বানাতে তোমার মতলব?"

"ঠিক তাই।"

"তারপরে তুমি আমাকে আরো শিক্ষিত করবে যাতে করে' আমি নতুন নতুন কলকো আবিষ্কার করে' কলকারখানা বানিয়ে এমন অবস্থায় আসব যখন আমাকে আর শারীরিক পরিশ্রম ক হবে না, তাই না?"

"তাই বটে।"

"ফলে আমার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে, আমি খুব বড়লোক হব। বড়লোক হলে পরে তখন আমাকে কাজকর্ম্মই করতে হবে না—তাই তো?"

"হুবহু তাই।"

"তাহলে এত কষ্ট করে' যেখান থেকে সুরু করলাম সেইখানেই ফের ফিরে এসে পৌছোনোর মানে? তার প্রয়োজন কি? আমাকে তো এখনো কোনো কাজ করতে হয় না। আমার বৌ-ই করে। আমি মহুয়া খাই আর মাদোল্ বাজাই।"

"কিন্তু তুমি যে সভ্যতার চূড়ান্তে গিয়ে ঠেক্‌বে সেটা কি ভেবেচ?" পাদ্রী তথাপি একবার চেষ্টা করেন।

"আরে মশাই, সেইখানেই তো আমি রয়েচি। সেই শেষ চূড়ায়—এই এখনি। এখানেই। কি, আমরা দুজনেই যথাস্থানে রয়েচি বলে যেন বোধ হচ্ছে। আমাকে কোনো কাজ করতে হয় না। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তোমাকেও না। অতএব তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। একেবারে সভ্যতার শ এসো দাদা, কোলাকুলি করা যাক্।"

বিজ্ঞানের বিস্ময়

কাঠের গুঁড়ো থেকে বিস্ফোরকের কাঠামো—

গাছ কেটে তক্তা করবার সময় প্রায় অর্দ্ধেক কাঠই বরবাদ হয়ে যায়। ছোট খাট লার অংশটাতো বাদ পড়েই, করাতের কৃপায় গুঁড়ো হয়েও অনেকখানি বাতিল হয়। কারণে, যেসব দেশে কাঠের কারবার খুব বেশি, যেমন ক্যানাডায় আর বল্‌টিক্ ষ্টেট্ —সেখানকার বৈজ্ঞানিকরা কাঠের গুঁড়োকে কি কি দরকারি কাজে লাগানো যায় তাই ব মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব মাথার ঘামের থেকে, এবং কাঠের থেকে এখন কের কাঠামো বেরিয়ে এসেছে। এবং এছাড়াও আরো কত কি! যেমন কাঠের থেকে এ একরকমের কেঠো চিনি তাঁরা বার করেছেন—যা নাকি আস্বাদে আর ারিতায় সাধারণ চিনির মতই চমৎকার! কেবল জিভের কষ্টিপাথরের পরীক্ষাতেই সে উত্তীর্ণ নয়, পকেটের দিক থেকেও হাল্‌কা। অর্থাৎ এই চিনি আম্‌দানি করা চিনির চেয়ে ঢের সস্তা। তাছাড়া, এই চিনি থেকে ওষুধের চিনি—খাঁটি 'গ্লুকোজ' যার নাম—তা তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। এই 'গ্লুকোজের' দাম অনেক এবং ওষুধপত্রে এর ব্যবহার খুব বেশি।

চিনি থেকে গ্লিসিরিন্—

এই চিনিকে, সাধারণ চিনির মত, জীবাণুর সাহায্যে গাঁজিয়ে আবার গ্লিসিরিনেও পরিণত করা যায়—এবং তার পরিণাম, ক্রমশঃ যা দাঁড়ায়, তাকে ভয়ানক ছাড়া আর কি বলা চলে? কেননা সেই গ্লিসিরিন্‌কে নাইট্রিক্ ও সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডের বিশেষ প্রক্রিয়ায় ফেল্‌লে তা থেকে নাইট্রো-গ্লিসিরিন্ নামক বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হয়ে থাকে। উক্ত বিস্ফোরক বস্তু, বোমা, শেল্ ইত্যাদির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে একান্ত অনিবার্য্য। ধ্বংসের ব্যাপারে অনিবার্য্য তো বটেই।

ওদেশ আর এদেশ—

কিন্তু সে সব কথা নয়, আমাদের দেশেও তো বহুৎ কাঠ আর তার উপসংহার অবহেলায় মাটি হয়ে যায়, সেই অপচয়ের কথা ভাবলে কাঠ হতে হয়। যুদ্ধের তাড়নায় এদেশে এখন যেরকম চিনির বিরলতা, তাতে আমাদের কোনো বৈজ্ঞানিক কি সেই কাঠের গুঁড়ো থেকে অন্ততঃ কাঠের গুড়ও বার করতে পারেন না? চিনির অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—তাই বা এমন মন্দ কি? পারলে পরে সেটা তাঁদের কাষ্ঠ-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হতে পারে।

মানুষের মত মানুষ

একটি দুরন্ত ছেলে

শ্রীবিমল বসু

টুনটুনি সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তার পড়ার ঘরে বসে পড়ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে পড়ছে। প
যখন তার মন বসে তার কিছু খেয়াল থাকে না, একমনে আত্মভোলা হ'য়ে পড়ে সে। এমনি টুনটুনি আমা
বাবলু দু'বার তাকে খাবার তাগাদা দিয়ে গেছে—টুনটুনি এমনি ধমক তাকে দিয়েছে যে সে
মুখ কালো ক'রে ফিরে গেছে। কতকক্ষণ সে পড়ছে কিছু তার মনে নেই—বইয়ের পাতার অক্ষর
ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল, ঘাড়টা টন্‌টন করছে। ঘাড়টা তুলতেই টুনটুনি অবাক হ'য়ে গেল। টেবিলের
দাঁড়িয়ে একটি লম্বা চওড়া লোক, জোয়ান চেহারা, লম্বা গোঁফ। হাতে তরোয়াল। চম্‌কে উঠ্‌লো টুনটু
চোর? না, ডাকাত? ভয়ে বুকটা তার ক'বার কেঁপে উঠ্‌লো। কাকে ডাক্‌বে সে। লোকটা
দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে, মিষ্টিগলায় সে বলে উঠ্‌ল—ভয় করছে বুঝি?

তার মিষ্টি গলা পেয়ে টুনটুনি সাহস পেলো মনে, শুধু ঘাড়টা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো কাউকে ভয় দেখাই না। লোকটা আবার মিষ্টি হাস্‌ল।

—তোমার চেহারা আর কোমরের তরোয়াল দেখ্‌লে ভয় করে কিন্তু তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে তো
ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে।

—বাঃ, তুমি বেশ তো কথা বল্‌তে পারো—লোকটি আবার হাস্‌ল।

—তুমি এখানে এলে কেন? আমাদের বেশী টাকা নেই।

—টাকার জন্যে আমি তো আসি নি।

—টাকার জন্যে নয়, গহনার জন্যে তো, কিন্তু মার গায়ে—

—না, না, টাকাকড়ি গহনা গাঁটি কিছু জন্য নয়।

—তবে তুমি এরকমভাবে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে এসেছ কেন?

—আমি এসেছি তোমাদের মতো বাংলা দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের মন চুরি করবার জন্য, তাই
এনেছি তোমাদের একজনের হাতে দিয়ে যাবো বলে। এ আমার অনেক দিনের সাধ। এই তরবারি
দিয়ে কত কাজ করা যায়, এ পৃথিবীতে যা কিছু অন্যায় আছে, অত্যাচার আছে—সব কিছু দূর করে
পারে এই তরবারি।

—বাঃ ভারী মজার লোক তো তুমি—তরবারি দিতে এসেছ। কিন্তু এ বাড়িতে আস্‌বার সময়
তোমায় দেখ্‌তে পাইনি?

—না, বড়দের চোখে আমায় তো দেখা যায় না।

—কিন্তু এত ছেলেমেয়ে থাক্‌তে আমার কাছে তুমি এলে কেন?

—এলুম তোমার কাছে, দেখলুম তুমি একা আছ। এদেশের ছেলেমেয়েরা বাস করে
কারাগারে। বাবা কাকা, মা মাসি, চাকর ঝি সদাসর্ব্বদা তাদের ঘিরে আছে। তাদের একা থাক্‌তে দে
তাদের ভাব্‌তে দেয় না, বুড়ো লোক আর বড় লোকেদের ভাব্‌নাগুলো ছোটদের মনের ভেতর জোর ক

দেওয়া হচ্ছে। কত বছর ধরে এই বিশাল বাংলা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কাউকে একা পাই নি।
আমাকে একা দেখে চুপি চুপি তোমার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু এখন তোমার ভয় করছে না তো?

—না, ভালো লাগ্‌ছে। তারপর বলো, থাম্‌লে কেন?

—দেখ্‌লুম তোমার মনের চারপাশে বুড়োলোকের ভাবনাগুলো ভীড় করে আসেনি, তাই তোমার
একপাশে ঠাঁই নিতে এলুম।

—কিন্তু তুমি কে তা তো বল্‌লে না?

—আমি বাংলা দেশের একটি দুরন্ত ছেলে।

—দুরন্ত মানে দুষ্টু তো?

—হ্যাঁ দুষ্টু, ভারি দুষ্টু ছিলুম আমি।

—মার কথা বুঝি শুন্‌তে না?

—মার কথা যারা শোনে না তাদের মত দুষ্টু আমি ছিলুম না, ছোটবেলা থেকে ছিলুম আমি দুরন্ত,
দৌড় ঝাঁপ করে বেড়াতুম। একবার কি হ'য়েছে জানো, আমার বয়স তখন বছর দুইয়ের ওপর।
শুয়ে ছিলুম, দেখ্‌লুম বাইরে দেওয়ালের গায়ে একটা মই লাগান আছে—আস্তে আস্তে উঠে
মই বেয়ে ওপর দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম পাঁচিলের ওপারে কি আছে দেখ্‌বার জন্যে। মা দেখে
এলেন ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন, আমি খুব হাস্‌তে লাগলুম। মায়ের চিৎকারে অনেকে দৌড়ে এল—
আমাকে জোর ক'রে মই থেকে নামিয়ে দিল।

—ইস্, তুমি যেন একটা কী! যদি মই থেকে পড়ে যেতে?

—লাগ্‌ত। মাথা ফেটে যেতো হয়তো।

—তবে কাঁদ্‌তে তো?

—উহুঁ, আমি সারাজীবন এমনি দুরন্তপনার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। পড়ে গিয়েছি, আবার
উঠেছি। কখনও কাঁদি নি।

—আমিও কাঁদিনা।

—সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলুম আমি। বীরপুরুষদের জীবন আমার ভারী ভাল লাগ্‌ত।

—আমারও লাগে।

—বাঃ তুমি দেখ্‌ছি ঠিক আমার মত। মার কাছে আমি রামায়ণ মহাভারতের বীরপুরুষদের কথা
শুন্‌তে ভাল বাসতুম। শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হত—আমিও একদিন এমনি বড় হব, বীর হব, সমস্ত দেশের,
বাংলা ও বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করব।

—বীর হ'য়েছিলে?

—লোকে তো তাই বলে। বাঙালী হ'য়েও আমি আমার শক্তি দিয়ে বীরত্ব দিয়ে ব্রেজিলের সেনাপতি
হ'য়েছিলুম।

—ব্রেজিল! সেনাপতি?—বাঃ কেমন ক'রে হলে, কেমন ক'রে তুমি সেখানে গেলে?

—সে-অনেক কথা।

—তাহো'ক, তবু বল শুনি। বাঙালী হয়েও পরাধীন দেশের অধিবাসী হয়েও তুমি হ'লে ব্রেজিলে সেনাপতি? কী অদ্ভুত!

—সত্যি অদ্ভুত। কিন্তু জানো আমার মত আজ ভারতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে হাজার হাজা ছেলেমেয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে সেনাপতি অধ্যক্ষ ইত্যাদি হবার।

—কিন্তু তা কি সম্ভব?

—পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই।

—তোমার জীবনের সব গল্প বলো। কেমন ক'রে তুমি সাত সমুদ্দর তেরো নদী পেরিয়ে ব্রেজিলে গিয়ে বাঙালীর শক্তির পরিচয় দিয়ে এলে?

—ও শোনো। জীবনে আমি অনেক সয়েছি। দুঃখ অভাব সব কিছু। আমার মনের শক্তি ছি অসাধারণ, ধৈর্য্য ছিল সারা জীবন। এরাই আমাকে বড় হবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। মনে আছে ছোট বেলাকার কথা। বেল গাছের ধারে খেলা করছি দেখি একটা বেড়াল একটা কাঠ বেড়ালী ধরে নিয়ে এল। কাঠ বেড়ালী দেখেছ তো?

—হুঁ, কবিতাও পড়েছি—কাঠ বেড়ালী, কাঠ বেড়ালী পেয়ারা তুমি খাও
কুকুর ছানা, বেড়াল ছানা তাও!

—বলো তারপর কি হ'ল?

ঐ ছোট্ট একরত্তি প্রাণীটিকে এমনিভাবে বেড়ালের হাতে নির্য্যাতিত হতে দেখে আমি আর স্থি থাকতে পারলুম না। তখনও তার দেহে প্রাণ রয়েছে। দৌড়ে গিয়ে বিড়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিড়াল আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছিল—সে তার নখ দিয়ে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষ ক'রে দিলে।

—ইস্। তারপর? টুনটুনি ভয়ে শিউরে উঠলো।

—আমার গা দিয়ে রক্ত পড়ছে আমার কিছু খেয়াল নেই। আমি কাঠ বেড়ালীটা ওর মুখ থে ছিনিয়ে নিয়েছি।

—সাবাস! তারপর?……

—মিনিট দশেক ধরে এই রকম চল্‌ল। বাড়ির লোকজনেরা ছুটে এসে আমায় রক্ষা করল বিড়ালে আক্রমণ থেকে। রক্তে আমার গা ভেসে গেছে।

—লাগেনি তোমার?

—খুব লেগেছিল। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল কাঠ বেড়ালীটিকে বাঁচান, তাই প্রথমে বুঝতে পারিনি কিছু

—কেঁদেছিলে?

—না, কাঁদিনি, আমি তো বলেছি আমার জীবনে কান্না কম। কিন্তু সেদিন আমার সবচেয়ে বে দুঃখ হয়েছিল।

—বেড়ালে তোমায় আঁচড়ে কামড়ে নিয়েছিল বলে?

—না, সেজন্য নয়, যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম তাকে বাঁচাতে পারিনি বলে। কিন্তু জানো, তিনমা আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল এজন্য।

টুনটুনির চোখ দু'টো বিস্ময়ে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল।

তিন মাস? কী সর্ব্বনাশ! তা তুমি থাকতে কোথায়?

নদে' জেলায় নাথপুরে আমার প্রথম দশটা বছর কেটেছিল।

কতদিনকার কথা সে?

অনেক দিন, ১৮৬১ সালে আমার জন্ম।

বাবাঃ ১৮৬১ সাল আর এখন যে ১৯৪৩ সাল—প্রায় ৮২ বছর আগে জন্মেছিলে তুমি? তাহলে তোমার তো এখন বুড়ো হয়ে যাবার কথা! নয় কি?

তা ঠিক। কিন্তু আমার মত দুরন্ত ছেলেরা কখনও তো বুড়ো হয় না।

কিন্তু কে তুমি?

আগেই তো বলেছি—বাংলার এক দুরন্ত ছেলে যে একদিন ব্রেজিলের সেনাপতি হয়েছিল।

বাঃ, কিন্তু ব্রেজিলে কেমন করে গেছ তা তো কিছু বল্‌লে না?

বল্‌ছি সেকথা, শোন। বছর দশেক বয়েস যখন তখন এলুম কোলকাতা শহরে। 'লণ্ডন মিসনারী' স্কুলে ভর্ত্তি হলুম কিন্তু কোলকাতার চেয়ে আমার পল্লী আমার নাথপুর সবচেয়ে ভাল লাগতো। তাই ছুটি পেলেই যেতুম কোলকাতা ছেড়ে গাঁয়ের দিকে। সেখানে সারাদিন হুটোপটি করে বেড়াতুম। একবার গাছ থেকে পাখীর ছানা পাড়তে গিয়ে পড়লুম সাপের মুখে।

সর্ব্বনাশ! সাপ?—তারপর?

যেই সাপ আমাকে কামড়াতে যাবে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমি তার ফনা জোর করে চেপে ধরলুম। সাপটা লেজ দিয়ে আমার ডান হাত জড়িয়ে মোচড় দিতে লাগল।

তারপর?—রুদ্ধ আবেগে টুনটুনির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

তারপর আর কি? বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে ছুরি বার করে সাপটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললুম। সর্ব্বদা মনে রেখো ধৈর্য্য আর মানসিক বল মানুষকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ওঃ সত্যি, তোমার কি সাহস!

দেহে শক্তি থাকলেই সাহস আসে না। দেহের শক্তির সঙ্গে মনের দৃঢ়তার যদি তুমি মিলন ঘটাতে পার, তাহলে দেখবে আসাধ্য-সাধন তুমি করতে পারবে। আমি তাই অনেক সময় অসাধ্য-সাধন করতুম।

তোমার ব্রেজিল যাবার গল্পটা বলো না, কেমন ক'রে সে-দেশের সেনাপতি হলে?

সব-কথা শুন্‌তে গেলে আমার জীবনের গোড়াকার কটা কথা জানা দরকার।

বেশ বলো শুনি, কিন্তু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা বলতে কি তোমার ভাল লাগবে? ঐ চেয়ারটায় বসো।

না—ও-চেয়ারটায় আমি আর বস্‌তে পারি না যদিও ওটা আমার চেয়ার।

কেন বসতে পারো না?

আমার বস্‌বার উপায় নেই, সেজন্যই তো আমার এই খালি চেয়ারে বস্‌বার ও তরবারি হাতে করে নেবার উপযুক্ত লোক খুজতে এসেছি।

ওঃ তাহলে তুমি বস্‌বে না?

না, শোনো আমার গল্প। ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন স্কুলে তো ভর্ত্তি হলুম। কিন্তু পড়ায় মন বসে না, খালি সর্দ্দারী আর দুষ্টুমি করে বেড়াই। বাবা রাগারাগি এমন কি মার ধোর করতেন। তার ওপর, স্কুলের খৃষ্টান ছেলেদের সঙ্গে মিশতে লাগলাম, তাদের বাড়ীতে অনেক সময় খেতুম। সে-যুগে এই পরধর্ম্মী লোকেদের সঙ্গে মেশা ও খাওয়া দাওয়া করা ছিল ভীষণ রকম খারাপ কাজ, মানে অধর্ম্ম।

কিন্তু এখন তো ঠিক তেমনটি নেই—বাবার সঙ্গে বাবার বন্ধু স্কুলের বাড়ি গিয়েছিলুম, খেয়েছিলুম কিছু……

যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেছে তাই। মানুষের রুচি ও মন উন্নত হয়েছে, তাই মানুষের ধর্ম্মের গোঁড়ামী গিয়েছে মরে। তাই এযুগে সম্ভব হ'য়েছে সব কাজ যা এক সময় প্রায় অসম্ভব ছিল। যাক্ সেকথা, বাবা আমার এই অধর্ম্ম আচরণে ভয়ানক শাসন সুরু করে দিলেন। আমার গোঁ ছিল ভয়ানক। আমিও জিদ ধরলুম আমি যা করেছি তা খারাপ কাজ নয়, কিন্তু শাসনের অত্যাচারে বাধ্য হ'য়ে আমি খৃষ্টান হয়ে গেলুম।

বাড়ি ঘর সব ছেড়ে দিলে?

হ্যাঁ। সব পিছনে ফেলে এলুম।

কষ্ট হয়নি?

হয়েছিল একথা ভেবে, যে বাধ্য হ'য়ে আমাকে সকলের মনে দুঃখ দিতে হ'ল। তখন আমার বয়স মাত্র চোদ্দ বছর।

মাত্র চোদ্দ? কী মুস্‌কিল? কে তোমায় খেতে দিলে, পরতে দিলে?

দিনকতক দিয়েছিলেন আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল। কিন্তু যার সঙ্গে অন্তরের কোন সম্পর্ক নেই তার কাছে আমি থাকতে যাবো কেন? তাই বেরিয়ে এলুম জীবনের রাজপথে, ভাগ্যের সঙ্গে একবার পাঞ্জা লড়বার জন্যে। অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা হোটেলে কাজ পেলুম। আমার কাজ হলো বিদেশ থেকে যে সব সাহেব মেম কলকাতায় আসবে—রেলষ্টেশন ও জাহাজঘাট থেকে তাদের হোটেলে আনা।

এতো কুলী বা চাকরের কাজ—ভারী ছোট কাজ যে।

কিন্তু সে-কাজই একদিন আমার জীবনে বড় হবার আকাঙ্খা জাগিয়ে দিলো। তাদের কাছে বিলেতের অনেক গল্প শুন্‌তুম। বিলেত যাবার জন্য ভারী ইচ্ছে করত, মন কেমন করত। তাই কোলকাতায় হোটেলের চাকরী ছেড়ে রেঙ্গুনের দিকে পা বাড়ালুম। মনে আশা, রেঙ্গুনে গিয়ে একটা ভালো চাকরী পাবো। কিন্তু সে সুবিধা সেখানে কিছু হলো না তাই চলে এলুম মান্দ্রাজে ভাল কাজের আশায়। কিন্তু সেখানেও কিছু হলো না। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পরিচয়টা আরো ঘন হয়ে এল। বাধ্য হয়ে ফিরে এলুম কোলকাতায়।

উঃ তুমি অনেক ঘুরেছিলে।

এই তো সুরু। সারাজীবন এমনি ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি। শুন্‌তে পেতুম আমার অন্তরে সমুদ্রের আহ্বান। কেমন ক'রে বিলেত যাবো তাই কেবল ভাব্‌তে লাগলুম। গঙ্গার ধারে জেটিতে জেটিতে ঘুরে বেড়াতুম, জাহাজের মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে আলাপ করতুম। এমনি করতে করতে এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা। তাকে আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খার কথা, জীবনের সমস্ত লাঞ্ছনার কথা

তাকে খুলে বললুম। আমাকে সে বিলেত নিয়ে যেতে রাজী হল—জাহাজের সহকারী ষ্টুয়ার্ড হ'য়ে সতেরো বছর বয়সে বিলেতের দিকে পাড়ি জমালুম।

কিন্তু লণ্ডন সহরে গিয়ে আমি হদিস পেলুম না। 'ইষ্ট এণ্ড' বলে জায়গায় একটা ঘর ভাড়া করলুম। কিন্তু খাবো কি? কেমন ক'রে কাট্‌বে দিন? কী প্রকাণ্ড আর কী বিচিত্র সহর! পথে পথে খবরের কাগজ বিক্রি করতে সুরু করলুম—উপায় কি—কিন্তু তাতে কি আর খাওয়া পরা চলে? তাই বাধ্য হ'য়ে রাস্তায় মুটে মজুরের কাজ নিলুম। তাতে খাওয়া পরার সুবিধা কিছু হল। এই রকম এটা ওটা সেটা করতে করতে কিছু কিছু ক'রে টাকা পয়সা জমালুম। এই জমান টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কিনে ইংলণ্ডের ভেতরে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করতে সুরু করলুম। এমনি ক'রে কটা বছর কাটল। জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল, নতুন লোকজনের দেখা পেলুম, নতুন জায়গা দেখে বেড়াতে লাগলুম। এমনি করতে করতে একটা ছোট সহরে সার্কাস-দলের এক ম্যানেজারের সঙ্গে হ'ল আলাপ। ভাগ্যের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচিত হবার জন্যে সপ্তাহে ১৫ শিলিং মাহিনায় সার্কাস দলে ঢুকে পড়লুম।

ওমা, সার্কাস-দলে?—সত্যি কি অদ্ভুত তুমি!

এই দলে আস্‌বার পর সার্কাস খেলোয়াড় হিসেবে আমার নাম একটু ক'রে ছড়াতে লাগ্‌ল। এই সময় প্রফেসর জাম্‌বাকের সঙ্গে পরিচয় হল।

প্রফেসর জাম্‌বাক্ কে?

প্রফেসর জাম্‌বাকের নাম এককালে সারা পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে ফিরত। অদ্ভুত শক্তি লোকটার। বনের পশুকে বশ করানোর শক্তি ওর অসাধারণ। ইচ্ছে হ'ল ওর মতো আমিও বাঘ সিংহ বশ করবার শক্তি অর্জ্জন করব। আমার মনের কথা তাকে জানালুম। সে শেখাতে রাজি হল। সার্কাসকে সেলাম জানিয়ে চলে এলুম প্রফেসরের দলে। জামবাকের পশুশালায় পশুদের বশ করানোর বিদ্যেটা আয়ত্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করলুম।

ওমা, কি দস্যি ছেলে গো তুমি? বাঘ সিংহ পোষ মানাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লে? ভয় ডর কিছু তোমার নেই?

না, ভয় ডর আমার কিছুটা কম। বাঘ সিংহ নিয়ে মেতে উঠ্‌লুম, বুনো পশুদের বশ করানোর বিদ্যেটা আয়ত্ত করে আবার ফিরে এলুম সার্কাস দলে। বুনো পশুদের নিয়ে খেলা করতে পারতুম বলে সারা য়ুরোপের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠ্‌লুম।

বুনো পশুর খেলা দেখাতে? তারা তোমার কিছু করত না?

না, মন আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষ সৃষ্ট জগতকে জয় করেছে তাতো জানো, তার ওপর আমার ছিল দেহে শক্তি, মনে বল। তাই দিয়ে অসাধ্য করেছি। ১৮৮২ সালে খাস লণ্ডন শহরে বাঘ আর সিংহির সঙ্গে খেলা করে কত যে মেডেল আর উপহার পেয়েছিলুম তার ঠিক নেই। ১৮৮৫ সালে এমেরিকায় গেলুম, এমেরিকা থেকে গেলুম মেক্‌সিকোয়, তারপর গেলুম ব্রেজিলে। ব্রেজিল কোথায় জানো তো?

হুঁ,—ব্রেজিল তো দক্ষিণ এমেরিকায়?

হ্যাঁ, এই ব্রেজিলে পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হলুম।

বারে বেশ মজা তো? খেলা দেখাতে একেবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ'য়ে গেলে?

হ্যাঁ,—তাই হলুম। কিন্তু এ কাজ করতে ভাল লাগ্‌ত না। কিছু কাজ করবার নেই, বসে বসে কেবল সর্দারী করা—তার চেয়ে সার্কাস ছিল ভালো। মৃত্যুর মুখোমুখি রোজ দাঁড়াতে হত, সে যে কী আনন্দ তা যদি জান্‌তে। ১৮৮৭ সালে ব্রেজিল সরকারের অধীনে সাধারণ সৈনিক বিভাগে যোগ দিলুম। সাধারণ সৈনিক থেকে কর্পোরাল, তার পরে এক পদাতিক দলের প্রথম সারজেণ্ট এবং পরে প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট হলুম। সে হ'ল ১৮৯৩ সালের কথা। ঐ বছরেই ব্রেজিলে একটা বিপ্লব হল। সমস্ত নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করলো। ব্রেজিলের সাধারণতন্ত্রের সেনারা বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। ক'দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ চল্‌ল।

তারপর ?

বিদ্রোহীরা রাজধানী দখল করতে না পেরে 'নিথেরক' বলে একটি ছোট্ট নগর অধিকার করবার সংকল্প করলে এবং কামান দাগতে লাগল। সে সময়ে নগর রক্ষা করার ভার যাদের ওপর ছিল তাদের মধ্যে আমি একজন। ওরা সংখ্যায় দ্বিগুণ, অস্ত্রেশস্ত্রে ওরা আমাদের চেয়ে সুসজ্জিত। নগর রক্ষার উপায় নেই দেখে প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করলেন—মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে আমাদের ভেতর কে শত্রুদের আক্রমণ করতে পারে ?

কে এগিয়ে এল ?

এগিয়ে এল একটি বিদেশী ছেলে—বাঙলা দেশের ছেলে সে।

কে সে ?

সে আমি !

তুমি ?

হ্যাঁ। চিৎকার ক'রে বললাম—দেখো, পরাধীন দেশের বাঙালী ছেলে কী করতে পারে। মাত্র পঞ্চাশজন সেনা দিয়ে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আমাদের আহত হ'ল কেউ কেউ, ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের কামান অধিকার ক'রে নিলুম। যুদ্ধের গতি গেল বদলে। বিদেশে বিদেশী ছেলে একটা জাতির ভাগ্য নিরুপণ করে এল।

উঃ কী সাহস তোমার ?

এমনি সাহস তোমারও আছে। তাকে শুধু জাগান দরকার শক্তি দিয়ে আর শ্রদ্ধা দিয়ে। মরবার আগে বড় ইচ্ছে ছিল, দেখে যাবো এই পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্ম। দেখে যাবো শৃঙ্খলিতা মায়ের মুখে মুক্তির আনন্দ। কিন্তু তা আর হলো না। ১৯০৫ সালে যখন জাতির জীবনের ঘন অন্ধকারে আস্‌ছিল মুক্তির আলো, আমার জীবনে তখন নেমে এলো চির অন্ধকার।

১৯০৫ সাল তো ভারতের নবজন্ম লগ্ন।

১৯০৫ সাল—আমার মৃত্যু-বাসর।—আমার আত্মা বাংলার ছেলেমেয়েদের ছেড়ে, বাংলা ছেড়ে যেতে পারে নি।

কেন ?

বাংলার দুরন্ত ছেলের শূন্য আসন পূর্ণ করবে কে ? কে নেবে আমার এ তরবারি, আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে কে ?

দাও, আমায় দাও তোমার তরবারি—তোমার আজন্ম সাধ, তোমার মৃত্যু-বাসরের শেষ-স্বপ্ন সার্থক করব আমি—আমরা, বাংলা ও ভারতের ছেলেমেয়ের দল। তোমার শূন্য আসন পূর্ণ করব আমরা। দাও, ও তোমার তরবারি আমার কোমরে বেঁধে।

—শান্ত ও তৃপ্তির হাসি হেসে সে অপরিচিত মূর্ত্তি এগিয়ে এল টুন্‌টুনির কোমরে তার তরবারি বেঁধে দ্বার জন্য। টুন্‌টুনি একবার জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নাম তো জানা হলো না ?

—আমার নাম ?—হাস্‌ল অপরিচিত মূর্ত্তি, আমার নাম—বাংলার মুক্তি-পিপাসু দুরন্ত ছেলের আমি একজন।

মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে টুন্‌টুনি দেখ্‌ল—দেওয়ালে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের ছবিখানা হাস্‌ছে।

একটু হাসো

উপহারের ভণিতা

দুটি ছোট্ট ছেলে তাদের দাদুকে একখানা ভগবদ্‌গীতা কিনে উপহার দেবে—কিন্তু উপহারের ভণিতায় কি লেখা যায় তাই হয়েচে তাদের সমস্যা। ওদের বড়দি বল্লে (বড়দি হলেও বয়সে বড়ো নয়) :

"কি লিখতে হয় আমি জানি। দাদুর কাছে অনেক বই আসে, তাতে যা লেখা থাকে আমি দেখেছি। আমি তাই লিখে দিচ্ছি, দাঁড়া।"

তাই লেখা হোলো।

বহখানি উপহার পেয়ে আর তার উপহার-পৃষ্ঠাটি দেখে দাদুর তাক্ লেগে গেল। সেখানে লেখা ছিল—"লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধার নিবেদনস্বরূপ প্রদত্ত হইল।"

হাঙরে-কুমীরে

সহরের ছেলেরা পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গেছে। নদীতে চান্ করতে নামার আগে গাঁয়ের একটা লোককে তারা জিগ্যেস্ করল : "তোমাদের নদীতে কুমীর টুমীর নেই তো ?"

"কুমীর ? নাঃ, একটাও না।" জবাব এল লোকটার কাছ থেকে।

ছেলেরা তো নদীতে নেমে পড়ল। একবুক জলে গিয়ে তাদের একজনের কি খেয়াল হতে সে লোককে জিগ্যেস্ করল আবার : "কিসে বুঝলে যে কুমীর নেই ?"

"এর আর বোঝাবুঝি কি ! আমরা তো আর বোকা নই ? যেখানে হাঙর থাকে তার ত্রিসীমানায় কুমীর ঘেঁষে কখনো ? কুমীর যা ছিল, হাঙররাই এসে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে।"

বৈশাখ এলো

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

বৈশাখ পুনঃ সাথে নিয়ে এলো
আলো হে,
লাগ্‌ছে তরুণ-কিরণ তাহার
ভালো হে!
চাঁপা-বেলফুল
মধু সুরভিতে
মোরে চায় যেন
কাছে টেনে নিতে
কিংশুক-ফোটা বন-পথে পথে বকুল কুসুম
ছড়ায়ে
এধার ওধার বৈশাখ শুভ-আলো রেখে গেছে
ভরায়ে।

যত না বিভেদ র'য়েছে জমানো
হিয়াতে,
আমাদের আজ আসে যায় আর
কি তা'তে?
বেদনার ব্যথা
যতো স'য়ে থাকি,
আজ কি সে'কথা
আর মনে রাখি?
বৈশাখ এসে নবীন আলোর পরশ যে গেছে
লাগায়ে
সকলের সাথে মোদের চিত্ত নিত্য রাখিতে
জাগায়ে!

আম্রমুকুলে আকুল-করানো
—গন্ধ
জানি, মুছে দেবৈ মানসমলিন
—দ্বন্দ্ব।
জানি, ঝড় মনে
বন্ধুর বেশে
সরল বাসনা
দিয়ে যাবে এসে।

তাই শুভার্থী বৈশাখ বুঝি নিয়ে এলো পুনঃ
আলো হে!
রঙমশালের ফুলঝুরি দিয়ে নতুন প্রদীপ
জালো হে!!

নামায়ণ

বেনামী

রামায়ণের গল্প তোমরা অনেকেই পড়েছো না? আজ আমি তোমাদের নামায়ণ সম্বন্ধে কিছু বলবো।

নামায়ণ কবে সুরু হয়েছে কেউ জানে না। তার লেখকই বা কে তাও জানা নেই। এমন কি, জিনিষটা কী, তাও বোধ হয় তোমরা কেউ জানো না।

তবে বলি শোনো।—

কিন্তু বলতে গিয়েই একটা গোল বাধছে। তোমাদের কি বলে ডাকবো? কথা বলতে গেলে অন্ততঃ তোমাদের নামটা তো জানা চাই। খোকা, খুকুমণি বলে, ডাকলে ত আর চলবে না, আবার যদি বলি—ওগো তুই—না, সে আমি পারবো না।

অথচ, নাম একটা ত দরকার। এবং তোমাদের সকলেরই একটা না একটা নাম আছে।

তোমাদের নাম নিয়েই ত আমার নামায়ণের সৃষ্টি। ওঃ, তোমরা বুঝি ভাবছো, তা হলে তোমাদের নাম নিয়ে বুঝি আমি একখানা বই লিখেছি এবং তারই বিজ্ঞাপন দিতে বসেছি।

কী বুদ্ধি! তাই যদি হবে, তবে বলবো কেন, যে নামায়ণ কবে সুরু হয়েছে কেউ জানে না, কে ওর সৃষ্টি তাই জানা নেই। আসল কথা, নামকরণ জিনিষটা সৃষ্টির গোড়া থেকেই চলে আসছে। শুধু মানুষ নয়, জানোয়ার, পশু-পক্ষী, পাহাড়, নদী, দেশ-মহাদেশ সকলকারই একটা না একটা নাম আছে। কে প্রথম সৃষ্টি করলে কেউ বলতে পারে না। অথচ, সকলেই প্রথাটা মেনে নিয়েছে।

বর্ত্তমানের কথাই ধরা যাক।

খুকুর অন্নপ্রাশন। নামকরণ হবে। বাপ মা তো ভেবেই আকুল, কী নাম হবে। সহজে পছন্দ হয় না। কত রকমের নাম তার মধ্যে মাত্র একটা। সহজে কি পছন্দ হয়!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয় ত সামলানো গেল না। অন্নপ্রাশনের পোষাকী নাম ছাড়াও আরো পাঁচ সাতটা হয়ে গেল। মা-বাবা দিলেন একটা, পিসিমা দিলেন আরেকটা। এমনি আরো অনেকে চাঁদা করে দিলেন।

তোমাদেরই মধ্যে কার নাম যে ক্যাবলা, না? তা ওটা নিশ্চয়ই অন্নপ্রাশনের নাম নয়। আর খেঁদী, এরাও তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষের মত বসে আছে, না? একটি ছেলেকে আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাই নাম দিয়েছিলেন, অনড্‌যান্। মানে? মানেটা না হয় অভিধানে দেখে নিও। একজন ভদ্রলোকের নাম জানতাম, শ্রীগোপীজনবল্লভপদরেণু পাল। একেই বলে, Truth is stranger than fiction. কোনো ঔপন্যাসিক এরকম নাম কল্পনায় আনতে পারতেন না। পয়ারছন্দে নামটি তৈরী—গোপীজনবল্লভপদরেণু আহা!

ঔপন্যাসিকদের অবশ্য একটু মুস্কিল আছে। তাঁদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দ ত আছেই, তার উপর

আছে পাঠক-পাঠিকাদের মর্জ্জি। ধরো একজনের নাম, "সাতকড়ি বঙ্গ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" এ রকম নাম উপন্যাসে চলে? তোমরা হয় ত বললে, ধ্যেৎ, ও-আবার নাম হয় না কি? আমি বলি হয়, এবং আমি স্বচ্ কলকাতার একটি বিখ্যাত রাস্তায় এমনি ধারা একটি নাম সাইনবোর্ডে ঝুলতে দেখেছি। অবশ্য নায়কের চরি হিসাবে নাম হওয়া উচিত। পরশুরামের জম্বুলিঙ্গম কোটিলিঙ্গমকে মনে আছে ত? আমি এখানে অবশ্য বাঙ্গা নামের কথা বলছি। হয় তো ভুল নামকরণের জন্যই অনেক বই অচল হয়ে গেছে কি না কে জানে। 'ঠাকুরম ঝুলি'র কোনো রাক্ষসের নাম যদি পরিতোষ কিংবা রহিমুদ্দিন হোতো, তা হলে বই বাজারে কাটতো কি জানিনা, পোকায় নিশ্চয়ই কাটতো।

নামের ইতিহাস লেখা হলে কত মজার খবরই না পাওয়া যেতো।

আজকাল, আন্নাকালী নাম শুনলে নিশ্চয়ই আধুনিকা শুক্লা, সবিতাদের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দে দেয়, কিন্তু আমাদের ঠানদি, ঠাকুরমায়ের কালে ও-নাম বেশ চলতো। আমি ত বুঝি না, বিলাতী অ্যান Anna—যদি শুনতে ভালো লাগে, আমাদের দেশী, ঘরোয়া 'আন্না'ই বা ভালো লাগবে-না কেন। ভুবনমোহি কৃষ্ণভামিনী, জগত্তারিনী, এ সব নামও সেদিন চলতো। আর ছিল, নৃপেন্দ্রবালা, গিরিন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমা আজকাল ছেলেরা যেমন কমলাপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জি না লিখে, লেখে কমলা চ্যাটার্জ্জি, তখনকার গিরিন্দ্রমোহি নৃপেন্দ্রবালারা কিন্তু গিরিন্দ্র ভট্টাচার্য্য বা নৃপেন্দ্র বা নেপা মুখুজ্জে লিখতেন না। অবশ্য, তোমরা বলতে প যে তাঁরা 'মোহিনী', 'কুমারী' বা 'বালা' তুলে দিলেও বিশেষ সুবিধা হোতো না, কারণ তাঁরা ভট্টাচার্য্য বা মু ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন—দেবী। আজ সে দেবীরা আর নাই। অবশ্য, তখনকার দিনের সাবিত্রী, ক ইন্দিরা, সরস্বতী, দুর্গা, গৌরী—এরা আজও আধুনিকা শুক্লা, সবিতা, সুপ্রিয়াদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে

আমাদের ঠানদি, ঠাকু'মাদের যুগের পর এলো সেই যুগ, যে যুগের ইংরাজি শিক্ষার ঢেউ দেশের প্রা সমাজ সংস্কৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। ডেরোজিও, ডেভিড হেয়ারের যুগ। অনেক বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্ম অব করলেন। এবং তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন ইংরাজী নাম। শুধু নাম নয়, পিতৃদত্ত নামের বানান ও বং পদবীও বদলালো।

জেম্‌স্ মুখুজ্জে, জোসেফ চ্যাটার্জ্জি বা জন বাইস্যাক (বসাক)এর সৃষ্টি হোলো। মুখোপাধ্যা অনেকদিনই মুখার্জ্জি হয়েছেন, আজকালকার সব 'মুখুজ্জে'রাই তা জানেন। এমন কি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যান থেকে বনার্জ্জিও হয়েছে। হয় তো এগুলির অপভ্রংশ, যেমন চন্দননগর হয়েছে চ্যাণ্ডারন্যাগোর বা চট্ট হয়েছে চিটাগং, বঙ্গদেশ হয়েছে বেঙ্গল। কিন্তু 'রায়' কোন্ হিসাবে 'রায়ে' (Raye) হয় বা সেন হয় (Seyne) এরা কি সব রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার অমিট্রায়ের পূর্ব্ব সংস্করণ না কি? তেমনি পাওয়া সিসি, লিসি, ডলি মলিদের সব। কাজেই মৃণালিনী যদি মিলি বা শীলা যদি Sheila হয়, দোষ কি?

মানুষের নামের সঙ্গে দোকানপত্রেরও নাম এই সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। 'চটকল মজদুর ইউনি কোনদেশী ভাষা? এখানেও নামকরণের সমস্যা নামায়ণের লীলা। গ্রামের গিন্নী বললেন, যা তো পটলা, দোকান থেকে এক পয়সার চিঁড়ে কিনে আনতো! ভজার দোকানে সাইনবোর্ড নেই, তবুও সকলেই দোকানের নাম। এখন এই ভজা যদি থাকে কলকাতায়, দুদিন পরেই সে সাইনবোর্ড টাঙাবে—ভজা এণ্ড কিংবা, দি গ্রেট চিঁড়া এম্পোরিয়ম। তা এন্ মুখার্জ্জির চানাচুর, বা পোট্যাটো চিপ্‌স্ বা সলটেড আমণ্ড যদি আমাদের এত ভালো লাগে, ভজা এণ্ড সন্সএর চিঁড়াই বা অপাংক্তেয় হবে কেন?

হয় তো বলতে পারো—কিন্তু 'এম্পোরিয়ম'—নাম যেন একটু বাড়াবাড়ি—নয় কি? হতে পারে, কিন্তু এখানেও নজির আছে—আর্ট প্রয়োগ বলতে পারো। কারণ একটু আগেই দেখে এসেছি, একটা দোকানের নাম 'দি গ্রেট হোমিও হল'। হলটি দশ হাত লম্বা, ৬ হাত চওড়া। নামায়ণে হলের মানে যেমন অভিধান বিরুদ্ধ হবে, ভজাই বা অভিধান মানবে কেন?

তা ছাড়া ভজার কি দোষ? এই সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের রাস্তাঘাটে পার্কে ইংরাজি নামের একাধিপত্য ছিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ড্যালহাউসী স্কোয়ার—যেন ইট পাথর দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'বৃটিশ পিরিয়ড' তৈরী হয়েছে। বরং ভজারা এদের খানিকটা দেশী বানিয়েছে। তাই ত ক্লাইভ ষ্ট্রীট হয়েছে 'কলাই ষ্ট্রীট', আর মেডিকেল কলেজ হয়েছে 'মাটিয়া কালিজ'। অবশ্য এমনও হতে পারে যে ওখানে লোকে মাটি নেয় এই মনে করেই ওর নাম হয়েছে মাটিয়া কালিজ। তাছাড়া হেদুয়া, গোলদিঘী, কোম্পানী বাগান, গড়ের মাঠ—এ সব ত আছেই। লর্ড আমহার্ষ্ট হুঁকো কলকে ধরতেন কিনা জানি নে, কিন্তু আমহার্ষ্ট রো'র নাম হয়েছে টিকেপাড়া। অবশ্য বৌবাজারেও বৌ পাওয়া যায় না, কিন্তু ওটা হচ্ছে বহুবাজার—যথেষ্ট বাজার আছে ঐ রাস্তাটায়। অপর পক্ষে আমাদের নতুন বাজারটা বহু পুরোণো।

অবশ্য ইংরাজি নাম সকলেই উচ্চারণ করতে পারে না। জাপানী ভাষায় ট্র্যাফালগার (Trafalgar) উচ্চারণ করা যায় না, ওরা বলবে 'ত্রাফারুগারু'। ধরো, ছোটদাদাবাবু পরীক্ষা পাশ করে গ্রামে এসেছে, বুড়ো চাকর রামশরণ জিগ্যেস করলে, দাদাবাবু তুমি কি পাশ দিলে? দাদাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, ম্যাট্রিক। বুড়ো রামশরণ পাশ পর্য্যন্ত জানে, ম্যাট্রিক কি তা জানে না, সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমাদের ঠানদি ঠাকুরমারাও ঐ দলের ছিলেন, তবে ওর একটা সমাধান করে নিয়েছেন। পরীক্ষার অনুক্রমিক সংখ্যা দিয়ে তাঁরা হিসাব রাখতেন, যেমন আই-এ পাশ করলে বলতেন দুটো পাশ. বি-এ হলে তিনটে। ধোপাদের নুড়ি দিয়ে কাপড় গোণার মত।

বিংশ শতাব্দীতে এই ইংরাজ-প্রীতির যুগ কতকটা রূপান্তরিত হয়েছে বলা যায়। তাই ত আমরা পেয়েছি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক ইত্যাদি। দোকানগুলির সাইনবোর্ডের দিকে তাকালেও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মিষ্টান্নের দোকানে "আপনাদের সেই চিরপরিচিত অমুক মোড়লের দোকান" যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাই 'মিষ্টি মুখ,' 'জলযোগ' ইত্যাদি। একটি বাড়ির নাম দেখেছি 'পদধূলি'। আমার এক কবি-বন্ধু তাঁর বাড়ির নাম দিয়েছেন 'ভালোবাসা'। ওটা গৃহস্বামী ও গৃহস্বামীনীর মধুর সম্পর্কের সূচনা করে, না বাসাটি সত্যিই ভালো তাই নাম দেওয়া হয়েছে ভালোবাসা, জানিনে। কিন্তু নামগুলি বড়ো মিষ্টি নয় কি? আবার দেখো, একটি দোকানের নাম, শ্রীচরণেষু। জুতার দোকান। নামটি যদি শ্রীচরণে সু (shoe) অর্থাৎ শ্রীচরণে জুতোবিশেষ না হয়, তা হলে খাঁটি বাঙ্গালী বলতে হবে।

সকলকার কল্পনাই কিন্তু বাস্তব ও কল্পনার সমতা রক্ষা করে চলতে পারে না। 'দি গ্রেট হোমিও হল' এর মত বিপরীতার্থক শব্দ সমন্বয়ের পরিচয় বাড়ির নামকরণেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের মত সৌধের নাম দেয় Cottage বা Villa অথবা কুঞ্জ-কুটিরও হতে পারে। একটি চমৎকার বাড়ির নাম পেয়েছি হার্মিটেজ (Hermitage)। কলকাতায় এই রকম কুটির ও আশ্রমের ছড়াছড়ি আছে। পূর্ণিমা রাত্রের কলকাতার ব্ল্যাক-আউটকে নিষ্প্রদীপ বললে কী অর্থ হয় বলো ত?

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একবার বায়স্কোপগুলার দিকে যাওয়া যাক। অবশ্য সময় নেই, তাড়াতাড়ি

ফিরতে হবে, বায়স্কোপের ভেতর গিয়ে আর কাজ নেই। আজকের মত খালি নামগুলাই দেখা যাক। এখানেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিদেশী নাম ফেলে দেশী নাম। অবশ্য সাহেবপাড়ায় এখনও বিদেশী নাম আছে। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এখন দেখি খাঁটি বাঙ্গলা নাম। 'রূপবাণী' নামটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। তেমনি চিত্রা, শ্রী, উত্তরা, চিত্রপুরী ইত্যাদি। এদের অধিকাংশ নামই সার্থক। ছবিঘর নামটি বেশ ডিমোক্র্যাটিক। 'আলেয়া,' 'বিজলী' নামটিও বেশ। থিয়েটারদের মধ্যে 'নাট্যভারতী'র নামটি বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। 'রঙমহল' নামটি আমাদের বাদশাহী যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'শ্রীরঙ্গম্' দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান মন্দির, মনে হয় আমরা যেন প্রাচীন ভারতের কোনো প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েছি।

বলেছি ত পরিবর্তন আস্তে আস্তে হচ্ছে। নামায়ণের উৎপত্তি যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাস্তাটিও ঠিক সিধা নয়। অনেক বেঁকেচুরে, পেছু হটে সামনে এগিয়ে এমনই ভাবে চলেছে। কোনো কোনো জায়গায় বৈদেশিকতা প্রতিশোধ নেবার জন্য ফিরে আসে। এই ধর না, 'আইসোলা বেলা' (Isola Bela) বলতে কি আমরা একটি আহারের স্থান বুঝি? 'কাফে দ্য মণিকো' (Cafe de monico)ই বা কোন জাতীয় নাম এবং কি বোঝায়?

মানে ত দূরে যাক, অনেক সময় উচ্চারণই জানি না।

এই ধর, আমরা কলকাতায় আছি বলেই জানি জায়গাটির ইংরাজী বানান—Calcutta। তা না হলে, কী উচ্চারণ করতাম? বলতাম—কালকুত্তা—লিমারিকের কবি হলে বলতাম—

I had a Dal-cutta (ডালকুত্তা)
Who came from Calcutta.

যাক, কলকাতায় যখন ভালোয় ভালোয় এসে পৌছেচি, তখন এইখানেই আমার নামায়ণ শেষ করা যাক। তোমাদের নাম নিয়ে আর তোমরা দুঃখ কোরো না—কারণ জানোই ত কবি বলেছেন—

যার অদৃষ্টে যেমনি জোটে,
—সেই আমাদের ভালো।*

* বেতারে পঠিত

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌ট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

আমার রংমশালধারী ভাই-বোনেরা—

নতুন বছরে আবার আমাদের দেখা হলো—অত দুঃসহ দুঃখের ভেতর আনন্দের কথা এই। বিগত বছরে যে অভাব বেদনা কষ্ট দুঃখ ভোগ করেছি, তা বিগত বছরেই পড়ে থাক। নতুন বছরে তার জের টেনে না আনাই ভাল। এই দুঃখ অভাবের ভেতর, নির্য্যাতনের ভেতর, নতুন বছরে নতুন করে বাজুক হৃদয়-বীণা, আশাভঙ্গের বেদনা-করুণ আর্ত্তনাদে সে-বীণায় সুর সেধো না। নতুন সুর ধ্বনিত হোক জীবনে। নির্জ্জীবের আর মৃতের বিলাপ আর নয়। এতকাল ধরে জাতি দুর্ব্বলের অস্ত্র কান্নাকে সম্বল করে পথ চলে এসেছে, সে পথের শেষ এখানেই যেন হয়। জীবন থেকে দুর্ব্বলতা বিদায় করে দাও। ক্ষীণ কান্নায় প্রায় মূক কণ্ঠস্বরকে একেবারে মূক করে দাও। তার পরিবর্ত্তে তোমাদের হৃদয়-বীণায় উচ্চারিত হোক: সবল প্রতিবাদের সুর। কণ্ঠ তোমাদের ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক প্রতিবাদের ব্যঞ্জনায়, তোমাদের প্রত্যহিক জীবনে প্রতি স্তরে প্রতিবাদের ছায়া স্পষ্ট হ'য়ে উঠুক—তোমাদের কর্ম্মে আর সংকল্প পালনে এই প্রতিবাদই বাস্তব রূপ ধরুক। জাতিকে জানতে দাও: এই সহস্র রকমের অসুবিধা অভাবের মধ্যে দেশের কিশোর কিশোরীরা মৃতের জীবন পায় নি। জাতিকে বাঁচাবার জন্য তারা রয়েছে, তাদের কাজে কর্ম্মে চরিত্রে সংকল্পে একটি কথাই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক 'আমরা মরি নি।'—তোমরা যে জাতির ও দেশের আগামীকালের নায়ক, মুক্তি যজ্ঞের হোতা তারই ইসারা রেখে যাও তোমাদের কাজে কর্ম্মে, ভাবে ভঙ্গিমায় প্রত্যহিক জীবন যাত্রায়। হে বীর কিশোর, ওঠো, জাগো,—নতুন বৎসরে তোমাদের যাত্রাপথের পাথেয় হোক নতুন বৎসরের নবতর আহ্বান।

তোমাদের কথা আর কাজ—

তোমাদের হাজার চিঠির ভেতর হাজার রকমের কথা আর কাজের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে মন আশ্বাস্ত হ'য়ে ওঠে। অন্তর বলে—এরাই পারবে কথা আর কাজের ভেতর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখ্‌তে। আজকে তোমাদের দুটি বোনের কাজের সঙ্গে তোমাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দি—

"* * * গ্রামে এসেই আমরা এ সমিতিটি গড়েছি। এখানে আমরা চরকা কাটি, চাঁছ্‌ তৈরী করে বিক্রি করি, একটা তাঁতের ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। তাছাড়া First Aid শিখে একটা Vill. A. R. P.র ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। জীবনে কোনদিন মাটিতে হাত দিই নি। এখানে এসে ফসল ফলিয়েছি। বৈকালে দূর থেকে জল এনে ক্ষেতে দিই সকলে—মা, বাবা, জ্যাঠাইমা, ভাইবোন চাকর

মিলে। সেকি আনন্দ! বাবা সেদিন বললেন, "তোদের মৌমাছি, তোদের দিদিভাই এমন হাতে কলমে কাজ করতে পারে কি?" আমরা বল্লাম, নিশ্চয়ই পারে না। পারো কি? শরীরে এসব দিব্যি সয়ে গেছে অথচ স্বাস্থ্য উঠেছে ভরে। আগে ছিলাম বেজায় বিলাসী—সব ছেড়ে দিয়েছি। ছোট ছোট ভাই বোনেদের নিষেধ করে দিয়েছি কেউ টিপ পর্য্যন্ত চাইতে পারবে না। ভালো কাপড় চোপড় তুলে রেখে ছেঁড়াগুলো সেলাই করে পরতে বলেছি—তাহলে গরীব যারা তাদের মনে দুঃখ হবেনা। ওরা খুসী মনে মেনে নিয়েছে। বিকালে একসঙ্গে করে ছোটদের ব্যায়াম শেখাই। নতুন ধরনের কাজের আস্বাদে প্রাণমন উঠেছে ভরে। এসবের প্রেরণা পাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকেই তো? তাছাড়া জাপানী বোমা আমাদের মানুষ হতে শেখালে। সত্যি নয় কি?—**শ্রীরেণু ও সাধনা বিশ্বাস** (গ্রাঃ ১৬৬২—চট্টগ্রাম)

দীর্ঘজীবী হোক—

* * * গত পয়লা মার্চ্চ বহরমপুর জেল থেকে বের হ'য়েছি। বাড়ী এসে আবার রংমশালের পাতা খুলে ধরেছি, আবার তোমার জন্যে কলম তুলে ধরেছি। কিন্তু কি লিখ্‌বো? জেলে বেশ আনন্দে ছিলাম আমরা। কোনখান দিয়ে যে ছটা মাস কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না। * * বেরিয়ে এসে দেখ্‌ছি পরিচিতের মধ্যে অনেকেই আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। * * চিঠির বাক্সে তুমি যে সুন্দর চিঠিগুলো লিখেছ সেগুলো পড়লাম। পড়ে কত যে আনন্দ পেয়েছি তা কি বল্‌ব! এগিয়ে চলার পথে রংমশাল যদি আমাদের পথই না দেখালে, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনই না করল তবে আর কর্‌ল কি? * * রংমশালের মধ্যে দিয়ে যা তুমি আমাদের দিয়েছ, দিচ্ছ এবং দেবে, তার জন্য তোমাকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের প্রিয় রংমশাল আজ কিশোর কিশোরীদের শক্তি দিক্, সাহস দিক। রংমশাল দীর্ঘজীবী হোক। এই দুর্দ্দিনে যেমন করেই হোক্ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রংমশালকে আমরা হারাতে পারব না!—**বরুণ রায়** (গ্রাঃ ১৬০৬—জঙ্গীপুর)

বন্ধু চাই—

আমি কি রকম বন্ধু চাই শোন: যে দেশকে ভালবাসে প্রাণের চেয়ে, দেশের প্রতিটি গরীব ভাই-বোনদের ঘৃণার চোখে দেখ্‌বে না, দূর দূর করবে না, তাকে আমি বন্ধু চাই। যে সুখের জন্য, বিলাসের জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ করবে, গরীব ভাই-বোনেদের দেখ্‌লে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করবে, গরীব ভাই-বোনেদের অনাহারে মৃতপ্রায় রেখে ছত্রিশ ব্যঞ্জন সহযোগে পরমান্ন খাবে, অস্পৃশ্যতা বজায় রেখে চল্‌বে, ছোট-বড়র ভেদাভেদ মানবে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য মান্‌বে তাকে চাইনা বন্ধুরূপে। এমন বন্ধু চাই যে বড় হ'য়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করবে।—**মায়ারাণী মিত্র** (গ্রাঃ ১৪৬৩—বর্দ্ধমান)

চিঠি লেখার নিয়ম—

বার বার তোমাদের অনুরোধ জানিয়েছি এবারেও জানাচ্ছি চিঠির লেখার নিয়ম মেনে চলো। নাম, ঠিকানা গ্রাঃ নম্বর প্রতি চিঠির সঙ্গে প্রত্যেক বার যেন তোমরা দিতে ভুলো না, আমার ভারী অসুবিধে হয়। ধাঁধার উত্তরও আলাদা কাগজে দিতে হয়।

তোমাদের চিঠি, আমার জবাব—

মায়ারাণী মিত্র (গ্রাঃ ১৪৬৩—বর্দ্ধমান) তোমার ডাক টিকিট পেয়েছি—তোমার আদর্শ বন্ধু চলেই তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, মধুদির কথা আমারও ভালো লেগেছে। তাঁর কথা, কাজে রিণত করো। পড়াশোনা ভালো করে করো—নিজের ভেতর শক্তি আর জ্ঞান না বাড়ালে যে কাজই রো না কেন তা সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে না। **মণিমালা ও শ্যাম (গ্রাঃ ৫৭৭—ভবানিপুর)** তোমাদের ঠি পেলুম, আগেকার কোন চিঠি পাই নি। মণিমালা, উপাধি বদ্‌লে ফেলেছ দেখে আশ্চর্য্য হই নি, ন্তু খাওয়াটা যে ফাঁকি দিলে সেজন্য খুব রাগ করছি। প্রার্থনা করি: তোমার জীবন সুন্দর ও সার্থক াক। রবীন্দ্র-স্মৃতি প্রতিযোগিতায় তুমি প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলে—তোমার প্রতিভা সম্বন্ধে যিনি সন্দেহ কাশ করেছেন—আমার হ'য়ে তাঁকে ভালবেসো—এই তাঁর যোগ্য শাস্তি—তুমি কি বলো? **অধীররঞ্জন াস (গ্রাঃ ১৩৪২—বরিশাল)** না, ও বইখানা এখনও বেরোয় নি। আমার গল্প শুন্‌বে? বেশ একদিন ানাব। গল্প-প্রতিযোগিতা আহ্বান করতে বলেছ, ভেবে দেখি, তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাই নি যে। **ীলিমা, উমা ও আভা চক্রবর্ত্তী (গ্রাঃ ?—আজমীর)** তোমাদের চিঠি পেয়ে খুসী হলুম, এর াগের চিঠি পাই নি তাই উত্তর দিই নি। না, না, আড়ি করতে হবে না, তোমাদের সাদরে আহ্বান ানালুম। নীলিমা, আমার নাম জান্‌তে চেয়েছ, আমার নাম একটি: দিদিভাই; এছাড়া আমার কোন রিচয় নেই। উমা, তোমরা রয়েছ রাজপুতনায় প্রতাপ-পদ্মিনীর দেশে। সে পুণ্য দেশের পুণ্য গরিমা তোমাদের শক্তি ও সাঁহস দিক। বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রেখো—চিঠিপত্র লিখো, দেখ্‌বে সব ক হ'য়ে যাবে। আভা—রাগ করো না, আড়িও নয়। তোমাদের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ আমার মনে রইল, যেদিন র্থভ্রমণে বেরুবো, আগে তোমাদের ওখানকার মাটি স্পর্শ করে ধন্য হবো, তখন দেখা হবে কেমন? বাংলা দেশ বাংলা ভাষাকে ভুলো না! **যতীন্দ্রমোহন দে (গ্রাঃ ১৮৫৩—শ্রীহট্ট)** তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা ানাচ্ছি ভাই। ভয়ে এতদিন কাজে এসো নি বুঝি? পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে তোমার পরিকল্পনা মনে রইল, ময় ভালো হ'লে কাজে লাগান যাবে। **গিরীন্দ্রনাথ রায় (গ্রাঃ ১৭৯০—শ্রীহট্ট)** তোমার প্রশ্নগুলো পেলুম, ডাক টিকিটও। ডাক টিকিট কি হবে? সব কথা জানিও রাগ করো না। **বরুণ রায় (১৬০৬—জঙ্গীপুর)** তোমার চিঠি পেলুম! তোমার কিশোর আশীর্ব্বাদ রংমশালে দীর্ঘজীবী হোক—এর সঙ্গে আমারও ন্তরের যোগ আছে জেনো। তার সঙ্গে আর একটা যোগ করে দিই, দীর্ঘজীবী হোক তোমাদের মতো ছেলে মেয়েরা। রবীন্দ্রনাথের গানটা জানো না বুঝি—তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা'বলে ভাবনা করা ্‌বে না। তোমার চার পাশে যারা আছে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রচার করো, তাদের জ্ঞান দাও আলো দাও, তাদের ভালোমন্দ বিচার করার শক্তিকে বাড়াও—তাহ'লে তোমার আমার সকলের াজ সহজ হ'য়ে আস্‌বে। নয় কি? **অপূর্ব্বলাল মজুমদার (গ্রাঃ ১৭৮৩ কৃষ্ণনগর)** তোমার ন্দর চিঠি পেলুম—তোমার লেখনী বন্ধুর তরেন্দ্রনাথ ঘোষ (নিউদিল্লী) তোমার চিঠির জবাব দেয় নি? ার ভারী অন্যায়, আচ্ছা তাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের সকল কাজে আমার অন্তরের যোগ ও াশীষ আছে। **সাধনচন্দ্র বসু (গ্রাঃ ১৩৪৯—কালীঘাট)** চিঠি পেলুম। টালিগঞ্জ আমার বাস য়, আমার আবাস তোমার সকলের মনের মাঝখানে। নাম ঠিকানা যার যার চেয়েছিলে আমি াঠাতে বলেছিলুম—অফিস তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়েছে—টিকিট পাঠিও—সব ঠিকানা দেবো। **নছিফা ও**

তৌফিকর রহমান (গ্রাঃ ১৩৪১—নওগাঁ) তোমাদের চিঠি পেলুম। জানতুম—আমাকে ছেড়ে তোম যেতে পারো না। যাব বল্লেই কি যাওয়া যায়? নছিফা, তোমার নাম ভুল লিখেছি! না, আর র করতে হবে না। তোমাদের বন্ধু তোমাদের বাড়ী গেলে উচিৎ তাকে আদর করে ডেকে তার সঙ্গে ক কওয়া নয় কি?

যাদের চিঠি পেয়েছি অথচ উত্তর দেয়া হলো না, তাদের নাম: **কাল মেঘ** (কলিকাতা) **রথীন্দ্রনা মজুমদার (খাগড়া), প্রবোধ বসু** (কাঁথি), **মিনতি চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা),** ভ্রম (পাটনা), **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** (কালীঘাট), **গনেশ মুখোপাধ্যায় (বাটাভোগ), অত মাহাত (ঝাড়গ্রাম), আশীষ দত্ত (শ্রীহট্ট)**—তোমরা সবাই আমার ভালোবাসা নিও। ইতি তোমাদের—

দিদিভাই

'রাজার ছেলে' ও 'জগাপিসি'র লেখক ও ভূতপূর্ব্ব 'ভাইবোন' সম্পাদক

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসুর একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস

অভিশপ্ত বংশ

রংমশালে আগামী আষাঢ়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া, আবিষ্কার ও অভিযানের গল্প
অভিনয়োপযোগী নাটক ও বিচিত্র কাহিনী
রংমশালে নিয়মিত প্রকাশিত হবে॥

চলন্তিকা

এই সংখ্যায় রংমশালের অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হ'ল। রংমশাল ছোটদের বড় কাগজ, াই তার দাবী ও দায়ীত্বও বেশী। নানা ঝড় ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে রংমশাল তার মশাল উঁচু রখে দুঃসাহসে এগিয়ে চলেছে। ১৩৪৯কে বিদায় দিয়ে আজ চলন্তিকার হাল্-খাতায় ৩৫০ কে আমরা আবাহন করলাম। জানি না, ১৩৫০ এর খাতায় কিসের রেখাপাত হবে। বু আমরা প্রার্থনা করছি যে আমাদের আদর্শের দিকে চেয়ে আমরা যেন এর ঝড় ঝাপ্টার ঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বোঝাপড়া করে চলতে পারি। ঝড় ঝাপ্টাটা যে আছে প্রচুর, সে বিষয় ন্দেহ নেই, আমাদের তৈরী হয়ে সচেতন থাকতে হবে, হয়ত ১৩৪৯ এর চেয়ে অনেক বেশীই বে এবং তার মধ্যেই আমাদের ভাগ্যের ইমারৎ কঠিন করে গড়ে তুলতে হবে। ১৩৪৯ ালে অনেক কিছুই তো ঘটল। অনেক কিছুই যা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সগুলি একদিক দিয়ে বিচার করলে, সবই একটা দারুণ জাতীয় দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই য়। ভারতের জাতীয় নেতাদের ও অন্যান্যদের কারাবরণ, চারিদিকে অশান্তির আগুন, রতাল, গুলিগোলা, জাপানী বোমারুদের বোমাবর্ষণ, প্রবল ঘূর্ণিবায়ু ও প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, হামারী, দুর্ভিক্ষ, অন্নবস্ত্রাভাব, লুটতরাজ প্রভৃতি অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনাপ্রবাহ ভারতকে স্তম্ভিত রেছে। ভারতের ইতিহাসে বা ইতিহাসে পূর্ব্বেও, এমন দল বেঁধে দুর্ভাগ্য কখনও আসেনি। ার এক দিক দিয়ে বিচার করলে, এর নিদারুণ ক্ষতি মেনে নিয়েই, এরা যে ভারতের চক্ষু াল করেই খুলে দিয়েছে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। আজ, ভারতবর্ষে যা আগে কখনও এতটা তে পারেনি সেই ভারতভূমি হিমাচল থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত সক্রিয় ও সজাগ হয়ে ঠেছে। আজ বিধাতার কাছ থেকে তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে নিতে সে ঙ্কল্প নিয়েছে।

* * * * * * *

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। পৃথিবীর যত দুর্য্যোগই হোক্ না কেন, আমরা ই দিনটি মনে রাখতে কখনও ভুলবো না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার মুখে ভাষা দিয়েছেন, বাংলার কে তাঁর বাণী জাগিয়েছেন। আজ আমাদের মস্ত দুর্ভাগ্য তিনি সশরীরে আজ আমাদের াঝে নেই। কিন্তু তাঁর লেখার অমৃতধারা, তাঁর গানের সুর আমাদের হৃদয়ে, আমাদের হাতে, আমাদের কণ্ঠে তিনি দিয়ে গিয়েছেন। আমরা যেন মানব দেবতার এই মহাদানের যথার্থ ল্য দিতে পারি আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনের এই বিরাট গ্নিপরীক্ষায়। রবীন্দ্রনাথ চিরজীবি, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অমর।

টিউনিসিয়া যুদ্ধে জার্ম্মাণদের পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত। রোমেলের সেনাবাহিনী এখ
পশ্চাৎপদবর্ত্তী এবং প্রকাশ, যে তাদের টিউনিসিয়া থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে। কি
মিত্রপক্ষ তাদের ঘিরে ফেলতে দৃঢ় সঙ্কল্পে ভীষণ নাকি যুদ্ধ চালিয়েছে। তার ফলে ষ্ট্যালিনগ্রা
জার্ম্মাণ সৈন্যের যে দুরবস্থা হয়েছিল, টিউনিসিয়াতেও তাই হবার বিশেষ সম্ভাবনা বলে
অনেকের বিশ্বাস। গুজব, রোমেল টিউনিসিয়া পরিত্যাগ করে জার্ম্মাণীর দিকে চলে গিয়েছে
এবং জার্ম্মাণী নাকি টিউনিসিয়াতে এক 'ডানকার্ক জাহাজবাহিনী' পাঠাবার ব্যবস্থা করছে যাতে
করে তাদের সৈন্যদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। আর কয়েকদিনের
টিউনিসিয়ের যুদ্ধের অবসান ঘটবে আশা করা যায়।

দক্ষিণ ভারতের একজন জনপ্রিয় নেতা শ্রী এস্ সত্যমূর্ত্তি গত ২৮শে মার্চ্চ মাদ্রাজে
মহাপ্রয়াণ করেছেন। ওমরাওতি জেলে তাঁর অসুখ হয় এবং পরে তাঁকে মাদ্রাজে চিকিৎসার
জন্য আনা হয়। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অসুখ ক্রমশ
বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিশেষে ভগবান তাঁকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিলেন। তাঁর মৃত্যুতে
কংগ্রেস একজন বীর কর্ম্মী হারাল। দেশ ও জাতি হারাল একজন স্বাধীনচেতা
দেশ প্রেমিককে।

আর একটি মৃত্যুর খবর ভারতকে দুঃখিত ও সন্তপ্ত করেছে। এবং সেই মৃত্যু কাহিনী
অত্যন্ত করুণ। আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী বেগম আজাদের
মৃত্যুর কথা বলছি। বেগম আজাদ ছিলেন সেই মহিয়সী ভারতীয় নারীর একজন, যাঁরা
নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে গৃহকর্ম্মে, ধর্ম্মে ও স্বামী সেবায় নিজেদের বিলিয়ে
দিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান
স্বামীই ছিলেন তাঁর অবলম্বন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি স্বামীকে দেখতে পান নি। ভারত
গবর্ণমেণ্ট তাঁর স্বামীকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দিতে পারেন নি। গবর্ণমেণ্টের এই নিদারুণ
বিধিনিষেধ চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকবে।

যার নামে সিন্ধুদেশ ভয়ে কাঁপতো, যাকে ধরবার জন্য বহু পুলিশ দারোগা হতাহত
হয়েছে, যার মাথার জন্য হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, সেই পীর পাগারোকে
বহু কলকৌশল করে ধরা হয়েছে এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়েছে। এই পীর পাগারোর
জীবনের বিচিত্র ইতিহাস যেদিন প্রকাশিত হবে, সেই ইতিহাসে যে আশ্চর্য্য লুঠতরাজ
রাহাজানি, যে রোমাঞ্চকর কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হবে তা যে কোন দেশের এ্যাডভেঞ্চার ইতিহাসকে
ম্লান করে দেবে। সম্প্রতি ৩২ হাত মাটির নীচে এক গুহায় পীর পাগারোর গুপ্তধনের সন্ধান
পাওয়া গিয়েছে। এই গুপ্ত গুহাতে নানা মণি মুক্তো, গয়নাগাঠি, টাকা মোহর, বাসনকোসন
পাওয়া গিয়েছে যার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পীর পাগারো যে ধনকুবের ছিল সে বিষ

ন্দেহ নেই। এই টাকার জোরে ও নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাহুবল ও কলাকৌশলে সে বহু বছর
লিশের চোখে ধুলো দিয়েছে। সে অসাধ্য সাধন করতো বলে আজও এমন অনেক
াক আছে যে পীর পাগারোকে দেবতা বলে মানে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে আবার নতুন করে 'সাদা-কালো চামড়ার' ভেদাভেদ তীব্র হয়ে দেখা
য়েছে। সেখানে ভারতীয়দের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আলাদা হয়ে থাকতে হুকুম জারী করবার
বস্থা হচ্ছে। ভারতীয়রা সেখানে নিজের ইচ্ছায় বা নিজের সুখ সুবিধামত বসবাস করতে
ারবে না। ইংরাজদের নির্ব্বাচিত জায়গায় তাদের থাকতে দেওয়া হবে না। যুদ্ধের এই
গ্নিপরীক্ষায় আজ যেখানে দেশে দেশে জীবন মরণ নিয়ে টানাটানি, যেখানে সকলে কি
রাজ কি ভারতীয় একত্র হয়ে শত্রুকে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে সেখানে নিজেদের সুখের জন্য
ই রকম চুলচেরা ভেদাভেদ, এর ফল যে বিষময়, এ কথা আজ দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের
জনেতারা কেন ভেবে দেখছেন না। স্বার্থান্বেষী অন্ধের মত তাঁরা এই অপকর্ম্ম
র্ব্বিচারে করছেন।

১লা এপ্রিল বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের ইস্তফা দেওয়াতে (এটা খুব একটা অপ্রত্যাশিত
আশ্চর্য্য ব্যাপার বলতে হবে) বাংলার লাটসাহেব স্যার জন হারবার্ট নিজ হস্তে
সন-তন্ত্রভার গ্রহণ করলেন বলে এক বিবৃতি দেওয়া হয়। কয়েকদিন বাংলাদেশে তাই
ান মন্ত্রিমণ্ডল ছিল না। বেশ ক'দিন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা গেল। মন্ত্রী-ছাড়া রাজা
জত্ব করতে পারেন না আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজ সাম্রাজ্যে সবই
ট দেখছি। যাহোক্ সম্প্রতি একটি মন্ত্রীমণ্ডল তৈরী হয়েছে এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলতেই
যিনি এতদিন গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত মন্ত্রীমণ্ডলের কার্য্যকলাপে বাধা দিতে অগ্রণী ছিলেন,
কেই এবার প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এই মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি জনসাধারণের
াস আছে কি না তা শীঘ্রই ভাল রকম টের পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলার আকাশে কয়েকদিন ধরে জাপ বোমারু বিমান বেশ হানা দিয়েছিল
বোমাবর্ষণ করেছিল। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেণি এবং সম্প্রতি মণিপুরের রাজধানী
ফলেও তারা বিমান আক্রমণ করেছিল। আসাম-বর্ম্মা সীমান্তে, আরাকানে ও অন্যান্য
ক্ষেত্রে হাতাহাতি যুদ্ধও কখনও কখনও চলেছে। গত ৩০শে মার্চ্চ দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলাদেশের
র বিমান যুদ্ধে 'আর এ এফ্' এবং জাপানী বিমানদের মধ্যে বেশ একটা বোঝাপড়া হয়ে
য়েছে। প্রায় ২২টা জাপানী বিমানের মধ্যে গোটা ১৩ জখম হয়েছে। জাপানীদের
বস্ত বেশীর ভাগই বিমান ঘাঁটিগুলি কিন্তু এখনও লক্ষ্যভেদ দূরে থাকুক, অনেক জায়গায়
ড়া খেয়ে তাদের ফিরতে হচ্ছে। ক্ষতি যে তারা করছে না তা নয়, কিন্তু সেই ক্ষতির
মাণ মিত্রপক্ষকে কাহিল করতে পারছে না।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' একজন বিখ্যাত আইরিশ লেখক ও ইংরাজ চরিত্রের একজন তীব্র সমালোচক। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, জার্ম্মাণ, জাপান ও ইতালীর সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে, রুশ-চীন এবং ইংরাজ-আমেরিকার চুক্তি নাকি আর থাকবে না। বরঞ্চ তাদের মতামতে কিছু গরমিল হতে পারে, এমন কি এই সম্পর্কে আর একটা বড় যুদ্ধ ঘটাও বিচিত্র নয়! পৃথিবী ব্যাপী এই একটা যুদ্ধের শেষ আজও আমরা দেখতে পারছি না, এর পরে যদি আবার আর একটা পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধ হয়—তা হলে শত্রুমিত্র কাউকে আর বাঁচতে হবে না। পৃথিবী থেকে মানুষ বিলুপ্ত হবে। তবে পৃথিবীতে পরাধীন জাতিগুলি যদি তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়, তবে যে কোন যুদ্ধই সার্থক।

রামকৃষ্ণ মহিলা চিকিৎসা-শিক্ষা বিভাগের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং কলিকাতার মহিলা কর্ম্মী নেত্রী ভগ্নী সরস্বতী গত ৭ই বৈশাখ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ভগ্নী সরস্বতী মহারাষ্ট্রীয় মহিলা হলেও বাংলাদেশকে তাঁর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র করেছিলেন। তাঁর আসল নাম বাঈ রমাবাই পালেকার। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, প্রায় এক লাখ টাকা, রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে গিয়েছেন। এর আগেও গত সাত বছর তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মিশনকে দিয়েছেন। তাঁর স্বামীর পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষ্যে স্বামীর নামে তিনি আলিপুরে একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল তৈরী করে দিয়েছেন। বম্বেতে বিধবাশ্রমের জন্য তার নিজের গৃহ দান করেছেন। রামকৃষ্ণ মহিলা চিকিৎসা বিভাগের তিনিই ছিলেন কর্ণধারিণী। জনসেবা ও শুশ্রূষায় তাঁর এই নিঃস্বার্থ দানে বিস্মিত হতে হয়। সার্জ্জেন জেনারেল গয়েল সাহেব তাঁকে "ভারতের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল" উপাধি ভূষিত করেন। ভগ্নী সরস্বতীর আয়্যারলণ্ডে অবস্থান কালে তাঁর আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি দেখে সেখানকার লোকেরা তাঁকে 'Electricity' এই অভূতপূর্ব্ব বিশেষণে অলঙ্কৃত করে। তাঁর মৃত্যুতে শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয়, শুধু বাংলা বা বোম্বাই নয়, সমস্ত ভারত একটি মহিয়সী দানশীলা অপার করুণাময়ী পরসেবী কর্ম্মী হারাল। তাঁর আত্মার প্রতি আমরা সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানাই।

গাঁ-এর ছবি

তরুণ রায়

কার যেন গান শুনি করুণ রাগে
তারু সাথে মৃদু মৃদু বাজ্‌ছে নূপুর
মোর চোখে নামে ধীরে তন্দ্রাঘুমের
স্তব্ধ দুপুর।

রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে শুকনো মাঠে
হাট করে ফেরে সব মাথায় ঝাঁকা
ধানক্ষেতে চাষী সব ব্যস্ত কাজে
পথটী বাঁকা।

চিলগুলো পাক খায় আকাশ পথে
ঝিরঝিরে হাওয়া বয় পাতার আড়ে
গ্রামের কুকুরগুলো ধুঁকছে সদা
কূয়ার পাড়ে।

ফুলগুলি পাশে ঘোরে ভোমরা মাতাল
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে করছে খেলা
নীল পাখী নিজমনে উড়ছে সুখে
বিকাল বেলা।

পুকুরঘাটেতে মেয়ে হয়েছে জড়
ছোট বড় ঘট সব কক্ষে করে
গল্পের সাথে সাথে পুকুরের জল
নিতেছে ভরে।

আকাশেতে ছেঁড়া মেঘ ভাসছে সুখে
হালকা হাসিতে ছোট গ্রামটী ভালো
কাণায় কাণায় ভরা নদীর সে জল
কাজল কালো।

গ্রামের সকল ঘরে শঙ্খ বাজে
চাষীরা যে যার ঘরে ফিরিয়া গেলো
ছোট্ট গ্রামের 'পরে ঘোমটা টানি
সন্ধ্যা এলো।

সূর্য্যের তেজ ক্রমে আস্‌ছে নিভে
পশ্চিমাকাশ তবু লাল্‌চে রাঙা
রাখাল গোধন লয়ে আসছে ফিরে
ক্লান্তি ভাঙ্গা।

চারিদিক নিঝুম নীরব
মিটিমিটি জ্বলে ক্ষীণ তেলের বাতি
ঝিঁঝিপোকা ডাকে শুধু একটানা সুর
গভীর রাতি।

কাঁচের জন্মকথা

শ্রীঅতুলচন্দ্র মাহাত

আমার রংমশালধারী বন্ধুদের মধ্যে কাঁচ দেখে নাই এমন বন্ধু নাই। কিন্তু কাঁচের জন্মকথা বোধহয় খু কম বন্ধুই জানে। এইজন্য আমি কাঁচের জন্ম ইতিহাস লিখিতেছি।

এক ব্যক্তি কোন কার্য্যোপলক্ষে কোন স্থানে যাইতেছিল। সেই স্থানে যাইতে হইলে একটি বড় ন অতিক্রম করিতে হইত। কাজেই সে যখন নদীর ঘাটে পৌছিল তখন দেখিতে পাইল যে মাঝি নৌকা অ পার্শ্বে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

লোকটী সকাল হইতে কিছু খায় নাই। সে ভাবিয়াছিল নদী পার হইয়া রান্না করিয়া খাইবে। নতু এপাশে রান্না করার জন্য নৌকা পাইবে না। এই ভাবিয়া সে সেপাশে রান্না করে নাই। কিন্তু এখন বা হইয়া নদী পাড়ে রান্না বসাইতে হইল।

রান্না হইবার পরে দেখা গেল, যে উনানের ছাই, কয়লা এবং নদীর পাড়ের বালী এক সঙ্গে জমিয়া গিয়াছে এই জমা দ্রব্যটি ঐ কাঁচ। তবে ইহা বর্ত্তমান কাঁচের মত পরিষ্কার ছিল না।

কোন্ কোন্ দ্রব্য মিলিত হইয়া এবং কি করিয়া উনানের নিচে কাঁচ হইল? চূণ, বালি এবং কয় একসঙ্গে উত্তমরূপে গরম হইলে তাহা গলিয়া যায় এবং পরে জমিয়া কাঁচ হয়। অতএব নদীর পাড়ের বা কাট পোড়ার কয়লা এবং ছাই (ছাই চূণ জাতীয়) একসঙ্গে উত্তমরূপে গরম হইবার ফলে গলিয়া গিয়াছিল এ পরে জমিয়া কাঁচ হইয়াছিল।

কাঁচ তৈয়ারী ব্যাপারে বালিই হইল প্রধান অঙ্গ। বালি না হইলে কাঁচই হয় না। বালির ম 'সিলিকা' বলিয়া একটি পদার্থ থাকে সেই হইল কাঁচের জন্মদাতা। বালিতে লোহাও থাকে, লোহা যত ক পরিমাণে থাকে ততই ভাল। কিন্তু শুধু বালিতে কি কাঁচ তৈয়ারী হয়? ইহাতে মেশাইতে হয় আরো কয়েক দ্রব্য—যেমন সোডা, পট্যাস্ ও চূণ ইত্যাদি। তারপর এই মিশ্র জিনিষকে ভীষণ আগুনে গলাইতে হ তারপর যে দ্রব্য তৈয়ারী হয় তাহাকেই আমরা বলি সাধারণ কাঁচ। ইহার কোন রঙ নাই। রঙ দিতে হই কাঁচে মেশাইতে হয় লোহা (সবুজ বা লাল রঙের জন্য), তামা (নীল ও লাল রঙের জন্য), কোবল্ট (নী রঙএর জন্য), নিকেল (বাদামী রঙএর জন্য) ইত্যাদি। অবশ্য এই রকম রঙীন কাঁচ তৈয়ারী করিতে গে তাপের তারতম্য ও অন্যান্য অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

এই হইল মোটামুটি কাঁচের জন্মকথা। কাঁচ মানুষের যে কত উপকারী জিনিষ, তা বলা বাহুল্য।

আমাদের লাইব্রেরী

"ক্যামেরার ছবি"—লেখক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী এম-এ। প্রাপ্তিস্থান ফটোগ্রাফিক স্টোর্স এণ্ড এজেন্সি লিমিটেড, ১৫৪ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

'আষাঢ়ে দেশে'র লেখক পরিমলবাবু যে ক্যামেরার ওস্তাদ, তা হয় তো তোমরা অনেকেই জান না। তাঁর তোলা অনেক উচ্চশ্রেণীর ছবি নানা কাগজে ছাপা হয়ে থাকে। তিনি কুড়িবাইশ বছর ধ'রে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তৈরীর সাধনা করে আসছেন। কাজেই তাঁরই লেখা এই বইখানা পড়ে আমরা যে কি আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব। প্রথম শিক্ষার্থী এই বই পড়ে অনেক জ্ঞান লাভ করবে—অনেক আনন্দও পাবে। আধুনিক ফটোগ্রাফি বিষয়ে বাংলাভাষায় এই প্রথম বই। খুব সরলভাষায় গল্পের মতো করে লেখা। বইতে পরিমলবাবুর তোলা ২১ খানি ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি ১৬ খানা আর্ট প্লেটে ছাপা হয়েছে। এ ছবির অনেকগুলোই বিভিন্ন এক্সিবিশনে আমরা দেখেছি। যাদের ফটোগ্রাফ তোলা অভ্যাস আছে বা যাদের ক্যামেরার শখ আছে—এ বই তাদের সবারই পড়া উচিত। উপহার দেওয়ার পক্ষেও চমৎকার। মলাট আর্ট পেপারে দুরঙা কালিতে ছাপা।

"সন্তায় কিস্তি"—তরুণ রায় সম্পাদিত। 'অজানা' ১০।১ এল্‌গিন্ রোড্ হইতে শ্রীমতী কল্যাণী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

এই বইটির ভূমিকায় তরুণ সম্পাদক মহাশয় বলেছেন, যে কাঁচা লেখকদের কাঁচা হাতের লেখা নিয়েই এর ...ই। উৎসাহপূর্ণ মতামত পেলে তাঁরা পরের বইটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করবেন। আমরা সানন্দে তাঁদের সেই উৎসাহ দিচ্ছি। কয়েকটি লেখা কাঁচা হলেও, বেশীর ভাগ লেখাই বেশ সুন্দর হয়েছে। ...োড়া দেখছি প্রেরণা ও চেষ্টা আছে। কেবল একটি কথা বলছি: সব লেখাই যে ছাপাতে হবে এমন কোন প্রতিজ্ঞা না করাই ভালো। বরঞ্চ ভালো লেখা লিখবো, এই প্রতিজ্ঞা নেওয়া উচিৎ। এই সম্পর্কে এই বইটিতে ...লিলকুমার মিত্রের কবিতা—'সাহায্য'র সাহায্য ভাববার কথা: 'সাধনা করিয়া চল্।' অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ...র হতাশ করা "লিখো না"—এই তিক্ত ওষুধ বলা বাহুল্য সব রোগীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

বইটিতে অনেকগুলি ছোট গল্প, রূপকথা ও কবিতা আছে। ছাপা বাঁধাই বেশ ভালো। বইটি ...মরা কিশোর তরুণ পাঠকপাঠিকাদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে যারা লিখতে চাও ...াদের বলছি। "সন্তায় কিস্তি"র সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে এ সম্পর্কে পত্র বিনিময় করতে পারো।

নূতন ধাঁধা

দশটি ধাঁধা। প্রত্যেকটিতে দশ নম্বর, ফুল-মার্ক ১০০। দেখি তোমরা কে কত নম্বর পাও। ফেল্ হলে (৩০এর কম পেলে) কিন্তু নাম উঠবে না।—

(১) দুই'শ' থেকে দুই বাদ দিলে কত বাকি থাকে? (২) পৃথিবীর কোথায় বাড়ী তৈরী করলে তার চতুর্দ্দিকের জানালাই দক্ষিণ মুখো হবে? (৩) কোথায় রবি অস্ত যায় না? (৪) একসের হাওয়া, না একসের মেওয়া ভারী? (৫) সিং গজালো কোন্ দেশের? (৬) চায় কোন্ দেশ না? (৭) জল থেকে বাষ্প হয়, না বাষ্প থেকে জল হয়? (৮) দুই শূন্য যোগে চার হয়? (৯) তাল পড়ে আগে, না আম পড়ে আগে? (১০) কে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত—পায়রা, এক রকম মাছি, সূর্য্যের আলো, বাজপাখি, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ঝড়, তীর, শব্দ, সাবমেরিণ?

* গত মাসের ধাঁধার উত্তর *

ড্রাইভারের মাহিনা মাসিক ২০০০৲ টাকা হতে পারে না। সুতরাং আয়ার ড্রাইভার হতে পারে না। আলি ফ্যায়ারম্যানকে মেরেছিল। কাজেই আলি ফ্যায়ারম্যান নয়। এই রকম ভাবে যুক্তি দিয়ে দেখতে পাবে, আলি ছাড়া কেউ ড্রাইভার নয়। তাহ'লে ধাঁধার উত্তর হল—আলি॥

কথাসাহিত্য সম্রাট

পৃথিবীর মেঘলোক
নিখিল-ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)
দুই টাকা

দক্ষিণারঞ্জনের

পৃথিবীর সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)
দেড় টাকা

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

—উষারাগের মত উজ্জ্বল নূতন রাজসংস্করণ ১৸০—

রঙমশাল

অষ্টম বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

জীবন

[একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[কল্‌কাতার উত্তর অঞ্চলের একটি অংশ। মোড়ের মাথায় একটি টিউবওয়েলকে কেন্দ্র করে একটি ছোটখাটো জনতার সৃষ্টি হয়েছে। আশে-পাশের বাসা থেকে এখনো লোক এসে জমা হচ্ছে। সকলের হাতেই ছোট-বড় বালতি, ঘড়া-ঘটি, কুঁজো। যে যেমন পেরেছে হাতে নিয়ে বেরিয়েছে। জনতার কোলাহল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এমন সময় ধোপ-দোরস্ত জামাকাপড় পরে একটি চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালো এবং অসহিষ্ণুভাবে পাইচারী করতে লাগ্‌লো, আরো খানিকক্ষণ বাদে গেঞ্জি গায়ে তারি সমবয়সী একটি ছেলেকে বাল্‌তি হাতে আস্‌তে দেখে পূর্ব্বোক্ত ছেলে সুশীল—বিনুর কাছে এগিয়ে গেল। সুশীলের মুখেচোখে একটা বিরক্তির ভাব।]

সুশীল

তুই ত আচ্ছা লোক বিনু! সেই আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের প্ল্যান কি তুই সব ভুলে গেলি?

বিনু

কিছুই ভুলিনি ভাই! কিন্তু হঠাৎ কলের জল বন্ধ হয়ে গেল। বাবা এখনো অফিস্ থেকে ফেরেন নি, দাদা দুদিন হল কল্‌কাতার বাইরে চলে গেছে···আমি যদি জল তুলে দিয়ে না যাই, তবে আজ্‌কে আমাদের বাড়ী রান্নাই হবে না!

সুশীল

[রাগে রাগে] আর কতক্ষণ জল তুল্‌তে হবে শুনি? এদিকে সাড়ে পাঁচটা বুঝি বেজে গেল! নরেনই বা কোথায়?

বিনু

নরেন! ওর বাসায়ও বুঝি এই অবস্থা! জল না তুলে দিয়ে গেলে সংসারের কাজ কর্ম একেবারে অচল হয়ে যাবে যে!

সুশীল

ওইত তোদের দোষ! নিজে থেকে তোদের বল্লাম—মিঠাই খাওয়াবো···সিনেমা দেখাবো। একটু চেষ্টা করে যে তোরা সময় করে নিবি সেটি হবার যো নেই! একটা-না-একটা গোলমাল তোদের বাসায় লেগেই আছে!

বিনু

তুই নিজে ইচ্ছে করে আমাদের খাওয়াতে চেয়েছিস্···সিনেমা দেখাতে টিকিট কিনে রেখেছিস···এত সত্যি কথা! কিন্তু কি করবো ভাই! জল যে এমন করে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এ কথাই বা কে জান্‌ত বল? জলের আর এক নাম যে জীবন সে কথা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সুশীল

নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌ছি? কেন তোদের চাকর বেটা কি কর্চ্ছে? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বুঝি?

বিনু

পাগল! আমরা চাকর কোথায় পাবো? তোদের মতো ত' আমরা বড়লোক নই যে সাতটা চাকর সব সময় হুকুম তামিল করতে হাজির থাক্‌বে। আমাদের সব কাজ বাড়ীর মেয়েরাই করে। বাইরের বাজারটা-আশটা আমাদেরই সেরে নিতে হয়।

সুশীল

তা যা বলিস্ ভাই! এ রকম ভাবে engagement না রাখ্‌তে পারলে জীবনে আর কখনো উন্নতি করতে পারবি ভাবিস?

বিনু

কিন্তু আমি ক্লাশে লেট্ হয়েছি কখনো দেখেছিস?

সুশীল

সেই জন্যেই ত তোকে এতটা ভালো লাগে আমার। হাজার হোক···তুই ত আমাদের ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়!

বিনু

ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে! তুই আর একটু দাঁড়া! আমি দু বাল্‌তি জল তুলে দিয়েই আস্‌ছি।

সুশীল

আরো দু বাল্‌তি! তবেই হয়েছে। সিনেমা হাউস্‌কে কি তোর মামাবাড়ী পেয়েছিস্ যে, যখন গিয়ে হাজির হবি তখনই শো সুরু হবে? আর তা' ছাড়া তার আগে খাওয়াটা রয়েছে না? তোদের নিয়ে খাবো বলে আমি বাসায় চা না ছুঁয়েই চলে এলাম।

বিনু

এক কাজ করবো? ছুটে গিয়ে আমাদের বাসা থেকে এক কাপ চা নিয়ে আস্‌বো?

সুশীল

না—না—ঐ করে আরো দেরী হয়ে যাক্ আর কি! আর তা ছাড়া তোদের বাসা যা নোংরা!

বিনু

আচ্ছা থাক্ ভাই! আমি বরঞ্চ জলটাই আগে তুলে ফেলি! তুই একটু কষ্ট করে না হয় দাঁড়া···

সুশীল

[বিরক্তভাবে] যা করবি চট্‌পট্ সেরে নে! আমার আর একটুও কিছু ভালো লাগ্‌ছে না! যত রাজ্যের নোংরা লোক সব জড় হয়েছে জল তুল্‌তে···কাপড় জামা একেবারে মাটি করে দেবে দেখ্‌ছি।

বিনু

[মৃদুহাস্যে] তা যা বলেছিস্ ভাই! তোর এ পাড়ায় আসাই ভুল হয়েছে।

সুশীল

হাসি নয়! সত্যি কথা! আমার গা একেবারে ঘিন্ ঘিন্ কচ্ছে। নরেনের বাসাটা এখান থেকে কদ্দুর?

বিনু

এই সাম্‌নের দুটো গলি পেরিয়ে! যা—না—ওদের বাসায় গিয়েই একটু বোস্ না! আমি এই এলুম বলে!

সুশীল

পাগলের মতো অত হাঁটাহাঁটি করতে পারিনে! [হঠাৎ চীৎকার করে উঠে] আরে! আরে! এমনভাবে জল ফেল্লে মেয়েটা, যে জুতোর পালিশটা একেবারে নষ্ট করে দিলে!

বিনু

একটু দেখেশুনে জল ফেল্‌তে হয় মিলি! এই দিক দিয়ে যা—

মিলি

কি করবো বিনুদা! কলসীটা এমন ভারী! কিন্তু জলত' না নিলেও নয়!

সুশীল

ওই মেয়েটাকে তুই চিনিস্ নাকি বিনু ?

বিনু

হ্যাঁ ভাই। আমাদের পাশের বাড়ীর মিলি। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে! এটুকু বয়েস! একা হাতে সংসারের সব কাজ করে!

সুশীল

আমি মনে করেছিলাম কোন বস্তির মেয়ে হবে বুঝি। ভদ্রলোকের মেয়ে বুঝি আবার রাস্তায় নেমে জল আন্‌তে যায় ?

বিনু

[খোঁচা দিয়ে] ও! টাকা দিয়েই বুঝি ভদ্র আর অভদ্র বিচার করা চলে। তোর কি ধারণা, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা থাক্‌লেই লোকে সব চাইতে বেশী ভদ্র হয় ?

সুশীল

ও! তুই আমায় খোঁচা দিয়ে কথা বল্‌ছিস! ঘাট হয়েছিল আমার তোদের সিনেমা দেখ্‌তে বলেছিলাম! থাক্‌তে চাইনে আমি তোদের এই নোংরা বস্তিতে। চল্লাম আমি—

[রাগ করে সুশীল যেই চলে যাবে অমনি পা হড়্‌কে পড়ে গেল ফুটপাতের পাশে···সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে একটা হাঁ—হাঁ—শব্দ উঠ্‌ল]

মিলি

কি হল বিনুদা—কি হল ? একি তোমার বন্ধু যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে!

বিনু

একটু জল আন্‌না মিলি ; ওর নাক দিয়ে যে রক্ত পড়ছে!

মিলি

জল! মাত্র এক ঘড়া জল আমি নিয়ে গেছি। এই এক বাল্‌তি জল অনেক করে ধরেছি। তা নাও! মানুষের জীবনের চাইতে ত আর কিছু বড় নয়। না হয় আমাদের রান্না আজ না-ই হবে—

বিনু

তুই আমায় বাঁচালি মিলি! ওই এক বাল্‌তি দিয়ে যা—আর আমি যে দু'বালতি বাসায় রেখে এসেছি তা-ও নিয়ে আয় বোন।

মিলি

আমি যাচ্ছি বিনুদা—

বিনু

এই যে নরেন এসে পড়েছিস্ ; সুশীলের মাথাটা একটু উঁচু করে তুলে ধর ত!

নরেন

তাই ত! নাক দিয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে! দাঁড়া আমি রুমাল দিয়ে মুছে নি!

বিনু

না-না—রুমালের কাজ নয়। তুই মাথাটা উঁচু করে ধর না···আমি জল ঢেলে দিচ্ছি—

নরেন

তাই দে ভাই! রক্ত যে কিছুতেই থাম্‌ছে না।

মিলি

থাম্‌ছে না! এই যে বিনুদা, আমি আর এক বাল্‌তি জল নিয়ে এসেছি। নাও—

বিনু

আর এক বাল্‌তি নিয়ে আয় মিনু! তোর একটু কষ্ট হচ্ছে—তা কি করবো বল!

মিলি

হলই বা একটু কষ্ট। আমি বুঝি নিজে নিজে নিজে রান্না করিনে ? খাট্‌তে আমি খুব ভালোবাসি—

বিনু

তবে যা বোন···নিয়ে আয়—

নরেন

আমি আস্‌বো ?

বিনু

না-না, তাহলে মাথাটা উঁচু করে ধরবে কে ?

মিলি

কাউকে যেতে হবে না। আমি দুহাতে দুটো তুলে নিয়ে চলে আস্‌বো। ভারী ত কষ্ট! হুঁ! [প্রস্থান

বিনু

কিন্তু ওর জ্ঞান হচ্ছে না কেন নরেন! তুই বরঞ্চ পাড়ার হারু ডাক্তারকে একটু খবর দে—

নরেন

হ্যাঁ ভাই বিনু, আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। ডাক্তার ডাকাই ভালো। আমি তাই যাচ্ছি— [প্রস্থান

মিলি

এই যে বিনুদা, যত খুসী জল ঢালো। একদিন সবাই মিলে চড়ুইভাতি করেছিলাম··· আজ না হয় সবাই মিলে না খেয়ে থাক্‌বো। ভারী মজা হবে।

বিনু

দে জল দে—

মিলি

তাকিয়েছে বিনুদা—তাকিয়েছে—আরো জল ঢালো—

সুশীল

[ক্ষীণকণ্ঠে] আমি···আমি কোথায় ?

বিনু

তুমি এখন ভালো আছো সুশীল। কিচ্ছু ভয় নেই। কিন্তু মিলিই তোমায় বাঁচিয়েছে। জলের আর এক নাম 'জীবন'। পণ্ডিতমশাই মানে বলে দেয়নি ?

মিলি

'বিনুদার যেমন কথা! এই সময় বুঝি মানের কথা মনে আসে ? যাই বাসার সবাইকে বলি গে—

—যবনিকা—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বারো অধ্যায়

"বজ্র" বেয়াজিদ ও খঞ্জ তৈমুর

তৈমুরের বিরুদ্ধে তখন একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে নানাদেশী শত্রু। তুর্কী, মামেলুক, সার্‌কাস্যান, জর্জ্জিয়ান, টার্কোম্যান ও আরব। এরা সবাই যোদ্ধার জাত এবং এদের মধ্যে তখন সব-চেয়ে প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল তুর্কীগণ।

কিন্তু ভয় পাবার ছেলে নন তৈমুর। তিনি স্থির করলেন, প্রথমেই যাত্রা করবেন বোগদাদের দিকে।

তুরস্কের প্রথম সুলতান উপাধিধারী বেয়াজিদের নাম তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে দিকে। জার্ম্মানদের রাজা ও রোমের সম্রাট সিগিস্‌মাণ্ড এবং য়ুয়োপীয় ক্রীশ্চানদের সম্মুখ-যুদ্ধে বিষমভাবে হারিয়ে দিয়ে তিনি তখন তৈমুরের চেয়ে অল্প খ্যাতি অর্জ্জন করেন নি। এই বেয়াজিদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তৈমুরের দুই প্রধান শত্রু—টার্কোম্যানদের কারা য়ুসুফ ও বোগদাদের সুলতান আমেদ।

প্রথমটা তৈমুরের ইচ্ছা ছিল না যে, বেয়াজিদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন। তিনি খুব ভদ্রভাবে লিখে জানালেন যে, সুলতান বেয়াজিদ যদি য়ুরোপ নিয়ে খুসি হন, তাঁর তাতে আপত্তি নেই। তাঁর সঙ্গে তৈমুরের ঝগড়া করবারও ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাঁর শত্রু য়ুসুফ ও সুলতান আমেদকে যদি ত্যাগ করেন তাহ'লে বড় ভালো হয়।

বেয়াজিদের ডাক নাম ছিল 'বজ্র'। এবং বজ্রেরই মতন কঠিন ভাবে তিনি জবাব দিলেন "ওরে রক্তাক্ত কুক্কুর, ওরে তৈমুর! তুর্কীরা বন্ধুদের তাড়িয়ে দিতে বা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ভয় পেতে অভ্যস্ত নয়। এ কথা তুই ভালো ক'রেই জেনে রাখিস্!"

তৈমুরও চুপ ক'রে থাকবার পাত্র নন। তিনি লিখলেন, "মাতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আগে পতঙ্গের উচিত, নিজের কথা ভেবে দেখা। আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, তাহ'লে পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।"

বেয়াজিদ জবাবে লিখলেন: "ওরে খোঁড়া তৈমুর! আমার অনেক দিনের সাধ তোর সঙ্গে লড়াই করব। ভগবান আজ সেই সুযোগ দিয়েছেন। এর পরেও তুই যদি আমার দিকে না এগিয়ে আসিস্, তবে আমিই এগিয়ে যাব তোর দিকে! তোকে হারিয়ে ভূত করব, তারপর তোর বউকে কেড়ে নেব!"

তৈমুর রাগে জ্ব'লে উঠে প্রতিজ্ঞা করলেন, বেয়াজিদকে তিনি ভালো ক'রেই শিক্ষা দেবেন।

দূতের মধ্যস্থতায় দুজনের মধ্যে এমনি পত্র ব্যবহার চলছে, ইতিমধ্যে দুটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বড় বড় ঘটনা ঘ'টে গেল।

প্রথমটি হচ্ছে, তৈমুরের দ্বারা তুর্কীরা ছাড়া অন্যান্য শত্রু দমন ও সিরিয়া অধিকার।

এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বেয়াজিদের ক্রীশ্চানদের প্রধান রাজধানী কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্ অবরোধ।

কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লের পতন হ'লেই পৃথিবী বিখ্যাত রোম-সাম্রাজ্যের শেষ-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে হয়ে যাবে। মুসলমানদের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ ও কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌কে রক্ষা করবার জন্যে য়ুরোপের চারিদিক থেকে ক্রীশ্চানরা ছুটে এসেছেন। কিন্তু মহাবীর্য্যবান বেয়াজিদ এমন ভাবে সহর ঘিরে রইলেন যে, ক্রীশ্চানদের কোন জারিজুরিই আর খাটল না। ধর্ম্মযুদ্ধের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অধিকাংশ ক্রীশ্চান বীরই কনস্তান্তিনোপল ছেড়ে স'রে পড়লেন। সহরের ভিতরে দারুণ খাদ্যাভাব। উপবাসী বাসিন্দারা সহরের পাঁচিল টপ্‌কে বাইরে গিয়ে শত্রু তুর্কীদের কাছেই ভিক্ষা মাগ্‌তে সুরু করলে। কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল আত্মসমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত—

এমন সময়ে খবর এল, সিরিয়া জয় ক'রে খোঁড়া তৈমুর আসছেন 'বজ্র' বেয়াজিদের সঙ্গে দেখা করতে।

'বজ্র'র পিলে গেল চম্‌কে! তৈমুরের এতটা ভরসা হবে তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। আমি য়ুরোপবিজেতা বজ্র, একটা খোঁড়া তাতারের এত স্পর্দ্ধা!

তারপরেই বোধ হয় 'বজ্র'র মনে প'ড়ে গেল,—'আমি য়ুরোপবিজয়ী বটে, কিন্তু এই খোঁড়া তাতার ঘৃণ্য হ'লেও নগণ্য নয়, সেও এসিয়াবিজয়ী!'

তখনি 'বজ্র'র হুকুম হ'ল—কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লের চারিধার থেকে তাঁবু তোলো! সওয়াররা ঘোড়ায় চড়, পদাতিকরা ছুটে চল! য়ুরোপের যেখানে যত তুর্কী বীর আছে সবাইকে ডাক দাও! শিয়রে তাতার শত্রু—এখন কন্‌স্তান্তিনোপলের কথা তুলে যাও!

কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল ছেড়ে, য়ুরোপ ছেড়ে তুর্কীরা ছুটল আবার এসিয়া মাইনরের দিকে। এর ফলে কন্‌স্তান্তিনোপলের ক্রীশানরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল আরো পঞ্চাশ বৎসর!

* * * * *

এর মধ্যেই বেয়াজিদের কবল থেকে আর আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখে কন্‌স্তান্তি-নোপ্‌লের ক্রীশ্চান সম্রাট ম্যানুয়েল করুণ ভাষায় তৈমুরের কাছে এক আবেদন জানালেন, "হে তৈমুর, তুমি আমাকে রক্ষা কর!"

সম্রাট ম্যানুয়েল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন—ইতিহাসে তা "শেষ ক্রুসেড" নামে বিখ্যাত। অথচ তিনিই মুসলমান বেয়াজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ করছেন মুসলমান তৈমুরকে!

প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর ব'লে মনে হয়। কিন্তু এর দুটি কারণ থাকতে পারে। ম্যানুয়েল জানতেন; হয়তো তৈমুরের চেয়ে বড় শত্রু বেয়াজিদের আর কেউ নেই। অথবা হয়তো তৈমুরের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা ততটা প্রবল ছিল না।

কিন্তু ম্যানুয়েল সাহায্য ভিক্ষা না করলেও তৈমুর তুর্কীদের আক্রমণ করতে আসবেনই। কারণ তৈমুর জানতেন, লোকে বেয়াজিদকে তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করে। এটা তাঁর ওক্ষে অসহনীয়। তাঁর সব-চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, পৃথিবীতে একমাত্র সূর্য্য ব'লে গণ্য হবেন তিনিই স্বয়ং। কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে রাগে তিনি পাগল হয়ে উঠতেন। প্রমাণ, যে-সব দেশ সহজে তাঁর বশীভূত হয়েছে, তাদের উপরে তিনি কোন অত্যাচারই করেন নি। কিন্তু যে-সব দেশের লোক তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছে, তাদের নগর-গ্রামকে তিনি পরিণত করেছেন সমতল ক্ষেত্রে এবং তাদের মুণ্ডগুলো কেটে নিয়ে তৈরি করেছেন ভয়াবহ পিরামিড। তার উপর বেয়াজিদ তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করেছেন এবং ইতর ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন।

সম্রাট ম্যানুয়েল কেবল তৈমুরকে নয়, বেয়াজিদকেও জানালেন, তিনি যদি তৈমুরকে পরাস্ত করতে পারেন, তাহ'লে বিনাযুদ্ধেই কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌কে তাঁর হাতে সমর্পণ করা হবে।

পঞ্চাদশ শতাব্দী এখন সবে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে—অর্থাৎ ১৪০২ খৃষ্টাব্দ।

য়ুরোপবিজয়ী বেয়াজিদ চারিদিক থেকে নিজের যুদ্ধপ্রবীণ সৈন্যদল সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁর ফৌযের মধ্যে কেবল তুর্কীরাই ছিল না। য়ুরোপের পরাজিত সামন্ত-রাজারাও তাঁর আহ্বানে বা আদেশে সৈন্য প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। সার্ভিয়ার রাজা পাঠালেন বিশ হাজার অশ্বারোহী—তাদের সর্ব্বাঙ্গ কঠিন লৌহবর্ম্মে আবৃত, দেখা যায় কেবল তাদের চোখগুলো। এল হাজার হাজার গ্রীক, হাজার হাজার রুমানিয়ান এবং আরও নানা দেশের অসংখ্য ক্রীশ্চান। বেয়াজিদের সৈন্য সংখ্যার সঠিক হিসাব নেই। কেউ বলেন এক লক্ষ বিশ হাজার, কেউ বলেন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

এসিয়া মাইনরের আঙ্গোরা (তুরুস্কের বর্ত্তমান রাজধানী) সহরে গিয়ে বেয়াজিদ ছাউনি ফেললেন। সিভা থেকে এদিকে আসবার জন্যে আছে একমাত্র পথ। অতএব বেয়াজিদ আন্দাজ করলেন, এই পথেই তৈমুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

তুর্কীদের প্রধান শক্তি, পদাতিক সৈন্য। আঙ্গোরার উপকণ্ঠে ব'সে কিছুদিন বিশ্রাম করবার অবসর পেলে তারা হবে আরো তেজীয়ান, আরো বলবান। কিন্তু তৈমুরকে সসৈন্যে আসতে হবে বহু যোজনব্যাপী দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে। সুতরাং তাঁর সেই পথশ্রান্ত সৈন্যদের আক্রমণ ও পরাস্ত করবার জন্যে বেশী বেগ পেতে হবে না। সুলতান বেয়াজিদ নিজের জয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে হুকুম দিলেন, "সৈন্যগণ, তোমরা খাও-দাও, ফূর্ত্তি কর!"

য়ুরোপবিজয়ীর সঙ্গে এসিয়াবিজয়ীর শক্তি-পরীক্ষা! সমস্ত পৃথিবী ফলাফল দেখবার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রমশঃ

কাজের লোক জগাপিসি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু'

গল্প

ব্যস্তবাগীশ যোগেশবাবুর আর একটা নাম ছিল জগাপিসি এবং সেই নামেই তিনি বিখ্যাত।

রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বাল্‌বের ওপরে ঝুল পড়ে, কাজেই আলো পাওয়া যায় অত্যন্ত কম এবং সেই কারণেই তরকারীতে হলুদ্‌বাটা দিতে গিয়ে লঙ্কাবাটা পড়ে, নুন দিতে গিয়ে চিনি প'ড়ে যায়—গৃহিনী হরিপ্রিয়া এই কথা জানালেন।

রাত্রেই গিয়ে তিনি একশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের একটা বাল্‌ব কিনে আন্‌লেন, দাম নিলে পাঁচ টাকা। সকলকে শুনিয়ে ব'লে দিলেন, এই বাল্‌বটি অন্ততঃ পাঁচ বছর চালানো চাই তার আগে খারাপ হ'লে তিনি কিছু জানেন না।

ব'লে দিলেন—পাঁচ পাঁচটি টাকা কম টাকা নয়। পাঁচ টাকা ঘুষ দিলে পৃথিবীতে অসাধ্য-সাধন হয়। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিলে ধারে হাতি কেনা যায়, ইত্যাদি।

একটি নড়বড়ে টুলে উঠে তিনি পুরোণো বাল্‌বটি সন্তর্পনে খুল্‌ছেন, বড় ছেলে ন্যাড়াকে বলছেন নতুন বাল্‌বটি সাবধানে হাতে ধ'রে রাখ্‌তে—বেশী চেপে নয়, বেশী আলগা ক'রেও নয়—ঠিক্ যেমন ভাবে বাল্‌ব ধরা উচিত—উপদেশ দিচ্ছেন, আর পিজবোর্ডের ব্ল্যাক আউট শেড্ সরিয়ে জ্বলন্ত বাল্‌বটিকে হস্তগত করবার কায়দাটা অধিগত করবার চেষ্টা করছেন, এক হাত দূরে উনুনে ভাতের হাঁড়ি টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে, গলিত ফ্যানের দিকে ললিত দৃষ্টিও নিক্ষেপ করছেন—ইতিমধ্যে কি হ'ল জানি না, বোধ হয় বাল্‌বটার ঈষৎ গরম ভাবে হাতটা ছ্যাঁক্ ক'রে উঠেছে, তিনি 'আউ' ক'রে উঠে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে কাৎ হ'য়ে পড়েছেন, ন্যাড়া তার পিতাকে ফুটন্ত ভাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সদ্যোকেনা বাল্‌বটার মায়াত্যাগ ক'রে দুটো ব্যাকুল হাত প্রসারিত করেছে এবং পড়ন্ত অবস্থায় তাঁকে অতিকষ্টে সাম্‌লেছে—কিন্তু—

জগাপিসি মাটিতে পা দিয়েই বল্‌লেন—এ তোর কিরকম আচরণ? পাঁচটাকার জিনিসটা ভাঙ্‌লি?

তুমি যে প'ড়ে মরছিলে—গৃহিনী জবাব দেন।

প'ড়ে ছেড়ে পুড়েই না হয় মরতুম, তবু আমার দাম ত নগদ কর্‌করে পাঁচটাকা নয়। তোমার ছেলের এ কী বুদ্ধি। খা দুটো চাঁটি!

আর একটা বাল্‌ব তখনি কিনে আন্‌লেন, ন্যাড়ার হাতে আর দিলেন না। পাশের ঘরের কোনে রেখে এলেন। যখন দরকার হবে, এনে দিলেই হবে।

আবার টুলে উঠেছেন, এমন সময়ে ও-ঘরে তাঁর ছোট মেয়ে রেনি সেই নতুন বাল্‌বটিকে খেলোনটা মনে ক'রে হাতে তুলে নিয়ে বল্‌ছে, আমি এই কাঁচের বলটা নোব মা।

যেই না বলা, এ ঘর থেকে জগাপিসি—খুন ক'রে ফেল্‌ব, রাখ শিগ্‌গির—ব'লে এমন এক হুঙ্কার ছেড়েছেন যে মেয়ে চমকে গিয়ে জিনিসটা ছেড়ে দিয়েছে, এবং একটি প্রচণ্ড শব্দ ক'রে সেটিও গেছে।

রেনিও মার খেত, যদি না পালাত। তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কি কিছু করবার আছে?—বল্‌তে বল্‌তে তিনি আবার দোকানে বেরিয়ে গেলেন।

এবাবে তিনি নিজের বগলে বাল্‌ব রেখে এক হাতে পুরোণোটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগ্‌লেন।

ওটিও খুলেছেন ডান হাতে, বাঁ হাতটাও অন্যমনস্ক হয়ে তুলেছেন, নতুন বাল্‌বটি ভাতের হাঁড়িতে গিয়ে পড়েছে, পুরোণোটি শিলনোড়ার ওপর আছাড় খেয়েছে, অন্ধকার ঘরে তাকের ওপরে যে তেলের বাটি ছিল সেটাতে কেমন ক'রে টান দিয়েছেন—সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা গেলনা, তবে এঁচোড়ের তরকারী যে পাত্রটাতে ঢালা ছিল তার মধ্যে জগাপিসির একটা পা গিয়ে পড়তেই হরিপ্রিয়া জলের ঘটি সাম্‌লাতে গেছেন, তাঁর নাকে জগাপিসির পিঠটা ঘষে যেতে কাণ্ড যে একটা হয়েছে সেটা পরিষ্কার হ'য়ে উঠল।

কিন্তু হারিকেন নিয়ে এসে দেখা গেল তরকারী মাখা পা নিয়ে জগাপিসি খাবার ঘরের মাঝখান দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যেন কিছুই হয়নি, এম্‌নি ভাব!

শুধু যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—একজন লোকের যতই বুদ্ধি থাক্, বাড়ীর আর পাঁচজন যদি নির্ব্বোধ হয় তবে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কষ্টকর।

পরলোক সংবাদ কাহিনী

রায় সাহেব ৺রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গত শুক্রবারে আমাদের এখানে একটি ভৌতিক বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে পরলোক হইতে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদেশের স্বাস্থ্য ও জীবনের সহিত সংবাদটির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বৈঠকের দলপতির আদেশ অনুসারে, সংবাদটি প্রকাশ করিলাম।

বৈঠকে আমরা পরলোক সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু এবারকার বার্ত্তাটি নূতন ধরণের। পরলোকবাসী বন্ধুর নিজের কথাই লিপিবদ্ধ করা হইল; দুঃখের বিষয় বার্ত্তাটি অসম্পূর্ণ।

বার্ত্তাটি এই :—

"পরলোক বহু দেশে বিভক্ত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক পৃথক দেশ নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দুদের জন্য পরলোকের যে দেশ নির্দ্দিষ্ট, তথায় তাহাদের সঙ্কুলান হইতেছে না।

বহুদিন যাবৎ কষ্ট ভোগ করতঃ তাঁহারা পরলোকের সম্রাট সমীপে এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদন পত্রে পরলোকের মাতব্বর অধিবাসীবৃন্দ স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত অনুযোগ কয়টি জানান হইয়াছে—

(ক) সম্রাটের ইহলোক নামক রাজ্য হইতে মৃত্যুচরেরা বহুযুগ যাবৎ অতি শীঘ্র শীঘ্র নরনারীগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতেছে। ইহাতে পরলোকের অধিবাসীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। চরেদের উচিত পরলোকের নূতন যাত্রীদের জন্য স্থান আছে কিনা পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া, পরে যাত্রী প্রেরণ করা; কিন্তু তাহারা কখনও তাহা করে না। চরেদের মধ্যে অনেকে (যথা,- কলেরা, প্লেগ) অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তাহারা ইহলোকের অধিবাসীদিগকে সময় দিতে চাহেনা; দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই পরলোকে পাঠাইয়া দেয়। চরেদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইতেছে। যেহেতু, ম্যালেরিয়া নামক চর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কবে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই, সে সেই দেশে একাধিপত্য করিতেছে, ইত্যাদি। চরেরা মনে করে যে, তাহারা আপনার কাজ সুচারুরূপে করিতেছে, কিন্তু তদ্বারা পরলোকবাসী আমাদের যে কি পরিমাণ অসুবিধা হইতেছে, তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখে না। তাহাদের ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব করিলে আমাদের স্থায়ী সুবিধা না হউক, অস্থায়ীভাবে কিছুকাল বসবাসের সুখভোগ করিতে পারি। যেসকল চরের ক্ষমতা হ্রাস করিতে হইবে, তন্মধ্যে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, যক্ষ্মা এবং শিশুরোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরন্তু অনেক অকালকুষ্মাণ্ড চর আছে যাহারা পলকে প্রলয় করে, যথা, বন্যা, রেলসংঘর্ষ, মারামারি, অগ্নিকাণ্ড, সর্পাঘাত, গৃহপতন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। ইহাদের উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহারা চকিতে বহু যাত্রীকে পরলোকে আনয়ন করে।

(খ) সম্রাটের গোচর থাকিতে পারে যে, পরলোকে বসবাসের সুবিধার জন্য এবং অত্রস্থ লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য এখান হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করিলে, আপনকার অনুগত চরেরা, পনের বৎসরের মধ্যে আবার এখানে ফেরৎ দেয়। এমন কি জন্ম বৎসরে প্রত্যেক চারিটির ভিতর, একটিকে এখানে চলিয়া আসিতে বাধ্য করে। আমাদের ভিতর কোন অধিবাসী ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিলে আমরা উৎসব করিয়া থাকি; কেননা, তাহার ইহলোকে অবস্থিতিকালে আমরা তাহার পরিত্যক্ত স্থান উপভোগ করিব। কিন্তু সে যদি জন্মমাত্র এখানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের কতটা আশা ব্যর্থ হইয়া যায়, সম্রাট তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। এই অতি শীঘ্র প্রেরণের জন্য ইহলোকে আপনার চরেরা মৃত্যুদেবের নিকট নানা আদর ও উপাধি পায় বটে, কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ভোগে অন্তরায় হইয়া, আমাদের প্রতি ঘোর শত্রুতা সাধন করে। ইহার সুবিচার কর্ত্তব্য।

(গ) পরলোকের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীগণ, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা, ব্রহ্মদৈত্য, পেতনী, শাঁখচুন্নী, গন্নাকাটা, পিশাচ প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়া, ইহলোকেই ভাঙা বাড়ী, গাছ, লোকের স্কন্ধে, শ্মশানে-মশানে প্রভৃতি নানা স্থানে ও অস্থানে বাস করে। এতদ্বারা পরলোকের অধিবাসীগণের কতক পরিমাণে সুবিধা হয়। কিন্তু তথাকার ৺গয়াধাম বলিয়া এক তীর্থ আছে। এবং সেই তীর্থমধ্যে গদাধরের পাদপদ্ম আছে। বৎসরের মধ্যে সর্ব্বকালে এবং বিশেষ পিতৃপক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক পরলোকবাসীর জন্য পিণ্ড দেয়। ফলে, নিম্নশ্রেণীর লোকগণ উন্নীত হয়, এবং ইহলোকের সান্নিধ্য ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত

হয়। এ কারণ আমাদের মধ্যে স্থানাভাব হয়। যদিও আমাদের সূক্ষ্ম দেহ, এবং সেইজন্য ইহলোকের যত হিন্দু দেহত্যাগ করিয়াছে, সকলেই এখানে স্থান পাইয়াছে, তত্রাচ আমাদের ইতস্ততঃ সঞ্চালনের স্থান দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। অতএব হয় পিণ্ডদানে বাধা দেওয়া হউক, না হয় শ্রীপাদপদ্মের ক্ষমতা কতক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হউক। উভয় উপায়ই সম্রাটের ক্ষমতাধীন।

(ঘ) সমগ্র পরলোক যখন সম্রাটের পূর্ণ অধিকারে, এবং তিনি যখন এই মহাদেশের একছত্র অধিপতি, তখন অন্যান্য দেশের কোন কোন অংশে আমাদের বসবাস করবার অনুমতি দেওয়া হউক। আমাদের ভিতর যাহারা জন্মগ্রহণে উপযুক্ত, তাহাদিগকে ইহলোকে দীর্ঘজীবনযুক্ত যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর শরীর ধারণ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। এখন ইহলোকে যে হিন্দু, পরলোকে সে হিন্দুই রহিয়া যায়; এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে সে হিন্দুই হয়। ইহাতে তাহার নশ্বর ও অবিনশ্বর অস্তিত্বে কোন কিছু বৈচিত্র্য শিক্ষা হয় না। পরলোকে এক দেশের লোক, অন্য দেশে প্রবেশ করিতে পারে না, সূক্ষ্মদেহ সত্ত্বেও। সম্রাট যদি এ বিষয়ে সুবিধা করিয়া দেন তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুদের জন্য অচিরে পরলোক প্রসার করিতে হইবে না।

(ঙ) বহুপূর্ব্বে পরলোক ও ইহলোকের মধ্যে ভাব বিনিময় হইত। মধ্যে সে প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে কতকগুলি উদ্যোগী লোকের সাহায্যে আবার বিনিময় চলিতেছে। এই বিনিময় সাহায্যে আমরা এখন ইহলোক সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিতেছি। আমরা জানিয়াছি যে, হিন্দুদের ভিতর নানা কারণে বহুলোক জীবিত অবস্থাতেই এখানকার যাত্রীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা আপনার চরেদের কার্য্য। তাহারা ইহাদের এমন জালে জড়াইয়াছে যে, ইহারা না পায় তাহা হইতে অব্যাহতি, না পারে তাহা ছিঁড়িতে। দেখিতেছি দিন দিন তাহারা মরিতেছে; সেইজন্য তাহারা আমাদের ভাষা বেশ বুঝিতে পারে। হিন্দুদের প্রত্যেকেই পরলোকে আসিবার জন্য বড়ই উৎসুক। তাহারা জীবিতকালে ইহলোকের যত কার্য্য করুক আর নাই করুক, পরলোকে সুখে থাকিবার জন্য যত কিছু কষ্টসাধ্য কার্য্য করিতে বিশেষ চেষ্টিত থাকে। ইহলোকে তাহা হইলে দুই প্রকার ব্যাধি—(১) মৃত্যু-ব্যাধি—যাহা আপনার সৃজন; (২) জীবন-মৃত্যু-ব্যাধি—যাহা আপনার চরেদের সৃজন। পূর্ব্বে ইহলোকের অধিবাসীগণের মধ্যে কৃতি পুরুষেরা পরলোক জয় করিত। পরলোকবাসী ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি ইহলোকবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত—যথা, বৃত্র+ইন্দ্র। বহু যুগ হইল সে সব প্রথা তিরোহিত হইয়াছে; এখন ইহলোকবাসী চায় দান-ধ্যান করিয়া, ম্যালেরিয়া যক্ষ্মায় ভুগিয়া পরলোকে চিরস্থায়ী হইয়া বসিতে। আত্মবলে পরলোক জয় এখনকার উদ্দেশ্য নয়। ফাঁকি দিয়া স্বর্গারোহণ এখনকার মূলমন্ত্র। অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই পরলোকবাসীদের ভয় হয়, পাছে একদিনে একযোগে সকলে পরলোকে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের সূক্ষ্মদেহ; হঠাৎ পেষণে মারা পড়িব এ ভয় নাই, কিন্তু বোধ হয় ভীষণ চাপে এত সূক্ষ্ম হইতে হইবে যে, আমাদের আর দেখা যাইবে না! সেই কি আমাদের (অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহধারীর) সূক্ষ্ম মুক্তি! অবস্থা যে ভাল নহে তাহা বুঝা যাইতেছে এই সত্য হইতে যে ইহলোকের হিন্দুগণ বহুদিন হইতে উত্তরোত্তর পরলোকপ্রিয় হইতেছে। এখন শুধু প্রিয় নহে, তাহাদের একপদ ইহলোকে, অপর পদ পরলোকে। এ বিষয়ে আমাদের উপস্থিত বলিবার কিছুই নাই, সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম মাত্র।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরলোকবাসী বন্ধু ক্ষান্ত হইলেন। বারান্তরে যদি আসেন, পুনরায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

ঘণ্টীরের দুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দে বানরগণ রামজয় হাঁকে—
সুষেণ ঔষধ দেন লক্ষ্মণের নাকে।
গাঙ্কাল পাতার গন্ধ যেমনি নাকে পাওয়া,
উঃ—বলে লক্ষ্মণ নাক সিটকে চাওয়া।
পাথর কুচির পাতা যেমন দাঁতে কাটা
হাড় মাস জোড়া লেগে পুরে এল ঘা'টা।
চোট সুষ্যি পাতার প্রলেপ দুই পুরু দিতে
লক্ষ্মণ সুরু প্রলাপ বকিতে।
চকিতে পানের সিটে জীভে দিবা মাত্র,
বকিতে বকিতে শীতল হল গাত্র।
বদ্যি কন—পথ্যি আজ নয় কাল,
বড় সামলেছেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলের তাল,
পাঁচটি মাস খাওয়া চলবেনা লাল লঙ্কার ঝাল।

রাম বলেন—"গেয়ান হল কই, ও বদ্যি!"
সুষেণ বলেন—"রসেন, বিশল্যকরণী মেড়ে দি।"
রাম বলেন—"বিষ বড়ি কি না দিলেই নয়।"
—"না দিলে নয় এ সময়।"
—"যা ভাল হয় করেন—

লক্ষ্মণ সুমিত্রা মা'র প্রাণের নন্দন
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন?
এনিছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি,
আনিয়ে সাগর পার—....."

আর কথা সরল না, রাম নিজের কপালে করাঘাত করে—'বিষ' বলে নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সুষেণ সেই সময় বিশল্যকরণীর সরু দু'টি শিকড় লক্ষ্মণের দুই কানে সেঁধ করিয়ে দিতেই—লক্ষ্মণ সজ্ঞান, গাত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান, যেমন পূর্ব্বে ছিলেন তেমন।—যাক্, ওষুধটা খেটেছে! তখন—

ভাই লক্ষ্মণে রামে হয় কোলাকুলি
চারিদিকে বানরের পড়ে হুলাহুলি।
ভাই ভাই এক ঠাঁই সুখে উতরোল,
হনুমান দিতে চান বদ্যি বুড়োয় কোল।

বগলে ছিল সূর্য্য, পালালো সেই ফাঁকে
বিস্মিত কপিগণ আকাশ পানে তাকে।
উদয় পর্ব্বতে ভানু করিল গমন,
পোহাইল বিভাবরী, প্রকাশ ত্রিভুবন।

—"এ কি হনুমান? খোঁড়াও যে দেখি? বগলেও দেখি পোড়া নারেঙ্গার মতো কি!"

—"ও কিছু নয় মশয়।"

—আরে কিছু নয় কি? যাও কোথা—দেখি দেখি বগলটা তোলো দেখি ও কে আছ, আন তো চোট্ সুয্যির পাত।"

—"আরে ছেড়ে দেন মশয়, আমার দরকার নেই ওষুধ-পাত।"

—"আরে তোমার মতো দেখিনি তো এমন হনুমান।"

—"ছেড়ে দেন মশয় গাঁদাল পাতার গন্ধে গেল প্রাণ।"

—"আরে গাঁদাল পাতা কোথা, দেখই না নতুন প্রেলেপটা দিয়ে। ও গন্ধমাদন, আয় না নিয়ে দেখনা এক্ষুনি করে দেবো খোঁড়া পা আরাম—বগলে দেবো একটা প্রেল্লেপ।"

—"আরে মশয় রাম-নামই আমার আরাম, আমার প্রেল্লেপ!"

—"ওহে বিস্ফোটক হবে, এলাজ না করলে বিস্ফোটক হবে।"

এলাচের কথা শুনে হনু কিছু শান্ত হয়ে বলছেন—"তা দেন এলাচ বাটাই দেন।" বলে হনু যেমন বগল তোলা, অমনি চট্ চোট সুয্যি পাতার গরম প্রেল্লেপ!

—"মেরে ফেল্লে, পুড়িয়ে ফেল্লে" বলে হনুমান হাত-পা ছোঁড়েন। বুকে হাঁটু দিয়ে গন্ধমাদন বানরে আর সুষেণ বদ্যিতে হনুমানের পায়ে পট্টি জড়িয়ে তবে ছাড়ান দিলেন।

—"যাও, বেদনা কমলে গন্ধমাদন পর্ব্বতটা যেখানে ছিল সেখানে বয়ে রেখে এসো, বুঝলে?"

—"ও গন্ধমাদন ঐখানেই রইলেন, কবে আবার কে পড়বে, তখন আবার ওষুধ আনতে ছুটবে কে?"

—"এ কথা বলেছ ঠিক, এই হেপায় গাছ গাছড়ার যোগাড় করে রাখি পর্ব্বতে ঘুরে এদিক সেদিক।"

হনুমান বল্লেন—"পর্ব্বতের বাগে যাবেন না—গন্ধকের হ্রদে গন্ধকালীর কুম্ভীর আছে। তা ছাড়া গন্ধর্ব্বরা সব গাছে গাছে গন্ধকের বাতি জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছে ওষুধের গাছে গাছে; বদ্যি দেখলেই সদ্যি গন্ধক মাড়া শিবজীর ধূনি জ্বালাবার দিয়াশালাই করে নেবে।"

—"তার কাজ নাই গিয়ে পর্ব্বতের কাছে। চল কি হচ্ছে দেখি গা জামাতার পটবাসে।"

দূর থেকে ফলের গন্ধ পেয়ে এ ওরে বলছেন—আজ বোধ করি রীতিমত ফলার আছে—

লক্ষ লক্ষ বানর বয় ফলমূলের বোঝা
কাঁঠালগুলো দেখে বোধ হয় বিঘৎ প্রমাণ কোষা
ছোট বড় আম 'কে জানে কি নাম
লেংড়া না ভূতা বোম্বাই—
হাড়িয়া হাড়িয়া তাল দেখে ঝরে লাল
ভাবি কিলাই ধমাধম—প্রাণ ভরে খাই।

এই বলতে বলতে লক্ষ বানর ফল ফুলের ঝোড়া হনুমানের সামনে ধরে দিতেই জাম্বুবান রামচন্দ্রের রোক্কা পড়লেন—

"বানর বংশের গৌরব হনুমান
তোমার প্রসাদে ভাই পেলো প্রাণ
বারোমাসী ফল ছিল লক্ষ্মণের তূণে
দিলাম প্রসাদ—বদ্ধ তোমার গুণে।"

শ্রীরাম জয়তি বলে হনু ফল খান
প্রাচীন বানরগণে কতক করে দান।
বালক বানরে কিছু দিয়া তোষে
রামজয় ঘোষে, আর ফলাহার কোষে।

দাড়িম্ব, নিম্ব, সুরঙ্গ বিম্ব, তেল-কুচকুচা তেলাকুচা
মুচমুচা নার্কেল, ঝুনা ডাব অচেল,
হাজার কাঁদি মর্ত্তমানের বর্দ্ধমান মুচা।
পিণ্ডি খেজুর, হাড়িয়া তাল, বৃহৎ কাঁটাল, বিঘত প্রমাণ কোষ,
শ্বেত কামরাঙা, বাদাম দাঁত ভাঙা, সরগুজিয়া মনতোষ।
মাখম শিমে, ডাঁসা পেয়ারায়
বুনো ওলে, বাঘা তেঁতুলে
টেঁপারিতে, টোপাকুলে
কালো জামে জামরুলে—একসা চাট্!
তারপরে—গোটা গোটা সজিনা খাড়া,
মোটা মোটা ঝাড়া বিশ ছড়া সুমাত্রার আক্—
খেয়ে উঠে পড়ে গোদা ভোঁদারা বলে, সুমিত্রার ছেইলা বেঁচে থাক!
দুই হাত তুলে সিন্ধুকুলে ধরে নাচ গান—লেজুড় করে উঁচা!

রামচন্দরের হনুমান—
কিষ্কিন্ধ্যা নগরের বীর হনুমান
রামজয়, জয়রাম—
ভাইরে ভাই দেখ আমাদের লেজেতেই মান লেজেতেই নাম
লেজেই মহামান্য পান মন্ত্রী জাম্বুবান।
অঙ্গদ যুবরাজ, সুগ্রীব প্রধান
জয় লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘন
রামজয় জয় রাম।

এই বলে লেজে লেজে তাল পাকিয়ে সকলে যেমন শয়ন অমনি নিদ্রা বেলা আড়াই প্রহরে। ক্রমশঃ—

অস্ত যান ভানুমান আইসে শর্ব্বরী
হেনকালে বিভীষণ আইল ত্বরাতরি
হাতে সোনার ছড়ি
এরে চেতন করেন, ওরে চেতন করেন
ডেকে বলেন, সাবধান এলো বলে অরি!
ফলার সেরেছে একটু আগে,
কলাতলার বানর আর কি জাগে।
বিভীষণ দেন রাগে—
একে চিমটি ওকে চিমটি
—ভাঙে না ঝিম্ কি!

তখন বিভীষণ খন্ খন্ করে বলছেন—

"ভাল, বিভীষণের কথা না তুলিলে কানে
সুখশয্যায় মর সব মহীরাবণের বানে।"

'মহী'টা কানে গেল না, রাবণটা শুনেই সবাই এক্সঙ্গে এককালে জাগরণ। চোখ কচলাতে কচলাতে রাম নাম স্মরণ।

—রাম রাম ছিরাম রাম রঘুমণি
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী।

"রাম বিষ্টু, বিষ্টু রাম, রাবণ দুষ্টু, সীতালক্ষ্মী, লক্ষণ বলবান"—এই বলেন, আর কেঁপে মরেন সবাই। রাবণের ভয়ে পঙ্গু যেন পেঙ্গুপক্ষীর দল!

তখন বিভীষণ বলছেন—

"বল্লে কথা বুঝিয়া না এই বড় দুঃখ
বুদ্ধিমান হয়ে হলি অজ্ঞান, চালাক হয়ে হলি মূর্খ!
ওরে জাগ সবাই জাগ করি জোড় হাত—
আজকে বড় সঙ্কটের রাত!
ভয়ে আমার চাল হলো পেটের ভাত!
সুপ্তি ছাড়ি সবে যুক্তি দৃঢ় কর
রাবণের বেটা মায়া জানে বড়।

হনুমান বলছেন—

"মরেছে তো ইন্দ্রজিত, আর বেটা কোথা?

বিভীষণ মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন—

"ঐ পাতাল তলার হোথা!
পাতালপুরেতে থাকে, নাম মোহী-রাবণ
মহা মায়াবী মহা পরাক্রম।
ডাকিনী মায়াপাতি কোলের ছাওয়াল হরে
ভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে।
মহামায়া তার ঘরে আছে সত্যি-বন্দী
ঘোর চোর চক্রবর্ত্তী কত জানে সন্দি।
অলক্ষিতে রাম লক্ষ্মণে যাবে চুরি করে
চোর-কুটুরীতে রেখে দেবে দুজনারে ভরে।
কালী বাড়ীতে বলি দেবে ছ্যাডাং যেন পাঁঠা
ভাবলেও যেন কেমন করে গা-টা।

সুগ্রীব বলছেন—

"সুযুক্তি বল হে তুমি মন্ত্রী জাম্বুবান
মহীর মায়াতে কিসে পাই পরিত্রাণ।"

জাম্বুবান মাথা চুলকে বলছেন—

"কি বল হে বন্ধু বীর হনুমান।"

হনুমান বলেন—

"রাম লক্ষণে নেবে—
চোর বেটার বিনাশিব সারারাত্রি জেগে!"

অঙ্গদ বল্লেন—

"দেখা-দেখি আসি যদি চোর দেয় হানা
তবে তো তাহার সাথে খাটে বীর-পনা।
লেজের কুণ্ডল-গড় করহ নির্ম্মাণ
তার মধ্যে থাকুন লক্ষ্মণ আর রাম।
রহুন সকল কপি কোমর বান্ধিয়া—
কার সাধ্য যাইবেক মোদের ভাঙ্গিয়া।"

বিভীষণ বলেন—

"আজিকার রাত্রি সবে কর পরিশ্রম
তার পরে আমি আছি আর রাবণ।"

—"আজ আঁর নিদ্রা নয়, নিশা জাগরণ!"
—বলে চাঁই বুড়ো উঠলেন!

[আগামী বারে সমাপ্য

কবিতা

বেদনা আশীর্ব্বাদ

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

বড়োদের কাছে বহুবার বহু
খবর দিয়েছি ভাই।
আরামে বেহুঁস্ তাহাদের কাণে
কথা মোর লাগে নাই।

নিরাশায় ফিরে নতুন বছরে
তাইতো তোদের কাছে।
ওরে ও কিশোর এসেছি এবার,
অনেক কথা যে আছে!

বড়োদের শুধু বড়ো-অভিমান,
বড়ো বড়ো বাক্ চাল্!
চোখ্ নেই হায় ঘর যে এদিকে
চোরা হাতে ফুটো খাল!

ওপরে তাকিয়ে বায়ু খায় যারা
দেখেনা এটুকু নীচ্!
হুঁচট্ খেয়েও আকাশেই ওড়ে
বোঝো, তারা কী যে চিজ্!

কথায় মধুর জ্ঞান-খই ঝরে,
মগজে কিন্তু জালা!
এদেরই প্যাঁচেতে সারা পৃথিবীটা
বিষে বিষে ঝালাপালা!

ওরা সরে যাক্, ক্ষতি কিছু নেই,
বেশী হবে লাভ ঢের!
নয়তো আরো যে বিপদ বাধাবে
'হুই-চই' নরকের!

তোরা ভাই বড়ো মিষ্টি সরল
ওদের মততো নয়?
ছোটগুলি নিয়ে চলাটি তোদের
বিরাট্ কথা যে কয়!

তাইতো হাজার দিনের বেদনা
হাজার চোখের জল—
নিয়ে আসিয়াছি সাজাতে তোদের
নরম বুকের তল!

আসিনি সাজাতে সোনা-মুকুতায়
নরম সোহাগ দিয়া!
এসেছি এবার রাঙাতে তোদের
হাজার অগ্নি নিয়া!

স্নেহ সকরুণ কোমল ডাকেতে
ডাকিবো না আজি আর।
বাড়াবো না ওই ভবিষ্যতের
ঘাড় ভাঙানিয়া ভার।

নতুন বছরে নিয়ে যারে তোরা
অগ্নি-আশীর্ব্বাদ!
তাপে তেজে তার জ্বলে যাক্ যতো
বড়োদের অপরাধ্!

—পৃথিবীর অপরাধ—
ঘুচাইতে আজ নিয়ে যা' কিশোর
বেদনা আশীর্ব্বাদ!

বিশ্বের রূপবৈচিত্র্য

শ্রীগীষ্পতিপ্রসাদ পাল

প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা

পৃথিবীর প্রথম মানুষেরও বিশ্বের দিকে চেয়ে আমাদেরই মতো বিস্ময় জেগেছিল। তার চোখে পড়েছিল, সূর্য্য প্রতিদিন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে যায়, আবার কোন্ অজানা পথে হয়তো বা পৃথিবীর নীচের পথ দিয়ে চ'লে প্রাতে পূবদিকে উদিত হয়। দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটছে, সে লক্ষ্য করে। চন্দ্রের উদয়াস্ত সূর্য্যের মতো নেত্রাকর্ষক না হোলেও তার দৃষ্টি তা এড়ায় নি। ক্রমে মানুষের চোখ আকাশে আরো দূরের দিকে প্রসারিত হয় ও নক্ষত্রজগৎ তাকে আকৃষ্ট করে। তবু জগৎ আদি মানুষের কাছে ছোটোই ছিল বলা যায়। সে ভাবতো, পৃথিবী বিশ্বরূপ গ্রহের তলদেশ, এই পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জল্‌জলে পদার্থগুলো আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসই পৃথিবীর আকার গোল ব'লে প্রথম জানতে পারে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের অপরূপ গবেষণার প্রণালী অবলম্বন করা সত্ত্বেও গ্রীক দার্শনিকেরা বুঝতে পারেন নি যে, বিশ্ব অনন্তদূরপ্রসারী। মাত্র ১৫০ সালে মানুষের মন বিশ্ব সম্বন্ধে তার সঙ্কীর্ণ ধারণা স্পষ্টভাবে ত্যাগ করতে আরম্ভ করে, ঐ সময়ে কোপার্নিকাস (Copernicus) প্রচার করেছিলেন যে পৃথিবী গ্রহজগতের কেন্দ্র নয়, সূর্য্যকে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে গ্যালিলিও আকাশ দেখবার জন্য প্রথম দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করেন। তাঁর দেখেই কোপার্নিকাসের মত ক্রমে জগতের লোকে গ্রহণ করে। দূরবীক্ষণ সত্যই মানুষকে নতুন দৃষ্টি দান করেছে। ঐ যন্ত্র তাঁর কল্পনার মুক্তি সাধনে যেমন সাহায্য করেছে, অন্য কোনো উপায়ে জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারার তেমন প্রসার ঘটে নি, একথা অনায়াসে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আর যে একটি যন্ত্রের উত্তর বিশ্বের সন্ধান পাবার সুবিধা ঘটেছে তার নাম স্পেক্‌ট্রস্কোপ্ (spectroscope)। বৈজ্ঞানিক ফ্রন্‌হফার ১৮১৪ সালে স্পেক্‌ট্রস্কোপের উদ্ভাবন করেন। ঐ যন্ত্রে আলোকরশ্মি পরীক্ষা ক'রে খুব দূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান ও তাপমাত্রা এখন ঠিক জানা যাচ্ছে।

নীহারিকা ও পৃথিবীর উৎপত্তি

দূরবীণের মধ্য দিয়ে দেখলে দূর আকাশে ছোটো ছোটো মেঘের মতো এক নতুন শ্রেণীর বস্তুপিণ্ড দেখা যায়। এইগুলিকে নীহারিকা বলে। তিন শ্রেণীর নীহারিকার কথা বৈজ্ঞানিকেরা জেনেছেন। প্রথম শ্রেণী গ্রহের মতো নীহারিকা। ঐ নীহারিকা আসলে যে সুবিস্তৃত বাষ্পমণ্ডলে ঢাকা একটা নক্ষত্র, এখন আর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রহের মতো নীহারিকা নক্ষত্রজগতের অন্তর্ভুক্ত। খুব বড়ো লাল রংয়ের নক্ষত্রের চেয়ে ঐগুলো অনেক বড়ো। একটা রকেট (rocket) ঘণ্টায় ৫ হাজার মাইল বেগে চলে ৯ বছরে নক্ষত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পারে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নীহারিকার দেহ অতিক্রম করতে হোলে তার ৯০ হাজার বছর সময় লাগবে। এই নীহারিকা খুব উষ্ণ। এদের তাপমাত্রা প্রায় ৭০।৭৫ হাজার ডিগ্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকারাও ছায়াপথের (Milky way) সীমানার মধ্যে অবস্থিত। (নক্ষত্রপুঞ্জকে ছায়াপথ বলে)। এগুলোর এক একটিতে একটির বেশীও নক্ষত্র থাকে। একটা নীহারিকার সমস্ত নক্ষত্র

বাষ্পের সাহায্যে যুক্ত! প্রথম শ্রেণীর নীহারিকার চেয়েও এসব আরো বড়ো। তৃতীয় শ্রেণীর বা বাইরেকার জগতের নীহারিকাগুলোই বিশেষ আশ্চর্য্যের জিনিষ। তাদের প্রত্যেকটি আকারে ছায়াপথের নক্ষত্রজগতের সমান। এই দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সূর্য্যময় জগৎটি হয়তো বা একটা নীহারিকা। বহির্জগতের প্রত্যেক নীহারিকা তেমনি এত দূরে অবস্থিত যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। সবচেয়ে কাছে দুটো নীহারিকার প্রত্যেকের দূরত্ব ৮ লক্ষ বছর! অর্থাৎ আলোকরশ্মি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে ৮ লক্ষ বছরে ঐ নীহারিকা থেকে সৌর-জগতে পৌছতে পারে। দূরবীণে এমন সব নীহারিকা দেখা যায় যাদের দূরত্ব ১৫ কোটি আলো-বছর! প্রত্যেক নীহারিকার ওজন সূর্য্যের হাজার কোটি গুণ ও প্রত্যেকটিতে হাজার কোটি সূর্য্য উৎপন্ন হবার মতো বস্তু আছে! যে রকেট এক সপ্তাহে সূর্য্যের, ন' বছরে বড়ো নক্ষত্রের ও ৯০ হাজার বছরে গ্রহের মতো নীহারিকাদের দেহ অতিক্রম করতে পারে, বহির্জগতের একটি নীহারিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছতে তার এক হাজার কোটি বছরের বেশী সময় লাগবে। ২ লক্ষ আলো-বছর ব্যাসবিশিষ্ট যে চক্রাকার নক্ষত্রজগতের কথা বলা হয়েছে তারই মতো প্রত্যেক নীহারিকা-চক্র ওর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে। এণ্ড্রোমিডার নীহারিকা দু' কোটি বছরে একবার ঘোরে। ঘোরার ফলে নীহারিকা গঠনের ক্রমবিবর্ত্তন ঘটছে। এক সময়ে অনুমান করা হয়েছিল যে, নীহারিকার দেহ থেকেই নক্ষত্রের জন্ম হয়। এখন শক্তিশালী দূরবীণের পরীক্ষায় তার প্রমাণ মিলছে। জলীয় বাষ্প জমে যেমন ফোঁটা ফোঁটা জল হয়, ঘোরার ফলে নীহারিকার দেহের বাষ্পও তেমনি নক্ষত্রের আকার ধারণ করে।

আবর্ত্তন গতিই নীহারিকার একমাত্র গতি নয়; প্রত্যেক নীহারিকার পশ্চাদ্‌গতিও আছে! প্রত্যেক নীহারিকা দূরত্বের আনুপাতিক বেগে দূরের দিকে ছুটে চলেছে। যে নীহারিকার দূরত্ব এক লক্ষ আলো-বছর, পেছনের দিকে তার বেগ সেকেণ্ডে ১০০ মাইল। নীহারিকাদের সবচেয়ে বেশী বেগ হচ্ছে ১৫ হাজার মাইল। এই বেগ নীহারিকাদের নিজেদের গতি হ'তে পারে অথবা বিশ্বের সমস্ত জায়গা বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে নীহারিকাদের পেছনের গতি ঘটছে এমন হওয়াও সম্ভব।

ছায়াপথ

নীহারিকাগুলি বিশাল আকাশে যেন এক একটি দ্বীপ। আকাশে এরকম হাজার হাজার দ্বীপ-জগৎ বা নক্ষত্রময় নীহারিকা ছড়িয়ে আছে। আমাদের নক্ষত্র-আকাশও এরূপ একটি নীহারিকা, তবে আমাদের দ্বীপ-জগৎটির একটা বিশেষ নাম আছে—'ছায়াপথ-রাজ্য'। ছায়াপথ থেকে নিকটতম নীহারিকার দূরত্ব প্রায় দশ কোটি আলো-বছর। ছায়াপথ ও নীহারিকাগুলো বিস্তৃতিতে লক্ষ আলোকবর্ষ। দূরবীণের সাহায্যে আমাদের ছায়াপথের বাইরে বিশ লক্ষ নীহারিকা দেখতে পাওয়া গেছে।

নীহারিকা শোভিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণাঙ্গচিত্র যে মানুষের কল্পনায় অসাধ্য সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত বা অপরিমিত, সে বিষয়ে দার্শনিকগণ অনেকদিন ধ'রে চিন্তা করছেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা কল্পনার অতীত হোলেও ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে পরিমিত—বয়সে, আয়তনে, জড়মানে।

শতাধিক নীহারিকার আলো পরীক্ষা ক'রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকটির কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সিংহরাশির মধ্য দিয়ে একটি নীহারিকা দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের ছায়া-পথ রাজ্য

থেকে এগার কোটি আলো-বছর দূরে। এই নীহারিকাটি আমাদের কাছ থেকে সেকেণ্ডে বারো হাজার মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। মিথুনরাশির মধ্য দিয়ে আরো দূরে আর একটা নীহারিকা দেখা যায়, সেটা সেকেণ্ডে ১৫ হাজার মাইল বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে।

নীহারিকাদের দূরত্ব ও তাদের পেছনের গতি মেপে দেখা যায়, যে নীহারিকাটি যত দূরে, তাদের অপসরণ বেগও সেই অনুপাতে বেশী। এই অনুপাত থেকে দেখা যায়, ২০০ কোটি আলো-বছরের দূরের নীহারিকার অপসরণ বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬৪০০ মাইল অর্থাৎ আলোর গতিবেগের সমান ও আরো দূরেরগুলোর আরো বেশী। কিন্তু কোনো বস্তুর আলোর গতিবেগ লাভ করা অসম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন প্রমাণ করেছেন, কোনো বস্তু আলোর সমান গতিবেগ বা তারো বেশী গতি লাভ করলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কাজেই ২০০ কোটি আলো-বছরের চেয়ে দূরে কোনো নীহারিকার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ২০০ কোটি আলো-বছরই তা হোলে জড়-ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি। কাজেই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্দ্ধ দুশো কোটি আলো-বছর।

ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত হোলেও সে কোন সীমার সাহায্যে ঘেরা নয়, আসলে সে সীমাহীন, অসীম। অসীম ও পরিমিত কথা দুটো উল্টো অর্থ নয়।

পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড দেশের এমন এক রকম বক্রতা আছে, যার ফলে, কেউ কোনোরকমেই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মাণ্ডহীন বহির্দ্দেশে উপস্থিত হ'তে পারবে না। আলোক-রশ্মিও এই বাঁকা ব্রহ্মাণ্ড দেশের মধ্যে বারবার ঘুরে আসবে।

এ থেকে একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে—যে-কোনো নীহারিকাকে আকাশের দু' দিকে দেখা যাবে! কারণ নীহারিকা থেকে সে আলোক সোজাসুজি আমাদের দিকে আসছে, তার সাহায্যেও যেমন দেখতে পাবো, আবার যে আলো বাঁকা ব্রহ্মাণ্ড দেশ প্রদক্ষিণ ক'রে আসছে, তার সাহায্যেও তাকে দেখতে পাবো। তবে, ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা আলো অবশ্যই হ'য়ে পড়বে অতি ক্ষীণ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের নিকটতম উজ্জ্বল দুটো নীহারিকার ঠিক বিপরীত আকাশে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দুটো অতি ক্ষীণ নীহারিকা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, এরা নিকটতম নীহারিকা দুটোর ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা আলোকের ক্ষীণ ছবি। অর্থাৎ, এই দুটোকে আমরা পরিমিত বাঁকা ব্রহ্মাণ্ড দেশের দু'দিক দিয়েই দেখতে পেয়েছি।

খুব সম্ভব, এক সময়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা জলন্ত বাষ্পাকার মেঘের মতো ছিল। পরে যুগ যুগ ধ'রে সেটা ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে ছোটো ছোটো কণার আকারে ঘন হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। এই সব নীহারিকা চিরচলমান ও প্রত্যেক নীহারিকা কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে তার চারদিকে আবর্ত্তন করছে। এরূপ আবর্ত্তনকালে পরস্পর আকর্ষণের শক্তি সমস্ত গ্যাসের কণাকে নানাজায়গায় একত্রিত করেও অবশেষে এইসব নীহারিকার অভ্যন্তরে কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। ক্রমে এই পদার্থ জমাট হয়ে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে থাকে ও নক্ষত্ররূপে প্রকাশ পায়। আমাদের সূর্য্যও খুব সম্ভব এভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যেক নক্ষত্রের এমন একটা অবস্থা আসে যখন সেটা বিস্ফোরিত হ'য়ে চারদিকে জলন্ত গ্যাস ছিটকিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে এই ছাড়া-পাওয়া জলন্ত গ্যাস চারদিকে তাপ ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয় ও জমাট বেধে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে। আমাদের পৃথিবীও এভাবে উৎপন্ন হয়েছে বলা যেতে পারে।' কিন্তু

স্যার জেম্‌স জীন্‌স, জেফ্রিস, চেম্বারলেন ও মোলটন বলেন, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে একটা প্রকাণ্ড নক্ষত্র সূর্য্যের কাছে এসে পড়েছিল। সেই নক্ষত্রের প্রবল টানে সূর্য্যের কিছু অংশ বেরিয়ে এলো, কিন্তু বেগবান্ সেই নক্ষত্রটি ফিরে যাবার পর মুহূর্ত্তে সূর্য্য থেকে বেরিয়ে-আসা অংশগুলো সূর্য্যের টানে তার চারদিকে ঘুরতে লাগলো। এইসব জলন্ত বাষ্প চারদিকে তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গ্রহের আকার ধারণ করেছে। এই পৃথিবীও ঐ অংশগুলিরই একটি।

পৃথিবীর মৃত্যু

আগেই আমরা পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলেছি। এই সৃষ্টির শেষ আছে কিনা সেই প্রশ্ন নিয়েও আবার মানুষ অনেকদিন মাথা ঘামিয়ে আসছে। দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন দৃষ্টি-বিচার নিয়ে বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। তবুও জিজ্ঞাসার বিরাম নেই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বুঝতে পারি আর নাই পারি, আমাদের পৃথিবীর একটা অন্তিম দশার কল্পনা করা অসম্ভব কিছু নয়।

সূর্য্যকিরণ না থাকলে পৃথিবীর জীবজন্তু, বৃক্ষলতা বাঁচতে পারে না। সুতরাং এমন অবস্থা যদি আসে যখন এই পৃথিবীর বুকে এক ফোঁটা রোদও আর দেখা দেবে না, সেদিন পৃথিবীর সব কিছুই বরফের মতো কঠিন ঠাণ্ডা পদার্থে পরিণত হ'বে। এক সময় এরকম ধারণাই প্রচলিত ছিল ও এমন কি স্যার জেম্‌স্ জীন্‌সেরও ধারণা যে, সূর্য্য একখণ্ড জলন্ত কয়লার মতো জ্বলতে জ্বলতে আস্তে আস্তে একদিন ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়বে; সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ওপরের দিকের এতকালের যে অফুরন্ত জীবনস্পন্দন সেটাও নিবে যাবে। পৃথিবীর এই মরণ-দশার কল্পনা আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করেন না।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্বন্ধে আজকাল দুটো মতবাদ দেখা যায়। প্রথম পক্ষের অভিমত হচ্ছে, সূর্য্যের তাপ ও উজ্জ্বলতা দিনের পর দিন বেড়ে গিয়ে পৃথিবীকে পুড়িয়ে মারবে। দ্বিতীয় পক্ষের গবেষণা আর একরকম। তাঁরা বলেন, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে আপনার কক্ষপথে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। ধীরে ধীরে (খুব সম্ভব কার্য্যকারণের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই) চন্দ্র একদিন পৃথিবীর কাছে আসতে থাকবে। ফলে, পৃথিবীর সাত সাতটা সমুদ্রে প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হ'বে। মহাপ্রলয়ের এই প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'তে না হ'তে অমন নিরীহ চন্দ্রটি ভেঙে চুরে সহস্র সহস্র খণ্ডে পৃথিবীর বুকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে।

তবে আজকাল প্রথম পক্ষের যুক্তিই বেশী সমাদর লাভ করেছে। জর্জ্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির সুবিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ জর্জ্জ গ্যামো বলেছেন—সূর্য্য যতই তাপ বিকিরণ ক'রে চলেছে ততই সে হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিভিন্ন মূল-উপাদানে পরিবর্ত্তিত ক'রে চলেছে। এসব রূপান্তরিত উপাদান হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী ও এদের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণই বেশী। আইনষ্টাইনের মতে, সামান্য পরিমাণে রূপান্তরিত অণুপরমাণু থেকেও শক্তি স্ফুরিত হচ্ছে। এভাবে সূর্য্যের ভাণ্ডার থেকে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ক্রমেই নিঃশেষিত হ'য়ে আসবে। এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায় যে সূর্য্যমণ্ডলের হাইড্রোজেন যত কমতে থাকবে, ঐ হাইড্রোজেনের রূপান্তর-ক্রিয়াও তত বাড়তে থাকবে এবং এর ফলে, সূর্য্য ধীরে ধীরে আরো প্রখর, আরো উজ্জ্বল হ'তে থাকবে। বর্ত্তমানে সূর্য্যের ভাণ্ডারে যতগুলো পদার্থ মজুত আছে তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই হাইড্রোজেন। যখন এই সৌরসম্পদ কমতে কমতে শতকরা ১ ভাগে এসে দাঁড়াবে, সূর্য্য তখন বর্ত্তমান সময় থেকে ১০০ গুণ প্রখর হ'বে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে পৃথিবীতে কোনোরকম প্রাণের সাড়া থাকবে না।

এবং আমাদের ঘূর্ণায়মান পৃথিবীও উত্তপ্ত ধাতু-গোলকের মতো গ'লে গ'লে পড়বে। অবশ্য এই সর্ব্বনাশ হ'বে কোটি কোটি বছর পরে।

সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন, পৃথিবী নাকি ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হ'তে সুরু করেছে। সোভিয়েট আবহতত্ত্ববিদেরা বলেছেন যে, উত্তর মেরুর ভূখণ্ডের উত্তাপ বাড়ছে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্ক্রিপ্‌স্ ইনষ্টিটিউসন অফ ওসিয়ানোগ্রাফির হেরাল্ড স্বারড্রাপও উত্তর মহাসাগরের জলরাশির উত্তাপ ১৯১৮ সালের চেয়ে ১৯৩১ সালে কিছু বেড়েছে ও বাড়ছে ব'লে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, প্রায় বিশ হাজার বছর আগে যে তুষার-যুগ শেষ হ'য়েছে, তারই প্রভাব থেকে পৃথিবীর উত্তরাংশ এতদিনে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে। গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের ভীষণ প্রকোপও কিছু কিছু কমে গিয়েছে। এভাবে তাপ বাড়তে বাড়তে আমাদের পৃথিবী গ্যাসের আকার ধারণ ক'রে মহাকাশে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে।

অপমৃত্যু

শ্রীসুগত দাসগুপ্ত

মুকুন্দর উপর একটা প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল মনিরামের। চিরকালই সে ওদের মধ্যে এই অহিনকুল সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল তা নয়, জীবনের প্রথম প্রভাতে ওদের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। প্রথম জীবনে ওরা ছিল গরীব। এই বিশালা ধরিত্রীর এক কোনে, একই বৃক্ষতলে তারা তাদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। একই ফুটপাথের উপর একই ইঁট মাথায় দিয়ে তারা তাদের কত বিনিদ্র রজনীই না কাটিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। সেদিন মুকুন্দ আর মনিরামের মধ্যে এতটুকু ব্যবধানের ছায়াও কেউ দেখেনি। কিন্তু আজ? আজ ঐ রাজার ছাপমার্কা কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা সেই ব্যবধানের প্রাচীরই গড়ে তুলেছে। বিশাল লোহার কারবারের মালিক আজ মুকুন্দরাম আর বিশালতর জুয়েলারীর মালিক মনিরামের মধ্যে কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায়না! শুধু মিল ছিল একটা। উভয়েরই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপরকে জীবনযুদ্ধে পরাজিত করা।

মনিরাম নিজের সেক্রেটেরীয়েট টেবিলের সামনে বসে ছিল, এমন সময় সশব্যস্তে ঘরে প্রবেশ কোরল তার প্রাইভেট এ্যাসিট্যাণ্ট সতীশ—শুনেছেন স্যার কি কাণ্ড?

—কিহে হোল কী?

—আমাদের সেই রামশরণ চাঁদের অর্ডারটার সেই অতিরিক্ত লাভের কথা বাজারে রাষ্ট্র হতে চলেছে, ফাঁস হয়ে যাবে শীগ্‌গিরই। একটা কিছু না করলেই নয়।

—সেকী! এর মূলে কে? Who is that devil?

রাগে মনিরামের স্বর বন্ধ হয়ে এল। অমায়িক হাসি হেসে নির্বিরোধির ভান করবার চেষ্টা করে সতীশ বল্লে—আজ্ঞে আপনার আবাল্যসহচর প্রিয়তম বন্ধু মুকুন্দবাবু আর কে।

—মুকুন্দ! মুকুন্দ আমার এই সর্ব্বনাশটা করলে। একটা আর্ত্তনাদ করে উঠলে মনিরাম।—তবে কি হবে সতীশ? কি হবে, মনিরামই কি তা জানে না। নিশ্চয় জানে। কালই সকালে বড় বড় হরফে খবরের কাগজগুলোর পাতায় পাতায় মনিরামের ঘৃণিত জোচ্চুরী আত্মপ্রকাশ করবে সমস্ত পৃথিবীর সামনে। তার এত বড় কারবার, তার ভারতজোড়া এই নাম যশ খ্যাতি সমস্ত তলিয়ে যাবে অতলে। কলকাতা সহরে মুখ দেখাবার জো থাকবেনা তার। রাস্তায় বেরুলে লোকে ঢিল মারবে তাকে। তারপর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কারাদণ্ডও ভোগ করতে হতে পারে ওকে।—আর ভাবতে পার্ল্লে না মনিরাম, ওর চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে এল মাথাটা ঘুরতে লাগল। সতীশের হাত দুটো জড়িয়ে ধর্ল্ল মনিরাম—এর একটা প্রতিকার করা চাইই সতীশ।

—প্রতিকার করা চাইই, স্যার। প্রতিধ্বনি করে উঠল ও।

—কিন্তু উপায় যে নেই কোন। ভারাক্রান্ত স্বরে মনিরাম বল্লে।

—উপায় আছে স্যার। সতীশ এগিয়ে এল মনিরামের ঘাড়ের কাছে। তারপর অত্যন্ত নীচু গলায় বল্লে—একটা মাত্র আছে। মুকুন্দবাবুকে সরিয়ে দিতে পার্ল্লেই এর একটা মিমাংসা হয়, আর কোন উপায় নেই।···এই নিন একশিশি বিষ। এরপর মুকুন্দবাবুর ডাক্তারকে হাত করার ভার রইল আমার উপর। ওর চোখে মুখে একটা প্রতীতি ফুটে উঠছিল, কিন্তু তার আড়ালে যে চরম অমানুষিকতার ছাপটা আত্মপ্রকাশ করছিল, তাও মনিরামের চোখ এড়ায় নি।

কিন্তু উপায় কী এ ছাড়া? মনিরামের এতদিনের কারবার, তার সমস্ত জীবনের একমাত্র সাধনা তার ইহজীবনের একমাত্র আকর্ষণ ঐ জুয়েলারীর দোকানটুকু ছেড়েও না হয় সে নিঃস্ব হ'য়ে আরেকবার এই উদার উন্মুক্ত পৃথিবীর তলে এসে দাঁড়াতে পাবে, আলিঙ্গন কোরতে পারে দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতাকে। কিন্তু তাই বলে সে তার যশ খ্যাতিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেনা, বেঁচে থাকতে পারেনা সমস্ত লোকের ঘৃণার পাত্র হয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে। না, অসম্ভব!

তাই তার মঙ্গলের জন্য, মনিরামের যশখ্যাতির জন্য মুকুন্দকে বলি হতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নেই কোন। মনিরামকে বাঁচতে হলে মুকুন্দকে সরে যেতেই হবে। হ্যাঁ ঠিক। মনিরাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত নেমে এল রাস্তায়। গাড়ীতে ওঠার কথা ভুলেই গেল। হেঁটেই চল্ল রাজপথ ধরে। এসে দাঁড়াল মুকুন্দর বিশাল প্রাসাদটার সামনে। চোরাসিঁড়ি ধরে উঠে গেল উপরে।···মুকুন্দর চা খাবার ঢাকা রয়েছে টেবিলের উপর। মুকুন্দ বাথ্‌রুমে গেছে। এ-ই সুযোগ: চায়ের কেটলীটা খুলে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা হলাহল মিশিয়ে দিলে মনিরাম তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল নীচে।

পরের দিন সকাল বেলা। সতীশ এসে ঢুকল মনিরামের ঘরে।—এই যে স্যার! খবর শুনেছেন আজকের? মুকুন্দবাবু মারা গেছেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে প্রকাশ, আত্মহত্যা করেছেন। কেন? কে জানে। ঠোঁটের কোনে মুচকি হাসি হেসে সতীশ বল্লে।

—আচ্ছা তুমি যাও সতীশ। পায়জামার পকেটে হাত দুটো গুঁজে মনিরাম উঠে দাঁড়াল। মুকুন্দ মারা গেছে। তার চিরশত্রু, তার ইহজীবনের সুখ ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অন্তরায় মুকুন্দরাম মারা গেছে। কার

গোধূলীর সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে সে। কি আনন্দ! কিন্তু কই, মনিরামের নির্জ্জীব মনে আনন্দের রোশনাই তো জ্বলে উঠল না। বাজল নাতো তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বিজয় শঙ্খধ্বনি। কই তেমন আনন্দ তো অনুভব কোরতে পার্চ্ছেনা সে। বরঞ্চ তার দমটাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসছে কেন? মনিরাম বার বার নিজেকে এই প্রশ্ন কোরলে, তারপর আরেকবার নিজেরই কানকে নিজেই চীৎকার করে শোনাল—মুকুন্দ মারা গেছে।

অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাসতে চেষ্টা করলে মনিরাম। হাঃ হাঃ হাঃ কিন্তু হাসির পরিবর্ত্তে ওর মুখ দিয়ে একটা করুণ আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল। অন্ধকার দূর করবার জন্যে টান মেরে জানলাটা খুলে দিলে মনিরাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরল এক ঝলক সোনালী রোদ। বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তার প্রথম চোখাচোখি হল নীল আকাশের সাথে। পার্ল্লেনা সে উদার উন্মুক্ত নীল আকাশে সাদামেঘের ভেসে বেড়ানোর দিকে তাকিয়ে থাকতে, পার্ল্লেনা সে কান পেতে শুনতে বিহঙ্গের কলকাকলী। সমস্ত জগৎ ধিক্কারভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল তার দিকে। মনিরাম তার ব্যর্থতাপূর্ণ দৃষ্টিদুটোকে ফিরিয়ে আনল ঘরের মধ্যে। বন্ধ করে দিলে জানলা, ফেলে দিলে কাঁচের শার্সি। ছুটে গেল ঘরের অপর কোনে। পকেট থেকে বের করে অর্দ্ধরিক্ত বিষের শিশিটাকে ছুঁড়ে দিল মাটীতে। হল্‌দে রঙের খানিকটা তরল বিষ ছিট্‌কে পড়ল। মুকুন্দের হত্যার একমাত্র সাথী। শিশিটার দিকে তাকাতে পার্ল্লেনা মনিরাম, সেও যেন ধিক্কারভরা এক দৃষ্টি মেলে ধরেছে ওর দিকে। হাসছে হিহি করে।

কিছুতেই শান্ত হতে পার্ল্লেনা মনিরাম। হঠাৎ তার নজর গেল টেবিলের কলিংবেলটার উপর। ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটা। ঝন্ ঝন্ শব্দে মুখর হয়ে উঠল বেলটা। প্রবেশ কোরল সতীশ। তুমি, তুমি কেন এলে। যাও, যাও এখান থেকে। বেরিয়ে যাও।—গর্জ্জন করে উঠল মনিরাম। সতীশ বেরিয়ে গেল। আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিজের বিবেকের সাথে এমনি প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে মনিরাম শান্ত হল। এসে দাঁড়াল মুক্ত বাতায়নের পাশে। আরেকবার সমস্ত অন্তর দিয়ে ধারণা করবার চেষ্টা করলে সে, মুকুন্দ নেই। সে মারা গেছে। কিন্তু কি ক্ষতি হয়েছে তার তাতে? মনিরাম নিজেকেই প্রশ্ন কোরলে। এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুকুন্দ মারা গেছে। এক নিমেষে, কোন যন্ত্রণা না পেয়ে, সে লাভ করলে মানুষের ঈপ্সিত মহানির্ব্বাণ। সে মুক্ত হয়ে গেল এই ধরণীর পঙ্কিলতা থেকে, আর পড়ে রইল অসম্ভব যশ-খ্যাতি নাম পসার ধনরত্নের অধিকারী মনিরাম। তার মৃত্যু হয়নি। সে বেঁচে আছে। আর এমনি থাকতেও হবে তাকে আরো কত কাল। এমনি বিবেকের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে তাকে হয়তো আরো বিশ-পঁচিশ-বছর বেঁচে থাকতে হবে। এমনি নরকের মধ্যে এমনি তিলে তিলে পঁচিশ বছর ধরে মরতে হবে তাকে। মুকুন্দর দুঃখ আর কতটুকু, কতটুকু ক্ষতি তার, তার তো এক নিমেষের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতি আর দুঃখ শুধু মনিরামের কারণ তার হয়েছে একটানা অপমৃত্যু!

কবিতা

নিঝুম দুপুর বেলা

শ্রীঅজিত সেন

গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠমাসে নিঝুম দুপুর বেলা
আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে দুরন্ত এক চেলা।

দাদার ছোট ছেলে
এইতো এল খেলে
কোন ফাঁকে যে পালিয়ে যাবে
সুযোগটুকু পেলে।
চক্ষুবুজে আছে
বকবো আমি পাছে
মিটমিটিয়ে তাকায় সেযে
দুষ্টু ছেলে যা-সে।
ঘুম এলরে টুকু ?
দেখছো নার্কি কাকু
আমি ঘুমাই ? ঘুমায় নাতো
ওদের বড় খুকু।

ক্লান্ত ঘুঘু ডাকে
আতা গাছের ফাঁকে
ঘরের কোনে ভোমরা ভোঁ ভোঁ
চোখে তন্দ্রা আঁকে।
দূরে পুকুর পারে
কাপড় কে আছারে
ঝিমিয়ে এল চোখের পাতা
অলস ঘুম ভারে।

হঠাৎ জেগে উঠি
বাহির পানে ছুটি
চড়াই ছানা বিষম ডাকে
টুকু ধরেছে টুঁটি।
দুষ্টু ছেলে বলে
কানটি দিছি মলে
ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁদন চেপে
কোথায় গেল চলে।

গ্রীষ্মকালে আবার এল নিঝুম দুপুর বেলা
অচিন্ দেশে পালিয়ে গেছে দুরন্ত সেই চেলা।

দেবশিল্পী

ম্যাজিকের কারসাজী

শ্রীঅশোককুমার সরকার

সে এক ভারী মজার ব্যাপার ;—বুঝলে। দেখি রংমশাল-ধারী কয়জন দস্যু ছুটে এলো। ভারী ভয় হল পাছে তারা মশালের আগুনে পুড়িয়ে মারে! তারা বললে, আপনার লেখা কই? ভয় ভয় বললুম, তোমরা চাইছ বটে, কিন্তু সম্পাদক মশাই যদি নারাজ হন? তারা বললে, বাঃ সম্পাদক নারাজ হবেন কেন, সম্পাদকই তো আমাদের পাঠিয়েছেন। তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেই লিখ্‌তে বসলুম মানুষ ভোলান ম্যাজিকের কারসাজী।

আজ তোমাদের যে খেলাটী শেখাব, সেটাকে তোমরা "এপ্রিল ফুল" বল্‌তে পার। বিগত ১লা এপ্রিল দার্জিলিংএ এক বন্ধুমহলে খেলাটী দেখিয়েছিলুম। তারা কৌশলটা জানতে চাইলে বলেছিলুম, রংমশালের ভাইদের না জানিয়ে তোমাদের আগে বল্‌তে পারিনে। খেলাটা কেমন হবে তাই আগে শোন,—প্রথমে অনেকগুলো বাদামী রংয়ের অফিস-খাম সবাইকে দেখান হোল, তার ভেতরে কিছুই নেই। বিলকুল খালি। তারপর আমি দর্শকদের ভেতর থেকে দু'জনকে ডাকলুম, ষ্টেজের দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে খাম দুটী উঁচু ক'রে ধরতে দিলুম। তারপর টেবিলের ওপর থেকে তোমাদের অশোককুমার সরকারের ছবিখানি নিয়ে একটা খালা খামের ভেতর রাখ্‌লুম। যার হাতে খামটী ছিল সে ততক্ষণাৎ খামের মুখটা বন্ধ করে দিল। তারপর দ্বিতীয় লোকটীর হাতেও যে খাম আছে তার ভেতর আরও একটা একই রকম ছবি পুরে দিলুম, লোকটী তার খামের মুখ বন্ধ ক'রে প্রথম লোকটীর হাতে দিল। এরপর দ্বিতীয় লোকটীর হাতে আবার পাঁচখানা খালি খাম দেওয়া হোল। আর পূর্বের মত পাঁচটী ছবি দিয়ে সে পাঁচটী ভর্ত্তি করা হোল। এই ভাবে প্রায় দশটা খাম ছবি দিয়ে বন্ধ করার পর সেগুলো দর্শকদের ভেতর থেকে একজনকে ডেকে এক বিরাট প্যাকেটের মত করিয়ে সেটাকে গালা দিয়ে শীলমোহর করান হোল।

এইবার আমার একজন সহচর একটা ট্রে নিয়ে এলো এবং সেটার ওপর সেই শীলমোহর করা প্যাকেটটী নিয়ে দর্শকদের মাঝে গিয়ে সকলকে একটা ক'রে ছবি পোরা খাম দিল। ছবির ওপর কিন্তু লেখা ছিল, "With best regards from Asoke Kumar to his beloved friends. বন্ধুদের দেওয়া খাম বন্ধ ভাবেই রাখ্‌তে বললুম, তারপর দিলুম এক বিরাট বক্তৃতা!

"My new friends of Darjeeling.—তোমাদের সংগে একদিনের আলাপে সত্যিই তোমাদের খুব ভাললেগেছে আর কয়দিন পরেই তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়ত শেষে তোমরা ভুলেই যাবে আমাকে কাজের মাঝখানে! কিন্তু তোমাদের ঠিক মনে থাকবে আমার, তোমরা যাতে ভুলে না যাও

আমাকে, সেইজন্যে তোমাদের একখানি করে আমার ছবি, স্মৃতি হিসেবে দিয়ে গেলুম।···তোমরা ছবিগুলি খুলে নিয়ে আমায় খামগুলি ফেরত দাও।"

আমার সেই সহচরটী তখন এক একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো তখন সে বন্ধুটী খামের মুখটী খুলে ছবিটা বের করে দেখলো সেখানে ছবির লেশ মাত্র নেই, সাদা কাগজে কেবল লেখা রয়েছে—

Such a fool in First April,
All the year, suffer the Hell.

Yours,
Asoke Kumar

অর্থাৎ—

১লা এপ্রিল এমন বোকা,
সারা বছর নরক ভোগা।

তোমাদের
অশোককুমার

বন্ধুরা সকলেই দেখে ঐ একই ব্যাপার! তখন তারা খাম, কার্ড সবই ফেরত দিলো সহচরের হাতে। সে ষ্টেজে উঠে এলো। বন্ধুরা ত সব ক্ষেপেই লাল। তখন দু'চারটে কথা বললুম বন্ধুদের, তারপর আমার সেই সহচরকে ইঙ্গিত করতেই সে নিজের পকেট থেকেই বের করলো টেনে একটা খাম এবং সেটার ভেতরেই দেখা গেল সেই ২৫খানা ছবি। বন্ধুরা তো আর একবার হাঁঃ, অবিশ্যি ছবিগুলি দিয়েই দিলুম বন্ধুদের। যাহোক এখন তোমাদের কৌশলটা বলি।

কৌশলটা পড়ার আগে একবার চেষ্টা কর নিজেরাই অন্য কোন কৌশল তৈরি করতে পার কিনা। অবিশ্যি পারা উচিৎ, কেননা তোমরা যখন কিশোর বাহিনী গড়ে খালিপেটে যুদ্ধ করতে পার তখন নিশ্চয়ই ভরাপেটে ঘরে বসে একটু ভাবলেই পারবে। ব্যাপারটার মধ্যে ভাবার বিশেষ কিছুই নেইও। ছবিগুলি প্রথমে সত্যিই খামে ভর্ত্তি করা হয়। এবং যখন শীলমোহর করার সময় গালা আগুনের তাতে গলান হয় তখন খামগুলো টেবিলের ওপর রাখা হয়। পরে যখন সেই খামগুলি প্যাকেটের ভেতর পোরা হয় সেইসময় আসল খামগুলির পাশে যে কার্ডলেখা নকল অথচ একই রকমের খামগুলি ছিল, বাইরের লোকে সন্দেহ করতে পারলো না। প্যাকেটে পোরা হোল, তারপর বিতরণ, পরে বক্তৃতা, তারপর খাম খুলতে বলা এরপরে তোমরা হয়ত বল্‌বে, আপনার সহচরের কাছ থেকে কি ক'রে বেরুলো?

আমি যখন বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত ছিলাম তখন সহচরটী খামগুলি খুলে ভেতর থেকে ছবিগুলো বে ক'রে নিয়ে খামে ভরে পকেটে করে এসে আবার সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

তোমরা হয়ত বল্‌বে, অত ছবি তোলাবার পয়সা পাব কোথা থেকে? তাহলে তোমাদের এক সুবুদ্ধি দেব। একখানা ছবি তুলিয়ে তার একটা ব্লক করিয়ে নেবে, তারপর আর্ট পেপার এর ওপর ছাপাবে ব্যস্ সুন্দর ছবি! তুমি ব্লক দিয়েই যতখুসি ছবি ছাপতে পার। তবে আজকাল ব্লকএর দাম কিছু বেড়েছে আর বাড়বে নাই বা কেন? চালের দাম যেখানে প্রায় চল্লিশ টাকার কাছে হতে চল্‌ল, সেখানে যা জিনিষ তো বাড়বেই। এবারে তোমাদের একটা মজার গল্প বলে আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। সেটি

জয়ন্তী পাহাড়ে ম্যাজিক দেখিয়ে বাংলোয় রাতের বেলা ফিরে এলুম, বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম। দিনের বেলায় সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে আর রাতে show দিয়েই এই অবস্থা হয়েছিলো সুতরাং শোবামাত্রেই ঘুম্। ভোর বেলায় দেখি বাংলোর বয়টা এসে দরজা ঠেল্‌ছে,—কি ব্যাপার? উঠে শুনি বাইরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা "কালকের রাতের যাদুকরকে ডাকছে।" "কেন? যাদুকরের সংগে বৌদ্ধ ভিক্ষুর কি দরকার"? যাহোক বাইরে এলুম ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে—এসে দেখি প্রায় বিশজন শ্রমণ গোছের সন্ন্যাসী মস্ত মস্ত লাঠি হাতে, আমায় দেখেই আস্ফালন করে উঠলো। তাদের গম্ভীর আকৃতি আর উগ্র ব্যবহারে বেশ একটু ভয় পেলুম।

এবার তাদের মাঝখান থেকে একজন উঠে এসে আধা হিন্দীতে অনেক কিছুই বল্‌ল। তার মর্মার্থ বুঝলুম, "তুমি ছুরি দিয়ে জিভ কেন কাটলে?" উত্তর দিলুম, "ওটা আমার সবচেয়ে ভাল ম্যাজিক, তাই দেখালুম্। তারা দেখি গুম্‌রে উঠ্‌লো। বললে, "জানো আমরা অহিংস, জীবহিংসা মহাপাপ, সুতরাং তোমার শাস্তি আমরা দেব, চলে এসো আমাদের সংগে।"

আমি তখন পড়লুম মহা ফ্যাসাদে। একটা উপস্থিত বুদ্ধি ঠিক করে নিয়ে তাদের ঘরের ভেতর এনে বস্‌তে দিলুম, তারপর আরও শুনে নিলুম আমার দোষটা, অতঃপর ডাক্তারী বইটই বার করে ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলুম এ জিভ কাটা জনসাধারণের কাছে যেমন মারাত্মক আর ভয়ঙ্কর তেমনি আমাদের কাছে সরল আর নির্ভয়। যাহোক অনেক বলার পর তারা ব্যাপারটা বুঝলো এবং আস্তে আস্তে চলে গেল।

তাদের চলে যাওয়ার পর আমি আমার প্রাতরাশ সেরে নিয়ে জয়ন্তী পাহাড়কে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কনট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

চলন্তিকা

টিউনিসিয়া-বিজয়, আরাকান-ফ্রন্ট, সেপাই-হাতি, মিঃ আল্লাবক্স, বেঁচে থাকার সমস্যা, ফুটবললীগ খেলা, কলিকাতায় ভিক্ষুক

উত্তর আফ্রিকাতে বহুদিন ধরে যে ভীষণ যুদ্ধ চলেছিল, তা এবার শেষ-প্রায়। লণ্ডনে গত ৮ই মে তারিখের এক খবরে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় দল টিউনিস ও বিজারটা শত্রুর হাত থেকে অধিকার করেছে। এই যুদ্ধে ফরাসী-ইংরাজ-আমেরিকা প্রভৃতি মিলিত শক্তি যে একটা বড় রকম জয়লাভ করল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যুদ্ধের এই ফলাফল শত্রুর পক্ষে যে ভীষণ আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ও কোন সন্দেহ নেই। মিত্রপক্ষ এই যুদ্ধক্ষেত্রে খুব কায়দা কৌশল করে লড়াই করেছে যাতে শত্রুসৈন্যদের অবস্থা শুধু কাহিলই করেনি তাদের পালাবার পথও বন্ধ করেছে। বহু সৈন্য ও সেনাপতি এবং যুদ্ধের নানা যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়েছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে মিলিত শক্তি এখন নিজের সুবিধামত ফ্যাসিষ্ট ইউরোপ আক্রমণ করার সুযোগ পেলে। যুদ্ধের গতি এবার ঘুরে যাবে এবং ফ্যাসিষ্ট শত্রু নিপাতে একটা বড় রকম ইউরোপীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে। টিউনিসিয়ার যুদ্ধে একটি জিনিষ আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করবার মত যে জয়লাভের অনেকখানি অংশই ভারতীয় সৈন্যদের অসমসাহসিকতায় সম্ভব হয়েছে।

৭ই মে তারিখের এক খবরে প্রকাশ যে, আরাকান ফ্রন্টে ইংরাজ সৈন্যরা জাপানীদের চাপে বুথিডঙ এলাকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে জাপানীরা এখন পশ্চিমে মায়ু পাহাড় ও পূর্ব্বে মায়ু উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী দেশ অধিকার করে তার সমস্ত সুযোগ কাজে লাগাতে সমর্থ হবে। এবং আরাকান যুদ্ধের গতি এক তীব্রতর বা এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিতে পারে। বুথিডঙ থেকে মাউঙডু রাস্তাও জাপানী সৈন্য অনেকখানি অধিকার করেছে। বুথিডঙএর যুদ্ধ শেষ হ'ল এবার মাউঙডু যুদ্ধের সূত্রপাত হবে। এই নতুন যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যদের নিজের সুবিধার জন্য আরো উত্তরে সরে আসতে হতে পারে। এই নতুন এলাকার যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে বা শত্রুকে হটিয়ে দিতে হ'লে, ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্যদের জঙ্গলাকীর্ণ দেশের অপরিচিত অলিগলিতে যুদ্ধ করবার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। কারণ জাপানীরাও এখানে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে লড়াই করছে। বাংলা সীমান্তের নিকটবর্ত্তী এলাকায় এই নিষ্ঠুর যুদ্ধ আগুয়ান হয়েছে বটে কিন্তু ভাবনার কারণ এখনও কিছু ঘটেনি। উত্তর আফ্রিকা যুদ্ধে জয়লাভ করে মিত্রপক্ষ ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তের এই যুদ্ধে নূতন উদ্দীপনায় সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ সৈন্য সাহায্যে লড়াই করবে সন্দেহ নেই।

আরাকান সীমান্ত থেকে এক ভীষণ বীরত্বের কাহিনী আমাদের কাজে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এ মানুষ-সৈন্যের বীরত্ব নয়, এ বীরত্ব এক দুঃসাহসী সেপাই হাতির অদ্ভুত বীরত্ব। জাপানীরা মাউঙডু-বুথিডঙ রাস্তা কেটে দেবার আগে এক অন্ধকার রাত্রে ঐ রাস্তার এক 'টানেল' পাহারায় একদল ভারতীয় সৈন্য হঠাৎ ভীষণ শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল এবং তারা শীঘ্রই একটা কালো ছায়া সরতে দেখতে পেল। প্রশ্ন করায় কোন উত্তর না পেয়ে একজন সেপাই এগিয়ে সেই কালো ছায়া লক্ষ্য করে গুলি চালাল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে কে যেন আকাশে তুলে মাটিতে আছাড় মারলে। আর একজন সেপাই মনে করল জাপানীরা নিশ্চয় আক্রমণ

করেছে, সে তখন তার ছোট মেসিন-গানটা চালাল। হাতিটা তখন এগিয়ে এসে শুঁড়ে করে সেই মেসিন-গানটা তুলে সেপাইর মাথার ওপর বসাল। তখন চতুর্দ্দিক থেকে সেপাইরা গুলি বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু একা হাতি আর কতক্ষণ পারে। যুদ্ধ কৌশল নীতি অবলম্বন করে সেই টানেলে সে রাতের অন্ধকারে আবার গা ঢাকা দিল। আরাকান-সীমান্ত সে রাতের মত আবার নিস্তব্ধ হ'ল।

সম্প্রতি করাচীর এক নিদারুণ সংবাদ প্রকাশ যে, সিন্ধপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স শিকারপুরের রাস্তায় অজানা দুর্বৃত্তের হাতের গুলিতে মারা গিয়াছেন। ৯ই মে সকালে মিঃ আল্লাবক্স ও তাঁর এক বন্ধু টাঙ্গা করে শিকারপুর রাস্তা দিয়ে সাক্কারের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রাস্তার একদিক থেকে জন চারেক লোক হঠাৎ তাঁদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং তার ফলে মিঃ আল্লাবক্সের বুকে গুলি লাগে এবং তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যান। হত্যাকারীদের এখনও ধরা যায় নি এবং তারা কে বা কারা জানা যায় নি। মিঃ আল্লাবক্সের মত এক নির্ভীক স্বাধীনচেতা মুসলমান নেতার এই অকাল মৃত্যু দেশের এই দুর্দিনে আমাদের মস্ত দুর্ভাগ্য। তাঁর এই মৃত্যু দেশের লোকদের যেমন স্তম্ভিত তেমনি শোকাচ্ছন্ন করেছে। ভারতের সেবায় তাঁর নিঃস্বার্থ দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের মত ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সমস্ত রাজদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন।

বাংলার খাদ্য সমস্যা অর্থাৎ নিছক বেঁচে থাকার সমস্যা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। নানা আইন আদালত, নানা সভাসমিতি গঠন, নূতন নূতন মন্ত্রীত্ব, নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন, নানা জারি জরিমানা কিছুতেই কিছু হয়ে উঠছে না। কোথায় এর গলদ? কোথায় আমাদের দেশের অন্ন? ঘরে ঘরে এই প্রশ্ন হাহাকার করছে। চালের দাম যে ধাপে উঠেছে এবং ক্রমশঃ যে রকম উঠছে তাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই লোকেদের সম্পূর্ণ উপবাসী থাকতে হবে। বাঙ্গালীর প্রাণ হ'ল অন্ন, দুটি ভাত খেয়ে তারা জীবন ধারণ করে। বাংলা দেশে এমন কোন দিন কোন কালে ঘটেনি, যে দুমুঠো ভাত তারা খেতে পায় নি। বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে। এই মরণাপন্ন অবস্থা থেকে দেশকে বাঁচাতে হ'লে, এখনই এর সুব্যবস্থা হওয়া একান্ত দরকার, যার দ্বারা প্রতি ঘর তার প্রাপ্য অন্ন পায় এবং ভবিষ্যতের অনটন থেকেও রক্ষা পায়। গরীব প্রজাদের আর কিছু না হোক অন্ততঃ দুমুঠো অন্ন পাবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা বা রাজতন্ত্র তার প্রজাদের দুমুঠো খেতে দেবার ব্যবস্থা রাখতে পারে না, সে রাজা বা রাজতন্ত্রের সার্থকতা কি রইল?

খাদ্যসমস্যা ও যুদ্ধের দরুণ এবারকার লীগ ফুটবল খেলায় তেমন আগ্রহ বা আনন্দ নেই। ভাল বিদেশী দল থাকলেও বা কথা ছিল। তাও নেই এবং যে দলগুলি আছে ও খেলছে, তাদের মধ্যে এমন দল বা দল গঠন নেই যে আমরা আগের মত চমৎকার খেলা দেখতে পাবো। ভারতীয় দলগুলিতে খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেক অদল বদল হয়েছে। এর জন্য এবার যে কোন্ দল কেমন করবে এখন থেকে বলা শক্ত। তবে গতবারের লীগ বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গলের দল এবার মন্দ নয়। মহামেডানসের মধ্যে পুরোনো খেলোয়াড় ও নতুন খেলোয়াড় দুই-ই আছে। এই দলও ভাল করতে পারে। মোহনবাগানের এবারের নতুন দলটি বিশেষ আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না—বিশেষ ফরোয়ার্ড লাইন। মোহনবাগানের এটা যেন রোগে দাড়িয়েছে। কেন যে তারা ভাল ফরোয়ার্ড লাইন সংগ্রহ বা গঠন করতে পারে না, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়। অন্যান্য দলগুলিতে অদল বদল হয়েছে, মোটামুটি তারা একরকম দাঁড়িয়েছে। কালিঘাট, এরিয়ান্স,

ভবানীপুর এরা কেমন খেলবে এখন বলা যায় না। লীগের প্রথমার্দ্ধ খেলাগুলি শেষ না হলে, দলগুলির ও ভালমন্দ খেলোওয়াড়দের অবস্থা বোঝা যাবে না। তবে কয়েকটি দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে এবার বেশ একটা প্রতিযোগিতা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলিকাতার পথে ঘাটে ভিখারীর সংখ্যা যে নিদারুণ ভাবে বাড়ছে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এই ভিখারীরা নানা রকমের, নানা ধরণের। কেউ কুষ্ঠ, কেউ অন্ধ, কেউ রোগক্লিষ্ট, কারুর অঙ্গ নেই, আবার কেউ সন্ন্যাসী, কেউ নিষ্কর্ম্মা রুগ্ন, কেউ সুস্থ সবল,, কেউ অনাথ ও অনাথা, কেউ শিশু, কেউ বৃদ্ধ বৃদ্ধা। ভারতবর্ষ ভিখারীদের দেশ, হয়ত বা তাদের তীর্থ। যারা পেরেছে সকলেই এই ভিখারীদের নির্ব্বিবাদে দান করে এসেছে। কিন্তু এখন বিচার করার সময় এসেছে। এর মধ্যেই বহুদিন থেকে একদল ব্যবসায়ী ভিখারীদের দল দেখা দিয়েছে। এদের শুধু ব্যবসাই নয় ভিক্ষা করা, এরা তাদের নেতাদের প্ররোচনায় ভিক্ষার ভাল অভিনয় করে ঠকিয়ে দু' পয়সা নিতে জানে। এদের চেনাও শক্ত, ফলে সত্যিকারের যে ভিক্ষুক তার থলিতে কিছু পড়ে না। অনেকদিন ধরে কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙ্গলার সরকার মহল এই ভিখারী সমস্যা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু হয় নি। বিশেষ করে ছোঁয়াচে রোগক্লিষ্ট ভিক্ষুকদের জন্য থাকবার এলাকা ও খাবার ব্যবস্থা এখনই করা উচিৎ নইলে কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির আশু প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে। তারপর যারা অন্ধ বা অঙ্গহীন অথচ যারা রোগগ্রস্থ নয় তাদের জন্যও ভিন্ন এলাকার বন্দোবস্ত করে তাদের উপযুক্ত কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করা উচিৎ। এতে লাভ বই ক্ষতি নেই। অনাথ ও অনাথাদের, শিশু বৃদ্ধ ভিক্ষুকদেরও তেমনি ব্যবস্থা উচিৎ। আর যারা দলবদ্ধ হয়ে ভিক্ষার অভিনয় করে লোক ঠকাচ্ছে, তাদের সায়েস্তা করা উচিৎ। এই হাজার রকমের ভিক্ষুকে কলিকাতা সহর ভরে উঠেছে। এমন আগে কখনও হয়নি। এ সম্বন্ধে একটা কায়েমী ব্যবস্থা এখনই করা উচিৎ। শোনা যাচ্ছে, বহরমপুরে ভিখারীদের জন্য এক ধর্ম্মশালার ব্যবস্থা হচ্ছে। কলকাতার নিকটবর্ত্তী কোন জায়গাতেও তাদের আংশিক ভাবে সরানোর চেষ্টা চলছে। এগুলি কাজে পরিণত করলেই সকলে খুসী হয়।

আগামী রংমশালে—

'রাজার ছেলে' ও 'জগাপিসি'র লেখক ও ভূতপূর্ব্ব 'ভাইবোন' সম্পাদক

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসুর একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস

অভিশপ্ত বংশ

রংমশালে আগামী আষাঢ়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া, আবিষ্কার ও অভিযানের গল্প
অভিনয়োপযোগী নাটক ও বিচিত্র কাহিনী
রংমশালে নিয়মিত প্রকাশিত হবে॥

কবিতা

এস্‌প্লানেডে সন্ধ্যা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এস্‌প্লানেডে দাঁড়িয়েছিলুম।
দুধারে ভিড়। মানুষরা কি ঝরাপাতা? কিন্‌লুম
চানাচুর আর খবরের কাগজ
আর ফিতে কয়েক গজ
আর গোটা দুই মাসিকপত্র। আর
এই ভিড়ের সঙ্গে গ্রীষ্মঝরা পাতার
কোথায় যেন মিল রয়েছে—
এই কথাটাই বারবার মনের মধ্যে ঘুর্‌ছে।

কত মানুষ, কত ব্যস্ত মানুষ।
মানুষরা কি বাতাসভরা ফানুষ?
কারুর গায়ে চোগাচাপ্‌কান,
কেউ পরেছে পাজামা আর আচ্‌কান,
কত মানুষ আপিস যাবার স্যুট-এ—
ছেলেমেয়ে খেল্‌ছে মাঠে, ছোট্ট ফুট্‌ফুটে।
সাম্‌নে দিয়ে বাস যাচ্ছে, যাচ্ছে লরি ট্রাম,
হন্তদন্ত সবাই কেমন, কপালে নেই একটুও বিশ্রাম।

এমন সময়ঃ আরে আরে একি?
সূর্য হোলো লাল্‌চে বেলুন, অবাক হয়ে দেখি!
সারাদিনের রুদ্র আকাশখানি
রঙে রঙে ভর্‌লো কেমন করে? বাতাস হোলো তরল জাফ্‌রাণী।
হাওয়া আস্‌ছে কোন্ সমুদ্দুর থেকে
ঘুমের মতো নরম মধুরতায়, বইছে এঁকে বেঁকে।

সূর্য গেল চলে, কলকাতায় ব্ল্যাক আউটের সন্ধ্যা
মেয়েটি কি হাসপাতালে দেখতে কাউকে যাচ্ছে? (হাতে রজনীগন্ধা!)

মুহূর্তের মধ্যে ঝড় উঠে এল।

জামাজুতো সব খুলে রেখে এ ক'দিন দেবতা হ'য়ে দেবতার আসনে ছিলাম, পালিয়ে যাবার আগে সব প'রে নিলাম।

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটে আমার মানিব্যাগটি নেই। শেষে দেখি পকেটটিও নেই, কে কেটে নিয়েছে! মণ্টুও চমকে উঠে দেখে তারও পকেট কাটা!

বাঘ বলল, "নিশ্চয় শোভাযাত্রার সময় ভীড়ের মধ্যে কেউ কেটে নিয়েছে।"

নিতাই অবাক হ'য়ে বলল, "আমাদের দেবতা জেনেও পকেট কাটল?"

বাঘ বলল, "পকেট কাটার সময় এদের ওসব জ্ঞান থাকে না। এদের ভক্তির চেহারাই অন্যরকম। তোমরা যেমন ঝড়ের গোলমালে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছ, ওরাও তেমনি ভক্তির গোলমালের মধ্যে দেবতাদের পকেট কাটবে ব'লে ঠিক করেছিল। এখানেও চেয়ে দেখ, ভক্তেরা তোমাদের যত অলংকার দিয়েছিল ভক্তেরাই সেসব চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, একটিও প'ড়ে নেই।"

চেয়ে দেখি সত্যিই তাই। যারা গড় হয়ে প্রণাম করেছে আর পায়ের ধূলো নিয়েছে তারা ঐ সঙ্গে রাজার দেওয়া মুক্তার মালা, রাণীর দেওয়া মুকুট সব সাফ্ ক'রে নিয়ে গেছে। টাকা পয়সাও অনেক ছিল, কিছুই নেই।

যাক আর ভেবে কি হবে! ঝড় ক্রমেই খুব বেড়ে যাচ্ছে, এমন ভীষণ ঝড় কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার মতো একটা শব্দ হচ্ছে। প্রবল বাতাস ঘুরতে ঘুরতে ধূলো বালি পাতা সব মাটি থেকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, গাছপালা মড় মড় ক'রে ভেঙে পড়ছে, কত বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মানুষের চীৎকার মিলে সব এক হ'য়ে যাচ্ছে। লোকেরা ছুটোছুটি ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘর চাপা পড়ে, কেউ গাছ চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে, প্রতি মিনিটে ঝড়ের বেগ যাচ্ছে বেড়ে।

আমরা এতখানি সুযোগ পাব কল্পনাও করতে পারিনি। ঝড়ের গোলমালে যখন সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই বেরিয়েই বলল, "আমি পারছি না—নিজেকে ধ'রে রাখতে পারছি না, ঝড়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" বাঘ বলল, "আমার লেজ ধ'রে চলে এসো।"

নিতাই বাঘের লেজ ধ'রে আমাদের সঙ্গে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে কিছুদূরে যেতেই কার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। এই ঝড়ের মধ্যে প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে হাসে কে?

মণ্টু বলল, "নিশ্চয় সেই লোকটি।"

নিতাই প্রশ্ন করল, "কোন্ লোকটি?"

মণ্টু বলল, "খিলঙ। লড়াইয়ের মাঠে সে হাসতে আরম্ভ করেছিল সেই হাসি তার এখনও থামেনি।"

আমি বললাম, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। খিলঙ যদি হয় তাহ'লে নতুন কোনো ব্যাপার নিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছে, কেননা এই সংসারে তার হাসি জাগানোর এত জিনিষ আছে যে একই জিনিস নিয়ে এতদিন ধ'রে অবিরাম হাসবে এরকম মনে হয় না।"

কিন্তু বলতে বলতেই খিলঙের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমি পড়ে গেলাম, সেও পড়ে গেল এবং পড়ে গিয়েও হাসতে লাগল।

মণ্টু তাকে বলল, "কে তুমি এই ঝড়ের মধ্যে হাসতে হাসতে চলেছ, তোমার কি একটুও ভয় নেই?"

খিলঙ হো হো হো হো ক'রে হাসতে হাসতে বলল, "যে তিনটে ছেলে আমাদের দেশে এসেছে তারা কি মানুষ নয়, দেবতা, হো হো হিহি—তাই শুনে আমি আর হাসি থামাতে পারছি না, হো হো হো—আমি তাদের দেখতে যাচ্ছি।"

আমি মাটি থেকে উঠে বললাম, "তা হ'লে তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি আর দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি তাদের দেখতে যাও"

খিলঙ মাটি থেকে উঠেই ছুটতে লাগল, তার হাসির শব্দ ক্রমে ঝড়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

আমরাও ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে শহরের সীমা ছাড়িয়ে এসে পড়লাম একটা পাহাড়ের ধারে। সেখানে খুঁজে খুঁজে একটা গুহা পাওয়া গেল, ঝড়ের মধ্যে আমরা সবাই সেইখানে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল, এবং রাত্রিও শেষ হ'য়ে এল।

মণ্টু বলল, "চল এইবার পাহাড় পার হ'য়ে দেশে ফিরে যাই।"

নিতাই বলল, "কোনো কথা না ব'লে কাজ আরম্ভ কর,—এখানে আর এক মিনিটও থাকতে চাই না।"

আমরা সবাই পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম—কিন্তু কিছুদূর উঠেই দেখি বাঘ আমাদের সঙ্গে নেই।—বাঘ গেল কোথায়?

নিতাই বলল, "সে তো আমাদের সঙ্গে আসে নি, তাকে গুহার মধ্যেই বসে থাকতে দেখেছি।"

অনেকখানি উপরে উঠে এসেছি, এখন আর নীচে নেমে বাঘের সন্ধান নেওয়া সম্ভব নয়। বাঘ দয়া ক'রে অদৃশ্য অবস্থায় আমাদের সঙ্গে এসে থাকে তা হ'লেই মঙ্গল, নইলে বাঘের কাছ থেকে আমাদের চির বিদায়।

মণ্টু বলল, "আচ্ছা, বাঘের কোনো অসুখ করেনি তো? নইলে আমাদের সঙ্গে না আসার তো কোনো কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

শূন্য জায়গা থেকে উত্তর এল, "ভয় নেই আমি সঙ্গেই আছি এবং সুস্থই আছি, তবে রওনা হ'তে একটু দেরি হ'য়ে গেছে। তোমরা রওনা হওয়ার পর আমি একটু ধ্যানে বসেছিলাম। সূর্যদেব সবে উঠছেন দেখে তাঁকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তাঁকেই ধ্যান করছিলাম। তবে এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমার থাকার দরকার নেই, পথে আর তোমাদের কোনো বিপদ হবে না।"

আমি বললাম, "তা হয় না, তোমাকে কলকাতা ফিরে যেতেই হবে।"

বাঘ হেসে বলল, "বল কি! কলকাতা যাব কেমন ক'রে? সেখানে কি আর আমাকে কেউ জায়গা দেবে? কলকাতার পথে এমন ভীড় যে সেখানে অদৃশ্য হ'য়েও চলাফেরা করতে পারব না। যদি নেহাৎ না ছাড়, তা হ'লে কলকাতার পথে একবার সুন্দরবনে যেতে পারি।"—আমরা এ কথায় খুশী হ'লাম।

কাঞ্চনবুড়োকে কথা দিয়েছিলাম, ফেরবার সময় দেখা ক'রে যাব, তাই প্রথমে আমরা তার কাছে গেলাম। বুড়ো কেমন ক'রে টের পেয়েছে যে আমরা আস্‌ছি, তাই আমাদের জন্য সব আয়োজন তার পাকা। চা তৈরী হয়ে আছে, তার সঙ্গে ফলমুলও প্রচুর। পেঁপে, কলা, কমলানেবু, তার নিজের বাগানের। তা ছাড়া বাঘের জন্যও ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্য একটা হরিণ রাখা হয়েছে।

কাঞ্চনবুড়ো বলল, "তোমরা সবাই অতিথি, তোমাদের সবারই জন্য ব্যবস্থা করেছি।" আমরা পত্রপাঠ খেতে আরম্ভ করলাম। বাঘ বলল, "হরিণটা আর তোমাদের সামনে খাব না, আমার খাওয়া দেখে বড় বিশ্রী, ওকে আড়ালে নিয়ে খেয়ে আসি।"

কাঞ্চনবুড়ো বলল, "স্বচ্ছন্দে। আমার পিছনে গিয়ে খেয়ে এসো।"—বাঘ হরিণকে টেনে নিয়ে গেল সেইখানে। আমরা ইতিমধ্যে চা ইত্যাদি খাওয়া শেষ করলাম, খেয়ে কি যে তৃপ্তি আর আরাম হ'ল আর কি বলব! এ ক'দিন দেবতার খাদ্য খেয়েও এত আরাম পাইনি।

খাওয়া শেষ করে বাঘের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় দেখি বাঘ আর হরিণ দুজনেই ফিরে আসছে।

আমরা ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বাঘ বলল, "খাওয়া গেল না ভাই, ওর মুখখানা দেখে বড় দয়া হ'ল। তা ছাড়া ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে খাবে?"—এমন কথা আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তা ছাড়া ওর আরও একটি কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।"

নিতাই জিজ্ঞাসা করল, "কি কথায়?"

বাঘ বলল, "ওর কাছে শুনলাম এক অদ্ভুত কথা। ও বলল, "ভারতবর্ষের হাজার হাজার বাঘ হিংসা ছেড়ে দিয়েছে, তুমিই কি তা পারবে না?" কথাটা ভাল ক'রে বুঝলাম না, কিন্তু এমন ভাবে বলল যাতে বিশ্বাস না করে থাকা গেল না, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমিও হিংসা ছেড়ে দেব।"

নিতাই হরিণকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "তুমি কলকাতা যাবে?"

হরিণ খুশী হ'য়ে বলল, "যাব।"

বাঘ বলল, "আমি আর যাব না। হিংসা যখন ছেড়েই দিলাম তখন আর দেশে ফিরব না, এখানেই থাকব।"

বাঘ কিছুতেই ফিরতে রাজি হ'ল না। অগত্যা আমরাই কাঞ্চনবুড়োর কাছ থেকে আর বাঘের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দার্জিলিং হ'য়ে কলকাতা ফিরে এলাম। নিতাই হরিণটাকে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আমি বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা আটটা বেজে গেছে।

সমাপ্ত

একটি চিঠি

আমার দূরের আর কাছের বন্ধুরা!

তোমরা আমায় চিঠি দাও দূরে থেকে, নিকট থেকে, তোমাদের অপরিণত মনের কিশোর বয়সের কত স্বপ্ন কথা, কত রঙীন আশা আকাঙ্খার কথা, কত মান অভিমান মেঘাচ্ছন্ন তোমাদের হাজার চিঠি। কোথায় তোমরা, কোথায় আমি, কারো কারো সঙ্গে হাজার মাইল ব্যবধান—তবু তোমরা আজ আমার কাছাকাছি আমার পাশাপাশি। তোমাদের হাজার চিঠির জবাব দিই একটি ঘরের কোণে বসে। ভাল লাগে তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে, ভাল লাগে তোমাদের আবদার রাখতে, ভাল লাগে তোমাদের মনে অভিমানের পালাটা শুনতে—কিন্তু ভাল লাগাটা কি চিরকাল স্থায়ী হয় জীবনে? ভালবাসাটা কি থাকে অনন্তকালের পরমায়ু বয়ে? চিরকাল কি কেউ বেঁচে থাকে? তবে? আমার পালা ফুরোবে জানি, জানি হয়তো তোমাদের চিঠির দপ্তর আল্‌গা রেখে আমায় চলে যেতে হবে। তখন তোমাদের মধ্য থেকেই কেউ আসবে এগিয়ে এই আসন দখল করতে, আমার মত খুলবে চিঠির দপ্তর, ভাববে কিশোরদের ভাবনা, উদ্বেল হয়ে উঠবে কিশোর আশায় ভাল-বাসায়। চিঠি-চিঠি খেলা চলবে অনেকদিন। আমি সেদিন থাকবো না। সেদিন হয়তো আজও আসেনি কালও আসবে না, আসবে সেদিন দু'দশ বছর পরে, তখন তোমরা কেউ আর কিশোর কিশোরী থাকবে না, তোমরা পৌঁছবে গিয়ে বড়দের কোঠায়, তোমাদের স্থান দখল করবে আগামী যুগের কিশোর কিশোরীরা। এমনি করে খেলা চলবে যুগে যুগে।

মনে হয়—আমাদের কালের কিশোর বয়সের কথা। সে কালে কিছুই আমরা পাইনি। 'আনন্দ' ছিল দ্বিতীয় ভাগের পাতায়, সারা জীবন ধরে তাকে বানান করেই আসছি, জীবনে তার স্থান হয়নি কোনদিন। না ছিল এত পত্রিকা, না ছিল ভালবাসার পাত্র, না ছিল কিশোর দরদী বন্ধু। ছিল রক্তচক্ষু, শুষ্ক শাসন আর বেতের আস্ফালন। হয়তো পেয়েছিলুম মা বাবার স্নেহ ভালবাসা, পেয়েছিলাম একটু নির্দ্দিষ্ট স্থান, পড়বার, ঘুমোবার, পুতুল খেলবার। ক্ষুদ্র সুখ আর স্বস্তির ভিতর দিয়েই জীবন কেটে গেল। যখন বড় হলাম, জ্ঞান হলো, দেখলুম গর্ব্ব করার মত কিছু নেই আমাদের—সারাটা জীবনে রয়ে গেছে মস্ত ফাঁক, তাই আমাদের জীবনে যে অভাব রয়ে গেছে তা যেন তোমাদের জীবনে না ঘটতে পারে—সেইজন্য সুরু হলো আন্দোলন। সে আন্দোলনের হোতা হয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, গল্পদাদা এবং আরো অনেক মনিষী—তাঁদের সকলকে প্রণাম করি। আনন্দ এসে বাস্তব মূর্ত্তিতে দেখা দিল তোমাদের জীবনে। হাজার রকমের সুখ সুবিধা তোমাদের জীবনে এলো—কিন্তু সে সব কথা বলার জন্য এ খোলা চিঠি নয় আমার।

বার বার করে আমার খতিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, এতদিন ধরে কি দিলুম তোমাদের? কি পেলে তোমরা আমার কাছ থেকে? কি সান্ত্বনা নিয়ে যাবো? যদি দেখি তোমরা আমাদের মত জীবন যাপন

করছো, হাজার সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বেও, তোমাদের জীবনে নব নব বন্ধুর আবির্ভাব হলেও, তোমরা রয়েছ আমাদের মত ক্ষুদ্র সুখ আর অলীক কামনার কারাগারে বন্দী হয়ে, তা হ'লে লজ্জার আর দুঃখের আর কিছু আছে কি? আমাদের যুগে তবু সান্ত্বনা খুঁজে পাবার উপায় ছিল যে, কোনও দরদী বন্ধুর দেখা পাইনি, পাইনি এতটুকু আশার কথা। কিন্তু কি হবে তোমাদের সান্ত্বনা? কি দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদের বোঝাবে?

লজ্জা পাই যখন দেখি ছেলেরা মেতে রয়েছে সিনেমা নিয়ে আর মেয়েরা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদের রঙ-করা জাপানী পুতুল করে তোলার কাজে। দু'দিন দু'দশ বছর পরে দেখবো আমরা যে জীবন যাপন করেছি তোমরাও সেই জীবন যাপন করবে। বিদেশীর গোলামখানায় কেরাণীগিরি করবে, বাড়ী ফিরে এসে চীৎকার করবে বা শনিবারে ফুলকপি কিনে বাড়ী ফিরবে, চণ্ডীমণ্ডপে তেমনি করে বসবে, পরনিন্দা পরচর্চ্চার সভা, পানের ডিবে আর বাঁয়াতবলা অবসরের সঙ্গী হবে। কিশোর বয়সের সমস্ত স্বপ্ন ম্রিয়মান হয়ে যাবে, আশার পাহাড় যাবে ভেঙ্গে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে যত কিছু কল্পনার জাল। মেয়েরা হবে এই সব ঘরের ঘরণী, জাপানী রঙ তখন যাবে ছিন্ন হয়ে। হয়তো কেউ হবে—জজ, হাকিম পুলিশের বড়কর্ত্তা, মেয়েরা কেউ হবে তাদের গিন্নী। কিন্তু আজ দেশ যেমন কাঁদছে, দেশের জনসাধারণ যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘৃণ্য অবস্থায় আর কুব্যবস্থায় কাঁদছে, তেমনি তখনও এরা কাঁদবে—অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কাঁদবেন দেশমাতা, তোমার আমার সকলের মা। তোমরা বড় হলে, তোমরা আর তোমাদের দেশের জনসাধারণ আর তোমাদের দেশ আলাদা হয়ে পড়বে যেমন হয়েছে এমন। 'আমি ভাল থাকি, আমার পরিবারের সব ভাল থাকুক—এই ক্ষুদ্রতা, এই নিতান্ত স্বার্থপরতা আজ দেশকে একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করে রেখেছে, প্রত্যেকে চেয়েছে নিজের স্বার্থ বজায় থাক, নিজে ভাল থাকি। এই আত্মসর্ব্বস্ব বোধে দেশের ও দশের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ ও মঙ্গল বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অপরের প্রতি কোনও মমতা নেই বলে দেশ আজ মরতে বসেছে। তোমরাও কি আমাদের ধারাটাকে, গতানুগতিক পথটাকে, আত্মসর্ব্বস্ব বোধটাকে জীবনে সব চেয়ে বড় জায়গা করে দেবে?

অন্যে নিজেকে তৈরী করুক কেরাণীর কাজে, অন্যে হোক রংকরা জাপানী পুতুল—তোমাদের ভিতর থেকে এমন কি কেউ জাগবে না, উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেবে নাকি এদেশের জনসাধারণকে, অন্ধকারে মা যে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন, তাঁর দিকে কেউ কি ফিরেও তাকাবে না? কেউ কি বলবে না—

"আমরা শুধু অনুভব করিতে চাই যে, এদেশ প্রকৃতই আমাদের—আমরা যে একটা জাতি, তাহা আমরা বুঝিতে চাই, আমাদের যে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাও আমরা অনুভব করিবার কামনা রাখি। আমাদের আদর্শকে প্রকাশ করিতে চাই, অন্যান্য জাতির পার্শ্বে আমরাও দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি যে আমরাও একটা জাতি.....।"

কেউ কি বলবে না—?

"The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word tell like a thunder bolt.

Awake! Awake, great souls! The world is burning in misery, can you sleep?"

অপরের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে কারো কণ্ঠে কি ধ্বনিত হবে না?—

"একটী পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনও দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর। তাহাকে জানিতে দাও, মানুষ বলিয়া তাহার বাঁচিবার অধিকার আছে—এ জগৎ সংসার সে অবজ্ঞার অধিকারিণী নহে।"

নিজেদের দাবীকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কেউ কি বলতে পারবে না?.....

"আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে।"

কেউ কি স্পর্দ্ধাভরে একথা চারিদিকে প্রচার করতে পারবে না?.....

"জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন ভয়-হারী,
সাম্যের মহা সঙ্গীত নব গাহে মিলি নরনারী।
আমরা মানি না মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা
আমরা মানি না বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা।
মানি না গির্জ্জা, মাঠ মন্দির, কঙ্কি, পেগম্বর
দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর।"

মনে হয়, এদেশের প্রতিটি ঘর থেকে যদি একটি কিশোর দেশের কাজে, দেশ সেবায়, আন্তরিক ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে। সেই সুদিনের আশায় তাকিয়ে থাকবো—তখন সান্ত্বনা থাকবে তোমাদের মাঝে আমি একদিন খেলাঘর পেতেছিলুম—সেখানে যে শিক্ষা পেয়েছিলে তা বৃথা যায় নি। দেশ চায় জাতি চায় মানুষের মত মানুষ। বৃহত্তর সুখ স্বার্থের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার আহ্বান যদি আসে, সে ডাকে ক'জন সাড়া দেবে? যদি যাই যেন তোমাদের নবজন্ম দেখে যেতে পারি। তোমাদের কাছে আজ যে খোলা চিঠি পাঠালাম তার উত্তর তোমাদের জীবনের আশায়, আকাঙ্খায়, আন্তরিকতায়, ত্যাগে কর্ম্মে উচ্চারিত হয়ে ওঠে সেদিন জাতির নবজন্ম হবে। সেদিনের সূর্য্য উঠবে কবে তাকি তোমরা কেউ জানো? ইতি—

দিদিভাই

আগামী রংমশালে বিশেষ আয়োজন—

আষাঢ়—**বিশেষ যুদ্ধ** সংখ্যা
শ্রাবণ—**রবীন্দ্র-স্মৃতি** সংখ্যা
ভাদ্র—**গ্রাহকগ্রাহিকা** সংখ্যা

প্রতীক্ষায় থাকুন

নীলপদ্ম

অতুলচন্দ্র মাহাত

১

অন্ত বড় এক সদাগর। তাঁহার মত সদাগর সে যুগে ছিল না বলিলেই হয়।

এই সদাগরের চারিটি কন্যা ছিল। তন্মধ্যে ছোটটী বেশ শান্তশিষ্ট। তাহার নাম মীনু। মীনুর মত সুন্দরী মেয়েও আর ছিল না।

সদাগর একদিন বাণিজ্য যাত্রা করিবার সময় তাঁর চার মেয়েকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "মা তোমাদের যদি কিছু দরকার থাকে বল, এনে দোব।"

বড়মেয়ে অনেকদিন একটা হীরার আংটীর কথা ভাবছিল। সেইজন্যে সে বলিল, "বাবা আমার একটা হীরার আংটী চাই।"

মেজমেয়ে বলিল "বাবা আমার একটা হীরার ফুল চাই।"

সেজমেয়ে বলিল "বাবা আমার একজোড়া হীরার দুল চাই।"

তিন বোন যাহার যাহা দরকার বলিল কিন্তু মীনু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ সদাগর বলিলেন "মা তোমার কি দরকার বল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

মিনু কোন কথা বলিল না এবং কাঁদিতে লাগিল।

"এই কি করলে মা, বাণিজ্যে যাবার সময় কাঁদতে নাই। বল মা তোমার কি দরকার" সদাগর বলিলেন।

এইবার কোন রকমে কান্না থামাইয়া মীনু বলিল "তোমার যা ইচ্ছে।"

"আমার ইচ্ছেয় যদি আনতাম তবে তোকে জিগেস করতাম কেন মা? বল মা তোমার কি দরকার?" সদাগর আবার জিজ্ঞাসা করেন।

এইবারে মীনু বলিল, "আমার একটা নীলপদ্ম হলেই চলবে।"

"এই সামান্য জিনিষে কি হবে মা? তোমার দিদিদের মত ভাল জিনিষ বল।"

"না বাবা আমার ওতেই হবে।"

২

সদাগর বড় তিন মেয়ের জিনিষ অনেক দিন পাইয়াছেন। কিন্তু ছোট মেয়ের সেই সামান্য জিনিষটীই আজও মেলে নাই।

সদাগর নীলপদ্মের জন্য অনেক যায়গায় খোঁজ করিয়া অবশেষে এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে একটী নীলপদ্ম ঠিক সরোবরের মাঝখানে ফুটিয়া রহিয়াছে।

নীলপদ্ম দেখিয়া সদাগরের বড় আনন্দ হইল। ঐ নীলপদ্মটী তুলিবার জন্যে সদাগর একটী লোককে সরোবরে পাঠাইয়া দিলেন।

লোকটী যেমনি নীলপদ্মের কাছে গিয়া টান মারিল তেমনি কোথা হইতে এক অজগর সাপ আসিয়া লোকটীকে খাইয়া ফেলিল এবং তার পরে সদাগরের নিকটে আসিয়া বলিল, "সদাগর মশাই আমি আপনাকে খাইব।"

বৃদ্ধ সদাগর হাতযোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "দোহাই নাগরাজ আমাকে খাবেন না। আমাকে খেলে আমার ছোট মেয়ে কেঁদে মরে যাবে।"

"আচ্ছা খাব না, যদি আপনি আমার একটী কথা রাখেন," অজগর বলে।

"আমি আপনার কাছে তিনসত্য করে বললাম রাখবো, রাখবো, রাখবো।"

"বেশ শুনুন, আপনি বাড়ীতে গিয়ে যাকে সর্ব্বপ্রথম দেখবেন তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

সদাগর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ তিনি আগে সত্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

বড় দুঃখের বিষয়, বাড়ীতে আসিয়া সদাগর সর্ব্বপ্রথম মীনুকেই দেখিতে পাইলেন। কারণ মীনু বাবার আগমনের প্রতীক্ষায় দুয়ারে বসিয়াছিল।

মীনুকে দেখিয়াই সদাগর কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পরে সমস্ত কথা মীনুকে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া মীনু বলিল, "বাবা তোমাকে সে জন্য ভাবতে হবে না, আমি যাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া বাবার কাছে এবং দিদিদের কাছে বিদাই লইয়া মীনু বাহির হইয়া পড়িল।

৩

মীনু নাগরাজের কাছে পৌছিয়া দেখিল যে নাগরাজ খাইবার জন্য অনেক ফল জমা করিয়া রাখিয়াছে।

মীনু নাগরাজের কাছে যাইতে নাগরাজ মীনুকে খাইতে দিয়া নিজে খাইল।

খাওয়া শেষ হইলে মীনু নাগরাজকে বলিল, "নাগরাজ আপনি ত বড় ভাল কিন্তু কেন আবার বাবাকে ফল রেখেছিলেন?"

নাগরাজ বলিল "সেকথা পরে আসবে। এখন তুমি বল দেখি আমাকে বিয়ে করবে কিনা?"

মীনু বলিল "আপনি হলেন নাগরাজ, কিন্তু আপনার স্বভাব ত খুব ভাল, কাজেই আপনাকে বিয়ে করতে আমার আদৌ আপত্তি নাই।"

কথা শেষ হইবার পরই মীনু দেখিল যে সাপের যায়গায় এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজপুত্র বসিয়া আছে।

রাজপুত্র মীনুকে বলিল, "আমাকে এক ডাইনী সাপ করে দিয়েছিল, আর বলেছিল যবে কোন সুন্দরী কন্যা তোমাকে বিবাহ করতে মত দিবে তবে তুমি শাপমুক্ত হয়ে আবার রাজপুত্র হবে।"

তারপর একসঙ্গে মীনু ও রাজপুত্র সওদাগরের গৃহে আসিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। সওদাগর মেয়েকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এবং ধুমধাম করিয়া মিনুর সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন।

নূতন ধাঁধা

(একটি গ্রাহকের সৌজন্যে)

১

চরণপুরের এক সদাশয় দানী ব্যক্তির খেয়াল হ'ল, যে তিনি চরণপুরের সমস্ত বাসিন্দ
যারা জুতো পরতে চায় বা পরতে পারে তাদের সকলকে জুতো উপহার দিয়ে নিজেকে ধ
করবেন। এখন, চরণপুরে শতকরা ৫ জন বাসিন্দা হচ্ছে খঞ্জ (এক পদ বিশিষ্ট), বা
অর্দ্ধেক তারা খালি পায়েই থাকা পছন্দ করে। বলতো কতগুলি জুতো তাঁকে কিনতে হবে?

২

পৃথিবী নাকি গোল—তুমি যেখান থেকেই যাত্রা কর না কেন, আবার সেইখানে
তোমাকে ফিরতে হবে, অবশ্য উল্টো দিক থেকে। কিন্তু অনেকেই ফিরে আসেন না, কা
পথের মধ্যে অসুখ-বিসুখে তাঁদের মৃত্যু হয়, বা কোন দুর্ঘটনায় তাঁরা নিহত হ'ন, নয়তো কে
তাঁদের আজীবন আটকে রাখে অথবা তাঁরা স্বেচ্ছায় কোথাও আজীবন বসবাস করতে থাকেন
এক ভদ্রলোকের কিন্তু অসুখ-বিসুখে মৃত্যু হয় নি, কোন দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হ'ন নি, কে
তাঁকে আটকে রাখে নি, কোথাও গিয়ে তিনি বসবাসও করছেন না, কিছু না, অথচ তাঁ
ফিরতে দেখা গেল না। তাঁর খবর কি তা হ'লে বলতো?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও এই মাসের ধাঁধার উত্তর একসঙ্গে আগামী মাসে প্রকাশিত হবে

● রংমশালের শাখা-অফিস ●

আমাদের টালিগঞ্জের অফিসে আসা যাঁদের পক্ষে দূর হয়, সেই পুরাতন, নূতন ও ভা
গ্রাহক গ্রাহিকাদের সুবিধার জন্য সহরে রংমশালের দুইটি শাখা-অফিস নিম্নলিখি
ঠিকানায় খোলা হল। সহরের গ্রাহক গ্রাহিকারা এখানেও তাঁদের চিঠিপত্র চাঁদা ইত্যা
জমা দিতে পারবেন।—

১। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন (মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ, গোলদিঘীর নিকট
কলিকাতা। সময়ঃ বিকাল ৪টা থেকে ৬টা।

২। ইন্দিরা দেবী, ২৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (বহুবাজারের নিকট), তিনতলা। স
সকাল ৭টা থেকে ১০টা।

আমাদের টালিগঞ্জের অফিস রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত্রি
পর্য্যন্ত খোলা থাকে। শনিবার বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

—পরিচা

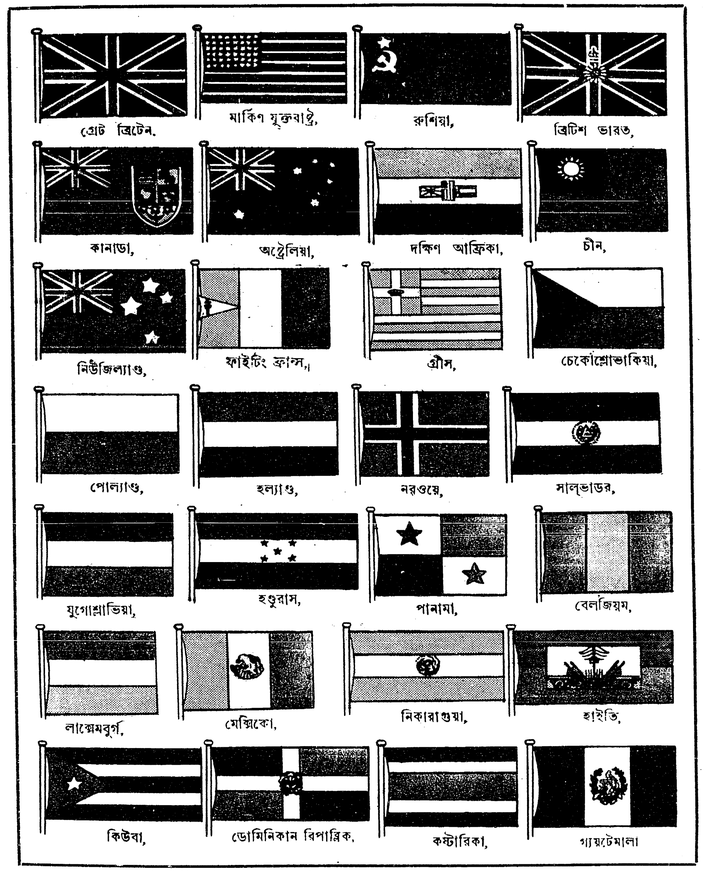

সম্মিলিত জাতির পতাকা

১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ]

রংমশাল
অষ্টম বর্ষ (৩)
আষাঢ় ১৩৫০

যুদ্ধ ও ভারত

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন

(১)

ভারতবর্ষ আজ যে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারই বিরাট পটভূমিকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করলাম রংমশালের এই বিশেষ সংখ্যাটির মধ্যে দিয়ে।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের স্থান কোথায় জানতে গেলে সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন কারা আমাদের সাথী, কারা আমাদের মিত্র এবং কারাই বা আমাদের শত্রুস্থানীয়। এবং এই যুদ্ধে আমাদের আদর্শ কী।

অনেকে বলেন ভারতবর্ষের কেউ শত্রু নেই এবং ভারতবর্ষও কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না। তাঁরা বলেন এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ স্ব-ইচ্ছায় যোগদান করে নি, ভারতবর্ষের নাম নিয়ে যে যুদ্ধঘোষণা করেছেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, ভারতের সম্মতি না নিয়েই। বৃটেনের যারা শত্রু তারাই যে ভারতের শত্রু হবে এমন কোনো কথা নেই।

কথাটা আংশিকভাবে সত্য। এবং সকল আংশিক সত্যের মত এই সত্যও সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

কথাটা আংশিক সত্য কারণ—

(১) বৃটিশ উপনিবেশগুলি—যেমন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি—স্ব-ইচ্ছায় এই যুদ্ধে যোগদান করেছেন। একটি বৃটিশ উপনিবেশ, আয়ার অর্থাৎ দক্ষিণ আয়র্লণ্ড, এখনও এ যুদ্ধে নামেন নি।

(২) এই যুদ্ধে রুশিয়া বৃটেনের মিত্র, এবং জাপান বৃটেনের শত্রু, তবুও এই দুই শক্তির মধ্যে এখনও বিরোধ বাধে নি। অর্থাৎ এখনও রুশিয়া জাপানের সঙ্গে, অথবা জাপান রুশিয়ার সঙ্গে, যুদ্ধঘোষণা করে নি।

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষের কেউ শত্রু নয় কিংবা ভারতবর্ষও কারো সঙ্গে বিরোধিতা করতে চায় না, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

তার কারণ, এই মহাযুদ্ধে দুটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাত লেগেছে। একটি নাৎসীবাদ, অপরটি গণতন্ত্রের আদর্শ। শেষ পর্য্যন্ত কোন্ আদর্শ জয়লাভ করবে, এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যদি নাৎসীবাদ জয়লাভ করে, অর্থাৎ ধরো যদি জার্ম্মাণী বা জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করে, তাহলে ভারতবর্ষের অবস্থা কী হবে অনুমান করা শক্ত নয়। ইয়োরোপের যে সকল দেশ আজ হিটলারের পদানত হয়েছে বা চীনের যে অংশ আজ জাপানের অধিকারভুক্ত হয়েছে তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে যে সকল খবর শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে কাগে এসে পৌঁছচ্ছে তা' থেকেই বোঝা যায় এই শত্রুর আসল স্বরূপটি কী।

তোমরা অনেকের কাছ থেকেই অনেক কথা শুনতে পাও, কিন্তু একটা কথা সবসময় স্মরণ রেখো যে একটা অসহায় দেশকে গ্রাস করবার অধিকার কোনো রাষ্ট্রেরই নাই। সে রাষ্ট্র সভ্যসমাজের শত্রু।

অপরপক্ষে মিত্রশক্তির আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই গণতন্ত্রের কী স্বরূপ হবে তার খানিকটা ধারণা করা যায় ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্টে স্বাক্ষরিত আটলান্টিক চার্টারের বিভিন্ন সর্ত্তগুলি থেকে এই চার্টার বা চুক্তিপত্রে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক মিঃ রুজভেল্ট অঙ্গীকার করেছেন এই যুদ্ধের অবশেষে তাঁরা গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি যাতে সর্ব্বত্র গৃহীত হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

অবশ্য এটা এখন পর্য্যন্ত আদর্শের পরিকল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ আছে। এই আদর্শ বাস্তবিক কার্য্যকরী হবে কি না নির্ভর করবে দুটি জিনিষের উপর। প্রথমতঃ যাঁরা আজ যুধ্যমান দেশগুলিকে এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করছেন তাঁদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপর। দ্বিতীয়তঃ, যাঁদের সম্মুখে এই আদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছে তাঁদের সেই আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করবার শক্তির উপর।

এখন দেখতে হবে এই দুই আদর্শের মধ্যে—নাৎসীবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে—ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে গ্রহণ করবে এবং কাকে বর্জ্জন করবে।

(২)

এ কথা সত্যি যে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায়, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এ যুদ্ধে যোগদান করে নি। তার কারণ যুদ্ধঘোষণার কালে এদেশে কোনো জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ছিল না, এবং যুদ্ধনীতির উপর দেশের জনসাধারণের কোনো হাত ছিল না। এখনও নেই। এই প্রশ্নই দেশের লোককে আজ গুরুতরভাবে বিচলিত করেছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে আজ যদি ভারতবর্ষে

[illegible]তীয় গবর্ণমেণ্টও থাকতো, তারা কি আজ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকতো? আজ যে [illegible]শর জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন তার কারণ এ নয় যে এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকলে তাঁরা [illegible] যুদ্ধে নিরপেক্ষ হয়ে থাকবার সুযোগ পেতেন, তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এজন্য যে তাঁরা এই যুদ্ধে [illegible]রো ব্যাপকভাবে, আরো ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করবার মত অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না তাই। [illegible]জেই আজ যদি আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট থাকতো, আমরা এই আদর্শের বিরোধে আজ [illegible]শ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারতাম না, বেছে নিতে হোতো এই দুটি আদর্শের মধ্যে একটিকে। এবং [illegible]দের মধ্যে আমরা কোন্‌টিকে গ্রহণ করতাম তা বোধ আর বলে দিতে হবে না। আমরা বেছে [illegible]তাম গণতন্ত্রের আদর্শকে।

এই আদর্শের মূল্য কী?

এই আদর্শের মূল্য এই যে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার [illegible]দর্শের উপর। এই রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার থাকে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের [illegible]র, তাঁরাই জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের সমাধান করেন, তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন, [illegible]দের গৃহীত নীতি-অনুসারে যাতে রাষ্ট্রের কার্য্যনির্ব্বাহ হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। এই স্বাধীন [illegible]পস্থার ফলে দেশের নিজস্ব-প্রতিভার স্বতঃ-স্ফূরণ হয়, মানুষের আত্মা সার্থকতা লাভ করে।

অপরপক্ষ নাৎসীবাদের মূল নীতি, এক-নায়কত্ব, যাকে আমরা ডিকটেটরসিপ বলি। [illegible]ষ্ট্রের চরম পরিচালনার ভার থাকে সেই একক নায়কের উপর, কারণ তিনি দাবী করেন যে [illegible]নিই সমগ্র রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিভূ। তিনি এবং তাঁর দল তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন স্বাধীন [illegible]লোচনার মধ্য দিয়ে নয়, প্রতিপক্ষকে নির্দ্দয় ও নির্ম্মমভাবে দমন করে। আর এই দমনকার্য্যে [illegible]য়তা করে নাৎসীপার্টির গুপ্তচর, গুপ্তপুলিশ এবং অবশেষে দেশের সৈন্যবাহিনী। এইরূপ রাষ্ট্রের [illegible]ক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা সব সেই একনায়কত্বকে পরিপোষণ করতে বাধ্য হয়, এবং যাঁরা এই নীতি [illegible]স্বীকার করেন তাঁদের নির্ব্বাসন হয়, নয়ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তোমাদের মধ্যে অনেকেই [illegible]নো বোধ হয় যে আইনষ্টাইনের মত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিককেও তাঁর নিজের দেশ জার্ম্মাণী থেকে [illegible]তাড়িত হতে হয়েছে।

কাজেই বুঝতে পারছ যে যখন এই দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শের বিরোধ লাগলো [illegible]খন যাঁরা পৃথিবীর—মানুষের—কল্যাণ চান, তাঁদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব হোলো [illegible]। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ সেদিন স্বাধীন থাকলে আমাদের দেশবাসীরাও পৃথিবীর অন্যান্য [illegible]ণতান্ত্রিক দেশবাসীদের মত অপার উৎসাহে, তাদের সমস্ত শক্তি পূঞ্জীভূত করে', স্বাধীনতার [illegible] শত্রু নাৎসীবাদের উচ্ছেদের জন্য এই বিশ্ব-ব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করতো। এ কারণ ছাড়াও, [illegible]রতবর্ষ যে নিরপেক্ষ থাকতে পারতো না, তার প্রধান কারণ এই যে প্রাচ্যের প্রধান ফ্যাসিষ্ট [illegible]ক্তি জাপান তার "নূতন এশিয়া" সংগঠনের পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে করুণাপরবশ হয়ে বাদ

দিতে পারতো না, যে কারণে মাঞ্চুরিয়া তার কুক্ষিগত হয়েছে, যে কারণে স্বাধীন চীনের সবচেয়ে দামী অংশ তার অধিকারভুক্ত হয়েছে, তার চেয়েও গভীরতর কারণে ভারতবর্ষের দিকে তার নেকনজর পড়তই। এবং ছলের অভাব হোতো না। ভারতবর্ষের ইচ্ছা থাকলেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারতো না।

কাজেই আজ যে ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করেছে তার গ্লানি এই যে সে স্ব-ইচ্ছায় এই যুদ্ধে যোগদান করেনি, তার গ্লানি এ নয় যে সে এ যুদ্ধে স্ব-ইচ্ছায় যোগদান করতো না। এইজন্যই দেশের লোকেরা চাচ্ছেন যে যুদ্ধকালেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে' ঘোষণা করা হোক যাতে ভারতের যোদ্ধারা জানে যে এটা তাদের 'আজাদী লড়াই'। কিন্তু সে হোলো উচ্চ রাজনীতির কথা। তোমাদের যাঁরা বড়ো, যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। রংমশালের পৃষ্ঠায় তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। আমাদের শুধু দ্রষ্টব্য এই যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে এ যুদ্ধে যোগদান করলেও ভারতবর্ষ তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে যাতে স্বাধীনতার আদর্শ নাৎসীবাদের আক্রমণে একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়। এই আদর্শের জন্য সে প্রাণ দেবার আহ্বান পেয়েছে, তার অগণিত নরনারী অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করবার নির্দ্দেশ পেয়েছে। ভারতবর্ষ আজও তার স্বাধীনতা পায়নি এ কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে চক্রশক্তি যদি আজ এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তা হলে ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণতার দিন হয়ত বা আরো কয়েক শত বৎসর পিছিয়ে যাবে। অপরপক্ষে মিত্রপক্ষে জয়লাভ করলে যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী যে আর অস্বীকার করা যাবে না সে কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তখন বিশ্বশক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হবে, এবং সেই গুরুভার দায়িত্ব নেবে তোমরাই, দেশের অগ্রণী তরুণদল, যাদের হাতে রংমশালের এই সংখ্যাটি উৎসর্গীকৃত হোলো।

(৩)

ভারতবর্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বলে এই প্রসঙ্গের শেষ করবো। যুদ্ধপ্রচেষ্টার দুটো দিক আছে—একটি সামরিক, একটি বে-সামরিক। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যারা লড়াই করতে যায় তারা হোলো সামরিক দিক। যারা ঘরে থেকে গৃহরক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োগ করে তারা হোলো এই যুদ্ধের বেসামরিক দল। সামরিক যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতের দান কম নয়। আজ সমগ্র বৃটিশ উপনিবেশগুলির যত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। মধ্যপ্রাচ্যে এবং উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক অশেষ গৌরব অর্জ্জন করেছে। বর্ম্মা এবং মালয়েও ভারতীয় সৈন্যরা তাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়েছে। মার্কিন জেনারেল আইসেনহাওয়ার উত্তর আফ্রিকার ভারতীয় সৈন্যদের সম্বন্ধে বলেন—"আফ্রিকায় যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের বীর সৈনিকদের সহায়তা পেয়ে আমরা বাস্তবিক গৌরবান্বিত হয়েছি।" ভারতের চতুর্থ সৈন্যবাহিনী কীর্ত্তির উল্লেখ করে জেনারেল আলেকজাণ্ডার বলেন, "চতুর্থ ভারতীয়

বাহিনী এই বিজয়লাভে যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে তার জন্য ভারতবর্ষ সত্যই গৌরব ব. করবে।" এই প্রশংসায় সত্য সত্যই আমরা গৌরব অনুভব করি। শুধু সৈন্যবাহিনী গঠন নয় সামরিক শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য দিয়েও ভারতবর্ষ আজ মিত্রশক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে।

কিন্তু বে-সামরিক সমরপ্রচেষ্টাতেও ভারতের কাজ কম নয়। দেশের নৈতিক বল, বা "মোরাল্" বলে, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এর জন্য একদিকে যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিষেধক সকলপ্রকার ব্যবস্থা ও সতর্কতা অবলম্বন করা, তেমনই চাই র সম্ভব জাতির সাধারণ জীবনযাত্রায় কোনরূপ অন্তরায় হতে না দেওয়া। এটা শুধু স্থানীয় মেণ্টেরই কাজ নয়, দেশের লোকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। যেমন ধরো পড়লেই যে ছত্রভঙ্গ হয়ে' ইতস্ততঃ পালাতে হবে এমন কোন কথা নেই। যখন নির্দ্দেশ হবে, দলবদ্ধ হয়ে' সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করে' আক্রান্ত স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। এখন যা যুদ্ধের পরিস্থিতি, তাতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল আর পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই আশা হয়। উত্তর আফ্রিকার বিজয় অভিযান ও মিত্রশক্তির বিবর্দ্ধমান শক্তি এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে। তবে বিপদ এখনও হয়ে আছে।

আর সব চেয়ে বড়ো কথা, এই বিপদে দেশের তরুণদলকে অগ্রণী হতে হবে। দেশকে য়ে নিয়ে যাবার ভার তাদেরই। অনাগত ভবিষ্যৎ তাদের ডাক দিয়েছে। রাজনীতির দলাদলি ভুলে, দায়িক ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে', ভাই বোন এক হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আজ ভারতীয় সৈন্য পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যে বীরত্বের গাথা করছে, তারই ধ্বনি জাগিয়ে তুলতে হবে সকলের কণ্ঠে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যে আদর্শের আমাদের ভাইরা জীবনদান করছে সেই আদর্শের বেদীতে, দেশমাতৃকাকে। সেই জাতীয় সঙ্কল্পকে লে চলবে না। বিশ্বের অস্ত্রঝঞ্ঝনার বাইরেও যে যুদ্ধ আমাদের সমাজের চতুর্দ্দিকে চলছে, জীবনব্যাপী আহ্বান আমাদের শক্তিকে স্পর্দ্ধিত করছে, সেই যুদ্ধের জন্য দেহকে ও মনকে প্রস্তুত ত হবে। এই প্রস্তুতি কার্য্যে সহায় হোক দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস, কারণ ঐখানেই আছে তীয় জাতির নিজস্ব সত্ত্বা। মনে রেখো স্বাধীনতা বিদেশী পণ্য নয়। অটুট স্বাস্থ্য, দৃঢ়চিত্ততা, ম, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা—আজ আমাদের জাতীয় উপাদান হোক। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দের শত্রু হোক। জাতীয় কলঙ্ক আমাদের প্রত্যেকের মনেই গ্লানি জাগিয়ে দিক। য় গৌরব আমাদের প্রাণে উদ্দীপনা দিক অসম্ভবকে সম্ভব করবার।

যে জাতীয় আত্মা ষ্টালিনগ্রাদকে বাঁচিয়েছে, ইংলণ্ডকে জার্ম্মাণ-ব্লিৎস্‌ক্রিগের হাত থেকে করেছে, অনুরূপ জাতীয় আত্মা আমাদের অনুপ্রেরণা দিক ভবিষ্যতের দুর্গম পথে। সে ভবিষ্যৎ আর অনির্দ্দিষ্ট নেই, তোমায় আমায়, সকলকে, আজ সে ডাক দিচ্ছে।

মরুর বুকে শ্যামল কুঞ্জ

[উত্তর-আফ্রিকার মহাযুদ্ধে তুনিসিয়া বিজয়-অভিযানের কথা সেদিন আমরা সকলেই শুনলাম। রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে এই দেশটি তার পূর্ব্বপরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ফিরে পেয়ে যেন নিশ্চিন্ত এবং মিত্রশক্তি ইউরোপ আক্রমণের এই প্রথম সব চেয়ে বড় সুযোগ পেল।

এই যুদ্ধ আমাদের অনেক জিনিষ শেখাচ্ছে, তাদের মধ্যে আমরা অনেক অনেক দেশের অনেক পাচ্ছি ও সেই সব দেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল ও জ্ঞান বাড়ছে। আমরা আবার ইতিহাস ভূগোলের উল্টে নতুন দৃষ্টিতে সেই সব দেশ যেন নতুন করে জানছি। জানবার মত তুনিসিয়া সেই রকম আশ্চর্য্য দেশ।

তুনিসিয়া উত্তর-আফ্রিকার একটি দেশ। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি, এর দক্ষিণে বি সাহারা মরুভূমি। এর পূবে আলজিরিয়া, পশ্চিমে লিবিয়া। প্রায় হাজার মাইলব্যাপী এর তটরেখা। ছিদ্র প্রণালী ও সুয়েজখালের মাঝামাঝি এর অবস্থান এবং ভূমধ্যসাগরকে পূব-পশ্চিম দুভাগে ভাগ করেছে। দেশটির ভৌগলিক অবস্থান তাই লক্ষ্য করবার মত এবং এজন্য তুনিসিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তুনিসিয়া প্রাচীনকাল থেকে দেশবিদেশের নানাজাতি, নানা যাত্রী, বণিক ব্যবসায়ী প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর ইতিহাসে আজ আবার এক নতুন পাতার যোগ হ'ল।]

দিনের শেষে ক্লান্ত প্যাসেঞ্জার-বোট শ্বেত-আফ্রিকার তুনিস বন্দরের জাহাজঘাটায় নোঙর ফেলে। মাস্তুলের দোলা থেমে যাবার আগেই যাত্রীদের নিঝুম মনগুলি এক বিস্ময় আবেশে সজীব হয়ে ওঠে। তাদের চোখের সামনে চকিতে এক বিচিত্র দেশের প্রাণ রূপ হয়ে ওঠে। রক্তবর্ণ ফ্ল্যামিংগো পাখীর ঝাঁক সূর্য্যাস্তের বিষণ্ণ আলোকে তুনিস উপসাগর চূর্ণ জলের ঢেউ নীচে ফেলে অবাধ আনন্দে ডানা মেলে উড়ে চলে যায় নলখাগড়ার বন দিকে। যাত্রীর চোখে তুনিসিয়ার এই যে প্রথম ছবি ধরা পড়ে, তা সহজে ভোলা যায় না।

তারপর তুনিস বন্দরের পথ, পার্ক আর বুলেভার। নানা জাতির নানা মানুষের ভী ইহুদী, মল্টীজ, আরব, ইতালীয়, ফরাসী ও মুরগোত্রজ নরনারী। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্য্যন্ত জাহাজঘাটার ধোঁয়াটে আকাশে নানা রাষ্ট্রের জাতীয় নিশানের ইসারা খেল থাকে। আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে পথিকের মন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়বে—এখা আতর বাজার। এক মহাদেশের কোটি গুলাব-চামেলীর আত্মনিবেদন এইখানে বাতাসে সুরভিত আবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এক ঐতিহাসিক নগরীর দেহসৌরভে পথিকের মন বিহ্ হয়ে পড়ে। আতরওয়ালারা সবাই প্রাচীন মুর অভিজাতদের বংশধর, এদেরই পূর্ব্বপুরুষ একদি য়ুরোপীয় স্পেনকে শাসন করেছিল। তারপর ঘটনার বৈগুণ্যে এদের ভাগ্যে পরাজয়ের গ্লা

হয়, মুর-অভিজাত গোষ্ঠী স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়। বিদেশী যাত্রীদের সঙ্গে একটু আলাপ হবার পর কোন কোন আতরওয়ালা বহু যত্নে ও সঙ্গোপনে রক্ষিত একটি নিদর্শন চে দেখিয়ে দেয়—একটি মরচে পড়া লোহার চাবি। —কি বস্তু এটা ?

বিদেশী পর্য্যটক বা পথিক কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে। আতরওয়ালা একটা ভারিক্কি কেশে নিয়ে উত্তর দেয়—স্পেনে আমাদের যে কেল্লামহল ছিল, এটা তার ফটকের চাবি। মুর আতরওয়ালা! সে জানে না যে, সেই কেল্লামহলের গাঁথুনি ভেঙে পাথরের াজ স্পেনের মাঠেঘাটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই মুরকেল্লার ফটকের খিলানের পাথর শতাব্দীর স্পেনের জনতার পদভারপীড়িত কোন সড়কের গায়ে গাঁথা হয়ে আছে!

তুনিসিয়ার ইতিহাসেও এই কাহিনী। বিদেশী আক্রমণ, শাসন, অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের া তুনিসিয়ার বেলেপাথরের রূপ মাঝে মাঝে বদ্‌লে দিয়ে গেছে।

মুসলমানদের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কাইরওয়ান তুনিসিয়ার একটি সহর। অনেকে সহরকে 'আফ্রিকার মক্কা' আখ্যা দিয়ে থাকেন। এক রুক্ষ তেপান্তরের মাঝখানে ধর্ম্মপ্রাণ ওয়ান তার গম্বুজ ও মিনারের শোভা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ শত শত তীর্থযাত্রীর ভান হ্রদের কিনারায় এসে আরামের ডেরা বাঁধে। কিন্তু যাত্রীদের অনেকেই হয়তো জানে বহু বর্ষ পূর্ব্বে, ৬৭০ খৃঃ অব্দে, ওকবা নামে এক মুসলমান সেনাপতি এই পথে আশ্রয়ের ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিন্তু সেদিনের এই প্রান্তর আজকের মত শ্যামশষ্পহীন ছিল না। ছিল ঘন অরণ্যের সমারোহ। সেনাপতি ওকবা সেই অরণ্যের এক স্থানে তাঁর বল্লম দিয়ে সৈনিকদের কাছে ঘোষণা করলেন—'এইখানে তোমাদের কাইরওয়ান' (বিশ্রামস্থান)। সহরের প্রতিষ্ঠা বহু শত বৎসর আগে এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

কাইরওয়ান সহরের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর একটি সভ্যতার পতনের দুঃখকর কাহিনী আছে। আরব অভিযানের সার্থক কীর্ত্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল এই সহর। রোমানদের বেশ ও সহরগুলি আরব অভিযানের প্রকোপে চূর্ণ হয়ে যায়। সেই সব পেগান স্থাপত্যের দিয়ে ইসলামীয় কাইরওয়ান গড়ে ওঠে। আধুনিক তুনিস সহরের তিন মাইল দূরে কার্থেজের শ্মশান এখনও পড়ে আছে। আজ তুনিসের সুউচ্চ মিনার থেকে মুয়েজ্জিনের ধ্বনি বিধ্বস্ত কার্থেজের বাতাসে যুগান্তক পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা শুনিয়ে যায়।

এই হলো তুনিসিয়া—দক্ষিণে তৃষ্ণার্ত্ত সাহারার মরুবেলা ও উত্তরে ভূমধ্যসাগরের স্মিত উচ্ছ্বাস। মাঝখানে এক বিচিত্র ওয়েসিসের মত ইতিহাসের রোমান্স গিয়ে রঙীন য়া দেশ। তুনিসিয়া এতদিন ফরাসী রাষ্ট্রের আশ্রিত রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের চক্রে তুনিসিয়া রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তির অভিযানের রথ ার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। ১৯২৬ সনের গণনা অনুসারে তুনিসিয়ার অধিবাসীদের

সংখ্যা হলো ২১৫৯৭০৮। এর মধ্যে মুসলমান প্রায় ১৯৩২১৮৪। বাকি কয়েক লক্ষ য়ুরোপীয় ও ইহুদী। মুসলমানদের বেদুইন সভ্যতার হাওয়া এখনও তাঁবুতে বাস করে তুনিসিয়ার বড় বড় সহরগুলির নাম—তুনিস্, সুসা, বিজের্তা, কাইরওয়ান ও বেজা। তুনিসিয়ায় আর এক ধরণের জনপদ আছে। এগুলি ঠিক সহর নয়—প্রকাণ্ড গ্রাম বলতে পারা যায় জনসংখ্যায় এই সব গ্রাম্য জনপদগুলিও উল্লেখযোগ্য।—মসাকেন, মোকনিন ও বগলা কেবিরা তারপর আছে ওয়েসিস বা মরুদ্যান বসতি। যথা—কাবেস, মাফ্তা, এল হাম্মা, গেরবা প্রভৃতি।

১৮৮১ খৃঃ অব্দে তুনিসিয়া ফ্রান্সের প্রতিভূস্বরূপ একজন রেসিডেণ্ট জেনারেল ও দে বে—এই দুজনের সম্মিলিত প্রতিভা দেশের শাসন নিয়ন্ত্রিত করে।

কৃষির ব্যাপারে তুনিসিয়া খুবই উন্নত। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে গম, বার্লি, যব, মক ও শুঁটি হলো প্রধান। ইতালীয় চাষীদের উদ্যোগে আঙুরের ক্ষেতের প্রসার খুবই বে পূর্ব্ব-তুনিসিয়াকে জলপাইকুঞ্জের দেশ বলা যেতে পারে। তা ছাড়া, মরুদ্যানগুলি অজস্র খে উৎপন্ন করে।

পশুপালনে তুনিসিয়া কম যায় না। গরু, ঘোড়া, গাধা, উট, শুয়োর, ভেড়া ও ছা পালিত পশুদের মধ্যে প্রধান। পশুসম্পদে তুনিসিয়া খুবই সম্পন্ন। তুনিসিয়ার মাছধরা ব্যবসা ১৫ হাজার জনের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। উপকূলভাগে স্পঞ্জ-ধরার ব্যবসা ব্যাপকভাবে চলে।

খনিজ সম্পদের মধ্যে তুনিসিয়াতে ফস্ফেটের ভাণ্ডার বোধ হয় অফুরন্ত। লোহার আক প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান এবং গুণেও উৎকৃষ্ট।

তুনিসিয়ার স্বাধীন শাসক ষষ্ঠ মহম্মদ ১৮৮১ সালে ফ্রান্সের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বা করে ফরাসী রাষ্ট্রের আশ্রিত হয়। ১৮৮৩ সালে বে ষষ্ঠ মহম্মদের ভ্রাতা চতুর্থ আলি 'বে' প প্রতিষ্ঠিত হন। তুনিসিয়ার শাসন নিয়ে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ, ইতালীয় ও তুর্ক রাষ্ট্রে মাঝে মাঝে মন-কষাকষি চলতো। মাঝে মাঝে দেশের ভেতরেই অভ্যুত্থান হয়েছে। গ মহাযুদ্ধের সময় একজন তুর্ক নেতার নেতৃত্বে ফেজ্জান নামে উপজাতীয়দের বিদ্রোহ হয়। ফরা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষের পর বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর থেকে তুনিসীয়দের মনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারবো জেগে ওঠে। ১৯২২ সালে এই দাবী এক-কিস্তি পূর্ণ করা হয়—জেনারেল কাউন্সিলের মধ্যে ৪৪ ফরাসী ও ১৮ জন দেশীয় সদস্য মনোনীত হয়। ১৯২৪-২৫ সাল থেকে তুনিসিয়াতে জাতী আন্দোলন খুব প্রবল হতে থাকে। এর সঙ্গে সাম্যবাদী আন্দোলনও যুক্ত হয়। সহরগুলি বিক্ষোভ চলতে থাকে। ১৯২৫ সালের শেষে আর এক কিস্তি অধিকার দেওয়া হয়, অর্থা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করে কিছুটা ক্ষমতা দেশীয়দের হাতে দেওয়া হয়।

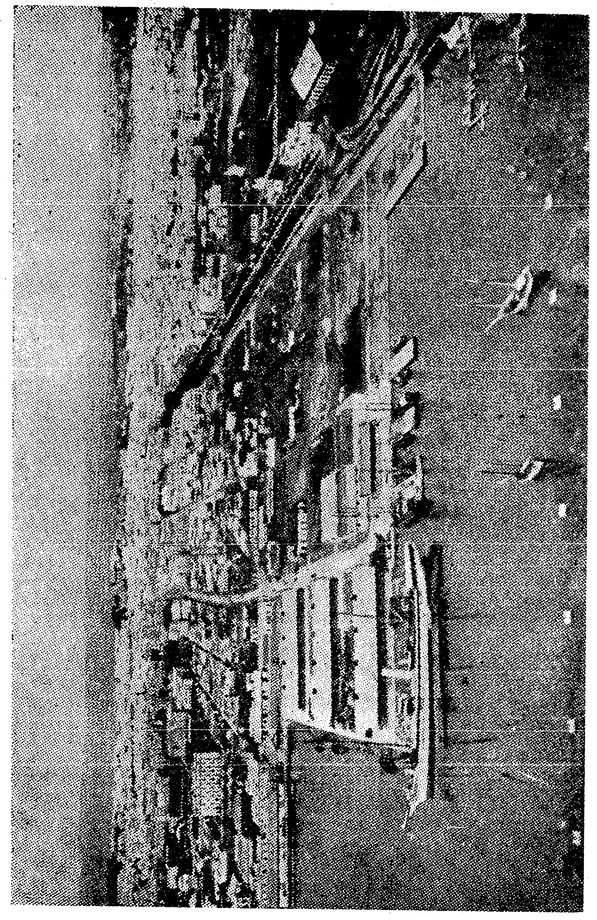

উপর হইতে তিউনিসবন্দরের দৃশ্য

১০০ পৃষ্ঠার সম্মুখে]

*

ভারতীয় সৈন্যরা তিউনিসিয়ার স্‌ফাক্স অঞ্চলে ফরাসী বাসিন্দার সহিত আলাপ পরিচয় করছেন।

*

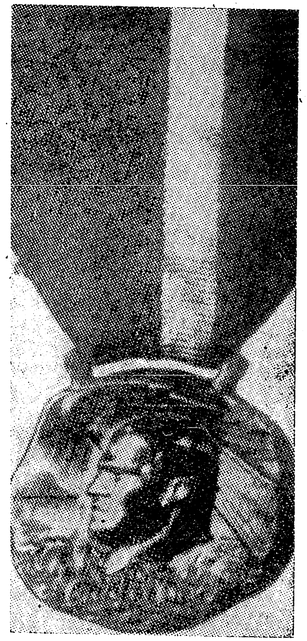

ইতালীর একছত্র ডিক্টেটর মুসোলিনী মহাশয় আফ্রিকা যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয়ের পূর্বে সাম্রাজ্য বিস্তারের বিস্তর রঙীন স্বপ্ন দেখতেন।

মুসোলিনী তাঁর সৈন্যদের কাছে সগর্ব্বে বলতেন, তাঁর বীরব্যঞ্জক মূর্ত্তি-মার্কা মেডেল (চিত্র দেখ) গলায় পরে তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য কায়রো সহরে সগৌরবে প্রবেশ করবে।

মুসোলিনীর সাম্রাজ্য বিস্তারের এমনি বিস্তর স্বপ্ন হায় আজ সমস্তই ভেঙ্গে-চুরে গেল। উত্তর আফ্রিকায় ইতালী সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর এক নতুন স্বাধীন দেশ গড়ে উঠছে।

এখন মুসোলিনী মহাশয় নিজের মেডেল নিজেই গলায় ঝুলিয়ে না আত্মহত্যা করেন।

আফ্রিকার যুদ্ধ

শ্রীগোপাল হালদার

যুদ্ধ আজ পৃথিবী জোড়া, আফ্রিকার যুদ্ধ তারই একটা বড় ঘটনা। একটা মহাদেশের এক দিক থেকে আর দিক পর্যন্ত তার ক্ষেত্র রচনা হয়েছিল। সে হিসাবে সত্যই আফ্রিকার যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল বিশাল। অবশ্য সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে এ যুদ্ধকে তত বিপুল বলা চলে না। মিঃ চার্চিল সেদিন এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—টুনিসিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তির লড়াই হয়েছে চক্র-শক্তির ১৫ ডিভিসান সৈন্যের বিরুদ্ধে। আর এক সোভিয়েট দেশেই সোভিয়েট সৈন্যরা লড়ছে ১৯০ ডিভিসান জার্মান্ সৈন্য ও আরও ২৮ ডিভিসান্ অন্যান্য চক্রশক্তির সৈন্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু ঠিক এই ভাবে দেখলেও 'আফ্রিকার যুদ্ধের' খাঁটি হিসাব পাওয়া যাবে না। প্রথম একটা কথা, কোনো যুদ্ধক্ষেত্রকে সমগ্র যুদ্ধের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়। কারণ, যুদ্ধকে এভাবে ভাগ করাটা ভুল। আফ্রিকার যুদ্ধে হিট্‌লার জিতলে, তার পক্ষে সুয়েজখাল দিয়ে এশিয়ার দিকে আসা সম্ভব হত, পশ্চিম দিকে ডাকারের তীর থেকে আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকাকেও আঘাত করার সুযোগ হত। আর আফ্রিকায় হারাতে এখন হিট্‌লারের পক্ষে ইতালি, ফ্রান্স, গ্রীস ও বলকান দেশ দখলে রাখাই চিন্তার বিষয় হয়েছে, ভূমধ্য সাগরে মিত্রশক্তির গতায়াতে আর বাধা দেওয়াও সম্ভব হবে না। অবশ্য আফ্রিকার যুদ্ধের এমনিতর ছোট বড় আরও অনেক ফলাফল আছে—কোনোটা নিছক যুদ্ধের হিসাব, কোনোটা যুদ্ধের সুযোগ-সুবিধার হিসাব, কোনোটা যুদ্ধের রাজ-নীতিক দিকের হিসাব। যেমন টুনিসিয়ায় চক্রশক্তির ২॥০ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য বন্দী করা মানে যুদ্ধের হিসাবে সব চেয়ে বড় কথা। আবার, টুনিস্, বিজার্টা মিত্রশক্তির হাতে আসায় আজ সিসিলি, সার্দিনিয়া, ইতালি, ফ্রান্সে মিত্রশক্তির পক্ষে বিমান আক্রমণের সুযোগ হল, ইয়ুরোপে মিত্রশক্তির অস্ত্রপ্রেরণের সুবিধা হল, ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির জাহাজ চলাচল সহজ হল ইত্যাদি। এসব হল যুদ্ধের সামরিক সমাবেশের হিসাব। তা ছাড়া যুদ্ধেরও রাজনীতিক হিসাব আছে। যেমন মিত্র-শক্তির এই জয়ে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী স্বাধীনতা-কামীদের একটা সুদৃঢ় কেন্দ্র লাভ হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের ভিতরে, নরওয়ের ভিতরে দেশপ্রেমিকরা হিট্‌লারের হাত থেকে মুক্তির আশায় উদ্যুক্ত হয়ে উঠলেন। আর স্পেন ও তুরস্ক পর্যন্ত ক্রমেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, ফ্যাসিস্তদের আর জয়লাভের সম্ভাবনা নেই। এই সব কারণে আবার পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধেরও হিসাব বদলে যাবে। আফ্রিকার যুদ্ধকে ঠিকমত বুঝতে হলে তাই পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধের কথা মনে রাখতে হবে, আর তারই একটা অংশ হিসাবে দেখতে হবে এই মহাদেশের যুদ্ধকে।

প্রথম চার অঙ্ক

কিন্তু 'আফ্রিকার যুদ্ধের' প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য এইখানেই মনে রাখা দরকার। আফ্রিকা একটা মহাদেশ—উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের তীর ছেড়ে তুপা এগুলেই মরুভূমি। লোকজন

নেই, চলাচলের পথ-ঘাট নেই। এখানে রুশদেশের মত বিপুল সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চলতেই পারে না। আফ্রিকার যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, সৈন্যদলের জন্য সরবরাহ ঠিক মত বজায় রাখাই এইখানে দায় হয়। এবার এই মে মাসে এই যুদ্ধের পঞ্চমাঙ্ক শেষ হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে চার অঙ্ক জুড়ে এই সমস্যারই আমরা পরিচয় পেয়েছি। তখন ইতালি থেকে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে 'সিসিলির খালে' চক্রশক্তি সৈন্য পারাপার করত, মাল পারাপার করত। তাতে বাধা পড়লেই হত, তার টান। আবার,সুয়েজের পথে ব্রিটেন সৈন্য পাঠাত, মাল পাঠাত। তাতে টান পড়লেই হত তার পরাজয়। যাকে 'মরুভূমির যুদ্ধ' বলা হয়, এইটাই ছিল তার মূলের সত্য। সৈন্য সামন্ত মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র রসদ ঠিক মত যে যখন জুগিয়ে তার সৈন্যদের সবল করেছে, সে-ই তখন জিতেছে।

আফ্রিকার এই "মরুভূমির যুদ্ধের" প্রথম চার অঙ্ক এইরূপই চলে। আফ্রিকাতে যুদ্ধ শুরু হয় ফ্রানস হেরে গেলে এবং ইতালি জার্মানির সঙ্গে যোগ দিলে। তখন মনে হল,—ব্রিটেনের ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথ তো এবার বন্ধ হলই, মাল্টায়ও সে আর টিক্‌তে পারবে না; আর মিশরেও তার অবস্থা সঙ্গিন হবে, সুয়েজ খালেও হয়ত ইতালি এসে হানা দেবে; হয়ত ব্রিটেনের 'ভূমধ্য রণতরীর বহর' আটকা পড়বে। এক কথায় আশঙ্কার শেষ ছিল না। ইতালি অনেক দিন ধরে শ্যেন দৃষ্টিতে 'এসবের ওপর' তাকিয়ে আছে—এবার ছোঁ দেবে। তার হাতে এদিকে লিবিয়া, ওদিকে আবিসিনিয়া-ইরিট্রিয়া; অনেকদিন থেকে লিবিয়ায় সে সৈন্যবল জমিয়েছে, ওদিকে ভারত-মহাসাগরের তীরে মাসোবায় জাহাজের আড্ডা গাড়ছে। অন্য পক্ষে, ব্রিটেন তো সর্বত্রই তখন যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত। অস্ত্রশস্ত্র লোকজন নেই, মালপত্র নেই; যুদ্ধে সে একা, গৃহেই তার জার্মানির বিমান দিন রাত হানা দিচ্ছে; সাম্রাজ্যে আর সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবে কি?

এই যখন অবস্থা তখন ব্রিটেনের সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল ওয়াভেল, আর ইতালির সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি। ওয়াভেলের হাতে ছিল নাকি হাজার ২০ ফৌজ, আর গ্রাৎসিয়ানি ৩ লক্ষ সেনার মালিক। প্রথম দিকে ওয়াভেল তো পিছিয়ে এসে মিশরের সীমান্তে মেরসা মেট্রুতে কয় মাস অপেক্ষা করলেন। ইতালি কিন্তু বিশেষ নড়ল-চড়ল না। তার সুসময় বয়ে গেল। ১৯৪০ ডিসেম্বর ওয়াভেলই আরম্ভ করলেন অভিযান। এই প্রথম অঙ্ক শুরু হল। বলতে গেলে এই অঙ্ক শুরু হল সিদি বারানিতে আমাদের ভারতীয় সৈনিকদের দুর্ধর্ষ বীরত্বে। আর এই অঙ্ক শেষ হল দু'মাস পরে ওয়াভেলের বেনগাজী অধিকারে। ওয়াভেলের এই জয় কিন্তু স্থায়ী হল না। ৫০০ মাইল জুড়ে তাঁর সরবরাহের পথ, তা বজায় রাখা শক্ত হল। আর এদিকে গ্রাৎসিয়ানির জায়গায় চক্রশক্তি তাড়াতাড়ি সেনাপতি করে পাঠালেন জার্মান জেনারেল রোমেলকে। তাকে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হল বিপুল। বাছা বাছা জার্মন সৈন্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল 'আফ্রিকা কোর্' আর বাছা নাৎসি সেনাপতি রোমেল, ট্যাংকের যুদ্ধে তিনি ওস্তাদ। তিনি ওয়াভেলকে আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল ২৪শে মার্চ ১৯৪১; ওয়াভেল ফিরে আসতে লাগলেন,

সে ১২ই এপ্রিল থামলেন বার্দিয়ায়। কিন্তু তাই বলে ওয়াভেলের বাহাদুরিও ভুললে চলবে না। যখন তিনি ছিলেন দুর্বল, তবু তিনি গ্রাৎসিয়ানির ইতালীয় বাহিনী একেবারে চূর্ণ করে ফেললেন। মাত্র দু-হাজার তাঁর নিজের সৈন্য হতাহত হয়; কিন্তু ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয় ১।০ লক্ষের মত। এর ফলে ইতালি দেহে মনে সাহস খুইয়ে ফেলল। এই পরাজয়ের ফলেই ইতালির আফ্রিকার সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়তে লাগল। যুদ্ধবিদ্যার দিক থেকেও ওদাভেলের কৃতিত্ব ছিল। তিনি দেখালেন যে ব্রিটিশরাও 'বিদ্যুতাক্রমণ' করতে পারে, আর নিপুণভাবে স্থল, জল ও আকাশের বলকে একসঙ্গে যুদ্ধে সুযোজনা করতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্কে হল রোমেলের আবির্ভাব আর জয়। কিন্তু তাঁরও সেই সরবরাহের সমস্যা থেকে গেল,—আর তাই জয় স্থায়ী হল না। তৃতীয় অঙ্ক শুরু হল—সেখানে ব্রিটিশ সেনাপতি হলেন অকিনলেক্। তিনি আক্রমণ শুরু করলেন ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪১এ। রোমেল ভয়ানক বাধা, তাঁকে হারাতে বেগ পেতে হল। তবু অকিনলেক্ জিতলেন, আবার বেনগাজীতে গিয়ে ব্রিটিশ বাহিনী পৌঁছল। কিন্তু রোমেল গ্রাৎসিয়ানির মত সৈন্যবল হারালেন না, তা অটুট রাখলেন। আঘাত সামলে নিয়ে রোমেল উদ্ধার করলেন প্রথম বেনগাজী। তারপর মে (১৯৪২) মাসে আরম্ভ করলেন তাঁর চমকপ্রদ অভিযান—শুরু হল চতুর্থ অঙ্ক। এক দিনেই ব্রিটিশের ৩০০ খানা ট্যাংক শেষ হয়—রোমেলের কামানের মুখে এগিয়ে গিয়ে। তব্রুককে দুই দিনের আক্রমণে ৩০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য আত্মসমর্প করে। পরে ব্রিটিশ ৮ম বাহিনী নিঃস্বাস ফেলল একেবারে আলকজেন্দ্রিয়ার মাইল ৬০ দূরে এসে, এল এলামেনে। "৮ম বাহিনী" যে বাঁচল তাই আশ্চর্য। এখানেই অবশ্য অঞ্চম অঙ্ক শুরু হল—এল এলামেনে ২৩শে অক্টোবরে ব্রিটিশ অভিজানে তার আরম্ভ, আর এই ১৩ই মে টুনিসিয়ায় জার্মান সেনাপতি আর্নিম ও তাঁর ১।০ লক্ষ সৈন্য বন্দী হলে তার পঞ্চমাঙ্ক হল শেষ। ঠিক 'মরুভূমির যুদ্ধ' অবশ্য শেষ হয় ৩ মাসেই। তার পরে যুদ্ধ চলে টিসিয়ায়। কিন্তু তা'ই হল আফ্রিকার যুদ্ধের শেষ দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কের তা চূড়ান্ত ঘটনা। তারই এক প্রধান ঘটনা—মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর ৮ই নভেম্বর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ। এটাও পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা।

অবশ্য আফ্রিকার যুদ্ধের আর-একটি পর্বও আছে। তা আমরা প্রায় ইতিমধ্যে ভুলতে বসেছি। ইতালীর আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্যের পতন সেই পর্ব। ওয়াভেলের বিজয়েই তার সূচনা হয়। এখানেও পাহাড়-পর্বত অনেক। দুর্গম দেশ। অভিযানের পক্ষে তাই অসুবিধা ছিল। তবু ইতালির সেই সাম্রাজ্য দু-চার মাসে বিলুপ্ত হল। আর তারও কৃতিত্ব প্রাপ্য অনেকাংসে ভারতীয় সেনাদেরই। বিশেষ করে, কেরেনের যুদ্ধে তারা দেখাল, খাড়া পাহাড়ও তারা বেয়ে উঠে শত্রুকে নিপাত করিতে পারে।

আফ্রিকার পঞ্চম অঙ্ক

পঞ্চম অঙ্কের যুদ্ধের কথাটাই আজ বড় কথা। মনে হয়, এইটেই আফ্রিকার শেষ যুদ্ধ। আর শেষ যুদ্ধে যে জেতে, যুদ্ধে তো তারই হয় জয়। আফ্রিকায় সেই জয় হয়েছে আজ মিত্রপক্ষের, আর জয় হয়েছে একেবারে সম্পূর্ণ।

যুদ্ধের এই পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হল এল্ এলেমিন থেকে। ব্রিটিশ সেনাপতি তখন আলেকাজাণ্ডার; তাঁর সহকারী জেনারেল মণ্টেগোমারি। এঁদের হাতেই রোমেলের পরাজয় ঘট্‌ল, বেশি কৃতিত্ব মণ্টেগোমারির। প্রথম ১২ দিনের যুদ্ধ হয় দুর্ধর্ষ—মণ্টেগোমারি, কামানের গোলায় আর বিমানের বোমায় রোমেলের বিজয়ী 'আফ্রিকা কোরকে' ত্রস্ত করলেন, রোমেলের সুরক্ষিত ব্যূহ চূর্ণ করে ফেল্‌লেন। অবশেষে ৫ই নবেম্বর রোমেল হট্‌তে শুরু করলেন। রণকৌশলেও এবার রোমেলের পরাজয় ঘটে ছিল। কোথায় মণ্টেগোমারি আক্রমণ করবেন, তা তিনি বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি। তিনি ভাবলেন আক্রমণ হবে দক্ষিণে, কিন্তু আক্রমণ হল প্রধানত উত্তরে। সেখানে রোমেলের একদল সৈন্য ঘেরাও হতে চল্‌ল। রোমেল ভাবলেন, এঁদের বের করে আন্‌বেন। এই হল তাঁর আর এক ভুল। বৃথাই তার সৈন্য ক্ষয় হল—পরাজয় আরও মারাত্মক হল। তিনি তবু সাম্‌লে নিয়ে আবার ফিরে চল্‌লেন পশ্চিম দিকে—তাঁকে "৮ম বাহিনী" তাড়া করে নিয়ে চল্‌ল। ব্রিটিশ বিমান প্রায় নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দিলে না। ততক্ষণে ৮ই নবেম্বর, আলজিয়ার্সে-মরক্কোতে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যেরা অবতরণ করেছে।—বুঝা গেল এবার যুদ্ধ আর "মরুভূমির যুদ্ধ" থাক্‌বে না, হবে 'উত্তর আফ্রিকার' যুদ্ধ।—মিত্রশক্তি দুদিক থেকে এগিয়ে আস্‌বে, একেবারে সমস্ত আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর শত্রু কবল থেকে উদ্ধার করবে, আফ্রিকা থেকে চক্রশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে।

একই সঙ্গে দুই দিক থেকে যুদ্ধ চল্‌ল।

মিশর থেকে যাত্রা করে '৮ম বাহিনী' তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল রোমেলের 'আফ্রিকা কোরকে।' এইটা একটা অভিনব ব্যাপার। আজ পর্য্যন্ত এই রকম করে এক বাহিনী অন্য বাহিনীকে দু'হাজার মাইল ধরে এমন অনুসরণ করতে পারেনি—ইতিহাসে এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর নেই। এই 'মরুভূমির যুদ্ধে' বারবার দেখা গেছে হাজার খানেক মাইল তাড়া করে এসে বিজয়ী সৈন্যরা হাঁপিয়ে পড়ে, বিশ্রাম চায়, তাদের সরবরাহও এই পথে ঠিক রাখা আর সহজ হয় না। দেখে-দেখে মণ্টেগোমারিও শিখেছিলেন। তাই সরবরাহ তিনি ঠিক বজায় রাখলেন, আবার জার্মান সৈন্যদেরও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দিলেন না—তাড়া করে চল্‌লেন। এই তাড়া বেশি চালায় ব্রিটিশ বিমান বহর। আর এবার '৮ম বাহিনী' অস্ত্র-শস্ত্রে খুব সবল করা হয়েছিল —তাতেই জেনারেল মণ্টেগোমারির কোনো জিনিসের অভাব হল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ বিমান আর নৌবল এমনভাবে পাহারা দিল যে ভূমধ্যসাগরের পথে রোমেল আর নূতন অস্ত্রশস্ত্র

ও সৈন্যবল পেলেন না পরাজিত রোমেল কোথাও দাঁড়াতে পারলেন না, সোল্লুমে না, বার্দিয়ায় না, তাব্রুকে না, গাজালায় না, বেনগাজীতেও না; এগেদাবিয়ায়ও তিনি তিষ্ঠতে পারিলেন না, এল্ এজেলিয়ায়ও ঘাঁটি বাঁধতে পারলেন না। একেবারে ত্রিপোলিতে এসে শেষ চেষ্টা করলেন খুঁটি নেবার। ২৩শে জানুয়ারী—এল্ এলেমেনের যুদ্ধের ঠিক ৩ মাস পরে—মণ্টেগোমারি ত্রিপোলিও দখল করলেন। ইতালির সাম্রাজ্য শেষ হল। রোমেল এবার ঠাঁই নিতে গেলেন ফ্রান্সের উপনিবেশ টুনিসিয়ার সীমান্তে "মারেথ্ ব্যূহে।" ততক্ষণে টুনিসিয়ায় একটা ভালো যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। "মরুভূমির যুদ্ধের" শেষে আমরা এসে গেলাম টুনিসিয়ার যুদ্ধে।

টুনিসিয়ার যুদ্ধ

"৮ম বাহিনী" যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল পূর্বদিকে, আইজেনহাওয়ারের মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী কিন্তু তখন পর্যন্ত তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। অবশ্য তাদের একটা প্রধান কীর্ত্তি —৮০০ জাহাজ বোঝাই সৈন্যসামন্ত মালপত্র নিয়ে এমনভাবে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে ৮ই নভেম্বর মরক্কো, আলজিয়ার্সে নেমে পড়া। তাতেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। এসব ফরাসী উপনিবেশে তখন চক্রশক্তির আধিপত্য। এড্‌মিরাল দারলাঁ হলেন সেখানে হাই কমিশনার। তিনি চক্রশক্তিরই বন্ধু। তবে সম্প্রতি তিনিও একটু নিরাশ হয়েছিলেন; মঃ লাভাল চক্রশক্তির আরও পেয়ারের লোক; লাভাল হয়ে বসেছেন ফ্রান্সের কর্ত্তা। দারলাঁ মনের দুঃখেই হোক্ আর উপায় নেই বলেই হোক্, জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেল্‌লেন। আইজেনহাওয়ারও তাই বাধা বেশি পেলেন না;—মনে করলেন,—বিনাযুদ্ধেই বুঝি একেবারে টুনিসিয়া পর্যন্ত দখল হয়ে যাবে; এমনকি দারলাঁর হুকুমে ফরাসী নৌবলও তুলোঁ থেকে এসে যোগ দেবে। এই রাজনীতিক চাল নিয়ে কিন্তু নানা প্রশ্ন উঠেছিল। দারলাঁকে বিশ্বাস কি? আর দারলাঁর বেনামিতে যে আসলে চক্রশক্তিরই চরেরা সর্বত্র বসে রইল, তারা পিছন থেকে সব পণ্ড করে দেবে না? মার্কিন সেনাপতি আইজেনহাওয়ার এসব কথা কানে তুল্‌লেন না। কিন্তু তুলোঁর নৌবল এল না, বন্দরে দাঁড়িয়ে রইল। পরে যখন জার্মানরা তা দখল করতে এল তখন সেই ফরাসী নৌ-সেনা, নৌ-সেনাপতি সব রণতরী ডুবিয়ে দিলেন, অনেকেই নিজ নিজ জাহাজের সঙ্গে সলিলসমাধি বরণ করলেন। এইটা একটা বিষম শোচনীয় দৃশ্য। ফরাসী নৌবলের বীরত্ব মানতে হবে; কিন্তু তাকে দৃষ্টিহীন, অন্ধও বল্‌তে হবে। নিজের প্রাণ দিলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হল? তাঁরা ফ্রান্সের প্রাণ পুনঃসঞ্চার করবার দায়িত্ব অস্বীকার করেন কি করে? এদিকে দারলাঁও শীঘ্রই (২৫শে ডিসেম্বর) নিহত হলেন। কে তাঁকে হত্যা করলে, সে সংবাদ এখনো গোপন রয়েছে। দারলাঁর স্থানে তখন হাই কমিশনার হলেন জেনারেল জিরো। তাঁকে সবাই সম্মান করে। তিনি রাজনীতির ধার-ধারেন না। আইজেনহাওয়ারের মত তিনি চাইলেন তাড়াতাড়ি একেবারে বিজার্টা-টুনিস পর্য্যন্ত দখল করে নিতে, একটা নূতন ফরাসী বাহিনী

গড়তে, তারপরে ফ্রান্সের স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করতে—থাক্ না চক্রশক্তির ফরাসী পোষ্যরা মরক্কো, আলজিয়ার্সে, পশ্চিম আফ্রিকায় ?

এ হল রাজনীতিক সুবিধাবাদীর হিসাব। কিন্তু এ হিসাবেও খাটল না। টুনিস, বিজার্টা খোয়াবার আগেই চক্রশক্তি উঠে পড়ে লাগল। ১১ই নভেম্বরেই জার্মান জঙ্গীবিমান

টুনিসিয়ার যুদ্ধ

এই মানচিত্রে মিত্রশক্তির বিভিন্ন বাহিনীর বিজয় অভিযানের অগ্রগতি দেখান হয়েছে।

ও বিমানবাহিত জার্মানসৈন্য টুনিসিয়ায় নামতে লাগল। যে দৃশ্য ক্রীটের যুদ্ধে দেখা গেছল—তারই পুনরাবৃত্তি হল এখানে—বিমানে সৈন্য এল, মাল এল, ট্যাংক পর্যন্ত নাম্‌ল ; শতে শতে হাজারে-হাজারে জার্মান সৈন্য দখল করে বসল প্রথম টুনিস বিজার্টার ঘাঁটি। সেখানকার

ফরাসীরা তাদের বাধা দিলে না। না দেবারই কথা। কারণ, সেখানে যারা কর্তা ছিল তারা সবাই যে ফ্যাশিস্তদের পোষ্য। মিত্রশক্তির সৈন্যরাও টুনিসিয়ার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ২০শে নবেম্বর তারা বিজার্টা থেকে ৩২ মাইল দূরে এসে পৌঁছল। ২৭শে তারিখ তারা এসে গেল টুনিসের ১০ মাইলের মধ্যে। একবার ব্রিটিশ পারাশূট সৈন্যরা টুনিসের বিমানঘাঁটিও দখল করেছিল (১লা ডিসেম্বর)। কিন্তু ততক্ষণে জার্মান বিমানবাহিত সৈন্যদল সংখ্যায় বেড়েছে, তারা সুগঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হল তাদেরই পাল্টা আক্রমণ। মিত্রপক্ষের ছাড়তে হল জেইদা, তেবুর্বা। মার্কিন সৈন্যরা তার প্রচণ্ড আক্রমণে পিছনে হটে এল—এ যুদ্ধে সবে তাদের এই প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে। ওদিকে সমুদ্রেও ডুবো-জাহাজের আঘাতে মিত্রশক্তি বাধা পাচ্ছে। প্রমথবাহিনীর সেনাপতি এণ্ডার্সনকে সাহায্য না দিলে আর এ যুদ্ধ জয়ী করা যাবে না। বলা যেতে পারে, এইখানেই এই পর্বের শেষ। তখনি ত্রিপোলি ছেড়ে রোমেলের সৈন্যরা আসছে টুনিসিয়ায়।

মিত্রশক্তির হাতে বন্দী কয়েকজন এক্সিস জেনারেলকে এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র হল এবার টুনিসিয়া। প্রধান সেনাপতি হলেন আইজেনহাওয়ার। অষ্টম বাহিনীর সেনাপতি আলেকজেণ্ডার তাঁর সহকারী। যুদ্ধের এবার সমাবেশ হল এইরূপ :—(১) প্রথমত, সব রকম বল বাড়াতে হবে। বিশেষ করে বাড়াতে হবে বিমান বল। (২) তার সঙ্গে যোগ দিয়ে নৌবল দেখ্‌বে যাতে চক্রশক্তির নূতন সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র আর টুনিসিয়ায় না পৌঁছায়। (৩) এজন্য চাই যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি বিমানঘাঁটি ; (৪) শত্রুর টুনিসিয়ার বিমান ঘাঁটি ও

সিসিলির বিমান ঘাঁটিতে বারে বারে হানা দিয়ে তা অকেজো করে তোলা। (৫) যতখানি সম্ভব শত্রুকে যুদ্ধে নিযুক্ত করা—(৬) পূর্ব্বদিকে রোমেলের 'আফ্রিকা কোর' যাতে টুনিসিয়ার আর্ণিমের বাহিনীর সঙ্গে একত্র না হতে পারে, তার জন্য মধ্য-টুনিসিয়ায় 'রইরুয়ান-সুসে'র গিরিপথ আগলে রাখা।

একটা কথা বুঝা গেল—একটু সময় লাগবে, কিন্তু যত কম ক্ষতি দিয়ে যত বেশি শত্রু সৈন্য নষ্ট করা যায়, তাই হবে মিত্রশক্তির এ যুদ্ধে লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ যেভাবে গড়িয়ে-গড়িয়ে চল্‌ল তাতে সবাই তখন নিরাশ হল। বিশেষত, তখন সোভিয়েট সৈন্য প্রচণ্ড আক্রমণে এগিয়ে আস্‌ছিল। ইয়ুরোপের অন্য যুদ্ধক্ষেত্র নেই, তাই হিট্‌লার সমস্তখান থেকে সৈন্য এনে লাল ফৌজের সেই জোয়ার থামাচ্ছিল। "মিত্রপক্ষ কি বুঝছেন না—একটা বড় ঘা হিট্‌লারকে এখন দিলে এবার হিট্‌লারের আসন টল্‌বে?"—এই ছিল সবার নালিশ। এ নালিশ অমূলক নয়। তবে টুনিসিয়ার জয়ের মূল্যও শেষ অবধি দেখা গেল কম নয়। এবার সেই হিসাবই নেওয়া যেতে পারে—যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। প্রথমটা ম্যারেথ ব্যূহের উত্তর দিয়েই চল্‌ল ৮ম বাহিনী, তার পরে দক্ষিণ থেকে গিয়ে তার পিছনে হানা দিল। তবু কিন্তু প্রথম ব্যূহ ভেদ হল না—কামানের বিপুল গোলাবৃষ্টিতে তা চূর্ণ হতে লাগ্‌ল। ১৭ই মার্চ আক্রমণ শুরু হয়। ১৮ই গাফ্‌সা দখল হল, ২৩শে শেষ ব্যূহ ভেদ হল। রোমেল ব্যূহ ছেড়ে দিয়ে উপকূলের পথে চল্‌লেন, তার পিছনে আবার তাড়া করলে '৮ম বাহিনী।' কিন্তু রোমেলের সৈন্যকে গিরিপথে আটকানো যায়নি—তারা আর্নিমের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হল। '৮ম বাহিনী' এসে পৌঁছল গাবেস্‌-এ ৩৩শে মার্চ।

তারপরে শেষ দৃশ্য—৩০০ মাইলের মধ্যে চক্রশক্তির সৈন্য বাঁধা পড়েছে, সাহায্য আস্‌ছে না। সাগরে শত্রুর তরী, আকাশে শত্রুর বিমান,—স্থলে শত্রুর বলের আধিক্য। একবার আর্নিম চেষ্টা করলেন নেপোলিয়নের মত চোখের পলকে এক একটা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য কেন্দ্রিত করে আঘাত করবার, সেখানে বলাধিক্যে জয় হলেই আবার সৈন্য সরিয়ে পলক না ফেলতে আর এক ক্ষেত্রে এমনিভাবে আঘাত হান্‌বার। দু-একবার মিত্রশক্তির চমকও তাতে লাগ্‌ল। এই লাইন ধরে দেড় লক্ষ জার্মান সৈন্য ও ৬০ হাজার ইতালীয় সৈন্য ব্যূহ স্থির করলে। পাহাড়ের প্রাচীর তাদের সাম্‌নে, পাহাড়ের উপরে ও পিছনে তারা সুসজ্জিত। তাও তবু টিক্‌ল না। পশ্চিমে-উত্তরে বিজার্টার ৩০।৪০ মাইল দূরে এসে গেল উপকূলের পথে মিত্রশক্তি,—তারা মার্কিন ও ফরাসী। মধ্যখানে প্রথম বাহিনীর ব্রিটিশ বর্গ জেবেল সামাবার দিকে। তারপরে পোয়া দ্য ফাঁহিসের ফরাসীরা। আর একেবারে পূর্ব উপকূলে '৮ম বাহিনী'। রোমেল দেশে ফিরে গেলেন—রইলেন আর্নিম। ওরা যে মার্কিন বাহিনী মেতুর দখল করলে,—জার্মানরা পিছনে হট্‌তে লাগল—আর দাঁড়াতে পারল না। ৭ই টুনিস ও বিজার্টা অধিকৃত হল। তখনো মনে হলো—বঁ অন্তরীপের দুর্গম দেশে জার্মানরা যুদ্ধ

চালাবে—যাঁরা ষ্ট্যালিনগ্রাদে নিঃশেষে প্রাণ দিয়েছে তাঁরা টুনিসিয়ারও যুদ্ধ করেই মরবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—জার্মানরা হাজারে হাজারে এসে আত্মসমর্পণ করলে। ১১ জন সেনাপতি নিয়ে স্বয়ং আর্নিম ১৩ই মে বন্দী হলেন '৪র্থ ভারতীয় ডিভিশনের' হাতে আর 'গোয়েরিংএর ডিভিশন' ও অন্যান্য ডিভিশন বিনা বাধায় বন্দী হতে এগিয়ে এল। শেষ দিকে তাদের আত্মসমর্পণের যে উৎসাহ দেখা গেল, তাই হল সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার।

টুনিসিয়ার রক্ষা-প্রাচীর 'মারেথ-লাইন।' ফ্রাঙ্কো-জার্মাণ যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তে এই প্রাচীর নষ্ট করতে হবে বল দাবী করা হয়েছিল।

এবার বুঝা গেল, টুনিসিয়ার যুদ্ধ কত বড় লক্ষ্য সাধন করেছে। আমরা তো জানিই—এ যুদ্ধে আফ্রিকা মুক্ত হল, ভূমধ্য সাগরের পথে মিত্রশক্তির বাধা প্রায় রইল না; ইতালি, ফ্রান্স, থেকে বল্‌কান্ অঞ্চল পর্যন্ত পথ খোলা রইল আক্রমণের জন্য। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা যুদ্ধের হিসাবে যা তা হচ্ছে 'শত্রুবাহিনীর ধ্বংস সাধন।' টুনিসিয়ায় এখন তাই হল। জার্মান বাহিনী নির্মূল হল। নভেম্বরে তাড়াতাড়ি টুনিসিয়া দখল হলে তা হত না। জার্মানদের পক্ষে টুনিসিয়া এপ্রিল-মে মাসে হল একটা ফাঁদ ও তাতে পা দিয়ে আর পালাবার পথ রইল না। ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ 'ডানকার্ক' ছেড়ে আসে। দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে আর্নিম সব অস্ত্রশস্ত্র শুদ্ধ বন্দী হলেন। ডানকার্কের এমন প্রতিশোধ আর হয় না। কিন্তু আর একটা কথাও আছে—এই পরাজয়ে বুঝা গেল—ষ্ট্যালিনগ্রাদেও জার্মান সৈন্য প্রাণ দিতে পিছ পা হয় নি, কিন্তু বঁ অন্তরীপে তাদের সে মনের বল আর নেই। এইটাই সবচেয়ে বড় শুভ চিহ্ন আজ—জার্মানির মনোবল নিঃশেষ হয়ে আস্‌ছে। আর গত মহাযুদ্ধেও দেখা গেছে—জার্মানির যখন দম ফুরোয় তখন একেবারেই ফুরোয়। টুনিসিয়া আবার সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। জার্মানের সাহস ফুরিয়ে আস্‌ছে।

এই যুদ্ধের আরও অনেক শিক্ষা অবশ্য আছে। অনেকগুলি আছে যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা।

তার মধ্যে প্রধান কথা হল এই যে—মিত্রশক্তি বুঝলেন—বিমানই প্রধানতম অস্ত্র। ট্যাংক আজ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। অন্য বলের সঙ্গে বিমানের ঠিক মত যোজনা করলে দুর্বার জিনিস। এই সুযোজনার একটা সুদৃষ্টান্তও তাঁরা দেখিয়েছেন এই যুদ্ধে ওয়াভেলের প্রথম অঙ্ক থেকে একেবারে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত। এর পিছনে যে একটি বড় সত্য রয়েছে তা হচ্ছে ব্রিটিশ নৌবলের কার্য্যকারিতা। তারই জন্য মার্কিন অভিযান সফল হল, তারই জন্য জার্মানরা আর ফিরে যেতে পারল না। এই যুদ্ধে একটি ব্যর্থতার প্রমাণ আছে—তা হচ্ছে দারলাঁর সঙ্গে মিতালি, রাতারাতি কিস্তিমাতের চেষ্টা—জনশক্তির সঙ্গে এক হতে দ্বিধা। অবশ্য এর উল্টো একটা বড় সুযোজনারও প্রমাণ

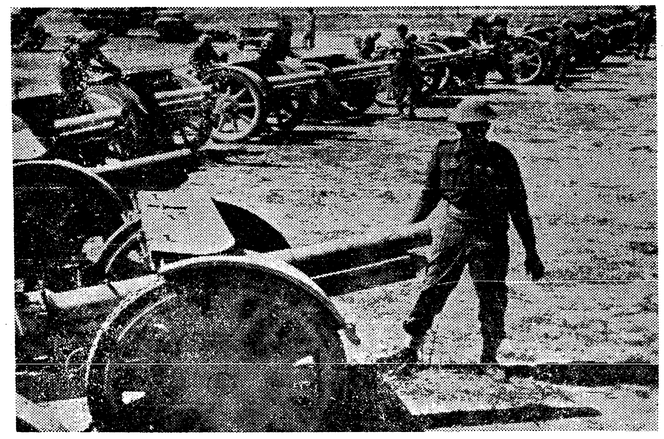

উত্তর আফ্রিকা যুদ্ধে টুনিসিয়াতে সমস্ত সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ও রসদ মিত্রশক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। এই চিত্রে টুনিসিয়াতে শত্রুকামান অধিকারে ভারতীয় সৈন্যদের আমরা দেখছি।

রয়েছে—ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী সৈন্যদের একই সেনাপতির চালনায় যে সুফল পাওয়া গেল, তা ভুলবার নয়। এ থেকে বেশ বুঝা যায় কি? মিত্রশক্তি যদি সত্যই একত্র হয় তবে তারা যুদ্ধেও অপরাজেয়। এমনি একমন একপ্রাণ হওয়া দরকার তাদের তা হলে চীনা ও সোভিয়েট বন্ধুদের সঙ্গে।

আফ্রিকার যুদ্ধের শেষ কথা কিন্তু আমাদের কথা। দু' বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছে ভারতবর্ষের মালপত্র নিয়ে, প্রধানত ভারতবর্ষের ফৌজ নিয়ে, রসদ নিয়ে। তারপরে অবশ্য মার্কিন মালপত্র আসে, সৈন্য আসে, অস্ত্রশস্ত্র মিলে। তাতেই জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই যুদ্ধে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে কে? সিদি বারানিতে, কেইরিনে, 'মরুভূমির যুদ্ধে' বারে বারে হেরে, বারে বারে জিতে,—বারে বারে মরে—শেষ পর্যন্ত টুনিসিয়ায় জেনারেল আর্ণিমকে বন্দী করে কারা? **সে আমাদেরই '৪র্থ ভারতীয় ডিভিশান'**। তাতে অবশ্য ইংরেজ সৈন্যও আছে। কারণ ভালো অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক, কামান, আর বিমান দলে এখনো ভারতীয় সৈন্যদের

বেশি নেওয়া হয়না। কিন্তু তবু '৪র্থ ভারতীয় দলে' ভারতীয় গোলন্দাজ ট্যাংক-চালক প্রভৃতিও আছে; আর প্রধানত তা ভারতীয় ডিভিশানই। বরাবর পৃথিবীর সমরনায়করা বলতেন—"আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে ভারতীয় সৈন্যদের সজ্জিত করা হয় না। এসব অস্ত্রে শিক্ষিত হলে ভারতীয় সৈন্যের মত যোদ্ধা আর নেই।" একটু সুবিধা পেতেই আজ এই কথা প্রমাণিত হয়ে গেল। ভারতীয়দের হাতেই বারে বারে ব্রিটেনের মান রক্ষা হয়েছে—সিদি বারানি থেকে একেবারে টুনিস পর্যন্ত। তাদের হাতেই আজ দুধর্ষ জার্মান সেনারা বন্দী, নাৎসি সেনাপতি বন্দী। আর এই সৈন্যরা যদি বুঝত—এ শুধু তাঁদের নকরির জন্য লড়াই নয়, মনিবের জন্য যুদ্ধ নয়,—তাদের-ও দেশের যুদ্ধ, তাদের-ও জাতির যুদ্ধ, তাদের-ও স্বাধীনতার যুদ্ধ—তাদের 'আজাদী কী লড়াই—?

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

এক বছরের ওপর হ'ল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলেছে। কথাটা চলেছে রাশিয়াকে সাহায্য করা নিয়ে। দু বছর ধরে রুশিয়া জার্ম্মাণীর প্রবল আক্রমণ রোধ করছে। গত বছর ষ্টালিনগ্রাদে রুশিয়ার অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল তখনই ইংলণ্ডে বেশী করে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা ওঠে।* লণ্ডনে এ নিয়ে মিছিল ও সভা হয়েছিল। তাদের দাবি ছিল যে রুশিয়ার ওপর চাপ কমানর জন্যে মিত্রপক্ষের উচিত পশ্চিম ইয়ুরোপে জার্ম্মানদের আক্রমণ করা।

সত্যি বলতে গেলে, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিশেষ মানে নেই। যুদ্ধকে সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যায়, ইতঃপূর্ব্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় রণাঙ্গন ছিল—উত্তর আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে। কারণ জার্ম্মানীর মত জাপানকেও ত পরাস্ত করতে হবে। যাই হোক, উত্তর আফ্রিকা থেকে জার্ম্মান ও ইটালীয়দের দূর করে, মিত্রপক্ষ ইয়ুরোপের যুদ্ধ অনেকটা সহজ করে এনেছে। এখন সমস্যা হচ্ছে, কি করে জার্ম্মানীকে সোজাসুজিভাবে আক্রমণ করা যায়। আর এ আক্রমণ শীঘ্রই করতে হবে, তা হ'লেই এই গ্রীষ্মে রুশিয়ার উপর জার্ম্মান আক্রমণ তীব্রতর হতে পারবেনা। জার্ম্মানরা নাকি ইতিমধ্যেই রুশিয়ায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং যথেষ্ট সাজসরঞ্জাম নিয়ে গেছে।

তবে অবস্থা দেখে মনে হয়, এই প্রবন্ধ ছাপা হবার আগেই, ইয়ুরোপে মিত্রপক্ষের অভিযান সুরু হবে। খুব সম্ভবত ইটালীর ওপর পূর্ণ আক্রমণ হবে, কারণ উত্তর আফ্রিকার সমগ্র উপকূলভাগ মিত্রপক্ষের আয়ত্তে আসায় আক্রমণ সুরু করার খুব সুবিধা হয়েছে। টিউনিসিয়া জয়ের পরই

* দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অর্থ তোমরা কেউ কেউ নাও বুঝতে পারো। মোটামুটি বলা যেতে পারে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান রণাঙ্গন সৃষ্টি করেছে রুশিয়া। তোমরা জানো, যুদ্ধ এখনও সেখানে পুরো মাত্রায় চলেছে। এখন, এই সঙ্গে ইউরোপের অন্যত্র একই শত্রুর বিপক্ষে ঐরূপ ব্যাপক আর একটি যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি হ'লে, সেটি হবে দ্বিতীয় রণাঙ্গন। অবশ্য সমগ্র যুদ্ধ ধরলে, উত্তর আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রণাঙ্গন ছিল।

মিত্রপক্ষ ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ঘাঁটিগুলোর ওপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। বিমানে মিত্রপক্ষে আধিপত্য হয়েছে দেখা যাচ্ছে। ইটালীর নৌবহরের দাপটও নেই, কাজেই বলা চলে ভূমধ্যসাগর মিত্রপক্ষের পূর্ণ আয়ত্তে।

ইটালীতে সোজাসুজিভাবে সৈন্য নামাতে হলে আগে সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা (কয়েকমাস আগে ইটালী ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপ দখল করেছিল) দ্বীপ তিনটি দখল করার দরকার। সিসিলি থেকে ইটালীতে হানা দেওয়া সোজা, আর কর্সিকা দখল করলে মিত্রপক্ষ দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলে সৈন্য নামাতে চেষ্টা করতে পারে। ইটালীকে একেবারে ঘায়েল করতে পারলে, জার্ম্মানী যে বিশেষ কাবু হয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে ইটালীরও তোড়জোড় আছে, তার প্রধান সৈন্যবাহিনী অটুট রয়েছে। ইটালী আক্রমণ করার চেয়ে, ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল আক্রমণ করা আরও বিপজ্জনক, কারণ ফ্রান্সের তুলোঁ বন্দরে জার্ম্মানরা কতকগুলি ফরাসী রণতরী হস্তগত করেছে এবং বিপদে ওগুলোকে কাজে লাগাবে। তার ওপর ইটালীর নৌবহরও অন্তত মরণ-কামড় দিতে ছাড়বে না।

আর একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে, মিত্রপক্ষ গ্রীসের উপকূল লক্ষ্য করে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে অভিযান সুরু করতে পারে। তা করতে হলে প্রথমে দরকার ইটালীর ডোডেকানেস দ্বীপপুঞ্জ ও ক্রীট্ দ্বীপ দখল করা। এ কাজে মিত্রপক্ষের সুবিধা হচ্ছে সাইপ্রাস দ্বীপে বৃটিশ ঘাঁটি রয়েছে; তা ছাড়া সিরিয়ার বেরুত ও মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে বৃটিশ নৌবহর কাজ করতে পারবে। তবে সমস্যা হচ্ছে যে ক্রীট্ আক্রমণ করা সহজসাধ্য নয়। মিত্রপক্ষ যে দিক থেকে (অর্থাৎ দক্ষিণ দিক) ক্রীট আক্রমণ করতে পারে, সে দিকে কোন বন্দর নেই, সমুদ্র থেকে খাড়াই পাহাড় উঠেছে। এ ছাড়া ওখানে জার্ম্মানদের তোড়জোড় যথেষ্ট। ক্রীট দখল করার সময়ে প্যারাট্রুপ নামিয়ে জার্ম্মানরা খুব কেরামতি দেখিয়েছিল এবং দ্বীপ থেকে অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীকে উদ্ধার করার সময়ে কয়েকখানি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ জার্ম্মান বিমানের ঘায়ে ডুবেছিল।

তবে একথা মনে রাখতে হবে গ্রীস ও ক্রীট অভিযানের সময়ে বৃটিশ একা যুদ্ধ করছিল, আমেরিকা তখন যুদ্ধে নামেনি। গ্রীসকে সাহায্য করার জন্যে বৃটিশদের লিবিয়া থেকে সৈন্য সরাতে হয়েছিল, যার ফলে অক্ষশক্তি মিশর পর্য্যন্ত হানা দিয়েছিল। আজ সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় অক্ষশক্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, উত্তর আফ্রিকার সব ঘাঁটিগুলি মিত্রশক্তিদের করতলগত—ওখান থেকে আক্রমণ সুরু করলে গ্রীসের উপকূলে জার্ম্মানদের নাজেহাল হতে হবে।

স্থলপথে গ্রীস আক্রমণ করার সুবিধা হত যদি তুরস্ক মিত্রপক্ষে যোগদান করত। কিন্তু মিত্রপক্ষ তুরস্ককে নিরপেক্ষতা বর্জ্জন করতে বাধ্য করবেন না। তবে একথাও সত্যি, যদি জার্ম্মানী বেপরোয়া হয়ে তুরস্ককে আক্রমণ করে তা হলে মধ্যপ্রাচীতে মিত্রপক্ষের যে বিপুল সৈন্যবাহিনী রয়েছে তা জার্ম্মানদের সায়েস্তা করার জন্যে যথেষ্ট। মধ্যপ্রাচীতে জার্ম্মানরা যে হুড়হুড় করে

এসে পড়বে, কিংবা ককেশাসের দক্ষিণ দিকে রুশিয়ার খিড়কীর দরজায় ঢুঁ মারবে সে সম্ভাবনা একেবারেই সুদূরপরাহত।

জার্ম্মানীর ইয়ুরোপীয় দুর্গের ওপর মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ কয়েক মাস ধরে চলেছে এবং দিনের পর দিন আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। ইংলণ্ডে অনেকে বলেন, এও পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কাজ করেছে, কারণ এই আক্রমণের ফলে জার্ম্মান সমর-শিল্পকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত হচ্ছে, আর জার্ম্মান বিমানবাহিনীর একটা অংশ পশ্চিম ইয়ুরোপে রাখতে হয়েছে, যার জন্যে জার্ম্মানরা রুশিয়ায় পূর্ণভাবে বিমান শক্তি নিয়োগ করতে পারছে না। এছাড়া জার্ম্মানীর ভয় রয়েছে মিত্রপক্ষ হয়ত ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করতে চেষ্টা করতে পারে। অবতরণ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে একটু আধটু পরীক্ষা গত বছর বৃটিশরা করেছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানী থেকে স্পেনের সীমান্ত পর্য্যন্ত আটলান্টিকের উপকূলভাগে জার্ম্মানরা দুর্ভেদ্য রক্ষাপ্রাচীর তৈরী করেছে। হলাণ্ড, বেলজিয়ম ও উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের জার্ম্মানদের ঘাঁটি রয়েছে। কাজেই আক্রমণ করতে হলে মিত্রপক্ষের বিপুল শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য। সামরিক নীতিতে এরকম শক্তিক্ষয়—যার ফলাফল অনিশ্চিত—কি যুক্তিযুক্ত। মিত্রপক্ষীয় অনেক রাজনীতিক এমনও মনে করেন যে, জার্ম্মান শক্তি ধ্বংস করতে হলে এরকম শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন হবেনা—অর্থাৎ ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযান ও জার্ম্মানীর ওপর বিমান আক্রমণ চালিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

জার্ম্মানদের আর একটা সন্দেহ আছে যে, মিত্রপক্ষ নরওয়ের উপকূলে সৈন্য নামাতে চেষ্টা করতে পারে। সে চেষ্টা যদি সফল হয়, তা হলে জার্ম্মানদের নিজেদের দেশ থেকে অনেক দূরে যুদ্ধ করতে হবে এবং সেখানে অবাধগতি সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠান সম্ভব নয়। মিত্রপক্ষের অসুবিধা হচ্ছে যে, তাঁদের নৌবহরের সুবিধা থাকলেও, সৈন্য নামান সহজ ব্যাপার নয়। একবার অবিশ্যি বৃটিশরা নরওয়ের কূলবর্ত্তী লফোটেন দ্বীপে হানা দিয়েছিল, কিন্তু সে ঘটনা ঘটেছিল চকিতে। তারপর নরওয়ে দেশটা পাহাড়ময় এবং সেখানে খুব ঠাণ্ডা। যুদ্ধ করা সেখানে সহজ নয়। জার্ম্মানরা যখন নরওয়ে দখল করেছিল তখন বৃটিশরা তাদের বাধা দেবার জন্যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই কাজে কয়েকখানি বৃটিশ রণতরী নষ্ট হয়েছিল। নার্ভিকে দু'বারকার জলযুদ্ধে বৃটিশ রণতরীবহর জার্ম্মানদের বিমান আক্রমণের জন্যে সুবিধে করতে পারে নি। কাজেই সামরিক নীতি অনুসারে নরওয়ের উপকূলে সৈন্য অবতরণ করানর চেষ্টা কতটা যুক্তিযুক্ত বলা কঠিন।

এখন অবস্থা এই, জার্ম্মাণরা বুঝতে পাচ্ছে না মিত্রপক্ষ ইয়ুরোপের স্থলভাগের কোন অঞ্চলে অবতরণ করবে। ফলে তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়েছে নরওয়ে মেরুঅঞ্চল থেকে স্পেনের সিমানা পর্য্যন্ত এবং ইয়ুরোপের দক্ষিণ উপকূলের পূর্ব্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত। এরূপ বিরাট ব্যূহ রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। তার উপর মিত্রপক্ষের তোড়জোড় ব্যাপক হয়েছে। কাজেই মিত্রপক্ষ ও রুশিয়া যদি একযোগে জার্ম্মানিকে লক্ষ্য করে অভিযান সুরু করতে পারে, তাহ'লে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা সার্থক হবে। মনে হয় এই অভিযানের প্রথমে কূপকাত হবে ইটালি।

চীন-জাপান যুদ্ধের ছয় বৎসর

এল, কে, সেন চৌধুরী

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে নিতান্ত এক তুচ্ছ ঘটনার ওজুহাতে যে যুদ্ধের আগুন জলে উঠেছিল, তার আজও শেষ হয়নি। আজ এই ছয় বৎসর ধরে বহু ক্ষতি স্বীকার করে, অদম্য সাহসে যে জাতি প্রবল পরাক্রান্ত এক শত্রুকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে তাদের কথা জানবার জন্য বিশ্বের সকল লোকেই আজ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তোমাদের কৌতূহল হওয়াও স্বাভাবিক তাই দু' চারটে কথায় তাদের যুদ্ধের কাহিনী তোমাদের বলছি। এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে এই দেশটীর নাম চীন, তার লোকসংখ্যা আমাদের দেশের থেকেও বেশী এবং তার সভ্যতা আমাদের দেশের মত প্রাচীন। চীনের সভ্যতার ইতিবৃত্ত তোমরা হয়তো পড়েছ বা শীঘ্রই পড়বে তাই এখানে আর সে কথা বল্‌ছিনা, তবে চীন জাপানের এই যুদ্ধ লাগবার পূর্ব্বেকার একটু ইতিহাস তোমাদের জানা উচিত। মানচিত্রে তোমরা সকলেই জাপানের অবস্থিতি লক্ষ্য করেছ, এবং দেখেছ সে চীনের কত নিকট প্রতিবেশী। চীনের তুলনায় অতি সামান্য হলেও, অন্ততঃ অনুকরণ ক্ষমতার জন্য জাপান দেখতে দেখতে শক্তিশালী হয়ে উঠল। তার শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় ক্রমে নিজের দেশের চতুঃসীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের দেশেও জাপানী পণ্যের প্রসার কম হয় নি। এর উপর ১৯০৪ সালে রুশ জাপানের যুদ্ধে রুশিয়াকে পরাজিত ক'রে জাপানের আত্মপ্রত্যয় অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিশালী জাতিদের সাথে সে তখন থেকে সমান তালে চল্‌তে সুরু করলে এবং ক্রমেই তার সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রবল হতে প্রবলতর হ'য়ে উঠল। চীন তখন সমর প্রভুদের অত্যাচারে এবং সাম্রাজ্ঞী মাতার স্বেচ্ছাচারীতার দুর্দ্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে। প্রতীচ্যের শক্তিবর্গ চীনে নানারূপ অজুহাত অছিলায়, এবং মাঝে মাঝে শক্তি প্রয়োগ করে চীনের ঐশ্বর্য লুঠনে ব্যস্ত। জাপান এই সুবিধা ছাড়লো না—অনেক দিন থেকেই সে খুটীনাটী নিয়ে চীনের সঙ্গে কলহের সূত্র খুঁজছিল। কলহের সূত্র যারা খোঁজে তাদের তা পেতে বেশী দেরী হয় না। জাপানও এই

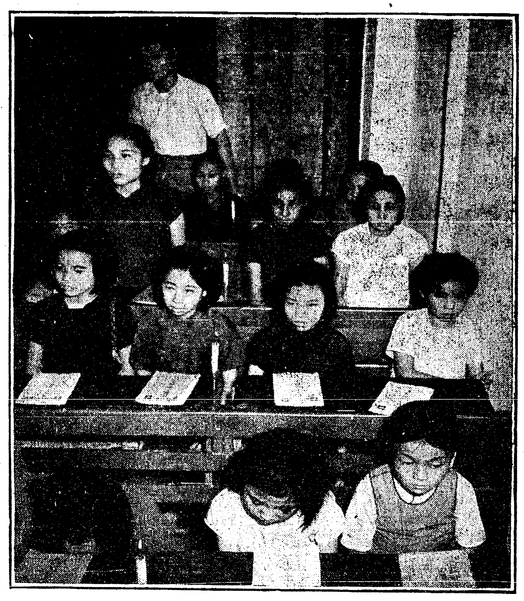

যুদ্ধ চলুক কিন্তু স্কুল বন্ধ হবে কেন? চীন-জাপান যুদ্ধে চীনা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কোনরূপ বিরতি ঘটে নি। এখানে দেখ, বিমান আক্রমণের সময়েও একটি Dug-outএর মধ্যে কেমন একটি স্কুল চলছে।

রকম এক সূত্র ধরে কোরিয়াতে প্রবেশ করে বসলো, সেই সঙ্গে চীন জাপানকে ফর্ম্মোসাও ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হোল। জাপান এই প্রথম এসিয়া মহাদেশে তাঁর নখর বিদ্ধ করলো। তারপর রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় (চীনের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত) প্রবেশ অধিকার লাভ কোরল। কোরিয়া, ফর্ম্মোসা, মাঞ্চুরিয়ার নাম তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ, না পড়ে থাকলে এসিয়া মহাদেশের মানচিত্রে চীনের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে কোথায় কোনটী অবস্থিত।

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হোল ১৯১৪ সালে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ১৯১১ সালে যখন চীনের প্রথম জাতীয় বিপ্লব হয় তখন জাপান চীনে অনেক অধিকার ভোগ করছিল। ১৯১৫ সালে যখন অন্যান্য প্রতীচ্য শক্তিরা ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে বিব্রত তখন সুবিধা বুঝে সে চীনের কাছে ২১ (একুশ) দফার এক দাবী পেশ করলো। দাবীগুলিকে পাঁচটী ভাগে বিভক্ত ছিল। পঞ্চম দাবীটিতে এমন কয়েকটী বিস্ময়কর প্রস্তাব ছিল যা মেনে নেওয়া হ'লে জাপান তৎক্ষণাৎ চীনের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করতে পারতো। এই বিস্ময়কর প্রস্তাবগুলি হচ্ছে চীনাদের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ করা। চীনের গভর্ণমেণ্ট তখন ছিল বিশ্বাসঘাতক উয়ান, সি কাইয়ের অধীনে—সে জাপানের এই দাবীগুলি স্বীকার করে নিলো। ১৯১৫ সালে ২৫শে মে সামান্য সংশোধনের পর চুক্তিটী স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। ক্যানসারের মতন ক্রমে ক্রমে চীনের দেহে জাপানের প্রবেশ সুরু হোল। কিন্তু উয়ান সি কাইয়ের গবর্ণমেণ্ট চীনের প্রকৃত গবর্ণমেণ্ট বলে স্বীকৃত হোত না বলে এবং যুদ্ধের পরে প্রতীচ্য শক্তিবর্গ সুদূর প্রাচ্যের উপর তাদের মনোযোগ দেওয়াতে চুক্তি সর্ত্তগুলিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের পর চীনকে জাপানের সমস্ত দাবী হ'তে মুক্তি দেওয়া হোল।

তার পরের দশ বৎসর চীনের ভিতরকার অন্তর্বিপ্লব ও গণ্ডগোলে কেটে গেল। ১৯২৭ সালের মে মাসে চীনের দ্বিতীয় বিপ্লব শেষ হওয়ার পর কুয়োমিনটাঙ বা জাতীয় দলের নেতৃত্বে ন্যানকিঙে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হোল। ঠিক সেই সময়ে জাপানের পররাষ্ট্র সচিবের পদে ব্যারন্ সিডেহারার স্থানে ব্যারন্ টানাকাকে নিয়োগ করা হোল। তারপর থেকেই জাপান যে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করছে তার ফলে বর্ত্তমান চীন-জাপানের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

১৯২৭ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়ার উপরেই বেশী ঝোঁক ছিল, এই উদ্দেশ্যে তার লক্ষ্য ছিল যাতে চীনাদের নূতন কুয়োমিনটাং বা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তর চীনে তার প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। ব্যারন্ টানাকা জাপানের পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হওয়ার পর জাপানী অধিবাসী ও সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য স্যানটুঙ প্রদেশে একদল সৈন্য প্রেরণ কোরল এবং তাদের আদেশ দিল পেকিঙের রাস্তা অবরোধ করবার জন্য। ব্যারন্ টানাকা সেই সঙ্গে ঘোষণা করলো যে মাঞ্চুরিয়াতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য জাপানকে বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কোন চীনা সৈন্যদলকে মাঞ্চুরিয়াতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। মাঞ্চুরিয়ার চীনা সমর প্রভুর উপর আদেশ হোল সে যেন কালবিলম্ব না করে পিকিঙ পরিত্যাগ করে মাঞ্চুরিয়াতে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ সমর প্রভু জাপানীদের ইচ্ছামত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়ার জন্য যাত্রা কোরলেন, কিন্তু পথিমধ্যে নিহত হ'লেন। তাঁর পুত্র কিন্তু ন্যানকিঙের চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগ দিলেন এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁকে মাঞ্চুরিয়ার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত কোরল। কুয়োমিনটাঙ দলের পতাকা উত্তর-পূর্ব্ব চীনের প্রদেশগুলির সকল স্থানেই উত্তোলিত করা হোল। জাপানীরা এ ব্যবস্থা হজম করতে পারলো না এবং ১৯৩১ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ টোকিওতে জাপানী সরকারের অনুমতি না নিয়েই মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ সুরু কোরল। ১৯৩৩ সালের মধ্যে

জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার সমস্ত প্রদেশগুলি অধিকার কোরল এবং চীনের প্রাচীর অতিক্রম করে চীনের উর্ব্বর সমতলভূমির দিকে তার লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরল। চীন অসহায়ভাবে 'জাতিসঙ্ঘের' নিকট আবেদন করলো কিন্তু কোন ফল হোল না। জাতিসঙ্ঘ কি সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা নিশ্চয়ই আছে। জাতিসঙ্ঘ যদি তখন জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কোরত তাহলে হয়তো আজকের এই মহাসমর বাধতো না। মাঞ্চুরিয়ায় গোলযোগের সময় কতকগুলি ব্যাপার ঘটে যা চীনাদের খুব বিচলিত করে তোলে।

জাপানীদের সম্বন্ধে সমগ্র চীনে এবং বিশেষ করে স্যাংহাইয়ে চীনাদের বিরুদ্ধভাব ক্রমশঃই বেড়ে উঠল। ১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে চীনাদের সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে স্যাংহাইয়ে ৫ জন জাপানী আহত ও একজন নিহত হয়। স্থানীয় জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ স্যাংহাইয়ের মেয়রের কাছে এক দফা দাবী পেশ কোরল এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না কোরে, জাপানী নৌ বাহিনী দ্বারা হঠাৎ আক্রমণ সুরু কোরে দিল। চ্যাপে'র সহরতলীতে যুদ্ধ বেধে গেল। এই পাশবিক ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফল হোল। এই ঘটনার থেকে জাপানীদের অত্যাচার সম্বন্ধে চীনাদের ধারণা বেশ স্পষ্ট হোল;—চীন সরকারও উপলব্ধি কোরলেন জাপানীদের প্রতিরোধ করা একেবারে অসম্ভব নয় কারণ কয়েকদল চীনা সৈন্য অদ্ভুত সাহসিকতার সহিত জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরেছিল এবং চীনা জনসাধারণও যে সাহস ও মনোবল দেখিয়েছিল তা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। জাপানীদেরও এই ঘটনা থেকে বোঝা উচিত ছিল যে নবীন চীনের শক্তি তুচ্ছ কোরবার বস্তু নয়। যা হোক, চীন ও জাপানের মধ্যে তখনকার জন্য একটা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হোল এবং উভয়পক্ষই তাদের সৈন্য সরিয়ে নিল।

পরের পাঁচ বছর উত্তর চীনের সমতল ভূমিতে চীন জাপানের যুদ্ধ প্রকাশ্যে ও গুপ্তভাবে চলতে লাগল। জাপান চীনকে, ভীতি প্রদর্শন করে, শক্তি প্রয়োগ করে এবং কূটনীতির চাল দিয়ে, পঙ্গু করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। জাপানের সামরিক দল মাঞ্চুরিয়ার মতন উত্তর চীনেও তাদের প্রভাব বিস্তার কোরবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোল। এই সময়ে ছোট খাট সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। কোথায় হয়তো চীনারা একজন জাপানী সাংবাদিককে আক্রমণ কোরল অমনি জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ এক দফা দাবী পেশ করে বসল এবং চীনের প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করা বাড়িয়ে দিত। উত্তর চীনের আর্থিক গুরুত্ব জাপানী সামরিক দল ভাল ভাবেই উপলব্ধি কোরেছিল, তাই তারা হোপি, সানটুঙ, সান্সি, চাহার ও সুইউয়ান, উত্তর চীনের এই পাঁচটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে, আলাপ আলোচনা চালাতে লাগল যাতে এখানে একটী স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করা যেতে পারে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে জেনেরল চিয়াঙকাইসেক উপস্থিত হ'লেন এবং প্রদেশের শাসন কর্ত্তাদের জাপানীদের সাথে আলাপ আলোচনা বন্ধ করতে আদেশ দিলেন, ফলে জাপানীদের মতলব ফেঁসে গেল। কয়েক মাস পরে জাপানীরা হোপি ও চাহার প্রদেশে এক তাঁবেদারের অধীনে এক স্বাধীন সাম্ফীগোপাল রাষ্ট্র গড়ে তুলল; মনে হোল যেন জাপানীদের প্রভাব ক্রমে বেড়ে চলেছে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে জেনেরল চিয়াংকাইসেক সমগ্র চীনকে মিলিত করলেন এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে। নূতন গবর্ণমেণ্টের খ্যাতি সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ল, কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের প্রচারকার্য্য কৃষক অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌছল। পিকিঙ ও টিয়েনষ্টিনের ছাত্রেরা জাপানী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু কোরে দিল, এবং তাদের প্রাচীর পত্র ও শোভাযাত্রা দ্বারা চীনা জনসাধারণকে জাগ্রত করে তুলল।

পরের অধ্যায় আরম্ভ হোল ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই যা থেকে বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে। ৭ই জুলাইয়ের আগের দিন পিকিঙের নিকট ওয়ানপিঙ নামে এক সহরে জাপানী সৈন্যদের এক

কুচকাওয়াজও এক মহড়া হয়। সন্ধ্যার সময় সৈন্যরা যখন তাঁবুতে ফিরে এল তখন দেখা যায় একজন জাপানী সৈনিক অনুপস্থিত—তৎক্ষণাৎ তারা ঘোষণা করলে যে জাপানী সৈনিকটীকে চীনারা অপহরণ করেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই অপহৃত সৈনিকটী তাবুতে ফিরে আসার পরও জাপানীরা প্রস্তাব কোরল দুই সৈন্যদলের মধ্যে স্থায়ী গণ্ডগোলের বিহিত করবার উদ্দেশ্যে চীনাদের ও জাপানীদের প্রতিনিধি নিয়ে একটী কমিটি গঠন করতে হ'বে। জাপানী প্রতিনিধিরা তারপর প্রস্তাব কোরল যে চীনা সৈন্যদলকে ওয়ানপিঙ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চীনারা তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাব প্রত্যাখান কোরল। জাপানীরা তখন ওয়ানপিঙ যাবার রাস্তার উপর মার্কোপোলের মার্ব্বেল সেতু অথবা "লুকৌ চাও" এর উপর লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ সুরু কোরল এবং চীনা সৈন্যরাও প্রত্যুত্তরে গুলী বর্ষণ আরম্ভ কোরল। বহুদিন ঠেকিয়ে-রাখা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

যে ঘটনাটী থেকে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হোল তার জন্য জাপানীরা আয়োজন করে রেখেছিল। অপহৃত জাপানী সৈনিকটীকে অনুপস্থিত হবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয় তাই চীনাদের গ্রহণ করতে বলা হ'য়েছিল।

চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বুঝতে পারলেন যে এই ঘটনা হতে বেশ বড় রকমের যুদ্ধই এবার আরম্ভ হবে। জাপানী সৈন্য আগিয়ে চলতে লাগল এবং পেকিঙ অধিকার কোরল। ১৩ই আগষ্ট তারা স্যাংহাই আক্রমণ কোরল এবং সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ভীষণ ভাবে বোমা বর্ষণ সুরু হোল। বিপক্ষের বিপুল সৈন্যাধিক্যের জন্য চীনারা অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে হটে যেতে লাগল। ইয়াংট্‌জী নদীর উপত্যকা দিয়ে তারা অগ্রসর হোতে লাগল এবং এক মাসের মধ্যে ন্যানকিঙ অধিকার করে ফেলল। চীনা সরকার ইতিপূর্ব্বেই চুংকিঙে সরে এসেছেন। তখন চীনাদের যুদ্ধকালীন রাজধানীতে জাপানীরা ভীষণভাবে বোমা বর্ষণ আরম্ভ ক'রে দিল। তারপর তারা ক্যানটন, হানকাও অধিকার কোরল। এইরূপে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সহর ও বন্দরগুলি অধিকার করবার পর জাপানীরা ঘোষণা করলো যে চীনাদের প্রতিরোধশক্তি নির্ম্মূল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হানকাও অধিকার করবার পর তারা আর বেশী অগ্রসর হ'তে পারেনি; এবং ইতিমধ্যে চীনাদের যুদ্ধ করবার শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে সাথে জাতির বিশ্বাস ও মনোবলও বৃদ্ধি পেয়েছে। হানকাওয়ের পর, মধ্য-চীনে জাপানীরা কেবল ন্যানচ্যাঙ ও ইচাঙ অধিকার করেছে। জাপানীরা প্রত্যেক যুদ্ধে চীনাদের কাছ থেকে গুরুতর আঘাত পেয়েছে এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বিশেষ করে চাংসার যুদ্ধগুলিতে এবং এই বছরে জুন মাসে হুপে-হুনান যুদ্ধে।

যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার সময় থেকেই চীনের সেনাপতিমণ্ডল জানতেন যে শত্রুকে পরাজিত করতে হ'লে, যুদ্ধকে যত দীর্ঘস্থায়ী করা যায় ততই ভাল। জাপানী সৈন্যদেরকে ক্রমে ক্রমে চীনের অভ্যন্তরে তাদের সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে আসতে হ'বে। রেলপথের সীমানা বাইরে যেস্থানে ভাল বাঁধান-রাস্তা নাই, এইরূপ স্থানে তাদেরকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে চীনা গেরিলা বাহিনী তাদেরকে বিপর্য্যস্ত করে তুলতে পারবে। তাদের যাতে প্রভূত অর্থ ও সমরোপকরণ খরচ হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে, যার ফলে তারা শেষ পর্য্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যায়।

সেইজন্য চীনারা সমতলভূমিতে এবং নদীউপত্যকায় শত্রুকে বিশেষ বাধা দেয়নি। চীনা সৈন্যদের জাপানী সৈন্য অপেক্ষা অনেক বেশী সাহস মনোবল ও লোকবল থাকলেও তাদের না ছিল ট্যাঙ্ক না ছিল বন্দুক, বা কামান যা ছাড়া আধুনিক যুদ্ধে সফল হওয়া একেবারে অসম্ভব। জাপানীরা তাদের যুদ্ধজাহাজগুলির কামান

দিয়ে চীনাদের নদীতীরবর্ত্তী সহরগুলিকে ধ্বংস করে দিতে লাগল। এইরূপ অবস্থায় যদি চীনারা তাদের নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী সহরগুলি রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা কোরত, তাহলে তারা সফল তো হোতই না বরঞ্চ তাদের যে ক্ষতি হোত তা পূরণ করা অসম্ভব হোত। সেইজন্য একটীর পর একটী সহর পরিত্যাগ করে আসা চীনাদের রণনীতির একটী প্রধান অংশ ছিল।

এই বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় জাপানীরা যে এত সহজে অগ্রসর হতে পেরেছিল তার কারণ তারা চীনে প্রায় সমস্ত রেলপথই অধিকার করতে সক্ষম হ'য়েছিল। কয়েক মাইল দীর্ঘ লৌহপথ এবং তার সঙ্গে কয়েকটী সহর অধিকার করলেই একটী বিরাট দেশকে পদানত করা যায় না। জাপান এ সত্য হয়তো এতদিনে বুঝতে পেরেছে। যদিও প্রত্যেক অধিকৃত অঞ্চলে তারা তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে সাক্ষীগোপাল শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেছে তারা কোনস্থানেই নিরুদ্বেগে শাসনকার্য্য চালাতে পারছে না। চীনারা যে এই জাপানী সাক্ষীগোপালদের কেমন ঘৃণা করে তা তারা জানে। জাপানী সৈন্যরাও অধিকৃত অঞ্চল থেকে ভিতরে বেশীদূর অগ্রসর হতে সাহস করে না, কারণ চীনা গেরিলারা সকল সময়ে সকল স্থানেই ওৎ পেতে বসে আছে।

চীনকে এইভাবে জয় করা অসম্ভব—দেশটী জাপানীদের পক্ষে বড্ড বড় এবং লোকসংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। চীনের লোকসংখ্যা শত্রুর তুলনায় পাঁচগুণ। শত্রুর একটীর স্থানে চীনাদের পাঁচটী নিহত হ'লেও যুদ্ধ চীনাদের বিরুদ্ধে যাবে না। যদি উভয়পক্ষের ক্ষতি সমান সমান হয় তা'হলে জাপানের পক্ষে চীনকে জয় করা একেবারে অসম্ভব। স্যাংহাইয়ের যুদ্ধে চীনাদের ক্ষতির পরিমাণ শত্রুর অপেক্ষা অনেক বেশী হলেও হানকাওয়ের পতনের পর থেকে দু'পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ সমান সমানই চলেছে। সান্সি প্রদেশের গেরিলা যুদ্ধে সময়ে সময়ে শত্রুর ক্ষতির পরিমাণ চীনাদের তুলনায় ১৪গুণ বেশী হয়েছে বলে জানা গিয়াছে। উপরের ঘটনাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, সময়, স্থান ও লোকবল সকলই চীনাদের পক্ষে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে চীনা কৃষকেরা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছে যে শত্রুকে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিহত করে যেতে হবে, এবং ফলে তারা চীনা সৈন্যদের বহুবিধ উপায়ে সাহায্য করছে। চীনা কৃষক ও জনসাধারণের এই অদ্ভুত জাগরণে চরম বিজয় সম্বন্ধে চীনাদের কোন সন্দেহ নাই। শান্তিপ্রিয়, স্বাধীন জীবন-যাত্রার পক্ষপাতী, এবং অশিক্ষিত লোকদের এইরূপ জাগরণের মূলে রয়েছে জাপানীদের বীভৎস অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নির্দ্দয়তা। চীনা কৃষকদের মতন শান্তিপ্রিয় লোক কদাচিৎ দেখা যায়, তারা যুদ্ধকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, শত্রু যে তাদের শস্যক্ষেত্রের উপর যুদ্ধ চালাবে এ কল্পনা তাদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করে। তারা তাদের গৃহ, তাদের জমিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। চীনের এই কৃষককূলও আজ জেগে উঠেছে, তাদের শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আলস্য ত্যাগ করে আজ সক্রিয়ভাবে চীনাসৈন্যদের যথাসাধ্য সাহায্য দিচ্ছে যাতে শত্রুর লুণ্ঠন থেকে তারা অব্যাহতি পায়।

প্রাচীন চীন আজ জাগ্রত, সংঘবদ্ধ। তার শক্তির পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কামান বন্দুক দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। তাদের একতা, সাহস, দৃঢ়তা এবং মনোবলই আজ তাদের শক্তি ও অমূল্য সম্পদ। তাই ছয় বৎসর যুদ্ধ করেও আজ তাদের ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই। অপরিসীম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তারা এক নিষ্ঠুর বর্ব্বর শত্রুকে বাধা দিয়ে এসেছে এবং চরম জয় না হওয়া পর্য্যন্ত তারা সমান বিক্রমে শত্রুকে বাধা দিয়ে যাবে।

আশ্চর্য্য স্তালিনগ্রাদ

ভানু গুপ্ত

[স্তালিনগ্রাদের নাম আজ কে না জানে? কিছুদিন আগে এই সহরে যে যুদ্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবীতে কোথাও কোনো কালে সে রকম যুদ্ধ হয়নি। এরকম প্রচণ্ড আক্রমণও কোনো জায়গার উপর কখনও হয়নি এবং এরকম অদ্ভুত প্রতিরোধও কোনো দেশের লোক কখনও করেনি। এই যুদ্ধ লোককে অবাক করে দিয়েছে। স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করেছিল জার্মানরা। তাদের পক্ষে শুধু নিজেদের দেশের সৈন্যই ছিল না—ইতালী, হাঙ্গারী, রুমানিয়া, ক্রোশিয়া, স্লোভাকিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সৈন্যেরাও যোগ দিয়েছিল। তাদের আক্রমণ ঠেকিয়েছিল একা সোভিয়েট দেশ—সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী লালফৌজ এবং সোভিয়েট দেশের জনসাধারণ, মেয়েপুরুষ, ছেলে বুড়ো সবাই। জার্মানরা অসংখ্য সৈন্য, ট্যাঙ্ক, কামান, বিমান প্রভৃতি আধুনিক সব রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করেছিল এবং তিনমাস ধরে দিন রাত এই আক্রমণ চালিয়েছিল। শহরের মধ্যেও তারা ঢুকেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্তালিনগ্রাদ তারা দখল করতে পারেনি। উল্টে জার্মানীর পক্ষে যত সৈন্য স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করতে গিয়েছিল তারা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্দ্ধর্ষ জার্মানীকে যে এ-ভাবে পরাজিত করা যায় তা কারো কল্পনাতেও ছিল না। স্তালিন-গ্রাদের যুদ্ধ তাই সকলকে অবাক করে' দেয়; শুধু অবাক করা-নয়, সকলের চোখ খুলে দেয়। লোকে বুঝতে পারে যে, জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠা অসাধ্যসাধন করতে পারে। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, নিজের দেশকে যদি মনেপ্রাণে ভালোবাসা যায়, নিজের দেশের ভাইবোনের সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থাকে বজায় রাখবার সঙ্কল্প যদি আন্তরিক হয়, তাহলে কোনো বিরুদ্ধশক্তি, সে যত সাংঘাতিকই হোক, জয়লাভ করতে পারে না। সাধারণ নরনারী দিনের পর দিন প্রাণ তুচ্ছ করে', সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ্য করে' লালফৌজকে সাহায্য দেয় এবং দরকার হলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাই স্তালিনগ্রাদের সংগ্রামের ফল এমন হয়। স্তালিনগ্রাদ এই কারণেই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।]

ভল্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্তালিনগ্রাদ শহর সোভিয়েট শ্রমশিল্পের একটা প্রকাণ্ড কেন্দ্র। এখানে ট্রাক্টর আর ট্র্যাক্টর তৈরীর বড় বড় কারখানা আছে। শহরটা লম্বায় ত্রিশ মাইলেরও বেশী; লোকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ। আগে এর নাম ছিল জারিৎসিন। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মানে মজুর-চাষী প্রভৃতি যারা পরিশ্রম করে। সমস্ত জিনিষ তৈরী করে, ফসল ফলায়, কারখানায় সব রকম জিনিষপত্র উৎপন্ন করে তাদের রাজত্ব হ'ল। অন্য সব দেশে তাদের খাটুনির ফল অল্প কয়েকজন বড় লোক ভোগ করে, অথচ যারা সব কিছু তৈরী করে তারা পেট ভরে খেতে পায় না, জীবনে তাদের কোনো সুখ সুবিধে নেই। রুষিয়ার বিপ্লবের ফলে এই অবস্থা দূর হয় এবং সমস্ত সম্পত্তি সকল লোকের হয়। এতে অন্য সব দেশের কর্ত্তারা ক্ষেপে গিয়ে রুশধনীদের সাম্‌নে খাড়া করে' রুশিয়াকে (বিপ্লবের পরের নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন) আক্রমণ করে। কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলে এবং অবশেষে বিপ্লবীরা জয় লাভ করে। সেই সময় ১৯১৮ সালে জারিৎসিন শহর শত্রু আক্রমণে ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়ে। বর্ত্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ নেতা এবং সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক স্তালিন তখন অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে বিপ্লবী বাহিনীকে সংগঠন ও পরিচালনা করে' জারিৎসিনকে বাঁচান। তাঁর প্রতি সম্মানে তাই জারিৎসিনের নাম হয় স্তালিনগ্রাদ। এক দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে জারিৎসিনের আগের ঘটনাটাই আর একবার ঘট্‌ল, তবে অনেক বেশী বড় করে' এবং অনেক বেশী স্পষ্টভাবে।

যাক্ সে কথা, এই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের কথা বলি। জার্মানরা গত বছর জুনমাসের গোড়ায় দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে' স্তালিনগ্রাদ এলাকায় এসে পড়ে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দুই দিক থেকে তারা আসে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রথম সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করে। তারপর

আরম্ভ হ'ল খাস্ স্তালিনগ্রাদের উপর ভীষণ আক্রমণ। সে যে কী ভয়ঙ্কর আক্রমণ তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। স্তালিনগ্রাদ এলাকায় ২০০০ বিমান বোমা বর্ষণ করতে থাক্‌ল। সে রকম প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ তার আগে কোথাও হয় নি। সেই সঙ্গে জার্মানরা ৪০ ডিভিসন অর্থাৎ কম্‌সে কম ৫ লক্ষ সৈন্য দিয়ে শহরের উপর আক্রমণ চালাল। একবার ভেবে দেখো কি ব্যাপার। একটিমাত্র শহরের উপর আক্রমণ চল্‌ছে ৫ লক্ষ সৈন্য ১০০০ বিমান এবং হাজার হাজার ট্যাঙ্ক। বাইরে থেকে সকলেই মনে করল জার্মানরা স্তালিনগ্রাদ সহজেই দখল করে' নেবে। জার্মানরা নিজেরাও সে কথা প্রচার করতে লাগ্‌ল। কিন্তু তারা তখনও জান্‌ত না, লালফৌজ এবং সোভিয়েটের মেয়েপুরুষরা কি ধাতুতে গড়া, তারা জান্‌ত না সোভিয়েট নেতাদের সংগঠনের ক্ষমতা কি আশ্চর্য্য এবং সামরিক জ্ঞান কত বেশী।

সোভিয়েটের পক্ষে স্তালিনগ্রাদ রাখ্‌তেই হবে, নইলে ভলগা নদীর পথ বিচ্ছিন্ন হবে, ককেশ্যাস আলাদা হ'য়ে যাবে এবং পেছন থেকে রাজধানী মস্কো আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে; এক কথায় সোভিয়েটের সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে আস্‌বে। তা ছাড়া পাল্টা আঘাতে জার্মানদের ঘায়েল করবার প্ল্যান সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ করছিলেন তাও বানচাল হয়ে যাবে, যদি না স্তালিনগ্রাদ টিকে থাকে। সুতরাং স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ স্তালিনগ্রাদ-রক্ষীদের হুকুম দিলেন, যে শেষ লোক বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত তাদের লড়াই চালাতে হবে। স্তালিন বলে' পাঠালেন যে শিশুরা মেয়েরা বুড়োরা এবং কাপুরুষেরা যেন শহর থেকে চলে যায়। তোমরা ভাব্‌ছ দলে দলে লোক বুঝি এই সুযোগে পালাতে লাগ্‌ল। তা নয়। শিশু ও বুড়োদের যথাসম্ভব সরিয়ে দেওয়া হ'ল; কিন্তু বেশীর ভাগ অধিবাসী গেল না। মেয়েরা রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পুরুষদের পাশে যুদ্ধ করবার জন্যে। জার্মানরা ভীষণ বাধা পেতে লাগল। তাদের পক্ষে সৈন্য ও অস্ত্রের পরিমাণ সোভিয়েটের তুলনায় অনেক বেশী ছিল; সেই জন্যে তাদের অগ্রসর হওয়া একেবারে বন্ধ হ'ল না। কিন্তু তাদের সৈন্য খুব বেশী সংখ্যায় হতাহত হ'তে লাগল। নাৎসীরা প্রথমে ভেবেছিল এক অস্ত্রের জোরেই সোভিয়েটকে ঠাণ্ডা করে দেবে। কিন্তু কাজে দেখা গেল, সোভিয়েট পক্ষ অস্ত্রে অনেকটা কম হলেও, তাদের অস্ত্রবলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মনোবল, যার ফলে তারা দুর্জ্জয় হ'য়ে উঠেছে।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই, তাতে তোমরা এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের প্রমাণ পাবে। স্তালিনগ্রাদে যাওয়ার পথে এক জায়গায় একটা ঢিপি ছিল। শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে এই ঢিবিটা খুব দরকারী। মাত্র ১৬ জন সোভিয়েট সৈন্য এই ঢিবি রক্ষা করতে থাকে। জার্মান ও ইতালীয়ান টমিগানধারী সৈন্যেরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা সমস্ত আক্রমণ হটিয়ে দিল। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে রাত হ'য়ে গেলো। কয়েক ঘণ্টার জন্যে যুদ্ধ বন্ধ হ'ল। কিন্তু ভোর হতে না হতে শত্রুর ১২ খানা ট্যাঙ্ক ঢিবি চড়াও করল। তখন সোভিয়েট সৈন্যেরা আর ১৬ জন নয়; তাদের অনেকে মারা গেছে। একজন অফিসার মুমূর্ষু। হাত বোমা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো অস্ত্র নেই। এই অবস্থায় সেই কয়জন সোভিয়েট সৈন্য কি করল জানো? তারা নিজেদের শরীরে এক তাড়া করে হাতবোমা বেঁধে নিয়ে ট্যাঙ্কগুলোর চাকার নীচে ঝাপিয়ে পড়্‌ল; সেনাপতির আদেশ নয়, নিজেদের ইচ্ছায়। বোমা ফেটে ট্যাঙ্কগুলো উড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাও। এই অবসরে নতুন সোভিয়েট সৈন্যদল ঘাঁটি আগলে দাঁড়াল।

এই প্রতিরোধের মুখে জার্মান সেনাপতিরা ক্রমাগত নতুন নতুন সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানী করে স্তালিনগ্রাদ শহরতলিতে ঢুকে পড়ে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। তখন শহরের ভিতরে যুদ্ধ সুরু হয়। সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ; ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। সোভিয়েট সৈন্যেরা এবং স্তালিনগ্রাদের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে এক

ইঞ্চি জমি ছাড়বে না। তারা কিছুতেই ঘাবড়ায় না। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে, বাড়ীতে বাড়ীতে। শুধু তাই নয়; এক একটা বাড়ীর ভিতরে একতলায় দোতলায় বা দোতলার তেতলায় কিংবা তেতলায় চারতলায়। যুবক সেনাপতি রোদিস্তসেভের পরিচালনায় সোভিয়েট ১৩ নং গার্ড ডিভিসন এইভাবে যুদ্ধ করতে লাগল। শুধু সৈন্যেরাই নয়, তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন রাইফেল ও হাতবোমা নিয়ে মেয়েরা এবং সাধারণ অধিবাসীরা। যুদ্ধ সবচেয়ে প্রচণ্ড হয় সহরের উত্তরাংশের খোলা অঞ্চলে। কিন্তু শ্রমিকরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কাজ বন্ধ করে নি। তারা রাইফেল পাশে রেখে কাজ করেছে; যখন শত্রু এসে কারখানায় ঢুকে পড়েছে তখন তারা রাইফেল নিয়ে লড়াই সুরু করে' দিয়েছে। তাই সোভিয়েট লেখক সিমোনোভ স্তালিনগ্রাদ লড়াই দেখে বলেন, "স্তালিনগ্রাদে কোনো অধিবাসী নেই, সকলেই রক্ষী।"

শহরে ঢুকে জার্মান ও অন্যান্য ফাশিস্ত সৈন্যদের এক পা এক পা করে' অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় থাক্‌ল না। সোভিয়েট রক্ষীদের বীরত্বে ও রণকৌশলে তাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য হতাহত হ'তে লাগল। পথে ঘাটে, বাড়ীর মধ্যে সিড়ির পাশে, বৈঠকখানায়, রান্নাঘরে, ফুলবাগানে সর্ব্বত্র নিহিত জার্মান সৈন্যদের মৃতদেহ স্তূপ হ'য়ে উঠল। এই সব বিবরণ থেকে তোমরা কল্পনা করে' নাও কি রকম অদ্ভুত যুদ্ধ স্তালিনগ্রাদে হয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু হিটলার থেকে আরম্ভ করে' নাৎসী-জার্মানীর সমস্ত নেতা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের প্রথম অনুমান ভুল হয়েছে। নিছক বেশী পরিমাণ সৈন্য ও অস্ত্রের জোরে সোভিয়েট যোদ্ধাদের পরাজিত করা দুঃসাধ্য। সেইজন্যে তারা সুর বদলাতে সুরু করে' দেয়। তারা বল্‌তে আরম্ভ করে যে, রুশদের মন পশুর মতো কিনা তাই তারা এমন হিংস্রভাবে বাধা দিচ্ছে। তবে তারা মোটামুটি তাদের দেশবাসীকে সতর্ক করে' দেয় যে, রুশরা ভেঙে পড়বে এ প্রত্যাশা যেন কেউ না করে। জার্মান কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করল, যেমন করে' হোক সোভিয়েট সৈন্য ও অধিবাসীদের মনোবল চূর্ণ করতে হবে, তাদের জীবনযাত্রা অচল করতে হবে। তার জন্যে জার্মানরা কোনো চেষ্টার বাকী রাখল না। প্রথমে তারা বিমাণ থেকে ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে বোমা বর্ষণ করতে লাগল। সে এমন বোমাবর্ষণ যে, আমাদের কল্পনাতেও ঠিক আসে না। স্তালিনগ্রাদ শহরের সোভিয়েট এলাকা উপর থেকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে' নিয়ে প্রত্যেক ভাগের উপর অজস্র বোমা ফেলা হ'ল; মনে হ'ল সে রকম বোমা বৃষ্টির পর নীচে কোথাও কিছু বেঁচে থাক্‌তে পারে না। তারপর জার্মানরা আন্‌ল অনেক বড় বড় কামান এবং তাই দিয়ে শহরে গোলা বৃষ্টি করতে লাগল। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বলেছেন, একটা জায়গার উপর এ রকম প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ "ইতিহাসে কখনও হয়নি।" কিন্তু এই বোমা ও গোলা বর্ষণের পর যখনই জার্মান সৈন্যেরা অগ্রসর হতে গেছে তখনই কোথা থেকে সোভিয়েট যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে আগের মতোই তাদের রুখেছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। ভল্‌গার ওপর থেকে যাতে খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র বা সৈন্য কোনো সরবরাহ স্তালিনগ্রাদে না পৌছতে পারে সেজন্যে জার্মানরা ভল্‌গার উপর সাংঘাতিকভাবে বিমান-আক্রমণ চালিয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সরবরাহ বরাবর স্তালিনগ্রাদে পৌচেছে। প্রতিপক্ষের লোকদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে এবং তাদের শ্বাস রুদ্ধ করবার জন্যে জার্মানরা শহরের বাইরের ঘাসের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে; তবুও প্রতিপক্ষ টলেনি। ব্যাপারটা শুনতে যেন ম্যাজিক। কিন্তু ম্যাজিক তো নয়। এর পেছনে সোভিয়েট সৈন্য ও নরনারীর কি ক্ষতি, কি প্রাণহানি, কি দুঃখকষ্টের কাহিনী রয়েছে, তা কল্পনা করে' দেখ। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে' ঘর বানিয়ে সেখানে জেনারেল রোদিস্তসেভ এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা বসে' আছেন; বারুদের ধোঁয়ায় চারদিক নিঃশ্বাস আট্‌কে আসে, দেশলাই পর্য্যন্ত জ্বালা যায় না। ভাঙা বাড়ীর আনাচে কানাচে

সোভিয়েট যোদ্ধারা লুকিয়ে রয়েছে; আশে পাশে মৃত্যু ঝরে পড়ছে। অর্দ্ধাহারে অনিয়মিত আহারে শহর-বাসীরা দিনযাপন করছে, তার মধ্যে শত্রু-আক্রমণে অনেকে অনিবার্য্য মৃত্যু বরণ করেছে; তাদের একটা ঘর বাড়ীও আস্ত নেই, শহর শ্মশান হয়েছে। রাতের অন্তকারে মাল নিয়ে ভল্‌গা পার হ'তে গিয়ে হয়তো মাঝিদের উপর সন্ধানী আলো এসে পড়েছে আর আরোহীদের নিয়ে নৌকা বোমার আঘাতে জলে ডুবেছে। এইসব বাস্তব অবস্থা কল্পনা করো আর কল্পনা করো কি অসীম মনের জোর তারা দেখিয়েছে; ভেবে দেখ, কি গভীর দেশপ্রেম এবং আদর্শের প্রতি কি অটল অনুরাগ থাকলে এই মনোবল জন্মায়।

জার্মানদের তুলনায় সোভিয়েটের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র কম থাকায় স্তালিনগ্রাদকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস যে সামরিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সে সঙ্কট ভুলে গেলে চল্‌বে না। জার্মানরা ভল্‌গার তীর পর্য্যন্ত পৌঁচেছিল, একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। সেইজন্যে সেপ্টেম্বরের শেষে হিটলার দম্ভ করে জার্মানদের বলেন, "তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, স্তালিনগ্রাদ নেওয়া হবে।" তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, স্তালিনগ্রাদরক্ষীরা সংগ্রামে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পাল্টা আঘাতে যে জার্মানদের ধ্বংস করবার সামরিক প্ল্যান গোপনে গোপনে করছেন তাও তিনি তখন জান্‌তেন না। কিন্তু ৫১ দিনে অবিরাম যুদ্ধ করবার পর শ্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল জার্মানদের, সোভিয়েট যোদ্ধাদের নয়। শীতও এসে পড়ল। জার্মানরা তখন মরিয়া হ'য়ে একটা শেষ আক্রমণ করল স্তালিনগ্রাদ দখলের জন্যে। শহরের উত্তর অংশে কারখানা অঞ্চলে শুধু একটা সঙ্কীর্ণ জায়গায় তারা ৩০ ডিভিসন সৈন্য, ৫০০ ট্যাঙ্ক, ২২০০ কামান এবং ৮০০ বিমান নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করল। কিন্তু তাদের এই শেষ ও সবচেয়ে তীব্র আক্রমণও সোভিয়েট যোদ্ধারা ব্যর্থ করে' দিলে। ব্যস্। এর পরই জার্মানরা আক্রমণ ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষায় মন দিল। শহররক্ষীরা পাল্টা আক্রমণ করতে লাগল। কিন্তু জার্মানরা বাধা দিতে লাগল এবং অনেক জায়গা থেকে তাদের কিছুতেই হটানো গেল না।

এই সময় নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দেখা গেল, স্তালিনগ্রাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে দুই বিরাট সোভিয়েট বাহিনী হঠাৎ অতর্কিতে প্রচণ্ড আক্রমণে এগিয়ে আসছে। স্তালিন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের সামরিক প্ল্যান এবার বোঝা গেল। জার্মানও বুঝল, কিন্তু বড় দেরীতে। তারা তখন দীর্ঘ দিন অজস্র সৈন্য নষ্ট করে' লড়াই চালিয়ে বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে এবং দুদিক থেকে তারা যে এভাবে আক্রান্ত হবে তা তারা ভাবেও নি। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন এই আক্রমণের আয়োজন করেছিলেন এবং আঘাত করবার ঠিক সময়টার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাজা নতুন সোভিয়েট সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণ জার্মারা ঠেকাতে পারল না, অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে সমগ্র জার্মান সৈন্যবাহিনী ঘেরাও হ'য়ে পড়ল। ২৪শে নভেম্বর উত্তর দিকের সোভিয়েট বাহিনী এসে শহরের কারখানা-এলাকায় রক্ষীদের সঙ্গে হাত মেলাল। তখন জার্মানদের উপর আরম্ভ হ'ল ভীষণ আক্রমণ। লালফৌজ একটার পর একটা রাস্তা, বাড়ী ও কারখানা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগল। জার্মান বাহিনী তখনও বিরাট ছিল; সেই জন্যে তারা সঙ্গে সঙ্গেই মারা পড়ে নি। মাস দুয়েক সময় লাগে। এই বছর জানুয়ারী মাসের মধ্যে শহরের ভিতরে ও বাইরে সমস্ত স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে সমগ্র জার্মান বাহিনী নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। সমস্ত সেনাপতি সমেত এক লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী হল, বাকী সব সৈন্য নিহত হল এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লালফৌজ দখল করল। সাড়ে পাঁচ মাস পরে স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ শেষ হ'ল। জার্মানী তার জীবনে কখনও এরকম শোচনীয় ভাবে কারো কাছে হারে নি। আর সোভিয়েট যে সামরিক কৃতিত্ব দেখায় তাও কেউ কখনও দেখাতে পারে নি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে সোভিয়েটের এই বিরাট জয়ের মূলে রয়েছে স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধ। স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েট

সৈন্যেরা এবং তাদের সাথী সমস্ত মেয়ে পুরুষ সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে যে রকম অটলভাবে দিন রাত লড়াই চালিয়ে গেছে তার ফলেই শেষ পর্য্যন্ত জার্মানদের এমন নিদারুণ পরাজয় ঘটেছে।

সোভিয়েট দেশের সৈন্য এবং সাধারণ অধিবাসীরা এই শক্তি কোথা থেকে পেল সেই কথাটাই যেন আমরা বুঝি। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের আসল কথা তাই। সোভিয়েটের নরনারী সকলে তাদের দেশকে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে। তারা স্বদেশকে শত্রুর দখলে যেতে দিয়ে স্বাধীনতা হারাতে চায় না। তাদের এই দেশপ্রেম আরো জোরালো হয়েছে এই কারণে যে, তাদের দেশে তারা এক নতুন সমাজ গড়ে' তুলেছে। সে সমাজে গরীব বড়লোক নেই, দেশের সমস্ত জিনিষের উপর সেখানে সকলের সমান অধিকার, শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান সমৃদ্ধি সব তাতেই সকলের সমান অংশ। দেশকে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন সমাজকেও তারা বাঁচাতে চায়। এর সঙ্গে আছে দেশের নেতাদের উপর তাদের অবিচল বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকারই কথা; কারণ এই সব নেতা, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, তাদের এক নতুন সমাজে পৌঁছে দিয়েছেন এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে নিয়ে চলেছেন। এই সমস্ত মিলে সোভিয়েট দেশবাসীর মনে ও কাজে এক অপূর্ব্ব শক্তি বিকাশ লাভ করেছে, যা কোনো বাধাবিঘ্ন মানে না। বাইরে থেকে যারা সোভিয়েট অধিবাসীদের এই দেশপ্রেম ও আদর্শানুরাগ এবং সোভিয়েট নেতাদের অদ্ভুত গঠন-ক্ষমতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা বোঝে নি, তারা স্তালিনগ্রাদের আশ্চর্য্য যুদ্ধের গতি ও ফলাফল দেখে হতভম্ব হয়েছে। আর এই বিষয়গুলো না বোঝার জন্যে শত্রুর কি দশা হয়েছে, তা তোমরা শুন্‌লে।

দেশরক্ষার জন্যে জনযুদ্ধ

অন্নদা ভট্টাচার্য্য

প্রায় সাত বছর আগে জাপানী ফ্যাশিষ্ট সৈন্যের দল ডাকাতের মত চীনদেশ আক্রমণ করে, তা বোধ হয় তোমরা শুনেছ। জাপানীদের হাতে অনেক অস্ত্র শস্ত্র, আর চীনাদের প্রায় কিছুই নেই। তবুও ছয় বছর ধরে চীনারা দেশের জন্যে লড়ছে, জাপানী গুণ্ডাদের রুখে রেখেছে। কেমন করে পারল? একটা সত্যি কাহিনী শোনো, তা হলে বুঝবে।

চীনাদের একটা গ্রাম একদিন একদল জাপানী সৈন্য হঠাৎ এসে দখল করল। অত্যাচারের ভয়ে গ্রামের যে পারল সেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে কাছাকাছি বনে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। শুধু কতকগুলি ছোট ছেলে গ্রামে রয়ে গেল, কারণ তারা তাড়াতাড়ি পালাতে পারেনি। সৈন্যরা গ্রামবাসীদের বাড়ীতে ঢুকে দামী জিনিষপত্র সমস্ত লুঠ করল। তাদের ভাঁড়ারের সমস্ত খাবার দাবার যা পারল খেল। তারপর আরও মৌজ করতে হবে বলে মদ খুঁজতে লাগল। মদ কোন্ বাড়ীতে কোথায় পাওয়া যাবে তারা জানে না। গ্রামের বাচ্চা ছেলেগুলিকে ধরে ধমকাতে লাগল—কোথায় মদ আছে বল্? ভয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। একটী ছেলে ছিল খুব চালাক, তার মাথায় এক ফন্দী এল। সে যেন খুব খোসামোদের সুরে বল্ল, "আসুন, আসুন, আমি আপনাদের মদ কোথায় দেখিয়ে দিচ্ছি।" গ্রামের বড়লোকের বাড়ীর মাটির নীচের ঘরে মদের বড় বড় জালা থাকে

তা সে জানত। সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে সেই বাড়ীর 'হল'ঘরে সে খুব তোয়াজ ক'রে বসাল। তারপর সব ছেলে মিলে পাত্র ভরে মদ এনে তাদের খাওয়াতে লাগল।

মদের লোভে সব সৈন্যই এসে সেখানে জুটেছে, মাতালও হয়ে পড়েছে প্রায় সবাই। ছেলেটীর উপর তারা খুব খুশী, সে তখন তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র। ছেলেটী যেমন ইচ্ছে আসছে যাচ্ছে সেদিকে সৈন্যদের ভ্রূক্ষেপও নেই। খানিকক্ষণ পরে সৈন্যরা যখন বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে, তখন তার সঙ্গীদের চুপি চুপি বল্ল, 'তোরা এদের মদ দিতে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি।' বলে সে বাড়ী থেকে বার হয়ে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে বনের দিকে পাড়ি দিল। বনে পৌঁছে গ্রামবাসী সমস্ত জোয়ান-মরদকে এক ক'রে বল্ল, "জাপানী ডাকাতেরা এখন নেশায় চুর, এইবেলা ওদের আক্রমণ করলে ওরা ঠেকাতে পারবে না। তোমরা চল সবাই।"

গ্রামবাসীরা বল্ল, যে একেবারে খালি হাতে তারা কি ক'রে যাবে? ছেলেটী বল্ল, "তার জন্যে ভাবনা কি? এখন তো ওরা সব বড়লোকের বাড়ীতে আড্ডা দিচ্ছে। তোমরা চুপি চুপি যে যার নিজের বাড়ীতে ঢুকে দা-কুড়ুল-কাস্তে-লাঠি যা কিছু পাও নিয়ে ওদের ওপর চড়াও হও। দু একজন শান্ত্রী বন্দুক নিয়ে এত লোককে কি ক'রে ঠেকাবে? বাকী সবাই তো নেশায় চুর!"

তখন দা-কুড়ুল যে যা পেল চুপি চুপি তাই সংগ্রহ ক'রে আড়ালে আড়ালে বড় লোকের বাড়ীর কাছে গিয়ে হুড়মুড় ক'রে সমস্ত গ্রামের লোক তার ভেতর ঢুকে পড়ল। বন্দুক কাঁধে তুলবার আগেই তারা শান্ত্রী দুজনকে মেরে শুইয়ে দিল আর ঘরের ভিতরে সমস্ত মাতাল জাপানী সৈন্যকে তারা কেটে টুকরো টুকরো করে দিল। তারপর সেই সব সৈন্যের বন্দুক, বোমা প্রভৃতি সমস্ত হাতিয়ার নিয়ে তারা আবার গ্রাম থেকে সরে পড়ল।

এখন থেকে তারাই হয়ে দাঁড়াল দেশরক্ষার সৈনিক। তারা লুকিয়ে ফিরবে, ছোট ছোট শত্রুদলকে একলা পেলেই আক্রমণ ক'রে তাদের হাতিয়ার কেড়ে নেবে, সেই হাতিয়ার দিয়ে অন্য অন্য গ্রাম থেকে নতুন নতুন সৈনিক দলে আনবে। এম্‌নি ক'রে তারা দলে বাড়বে। তারপর আসল চীনা সৈন্যদলের কাছে চর পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে। আসল সৈন্যদল যখন সামনাসামনি শত্রুকে রুখবে, এরা তখন পিছন থেকে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করবে, তার রসদ লুঠবে, যোগাযোগ কেটে দেবে, ছোট ছোট শত্রুদলকে ধ্বংস করবে, আবার বড় শত্রুদল দেখলেই লুকিয়ে পড়বে। এদেরই নাম গেরিলা সৈন্যদল।

চীন দেশের সমস্ত লোক তাদের দেশকে বাঁচাতে চায়, জাপানী ডাকাতদের রুখবার জন্যে তারা সবাই প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। গেরিলা সৈন্যের ভাবনা কি? গ্রামবাসীরা তাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়, শত্রুর খবর দেয়, দরকার হলে গেরিলা দলে ঢুকে হতাহতদের স্থান পূরণ করে।

ফ্যাশিষ্ট শয়তানদের আক্রমণ থেকে মাতৃভূমিকে বাঁচাবার জন্যে দেশের সৈন্যদল তো লড়েই, সঙ্গে সঙ্গে এম্‌নি ভাবে দেশের সমস্ত জনতাও লড়ে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি হ'ত যে চীনারা গিয়ে জোর ক'রে জাপানীদের দেশ কেড়ে নেবে, তাহ'লে চীন দেশের সমস্ত মানুষকে সে যুদ্ধ এমন ক'রে মাতাতে পারত না। কারণ জবরদখল অন্যের দেশ দখল করা তো গুণ্ডার কাজ, তার মধ্যে দেশপ্রেমও থাকে না, বীরত্বও থাকে না। লোকেরা জানে যে তারা পরের দেশ গ্রাস করবার জন্যে লড়ছে না, তারা লড়ছে নিজের দেশের জন্যে। তাই দেশের সমস্ত জনতা তাতে যোগ দেয়, হাতিয়ারের অভাবও তাদের আটকাতে পারে না।

নিজের দেশকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য এম্‌নি ধারা যে যুদ্ধ, তাকে বলে জনযুদ্ধ। দেশের সমস্ত জনতা তাতে যেমন ক'রে পারে যোগ দেয় ব'লেও সে যুদ্ধ জন-যুদ্ধ। জনযুদ্ধের বিরাট শক্তির সামনে অতি

ড় হাতিয়ার নিয়েও ফ্যাসিষ্ট ডাকাতদের থমকে দাঁড়াতে হয়। অতি শক্তিশালী ফ্যাশিষ্ট জাপান সাত বছরেও চীনকে কাবু করতে পারল না।

যে দেশের জনসাধারণ যত বেশী স্বাধীন, যে দেশের সরকার জনসাধারণের কাছে যত বেশী প্রিয়, জনযুদ্ধের ধরণও সে দেশে তত বেশী বিস্তীর্ণ, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত। উপরের কাহিনীতে তোমরা দেখলে জনযুদ্ধের প্রথম স্তর। গ্রামবাসীরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটাল, নিজেরাই হাতিয়ার জোগাড় করল, নিজেরাই দেশী সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল। হয়তো তারা যোগাযোগ করতে পারবে, নিজেদের দেশী সৈন্যদলের বা সরকারের কাছ থেকে আরও বেশী হাতিয়ার যোগাড় করতে পারবে, হয়তো পারবে না। এরকম অনিশ্চয়তার কারণ কি? চীন দেশের লোক স্বাধীন বটে, কিন্তু সে দেশের সরকার এখনো জনসাধারণকে অনেক অধিকার দেয়নি। যেমন, জমিতে চাষ ক'রে ফসল ফলায় চাষী অথচ জমির মালিক জমিদারকে তাদের মোটা খাজনা দিতে হয়; কারখানায় মাল, হাতিয়ার সব তৈরী করে মজুররা অথচ মজুরদের অনেক অসুবিধা, বেশীর ভাগ সুবিধাই কারখানার মালিকদের জন্যে। যেখানে যেখানে জাপানীরা দখল করে বসেছে, সেখানকার চীনা অধিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ও পরামর্শ দিয়ে সরকার যদি গেরিলা সৈন্য বানাত, তাহলে জাপানীরা এতদিনে একেবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠত।

এবিষয়ে সোভিয়েট রুশদেশ আদর্শ। সেখানে জনসাধারণই সরকার চালায় আর কিসে জনসাধারণের ভাল হবে অনবরত তার ব্যবস্থা দেখে। সে দেশের লোক, দেশের সৈন্যদল আর দেশের সরকার এক। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ জেগে উঠল। বনে, জলায়, পাহাড়ে লুকিয়ে তারা আজও হিটলারী সৈন্যের সঙ্গে নির্ভয়ে লড়াই চালাচ্ছে। এই গেরিলা সৈন্যরা চীনের মত নয়। সোভিয়েটের আসল সৈন্যদলের সঙ্গে এদের দস্তুর মত যোগাযোগ থাকে, সরকার থেকে এদের অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেয়। এমন কি খবরের কাগজ পর্য্যন্ত। এদের টেলিফোন আছে, রেডিও আছে, রীতিমত এরা সৈন্যবাহিনীর পরামর্শ মতই কাজ করে। দরকার হলে সৈন্যবাহিনী থেকে বিমানে ক'রে পর্য্যন্ত এদের অস্ত্রশস্ত্র বা লোকজন পৌঁছে দেওয়া হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে এদের যোগ কেটে যায় বটে, শত্রুকে মেরেই অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু রুশিয়ায় সমস্ত জনসাধাণ ও সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা আছে বলে সেখানে এই সব দল অনেক সুগঠিত।

হিটলারী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের জনযুদ্ধ ষোল আনা জনযুদ্ধ। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সবাই এ যুদ্ধের জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দেয়। সোভিয়েট গেরিলাদের অতুলনীয় বীরত্বের হাজার হাজার কাহিনী সে দেশের ইতিহাসে চিরকাল অম্লান থাকবে। একটি কাহিনী তোমাদের শোনাচ্ছি।—

মাত্র আঠারো বছরের মেয়ে জোয়া। জার্ম্মান ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে লড়বার জন্যে সে গেরিলা দলে যোগ দিয়েছিল। যে গ্রাম জার্ম্মানদের দখলে, রাত্রিবেলা চুপি চুপি সেখানেই ঢুকে সে তাদের টেলিফোনের তার কেটে দিত, আস্তাবল জালিয়ে দিত, মোটর বিগড়ে দিত, এই রকম আরও অনেক ক্ষতি করত। একদিন শত্রুর গুদামে আগুন দিতে গিয়ে শত্রুর হাতে সে ধরা পড়ে গেল। ফ্যাশিষ্টরা তাকে খুব মারধোর করল। ভয়ঙ্কর শীতে জামা কাপড় সব খুলে নিয়ে তাকে খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিজেদের কাপ্তেনের কাছে নিয়ে চল্ল। কাপ্তেন তাকে অনেক ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে আর কে কোথায় আছে, সে খবর বার করবার চেষ্টা করল। কিন্তু জোয়া একটি কথাও বল্ল না। তখন কাপ্তেনের হুকুমে চারজন ফ্যাশিষ্ট সৈন্য মোটা চামড়ার বুট দিয়ে তাকে মারতে লাগল। তার মুখ, কপাল ফেটে গেল, দেহের জায়গায় জায়গায় ফুলে উঠল, গলার

আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু অটল সাহসে সমস্ত প্রশ্নের জবাবে তখনও তার মুখে একই কথা—'আমি কিছু বলব না।' সকাল বেলা তাকে ফাঁসি দেবার জন্য মঞ্চে তোলা হ'ল। চারিদিকে ফ্যাশিষ্ট সৈন্য ভয় দেখাবার জন্যে গ্রামের লোকদের তারা জোর করে সেখানে এনে জড়ো করেছিল। জোয়ার গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হলে একজন ফ্যাসিষ্ট অফিসার জহ্লাদকে বল্ল, 'একটু থাম, আমি একটা ফটো তুলে নিই।' (ফ্যাশিষ্টরা এই রকম অত্যাচারের ছবিই ভালবাসে)।

ফটোর জন্যে থামবা মাত্র সেই ফাঁকে জোয়া গ্রামবাসীদের ডেকে জোরে বলে উঠল, "তোমরা আমার মৃত্যু দেখে হতাশ হয়ো না। বুকে সাহস নাও, লড়াই কর। ফ্যাশিষ্টদের প্রতিশোধ দাও, কুকুরের মত মার।"

একজন জার্ম্মান তাকে ঘুষি মারতে গেল। ঘুষি কোনো রকমে ঠেকিয়ে জোয়া গ্রামবাসীদের আবার বল্ল, "ভাই-বোনেরা! আমি মরতে ভয় পাই না। নিজের দেশের জন্যে মরায় কি আনন্দ!" ফ্যাশিষ্টদের লক্ষ্য করে সে বল্ল, "তোমরা আমাকে মারতে পার, কিন্তু আমি একলা নই। আমরা বিশ কোটী মানুষ। সবাইকে তোমরা কি করে মারবে! আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ তোমরা পাবে।"

গ্রামের লোকেরা কাঁদছে। আর মনে মনে ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে—তারা সবাই জোয়ার মত হয়ে যেমন করে হোক ফ্যাশিষ্টদের ধ্বংস করবে। জহ্লাদ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জোয়ার গলায় ফাঁসির দড়ি আরও কষে দিল। দম আটকে আসে, তবু জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে জোয়া কোনো রকমে শেষ কথা বল্ল, "বিদায় গ্রামের ভাই-বোনেরা, বিদায়! লড়ে যাও, ভয় পেও না।"

ফ্যাশিষ্ট রাক্ষসের পৈশাচিক অত্যাচারে এম্‌নি করেই সে জীবন দিল। কিন্তু কষ্টের একটী শব্দ তার মুখ দিয়ে বার হয়নি, একটী সঙ্গীর কথাও সে ফাঁস করেনি। বীরের মত যন্ত্রণা ও অত্যাচারকে সে বরণ করে নিল। যে মহান জাতির সে মেয়ে, সেই মহান জাতিকে কেউ কোনোদিন নোয়াতে পারবে না। দেশরক্ষার জন্যে সমস্ত জনতার যে জনযুদ্ধ, তা দেশের ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত এম্‌নি ধারা অপূর্ব্ব বীরত্বে অনুপ্রাণিত করে।

জনযুদ্ধ মানে শুধু ফৌজের সঙ্গে লড়াই-ই নয়। লড়াই ভালভাবে চালাবার জন্যে সমস্ত ফৌজের প্রচুর রসদ চাই, দেশের সমস্ত লোকের খাবার চাই। অথচ বহু চাষী যুদ্ধে চলে যায় বলে ফসল ফলানোর লোক কম। অনেক জমি শত্রুর হাতে চলে গেছে বলেও ফসলের পরিমাণ কম। কিন্তু জনযুদ্ধ দেশের সমস্ত চাষীকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যে তারা অল্প লোকেই অসম্ভব খাটে। খেটে আগের চেয়েও ফসল বাড়ায়, যে-সব জমিতে আগে কখনো আবাদ হত না, সেসব জমি পর্য্যন্ত আবাদ করে। আমাদের দেশের সাঁওতাল পরগণার মত সোভিয়েটে তাজিকিস্তান হ'ল পশ্চাৎপদ প্রদেশ। কিন্তু জনযুদ্ধ তাদেরও এমন নাড়া দিয়েছে যে ১৯৪১ সালে তাজিকিস্তানের চাষীরা অন্য বছরের চাইতে পাঁচ লক্ষ বিঘা বেশী জমি চাষ করে, ফসল বহু ফলায়। তারা ফসল বাড়ানোর আরও অনেক কায়দা বার করে। আগে যে-জমিতে শুধু এক রকম ফসল হ'ত, এখন তারা সেখানে দুরকম ফসল ফলাচ্ছে। তারা যুদ্ধে যায়নি বটে, কিন্তু যে-কাজ তারা প্রাণ দিয়ে করছে তা না হলে যুদ্ধ চলতেই পারে না। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না, তারাও জনযুদ্ধে এম্‌নি ক'রে লড়ে।

চাষীদের মত দেশের সমস্ত মজুরও দেশরক্ষার আগ্রহে প্রাণ দিয়ে না খাটলে জনযুদ্ধ হয় না। রুশিয়ার লেনিনগ্রাদ শহরের ওপর যখন দিন রাত শত্রুর বোমা ও গোলা পড়ছে, তখনও সেখানকার কারখানায় মজুররা অটলভাবে হাতিয়ার বানিয়ে যাচ্ছে। জনযুদ্ধে এই তাদের বড় দান, হাতিয়ার না পেলে তাদের ফৌজ লড়বে কি ক'রে? যুদ্ধের আগে সোভিয়েটের মজুররা যা তৈরী করত এখন তার চেয়ে আরও বেশী করে। এক

কারখানার কথা শোনো। সে কারখানা যুদ্ধের সময় বাড়ানোর সুবিধা হয়নি, নতুন কোনো যন্ত্রপাতিও যোগাড় করা যায়নি। বহু মজুর যুদ্ধে গেছে বলে কারখানার মজুরের সংখ্যা আগের চেয়ে কম। সামান্য কিছু নতুন মজুর এসেছে, কিন্তু তারাও হয় মেয়ে, না হয় অল্প বয়সের ছেলে, কাজে মোটেই পাকা নয়। মনে হবে যে কারখানায় নিশ্চয়ই আগের চেয়ে কম হাতিয়ার তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মজুর কমেছে বটে; তবু জনযুদ্ধ প্রত্যেক মজুরের মনে এনে দিয়েছে নতুন প্রেরণা ও নতুন চেতনা। তারা জানে যে তাদের হাতিয়ারের ওপরই দেশরক্ষা নির্ভর করে। তাই তারা সবাই মিলে চেষ্টা করে কিসে এই যন্ত্রপাতি দিয়েই আরও বেশী হাতিয়ার বানানো যায়। কারখানেই আগে অল্পস্বল্প সময় বা মাল নষ্ট হ'ত সে সব তারা খুঁজে পেতে বন্ধ করে। আর সবাই দেশরক্ষার উৎসাহে ডবল মেহনত করে। ফলে, সেই কারখানায় এখন আগের চেয়েও দেড়গুণ বেশী হাতিয়ার তৈরী হচ্ছে।

সোভিয়েটের অনেক বড় বড় কারখানাওলা শহর যখন ফ্যাশিষ্ট শত্রুরা দখল করবার উপক্রম করল তখন সোভিয়েট মজুররাই সেই সব কারখানার যন্ত্রপাতি বাঁচিয়ে অন্য জায়গায় যাওয়াতে অগ্রণী হ'ল। কারণ যন্ত্রপাতি সরাতে না পারলে হাতিয়ার তৈরীর পরিমাণ তো কমে যাবে। যে সব যন্ত্র খুব বেশী বড়, সরানো একেবারে অসম্ভব, সে সব যন্ত্র তারা ভেঙ্গেচুরে এল; কারণ শত্রুর হাতে পড়ার চাইতে যন্ত্র নষ্ট হওয়াও ভাল। আর অন্য সব যন্ত্রপাতি রেলগাড়ী বোঝাই করে তারা দেশের ভিতরে বহু দূরে নিয়ে চল্ল, যেখানে শত্রু নাগাল পাবে না। দেশের ভিতরে যে সব জায়গায় আগে কল-কারখানা ছিল না, বিশেষ কোনো সরঞ্জাম বা ব্যবস্থা কিছুই নেই। কিন্তু মজুরেরা দিনরাত পরিশ্রম করে সেই সব জঙ্গুলে জায়গায়ই অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় কলকারখানা বসিয়ে ফেল্ল, শহর বানিয়ে ফেল্ল, হাতিয়ার বানানো চালাল পুরা দমে। তাই এত বড় বড় শহর ও কারখানা হারিয়েও আজ লাল ফৌজের হাতিয়ারের অভাব হয় না। মজুরদের এই লড়াইও জনযুদ্ধেরই অংশ।

এর সঙ্গে চীনদেশের তুলনা কর। সেখানে দেশের লোকের অধিকার অনেক কম। তাই গোড়ার দিকে জাপানীরা যখন ক্যাণ্টন, নানকিং, শ্যাংঘাই প্রভৃতি শহর চড়াও হ'ল, তখন মজুরদের যন্ত্রপাতি সরানোর প্রস্তাব কেউ করল না। এমন কি যন্ত্রপাতি শত্রুদের হাতে অন্ততঃ না পড়ুক এই ভেবে সেগুলো ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আসতেও মালিকরা রাজি হ'ল না। তারা ভাবল যুদ্ধ শেষ হয়ে সন্ধি হ'লে, তারা হয়তো কারখানা আবার ফিরে পাবে। ফলে, জাপানীরা আজ সেইসব কারখানা দখল করে সেখানে হাতিয়ার বানাচ্ছে—চীনাদেরই মারবার জন্যে।

এর মানে চীনের যুদ্ধ ষোল আনা জনযুদ্ধে এখনো পরিণত হয়নি, জনসাধারণের কর্তৃত্ব এখনো পুরাদস্তর আসেনি। কিন্তু চীনের মানুষ কি দেশকে বাঁচানোর কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছে? সরকার সবাইকে যুদ্ধ চালানোর কর্তৃত্ব বা হাতিয়ার সম্পূর্ণরূপে দিচ্ছে না বলে কি চীনের জনসাধারণ হতাশায় হাত গুটিয়ে বসে আছে? মোটেই না! তারা জানে এ তাদের নিজেদেরই জনযুদ্ধ। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও জনসাধারণ যেমন করে পারে দেশকে বাঁচানোর জন্যে এ যুদ্ধে যোগ দেবে, ফ্যাশিষ্ট দুশ্‌মনকে রোখার জন্যে নিজেদের একতা ও চেষ্টা যত তারা বাড়াতে পারবে, জনসাধারণের শক্তিও ততই বাড়বে। জনসাধারণ একই উদ্দেশ্যে যত বেশী এক হবে, সরকারকেও তত বেশী তাদের কথা শুনতে হবে। তাই হচ্ছেও। এখন আর জাপানীরা কোন শহর দখল করলে কারখানা-মালিকরা যন্ত্রপাতি ফেলে আসে না; হয় ভেঙ্গে ফেলে, নয় সরিয়ে আনে। জনসাধারণের অধিকারও ক্রমশঃই বাড়ছে।

আমাদের সোণার বাংলায়ও আজ এই জাপানী ফ্যাশিষ্টরা তাদের রক্তাক্ত হাত বাড়িয়েছে। চট্টগ্রাম, তমলুক, প্রভৃতি কত জায়গায় আমাদের নিরীহ ভাই-বোনেরা জাপানী বোমায় প্রাণ দিচ্ছে। আমাদেরই দেশবাসীর ঘর-বাড়ী, ঘাট-মাটি, ক্ষেত-খামার জাপানী বোমায় পুড়ে ছারখার হচ্ছে। এই শত্রুকে আমরা না রুখলে, রুখবে কে?

রুশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টা

ডাঃ স্যার এ, এফ, রহমান

আমাদের মধ্যেই অনেকেই রুশিয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানতুম না। গত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়াতে বলশেভিজ্‌ম্ প্রচার হয়েছে এবং রুশিয়ার রাজনীতি, শাসনপ্রনালী, দৈনিক জীবন সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে গেছে, এই রকম একটা ধারণা ছিল। কিন্তু বলশেভিজ্‌ম্ কি জিনিষ, রুশিয়া কি ভাবে পুনর্গঠিত হচ্ছে, কি আদর্শে প্রণোদিত হয়ে কাজ করছে এবং তাতে কতদূরই বা সফলতা লাভ করেছে, সে সব সম্বন্ধে উদাসীনই ছিলুম। বরঞ্চ, যতটুকু সংবাদ পড়ে দেখতুম, তাতে একটা ধারণা জন্মেছিল, যে রুশিয়াতে নেতা নাই, একটা অরাজকতার ভিতর দিয়ে রুশিয়া মুক্তির চেষ্টা করছে। কিন্তু গত দু' বৎসর ধরে জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে যে অসীম বীরত্ব ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে, রুশিয়ার অমর কীর্ত্তিতে পৃথিবী যেরূপ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে, তাতে আমাদের সকলের মনেই একটা প্রশ্ন জেগেছে যে, রুশিয়া কি উপায়ে এত শক্তি সঞ্চয় করলো। যে নাৎসী সমরবাহিনী অপরাজেয় বলে ভাবতুম, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ধ্বংশের পর যার পরাক্রমে সমস্ত ইউরোপে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল, রুশিয়া কোন্ শক্তির বলে তাকে পরাজিত করলো এবং দীর্ঘ দু'বৎসর কাল তাকে কোন ক্রমেই একটা চরম মীমাংসা করতে দিচ্ছে না—আজকার আলোচনা সে সম্বন্ধেই কএকটি কথা বলছি।

একটু গোড়ার কথা বলি। অবশ্য রুশিয়ার আধুনিক ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করা আজ সম্ভব হবে না, তবুও ১৯৩৯ সালের কথা বলছি। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যখন জার্ম্মানী ঘোষণা করলো যে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে একটা অনাক্রমণ চুক্তি বা একে অন্যের সঙ্গে বিরোধ করবে না, *Non-Aggression Pact* বলে একটা চুক্তি হয়েছে, পৃথিবী তখন বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছিল। জার্ম্মানী যে সমস্ত দাবী পোল্যাণ্ডের নিকট করেছিল, তার ফলে যুদ্ধের কালো মেঘ ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে আসছিল। তখন একটা কথাই সকলের মনে জেগেছিল যে রুশিয়াও গত কএক বৎসর ধরে যুদ্ধের যথেষ্ট আয়োজন করেছে! যদি জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, রুশিয়া কি করবে, সেইটাই জানা যাচ্ছিল না। যখন দেখা গেলো, উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে, ইউরোপের মহাযুদ্ধের সূচনা অনিবার্য্য হলো এবং আগষ্ট মাস শেষ না হতেই জার্ম্মানবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো, এবং যে যুদ্ধের সূচনা তা ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবী কি ভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তা সবাই প্রতিদিন দেখেছেন এবং অনুভব করছেন। জার্ম্মানী ও রুশিয়ার চুক্তিতে আশ্চর্য্য হবার কারণ এই ছিল যে নাৎসীবাদ ও বলশেভিকবাদ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদ। যাঁরা হিট্‌লারের *Mein Kampf* পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে হিট্‌লার রুশিয়ার নীতিকে জার্ম্মানীর কেন, পৃথিবীর মহাশত্রু বলে আখ্যা দিয়েছে এবং রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী তা পরিষ্কার ভাবে বলেছে। যাঁরা রুশিয়া সম্বন্ধে খবর রাখতেন, তাঁরা জানতেন যে রুশিয়ার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা প্রয়োগ করে রুশিয়া যুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে আয়োজন করছিল, কারণ রুশিয়া জানতো তাকে বাঁচতে হলে, তার আদর্শকে বাঁচতে হলে যুদ্ধ করতেই হবে। যিনি প্রথম কমিউনিজ্‌ম্ প্রচার করেন, কার্ল মার্ক্স, রুশিয়াতে দেবতার মত তিনি পূজ্য। নাৎসী জার্ম্মানী সে নামকে ঘৃণা করে। রুশিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বারা নিজের দেশকে গঠন করতে চেয়েছে, অনেকটা সফলও হয়েছে, দীন দরিদ্রকে দেশের অর্থের অংশীদার করেছে। নাৎসী জার্ম্মানী এই নীতির সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং তার রাজ্যে এর কেন স্থান নাই।

শিয়ার জীবনে 'ট্রেড্ ইউনিয়নিজ্‌ম্' একটা প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করেছে। হিট্‌লার তাকে একেবারে নির্ব্বাসিত রেছে। হিট্‌লার জার্ম্মাণীর যুবকদের সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার উপদেশ দিয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদাণের হিমা ব্যাখ্যা করেছে। ষ্টালিন রুশিয়ার নেতা হিসাবে কখনও তা বলেন নাই বা এই মহিমা ব্যাখ্যা করেন নাই। ৎসী জার্ম্মানী নারীর স্থান নির্দ্দেশ করেছে গৃহের অন্তরালে। রুশিয়া স্থান দিয়েছে নারীকে দেশের বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে। এত মতভেদ যেখানে, উভয় নীতির মধ্যে যখন এত পার্থক্য, তখন রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে চুক্তি কি রে হলো, সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয় হলো। হিট্‌লার তার বক্তৃতায় বলেছিল, "যদি ইউক্রেণ, ইউরাল্‌স্ এবং ইবেরিয়া আমাদের হতো, তবে জার্ম্মাণীতে 'অভাব' বলে কোনো জিনিষ থাকতো না।" রুশিয়া জানতো যে র্ম্মানীর নেতার মনোভাব কি। কাজেই যদিও চুক্তি হলো, ইউরোপে মহাযুদ্ধের সূচনা হলো, এবং রুশিয়া পরাজিত ল্যাণ্ডের একটি অংশ নিলো, তথাপি দূরদর্শীরা প্রথম থেকেই বলেছিলেন যে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ নিবার্য্য। এবং তাই হলো। ১৯৪১ সালের জুন মাসের জার্ম্মানী হঠাৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো, ৎসী সমরবাহিনী এত দ্রুতবেগে রুশিয়া আক্রমণ করলো, যে পৃথিবী আবার শঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলো যে জার্ম্মানী শিয়াকে বুঝি গ্রাস করবে। তখন জার্ম্মানী দর্প করে বলেছিল—৩ মাসের মধ্যে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের অবসান হবে, রাজিত রুশিয়া জার্ম্মানীর পরাক্রম স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা তো হয়ই নাই, বরঞ্চ নাৎসী জার্ম্মাণীর ক্তি খর্ব্ব হয়েছে, তার দর্প চূর্ণ হয়েছে। যে 'প্যান্‌জার বাহিনী' অপরাজেয় বলে মনে হয়েছিল, সেই সমর বাহিনী রাজিত হলো। ২৪ মাস ধরে রুশ-জার্ম্মানীর মহা সংগ্রাম অনবরত চলছে। অপরাজিত রুশিয়ার আত্মা সমগ্র থিবীর ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তার বিজয় কাহিনী সারা পৃথিবীতে ঘোষিত হয়েছে। অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের তিহাসে, লেনিনগ্রাদ, মস্কো, স্মলেন্স্ক, খারকভ ও সর্ব্বোপরি ষ্টালিনগ্রাদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে। পোলিয়ান একবার বলেছিল, "হয়তো খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রুশিয়াকে পরাজিত করেছি কিন্তু কোন চরম আঘাত হানিতে রি নাই, রুশিয়া পরাজয় স্বীকার করে নাই।" নাৎসী জার্ম্মানীরও ঠিক তাই হয়েছে।

রুশিয়াকে নিয়ে জার্ম্মানী এত ব্যতিব্যস্ত, যে অন্য কোন দিকে তার মনোনিবেশ করবার অবসর নাই। উরোপের যে সমস্ত দেশ হিট্‌লার গ্রাস করেছিল, ক্রমশই তাদের শৃঙ্খলা শিথীল হয়ে পড়ছে। অচিরে ইউরোপে ক বিস্তৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, জার্ম্মানীর বিপদ ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। একবৎসর পূর্ব্বেও এ ধারণা কল্পনার অতীত ছিল। রুশিয়াই একে সম্ভব করে তুলেছে। যদিও মিত্রশক্তি রুশিয়াকে সাহায্য করছে, তথাপি শিয়া বেশীর ভাগ নিজের চেষ্টায়, নিজের অধ্যবসায় দ্বারা মহাযুদ্ধের গতিকে এভাবে পরিবর্ত্তন করতে সক্ষম হয়েছে। চেষ্টার ফলে, কোন্ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, রুশিয়া এই সফলতা লাভ করলো, তারই একটু আলোচনা করবো।

পূর্ব্বেই বলেছি, বলশেভিজ্‌ম্ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই রুশিয়া বুঝতে পেরেছিল, যে তাকে একদিন তার দেশের ন্য, তার আদর্শের জন্য যুদ্ধ করতেই হবে। হিটলার যখন জার্ম্মানীতে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো, শিয়ার সেই ধারণা দৃঢ় হলো, হিটলার জার্ম্মানীর একছত্র নেতা হবার পর রুশিয়ার সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো। টলারের উক্তি গুলোতে পৃথিবীরও এই ধারণা হয়েছিল, যে ইউরোপ বলশেভিক নীতি বিস্তৃতি নিবারণের জন্যই ম্মানী তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। রুশিয়া তার নূতন জীবনের প্রারম্ভেই ৫ বৎসরের একটি পরিকল্পনা বা র্য্যসূচী প্রস্তুত করে এবং দুটি কারণের জন্য প্রথমেই ধাতুশিল্পর প্রতি তার সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করে। ষ্যালিজ্‌মকে বিস্তৃত করলে শিল্পের ভিত্তি মজবুত করতে হলে ধাতুশিল্পের সাহায্য নিতে হবে। বর্ত্তমান যুগের 'মেসিনের' উপর নির্ভর করে। ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, বোমা, কামান, ক্রজার বিমানধ্বংসী কামান, প্যারাসুট,

এ সবেরই প্রয়োজন। এ সব প্রস্তুত করবার জন্য মেসিনের প্রয়োজন। মেসিন প্রস্তুত করবার জন্য মেসিন টুল্‌সের (*Machine tools*) দরকার এবং এর জন্য ধাতুশিল্পের উন্নতির প্রয়োজন। এর সঙ্গে সঙ্গে আর কএকটি জিনিষেরও নিতান্ত প্রয়োজন, যাদের দ্বারা মেসিনগুলি চালিত হয় অর্থাৎ কয়লা এবং তেল। রুশিয়া যখন এই কার্য্যসূচী নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, অনেকেই ভেবেছিলেন যে রুশিয়া একটা কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান করতে চাচ্ছে। ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ করতে চাচ্ছে, তা অসম্ভব। দৈবের সাহায্য ছাড়া এ হতে পারে না। এই কার্য্যসূচী সফল করতে রুশিয়াকে বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে; বহু অশ্রু, বহু মৃত্যু, বহু দুর্ভিক্ষের ভিতর দিয়ে রুশিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁচেছে, বহু বাধা বিঘ্ন পৃথিবীর বিরোধ সত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সে সমস্তের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়—কি ভাবে রুশিয়া মহাযুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েছে, কি প্রকাণ্ড চেষ্টার ফলে আজ সে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তারই কথা বলবো।

প্রথম ৫ বৎসরের চেষ্টার ফলে রুশিয়াতে কয়লা এতো উঠতে লাগলো যে ১৯৩৭ সালে দৈনিক ৩৭০০০০ টন্ কয়লা উঠতো, ১৯৪০ সালে দৈনিক ৪৬৭০০০ টন কয়লা উঠতো। ১৯৪১ সালের উৎপাদন আরও শতকরা ষোলভাগ বৃদ্ধি পাবে জানা গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে রুশিয়া কয়লা উৎপাদন করতো মাত্র ২ কোটী ৯০ লক্ষ টন। ১৯৩৮ সালে তার উৎপাদন হ'ল ১৩ কোটী ৩০ লক্ষ টন, প্রায় শতকরা ৪৫০ ভাগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে রুশিয়াতে যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র শতকরা ১ ভাগ কয়লা উঠতো, সে স্থলে এখন শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা যন্ত্রের সাহায্যে উঠান হয়। কয়লার সঙ্গে তৈল উৎপাদনেও রুশিয়া আশ্চর্য্য উন্নতি করেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া তৈল উৎপাদন করতো ৯২ লক্ষ টন। ১৯৩৭ সালে সে ৩ কোটী ৫ লক্ষ টন উৎপাদন করেছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে রুশিয়া দৈনিক ৯৭ হাজার লক্ষ টন তৈল উৎপাদন করতো। উপস্থিত প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করা হয়। আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে রুশিয়াতে তেল অতিরিক্ত উৎপাদন করা হয়। এতো গেল কয়লা ও তেলের কথা। ধাতু উৎপাদন শিল্পর দিক দিয়েও রুশিয়া এক কোটী ৫০ লক্ষ টন লোহা উৎপাদন করে। ১৯৪০ সালের শেষে প্রায় ৪৭ হাজার টন দৈনিক উৎপাদন হতো। ১৯৩৮ সালে ইস্পাত এক কোটী ৮০ লক্ষ টন উৎপাদন হয়। রুশিয়ার নূতন জীবনের পূর্ব্বে, মাত্র ৪২ লক্ষ টন উৎপাদন হতো। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে রুশিয়া দৈনিক ৫৮০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন করতো। লোহা এবং ইস্পাত উৎপাদনে ইউরোপে জার্ম্মানী প্রথম স্থান অধিকার করে, তার পরবর্ত্তী স্থানই রুশিয়া অধিকার করেছিল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার জন্য রুশিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তুললো। তার এ সমস্ত কারখানা আজ পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করে। ক্রমে রুশিয়া পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক ইস্পাত উৎপাদনেও প্রথম স্থান অধিকার করলো। আপনারা সহজেই বুঝবেন যে এই বিশাল আয়োজনের জন্য যেমন যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছিল, তেমনি দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সজ্জাও এইসব বিশাল কারখানায় তৈরী হচ্ছিল। কত ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, কামান, বোমা তৈরী হচ্ছিল, তার হিসাব পাওয়া যায় না—কারণ সেগুলো জানতে দেওয়া হয় না। তবে যে ভাবে এগুলোর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তার একটা আভাষ পেয়েছেন, কাজেই জার্ম্মানী যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলো, সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম কয়লা তেল লোহা ইস্পাত যথেষ্ট পরিমাণে রুশিয়ার নিকট ছিল। কিন্তু এটুকুই শুধু রুশিয়ার চেষ্টা নয়। দেশের কল্যাণ এবং দেশরক্ষার জন্য মেসিনের অবশ্য দরকার, কিন্তু তাদের চালিত করবার জন্য শিক্ষিত নরনারী দরকার। অসংখ্য ইঞ্জিনীয়ার, কলকব্জার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার তৈরী হলো। সামান্য একটু উদাহরণেই বুঝতে পারবেন। রুশিয়াতে প্রায় ৬৬ হাজার মহিলা চিকিৎসক আছেন। প্রায় এক লক্ষের উপর ইঞ্জিনীয়ার আছে।

প্রায় দশ লক্ষ মেয়ে রুশিয়ার কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই বিশাল কর্ম্মীদলের পুরুষ ও নারী একই মন্ত্রে দীক্ষিত। দেশের কল্যাণের জন্য যন্ত্রের দ্বারা শিল্পের উন্নতি করতে হবে, এবং দেশরক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে তৈরী হতে হবে। বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধ করতে হলে কয়েকটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন। যুদ্ধ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প দরকার। প্রত্যেক নরনারীকে জন্মভূমির জন্য সর্ব্বরকম ত্যাগ স্বীকার, প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করার সঙ্কল্প দরকার। রুশবাসীদের রুশিয়ার মাটির মমতা পৃথিবী বিখ্যাত। সেই মমতা রুশিয়ায় নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে। প্রত্যেক নরনারী দেশের জন্য যুদ্ধ করে ধন্য হবার আশা করে। এই দৃঢ় সঙ্কল্পের পর, একটি সামরিক প্রতিষ্ঠানের দরকার, যার দ্বারা যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ হতে পারে। তারপর বিচক্ষণ দুরদর্শী নির্ভীক নেতার দরকার এবং আধুনিক জগতের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামের দরকার অর্থাৎ ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। রুশিয়ার সেই সংগঠন, সেই নেতৃত্বে সামরিক সাজসজ্জার কতকটা বিবরণ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল দিয়েছিলেন, রুশজার্ম্মান যুদ্ধের পঞ্চাশৎ দিনে একটি বক্তৃতায়—

> "রুশিয়ার সৈনিক, প্রত্যেক নরনারী জন্মভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। নাৎসীদের রক্তে রুশিয়া প্লাবিত। রুশিয়ার দিগন্তব্যাপী প্রান্তরে দশ লক্ষ নাৎসী ধুলায় মিশে গিয়েছে। প্রায় ২০০০ মাইল ব্যাপী যুদ্ধের পরিসীমা, রুশিয়া মহা-আগ্নেয় যোজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমাদের যে সব সেনাপতি তাদের দেখে এসেছেন, তাঁরা তাদের সংগঠন, তাদের নেতৃত্ব, তাদের সামরিক সাজসজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নাৎসী শত্রু রুশিয়ার যুদ্ধের ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হয়েছে, তারা অগ্রসর হতে পারছে না, তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে।"

২২শে জুন জার্ম্মানী ও রুশিয়ার যুদ্ধের দু'বৎসর বা ২৪ মাস পূর্ণ হবে। একদিনের তরেও এই যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকে নাই। রুশিয়ার সেনা, রুশিয়ার বিখ্যাত গেরিলা যোদ্ধা রুশিয়ার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বহু ট্যাঙ্ক, বহু উড়োজাহাজ, বহু সমরসজ্জা ধ্বংস হয়েছে। নিহতদের রক্তে রুশিয়ার মাটি লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বীর রুশিয়ার উন্নত শির কখনও নত হয় নাই—রুশিয়া অপরাজিত। বিমুগ্ধ পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাবার যোগ্য তারা!

কলিকাতা রেডিওর সৌজন্যে

আগামী শ্রাবণের রংমশাল

বিশ্বকবির স্মৃতি-সমুজ্জ্বল রচনাসম্ভারে বিচিত্র

রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের হাতে চিরদিন থাকিবার মত

মূল্য সডাক ৷৷০

যারা গ্রাহক নও, অগ্রিম এই সংখ্যাটির জন্য তৎপর থাকো।

গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না

তিউনিসিয়া ডায়েরী

১৩-১১-৪২—তিউনিসিয়ার বিজার্ত্তা নৌ ঘাঁটি দখলের জন্য বৃটিশ ও মার্কিণবাহিনীর অভিযান। তিউনিস বিমান ঘাঁটিতে বৃটিশ বিমান আক্রমণ।

১৪-১১-৪২—বৃটিশ বাহিনীর তিউনিসিয়ায় প্রবেশ—কাসাব্লাঙ্কা হইতে আলজিয়ার্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উপকূলভাগে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণ।

১৫-১১-৪২—আলজিয়ার্স হইতে তিউনিসিয়া অভিমুখে মিত্রপক্ষীয় দ্রুত অগ্রগতি।

১৬-১১-৪২—তিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণ ও মিত্রপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ।

১৭-১১-৪২—তিউনিসিয়ায় আরও এক্সিস সৈন্য প্রেরণ—শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিবার জন্য হিটলারের নির্দ্দেশ—মিত্রপক্ষের সহিত ফরাসী সৈন্যদলের সহযোগিতা।

১৯-১১-৪২—তিউনিসিয়ার তিনটি এলাকায়—মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ও এক্সিস সৈন্যদলের সংঘর্ষ আরম্ভ।

২০-১১-৪২—তিউনিসিয়ায় প্রথম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ—সমুদ্রোপকূল দিয়া বৃটিশ প্রথম আর্ম্মির অগ্রগতি—বিজার্ত্তা হইতে ৩২ মাইল দূরে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল।

২১-১১-৪২—মিত্রপক্ষীয় সাঁজোয়া বাহিনী কর্ত্তৃক দলে দলে তিউনিসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম।

২২-১১-৪২—ত্রিপোলিতানিয়া হইতে আগত জার্ম্মাণ সেনাদের তিউনিসিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত অতিক্রম।

২৫-১১-৪২—তিউনিসিয়ার অন্তরীক্ষে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম—বিজার্ত্তা ও তিউনিসের উপর ব্যাপক বিমান হানা।

২৭-১১-৪২—তিউনিস ও বিজার্ত্তার বহির্দ্বারে বৃটিশ ১নং আর্ম্মির সংগ্রাম—রাজধানীর ১০ মাইল দূরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উপস্থিতি।

১-১২-৪২—বৃটিশ প্যারাসুটী সৈন্যদলকর্ত্তৃক তিউনিসের বহির্ভাগস্থ বিমান অবতরণক্ষেত্র দখল।

৪-১২-৪২—জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণে মিত্রপক্ষীয়দের জেদইদা সহর ত্যাগ।

৫-১২-৪২—তেবুরবা ও মাতেউয়ের মধ্যে জার্ম্মাণ বাহিনীর তৃতীয় আক্রমণ—মিত্রপক্ষীয় বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা ব্যর্থ।

৯-১২-৪২—তেবুরবার নিকটে জার্ম্মাণ ও মার্কিণ বাহিনীর মধ্যে বৃহত্তম সংঘর্ষ—জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত।

১১-১২-৪২—মেজেজ এল বারের দিকে দুই দিক হইতে এক্সিস বাহিনীর আক্রমণ—মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে পশ্চাদপসরণ।

১৪-১২-৪২—ফরাসী বাহিনী কর্ত্তৃক সিদি বৌসিদ ঘাঁটি অধিকৃত।

১৬-১২-৪২—রোমেলের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যের তিউনিসিয়া প্রবেশ।

২৫-১২-৪২—আলজিয়ার্সে ফরাসী উত্তর আফ্রিকার হাই-কমিশনার এডমিরাল দাঁরলা আততায়ীর হস্তে নিহত—জেনারেল জিরো কর্ত্তৃক উত্তর আফ্রিকার সুশৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ।

২৬-১২-৪২—তিউনিসের ১২ মাইলের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর উপস্থিতি।

৬-১-৪৩—বৃটিশ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে বিজার্ত্তার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে জার্ম্মাণগণ বিতাড়িত।

১৩-১-৪৩—তিউনিসিয়া রণাঙ্গনে দুই দিক হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ আক্রমণ সুরু।

২৬-১-৪৩—রোমেলের বাহিনীর তিউনিসিয়া প্রবেশের সংবাদ।

২৭-১-৪৩—ম্যারেথ লাইন অভিমুখে এক্সিস বাহিনী।

৩০-১-৪৩—বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর অগ্রগামী দল কর্ত্তৃক তিউনিসিয়া সীমান্ত অতিক্রম।

৪-২-৪৩—বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর ম্যারেথ লাইনে পৌঁছিবার সংবাদ।

৮-২-৪৩—ম্যারেথ-লাইনে এক্সিস পৃষ্ঠরক্ষী বাহিনীর ঘাঁটি গ্রহণ। পিসিদার পশ্চিমে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ।

১৬-২-৪৩—এক্সিস বাহিনীর গাফসা প্রবেশ।

১৮-২-৪৩—এক্সিস বাহিনী কর্ত্তৃক ফেরিয়ানা, কাসেরিণ ও বেইটলা অধিকার।

২১-২-৪৩—ব্যুহের বহির্ঘাটি মেদেনিন দখল শেষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিউনিসিয়ায় বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মির অগ্রগতি।

১৭-৩-৪৩—ম্যারেথ লাইনের উপর বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর হানা।

১৮-৩-৪৩—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক গাফসা অধিকৃত।

১৯-৩-৪৩—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক এল-ওয়েডার অধিকৃত।

২২-৩-৪৩—তিউনিসিয়া দখলের জন্য মিত্রপক্ষের বিরাট অভিযান আরম্ভ—তিনদিক হইতে বৃটিশ ও মার্কিণ বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ—মার্কিণ বাহিনী কর্ত্তৃক সেনেদ অধিকার।

২৩-৩-৪৩—বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মি কর্ত্তৃক ম্যারেথ ব্যূহ ভেদ—মিত্রবাহিনী কর্ত্তৃক মাকনাসি দখল।

৩০-৩-৪৩—বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক এল্ হাম্‌মা ও গাবেস অধিকৃত।

৪-৪-৪৩—মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্ত্তৃক সেরাত অন্তরীপ অধিকৃত।

১০-৪-৪৩—মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্ত্তৃক স্ফাক্স অধিকৃত—এক্সিস বাহিনীর পিস পরিত্যাগ।

১১-৪-৪৩—মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্ত্তৃক ফণ্ডুক গিরিবর্ত্ম দখল।

১২-৪-৪৩—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক সুসে ও কাইরুয়ান অধিকৃত।

১৩-৪-৪৩—তিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রোমেল বাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ।

১৮-৪-৪৩—তিউনিসের ২৫ মাইল দূরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী।

২১-৪-৪৩—বৃটিশ অষ্টম-বাহিনী কর্ত্তৃক এন-ফিডাভিল দখল।

২৩-৪-৪৩—বৃটিশ অষ্টম-বাহিনী কর্ত্তৃক তাকরুণা অধিকার।

২৫-৪-৪৩—ফরাসী বাহিনী কর্ত্তৃক, জেবেল মনস্থর পুনরধিকৃত।

২৭-৪-৪৩—বৃটিশ প্রথম আর্ম্মি কর্ত্তৃক লংষ্টপ পাহাড় অধিকার।

৩-৫-৪৩—মিত্র বাহিনী কর্ত্তৃক মেতুর অধিকৃত।

৮-৫-৪৩—বৃটিশ ও মার্কিণ বাহিনী কর্ত্তৃক তিউনিস ও বিজার্ত্তা দখল। ফেবিভিল ও পঁদ্যুফাস মিত্র বাহিনীর হস্তগত—বঁ অন্তরীপ অভিমুখে এক্সিসের পশ্চাদপসরণ।

১০-৫-৪৩—মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্ত্তৃক বঁ অন্তরীপ অবরুদ্ধ—বিজার্ত্তা ও তিউনিসের মধ্যে এক্সিস প্রতিরোধ চূর্ণ।

১২-৫-৪৩—বঁ উপদ্বীপে অবরুদ্ধ এক্সিস বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত—ভারতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক বঁ উপদ্বীপে এক্সিস বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফন্ অর্ণিম্ বন্দী—আরও ১১ জন জেনারেল বন্দী হওয়ার সংবাদ।

আফ্রিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

আটলান্টিক চার্টার

এই যে আজ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলছে, তোমাদের সকলের মনেই হয় তো প্রশ্ন উঠছে—কেন? কেন এই রক্তপাত, এত ত্যাগস্বীকার, এত বিরাট আয়োজন? কিসের জন্য?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে এই যুদ্ধে যে দুটি দল শক্তিপরীক্ষার জন্য রণাঙ্গনে নেমেছেন, তাঁদের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে এ যুদ্ধের তাৎপর্য্য কি।

একধারে আছেন অক্ষশক্তিগণ বা Axis Powers—জার্ম্মাণী, ইটালি, জাপান এবং তাঁদের অধিকৃত দেশগুলি।

আর একদিকে আছেন, মিত্রশক্তিগণ বা Allied Powers এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন সম্মিলিত গণতান্ত্রিক জাতিগুলি—United Nations—যাঁরা ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হাতে হাত মিলিয়ে পণ করেছিলেন যে হিটলারী শক্তিকে বিধ্বস্ত করে তাঁরা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

হিটলারের রাজনীতির ভিত্তি এই যে তিনি রাষ্ট্রকে বড় করেছেন মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা ও অধিকারকে তুচ্ছ করে', এবং সেই রাষ্ট্রের একছত্র মুখপাত্র করেছেন নাৎসী পার্টিকে এবং এই পার্টির একছত্র অধিনায়ক করেছেন নিজেকে এবং নিজের মনোনীত ব্যক্তিদের। এই রাষ্ট্র-পরিচালনায় সাধারণ মানুষের কোনো হাত থাকবে না, এবং প্রতিভা ততদিনই সম্মানিত হবে যতদিন তা হিটলারী শক্তির পৃষ্ঠপোষকরূপে ব্যবহৃত হবে।

এই রাজনীতি মানুষের অপমানের উপর গঠিত, তাই মিত্রশক্তিরা এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

যতদিন এই নাৎসীবাদ জার্ম্মানীর ঘরের কোণে আবদ্ধ ছিল ততদিন পৃথিবীর গণতন্ত্রগুলি এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও যথেষ্ট সাবধান হন নি। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ যখন নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠলো ইউরোপ-জোড়া তাণ্ডব লীলায়, তখন তাঁদেরও সামনে এসে না দাঁড়িয়ে আর উপায় রইল না।

এমনি করেই লাগলো যুদ্ধ, তার ইতিহাস আজ পৃথিবী-জোড়া রণাঙ্গনে রক্তলিপিকায় লেখা হচ্ছে।

একধারে অক্ষ-শক্তির দুর্দ্ধর্ষ সমাবেশ।

আর একধারে গণতন্ত্রগুলির কুচকাওয়াজ, আজ তাঁদের নেতৃস্থানীয় বৃটিশ ও মার্কিণ জাতি।

এটি একটি জীবনযাত্রার আদর্শের সংঘাত। তাই সাধারণ মানুষও প্রশ্ন করে, এই মহাযুদ্ধে গণতন্ত্রগুলির লক্ষ্য কি? যে সীতাকে তাঁরা রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করতে আজ অভিযান করেছেন, সেই সীতার ভবিষ্যৎ কি?

এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাবার জন্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

সাক্ষাৎ হল তাঁদের। অতিকায় যুদ্ধজাহাজ "প্রিন্স অব্ ওয়েলস্"এর একটি কামরায়, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট (১৩৩৮ সালের ২৯শে শ্রাবণ) তারিখে "আটলান্টিক চার্টার"—বৃটেন ও আমেরিকার পারস্পরিক চুক্তিপত্র—স্বাক্ষর হোলো। এই চুক্তিপত্রটিই বিশ্বের জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তর।

তোমাদের সুবিধার জন্য এই চুক্তিপত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ নীচে দিয়ে দিলাম।

দেখবে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও নিরপত্তার রক্ষার জন্যই এই চুক্তিটি পরিকল্পিত হয়েছে।

সত্যি সত্যিই এই চুক্তির আদর্শ যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে কি না, নির্ভর করবে ভবিষ্যৎযুগের তোমার আমার মত মানুষদের উপর। মনে রাখবে জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তার উপর এই ভিত্তি। মনে রাখবে এটা একটা আদর্শ এবং লক্ষ্য, একটা জাতির প্রতি আর একটি জাতির ভিক্ষা নয়।

অনেকে বলেন ভারতের কাছে এই আদর্শের কোনো মূল্য নেই কারণ চার্চ্চিল বলেন যে এর লক্ষ্য ভারতবর্ষে প্রযোজ্য নয়।

তার উত্তর, অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষকেও এই আদর্শকে অর্জ্জন করে নিতে হবে।

চুক্তিপত্র

"যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট এবং যুক্তরাজ্যের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে; উভয়ে রাষ্ট্রের জাতীয় কার্য্যসূচীর মধ্যে যে সকল সাধারণ নীতি আছে, এবং যে সকল নীতির উপর তাঁহারা পৃথিবীর উন্নততর ভবিষ্যৎ রচনা করিবার আশা পোষণ করেন, তাহা প্রকাশ করা তাঁহারা সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন।

"প্রথমতঃ, এই উভয় দেশের কোনোটিই রাজ্যবিস্তার অথবা অন্যপ্রকারে নিজেদের বাড়াইতে চাহে না।

"দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশের অধিবাসিদের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সে দেশের ভৌগলিক সীমার কোন পরিবর্ত্তন হইবে ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়।

"তৃতীয়তঃ, কোন দেশের শাসনতন্ত্রের আকার-প্রকার নির্ব্বাচনের অধিকার সে দেশের অধিবাসিদের আছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন; যে সকল দেশের স্বায়ত্তশাসন ও সার্ব্বভৌম অধিকার বলপূর্ব্বক বিনাশ করা হইয়াছে, সেসকল দেশে তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়।

"চতুর্থতঃ, ছোট বড়, বিজিত বিজেতা সমস্ত দেশই যাহাতে নিজ-প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাঁচামালের সমান অধিকারী হইতে পারে বর্ত্তমানে উভয় রাষ্ট্রের যে সকল বাধ্যবাধকতা আছে, তাহা যথাযথ করিয়াও তাঁহারা সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন।

"পঞ্চমতঃ, সমস্ত জাতিই যাহাতে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার

অধিকারী হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা অর্থনীতিক্ষেত্রে, সমস্ত জাতির মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা স্থাপনের অভিলাষী।

"ষষ্ঠতঃ, নাৎসী দৌরাত্ম্যের বিনাশের পর, যাহাতে সমস্ত জাতি নির্ভয়ে এবং নিরাপদে নিজ নিজ রাজ্যে বাস করিতে পারে এবং সমস্ত দেশের সমস্ত লোকই যাহাতে নির্ভয়ে এবং স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে, এমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়।

"সপ্তমতঃ, পূর্ব্বোক্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমস্ত লোকই সমুদ্রে নির্ভয়ে এবং স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

"অষ্টমতঃ, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক কারণে বলপ্রয়োগ-নীতিপরিহার করিবে। যে সকল রাষ্ট্র পররাষ্ট্র আক্রমণ করিতেছে বা করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে, তাহারা জল স্থল ও বিমানশক্তি বর্দ্ধিত করিতে থাকিলে ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন যে সাধারণ নিরপত্তা রক্ষার কোন ব্যাপক এবং স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল রাষ্ট্রকে নিরস্ত্র করা অত্যাবশ্যক। তাহা ছাড়া, শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির শস্ত্রবৃদ্ধির ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য অপর সকল প্রকার সম্ভবপর ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহারা সহায়তা করিবেন ও উৎসাহ দিবেন।"

যুদ্ধের টুকিটাকি

বাঙ্গালী সৈনিকের বীরত্ব

দৃশ্য—তোব্রুক বন্দর, সময়—সন্ধ্যা ৬টা।

খবর এলো, শত্রুপক্ষ বেড়াজাল ভেঙ্গে ছুটে আসছে। সমস্ত বন্দর এলাকার ওপর কামান দাগা হচ্ছে। বোমারু বিমানও আকাশে বজ্রনিনাদ করছে। আর কোন আশাই নেই।

নাবিক ও ভারতীয় সৈন্যের একটি ছোট দল একটা স্লিট্-ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে নোঙর-করা একটা ষ্টীমারের উদ্দেশ্যে ছুটল। হাভিলদার মহাম্মেদ ইসমাইল এঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে ষ্টীমার চালু করে বন্দর থেকে বার হয়ে যাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ বোমার টুক্‌রো এসে ষ্টীমারে আঘাত করল ও এঞ্জিনটা নষ্ট করে দিল। কয়েকজন নাবিক আহত হ'ল।

সেই অবিরাম গোলাবর্ষনের মধ্যেই মহাম্মেদ ইসমাইল আহতদের একটা সাহায্যকারী ষ্টীমারে (যা তখনই তাদের সাহায্য এসে পড়েছিল) স্থানান্তরিত করল এবং শেষে নিজে গিয়ে উঠল। শুধু ইসমাইলের দৃঢ়ত্বে ও নেতৃত্বে এই দলটি রক্ষা পেয়েছিল।

হাভিলদার মহাম্মেদ ইসমাইল বাঙ্গালী, নোয়াখালীতে তার বাড়ী। ইসমাইলের বীরত্বের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাকে I. D. S. M. উপাধি দিয়েছেন। আমরা হাভিলদার ইসমাইলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিনজন ভারতীয় ভি-সি

ভিক্টোরিয়া ক্রশ (ভি. সি.) দেওয়া হয় অসাধারণ বীরত্বে ও কৃতিত্বের জন্য। বীরত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক এই ভিক্টোরিয়া ক্রশ অল্প লোকেই লাভ করে।

যুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গণে অসীম বীরত্বের জন্য যে তিনজন ভারতীয় ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ করেছেন, তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হ'ল।

সুবেদার রিচপাল রাম—'কেরেন' আক্রমনে অসীম বীরত্বে ইনি নিজের জীবন দান করেছেন।

সেকেণ্ড লেফ্‌টন্যাণ্ট প্রেমেন্দ্র সিং ভগত—ইরিট্রিয়ার Minefilds বিপদমুক্ত করার কাজে ইনি আশ্চর্য্য সাহস ও ধৈর্য্য দেখিয়েছেন।

হাভিলদার প্রকাশ সিং—মায়ু উপদ্বীপে ডনবাইক এলাকায় অসীম সাহসে ও নিজের জীবন তুচ্ছ করে ইনি ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যদের এবং যুদ্ধের যাবতীয় বাহন ও অস্ত্রসস্ত্র রক্ষা করেছিলেন। শুধু একবার মাত্র নয়, শত্রু-আক্রমণে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে তিনবার তিনি ছুটে গিয়ে সৈন্য ও রসদ রক্ষা করে ছিলেন।

আমরা রিচপাল রামের অমর আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং প্রেমেন্দ্র সিং ভগত ও প্রকাশ সিংকে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভারতীয় সৈন্যদের লাঙ্গল প্রতিযোগিতা

সাইপ্রাসের এক গ্রামে ভারতীয় সৈন্য ও সাইপ্রাসবাসীদের মধ্যে লাঙল চাষ নিয়ে একবার মজার আলোচনা হয়। সাইপ্রাসবাসীরা বলে, ভারতীয় প্রথার চেয়ে তাদের প্রথা ভাল।

ভারতীয় সৈন্যদের একটু অসুবিধা ছিল। যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে তারা লাঙ্গলে হাত দেবার সুযোগ পায়নি। কাজেই স্থির হ'ল, আলাদা ভাবে প্রতিযোগিতা হবে, ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ও সাইপ্রাসবাসীদের মধ্যে।

তামাসা দেখতে অনেক লোক সমাগম হল, তার মধ্যে দূর গ্রাম থেকেও অনেক সাইপ্রাসবাসীরা এল। যে সব সৈন্যদের ছুটি ছিল তারাও ভীড় করল। দু'দলেই ভাল চাষের জন্য ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল।

কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও, ফল হল এই, যে ভারতীয় সৈন্যেরা সাইপ্রাসবাসীদের কাছে অনেক নতুন জিনিষ শিক্ষা পেল এবং সাইপ্রাসবাসীরাও ভারতীয়দের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারল।

তেমন—গরম—নয়

ইংলণ্ড ত্যাগ করবার পূর্ব্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যদের বলা হয়েছিল, ভারতবর্ষ নাকি ভয়ানক গরম দেশ, অতএব সর্দ্দিকাশি থেকে সাবধানে থেকো।

সেই সৈন্যেরা ভারতে এলো এবং একটি ট্রেন্‌এ গিয়ে তারা উঠল। সেই সময় এই কয়েকটি ব্যাপার ঘটল :—

ট্রেনের এঞ্জিন আর ষ্টার্ট নেয় না, শীতে এঞ্জিন নাকি 'জমে' গিয়েছে। সাহায্যকারী একটি এঞ্জিন এলো কিন্তু তারও শেষ পর্য্যন্ত একই অবস্থা। এঞ্জিনের তলায় আগুন জ্বালা হল, তাকে চালু করবার জন্য—কিন্তু ঐ আগুণের তাপে ব্রেক গেল 'কষে'।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত, সৈন্যেরা এঞ্জিন চালু করতে পেরেছিল। কিন্তু সাবধান! গরম দেশের কথা সৈন্যদের কাছে যেন বোলো না, তাহলে তার উত্তরটাও গরম হয়ে উঠতে পারে।

মহাযুদ্ধ (নাটিকা)

শ্রীইন্দিরা দেবী

খোকা : দিদি, তোর নতুন পুতুলটা তো বেশ।

খুকু : হ্যাঁ, কেমন 'মা' 'ওমা' করে ডাকে।

খোকা : আমার কাঁক্‌ড়াটাও ভালো, কেমন শুঁড় নেড়ে চলে।

খুকু : কিন্তু পুরোনো হাতী, ঘোড়া, বাঁদর নিয়ে কি করি বল্‌তো খোকন ?

খোকা : কি করবি ? দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দে।

খুকু : ঠিক বলেছিস, নতুন যখন পেয়েছি তখন পুরোনো গুলো দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দি—

মা : হ্যাঁরে দস্যিরা ! অমন করে পুতুলগুলো নষ্ট করছিস ?

খুকু : ওগুলো পুরোনো, পচা।

খোকা : আমাদের যে নতুন নতুন পুতুল এসেছে।

মা : তা বলে পুরোনোগুলোর হাড়গোড় আস্ত রাখবি না ? কি দুষ্টুরে বাবা ! যাও শোয় গে যাও।

[তারপর খোকা, খুকু যখন বিছানায় শুয়েছে সেই সময় তাদের খেলাঘরের মধ্যে কি হুলস্থূল পড়ে গেছে তা তোমাদের দেখিয়ে আনি চলো। ওদের যত জন্তু জানোয়ার খেলনা ছিল সবাই মিলে তখন এমন যুদ্ধ বাধিয়েছে, সে প্রায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ। খোকা খুকু ঘুমিয়েছে—চুপি চুপি তোমরা এসো আমার সঙ্গে দেখবে ব্যাপারটা]

ঘোড়া : স্‌-স্‌-স্‌ ! আস্তে, খোকা খুকু সবে শুয়েছে।

হাতী : আমার শুঁড়ে যা লেগেছে আমি নড়তে পাচ্ছি না।

পুতুল : তুমি থাম তো শুঁড়বাবাজী।

হাতী : কে রে ? ক্ষুদে বাদশা পুতুল বুঝি ? তিন রাত্তির তো চোখ বুজে ঘুমোলে—এবার চোখ চাও।

পুতুল : আমাকে বসিয়ে না দিলে আমি যে চোখ চাইতে পারছি না। (সানুনয়ে) আমায় যদি কেউ বসিয়ে দেয়।

হাতী : আমার যে শুঁড়ে ব্যথা। (চীৎকার করে) কে আছ সাহায্য করো,—help ! help !

ভালুক : আরে থাম্‌কা চেঁচায় কে ?

পুতুল : এই যে ভালুক ভায়া, আমায় একটু ধরে বসিয়ে দাও না।

হাতী : ভালুক ভায়া বুঝি ঘরের কোনে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলে ?

ভালুক : তুমি থাম দেখি শুঁড়বাবাজী।

পুতুল : হ্যাঁ, কোন কাজের কাজী নয় বাজে কথার জাহাজ ! দাও না ভালুক ভায়া আমায় বসিয়ে। মুস্কিল, না বসালে আমার চোখ চাওয়ার উপায় নেই।

হাতী : নাও চেঁচাতে হবে না, আমি একাই তোমাদের সকলকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি।

পুতুল : তুমি থামো শুঁড়বাবাজী, এতই যদি শক্তি, আমায়ই বসিয়ে দাওনা কেন ?

হাতী : আমার যে শুঁড়ে ব্যথা।

ভালুক : ওটা অকর্ম্মার ঢেঁকী, আমি দিচ্ছি তোমায় বসিয়ে।

সকলে : বহুৎ আচ্ছা, বেশ ভাই, জিতা রহ।

পুতুল : যাক বসা তো গেল, আরে এ যে ভারী অন্ধকার।

ভালুক : মানুষগুলো অন্ধকারে ঘুমোতে ভালবাসে।

পুতুল : আমি যদি ইলেকট্রিক সুইচটায় হাত পেতাম।

হাতী : কই হে ভালুক ভায়া, দাওনা আলোটা জেলে।

ভালুক : আমার হাত যে অতদূর যায় না।

বানর : অথচ হাম বড়াই ভাব যাবে না।

দু'জনে : আরে বাঁদর ভায়া ! তুমি এতক্ষণ কি করছিলে ?

বানর : তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম।

ভালুক : দাওনা ভাই please, আলোটা জেলে !

বানর : তাই বলো, এই নাও। (সকলের আনন্দ চীৎকার)।

ভালুক : এখন বন্ধুগণ, আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে।

পুতুল : কিসের কর্ত্তব্য ?

ভালুক : খোকা, খুকু, নতুন পুতুল পেয়ে আমাদের ফেলে দিয়েছে, আমার ডান পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা বেঁকে গেছে।

বানর : আমার নাকটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

পুতুল : ওদিকে শুঁড় বাবাজীর শুঁড় তো টন্‌টন্ করছে আর আমার সামনের দাঁত দু'টো উড়ে গেছে।

ভালুক : শুধু কি তাই, আমাদের সঙ্গে পাশের বাড়ীর অরুণ অলকের পুতুল ছিল, সেগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

ঘোড়া : স্‌-স্‌-স্‌—আস্তে, খোকা, খুকুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। সবাই মিলে গোলমাল করলে কিচ্ছু হবে না।

সকলে : তা বটেই তো ! সত্যি কথা !

হাতী : আমাদের অবস্থা হয়েছে খোকা খুকুর হাতে পড়ে—

ভালুক : আরে থাম শুঁড়বাবাজী ! শুধু কি খোকা খুকু, ওদের বাড়ীর অরুণ, অলক, অজু, বুলু, কেয়া, বাণী সকলে মিলে আছড়ে মেরেছে। এ অবিচার !

পুতুল : এ অত্যাচার !

বানর : এ অসম্মান !

ভালুক : এই অবিচার, অত্যাচার, অসম্মান দূর করতে আমাদের এক হতে হবে, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

সকলে : নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! একশোবার।

ভালুক : এখন কি করা যায় ? এ অত্যাচারের প্রতিকার কি ভাবে সম্ভব ?

হাতী : আমি এক প্রস্তাব করছি—

পুতুল : তুমি থাম তো শুঁড় বাবাজী।

ঘোড়া : তুমি থাম তো হে ক্ষুদে বাদসা পুতুল।

ভালুক : আঃ কি হচ্ছে ! এখন কাজের কথা বলি। সময় আমাদের অল্প। আজ রাতেই শত্রু নিপাত করতে হবে।

ঘোড়া : আমি প্রস্তাব করছি, শুঁড় বাবাজীকে শত্রু নিপাতে পাঠানো হোক।

হাতী : আমি পারবো না, আমার শুঁড়ে ভীষণ ব্যথা, আমি নয়।

বানর : খেতে পারবে তো ? মোটা ভূত কোথাকার। বার করে দাও ওটাকে।

পুতুল : গলাধাক্কা দাও।

ঘোড়া : আহা থাক ! ও সত্যিই আহত।

বানর : তা হলে উপায় ?

ভালুক : উপায় আছে। যাদের জন্য আমরা এই অত্যাচার, অবিচার সয়েছি তাদের মারতে গেলে, একা হাতী নয় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সকলে : আমরা এগিয়েই এসেছি।

ভালুক : তাহলে সকলে প্রতিজ্ঞা করো।

বানর : কি প্রতিজ্ঞা করবো ?

ভালুক : শত্রু নিপাত না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা রাত্রে ঘুমবো না। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবো, প্রাণ দেব তবু মান দেবো না।

সকলে : আমরা প্রতিজ্ঞা করছি।

ভালুক : বেশ ! এসো আমরা দলবদ্ধ হয়ে

এই মহাযুদ্ধে এগিয়ে যাই।

সকলে : সেই বেশ, তাই ভালো।

(কোরাসে গান)

সকলে : এড়িয়ে চলো, এগিয়ে চলো ভাই
দুই পায়েতে-শত্রু দলা চাই।
যায় যদি যাক প্রাণ
তবু নাহি দিব মান
জীবনের চেয়ে বড় যে সম্মান।
এগিয়ে চলো, সামনে চলো ভাই
দুই পায়েতে শত্রু দলা চাই॥

ঘোড়া : হাতী, ভালুক ভায়া, বাঁদর ভায়া—আক্রমণ করো, ঐ যে ওরা—যাদের পেয়ে খোকা খুকু আমাদের এই অবস্থা করেছে। ঐ যে, যাও, যাও এগিয়ে।

পুতুল : কাঁদছে যে!

ঘোড়া : গলা চেপে ধরো। ঐ কাঁকড়া বিছে টাকে—হাতী, তুমি পায়ের চাপে মেরে ফেলো। বাঁদর ভায়া! ঐ শুঁড়ওয়ালা চিংড়ীটাকে আছড়ে ফেলো। কই ভালুক ভায়া, জরীর জামা পরা পুতুলটাকে ছেড়ে দিলে কেন? নাও, নাও।

জোরসে ভায়া, নিকেশ করো সামলে
দেখ দেয় না যেন কামড়ে।

সাবাস! সাবাস! ঠিক হায়—তিনটে নিকেশ! হুঁসিয়ার ভাই, আরো আছে।

সকলে : মারো আঘাত, জোরসে, হুঁসিয়ার
কোমর ভাঙ্গো, ঠ্যাং ভাঙ্গো,
ভাঙ্গো মাথা জোরসে।

(বাইরে মুরগীর ডাক)

পুতুল : হয়েছে, হয়েছে সব মরেছে।

ঘোড়া : স্-স্-স্, সকলে হয়ে আসছে, যে যার জায়গায় চলে যাও।

সকলে : চলো, চলো চটপট।

হাতী : লাসগুলো যে এখানে পড়ে রইল।

পুতুল : থাক, তুমি নিজের জায়গায় গিয়ে শুঁড়ে হাত বুলোও গে। বুদ্ধির ঢেঁকী, এদিকে যে সকাল হয়ে গেছে।

ভালুক : বাঁদর ভায়া, আলোটা নেভাও তো!

বানর : যে যার জায়গায় শুয়ে পড়েছ তো, আলো আর নেভান হলো না।

(পাখীর ডাক)

খুকু : খোকন! তোর সকাল বেলা উঠেই খাওয়া, আগে আয় না খেলাঘরে।···ওমা! একি কাণ্ড!

খোকা : কি? কি? তাইতো এসব ছড়ালে কে? নিশ্চয় কেয়া বাণীরা এসেছিল।

খুকু : আলো জ্বলছে কেন? কেয়া বাণী তো হাত পায় না। ওমা! নতুন পুতুল গুলো এমনি করে ভেঙ্গেছে কে?

খোকা : দেখি, এইতো দম দিচ্ছি, কই চিংড়ী তো শুঁড় নেড়ে চলছে না—কাঁকড়া বিছেটাও তো নড়ছে না। জরীর জামা পরা পুতুলটার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে কে? এ কি! য়্যাঁ,···য়্যাঁ,···য়্যাঁ।

খুকু : কাঁদিসনি খোকন, আয় আমরা পুরোণো গুলোই নিয়ে আসি॥

যবনিকা

একটি *Skylark*এর কাহিনী

[সমস্ত ঘটনাটিই সত্য, শুধু গল্পাকারে লিখিত। মূল লেখিকা, শ্রীমতী এলিনা কনোনেঙ্কো; ইংরাজি অনুবাদ, এ. বি. খার্দ্দিকার; বাঙ্গলা অনুবাদ, শ্রীধর।]

এই কাজের সমস্ত আনন্দ পেতে হলে, নার্স হতে হবে ও যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে কাজ করতে হ'বে। কিন্তু আনন্দ? এই কাজে আবার আনন্দ কোথায়?

লীনা আহতদের মুখে বেদনার চিহ্ন দেখতো, তাদের কাতর কণ্ঠ সে শুনতো। মানুষের ঘাম, রক্ত, ওষুধের গন্ধ তার নাকে আসতো। তার চোখের সামনেই সে মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতো। অথচ একটা আনন্দ তার ছিল—ছেলেমানুষের মত, স্বতঃস্ফূর্ত, উষ্ণ সে আনন্দ।

কি করে এমন সম্ভব? সে কি মনে প্রাণে জানতো যে যেখানে তার প্রয়োজন সেখানেই সে আছে? সে লীনা জাভরোন্‌কোভা, বন্দুকধারী যোদ্ধা নয়, ট্যাঙ্ক চালক নয়, বিমান চালকও নয়—না হোক, তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তার মাতৃভূমির কাছে তার প্রয়োজন এদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

লীনা খুসী হয়ে থাকতো কারণ সে দেখতো, এখানে, এই যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে সে তার মেয়েলি সবল হাত দিয়ে কত দরকারী কাজ কত জলদী করে-ফেলতে পারে। তার সম্পূর্ণ অপরিচিত শয্যাগত এক রুগী প্রলাপ বকছে: সে তখুনি অনুভব করতো তার নিজের প্রয়োজন। লোকটি জল চায়, সে তখুনি জল এনে ধরে তার তৃষ্ণাতুর ওষ্ঠে। লোকটি তার ব্যাণ্ডেজটি ঠিক করে দিতে বলে, সে ঠিক করে দেয়। যন্ত্রণায় লোকটি ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে, সে বারবার ঠিক করে দেয়। লোকটি কা'কে যেন ডাকে—কা'র দিকে যেন তার হাত দুখানা বাড়িয়ে দেয়—সে তখন তার নিজের হাতে তার হাত দুটি নেয়। তাকে সান্ত্বনার কথা শোনায়। লোকটি যখন তার মাকে ডাকে—সে সাড়া দেয়, লোকটি তার বোনকে ডাকলে সে এগিয়ে যায়।

সমস্ত সময় তার মুখে হাসিমুখী লেগে থাকে। জার্ম্মান শকুনীরা যখন হাসপাতাল ঘিরে ফেলেছে তখনও সেই হাসীমুখী ভাব। তার মনের সাধ, আহত সৈনিকরা তাকে যেন সদা হাস্যময়ী দেখে। তার ঐ হাসিখুসী ভাব সৈন্যদের মধ্যেও খুসীর ছোয়াঁচ লাগায়। তারা তাকে বলে—জাভরোন্‌কোভা—অর্থাৎ, Skylark.

পশ্চিম-সীমান্তের যুদ্ধে লীনার প্রথম অগ্নি পরীক্ষা হ'ল। ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। জার্ম্মানরা হাসপাতালে বোমা ফেলছে। আহতদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে। গোলা গুলির মধ্যেই লীনা রুগ্ন আহত সৈনিকদের গাড়ীতে তুলে দিতে থাকে। কি ভয়ানক, না? হা, তা ভয়ানকই বটে। কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি লীনার এতটুকুও দৃষ্টি নেই, তার শুধু লক্ষ্য কেমন করে বোমার হাত থেকে আহতদের সে রক্ষা করতে পারে। যারা হাসপাতালের ওপর এই বোমা ফেলছে, তাদের প্রতি রাগে ও ঘৃণায় সে জ্বলে যেতে থাকে। এই ঘৃণা তার ভয় ঘুচিয়ে দেয়। তার দেহ মনে অসম সাহস আনে।

যুদ্ধ যখন ভীষণতম আকার ধরেছে, লীনা ছোট্ট এক শিশু কোলে এক সেনাপতিকে আসতে দেখতে পেলো। ছোট্ট শিশুটি তাঁরই বুঝি মেয়ে। ছিন্নভিন্ন রক্তারক্তি তার জামা। ভয়ে তার চোখ দুটি যেন জমে গিয়েছে। দ্রুত নিঃশ্বাসে ও উত্তেজনায় সেনাপতি লীনাকে বলতে লাগলেন, কেমন করে তিনি তাঁর গ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে যেতে যেতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দেখতে যান। তাঁর চোখে পড়ে কেবল ধ্বংসের চিহ্ন। তাঁর গৃহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনি দেখতে পান, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের মৃতদেহ আর তাঁর এই মেয়ে, এই দুধের শিশু বসে বসে ভয়ে কাঁপছে ও 'মা মা' বলে কাঁদছে।

রক্তাক্ত শিশুটির প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে লীনা সেনাপতির সমস্ত কথা শুনতে লাগল। সেনাপতি শিশুটিকে তার কোলে দিয়ে বললেন—বোন, তুমি একে নাও, আমি যাই। আমার স্ত্রীপুত্র, আমার এই শিশু আর অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু হত্যাকারী ঐ জার্ম্মানদের ওপর প্রতিহিংসা নিতে চল্লাম আমি।

সেনাপতি চলে গেলেন। লীনার কণ্ঠ চাপা কান্নায় যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। কান্না চেপে সে শিশুর দেহ ধুয়ে দেয়, তাকে জামা কাপড় পরিয়ে দেয় আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এই যুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি, তার দেহের সমস্ত রক্ত সে উৎসর্গ করবে।

আরো উৎসাহে লীনা তার কাজে লাগল। সব সময়ে তার মনে হতে থাকে সে যেন কিছু করছে না, আরো কিছু চাই। এমন সময় তার কি আসবে না, যখন সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করে তার প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি তার কর্ত্তব্য করতে পারবে।

সে জানতো তার অনেক বন্ধু নার্স সম্মুখ-যুদ্ধে কাজ করে দেখিয়েছে, রুশ মেয়েরা ভীরু নয়, মৃত্যুকে তারা অবজ্ঞা করে। সে জানে যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও নার্স কুলিকোভা দারুণ অগ্নিবর্ষণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তার সবল হাতে সে এক ট্যাঙ্ক চালকের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করছে। বোমার টুকরো শিষ কেটে কেটে তার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কি ভীষণ, না? নিশ্চয়, ভীষণই তো। কিন্তু আসল কথা, লীনার মতই কুলিকোভার সমস্ত দেহমন শত্রুর প্রতি ঘৃণায় উদ্দীপ্ত। কাজ করে যায় সে। হঠাৎ বোমার এক টুকরো তার গায়ে এসে লাগে—মাটিতে পড়ে যায় সে, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। কিন্তু তার সে খেয়াল নেই। ট্যাঙ্ক চালককে বাঁচাতে হবে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বনের দিকে এগিয়ে যায়, একজন লাল সেনাকে ডাকে। দুজনে মিলে ট্যাঙ্ক চালককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে পৌঁছে দেয়। তারপর তার কণ্ঠে ওঠে অস্ফুট কাতর ধ্বনি। লাল সেনা বলে, কি হয়েছে বোন—?

"দয়া···করে···আমার···ক্ষত···ব্যাণ্ডেজ···"

লীনা এ সমস্তই জানে, সব খবর সে রাখে। তার সমবয়সী বন্ধুদের সাহসে কত সুখী সে হয়েছে। ক্লাভা পাভ্‌লোভা জার্ম্মান-অধিকৃত এলাকা থেকে পাঁচজন আহত লাল সৈনিককে নিজের

কাঁধে করে স্থানান্তরিত করেছে, সে শুনেছে। কাটিয়া পাব্রোমোভার সে কথা শুনেছে। কাটিয়া এক গেরিলা বাহিনীর নার্স; সে একবার বত্রিশজন আহত সৈনিকদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। তাদের রক্ষা করে সে শত্রুর গোলাবর্ষণের মধ্যেই আবার কাজে ছুটে গিয়েছিল। যখন জার্ম্মানরা মেসিনগানারকে গুলি করে, তখন কাটিয়া ছুটে গিয়ে সেই মেসিনগান নিজ হাতে আবার চালিয়ে জার্ম্মাসিষ্ঠ কুকুরদের ওপর প্রতিশোধ নেয়।

সাবাস্ কাটিয়া! লীনা তার সমবয়সী এই মেয়েটির বীরত্বে গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু তার মনে কিসের একটা কাঁটা যেন বিঁধতে থাকে। তার মাথায় একটা চিন্তা আসে। সে ভাবে:

—কিন্তু আমি? আমি কি? কবে আমি দেখাতে পারবো যে মৃত্যুকে আমি তুচ্ছ করতে জানি। কবে আমি বড় একটা কিছু করতে পারবো, এমন একটা বড় কিছু, যাতে আমাদের লাল সেনাদের সত্যিকারের সাহায্য করা যায়?

হাসিখুসীভরা জাভরোন্‌কোভা—skylark মনে দুঃখ করতে থাকে. সে সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে নাস হয়ে কেন কাজ করছে না। তার মনে হতে লাগল এই হাসপাতাল যেন বড় বেশী নীরব।

শীঘ্রই সুযোগ এলো, যখন লীনা ১৩০ জন গুরুতররূপে আহত লালসেনা ও সেনাপতিদের জীবনরক্ষা করেছিল।

এই ঘটনাটি ঘটে ইয়াট্‌সেভো জেলা সহরে। জার্ম্মানরা সহরের নিকট পৌঁচেছে। রাতের অন্ধকারে তারা রেলওয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে ভীষণ গুলিবর্ষণ সুরু করেছে। ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ। লীনা যে হস্‌পিটাল ট্রেনে তার ৬ জন সহকারী ও ১৩০ জন আহত সৈন্য নিয়ে চলেছিল, সেই ট্রেনখানা লালসেনা বিভাগ থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

লীনা কিন্তু তার বুদ্ধি হারাল না, ভয় পেয়ে সে পালালোও না। সে নীরবে সৈন্যদের শুশ্রূষা শুরু করে দিতে লাগল, তাদের খাওয়ালো, জল দিলো ও তাদের শরীরের তাপ লিখে নিলো।

জার্ম্মানরা রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী বনের মধ্যে এসে পড়েছে।

লীনা তার ৬জন সহকারীকে জানাল—আহতদের কাছে জার্ম্মানদের একটি কথাও নয়।

তারা বললে—কিন্তু, কিন্তু আমরা করবো কি। আমরা আহতদের পাহারা দেবো। রেলপথে নিশ্চল এই হস্‌পিটাল ট্রেনটি জার্ম্মানরা যেকোন সময়ে আক্রমণ করতে পারে। লীনা ও তার সহকারীরা সমস্ত ট্রেনখানায় পাহারা দিতে লাগল।

দিনের বেলায় আহতদের সে শুশ্রূষা করে, এমন কি তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করে।

আহত সৈন্যরা জিজ্ঞেস করে—আমাদের ট্রেন এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছে কেন?

লীনা উত্তর দেয়—রাস্তা ঠিক নেই বলে, তবে শীঘ্রই আমাদের ট্রেন আবার ছাড়বে।

তিনদিন তিন রাত এমনি করে কেটে গেল। আর তাদের শেষ রুটিও ফুরিয়ে গেল।

একজন সহকারী বলল—আমাদের আর খাবার কিছু নেই। লীনা বলল—আগে খুঁজে দেখো সমস্ত গাড়ী। কিন্তু ভাবতে লাগল, কি করা যায়। কাল আহতদের কি খেতে দেবে?

কিছু ময়দা পাওয়া গেল।

লীনা বললে—আমি জানি, পাওয়া যাবে। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে, শোন: নিকটের কোন গ্রামের চাষী মেয়েদের কাছে আমাদের খবর পাঠাতে হবে। আমাদের তারা সাহায্য করবে।

লীনা নিজেই নিঃশব্দে নিকটের এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছল এবং সমস্ত কথা গ্রামের মেয়েদের বলে, জিজ্ঞেস করলে—তোমরা আমাদের সাহায্য করবে না? আহতদের খেতে দেবে না?

তারা বললে—নিশ্চয় তা'কি আমরা জানি না গো, আমাদেরও ছেলেমেয়েরা যে যুদ্ধে গিয়েছে। গ্রামের কয়েকটি মেয়ে লীনার সঙ্গে চুপি চুপি চলে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো দুধ আর ফলমূল। যাবার সময় তারা ময়দা নিয়ে গেল ও পরদিন ভোরে গরম রুটি নিয়ে এলো।

এমনি করে পাঁচদিন কেটে গেল। গ্রামে থেকে মেয়েরা রুটি নিয়ে আসে, এমনকি আহতদের জন্য গরম ঝোলও তারা নিয়ে আসে।

কিন্তু একটা 'প্ল্যান্' না করলে চলে না। যে কোন মুহূর্ত্তে জার্ম্মানরা আহত সৈন্যদের হয়ত দেখতে পাবে।

একজন বললে, কি আমাদের এখন করতে হবে? হয়ত এখনও আমরা আহতদের বাঁচাতে পারি!—তাদের বাঁচাতেই হবে, লীনা বললে, আমাদের শত্রুব্যূহ ভেদ করে যেতে হবে, যে করে হোক লালসেনা মহলে পৌঁছতে হবে আমাদের।

সহকারীরা জানে যে এই মেয়ে তার জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত।

একজন বললে, বোন তোমার না গেলেই ভাল। বিপদটা বড় বেশী। দয়া করে আমাকে যেতে দাও।

লীনা বললে, না না, আমিই যাবো। আমার পক্ষে খুব সহজ হবে। চাষী মেয়ের পোষাক পরে আমি যাবো।

লীনা একটা শাল জড়িয়ে নিলে গায়ে। রুমাল দিয়ে তার মাথার চুলগুলো বাঁধলো। আর ভোরেই সে নিকটবর্ত্তী কোন সোভিয়েট হাসপাতালের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বনের মধ্যে একটা পায়ে-চলা পথ ধরে সে এগুতে লাগল। জলাভূমি পার হয়ে সে চলতে লাগল। কখনও কখনও মৃতদেহের পাশেই তাকে লুকোতে হয়। একটা জার্ম্মান প্লেন তাকে দেখতে পেয়ে নীচের দিকে নেমে এলো আর গুলি চালাতে লাগল। লীনা একটা গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। আবার বনের মধ্যে দিয়ে সে এগুতে লাগল।

অবশেষে, হাসিখুসী মুখে skylark এসে পৌঁছল সোভিয়েট হাসপাতালে লালসেনা মহলে।

লীনা ও তার সহকারীরা একে একে আহতদের কোলে করে বয়ে আনতে লাগল। এক জায়গায় কতকগুলি মোটরগাড়ী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মেসিনগানের অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্যে তারা একশ' ত্রিশ জন আহতদের সকলকে একে একে নিরাপদে গাড়ীতে তুলে দিলে।

তারপর তারা সকলেই যখন বিপদের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন লীনা আহত সৈনিকদের কাছে সব কথা খুলে বললে।

* * *

পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে যখন ফ্যাসিষ্ট কলঙ্ক একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে, তখন কবি ও ঐতিহাসিক, শিল্পী ও ভাস্কর, গায়ক ও বাজনদার আমাদের সোভিয়েট মেয়েদের কাহিনী নিজেদের মতন করে বর্ণনা করবে।···প্রিয় সোভিয়েট মেয়েরা! সুন্দর সুন্দর গান, কবিতা, গল্প, সঙ্গীত, চিত্র তোমাদের প্রতি উৎসর্গ করা হ'বে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তোমাদের সেই বীরত্বের কাহিনী শুনবে।

অভিশপ্ত বংশ

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

?

'অভিশপ্ত বংশ'—নাম শুনলে আমাদের ভয় হয়, তোমাদের জাগে কৌতূহল।

সমস্তটাই কিন্তু বানানো গল্প নয়, বাংলা দেশের কোনো এক মফঃস্বল শহরের জীবন্ত ঘটনা। কোনো একটি ছেলের বিচিত্র জীবনের কাহিনী। প্রদীপ তার নাম, মনে রেখো।

মস্ত বংশের ছেলে প্রদীপ, সরলতায় সুন্দর, মাধুর্য্যে উজ্জ্বল।

এক অভিশপ্ত পরিবারের রহস্যময় আলোছায়ায় নিরানন্দ জীবনে তার যে ঝড় এলো, তার যেন শেষ নেই।

লক্ষ্য করো এই ছেলেটিকে দুঃখের রাত্রে, লক্ষ্য করো তা'কে সুখের সূর্য্যালোকে, তোমাদের কারুর সঙ্গেই এর মিল পাবে না। যে আঘাতে তোমরা কাতর হ'য়ে পড়বে, চঞ্চল হ'য়ে উঠবে, কি অপরিসীম ধৈর্য্যে ও সাহসে সে আঘাত এ সহ্য করে, দেখো। শেষ অবধি পারবে কি দুধের বালক—?

হলুদ রংএর বাড়ী। নাম বুঝি তাই হল্‌দে কুঠি।

মস্ত প্রাসাদের সমস্তটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। গাছপালায় আড়াল পড়ে। বড় বড় আকাশ ছোঁয়া গাছ, ওক্ আছে, পাইন আছে, দেবদারু আছে, ইউক্যালিপটাস্ আছে, আছে আম জাম কাঁঠালের বন।

ফটক পার হ'য়ে শামুকের সাদা খোলা দিয়ে বাঁধানো, ফিকে লাল পুরাণো রাস্তাটা দিয়ে চ'লে যাও, দুপাশে ঠাণ্ডা গাছের ছায়ায় শুক্‌নো পাতার রাশ, অনেকখানি চ'লে পাবে দেউড়ি। ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড উঠোন, চক্‌মিলানো। বাড়ীর বধ্যে খালি সিঁড়ি, ঘরের পর ঘর, ছাদের পর ছাদ, বারান্দার পর বারান্দা।

সব শূন্য, সব খাঁ খাঁ।

বার বাড়ীর বৈঠকখানায় তালা দেওয়া। নেই সেখানে পুরুষ কণ্ঠের অট্টহাসি। অন্দরের রান্নাঘর ঝুলে ভরা। নেই সেখানে নারী হস্তের কঙ্কননিক্কণ।

এত বড় পুরী লোকজনে যা একদিন গম্‌গম্ করত, আজ যেন অপরাহ্নের ম্লান আলোয় থম্‌থম্ করতে থাকে। বাইরে দরোয়ানদের অলস গলার গান, গাছে পাখীদের রুচিৎক্লান্ত সুর সেই একটানা স্তব্ধতাকে আরো গম্ভীর আরো অসহ্য ক'রে তোলে।

এখনো সব ঘর আমাদের দেখা হয়নি। বাকী আছে অনেক অনেক দিক্।

তবু বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে পড়ি।

এত বড় 'হলে' এত বইয়ের লাইব্রেরী, এমন কমই দেখেছ।

বইয়ের আলমারী প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে, চারিধারের দেয়াল ভ'রে আলমারীর পর আলমারী।

সেখানেও বই ধরেনি। র‍্যাক্ শেল্‌ফ টেবল্ বোঝাই ক'রে শেষে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, লাল নীল সবুজ কালো মলাটের অসংখ্য অগুন্তি বই।

ঘরের সমস্ত শার্সীগুলো লাগানো। রঙীন কাঁচ, শুধু রঙীন নয়, তাতে রং বেরংএর কতনা ছবি আঁকা, কত সমুদ্রের, কত অরণ্যের দৃশ্য, কত বনের বাঘ, কত দীঘির সারস কত ছেলেমেয়ের ছুটোছুটি।

তারি ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের যে পড়ন্ত রোদ এসে এখানে ওখানে পড়েছে, তারও আভা যেন মায়াময়। চোখে যেন ঘোর লাগে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌বার পরে তবে নজরে পড়ে, একটি বৃদ্ধ ঘুর্ণায়মান চেয়ারে ব'সে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে যেন কী পড়ছেন।

খানিক পরে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। রোগা, অতিরিক্ত লম্বা লোকটি, পাকা আমের মতন টক্‌টকে রং, দীর্ঘশ্মশ্রু একেবারে সাদা হ'য়ে যায়নি, কাঁচাপাকায় হরিহরমূর্ত্তি, মাথার চুল পাৎলা হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। মর্ম্মভেদী সে দৃষ্টি।

বইয়ের মাঝখান দিয়ে লম্বা ঘরটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তিনি পায়চারী করলেন। অনেকবার।

শেষটা আরাম কেদারায় শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে কী ভাবতে লাগলেন।

বাড়ীটার কিছু তফাৎ দিয়ে গঙ্গা ব'য়ে গেছে।

স্রোতের টানে সাদা ও কমলা রংএর পাল তুলে দিয়ে নৌকো চলেছে।

নদী যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে সারি সারি কলের চিম্‌নী। ঠিক্ ওপারে শিবের বাদশ মন্দির, কার যেন বাগানবাড়ীর ঘাট। ওপারের সমস্ত সবুজ গাছগুলোর মাথায় সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছটা লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঈশান কোণের মেঘ আকাশে মাথা তুলে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো।

মাঝিরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো ঘাটে তরী লাগাবার জন্যে। এলো এলো বুঝি কালবৈশাখী।

বৃদ্ধ দরজার কাছে এসে ডাক্‌লেন—পার্ব্বতী।

ভৃত্য পার্ব্বতীচরণ বেঞ্চের ওপর বসেছিল। সাড়া দিল—হুজুর!

ঝড় আসছে নাকিরে? ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখে এসে সে বল্‌লে—আস্‌ছে।

তাহ'লে আজ সে আস্‌বে।

বৃদ্ধের স্বরে উত্তেজনা।

সার্শীটা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে তারপর নিজেই বল্‌লেন—ঝড় আস্‌ছে। বছরের প্রথম ঝড়। আজ সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। বন্ধ ক'রে দে ফটক। লছমন সিং!

নীচে থেকে দরোয়ান হাঁক্‌লো—হুজো'র!

বন্ কর্ দেও বাহারওয়ালা কেওয়াড়ি!

খানিক পরেই বল্‌লেন—নেহি, রহনে দেও। আনে দেও উস্‌কো। বন্ করনেসে আউরভি মুস্কিল। আনে দেও, যো হোয়, সো হোয়!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়, বাগানের গাছে গাছে মর্ম্মরধ্বনি শেষে একটানা

শো শো শব্দে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল, ধূলোতে বালিতে ঠাণ্ডা বৃষ্টির গুঁড়োতে আলো অন্ধকারের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য গ্রীষ্মদগ্ধ পৃথিবীর ভালোই লাগবার কথা—কিন্তু জীর্ণ বৃদ্ধের চোখে যেন আশঙ্কার বন্যা এলো।

ঝড় তখনো চলেছে।

হঠাৎ—ঝড়ের মধ্যেই তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ—ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও!

চম্‌কে উঠে বৃদ্ধ গিয়ে তাঁর চেয়ারে বস্‌লেন। কান দুটো চেপে। সদর থেকে আর্ত্তনাদ মহলের পর মহল পার হ'য়ে অন্দরের দিকে প্রসারিত হল—ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!

বৃদ্ধের কণ্ঠ ভয়ে করুণ ও ক্লান্ত—দোব দোব—যা যা তুই যা, সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠ—না, না এখনি ফিরিয়ে দাও, আজই ফিরিয়ে দাও—বীভৎস বিশ্রী কলহের মতন শোনাতে লাগলো।

সেই ফিকে অন্ধকারে একটি ফর্‌সা ছেলে ছুটে এসে প্রশ্ন করলে—কেও দাদু, কী ফিরিয়ে নিতে চায়?

বৃদ্ধ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—তুই যা যা প্রদীপ, এখান থেকে যা।—তুমি চ'লে যাও। তুমি চ'লে যাও, আমি ফিরিয়ে দোব যখন বলেছি, দোবই।

কবে দেবে? আর কবে দেবে?

বাইরে ঝড়ের আওয়াজ তখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠেছে। গাছের ডালপালা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এক একটা দম্‌কা হাওয়ায় খড়খড়ি শাসী ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠেছে। পুরোন বাড়ীর ভিত পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠছে।

সেই ঝড়ের মধ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই রহস্য ঘনমূর্ত্তি তার অদ্ভুত আবেদন নিয়ে মিলিয়ে গেল।

ক্রমে ঝড় থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার হল।

পড়ার ঘরে একলা ছোট ছেলে প্রদীপের দুর্ব্বল মনে সেই আশ্চর্য্য প্রার্থনার কথাই বারবার আঘাত ক'রে ফিরতে লাগলো। কেন ও বল্‌লে—'ফিরিয়ে দাও' 'ফিরিয়ে দাও'?

সাম্‌নে আরো অন্ধকার রাত। তাকে একেবারে একলাটি শুতে হবে। তারায় ভরা নীল আকাশের ভয় দূরকরা চাঁদের আলো আজ নেই।

মাষ্টার মশায়ের আস্‌তে দেরী হচ্ছে। পড়ায় তার মন বস্‌ছেনা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে সে বসেছে। এই বই পড়ে নাকি তার দাদুও বাংলা শিখেছিলেন। প্রথমে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় পড়েছিলেন।

যাই হোক্, সে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এতদিন পড়ছিল—ক আর র—কর; ঘ আর র—ঘর; এখন দেখছে বেশ মিল্ আছে, যদিও ফাঁক ফাঁক ক'রে লেখা—

কর	ঘর	ধর	কর
পর	মল	ধর	ফল
যত	কয়	তত	নয়
গত	হয়	কত	সয়

ঠিক্ কবিতার মতন।

তারপর— সরস দল পনস ফল
সরল নল তরল জল—শেষ ক'রে এখন তাকে পড়তে হবে—

ক-এ আকার কা আর ল—কাল।
ক-এ আকার কা আর ক—কাক।

নিজে নিজেই বিস্তর পরিশ্রম ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে প'ড়ে দেখে ওমা, একি? এও যে কবিতা!—

কাল কাক ভাল নাক।
কাটা কাণ ফাটা শাণ॥
শিকি চাই টিকি নাই।
মণিহারা ফণীপারা॥ —কী আশ্চর্য্য!

আরো আশ্চর্য্য তার লাগে এ কথা ভাবতে, এখন ত' এত কষ্ট ক'রে বানান ক'রে ঘেমে উঠে একটি একটি ক'রে সে কথা শিখছে! পরে এমন দিন আস্‌তে পারে যে বই হাতে করলেই সে তর্‌তর্ ক'রে গল্প পড়তে পারবে, মাষ্টার মশায়ের মতন!

চাই কি এরকম একটা বই সে লিখেও ফেল্‌তে পারে!

না অতদূর ভরসা করবার তার সাহস সেই।

এই সময়ে মাষ্টারমশাই এসে গেলেন। যাক্ ভয় খানিকটা দূর হ'ল।

একজন মাষ্টারমশাই পাশে থাকা যে কী ভাল, বলা যায় না।

সে বল্‌তে পারে, অন্য ছেলেদের কাছে, যে তার একজন মাষ্টারমশাই আছেন—যদিও অন্য ছেলেদের সঙ্গে কতটুকু বা তার দেখা হয়? ক্বচিৎ কখনো কেউ যদি বাগানে ঢুকে পড়ে, তবেই।

মাষ্টারমশাই কিন্তু সকলের থাকে না। প্রদীপ সে খবর নিয়েছে। আর থাক্‌লেও, এত ভালো মাষ্টারমশাই খুব কম লোকেরই থাকে, প্রদীপ ভালো রকমই জানে, কেউ না বল্‌লেও।

তিনি মোটে মারেন না। যে মাষ্টারমশাইরা মারে, তাদের লোকে বলে মাষ্টার। মশাই কিছুতেই বলেনা।

প্রদীপের মাষ্টার মশাইয়ের নাম প্রণববাবু। ভয়ানক শক্ত বানান করা। তার নিজের নামের মতন। এখনো র-ফলায় সে পৌঁছয়নি, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে, অন্য ছেলেদের মতন পোদীপ বলেনা। একেবারে পদবী পর্য্যন্ত বলে, বলে আমার নাম—প্রদীপ মল্লিক।

ছেলেরা জিজ্ঞেস্ ক'রে যখন—তোর বাবার নাম কি? বল্‌তে পারেনা। ওটা তাকে শেখানো হয়নি। তারা তাদের বাবার নাম বলে। আর হাসে।

মাষ্টারমশাইকে আজকে প্রশ্ন করে—আপনি জানেন আমার বাবার নাম কি? মার নাম কি?

আমি কি ক'রে জান্‌ব বলো? গিয়ে জেনে নিয়ো তোমার দাদুর কাছ থেকে। আরো আগে জানা উচিত ছিল।

একদিন জিগেস্ করেছিলাম দাদুকে। দাদুর মুখ অম্‌নি গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। বল্‌লেন, তোমার দরকার কি?

আবার যেন বাইরে ঝড়ের আওয়াজ আস্‌ছে। মনে হয় প্রদীপের। আবার যদি সেই রকম কথা বলে এসে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটা! আবার যদি দাদু চেঁচামেচি করেন? ঘোর অন্ধকার বাইরে। ঘোর অন্ধকার দালানে। এখন ওসব না হওয়াই ভালো। কিন্তু কান পাতলে কি শোনা যায়না অ-নে-ক দূরে?—ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!—

[ক্রমশঃ

সকল প্রকার রাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কন্‌ট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

সম্পাদকীয়

অনেকেরই উৎসাহে, সৌজন্যে ও সহযোগিতায় রংমশালের এই যুদ্ধসংখ্যাটি তোমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারলাম। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাব্‌লিক্ রিলেশানস্ বিভাগ, ইণ্টার-সারভিস্ পাব্‌লিক্ রিলেশানস্ ডাইরেক্টরেট (ইষ্টার্ণ আর্ম্মি), চাইনীজ মিনিষ্ট্রি অফ্ ইনফরমেশন, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ছাত্র-ফেডারেসন প্রভৃতি এবং যে সকল লেখক-লেখিকা বিনা পারিশ্রমিকে নানা লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নানাবিধ ভাবে তাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন এবং বলা বাহুল্য তাঁদের সাহায্য না পেলে রংমশালের এই বিশেষ যুদ্ধ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না। নতুন মলাট ও রঙীন প্রচ্ছদপটের জন্য আমাদের একটু দেরী হ'ল—সেজন্য আমরা পাঠকপাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আফ্রিকা থেকে মিত্রশক্তি বাহিনীর নৌ ও বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে প্যান্তেলারিয়া, ল্যাম্পেডুসা ও লিনোসা এই দ্বীপগুলি পরপর আত্মসমর্পণ করতে একটুও দেরী করেনি। প্যান্তেলারিয়া—সিসিলি ও টিউনিসের মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ, ল্যাম্পেডুসা ও লিনোসাও ইতালী সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত সিসিলিয়ান্ প্রণালীস্থ দুটি দ্বীপ। লিনোসা ল্যাম্পেডুসার ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। এই দ্বীপগুলির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের পতনের ফলে, সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার পতনও আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। মিত্রশক্তির নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ইতালীর নিজের অবস্থাও যে খুব কাহিল সে বিষয়ও সন্দেহ নেই। অনেকে বলছেন, এবার যে কোন মুহূর্ত্তে খাস্ ইউরোপ আক্রমণ আসন্ন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ ও মার্কিণ বিমান বহর ইতালীতে বোমা বর্ষণ সুরু করেছে।

জার্ম্মানরা রুশের বিরুদ্ধে লেনিনগ্রাদ থেকে খারকভ্ পর্য্যন্ত প্রায় ২ হাজার মাইল দীর্ঘ এক রণাঙ্গন সৃষ্টি করে বিরাট সাঁজোয়া বাহিনীর সমাবেশ করেছে এবং ওৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছে। মতলব এদের নীরেট সোভিয়েট ব্যূহ ভেদের একটা অন্তিম চেষ্টা। জার্ম্মানদের এই বিরাট মহলা অগ্রাহ্য করে সোভিয়েট লাল ফৌজ, গোলন্দাজ সৈন্য ও সর্ব্বোপরি লাল বিমানবাহিনী পাল্টা আক্রমণে ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর বিস্তর ক্ষতি করতে সুরু করেছে। জার্ম্মান সাঁজোয়া বাহিনী সোভিয়েট ব্যূহের ফাঁক খোঁজবার চেষ্টায় আছে কিন্তু সোভিয়েটও তার বিরাট লাল বাহিনী নীরেট করেই জার্ম্মান বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছে।

ভারতবর্ষের নতুন বড়লাট কে হবেন, তাই নিয়ে কমপক্ষে দশবারোটা নাম আমরা দৈনিক কাগজে লণ্ডন মারফত সংবাদে পড়ছিলাম এবং এ সম্বন্ধে কতদূর গুজব আজব রচনা হতে পারে তাও দেখছিলাম। কিন্তু এই সব সংবাদদাতাদের বোকা বানিয়ে, যাঁর নাম কোনদিন ভাবী-বড়লাটের তালিকায় স্থান তারা দেন নি, সেই ফিল্ড মার্সাল ওয়াভেল সাহেবকে বড়লাটের পদে নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। ফিল্ড মার্সাল ওয়াভেল ভারতের প্রধান সৈনাপতি। বড় যোদ্ধা ও সমরনীতিজ্ঞ বলে তাঁর জগৎ জোড়া খ্যাতি আছে। যাহোক, ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সৈনাপতিকে বড়লাট পদে নির্ব্বাচিত করা হল।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করে পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে দেন। তাঁদের বিচিত্র তথ্যগুলি শুধু উচ্চ বিজ্ঞান বিষয়ক নয়, সেগুলি মানুষের উপকারে আসে এমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সম্প্রতি তাঁরা এক জাতের মাছের অনুসন্ধান করেছেন যারা নাকি ম্যালেরিয়া-বাহী মশার ডিম খেয়ে শরীর পুষ্ট করে। জলাবিলে, ক্ষেত ক্ষামারে যেখানে যেখানে এই মশারা ডিম পাড়ে, সেখানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই মাছ ছেড়ে দেওয়ার কাজে লেগেছেন। এর ফলে, ঐ মাছের দ্বারা মশক-ডিম্ব নষ্ট করে সোভিয়েট ভূমি থেকে ম্যালেরিয়া ভূত বিতাড়িত হবে।

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, হলিউডের জনপ্রিয় তরুণ ভারতীয় ফিল্মষ্টার সাবু আগামী ৭ই জুলাই নাকি সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবে, অর্থাৎ সাবু তার ফিল্ম অভিনয় আপাততঃ পরিত্যাগ করে যুদ্ধে লড়াই করতে যাবে। সাবুর একটি ছোট ভাই—সেখ—সেও নাকি যুদ্ধে যোগদান করবে। আমরা দেখেছি সাবু তার ফিল্মে ভীষণ জন্তু ও দুষমনদের সঙ্গে লড়াই করেছে। এবার কিন্তু সাবুকে আসল্ ও আরো ভীষণ দুষমণের সম্মুখীণ হয়ে আসল লড়াই করতে হবে। সাবু তাইতো আজ চায়। আশা করি সাবু ফিল্মে যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, তার চেয়েও অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়ে সে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

কলিকাতা ফুটবল-লীগ খেলা যতটা এ পর্য্যন্ত (জুনের মাঝামাঝি) হয়েছে, তাতে মনে হয় এবার ইষ্টবেঙ্গল দলটির লীগ জয় করার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। এবারকার সমস্ত দলের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল সকলের চেয়ে ভাল খেলেছে। ইষ্টবেঙ্গলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান লীগ তালিকায় দ্বিতীয় হবে বলেই মনে হয়, যদি না অপ্রত্যাশিত হারজিৎ কিছু ঘটে। অন্যদলের মধ্যে কালিঘাট এবার ভাল খেলছে। এদিকে মহামেডান স্পোর্টিংএর আর সে খেলা নেই এবং লীগের আশা তাদের আগেই ছাড়তে হয়েছে। অথচ একদিন এই দলটি অপরাজেয় ছিল এবং এদের ফরোয়াড় লাইনের খেলা দেখবার মত ছিল। যা হোক, তোমরা যখন এ পত্রিকাটি হাতে পাবে, তখন লীগ খেলার কতকটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ত হয়ে যাবে।

ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের পরলোকগমনে সমস্ত দেশ শুধু একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক হারান না, একজন শিক্ষাব্রতী, স্বদেশী-শিল্পানুরাগী দেশপ্রেমিককেও হারাল। অজস্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে, চিকিৎসায়, শিক্ষায়, শিল্পে, নানা কল্যান প্রতিষ্ঠায়, তাঁর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি শুধু গুণীজ্ঞানী ছিলেন না, তিদি অত্যন্ত সজ্জন, ভদ্র, অমায়িক, পরদুঃখকাতর ও দানী পুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁর মহান্ আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাচ্ছি।

দক্ষিণ মেক্সিকোর একটি পার্ব্বত্য রাজ্যে এক নতুন আগ্নেয়গিরির আবির্ভাব হয়েছে, সে খবর বোধহয় হয়ত অনেকে পেয়ে থাকবে। পৃথিবীতে আজ অনেক কিছু নতুন জিনিষের আবির্ভাব ঘটছে, তাতে কিছু আশ্চর্য্যের নেই কিন্তু এই নতুন আগ্নেয়গিরির আবির্ভাব এ যেন কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম। এই আগ্নেয়গিরির নাম হ'ল পারিকিউটিন্ (*Paricutin*)। কিন্তু এর উদ্দেশ্য যে ভাল তাতো মনে হয় না। একে তো যুদ্ধের আগুনে পৃথিবী-পৃষ্ঠ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, তার ওপর এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎকিরণ, সে ভয়ানক কথা। এঁদের ঠেকাতে পারে এমন অস্ত্র তো আজও কেউ বার করতে পারেন নি। শুনছি পারিকিউটিন্ তার অগ্ন্যুৎপাতে এক ভীষণ রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। মেক্সিকো সহরের এক খবরে প্রকাশ, যে ডাক্তার, নার্স ও কর্ম্মচারীরা এই আগ্নেয়গিরির এলাকায় সাহায্য দানে গেছেন কাল্ট্‌জিন্‌জিন্ (*Caltzinzin*) গ্রামটি নাকি পত্রপাঠ খালি করা হচ্ছে।

সম্মিলিত জাতির ঘোষণা

এবারকার রংমশালে তোমরা প্রথমেই যে তিনরঙা ছবিটি দেখলে তাতে আটাশটি সম্মিলিত দেশের বা রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার ছবি দেখতে পাচ্ছ। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী নিম্নলিখিত ছাব্বিশটি জাতি পৃথিবীর শত্রু জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপানকে ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওয়াশিংটনে একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন—

ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেলজিয়াম, কষ্টারিকা, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডোমিনিক্যাল সাধারণতন্ত্র, সালভেডর, গ্রীস, ওয়াটেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, লাক্সেমবুর্গ, নিকারাগুয়া, পানামা এবং যুগোশ্লাভিয়া।

পরে এই অঙ্গীকারপত্রে আরও ছয়টি দেশ স্বাক্ষর করেছেন, কাজেই বর্ত্তমান সম্মিলিত রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩২টি। যখন ছবিটি তোলা হয় তখন ২৮টি রাষ্ট্র এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। অঙ্গীকারপত্রটি এই ঃ—

"যে সমস্ত রাষ্ট্র এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন, তাঁহারা ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট 'আটলাণ্টিক চার্টার' নামে যে ঘোষণা করেন, তাহার সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি সমর্থন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের নিজেদের এবং অন্যান্য দেশের মানুষের জীবন, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচার রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের শত্রুদের উপর সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করা একান্ত প্রয়োজন, এবং আরও বিশ্বাস করেন যে, যে শক্তি সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন—

প্রথমতঃ, ত্রিশক্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ শক্তিগুলি ও তাহাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজেদের সম্পূর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সেই যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত এই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাঁহাদের কেহই শত্রুর সহিত বিভিন্নভাবে যুদ্ধে বিরত হইবে না বা সন্ধি করিবেন না।

হিটলারী নীতির বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যে সকল জাতি কার্য্যকরী সহায়তা বা সাহায্য করিতেছেন তাঁহারাও এই ঘোষণায় যোগদান করিতে পারেন।

—ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪২।"

এই ঘোষণায় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী স্বাক্ষর করেন।

'লাল চীন' পড়েছ কি? উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র—
ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের
লাল চীন—মূল্য ১৷৷০
পর্য্যটন প্রকাশনা ভবন, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নূতন ধাঁধা

(১) কোন্ দেশের নাম লিখতে গিয়ে রাম টিউসনি করে এল ?

(২) যতদূরে যায় তত বড় হয় কি ?

(৩) তিন অক্ষরে নাম কাজের জিনিষ খাসা,
মাথা নিলে গনেশদাদার বুঝি সর্ব্বনাশা।
লেজ কাটলে চপল অতি কিন্তু পাখী খাঁটি,
পেট ছাড়লে কিন্তু যে ভাই কাজটা হবে মাটি॥

১৫ই শ্রাবণের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) 'শ' (২) উত্তর মেরু (৩) কোথাও না
(৪) দুই সমান (৫) সিংহল (৬) চায়না (৭) জল
থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে জল হয় (৮) ৪ (ওপর
নীচে যোগ হ'লে) (৯) আম (১০) সূর্য্যের আলো।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) যত লোকসংখ্যা তার অর্দ্ধেক জুতা।
(২) তিনি কোথাও যাত্রা করেননি।

ধাঁধার উত্তর

বৈশাখ মাসে নির্ভুল উত্তর কাহারও হয় নাই।

যাদের একটি মাত্র ভুল হয়েছে :—কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন ; সতীনাথ ভট্টাচার্য্য, নৈহাটী ; কুমারী যুথিকা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ; অমিয় চ্যাটার্জ্জী, পুরুলিয়া। যাদের দুইটি ভুল হয়েছে :—পঞ্চানন, পারুলবালা ও গোপীনাথ রুই, কলিকাতা ; সমরেন্দ্র, মানবেন্দ্র ও নিলিমা চক্রবর্ত্তী, আজমীর ; অমল, অজিত ও অধিবরঞ্জন বসু বরিশাল ; অতুলচন্দ্র মাহাত, মেদিনীপুর ; কান্তিরঞ্জন ঘোষ, নোয়াখালি ; রেণুকা ও সাধনা বিশ্বাস, চট্টগ্রাম।

জ্যৈষ্ঠের উত্তর নির্ভুল হয়েছে কেবল জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, শ্রীনগর। যাদের একটি ভুল হয়েছে : অমিয় চ্যাটার্জ্জী পুরুলিয়া ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া ; সাধন বসু, কলিকাতা ; অরবিন্দ নন্দী, কলিকাতা।

ভাদ্রের রংমশাল—গ্রাহকগ্রাহিকা সংখ্যা

রংমশালের নিয়মিত উপন্যাস ও তার বিশেষ বিভাগগুলি ছাড়া, বাকি সমস্ত পৃষ্ঠায় **শুধু গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনা** থাকিবে। গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন—

(১) শুধু তোমাদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পাঠাবে। (২) সাধারণ এক্সারসাইজ খাতার **৫ বা ৬ পৃষ্ঠার** বেশী রচনা যেন বড় না হয়। ছোট হলেই ভাল। (৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রচনা লিখবে, **নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং** দিতে ভুলবে না। (৪) রচনার শেষে **পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকা চাই।** (৫) রচনার বিষয়—ছোট গল্প, রূপকথা, এড্‌ভেঞ্চার, শিকার, ভ্রমণ, জীবনী, নাটিকা, ছড়া, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দেশবিদেশের কথা, স্বাস্থ্যকথা, রান্নাবান্না, খেলাধূলা, কৌতুক রচনা, বিবিধ প্রবন্ধ, ফটোগ্রাফ, ধাঁধা প্রভৃতি বিষয়গুলি তোমাদের কাছ থেকে আহ্বান করছি। (৬) আমাদের দপ্তরে গ্রাহকগ্রাহিকাদের যে সব রচনা আসবে সেগুলিও নির্ব্বাচিত করা হবে, অবশ্য সেই সব গ্রাহকগ্রাহিকা ইচ্ছা করলে আরো রচনা পাঠাতে পারেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একটির বেশী একজনের রচনা প্রকাশিত হবে না। (৭) রচনা নির্ব্বাচনের সমস্ত ভার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। (৮) কোন্ লেখাগুলি নির্ব্বাচিত হ'ল, সে সম্বন্ধে কোন গ্রাহককে আগে জানান সম্ভব নয়, তবে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠালে শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে উত্তর দিতে চেষ্টা করা হবে। (৯) যাদের লেখা ছাপা হবে তাদের ঐ মাসের এক কপি করে রংমশাল ফ্রি দেয়া হবে। (১০) **রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ১২ই শ্রাবণ।**

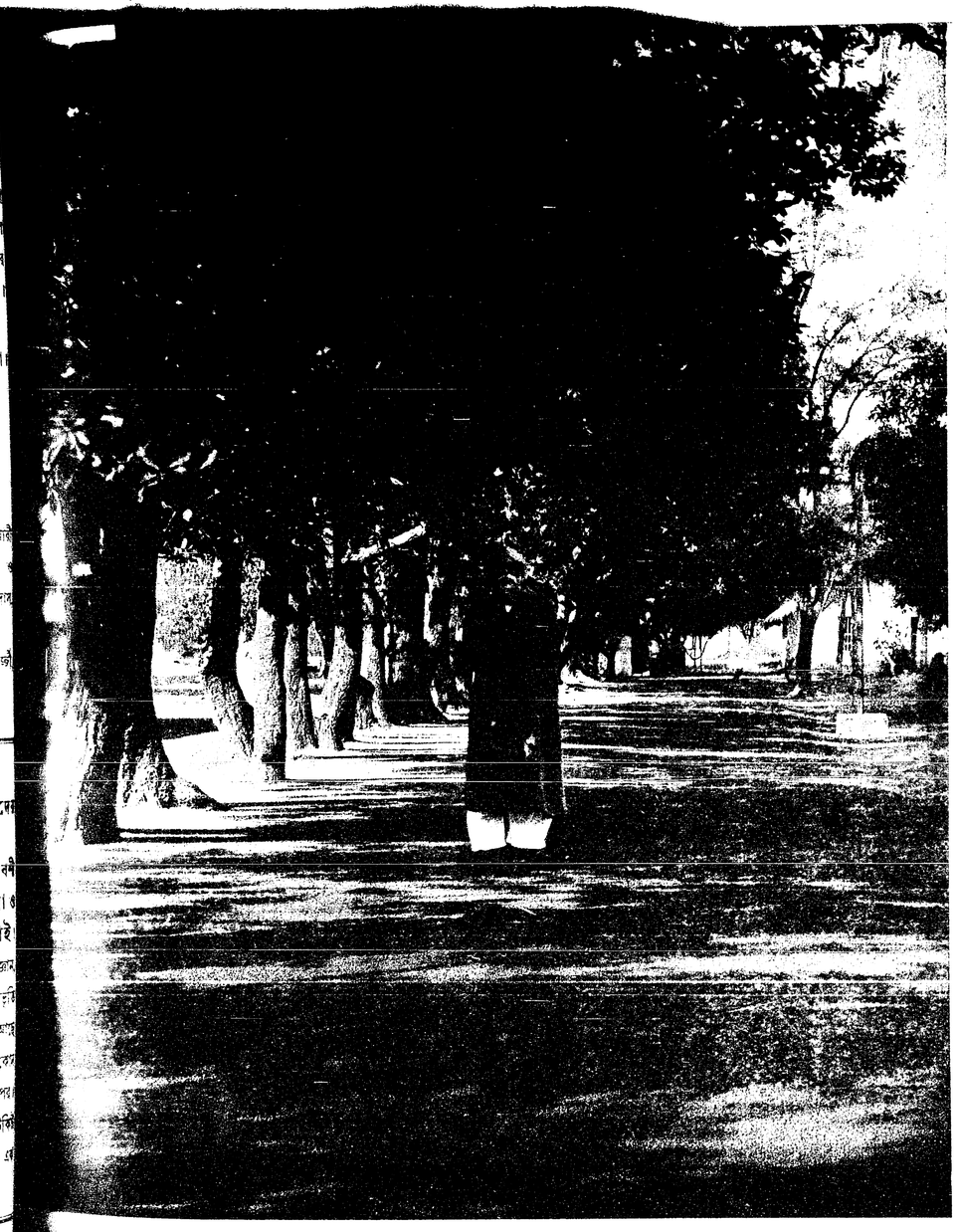

শান্তিনিকেতনে শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

...টাইপ কোং

রঙিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা।
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।
অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে ;
রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে!
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে॥

বঙ্গশাল
অষ্টম বর্ষ (৪)
শ্রাবণ ১৩৫০

বিশ্বভারতী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মূল উদ্দেশ্য শুধু ছেলে মেয়ে পড়াবার কলেজ স্কুল এক কথায়, দেশ বিদেশের যে সব ইউনিভারসিটি আছে সে রকম একটা ব্যাপার গড়ে তোলা মাত্র নয়। সারা জগতের শিশুমন যাতে সুশিক্ষার দ্বারায় সুপুষ্টি লাভ ক'রে বিশ্বের হিতে লাগাবার উপযুক্ত হতে পারে সব দিক দিয়ে এইটেই তিনি চেয়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছে জগতের মানব শিশুর জন্যে প্রাণ কেঁদেছিল কবির—তাদেরই মানসিক উন্নতির প্রচেষ্টা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান গড়তে। গঠনের কাজ পত্তন করে গেছেন তিনি ; বছরের পর বছর মানুষের পর মানুষ এসে এই বিদ্যাপত্তনের শ্রী শোভার কাজ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যে কাজে লাগবেন এই তাঁর মনে ছিল নিশ্চয়ই।

অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তোমরা বোধ হয় ফরাসী 'রেনেসাঁস' (renaissance) শব্দটির সঙ্গে পরিচিত? 'রেনেসাঁস' বলতে বোঝায় নবযুগ বা নব-জাগরণ বা নবজন্ম।

যুগে যুগে সাহিত্য ও ললিতকলার নব-জাগরণ হয়েছে নানা দেশে। সাহিত্য ও শিল্পের আকাশে সে যেন নববর্ষার আত্মপ্রকাশ! যে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যেন নিদাঘের আতপ-তাপে ফুল-ফল শুকিয়ে, এসেছিল অজন্মার দিন, নূতন আষাঢ়-শ্রাবণ নিয়ে এল সেখানে দিকে দিকে নানা প্রতিভার রঙিন রসাল পরিপূর্ণ শ্যামলতা। একসঙ্গে ফুটল কমল, ফুটল গোলাপ, ফুটল কদম এবং ফুটল আরো কত রূপশ্রী।

বহু যুগের ওপারে তাকালে দেখতে পাবে, ভারতবর্ষে গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এসেছিল নব-জাগরণ। সেই সময়েই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় মধ্য-মণির মতন বিরাজ করতেন কবি কালিদাস। সেই নব-জাগরণের প্রভাবেই অজন্তার পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রকলার জন্ম এবং তখনকার ভাস্কর্য্য আর স্থাপত্য-কলাও আজ পর্য্যন্ত হয়ে আছে বিশ্বের বিস্ময়!

মধ্য-যুগের ইতালীতেও এসেছিল এমনি নব-জাগরণ। তখনকার বহু কবি ও লেখক আজও পান জগতের অভিনন্দন। তখনকার ললিতকলাকে অমর ক'রে রেখেছে দ্য ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো ও রাফায়েল প্রভৃতির প্রতিভা।

দ্য ভিঞ্চির নাম আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। তাঁর আঁকা 'মোনালিসা' ছবির কথা কে না জানে? কিন্তু তিনি কেবল চিত্রকরই ছিলেন না, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যেও তাঁর হাত ছিল সুপটু এবং বিজ্ঞানের নানা বিভাগে সেই মধ্যযুগেও তিনি যে-সব অভাবিত নূতন নূতন আবিষ্কার করে গিয়েছেন, আজ এতকাল পরে একেলে বৈজ্ঞানিকরা তার চাবি আবার নতুন ক'রে খুঁজে পাচ্ছেন।

মিকেলাঞ্জেলোও ছিলেন একাধারে ভাস্কর, চিত্রকর, স্থাপত্যবিদ্ ও কবি। তিনি চিত্রকলাকে তেমন পছন্দ করতেন না, তাই ছবিতে রং ফলাতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁকে শিল্পী-হিসাবে অপদস্থ করবার জন্যে তাঁর শত্রুরা রোমের পোপকে গিয়ে ধরলেন—"সিস্‌টাইন গীর্জ্জাকে চিত্রে অলঙ্কৃত করবার ভার দেওয়া হোক্ মিকেলাঞ্জেলোর উপরে।" পোপের হুকুমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিকেলাঞ্জেলো সেখানে গিয়ে এমন সব সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্য ছবি আঁকলেন যে, আজও পৃথিবীতে যাদের তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না! এই রকম সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার মহিমাতেই সাহিত্যে ও শিল্পে নব-জাগরণ সম্ভবপর হয়।

এলিজাবেথীয় যুগেও বিলাতের সাহিত্য-আকাশে এসেছিল এমনি নববর্ষার উৎসব। এই বিক্রমাদিত্যের যুগের কালিদাসের মত এলিজাবেথীয় যুগকে ধন্য ক'রে রেখেছেন প্রধানত সেক্সপিয়ার।

বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে অনেকদিন আগে। চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে বহু ক

এখানে বহু গান গেয়ে গিয়েছেন। তারপর এল অজন্মার দিন। দু-চারজন কবি যে তখন ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁরা ছিলেন চাঁদ-হারা আকাশের ছোট ছোট তারার মত। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, কিন্তু আকাশকে আলোময় ক'রে তুলতে পারতেন না।

এমনি সময়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম হ'ল। কিন্তু তখনকার গদ্য ছিল মরা গঙ্গার মতন প্রাণহীন। এবং তার মূর্ত্তিও ছিল অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ।

তারপরেই দেখি বাংলা সাহিত্যের নব-জাগরণের যুগকে। সে যুগ এল কোন্ কোন্ প্রতিভার প্রসাদে? মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র। একজন কাব্যে ও আর একজন গদ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ক'রে তুললেন মূর্ত্তিমান। এবং এই কার্য্যে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে এলেন দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি।

তারপর সেই মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রাণবন্ত ও সচেতন ক'রে তোলবার জন্যে হ'ল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ পেয়ে বাংলা ভাষা আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার লাভ করেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই সব কথা বলা হয় না। কারণ গোটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সকল দিক দিয়ে তুলনীয় হ'তে পারেন, বিশ্বসাহিত্য-সংসারে এমন কোন মানুষের নাম আমার মনে পড়ে না।

গ্রীসের হোমার, ইংলণ্ডের সেক্সপিয়ার, ফ্রান্সের ভিক্টর হুগো, ভারতের কালিদাস, ভবভূতি, ইতালীর দান্তে ও জার্ম্মাণীর গ্যেটের নাম তোমরা জানো। অদ্ভুত, বিচিত্র ও আশ্চর্য্য ওঁদের প্রতিভা, এ কথা কে না মানবে? আর নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই যে অতুলনীয়, এ সত্যও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এঁরা কেহই রবীন্দ্রনাথের মতন সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই সোনার ফসল ফলিয়ে যান নি। ওঁদের কারুকে আমরা বলব শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, কারুকে বলব শ্রেষ্ঠ মহাকবি, কারুকে বলব শ্রেষ্ঠ আর কিছু।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামকে ও-ভাবে কোন সংকীর্ণ আসরেই স্থাপন করা চলবে না। কোন্ বিভাগে তিনি হাত দেন নি?

তিনি কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, সমালোচনা লিখেছেন এবং তাঁর বিরাট রচনা-সাম্রাজ্যের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না এমন বিষয় হয়তো সাহিত্য-জগতের মধ্যেই নেই। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, স্বদেশ, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব—এমন-কি শিশু-সাহিত্য পর্য্যন্ত। তাঁর মায়া ছোঁয়া থেকে কোন ভাব বা রস এবং বস্তু বঞ্চিত নয়। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সমস্তই ফুটেছে তাঁর মনের মুকুরে।

তারপর কেবল কি সাহিত্য? বাংলা সঙ্গীত-সমাজেও তাঁর প্রতিভা এনেছে একটা

কল্পনাতীত যুগান্তর। বলতে বাধা নেই, নবযুগের বাংলা সঙ্গীতের জন্মদাতাই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কেবল সুরস্রষ্টা ছিলেন না, সুগায়কও ছিলেন। প্রায় পঁইত্রিশ ছত্রিশ বৎসর আগে প্রথম তাঁর কণ্ঠের গান শুনেছিলুম—"তুমি কেমন ক'রে গান কর যে শুনি!" সে গান আজও আমার কাণে বাজছে।

বহুবার নানা ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। অভিনয়-কলাতেও তাঁর প্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর।

বাংলাদেশে ভদ্রসমাজে নাচের আদর ছিল না একটুও। আগে যে-সব ছেলে-মেয়ে নাচত শিষ্ট-সমাজ করত তাদের পরিত্যাগ। অথচ পৃথিবীর এমন কোন সভ্য দেশের নাম কেউ করতে পারবে না যে-দেশের ভদ্র-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নাচের চল নেই—কেবল মুসলমানদের অধিকৃত দেশগুলির মধ্যেই নেই নাচের ভদ্রতা। প্রাচীন হিন্দু ভারতবর্ষেও নাচের নূপুর পায়ে পরলে কোন ভদ্র পুরুষ বা মহিলা নিন্দিত হ'তেন না। আধুনিক বাংলাদেশে ভদ্র-সমাজের মধ্যে নৃত্য-কলাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথই।

আমাদের শাস্ত্র যে-বয়সে লোককে বনবাসী হবার জন্যে ব্যবস্থা দিয়েছে সেই বয়সেই এই আশ্চর্য্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন কলমের বদলে তুলি ধ'রে ব'সে গেলেন ছবির পর ছবি আঁকতে এবং অশ্রান্তভাবে এঁকে ফেললেন শত শত ছবি। সে-সব ছবিতেও নতুন নতুন সুরের রেখা—তার কোনখানিই গতানুগতিক নয়। যে দেশে উঁচু-দরের ছবির যথার্থ আদর আছে সেই য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় কম প্রশংসা পায় নি।

স্বদেশীর যুগে তাঁকে আমরা দেখেছি দেশভক্ত বক্তা রূপে এবং তাঁর বাণী শোনবার জন্যে ছুটে গিয়েছি কত বড় বড় সভায়। রবীন্দ্রনাথ না থাকলে কোন সভাই তখন লোকের মনের মত হ'ত না। শেষ বয়সে যদিও তিনি অধিকাংশ সভায় যোগ দিতে পারতেন না তবু দেশের প্রতি তাঁর নাড়ীর টান যে সমান প্রবল ছিল এর প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন তিনি বারংবার।

শান্তি-নিকেতনে তিনি কেবল ঋষি-রূপে নয়, দেখা দিয়াছেন ভারতীয় শিক্ষার সংস্কারক রূপেও। এখানে আধুনিক যুগধর্ম্মকে স্বীকার ক'রে তিনি গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর্য্য ভারতের আদর্শে নূতন এক তপোবন, নূতন এক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, নূতন এক বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র। এদেশের অধিকাংশ লেখক ও বক্তার মতন রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কেবল বড় বড় প্রবন্ধ লিখে ও উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে অভিযোগ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, নিজেও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, কবি হ'লেও স্বপ্নলোকে বাস করাই তাঁর স্বভাব নয়। তিনি বাক্যবীর নন, সত্যিকার কর্ম্মবীর।

বিভিন্ন রূপ এই রবীন্দ্রনাথের। পৃথিবীর আর কোন প্রতিভাধরের মধ্যে এমন বিভিন্ন রূপের বিকাশ দেখা যায় নি। এইজন্যেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়।

দেশের লোক আজও তাঁকে ভালো ক'রে চিনতে পারে নি। তোমরা তাঁকে চেনবার চেষ্টা কর। কারণ একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারলেই তোমরা চিনতে পারবে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা দেশকে।

প্রণাম

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বিশ্বকবি!

যে দেশ তোমার জনমে ধন্য, ধরণী ধন্য করি',
তারি আনন্দ-দুলাল দল, প্রণাম তোমারে করি!
তোমার বুকের আদর আলোর চির জীবন্ত ধরা
যাদেরে অশেষ দিয়েছ ঢেলে এসেছে তোমারি তারা!
চাহি অন্তরে তোমারে আর বাহিরে তোমারে চাহি
সবখানে তুমি মোদের সাথী, শূন্য কোথাও নাহি!

পুণ্য জলে পুষ্পে ফলে ধূলিতে বাতাসে মেঘে
তোমার স্নেহের সোণালী রং বাংলায় আছে জেগে!
পৃথিবীর জয়মাল্য এনে বাংলার তপোবনে
মোদেরে দিলে ছড়িয়ে বিশাল চলন্ত ভুবনে!
হাসিতে আশায় জীবনে ভাষায় ঊষার রাঙা রথ,
মিলনে বল, শক্তি উথল, কর্ম্মের রাজপথ,
লিখেছ শান্তি, সম্মান, ত্যাগ,—মানুষের জয়টিকা,
রক্তে মোদের জাগায়ে দিয়েছ প্রাণ-অগ্নির শিখা!
তোমারে স্মরি' এসেছি তোমার—সবুজ অভিলাষ,
লিখিব তোমার পতাকা ধরি' নূতন ইতিহাস!

উলসে অমল নিমিষ তোমার সুরের কিরণ স্রোত,
স্বপ্ন জাগরণের উতল জ্যো'স্নাঢালা রোদ!
গহন অতল গহ্বরে কোন্ অসীম তরুণ কথা,
বক্ষে কোথায় মানুষে রয় জাগ্রত দেবতা,
অন্যায় আর অপমান ভস্ম করি' দূরে
এগিয়ে নেয় সৃষ্টিকে যে সত্য-ধবল পুরে,
জ্বলে কোথায় ভালোবাসার বিশ্বউজল রবি,
তোমার বাঁশী বাজিয়ে চলে তাহার চলচ্ছবি!

যে বুকেতে এঁকেছ গান আপন অতুল নামে,
অঞ্জলিতে ঢালি তারে অন্তহীন প্রণামে!

রবীন্দ্রপূর্ণিমা, ১৩৫০

অমিয় চক্রবর্ত্তী

শুধুমাত্র দুবছর আগেও ছিলেন তিনি কাছে
আমাদেরি সঙ্গে দেশে, চলেছেন, বেঁধেছেন গান,
লিখেছেন আলোজ্বালা কবিতা, আশ্চর্য কত লেখা।
রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার।

মানুষের দুঃখে তাঁর বেদনায় ভরেছিল প্রাণ
অন্যায়ের দিনে দৃপ্ত সত্য নিয়ে দাঁড়ালেন একা,
আমাদের প্রাণ তাঁর আশীর্বাদে পুণ্য হয়ে আছে।
রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার।

কেহ বা দেখেছি তাঁকে, অনেকে দেখিনি, তবু দেখা
ঘরে ঘরে তাঁরই ছবি, ভাষা তাঁর ভাষা আমাদের ;
ভাবে কল্পনায় ধ্যানে নিঃশেষ রয়েছে তাঁর দান।
রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মৃত্যুতিথি সূর্যের চাঁদের
লক্ষ দীপ জ্বেলে আজ প্রাণের মন্দিরতলে যাচে ;
বাঙালি-ভারতবাসী-পৃথিবীর শ্রদ্ধায় মহান্
রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার ॥

কবিস্মৃতি

কবিশেখর কালিদাস রায়

শান্তি পারাবারের বুকে ভাসায়েছ সোনার তরী,
সজল চোখে আজো তোমার পথটি অনুসরণ করি।
বাক্য আজো পাই না খুঁজি
গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজি
মোদের কি আর রইল পুঁজি তোমায় গুরু স্মরণ করি।
চিদ্‌ঘন প্রেমরসে রাতুল স্মরি তোমার অতুল তুলী
কল্পরমার বিচুম্বিত স্মরি তোমার আঙুলগুলি।
কবি তোমার হৃৎকমলে
বিশ্ববাণী লীলার ছলে
স্বর্ণবীণা ঝঙ্কারিয়া ছিলেন সারা ভুবন ভুলি'।
প্রজাপতি, তোমার করেই দেশের মানসজীবন গড়া,
তোমার গীতেই সারা দেশের জীবনধারা কলস্বরা।
তোমার ধ্যানের রশ্মিপাতে
যে চিৎ সরোজ ফুটল প্রাতে,
তারি মধুর সৌরভেতে আজো ইহভুবন ভরা।
নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি'
নূতন ক'রে গড়লে ভুবন পুন মনোলোভন করি'।
সকল পরাজয়ের মাঝে
তোমার বরাভয়টি রাজে,
সকল ভয়ে সকল ক্ষয়ে তোমার মাভৈঃ মন্ত্র স্মরি।
কলির প্রাণে নবীন গন্ধ অলির গানে ছন্দ নব
মেঘের মুখে মন্ত্র নবীন অর্পিল আনন্দ তব।
অনীরিত অনেক বাণী
অনাহত অনেক গানই
শুনালে মূক জড়ের মুখে, সম্ভবিল অসম্ভবও।
নূতন নূতন দ্বার বাতায়ন খুললে তুমি গগন গায়ে,
আজো তোমার তনুর গন্ধ পাই মোরা তাই দিব্য বায়ে।
লোকোত্তরের বার্ত্তা সবি
জানতে পারি তাইত কবি
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে যে মনের কায়ে।

অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগ্‌ল ভালো।
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলো ঝর্ণা হ'য়ে ঢাল্‌ল আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে
তোমার তূলীর টানটি জাগে;
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরো মন ভুলালো।
গহন নবরসের তব হ্রদেই অবগাহন লভি,
সান্ত্বনা পাই, সন্তরণে জুড়াই জ্বালার দাহন সবি।
সহন গুণে তাপ বেদনা
গৃহাশ্রমেই তপ্‌-সাধনা
বহন করাই আরাধনা শিখালে তা তুমিই কবি।
আমাদের এই ভুবনটিরে নূতন ক'রে গড়তে এলে।
শেষ ক'রে হায় তোমার ব্রত আজকে গুরু কোথায় গেলে?
কোন্ ভুবনের কলাভবন
কোন্ তারকার শ্রীনিকেতন,
তোমার পানে চেয়ে ছিল সৃজন উপকরণ মেলে?
হেথায় বায়ু উড়ায় আয়ু কোথায় বায়ু বয় সুরভি
কোথায় সুরু ভৈরবী সুর হেথায় গুরু শেষ পূরবী।
কোথায় গেলে, অভয় পাণি,
শুনাইতে মাভৈঃ বাণী—
তপস্যাতে মগ্ন ছিল আঁধারে কোন্ ভুবন, রবি।
মানসলোকের রবি তুমি লীন হয়েছ অস্তাচলে,
আজো কোটি কোটি চোখের পাতায় পাতায় শিশির গলে।
স্বপ্নসুখের আলোক হরি'
এলো স্মৃতির বিভাবরী,
তোমায় গুরু স্মরণ করি ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে।
মানসলোকের হে দিবাকর কোন্‌লোকে আজ উদয় হ'লে।
কোন্ ভুবনের কমলগুলি তোমার পানে হৃদয় খোলে।
এই ভুবনের বর্ষাকাশে
ঘনঘটায় চাঁদ না হাসে
একটি তারাও নেইক, শুধু জোনাকি জ্বলে পাতার কোলে।
আজ বরষার অন্ধকারে সজল চোখে তোমায় স্মরি,
ধন্য জীবন তোমার কিরণ আশিস্‌ধারা মাথায় ধরি'।
করলে প্রাণের বন্ধ মোচন
খুলে দিলে অন্ধ লোচন,
ক্ষম শোচন হে অশোচন সহস্রবার প্রণাম করি॥

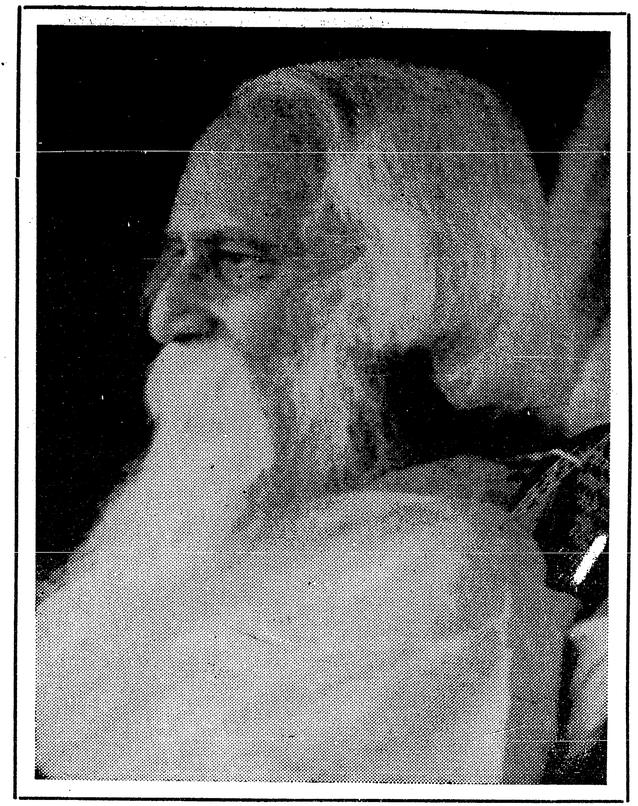

রবীন্দ্রনাথ

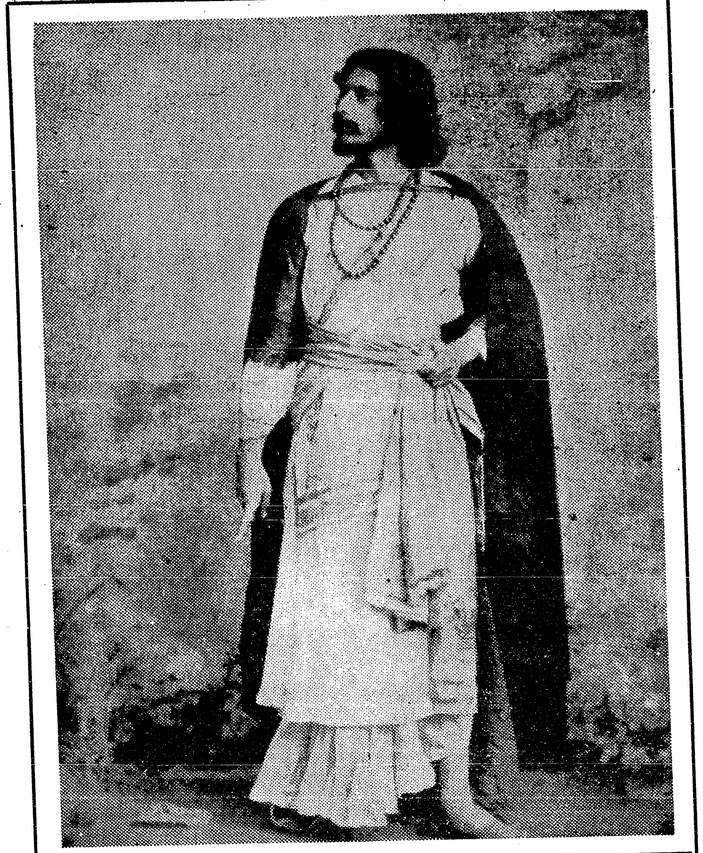

জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

কার কবি রবীন্দ্রনাথ ?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মশালের কিশোর পাঠকেরা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারে—রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি।

কিন্তু তরুণ এ কথায় শ্লেষ ক'রে একটু হাঁস্‌বে, বল্‌বে—এ অসার ছেলেমানুষী কথা। সার সত্য, র যৌবনের কবি।

বিজ্ঞ পণ্ডিত শিশুদের সঙ্গে তর্ক করেন না। কিন্তু এ অধিকারের কথা শুনে মনে মনে বল্‌বেন, এদের ক, জ্ঞান বাড়ুক্ তখন এরা রবীন্দ্রনাথকে চিন্‌বে। আহা! বেচারারা! উজ্জ্বল সূর্য্যকে বিজ্‌লবাতী পক্ষা বড় ক'রে দেখবার এদের দৃষ্টিশক্তি নাই।

দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে যাচাই কর্‌লে বোঝা যাবে, তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সমষ্টির হ'তে রবীন্দ্রনাথকে দাবী করে। আমি একবার হরিদ্বারের চাতালে শিখ্ সম্প্রদায়ের সভায় দৈবক্রমে উপস্থিত লাম। সভার নায়কেরা আমাকে সভার কার্য্যে যোগদান কর্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লেন। আমি পাঞ্জাবী জানি না। ী ভাষায় বক্তৃতা দিবার মত তখন সাহসও ছিল না। কিন্তু সভার ঐকান্তিকতা আমাকে তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ পক্ষা করিতে দিলে না। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি কর্‌তে সম্মত হ'লাম। কবিতাটী আমার মাতৃভাষায় রচিত, ই আবৃত্তির পূর্ব্বে এক একটী পংক্তি হিন্দীতে অনুবাদ ক'র্‌লাম। আসল কথা ভাষাত একই, কেবল হিন্দী ও লার আকারে ও প্রকারে প্রভেদ। কবিতাটী রবীন্দ্রনাথের "প্রার্থনাতীত দান"। আমি যখন আবৃত্তি শেষ কর্‌লাম—

তরুসিংহ কহে, "করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা
যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।"

ক গুরু" "অলখ্ নিরঞ্জন" প্রভৃতি শব্দে সভাস্থল কম্পিত হল। জাহ্নবীর খরস্রোত সেই জয়ধ্বনি বক্ষে ভাসিয়ে গরের দিকে ছুটলো। মোট কথা, সভার গণ্যমান্যেরা দাবী ক'রে বল্‌লেন—রবীন্দ্রনাথ শিখ্‌দের কবি।

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি।" প্রভৃতি

বিতার নিজেদের প্রাণের কথা শুনে, বৌদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর পবিত্র স্মৃতিকে এবং এমন কি বিশ্বভারতীর একটা কে নিজস্ব ক'রে নিয়েছে। আমি সম্প্রতি অন্যত্র "রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব গীতি-কবিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবপ্রীতি প্রমাণ করেছি।

এরকম দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। ব্যাপারটা মনে হয় জটিল। কিন্তু একে সরল করে বোঝাতে গেলে একটা গল্প বল্‌তে হয়।

অতি প্রত্যূষে এক নদীর বালির চরে সাতটী ছেলে ছুটে ছুটে খেলা করছিল। কেহ সুপ্ত চখাচখীর শান্তি করছিল। কেহ জলের মাঝে পাথর ফেলছিল, কেহ বকের ভণ্ড স্থবিরতা লুপ্ত করছিল। একজন পূব আকাশে তাকিয়ে দেখ্‌লে ওপারের আমগাছের পিছন থেকে প্রকাণ্ড একটী সোনার থালা ধীরে ধীরে আকাশে উঠে তার মুখে

তাকালো। অরুণের ছায়া পড়ল জলের মাঝে। নদীর প্রবাহ সেই কনক ছবির প্রতিবিম্বকে কাঁপালে, ভাঙ্গলে
তখন বালক চীৎকার করে বল্‌লে—"তোরা কি করছিস্? এই দেখ্ আমার সামনে কি। আমায় দেখছে সোনা
অরুণ"। দ্বিতীয় বালক বল্‌লে—"তোর চোখের অসুখ, অরুণ্ তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
আমার সূর্য্য"। তৃতীয় শিশু প্রথম দুজনকে ধিক্কার দিলে। বল্‌লে—"তোদের দৃষ্টি বাঁকা, এ আমার সূর্য্য
আমাকে দেখছে।" চতুর্থটীর চিন্তায় মৌলিকতা ছিল। সে বল্‌লে—"তোরা পাগল, এই ছাখ আমি ছুটছি
আমার রবি আমার সঙ্গে ছুটছে। আমি উঁচু পাড়ের উপর কদমতলায় উঠলাম। সূর্য্য আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠলো।"
বাকী তিনজনও ঐরূপভাবে বালারুণকে নিজের ব'লে দাবী করলে। এদের কলহ ক্রমশঃই শব্দায়মান হ'য়ে বি
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাতঃস্নানে বাধা দিলে। তিনি ব্যাপারটা বুঝে, সস্নেহে গণ্ডগোলকারী সাতজনকে নিজের কা
ডাক্‌লেন। এবার তারা দেখ্‌লে যে রবি তাদের সকলেরই। কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

আমাদের কবি-গুরু ভারতীর মুকুটের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন। রবীন্দ্রনাথ, ঠিক্ অমনই ব্যোমের রবির মত সকলের
অথচ, মাত্র কোনো জনের বা কোনো সম্প্রদায়ের নয়। বাঙ্গালী তাঁকে বলে, বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিশ্ব-কবি
কেন সে কথা বোধ হয় ঠিক্ বুঝ্‌লে না। অনেকে মনে করে যে পৃথিবীর সব দেশের লোক তাঁর নাম জানে, তাই
তিনি বিশ্ব-কবি। সেক্সপিয়র, কালিদাস, হোমর, বাল্মিকীর কবিতা বহু যুগ মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু তাদের
নাম, মাত্র তাঁদের দেশের লোক জান্‌তো যখন তাঁরা জীবিত ছিলেন। দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ লোকের নাম জানিয়ে
দেয় টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, খবরের কাগজ এবং যারা বই ছেপে অর্থ-উপার্জ্জন করে, তাদের বিজ্ঞাপনের ঘটা
রবীন্দ্রনাথের কবিতা পৃথিবীর অনেক সভ্য জাতি পড়েছে, তাঁর নাম সকল সভ্য-জাতি জানে। যারা সিনেমায়
অভিনয় করে, তাদেরও নাম বহুলোকে জানে। হিটলারের নাম সবাই জানে, কিন্তু সে পৃথিবীর বুকের উপর কি
অশান্তির স্রোত বহিয়েছে তা তোমরা শুনেছ। দেশ-বিদেশে নাম জানা থাক্‌লেই মানুষ বড় হয় না। বি
রবীন্দ্রনাথের নাম জানে বলে তিনি বিশ্ববিশ্রুত—কিন্তু সে কারণে তিনি বিশ্ব-কবি নন। তিনি গুণী। তাঁর গু
তাঁকে বিশ্ব-কবি করেছে। সে কোন্ গুণ?

আমাদের এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য এবং কোটি কোটি তারা—সব নিয়ে বিশ্ব। এরা সবাই এক বিধাতার সৃষ্টি
এইজন্য এদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ। গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, জল-হাওয়া, সূর্য্যের কিরণ, চাঁদের আলো
শিশুর হাঁসি, পুন্যাত্মার আনন্দ—এ সবার মধ্যে একটা যোগ-সূত্র আছে। এই কথা রবীন্দ্রনাথ প্রাণে প্রাণে
বুঝেছিলেন। সমস্ত বিশ্বটা তাঁর মনের মাঝে এক হ'য়ে জেগে উঠেছিল। এরা সব তোমার আমার মনেও অমনি
ভাবে লুকিয়ে আঁকা আছে। কিন্তু আমরা পূর্ণ চিত্রটা দেখ্‌তে পাই না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের একতায় নিজেকে
মিশিয়ে দিয়েছিলেন—সদাই তাই বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তিনি বাস করতেন। ভগবানের রূপ নাই অরূপ। কি
তাঁর গড়া পৃথিবী রূপের লীলায় ভরপুর। তিনি রূপ দেখে অরূপকে স্মরণ করতেন। মনের মাঝে যা দেখে
কবি সু-ললিত কথায় তাই সকলকে শোনান। তাই কবিকে বলা হয় দ্রষ্টা এবং শ্রষ্টা। বিশ্বের একতার বাণী
তিনি মধুর ভাষায়, প্রাণ মাতানো ছন্দে সকলকে শুনিয়েছেন।

তাই তিনি—বিশ্ব-কবি। সারা বিশ্বের ভাব তাঁর মনে ফুট্‌তো।

তোমরা কিশোর। তোমাদের বিশ্ব নবীন—বৈজ্ঞানিক যা ইচ্ছা বলুক না কেন বিশ্বের বয়সের কথা
তোমাদের বিশ্বও কবির মনের পটে আঁকা ছিল। তিনি সেই পটের ছবি তোমাদের জন্য কবিতায় এঁকে গেছেন
তাই তিনি তোমাদের কবি।

আর একটা কথা বলি। যাঁর লেখা পড়লে পাঠকের মন সাড়া দেয়, বলে—কি কাণ্ড! আমার মনের
া যে ইনি টেনে বার করেছেন—তিনিই প্রকৃত কবি। বলতো—"শিশু ভোলানাথ" বা "শিশু"র কবিতাগুলি
লে কি তোমাদের ঐ কথা মনে পড়ে না?

সব কথা বলবার স্থান নাই। কিন্তু একটা উদাহরণ না দিলে তোমরা বুঝ্‌বে না। ধর "মুখু"
বিতাটি। বলতো শিশুর এটি মনের কথা কিনা?

মুখু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।"

দের সবাই মুখু বলে তাদের স্বাধীন জীবন কোন্ শিশুর মনে না হিংসা জাগায়?

"তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গরু চরায় মাঠে।"

ান্ শিশুর মনে না হয়—

"যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুর বেলায় বসে বসে ঢোলে;
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
শুনে আমি পণ করি যে মুখু হব বলে।"

ন? মনের মধ্যে এ কথার সাড়া পাওয়া যায়তো?

তিনি শিশু কবিতার যে সব ছবি এঁকেছেন, তাতে প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। আকাশ বাতাস,
ার গান ও নদীর তান কিশোরের মনে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি জাগায়। চিন্তার ধারা রঙীন হয়, উচ্চে ওঠে।
দিয়ে, অর্থ বুঝে, নিজের মনের সাথে মিলিয়ে তাঁর কবিতা পড়, জ্ঞানের রং-মশালের শুভ্র রশ্মিতে
র অন্ধকার দূর হ'বে। যখন তাঁর কবিতার ছন্দে সুর মিলিয়ে তোমার মন সাড়া দেবে, তখন নিঃসন্দেহে
ি বলতে পারবে—আর যে যা বলে বলুক্ রবীন্দ্রনাথ কিশোরের কবি।

পূর্ব্বে বলেছি—এখানে তাঁর সকল রচনার উল্লেখ অসম্ভব। "কথায়" অনেক মনোরম শিক্ষা আছে।
কেক ছন্দে, ঐতিহাসিক গল্পর বিবৃতি—তাদের মূলে আছে, ভক্তি, বীরত্ব, স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি নানা
ান কুমার ভাব। "কথা"র অনেকগুলি কবিতা তোমরা বুঝতে পারবে। এ বয়সে তাদের মুখস্থ করলে
ন আবৃত্তির সুখ সম্ভবপর হবে।

রবীন্দ্রনাথের সকল গ্রন্থেই কিশোরদের বোধগম্য কবিতা ও গান আছে। তাদের বেছে নিয়ে তোমাদের
রেশন করবার ভার অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের। একটা উদাহরণ দিই। গীতাঞ্জলির—

"আমার মাথা নত করে দাওহে
তোমার চরণ ধূলার তলে,
সব অহঙ্কার হে আমার
ঘুচাও নয়ন-জলে।"

ু হ'তে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করে। তাঁর "সোনার তরী"র শব্দের ঝঙ্কার কোনো
ার ঝঙ্কার হ'তে কম মিষ্ট নয়। সব ছেলেমেয়ের সেটি কণ্ঠস্থ করা উচিত। তার আঁকা ছবিও অপরূপ।

তাঁর স্বদেশ-ভক্তির গান অতিশয় উদ্দীপক। "সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

কিম্বা "অয়ি কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন"

প্রভৃতি অত্যন্ত মধুর। বলেছি তিনি বিশ্ব-কবি, সামান্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকের ভারতবর্ষ তাঁর "জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা" পবিত্র মাতৃভূমি নয়। তিনি ভারতীয় জাতি বল্‌তে বোঝেন—হিন্দু, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, পারশিক, মুসলমান, খৃষ্টানী।" কারণ এ দেশে কত মানবের ধারা, এক দেহে লীন হ'য়েছে।—

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন
সক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

প্রত্যহ প্রভাতে প্রার্থনা করবে তাঁর রচিত "প্রণমি তোরে চলিব নাথ সংসার কাজে" গানটি আবৃত্তি ক'রে—তা হলে তোমাদের কল্যাণ হবে, মন পবিত্র ও উন্নত হবে।

সেদিনও এমনি শাওন-আকাশে

শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায়

বুঝি, সেদিনও এমনি শাওন-আকাশে জমেছিল কালো মেঘ,
মরণের দূত এসেছিল চুপে চুপে লভিয়া বায়ুর বেগ!
বিদায়ী 'রবি'র শেষ-রশ্মির আভা মৃত্যু-জলধি-নীরে
মিলালো সহসা, কুয়াশা মলিন হ'য়ে তমসা রহিল ঘিরে।
বিপুল বিশ্বে বেদনার বাণী ব'য়ে ঝ'রে ছিল জল-ধারা,
যেদিন হে কবি! সীমার বাঁধন ছেদি' অসীমে হইলে হারা।
অন্ধকারের গুহাতলে বসি' ধরা, নীরবে প্রহর যাপে,
শাশ্বত কবি রবিরে হারালো আজি কা'র নিদারুণ পাপে।
সুর-চঞ্চল বিশ্ব-প্রেমিক ওগো, জ্ঞানগুরু গরীয়ান!
অনন্ত এই নিখিলের বুকে তুমি গেয়েছে মিলন গান।
এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণাটিরে বেসেছিলে তুমি ভালো,
'গগনে গগনে নব নব দেশে রবি' দিয়েছে মধুর আলো।
নয়নের ধারা ঝরিছে অঝোরে শ্রাবণ ধারার মত,
তোমারে হারায়ে শুখায়নি আজো হায় সবার প্রাণের ক্ষত!
চ'লে গেছ তবু-আছ আমাদের সনে—কাব্যে, ছন্দে, গানে,
প্রতিভাত হয় অমলিন ছবি তব হৃদয়ের কোণে কোণে।
বাণীর পূজারী নব ঋত্বিক ওগো! বেদনা-অর্ঘ্য খানি,
অশ্রু ঝরায়ে চরণে তোমার কবি! শ্রদ্ধায় দিনু আনি।

স্মৃতির লিখন

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই শান্তিনিকেতন যাবার খুব ইচ্ছা আগে থেকেই ছিল। শান্তিনিকেতনে যেতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য যে ছবি আঁকার চর্চ্চা কর্‌তে পার্‌বো। রবীন্দ্রনাথের নতুন গানে সুর হবা মাত্র সেগুলি শিখ্‌তে পারবো·····

* * * খুব ছোটবেলায় যখন গিয়েছিলুম তখনকার কথা এখনো কিছু কিছু মনে আছে। পরে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েক বছর কাটিয়েছি কিন্তু তবু সেই ছোটোবেলার শান্তিনিকেতনের ছবি মন থেকে মুছে যায়নি·····

* * * জ্যোৎস্না রাতে ছাতে বসে রবীন্দ্রনাথ গাইছিলেন একলা—জ্যোৎস্নার আলোতে ওঁকে দেখেছিলুম। পরের দিন সকালে সভায় এসে আসনে বসলেন উপাসনা কর্‌তে। ছবি দেখেছিলুম অনেক; এই ছবির মানুষও যখন দেখলুম নিঃশব্দে হেঁটে এসে আসনে বস্‌লেন, কি জানি কেন একটু আশ্চর্য্য মনে হ'ল। সব চেয়ে ভালো ক'রে মনে আছে রাত্রে অভিনয় হ'ল। নাট্যঘরে গিয়ে সবাই বসেছিলুম—দীনুবাবুর গান হঠাৎ কানে এলো। 'পঞ্চক' সেজে তিনি এক মোটা লাঠি নিয়ে ঢুক্‌লেন ষ্টেজে—

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে—
কেউ তা জানে না—
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না—

আমার বয়স তখন আট বছর হবে—কিন্তু ওঁর সেই গান ভোলবার নয়।·····
·····রবীন্দ্রনাথ বাউলের বেশে গাইলেন—তাঁর করুণ মিষ্টি সুর এখনো মনে পড়ে।

—ও মোর দরদিয়া
কাঁদি কাঁদাই তোরে
—ও মোর দরদিয়া—

ওঁর মুখে আলো ফেলবার চেষ্টা চলছিল—খুব পরিষ্কার মনে আছে। আজকালকার দিনে সেরকম আলো ফেলবার চেষ্টা দেখলে হয়তো মনে ধর্‌বে না। কিন্তু তখনকার দিনে সেই সামান্য আলোটুকুর আয়োজন নাট্যঘরে করতে এবং বহু জোগড়যন্ত্রের ফলে হয়তো সম্ভব হয়েছিল·····

·····এই স্মৃতিটুকু নিয়ে আবার যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে শান্তিনিকেতনে যাবার জন্যে ট্রেনে চড়লুম তখন মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়, একটুখানি আনন্দ, একটুখানি লজ্জা এসে মনটাকে যেন কাহিল করে দিচ্ছিল। শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌছুবার সময়কার কয়েকটা ঘটনা মনে আছে। ভাঙ্গা ঝর্‌ঝরে 'বাসটা' বোলপুর ষ্টেশন থেকে লালমাটির রাস্তা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে গেষ্ট হাউসের সাম্‌নে নিয়ে দাঁড় কর্‌লো বহুকষ্টে। ফুলমশাই গেষ্টহাউস তদারক করেন—মিলিটারী পোষাক! বেশ সুন্দর চেহারা—সুন্দর বৈকি; মিলিটারী পোষাকের সঙ্গে তাঁর সেই দাড়ি ও বাবরি চুল হয়তো খাপ খেয়েছিল—কিন্তু আমার চোখে কোথায় যেন বাধা লাগলো! তিনি ত' হাঁকডাক ছেড়ে—"ওরে পঞ্চা—নাবা জিনিষপত্তর কোথায় আছিস—ইত্যাদি বল্‌তে

বল্‌তে খানিক থেমে প্রশান্তভাবে হেসে আমার কাছে এলেন—বল্‌লেন—"বেশ ভালো ভাবে এসেছ' ত! ট্রেনে কষ্ট হয়নি ত'?—তা' এসো।" ওঁর দিকে তাকিয়ে ভাবলুম, এঁকে হাত তুলে নেহাৎ নমস্কার করলে বেমানান হবে কিনা! ওঁর মিলিটারী পোষাকটা বল্‌লে—"হ্যাঁ, সোজা দাঁড়িয়ে নাকের কাছে দু'টো হাত মিলিটারী ফ্যাশনে জড় করলেই হবে।" আবার ঐ বাবরী চুল কাঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ বল্‌লে—"না হে, প্রণাম চাই।" চোখ নাক কান বুজে প্রণামই করে ফেললুম। উনি অবশ্যি অপছন্দ করলেন না—বল্‌লেন—"থাক থাক, তোমার থাকবার জায়গাটা দেখেছ ত'? এইখানে আজ রাতে থাকবে—তারপর কাল থেকে হষ্টেলে গেলেই হবে।'

বিকেলে আমবাগানে বেড়ালুম। দু'টি গুজরাটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাদের সঙ্গে সাঁওতালী গ্রামের দিকে বেড়াতে গেলুম! ফিরে আস্‌লুম সন্ধ্যেবেলায়। রাত্রে খাওয়ার পর মনে পড়ে গান ভেসে আসছিল বৈতালিক দলের—

"আকাশ জল বাতাস আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
আপনি কবে, তোমার নাম ধ্বনিবে সব কাজে—

* * * *

কলাভবনে ছবি আঁকা সুরু কর্‌লুম। আই-এ পরীক্ষার পড়াও কিছু কিছু সুরু হ'ল। ছবি আঁকায় মন দিয়ে মাঝে মাঝে কলেজের ক্লাশ করবার কথা ভুলতুম! কলাভবনে ছবি আঁকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেওয়ার জন্য পড়া এ যেন হ'ল দু'নৌকোয় পা দেওয়া। হয়তো সাম্‌লে চল্‌তে পার্‌লে দু'নৌকোয় পা দিয়েও পার হ'তে পার্‌তুম! কিন্তু সাম্‌লে চলার পথে নানান্ বিঘ্ন দাঁড়ালো মাথা উঁচু করে।.....

.....তখনকার শান্তিনিকেতন ছিল একটু আলাদা ধরণের। মনে আছে সকালবেলায় উঠে দাঁত ঝাঁট দেওয়া—মাঠে যাওয়া—স্নান করা—কাপড়কাচা এবং খাবার ঘণ্টা পড়লে লাইন করে থালাবাটি হাতে খেতে যাওয়া এবং খাওয়ার পর সেই থালাবাটি ধুয়ে মেজে ঘরে ফেরা—সবই করতে হত। ছোট ছেলের পাশে থালাবাটি রেখে যখন একটু বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌তুম তখন বাড়ীর কথা রোজ মনে হ'ত।.....

.....দেখতে দেখতে দু'টো বছর কেটে গেলো! দু'নৌকোয় পা দেওয়াতে একটা মুস্কিল হল এই যে কলাভবনেও কাজ বেশী হ'ল না, আবার পড়াশোনাও তেমন হল না মনের মতো। কতবার মনে হয়েছে "দূর ছাই।—দিই ছেড়ে পরীক্ষার জন্য পড়া।" কিন্তু নেহাৎ বাপমায়ের কথাটা একেবারে তুচ্ছ করতে পারিনি। নানান্ কারণে মনটা ঠিক বসেনি তখনো শান্তিনিকেতনে। প্রতিমাসেই ইচ্ছে করতো একবার কলকাতা যেতে। মা বাবারা তখন কলকাতায় ছিলেন। একবারের কথা মনে আছে—কলকাতায় যাবার খুব ইচ্ছা কিন্তু কোনো কারণই দেখাতে পারলুম না কলকাতা যাবার। সেবারে পারলুম না কলকাতায় যেতে কিন্তু তার পরের সপ্তাহের জন্য কারণ তৈরী করে রাখলুম। চশমা ব্যবহার করতুম তখন—চশমার একটি কাঁচ ভেঙ্গে ফেল্‌লুম ইচ্ছে করে এবং সেই ওজুহাতে কলকাতা গেলুম। এখন ভাবলে একটু লজ্জাবোধ হয়! হাসিও পায়! ছোটোবেলায় ময়দা দিয়ে কাদা দিয়ে পাখী ফল জন্তু জানোয়ার বানিয়েছি। কিন্তু সে ছোটোবেলার কথা!

১৯২৭ সালে প্রথম মূর্তি গড়ার জন্য মাটিতে হাত দিই! ছবি আঁকতুম কিন্তু খুঁটিনাটি অনেকদিন

সাজামিল দেবার চেষ্টা করতুম। "রিয়ালিটির" সঙ্গে যোগ ছিল কম। ড্রইংএর ভুল হ'ত নিজেও বুঝ্‌তুম। সাধারণের চোখে ধূলো দিতে একটু চালাক আঁকিয়ে হ'লেই পারে! কোনো কোনো চিত্রকরদের গুরুতর ড্রইংএর ভুল যেমন মোলায়েম খেলো কিম্বা চটকদার রঙের সংমিশ্রণে ঢেকে ফেল্‌তে দেখা যায়।—তেম্‌নি আমিও চেষ্টা কর্‌তুম। চোখে ধূলো দেওয়া সোজা জিনিষ! অনেক শিল্পীই এমনি ক'রে সবার চোখে ধূলো দেন্—নিজে জানেন না বলে। মাষ্টারমশাইয়ের (শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু) চোখে ত আর ধূলো দেওয়া যায় না!—উনি একদিন আমায় বল্‌লেন;—আমি কিছু মনে না করি এমনিভাবে,—"দেখ' হর্ষ, মূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছে হয়? একটা প্রকাণ্ড মানুষের মাথা কাদায় করো দেখি? খুব নিখুঁতটি ক'রে শেষ কর্‌তে হবে কিন্তু!"

মাসখানেক ওঁর কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লুম। ভয় ছিল—মূর্ত্তি গড়্‌তে গেলে ত' আর চোখে ধূলো দেওয়া চলে না!—আকাশ বাসরে ছবি এঁকে যেখানে ড্রইংটা ঠিক হ'ল না, সেখানটা মেঘ এঁকে দিলে চলে! পথিকের পায়ের ড্রইংটা ঠিক কর্‌তে না পার্‌লে জলের ওপর দিয়ে পথিককে হাঁটিয়ে দেওয়া যায়! কিন্তু মূর্ত্তি গড়্‌তে গেলে জিনিষটা শুধু একদিক নয়—যতরকম সম্ভব অসম্ভব 'angle' থেকে ঠিক হওয়া দরকার!—সময় পেয়েছিলুম! শেষে আমায় যেতেই হ'ল মূর্ত্তি গড়ার জায়গায়!—

এইসময় থেকেই প্রথম আমার "গুরুদেবে"র সঙ্গে একটু ক'রে পরিচয় সুরু হ'ল! গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) কলাভবনে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয় বেশ দৃষ্টি রাখতেন। মাঝে মাঝে দেখতুম নিজেই এসে হাজির হয়েছেন! একদিন মাষ্টারমশাই ও অন্যান্য অনেক ছাত্রদের সঙ্গে বসে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌লেন! ছোট ছোট করতে মানা করতে সুরু করেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ্—বড় বড় মূর্ত্তি গড়্—বড় বড় ছবি আঁক্—বড় তুলী ফেলে দে!—চোখ খারাপ করিস নে! মোটা তুলী দিয়ে প্রাণ ভরে আঁক্—ভয় পাস নে! কাজের বেলা মনের জোর ধরা পড়ুক হাতের জোর ধরা পড়ুক—ভয়ে ভয়ে সরু তুলী দিয়ে ঘষে মেজে সে ত অনেক করেছ—ইত্যাদি।

এরকম উৎসাহ বড় সহজে সকলের কাছে পাওয়া যায় না! মাটি নিয়ে খেলা হল সুরু! অদ্ভুত আনন্দ পেতে লাগলুম মূর্ত্তি গড়ে—যা ছবি এঁকে কখনো পাই নি! মানুষের শরীরের গড়ন ভালো ক'রে জান্‌বার প্রচণ্ড ইচ্ছে মনের মধ্যে জেগে গেল! মানুষ মাত্রেরই একজোড়া চোখ আছে, আর সেই চোখ জোড়া দিয়ে মানুষে দেখে! কিন্তু সেই চোখজোড়া খুলে গেলো যে চোখজোড়া দিয়ে শুধু শিল্পীরাই দেখে!—যে সাতজন্মে চেষ্টা করলে একটা হাতের ড্রইং আঁক্‌তে পারে না, অথচ সে যদি দেখে কারুর হাতে একটা বোলতা কামড়ানোতে হাতে ফুলে উঠেছে—অমনি তার নজর পড়ে!—জিজ্ঞেস্ করে—"হাতে কি হ'ল?—ফুলেছে দেখছি।"—হাতের ফুলে সে জানে কিন্তু তা' আঁক্‌তে জানে না! নিখুঁতভাবে জান্‌বার চেষ্টা ও ইচ্ছা যদি শিল্পীর মনে জাগে এবং সে শিল্পীর যদি কল্পনাশক্তি থাকে তবে সে ভালো ছবি আঁকবেই!—দরদ দিয়ে আঁকাও চাই! কিন্তু—প্রকৃতিকে জানা কি সোজা!—কত জীবন কেটে যাবে ঠিক জান্‌তে গেলে!—তাই ত' শিল্পীর শেখার শেষ নেই! প্রাণের মধ্যে তাই জ্বলে আগুণ! যত জানে তত বুঝতে শেখে কিছুই জানা হ'ল না! শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু এই আগুনই জ্বালিয়ে দেন তাঁর ছাত্রদের মনে! সে কি আর সহজে নেবে? * * *

* * * গুরুদেব ছবি আঁকতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন তখন! খুব যে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম ছবির, তা' নয়! মাঝে মাঝে দু'চারটা চোখে পড়েছে!—বুঝ্‌তে পারি নি তাঁর ছবি—বুঝতে চেষ্টাও করি নি!—কিন্তু কি রঙই না লাগিয়েছেন! অমন রঙ লাগানো সবার কর্ম্ম নয়—একেবারে জলজ্বল করে যেন!

কোথাও কালো—পাশ থেকে যেন লাল হলদে আলো জলজল করছে! গাছ নীলে লালে একেবারে একাকার!—জন্তু জানোয়ার মানুষের মুখের অদ্ভুত প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে "ফাউনটেন পেনে"র কিম্বা পেন্সিলের হাজার হাজার রেখার মধ্যে! আজকাল ওঁর ছবি ছাপা হ'য়ে অনেক ত' বেরিয়েছে! কিন্তু সে ছাপা ছবি দেখে তাঁর ছবির আলোচনা চলে না! আসল ছবিগুলো না দেখ্‌লে বুঝ্‌বেই না ও সব ছবির মজা!—কত যে এঁকেছেন তার কি আছে ঠিক! অনবরত এঁকেছেন—আঁক্‌তে যে ভাল লাগ্‌তো তাঁর, সে তাঁকে দেখ্‌লেই বোঝা যেতো—যখন আঁক্‌তেন সময়ের আর খেয়াল থাক্‌তো না। এতো আঁক্‌বার শক্তিই বা পেতেন কোথায় বুড়ো বয়সে? কেউ বোঝে না তা'!—সারা জীবন-ভোর যে উনি নিবিড় ভাবে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার জন্যই ত' ফোয়ারার মতো তাঁর কালি-কলমে-তুলীতে-রঙে চিত্রিত বিচিত্রিত হ'য়ে ফুটে বেরিয়ে পড়্‌ছিল শেষ সময় পর্য্যন্ত নানান রকমারি অদ্ভুত জীবন্ত-খেয়ালের ছবি। * *

* * * ছাত্রভাবে শান্তিনিকেতনে ছিলুম ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত! তার পরে দু'চার বছর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম! মাদ্রাজে হ'য়েছিল আবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা! উনি কলম্বো হ'য়ে বিলেত যাচ্ছিলেন। দেখা হ'তেই বল্‌লেন—"অনেক ত' ঘুর্‌লি—আবার যা' ফিরে শান্তিনিকেতনে কিছুদিনের মতো"—আড্যারে সমুদ্রের ধারে বসেছিলেন—তার পরের দিনই চলে গেলেন।

* * * * *

সেবার ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন গেলুম। বেশীদিন আগেকার কথা নয়—১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে—শুন্‌লুম বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছেন। সম্প্রতি কলকাতা থেকে এক চিত্রকর—এসে তাঁকে বড় জ্বালিয়ে গেছেন! আড়ষ্ঠ ভাবে তাঁকে চুপ ক'রে থাক্‌তে হয়েছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা! আর তত ক'রে ছবিখানাতে তাঁর সে রূপ ধরা পড়ে নি!—আমার মনের অনেক দিনের ইচ্ছা ওঁর মূর্ত্তি গড়ার—এবারে সাহস ক'রে বলেই ফেল্‌লাম! বল্‌লেন—"এখন নয় রে—বড় কাহিল! একটু সাম্‌লে নিতে দে—দিন দশ বার পরে আসিস্—জানুয়ারী মাসে। কিন্তু দেখ্—জ্বালাবি না ত'? আমি ছবি আঁকবো—আমায় বিরক্ত কর্‌তে পাবি নে! তুই ঐ কোনে গড়িস্!" রাজী হলুম! ১৯৩৭ সালে জানুয়ারী মাসে আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির। মাটির তাল নিয়ে ওঁর আঁকবার ঘরের এক কোণে জায়গা নিলুম! উনি আমার রকম সকম দেখে বল্‌লেন—"এসেছিস্—মাটি কর্‌তে আমায়! তা'—আপত্তি কর্‌বো না, কিন্তু দেখ্—দু'একদিন পর যে বল্‌বি—এদিকে মুখ ফেরান—ওদিকে সরে বসুন—ওসব শুন্‌ছিনে বাপু—মাপামাপি করবিনে তো?" তাঁকে বলেছিলুম "আপনাকে একটুখানিও বিরক্ত করবো না।" সেকথা আমি রেখেছিলুম! * * *

* * * চার পাঁচ দিনেই কাজটা হ'য়ে গেলো! উনি একদিন কাছে এসে দেখ্‌লেন—বল্‌লেন—"বেশ এইবার ছেড়ে দে! আর করিস্ নে—এই বেশ। আর বেশী যদি কর্‌তে যাস্ ত' খারাপ ক'রে ফেল্‌বি!" সেদিন অনেক কথা বল্‌লেন—কবে আমেরিকায়—বিলাতে আরো কোথায় কোথায় চিত্রকররা এসে তাঁকে এঁকেছিল—গড়েছিল—তাদের সব গল্প কর্‌লেন।—কেউ বা তাঁকে বিরক্ত করেছিল—কেউ বা খুসী করেছিল! কর বকমের যে ঢং তাদের—তাই বল্‌ছিলেন!

মূর্ত্তিটা শেষ ক'রে প্লাষ্টারে ছাঁচ নিয়ে ঢেলে ফেল্‌লাম! প্লাষ্টারে যখন মূর্ত্তিটা হ'ল তখন নানান্ কথাবার্ত্তা চল্‌লো মূর্ত্তিটা নিয়ে! কেউ বল্‌লে—'বেশ হয়েছে'—কেউ বল্‌লে—"এই হয়েছে একরকম"। জানি—হোক্ না হোক্ এই যে রোজ রোজ ওঁর কাছে এতোক্ষণ থাকবার সুযোগ এবং সুবিধা পেলুম—সেই

আমার পরম লাভ! উনি আর আমি—আর কেউ বড় থাক্‌তো না—দুপুরে খাওয়ার পর চল্‌তো কাজ। উনি তিনটে সাড়ে তিনটের সময় কিছু খেতেন—রস—কিম্বা কিছু।—সে আমার ভাগেও জুট্‌তো!—কিছুতে ছাড়্‌তেন না! ছবি আঁক্‌তেন বসে বসে—কখনো চুপ ক'রে ভাব্‌তেন—কখনো ভুরু কুঁচকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাক্‌তেন! কখনো—কিছু বল্‌তেন—ছবি আঁকা সম্বন্ধে!

* * * একদিনকার কথা মনে আছে। আমি গড়্‌ছিলুম—উনি আঁকছিলেন।—ঘরটা ছোট—সুতরাং দূর থেকে মূর্ত্তিটাকে দেখ্‌তে হ'লে আমায় ঘরের বাইরে চলে যেতে হ'ত। ঘরের বাইরে যেতুম প্রায়ই—একবার ওইরকম ঘরের বাইরে গিয়েছি—ওই সময় তিনচারজন ভদ্রলোক অন্যদিককার দরজা দিয়ে কি সব পরামর্শ নিতে ওঁর ঘরে ঢুক্‌লেন!—আর নানান আলাপ আলোচনা জুড়ে দিলেন! আমার আর সে ঘরে ঢোকা হ'ল না! * * অন্য ঘরে বসে' মন থেকে গুরুদেবের একটি ছোট মূর্ত্তি গড়্‌লুম—যা' মাটি বাকী ছিল তাই দিয়ে হ'য়ে গেল! ভদ্রলোকরা চলে যাবার পর ওঁর ঘরে গেলুম। বল্‌লেন—ওঁদের চেয়ে তোর সঙ্গটাই ত' ছিল ভালো—গিয়েছিলি কোথায়?" বল্‌লুম—"যে প্রসঙ্গ উঠ্‌লো আপনাদের, ঘরে ঢুক্‌বার আর সাহস পেলুম না—পথও পেলুম না"—সেদিনে আর কাজ হ'ল না। পুরোণো একটি গামছা গুরুদেবের কাছ থেকেই জোগাড় করেছিলুম সেইটে ভিজিয়ে মূর্ত্তিটিকে জড়িয়ে রেখে দিয়ে চলে এলুম! * * * সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা! তারপর শান্তিনিকেতন যাবার আর সুযোগ সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

ধাইল প্রচণ্ড ঝড়, বাধাইল রণ,—
কে শেষে হইল জয়ী?—মৃদু সমীরণ। (রবীন্দ্রনাথ)

সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্যভূষণ

(১)
জমিদার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায়ই সাজাদপুরে যেতেন, সে তাঁর প্রথম যৌবন, তখন সবে চৈতালীর কবিতাগুলি লিখ্‌তে চলেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জমিদার রবীন্দ্রনাথই জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন বেশী। সাজাদপুরের সেই যুগের কথা।

তখন নিয়মিতভাবে প্রতি বছরেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস এসে সাজাদপুরে থাকতেন। কাব্যচর্চার চেয়ে জমিদারী তহশীলের হিসাব চর্চাই তাকে বেশী সময় করতে হতো। অবসর সময়ে অনেক কিছু তাঁর লেখবার ইচ্ছা হতো কিন্তু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস, কোন্‌টা লিখ্‌লে ভাল হবে এই সমস্যার সমাধান করে উঠ্‌তে পারতেন না, কাজেই ভাবতেন বেশী, লিখতেন কম। রবীন্দ্রনাথের সেই যুগের সাজাদপুর থেকে লেখা একখানা চিঠির ভেতরও এরকম পাওয়া যায়। তাঁর এই গভীর চিন্তাধারা একদিন মূর্ত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছিল। সাজাদপুরের আবহাওয়া, তার নিস্তব্ধ দুপুর বেলা, বিহংগগুঞ্জিত মনোরম প্রভাত এবং সাজাদপুরের অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি হবার পক্ষে হয়তো খানিকটা সাহায্য করেছিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'কৈশোরক' পত্রিকায় 'সাজাদপুরের কথা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন···এই সাজাদপুর হইতেই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার এবং তরুণ বয়সের অক্লান্ত সাধনার ইতিহাসের সূচনা দেখতে পাই তাঁহার লিখিত চিঠির মধ্য দিয়া···।'

সেকালের জমিদারদের মধ্যে অনেকেই খুব অত্যাচারী ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রজার ভিক্ষার ঝুলি কেড়ে নিজেদের টাকার থলি বোঝাই করা। দরিদ্রের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা দুঃখের অন্নগ্রাস মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের রাজপ্রাসাদ সমৃদ্ধ করে তোলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মভোলা লোক। মানুষের দুঃখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হতো। তিনি জমিদার হলেও শুধু আদায় করেই ক্ষান্ত হতেন না, আবার দিতেনও তেমনি। কেউ অভাব অভিযোগ জানালেই তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। একদিনের ঘটনা বলি।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে আমাদের গ্রামদেশে খুব আগুনের ভয় হয়। এই সময় বৃষ্টি হয় না, সূর্যের তেজও বেড়ে যায়। গাছের পাতা ঝরে যায়। সবই শুকিয়ে যেন বারুদ হয়ে থাকে, একটু অসাবধান হলেই বহ্নিবন্যায় দেশকে ছারখার করে দেয়। ১২৯৭ সালে একবার সাজাদপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। সেবার সাজাদপুরের পোষ্ট অফিস পুড়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ীর একতলাতে পোষ্ট অফিস হয়। এই সময় বিশ্বকবির হাত থেকে 'পোষ্টমাষ্টারে'র মত গল্প মুক্তি লাভ করে।

সেদিন ১৩০২ সালের ৩০শে চৈত্র। স্তব্ধ দুপুর। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রাম করছেন। অসম্ভব গরম, বাইরের দিকে তাকানো যায় না, চোখ যেন ঝল্‌সে যায়। রবীন্দ্রনাথ গরমে কাতর হয়ে উঠেছেন। টানাপাখা চল্‌ছে। এমন সময় মোমিন মিঞা এসে দাঁড়ালো খাটের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: কি রে কি বলছিস।

মোমিন মিঞা গরমের জন্যে প্রভুর অস্বস্তি বেশ বুঝতে পারছিল, কাজেই কিছু বল্‌তে সাহস করছিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রভু পাছে বিরক্ত হন, তাই বলেই ফেল্লে: হুজুর এনাতপুর থেকে কয়জন প্রজা এসেছে, কর্তার সংগে দেখা কর্‌তে চায়, তারা এখনি আবার চলে যাবে, খাওয়া-দাওয়াও হয়নি এখনো। রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গেলেন: এই রোদে এনাতপুর থেকে এসেছে না খেয়ে, বেচারাদের ওপরে খুব কষ্ট হয়েছে, তুই যা খাজাঞ্চিবাবুকে বলে আগে তাদের খাবার ব্যবস্থা কর, তার পর আমার সংগে দেখা হবে।

মোমিন মিঞা চলে গেল এবং তখনি আবার ফিরে এসে বল্লে: হুজুর, তারা বলে আমরা শুধু মহাশয়ের দর্শন চাই, খাওয়াদাওয়ার আমাদের দরকার নেই।

রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন। এই দুরন্ত রৌদ্রে সাত আট মাইল পথ হেঁটে এসেছে তাঁরই সাথে দেখা করতে, নিশ্চয়ই তারা কোনও বিপদে পড়েছে, মোমিন মিঞাকে বল্লেন: যা, নিয়ে আয় এখানে।

রবীন্দ্রনাথ একখানা চেয়ার নিয়ে উত্তরের বারান্দায় এসে বস্‌লেন। মোমিন মিঞার সংগে তিনজন প্রজা এসে তাঁকে প্রণাম করেই হাউ হাউ করে কেঁদে বল্লে: হুজুর, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, গতরাত্রে আমাদের বাড়ীঘর পুড়ে গেছে, গোরু বাছুরগুলো পর্যন্ত আমরা বাঁচাতে পারিনি। বাসনপত্র টাকা-পয়সা যাহা ছিল সমস্তই বুঝে চোরে নিয়ে গেছে। আমাদের এ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি সেজন্য আমরা ভাবছিনা। বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি যে কি খাবে তার সংস্থান এপর্যন্ত কর্‌তে পারিনি। হুজুর মা বাপ, আপনি যদি আমাদের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি না করেন তবে মরে যাব। এর উপর বছরের আজ শেষ দিন, খাজনার জন্য কাল জুবার পেয়াদা গিয়েছিল। বলে এসেছে নালিশ করবে। হুজুরের পায়ের তলে পড়লাম আমাদের যাহয় করুন।

এদের এই বিপদে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো। তিনি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম কি? সে বল্লে শ্রীগোবিন্দ প্রামাণিক।

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: গোবিন্দ, তোমাদের সব কথা শুনে আমার মনে বড়ই দুঃখ হচ্ছে। তুমি বুড়ো মানুষ, এই রৌদ্রে এত পথ এসেছ না খেয়ে না দেয়ে, এখন বেশী কথাবার্তায় দরকার নেই, তোমরা খেয়ে দেয়ে কাছারীতে যেও, আমি তোমাদের জন্যে দেখি কি কর্‌তে পারি। খাজনার জন্যে তোমাদের ভয় নেই নালিস তোমাদের নামে হবে না, আমি বলে দেবো এখন। মোমিন, এদের নিয়ে খাজাঞ্চিবাবুর কাছে যাও, এদের খাবার যোগাড় করে দিতে বল, আর মুন্সি বাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দরিদ্র সর্বহারা পরিশ্রান্ত এই প্রজা কয়টি জমিদার রবীন্দ্রনাথের শান্ত সৌম্য সুন্দর মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর তাঁর মধুর আশ্বাসবাণীতে তারা অন্ধকারের ভেতর যেন আলোর সন্ধান পেল। তারা শুনেছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যাচারী জমিদার, প্রজাদের সংগে দেখা করেন না কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আজ তারা দর্শন কর্‌লো মর্ত্যের দেবতাকে, তারা দেখলো রবীন্দ্রনাথ কল্পনার কল্পবৃক্ষ। এই দরিদ্র অশিক্ষিত প্রজারা কি করে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না।

বিকেল বেলায় গোবিন্দ প্রামাণিক, রামগতি প্রামাণিক প্রভৃতির এনাতপুরে প্রজাদের কাছারীতে ডাক পড়্‌লো। খাজাঞ্চি রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী বল্লেন: ওহে গোবিন্দ তোমাদের খাবার জিনিষ পত্র কিন্‌তে তাঁরাজ এই সতের টাকা দিয়েছেন, আর তোমরা খাজনা মাফের জন্য একটা দরখাস্ত করে যাও, তোমাদের এক বছরের খাজনা মাফ হবে।

প্রজারা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই সতের টাকাকেই সতেরটা মোহর মনে করে খুসী হয়ে চলে গেল। তারা দেবতার দেখা পেয়েছে, তাঁর মুখের বাণী শুনেছে এতেই তারা ধন্য হয়েছে। এ সতের টাকা তো ফাউ।

সাজাদপুরের রবীন্দ্রনাথের সময়কার একখানা অর্ডার বইয়ে এনাতপুরের গোবিন্দ প্রামাণিক, রামগতি প্রামাণিক প্রভৃতিকে বাড়ী পুড়ে যাবার সাহায্য বাবদ সতের টাকা দেবার একটি হুকুম দেখা যায়। এই হুকুমের নীচে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর আছে।

---

(২) মোমিন মিঞার প্রভুভক্তি

১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের আর একটা ঘটনা বলি। রবীন্দ্রনাথ তখন সাজাদপুরে ছিলেন। আজকের ঘটনা রবীন্দ্রনাথের একটি ভৃত্য মোমিন মিঞাকে নিয়ে।

মোমিন মিঞার চেহারা ছিল কদাকার এবং বুদ্ধি ছিল কম। কিন্তু মনিবের কাজ করতো বেশী, কথা বল্‌তো কম, কাজেই রবীন্দ্রনাথ এই সাদাসিধা ভৃত্যটিকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন। মনিবের জন্য তার যে অপরিসীম দরদ ছিল সেই কথাই তোমাদের কাছে বল্‌তে যাচ্ছি।

শ্রাবণ মাস। বর্ষার জলে গ্রামের খাল বিল নদী নালা একাকার হয়ে গেছে। পথ ঘাট বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। তার ওপর সেদিন সকাল থেকেই মুসলধারে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির আর বিরাম নেই, আকাশ যেন ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। শুধু বৃষ্টি নয়, তার সঙ্গে ঝড়ের যোগ আছে। 'কুঠিবাড়ীর' সামনে ঝাউ ও অন্য গাছগুলি কাটা পাঁঠার মত অশান্ত আবেগে দাপাদাপি করছে। গাছে গাছে বিহংগ সমাজের মধ্যে সুরু হয়েছে মরণ ভীতির আর্তনাদ।

রবীন্দ্রনাথ 'কুঠিবাড়ীর' দোতালার দক্ষিণের ঘরে কাঁচের জানালার সামনে বসে বাইরের প্রকৃতির এ উন্মাদ ছেলেটির অশান্ত অত্যাচার ও মাতলামি উপভোগ করছেন। পথের পরে যতদূর দৃষ্টি যায়, একটি জনপ্রাণী সাড়া শব্দ নেই। মানুষ তো দূরের কথা এই দুর্য্যোগে বুঝি কুকুর বেড়ালও বাইরে আসতে পারে না।

মোমিন মিঞার বাড়ী দূরে, এখনো কাজে আসতে পারে নি। অবশ্য এমনি দেরীতে কাজে আসার জন্যে এক রৌদ্রোজ্জ্বল চৈত্র প্রাতে মোমিন মিঞা তিরস্কার লাভ করেছিল কিন্তু তার আট বছরের মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনে কবি যে কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন সেকথা অন্য গল্পে বলেছি।

আজ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটুও রাগ করেননি বরং রবীন্দ্রনাথ আরো ভাবছিলেন, আজকের ঝড়ে কত দরিদ্র হবে গৃহ হারা, কত অনাশ্রিত হারাবে প্রাণ। প্রকৃতির খেয়ালের খেলায় তাঁর ভৃত্যের ক্ষুদ্র গৃহখানি ধ্বংশপ্রাপ্ত না হয়। তিনি প্রাতঃকালীন সব কাজ নিজেই সেরে নিয়েছেন, অযথা ভৃত্যের ভরষা করেননি।

সহসা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দূরে দেখা গেল একটা অস্পষ্ট মূর্তি যেন ঝড়ের সংগে যুদ্ধ করতে করতে আসছে, রবীন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রমে অস্পষ্ট মূর্তি স্পষ্টতর হয়ে মোমিন মিঞায় পরিণত হল। কবির বিস্ময় আরোও বেড়ে গেল যখন দূরে একটা গাছের ডাল মরমর শব্দে ভেঙ্গে পড়লো, তিনি তাকিয়ে দেখলেন, না মোমিন মিঞা চাপা পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন মোমিন মিঞার বাড়ী কুঠিবাড়ী থেকে আধ মাইলের কম নয় এবং বর্ষার এই খরস্রোতা খালটিকে উজিয়ে আসতে হয় খানিকটা পথ।

মোমিন মিঞা আপাদমস্তক ভেজা দেহখানা নিয়ে নিঃশব্দে রবীন্দ্রনাথের সামনে বারান্দায় এসে দেলাম দিয়ে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ তখন স্নেহমিশ্রিত ক্রোধে কথা বলতে পারছিলেন না।

মোমিন মিঞা ভাবলো, দেরীতে কাজে আসায় বুঝি হুজুর রাগ করেছেন, তাই অবনত মস্তকে বল্লে হুজুর, মেয়েটা কাঁদতে লাগলো তাই কাজে আসতে এত দেরী হয়ে গেল, নইলে···।

রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বল্লেন: থাক্ থাক্, কে তোকে এই ঝড় জল মাথায় করে এখানে আসতে বলেছে গাছটা যদি এখনি ঘাড়ের ওপর পড়তো, কি হতো তা হলে, বোকা কোথাকার।

মোমিন মিঞা বিনীত ভাবে বল্লে: আমি না এলে হুজুরের কষ্ট হতো; আর কিই বা এমন পথ, এক দৌড়ে ছুটে এলাম। মেয়েটা মানা করলো, অনেক বুঝিয়ে বলে এলাম তোর জন্যে হুজুরের কষ্ট হবে রাঙা সাড়ী এনে দেবো, তবে থামলে।

রবীন্দ্রনাথের কোমল প্রাণ মোমিন মিঞার এই গ্রাম্য সরলতায় প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বল্লেন: খাল পার হলি কি করে।

এবার মোমিন মিঞা হেসে বল্লে: খানিকটা সাঁতার দিয়ে উজিয়ে এপার এসে উঠলাম। খরস্রোতা খাল উজিয়ে আসার কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন কিন্তু মোমিন মিঞার বলবার ভঙ্গি দেখে, না হেসে পারলেন না বল্লেন: বেশ করেছো, এখন ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলো গে, হতভাগা নিউমোনিয়া হয়ে মরলে মেয়েকে কাপড় দেবে কে?—বলেই পোর্টমেণ্টো খুলে নিজের পরিধেয় একখানা নূতন শান্তিপুরি ধুতি বের করে দিলেন।

মোমিন মিঞা হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন

ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে ভালো আছ ভাই? (রবীন্দ্রনাথ)

শিশুর সখা

চিত্রিতা গুপ্তা

কবিকে মনে আছে তোমাদের? যারা তাঁকে একবার দেখেছে তাদের ত ভোলবার কথা নয়। সেই যে সাদা সিল্কের মত দাড়ি চুল, আলোর মত প্রদীপ্ত রং, সেই যে হাত দুটী পিছনে জড় করে একটু কুঁজো হয়ে চলন, সেই যে উজ্জ্বল গভীর চোখের সস্নেহ দৃষ্টিপাত—সে কি ভোলবার? মনে হোত যেন অতীতের কোন ঋষি। তার ওপর তাঁর আশী বছর বয়স। দূর থেকে দেখে ভাবা যেত না যে এঁর সঙ্গেও অত মজার মজার গল্প করা চলে। কিন্তু দূর থেকে যা মনে হয় তা সত্য নয়। তাঁর বয়স ৮০ পেরিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু সে কেবল ধারাপাতের হিসাবে—মনটী তাঁর সমান ছেলেমানুষের ছিল। তিনি নিজে কি বলেছেন শোন—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন।
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

সত্য তিনি বুড়োদের বা বয়স্কদের মনোভাব যেমন সুন্দর ভাবে এঁকেছেন—ছোটদের মনের কথাও তার চেয়ে কিছু কম সুন্দর করে লেখেন নি। তিনি যে মনে মনে ছেলেমানুষ ছিলেন নিজেই। নইলে কি আর ছোটদের মনের ছোট ছোট কল্পনা, ছোট কচি সুখ দুঃখ গুলি অত পরিষ্কার করে মধুঢালা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। শিশুর কবিতাগুলো তোমাদের মনে আছে—যেমন ধর—

"মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে·····"

অথবা—"আমি যদি দুষ্টুমি করে·····"

কিম্বা—"যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি·····"

এই মনোরম কবিতাগুলি নিশ্চয় অনেকবার শুনেছ। এই ধরণের কত কল্পনা ছোটবেলায় মনে হোত—কিন্তু তিনি কি করে সে সব কথা অমন চমৎকার করে লিখেছেন। তার কারণ তিনি তার ছোট বেলাকে হারিয়ে ফেলেন নি একটুও। এত মান এত যশ—বিশ্বজোড়া খ্যাতি প্রতিপত্তির আড়ালে—এত বড় বড় ভাবনা চিন্তা, এত বিচিত্র ভাবও কাব্যের তরঙ্গ দোলার পিছনে, তাঁর সেই ৭ বছরের শিশু মনটী ঘুমিয়ে থাকত না। যখনি তিনি তার দিকে চোখ ফেরাতেন তখনি সে নানা সুরে গেয়ে উঠত গান। তাই না এই সেদিনও লিখেছেন—

"ক্ষ্যান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ীর পাঁচ বোন থাকে কালনায়
শাড়ি গুলো তারা উনুনে বিছায় হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়
পাছে কোন দোষ ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তাই লোহা সিন্দুকে
টাকাকড়ি গুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জালনায়।

শৈশবের ছোট ছোট অনুভূতিগুলো তাঁর মনে এত গভীর ভাবে বেজেছিল যে সে কথা তিনি কত কবিতায় কত লেখায় লিখেছেন পরে। সেই যে বাজল সানাই "বাজল বারোয়াঁ সুরে"—বাড়িতে প্রথম এল

নববধূ,—সেই যে আনন্দ কলরব, সেই যে আলোতে ছায়াতে, সাড়িতে গয়নায় রূপকথার মায়া সৃষ্টি হোল, কিন্তু তিনি তাতে ঢুকতে পেলেন না—নতুন বৌদিকে ঘিরে বসে আছেন বড়দিদির দল—তিনি শেখানে বড় ছোট। সেদিনের বেদনার ছবি তিনি ৮০ বছর বয়সে কি সুন্দর এঁকেছেন। তখনকার প্রাত্যহিক জীবনের সেই একটানা ছন্দ, সেই সকালে উঠে কুস্তি করা, মাটি মাখা, গায়ের ওপর জামা পরে পড়তে বসা, তারপর ইস্কুল—ইস্কুলে গিয়ে বিদেশী ভাষায় কি যে পড়লেন তার আদ্ধেক বুঝলেন না—ফিরে এসে আবার নানারকম রুটীন—এ তাঁর ভাল লাগত না। তাঁর মন ছুটে যেত নিয়মের গণ্ডীর বাইরে—ইস্কুল কামাই করে চলে যেতেন তেতালার ছাদে—ধূ ধূ করত রোদ্দুর, ছাদের ওপর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে আসত; চিল উড়ে যেত মাথার ওপর দিয়ে, অন্যমনস্ক দুপুর বেলা কেটে যেত শিশুমনের কত স্বপ্নরচনায়। সেই সব দিনগুলির কথা ইদানীং তাঁর বড় বেশী মনে পড়ত। বিশেষত ইস্কুলের চারটে দেয়ালের গণ্ডী—তার মধ্যে কোনরকম আকর্ষণ নেই, পড়াকে মনোরম করে তোলবার কোনরকম সরস উপায় নেই—এ তিনি কিছুতেই সইতে পারতেন না। ইস্কুলে তাঁর পড়া হোত না কিছুই—তার চেয়ে ঢের বেশী পড়েছিলেন। যখন তাঁর বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন ডালহৌসী, সেই পাহাড়ের সব রকম বাধা নিষেধের বন্ধনহীন বুকে তিনি অনেক বড় বড় বই পড়ে শেষ করেছিলেন মনের আনন্দে।

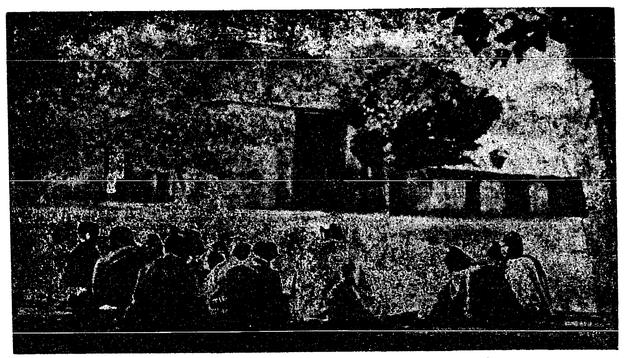

গাছের তলায় ইস্কুল

শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ের আদর্শ ছোট বেলার ইস্কুলের স্মৃতি থেকেই তাঁর মনে আসে। বিদ্যালয় হবে এমন যেখানে চোখ-রাঙানীর ভয় নেই, ছেলেরা পড়াশুনা করে আপন প্রাণের তাগিদে, শাসনের ভয়ে নয়। গাছের তলায় ঘাসের উপর প্রকৃতির আনন্দমেলায় পাখীর গানের সঙ্গে ছেলেদের পড়ার স্বর মিলবে। ছোটদের মনের সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন স্বাধীনতা বিদ্যারসের আস্বাদ পাইয়ে দেবে। লেখা, পড়া, গান, বাজনা, ছবি আঁকা সব থাকবে পাশাপাশি—কোনটার জন্যে কোনরকম জুলুম থাকবে না। তাঁর এ আদর্শ শান্তিনিকেতনে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। অত্যধিক নিয়মের বন্ধনে তিনি ছোটদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আনন্দস্রোতকে রুদ্ধ করে দিতে চাইতেন না। তাই বলে মনে ক'র না যে তিনি জীবনযাত্রায় নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যন্ত নিয়মিত জীবন বহু সুঅভ্যাসের কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত হোত। যেমন ধর তিনি কখনো দিনে ঘুমাতেন না, এমন কি বৃদ্ধ বয়সে ডাক্তারের অনুরোধ সত্ত্বেও না। বড়জোর ইজিচেয়ারের ওপরে বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিতেন সামনের মোড়ায়—হাতে থাকত একখানা বই। সিগারেট, পান, ত দূরের কথা—কখনো কোন রকম মশলাও তাঁকে খেতে দেখিনি। প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৪টার সময় উঠে প্রস্তুত হয়ে বসতেন সূর্য্যোদেবের দিকে

মুখ করে। হাত দুটী কোলের ওপর জড়ো করা—তাঁর সে সময়ের অপূর্ব্ব ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দেখলে মুখে কথা সরত না—মাথা আপনি নত হয়ে আসত। মনেও হোত না যে এঁর সঙ্গেও আমরা গল্প করতে পারি। কিন্তু তিনি নিজেই ফিরে আসতেন মানুষের মনের খুব কাছে। হাসি গল্পে, গানে, ঠাট্টা রসিকতায়, মনোরম বাক্যরচনায় যারা কাছে থাকত তাদের মনকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতেন।

পৃথিবীর বড় বড় মনীষিগণের সঙ্গে যখন এ বিশ্বের নানা তথ্যের আলোচনা করতেন তখন তাঁর একরূপ—আবার যখন শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে গল্প করতেন তখন তাঁর অন্য একরূপ। ছোটদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন তিনি তাদের সত্যিই একবয়সী—কিছু বোঝাতে হলে তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। লেক্‌চার দিয়ে বোঝানো তাঁর মত ছিল না। ছোটদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে কথা বলতেন। তোমরা যদি "ভানুসিংহের পত্রাবলী" পড়, অবাক হয়ে যাবে—একটী ছোট মেয়েকে লেখা সে সব চিঠি কী আশ্চর্য্য ছেলেমানুষীতে ভরা। ছোটদের অনবরত ছোট ছোট করে দূরে সরিয়ে রাখা তাঁর মোটেই পছন্দ হোত না। তিনি বলতেন—ছেড়ে দাও ওদের অত করে বেঁধো না, পৃথিবীতে ওদের যতটুকু যায়গা ততটুকুই ওরা নেবে। ওদের ছোট মনে যতটা ধরে ততটাই ওরা বুঝবে। কাজেই ওদের বড় বই পড়তে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। ওদের বুদ্ধি তা থেকে যতটা গ্রহণ করতে সক্ষম ততটা গ্রহণ করবে, উদ্বৃত্তটা ফেলে রেখে দেবে। সেই কিছু বোঝা কিছু না বোঝায় মিলিয়ে ওদের মন যাবে অনেক এগিয়ে। তারা ছেলেমানুষ বলে পৃথিবী ত ছেলেমানুষ হয়ে যায়নি। বিশ্ব যেমন তেমনি থাকে ছোটরা আপন মনের আয়নায় বিশ্বকে দেখে। তেমনি ছোটদের জন্যে বড় বইকে ছোট করবার দরকার নেই—তারা নিজের মনের ছেলেমানুষীতে সে সব বই তাদের মত করে নেবে। ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত এসব তাঁর খুব ভাল লাগত না।

একবার ছোটবেলায় আমি তাঁকে নালিশ জানিয়েছিলাম—আপনার বই কেন আমরা পড়তে পাই না। আমাদের জন্যে গল্প লিখুন। তিনি বল্লেন—এমন কথা—আমার বই সকলের জন্যে। তোমার যা খুসী পড়তে পারো—যারা তোমাকে এজন্যে বকবে—তাদের আমি কষে ধমকে দেব।

ছোটদের জন্যে এত দরদ, তাদের মনের প্রতি এত সস্নেহ সহানুভূতি, তাদের চিত্তের গূঢ়নিহিত আত্ম-সম্মানের (যা তারা নিজেও ভাল বোঝে না), এমন আন্তরিক স্বীকৃতি কবির মধ্যেই সম্ভব ছিল।

শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানবজীবনের বিভিন্ন বয়সের প্রত্যেক সুখদুঃখ অনুভূতির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তাইত বলি বয়সের সংখ্যা গণনায় তাঁকে ধরা যায় না।

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি, আঁখির কোণে কোণে
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়, কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে।
কেউ বা থাকে ঘরের কোনে দোঁহে, জগৎ মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ।
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে, জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি, কখন শুনি পরকালের ডর
সবার আমি সমান বয়সী যে চুলে আমার যতই ধরুক পাক্।

বালক রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

নব নব উন্মেষশালিনী যে বুদ্ধি তাকেই পণ্ডিতেরা প্রতিভা আখ্যা দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলেন প্রতিভা দৈবায়ও, কারও কারও মতে স্বকীয় চেষ্টায় অর্জ্জনীয়। এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তৃতীয় দল বলে থাকেন, দৈবানুকুল্য এবং মানুষের স্বকীয় পরিশ্রম এই সমন্বয়েই প্রতিভার বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের দিকে যদি দৃষ্টি দিই, তাহলে শেষের মতটির যথার্থ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রদীপ্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর যে সর্ব্বতোমুখী মনীষা সহস্রাংশু সূর্য্যের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। এ প্রতিভা যে শুধু দৈবদত্ত দান তা নয়, এর অনেকটাই যে তাঁকে বহুদুঃখ সহ্য করে সাধকের মত সাধনা করে অর্জ্জন করে দিতে হয়েছে, বালক রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা পাঠ করলে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজের পঠদ্দশা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"……আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি, মাষ্টার আমার ভাবী কাল সম্বন্ধে হতাশাস।

মাষ্টারি শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে — জানি না কী টানে
ক্লাসের কর্ত্তব্য ফেলে — ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জ্জন বাগানে।"

ইস্কুলের পড়ায় তাঁর মন বসত না, বাড়িতে যে পড়ার ব্যবস্থা ছিল তাও সব সময় তাঁর ভাল লাগত না। কিন্তু তবু তাঁকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশোনা করতে হয়েছে। ইস্কুলের দিকে অবহেলা যেটা হয়েছে, বাড়িতে তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে ষোল আনার উপর আঠার আনা। এ কল্পনার কথা নয়। তাঁর নিজেরই নানা রচনার মধ্যে তার প্রমাণ রয়ে গেছে। সেই সব প্রমাণ অবলম্বন করে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচী (routine) কি ভাবে তৈরি করা যেতে পারে, তারই একটি নমুনা এখানে দিলাম।—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাত্যহিক কর্মসূচী

(বয়স ৬।৭ হইতে ৭।৮ বৎসর)

সোমবার হইতে শনিবার

সময়	বিষয়	শিক্ষকমহাশয়ের নাম
সকাল ৫টা হইতে ৬টা	কুস্তি	কানা পালোয়ান
৬টা হইতে বেলা ৯টা	বোধোদয়, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, পাটিগণিত, সীতার বনবাস।	প্রথম শিক্ষকের নাম অজ্ঞাত নীলকমল ঘোষাল
বেলা ১০-৩০ হইতে ৪টা	আঢ্যের স্কুল বা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, পরে নর্ম্মাল স্কুল	
সন্ধ্যা ৬ টা হইতে ৯টা	রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণ	বক্তা বা পাঠক ব্রজেশ্বর
	পাঁচালি শ্রবণ	গায়ক কিশোরী চাটুজ্যে
	রবিবার	
সকাল .	গান	বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী

স্মৃতি-পূজা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

মালতী-কুঞ্জ-বেদীতলে বসি গাঁথিছে 'মালতী' মালা,
এলায়ে পড়েছে কুন্তল-জাল, মেঘে বিদ্যুৎ-বালা।
জল ভারানত উজল নয়ন কি যেন বেদনাভার—
কি-যেন-হারাণো সুর আজি তার চিতে জাগে বারবার।
কনক-আঙুলে গ্রন্থন চলে, অধরে বিষাদ হাসি,
সে হাসি ফুটেছে আধ-ফোটাফুলে গাঁথিল যা রাশি রাশি।
ছোটবোন্ রমা রূপে অনুপমা আসিয়া কহিল তারে—
'একি দিদি ভাই! এত ফুল-সাজে সাজাবি আজিকে কারে?'
'বোন্‌টি আমার'—কহিল মালতী—'ভুলে গেলি সেইদিন,
বাংলার রবি, জগতের কবি—যেদিন অস্তলীন!
ধরার ধূলিরে ভালবেসে যাঁর তৃপ্ত হয়নি আশা,
মানবের যত কান্না ও হাসি যাঁর ছিল ভাব ভাষা—
সত্য ও শিব সুন্দরে যেবা আঁকি দিলা তুলিকায়—
আজি তাঁর মহাপ্রয়াণের তিথি, পূজিতে যে হবে তাঁয়।'
সহসা ছুটিয়া আনি দিল রমা পটে আঁকা ছবিখানি,
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরে মালতী বেদীতে বসালো আনি।
ছবি-পাদমূল ধৌত করিল দিয়ে সে নেত্র-ধার—
মুছি নিল চুলে যেন পাদু'খানি সযতনে বারবার।
কুসুম-মাল্যে বেষ্টনী দিল চৌদিকে ছবি ঘেরি,
ডালিখানি তার করিল উজাড় সাজাইল হেরি হেরি!
মুদিয়া নয়ন কি বলিল বালা, কি জানি সেই সে জানে,
নিদ্রিত কবি—জাগ্রত ছবি—বুঝি সে হেরিল ধ্যানে।
জানাল বুঝি বা প্রাণের মিনতি অশ্রুর লিপিকায়—
'সুচির-অমর! হ'য়ে থাক দেব! এই মর অমরায়।'
অবাক্ নয়নে বসে ছিল রমা দিদির একটি পাশে,
দিদির করমে সায় দিতে তার মন বড় ভালবাসে।
তরল মনের সরল শিশুটি—দেখি দিদি নতশির,
ধীরে নোয়াইল মাথাটি তাহার, তারো চোখে এল নীর।
তারো শিরে বুঝি কবির পরশ! কহে—'দিদি! একি ছবি!
ছবির মাঝারে বাঁচিয়া রয়েছে এই যে মোদের কবি।'
মালতী হাসিল, শুধু সে কহিল—'নয় শুধু তাহা নয়,—
বিশ্বের কবি বেঁচে আছে বোন্ সারাটি বিশ্বময়!'

দেশ বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র এগার তখন তিনি তাঁহার পিতার সহিত দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর হইয়া সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। পনর বছর বয়সে পুনরায় পিতার সহিত হিমালয় ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সতর বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আহমেদাবাদ নগরে গিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি প্রথমবার সমুদ্র পাড়ি দেন। সতর হইতে সত্তর বছর বয়সে তিনি দ্বাদশবার জলে, স্থলে, আকাশে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রথমবার বিদেশে—তিনি ইংরাজি সাহিত্য শিখিবার জন্য বিলাতে ব্রাইটন্ সহরে স্কুলে ভর্ত্তি হন। যদিও তিনি স্কুলের বাঁধা ধরা নিয়মে লেখাপড়ায় অনভ্যস্ত তথাপি এই বিদেশে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া বেশ মন দিয়াই স্কুলে যাইতেন। তিনি তাঁহার প্রতিভায় তাঁহার শিক্ষকগণকে বিস্মিত করিতেন। কেবল লেখা পড়াই করিতেন না, বৃটিশ মিউজিয়মে নানা দ্রব্য দেখিতেন এবং বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন। ছবির গ্যালারীতে গিয়া ছবি আঁকিবার পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিতেন। কচি বয়স হইতে তাঁহার ছবি আঁকার অনুরাগ ছিল। পরিণত বয়সে সেই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হইয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছিল। দেড় বৎসর বিলাতে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা করিয়া ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন।

দ্বিতীয়বার বিদেশে—১৮৯০ সালের ২৩শে আগষ্টে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান। পথে তিনি ইটালী ও ফরাসী দেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করেন।

তৃতীয়বার বিদেশে—১৯১২ সালে ২৭ মে বোম্বাই হইতে তৃতীয় বার বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথম দুইবার বিদেশের জ্ঞান আহরণ করিতে এবং ভারতের জ্ঞান পরিবেশন করিতে গিয়াছিলেন। এসময় চিত্রকর রদেনষ্টাইন ও কবি ইয়েট্‌স্ তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য সুধী-সমাজে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেন। "গীতাঞ্জলি"র ভূমিকা ইয়েট্‌স্ লিখিয়া দেন এবং রদেনষ্টাইনের ছবি গীতাঞ্জলির শোভাবর্দ্ধন করে। ইয়েট্‌সই কবির "নোবেল প্রাইজ" পাইবার জন্য সুপারীশ করেন। ১৯১৩ সালের নভেম্বরে কবি "নোবেল প্রাইজ" পান।

আমেরিকায় প্রথমবার—ইংলণ্ড হইতে ১৯১২ সালের ২৭শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় গমন করেন। নিউইয়র্ক সহরে ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি 'বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা' প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সর্ব্বজাতি মহাসম্মেলনের বিরাট অধিবেশনে জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বের ফলে বিশ্বে যে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে তাহাই প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ভারতই মানবের মহামিলনভূমি।

১৯১৩ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যান এবং সতের মাস ভ্রমণ করিয়া ৫ই অক্টোবর ভারতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নোবেল প্রাইজ পাইবার সময় অভিনন্দন করিবার কালে সিমলা শৈলে লর্ড হার্ডিং কবিকে "পোয়েট্ লরিয়েট্ অফ্ এসিয়া" অর্থাৎ এসিয়ার কবি-সম্রাট আখ্যা দেন।

চতুর্থবার বিদেশে—১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করেন। পথে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও হংকং বন্দর গুলিতে কবির প্রচুর সম্বর্দ্ধনা হয়। টোকিওতে জাপানের কবি-শ্রেষ্ঠ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কবিতা লিখিয়া বলেন, "ক্ষণিকের জন্য যেন মহানগরীর সমস্ত কলরব, কর্ম্মতৎপরতা, মহামন্ত্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল। সেই ইটপ্রাচীরের রুক্ষ সভাগৃহ একটি মনোহর শান্তিময় আশ্রমে পরিণত হইয়া উঠিল।" প্রধান মন্ত্রী যে অভিভাষণ জাপানী ভাষায় পাঠ করেন তাহার উত্তর রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রদান করিয়া বঙ্গভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন!

কানাডা হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে কিন্তু কবি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, কানাডায় ভারত প্রবাসীদের প্রতি অপমানজনক ভেদনীতির প্রতিবাদে। ১৯১৬ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করেন। আমেরিকার সংবাদপত্র রবীন্দ্রনাথকে "ভারতের সেক্সপীয়র" নামে অভিহিত করিত। ক্লীভল্যাণ্ড নগরে 'সেক্সপীয়রের উদ্যানে' মহাকবির জন্ম উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবি বিগত যুগের এক বিশ্বকবির স্মরণে বৃক্ষরোপণ করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের ২১শে জানুয়ারী কবি আমেরিকা হইতে জাপান অভিমুখে যাত্রা করেন, পথে হনলুলুতে অবতরণ করেন।

১৯১৯ সালে কবি দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর, মহীশূর, নেলোর, তাঞ্জোর, মাদ্রাজ, ও মাদুরাতে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পান। ১৯১৯ সালের ৩রা মে জালিয়ন্‌ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি "স্যর" উপাধি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর আত্মসম্মান জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমবার বিদেশে—১৯২০ সালে ১১ মে চতুর্থবার ইয়োরোপ যাত্রা করেন। সেখানে সুধীমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে তিনি গমন করেন। বিখ্যাত ফরাসী মহিলা কবি কাউণ্টেস্ লিসেস্ কবিকে বলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট যুদ্ধের সময় গীতাঞ্জলীর ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিয়া শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কবি হল্যাণ্ডে যখন যান, তখন লিডেন ইউট্রেক্ট্ এবং আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। রাজধানীর প্রধান গির্জ্জাঘরে ধর্ম্মযাজকের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন খৃষ্টানকেও এমন সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয় নাই।

১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর কবি বেলজিয়ামের প্রধান নগর এনট্‌ওয়ার্পে গমন করেন ও বিপুল সম্বর্দ্ধনা পান ও বক্তৃতা দেন। সেই দেশের রাজার আমন্ত্রণে ব্রাসেলস্ নগরে গমন করেন। রাজা স্বয়ং কবিকে অভ্যর্থনা করেন। লণ্ডন হইয়া কবি তৃতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন ও ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কে পৌছান। ব্রুকলিনের 'একাডেমী অব্ মিউজিক হল্'এ ও ফিলাডেলফিয়া ব্রেনন সহরে মেয়েদের কলেজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন বাণী প্রকাশ করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমেরিকার নর-নারী মুগ্ধ হ'ন। নিউইয়র্কের জাতীয় আর্ট ক্লাবের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হন। তৎপরে শিকাগোতে 'ভারতের ও বিশ্বভারতীর কথা বলেন। নিউনিয়র্কের কবি সমাজ তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করেন। ১৯২১ সালের ৮ই এপ্রিল আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন।

পঞ্চমবার কবি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। উড়োজাহাজে করিয়া ফরাসীদেশে গমন করেন। সেখানে এবং সুইটজার্লণ্ড, জার্ম্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন ও অষ্ট্রিয়া দেশের বহুনগরে দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন।

৭ই মে—২৫শে বৈশাখ—সৌন্দর্যময়ী লাউসান সহরে কবির ৬১ বাৎসরিক জন্মোৎসব হয়। ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতরা তাঁহাকে শুভইচ্ছা জানান। জার্ম্মান পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে অভিনন্দন করেন এবং জার্ম্মান দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মূল্যবান্ গ্রন্থের সংগ্রহ উপঢৌকন দেন। তাঁহারা কবির বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা পাঠ শুনিয়া আনন্দ পান।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ মশালধারীর বিরাট মিছিল সাজাইয়া কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাজপথ জয়ধ্বনিতে ভরিয়া সভাস্থলে গমন করেন।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমের যে সভা হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তাহার সভাপতি ও সভ্যেরা কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

বার্লিনে ২রা জুন তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার সভাস্থলে দশ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গাউনধারী ১৫ সহস্র অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ দর্শকদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কবিকে সম্মান জানান। ১৯২১ সালের ১৩ই জুলাই কবি ভারতে ফিরিয়া আসেন।

ষষ্ঠবার বিদেশে—১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীন যাত্রা করেন। বেস্থন, কুয়ালা-লামপুর, সিঙ্গাপুর হইয়া হংকংএ ১২ই এপ্রিল জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। স্যাংহাই ও অন্যান্য মহানগরীর পণ্ডিত ও রাষ্ট্রবিদ্‌রা বুদ্ধের দেশের ঋষিকে শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করেন।

পিকিংএর ছাত্র-ছাত্রী কবির যে সম্বর্দ্ধনা করেন তাহা আন্তরিকতা ও সরলতায় পূর্ণ ছিল। চীনের সম্রাট অসূর্য্যম্পশ্য, সহজে তাঁহার সাক্ষাৎ কেহ পায় না। বড় বড় রাজারাজড়া বা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠদের নিকটও তুচ্ছ। সেই পবিত্র পিকিংএর প্রাচীন রাজপ্রাসাদে রবীন্দ্রনাথকে প্রাক্তন চীনসম্রাট সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

চীনে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ বার্ষিকী জন্মদিন উৎসব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ভারতীয় শাস্ত্রমত অনুষ্ঠিত হয়। চীন দেশের নর-নারী এই জন্মোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছিল। ৩১ শে মে চীন হইতে কবি সদলবলে জাপানে গমন করেন। তথায় রাসবিহারী বসু তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। কবি জাপানে ২১শে জুলাই ফিরিয়া আসেন।

সপ্তমবার বিদেশে—চারমাস বাদেই ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেন। তাঁহার চিত্ত এমনই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল যে পেরু প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা অর্জ্জনের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু জাহাজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, পেরু যাওয়া হইল না। আর্জ্জেন্‌টাইন্ রাজ্যের রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিস্ নগরে কিছুদিন থাকিয়া ৩০শে ডিসেম্বর ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

২১শে জানুয়ারি ইটালীর জেনোয়া বন্দরে অবতীর্ণ হন। এই তাঁহার ষষ্ঠবার ইউরোপ ভ্রমণ। ভিনিসের অধিবাসীরা তাহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়াতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অষ্টমবার বিদেশে—ইটালীবাসীদের ঐকান্তিক অনুরোধে ১৯২৭ সালের ১৫ই মে কবি ইটালী যাত্রায় গমন করেন। এবার মুসোলিনী নিজে কবিকে রাজঅতিথিরূপে ইটালীতে থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার ভ্রমণের ও অবস্থানাদির যাবতীয় খরচ ইটালীর রাজকোষ বহন করেন।

কলিসিয়ামের বিরাট প্রেক্ষাগৃহে শিশুদের সঙ্গীত-উৎসব দেখিতে আমন্ত্রিত হন। সে এক অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার দর্শক একযোগে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া কবিকে অভিবাদন করিল। তৎক্ষণাৎ হাজারটি শিশুর দ্বারা ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

রোমে 'টেগোর সার্কল্' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালীর রাজা রাজপ্রাসাদে কবিকে আমন্ত্রণ করেন। কবির 'চিত্রা' নাটকের অভিনয় হয়। ফ্লোরেন্স হইয়া কবি সুইটজারল্যাণ্ডে গমন করেন।

ভিলেন এনভএ হোটেলে বাইরোঁনে যে ঘরে ভিকটর হিউগো থাকিতেন সেই ঘরে কবি দশদিন বাস করেন এবং রোম্যা রোঁলা নিত্য কবির সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। ভিয়েনা ও প্যারিস হইয়া তিনি স্বদেশযাত্রা

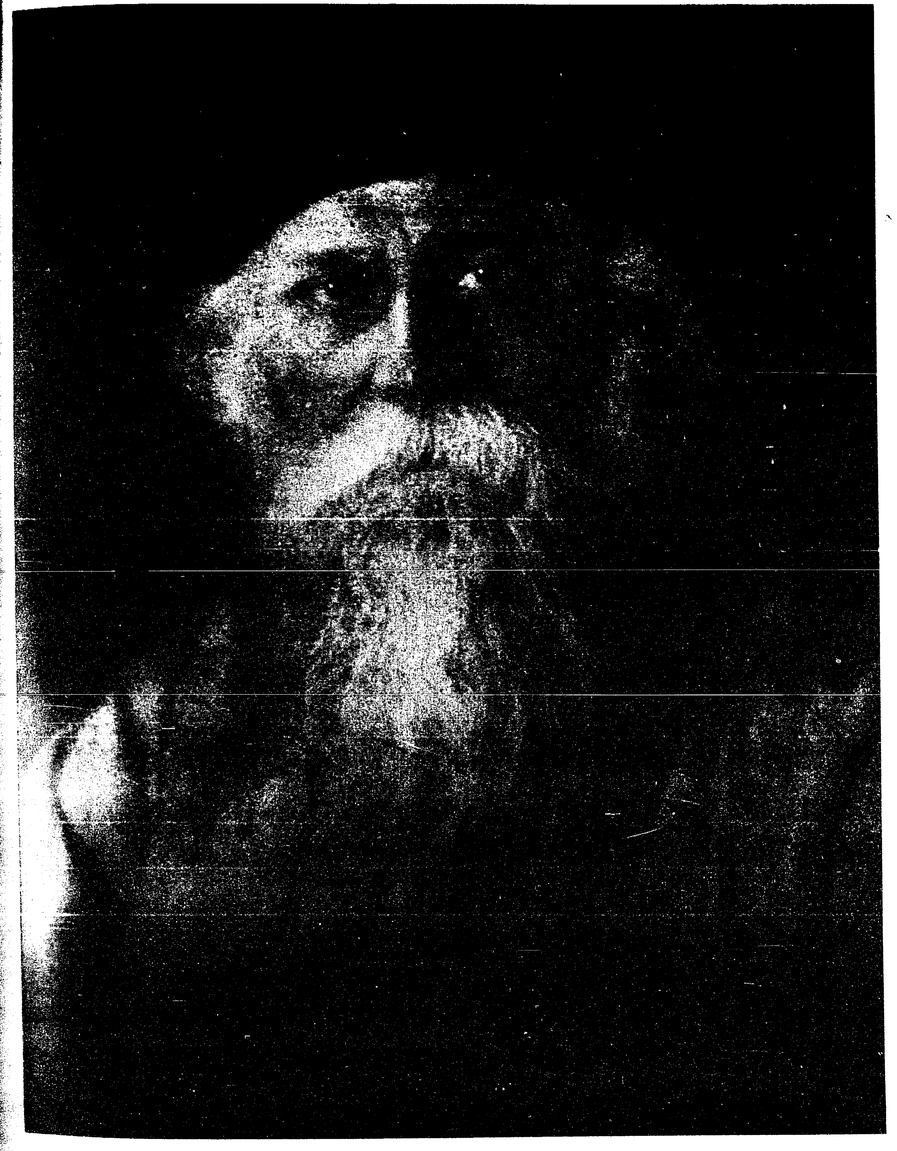

রবীন্দ্রনাথ

রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

লণ্ডন গমন করেন। প্যারিসের উপকণ্ঠে বুলোনে ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে তাঁহার গৃহের নাম 'চিত্রা' রাখিয়াছেন। তাঁহার আঁকা কবির ছবি তাঁহার বাড়ীতে ও বিশ্বভারতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্পী এপ্‌স্‌টাইন্‌ রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি গঠন করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার ষ্টুডিয়োতে লইয়া যান। কবি রবার্ট ব্রীজেস কবিকে আমন্ত্রণ করিয়া অক্সফোর্ডে লইয়া গিয়াছিলেন।

১৯২৬ সালের ২৪শে আগষ্ট তিনি নরওয়ে গমন করেন। প্রাসাদে রাজা কবিকে অভ্যর্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে সম্মানিত অতিথিরূপে গমন করেন।

কবি নরওয়ে হইতে সুইডেন, ডেনমার্ক হইয়া জার্ম্মানীর হামবুর্গে পদার্পণ করেন। জার্ম্মানীর নানা সহরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন বা কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বার্লিনে বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন কবিকে নিজগৃহে ঘরোয়া বৈঠকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

ড্রেসডেনে কবির 'ডাকঘর' মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কবিবরের ভ্রমণকালে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য, অভিনয়ের আয়োজন হইত।

অষ্ট্রিয়া, চেক প্রদেশ, হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ত সহরে রেলষ্টেসনে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার বিপুল আয়োজন করে। সার্ব্বিয়া ও বুলগেরিয়াতে কবির আগমনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ ছুটি হইয়াছিল।

বুলগেরিয়ার রাজা বরীস্‌ কবিকে তাঁহার প্রাসাদে অভ্যর্থনা করেন। ১৯শে নভেম্বর রুমানিয়ার রাজধানী বুকারেষ্ট সহরে কবির বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমগ্র সহরবাসী যেন রাস্তায় উপনীত হইয়া পড়েন। রুমেনিয়ার রাজা ফার্ডিনেণ্ড শয্যাশায়ী ছিলেন তথাপি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে আনাইয়া সাদরে আলাপ করেন।

তুরস্ক হইয়া কবি গ্রীসে গমন করেন ও এথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রীসের রাজা রবীন্দ্রনাথকে "কমাণ্ডার অফ্‌ দি অর্ডার অফ্‌ দি রীসিভার" উপাধি দেন ২৭শে নভেম্বর।

অতঃপর কবি মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া ও কাইরো নগরে বক্তৃতা দেন। ১লা ডিসেম্বর মিশরের রাজা ফুয়াদ রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বিশ্বভারতীর জন্য মূল্যবান কতকগুলি আরবি ভাষার পুস্তক উপহার দেন। কবির সম্মানে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। ১৯শে ডিসেম্বর কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

নবমবার বিদেশে—বৃহত্তর ভারতের হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন দেখিবার জন্য কবি ব্রহ্মদেশ, মালয়, মালক্কা, ইপো, তাইপিং, পিনাং, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, শ্যাম ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালের ১৭ই জুলাই হইতে ১৬শে অক্টোবর অবধি তিনি ভ্রমণ করেন। সকল স্থানের নরনারী আপনার জনের মতন কবিকে অভ্যর্থনা করেন! রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুরের গভর্ণরের অতিথি হইয়া ছিলেন। পিনাংএ চীনাদের হাইস্কুলের ছাত্রগণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। কবির বাণী শুনিয়া ছেলেরা খুব উৎসাহিত হয়।

কবি সুমাত্রা হইয়া যবদ্বীপে গমন করেন। ডাচ গভর্ণর ব্যাটাভিয়াতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি তার পর বলিদ্বীপে যান। কবি বলিদ্বীপের রাজার ও ডাচ সরকার-প্রতিনিধির অতিথি ছিলেন।

যবদ্বীপের রাজার অতিথি হইয়া তিনি ছায়া অভিনয়ে রামায়ণ মহাভারতের গল্প দেখেন। ১৯২৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর একটী সাঁকো ও রাস্তা কবি খুলিয়াছিলেন। তাহাদের নাম কবির নামে প্রচলিত আছে। প্রাম্বনান্‌এ বহু হিন্দু দেব দেবীর মন্দির কবি দর্শন করেন। বরবদুর বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়া পুলকিত হন।

তারপর কবি শ্যামদেশে গমন করেন। শ্যামের রাজার অতিথি হইয়া তিনি ব্যাঙ্কক্‌ নগরে ছিলেন। বিজয় দশমীর দিন বিজয় উৎসব দেখিয়া বাঙ্গলার কথা তাঁহার মনে উদয় হয়। ১৬ই অক্টোবর শ্যামদেশ ছাড়িয়া রেঙ্গুনের

মধ্য দিয়া ২৭শে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর কবি মান্দ্রাজ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি পথে আনিবেশন্তের ও অরবিন্দর আশ্রমে কয়েকদিন অবস্থান করেন।

দশমবার বিদেশে—১৯২৯ সালের ১লা মার্চ্চ কবি ক্যানাডা যাত্রা করেন। কলোম্বো, সিঙ্গাপুর ও হংকংএ তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয়। তিনি সাংহাই হইতে চতুর্থবার জাপানে গমন করেন। ইয়াকোহামা ও টোকিওতে সুধী ও সাংবাদিকগণ তাঁহার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করেন।

ক্যানাডায় শিক্ষা-মহাসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। সকল বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হয়। তথা হইতে তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করিবার জন্য যাত্রা করেন। পাশপোর্ট অফিসে গোলমাল হওয়াতে তিনি ভারতবাসীর মর্য্যাদা রাখিতে শত অনুরোধসত্ত্বেও আমেরিকায় প্রবেশ করিলেন না। জাপান হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন ভারতের পথে ইন্দোচীন রাজ্যের রাজধানী সাইগনে অবতরণ করেন—তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয়। স্কুল কলেজ সমস্ত ছুটি দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালের ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুর, পরে মান্দ্রাজ হইয়া কলিকাতায় পৌছান।

একাদশবার বিদেশে—এই ভ্রমণ ব্যাপার তাঁহার ৭০ বৎসর বয়সে হইলেও বিশ্বে তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে।

১৯৩০ সালের ১১ই মে রবীন্দ্রনাথ অষ্টমবার লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন। ১৯শে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—'হিবার্ট বক্তৃতা' দেন, পরে ডেনমার্ক ও জার্ম্মানী হইয়া ১৯৩০ সালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরে উপনীত হন। কবি নানা সভায় বক্তৃতা ও আবৃত্তি করেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার আন্তরিকতা কবিকে মুগ্ধ করে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সহজ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর কবি পায়োনিয়র্স কম্যুন পরিদর্শন করেন। প্রতিষ্ঠানের সৌধের প্রবেশদ্বারে সোপানের নিকট কবি উপস্থিত হইবামাত্রই সিঁড়ির উপর দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাত্র ও ছাত্রীদল স্বাগত সঙ্গীতে একযোগে মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করেন। কবি উপবেশন করিলেই একটি মহিলা কবিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া অভিভাষণ পাঠ করেন। বালক বালিকারা মন খুলিয়া কবির সহিত নানা বিষয় আলাপ আলোচনা করে।

২৯শে মস্কো ত্যাগ করিয়া কবি বার্লিনে যান, ও সেখান হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক ও বোষ্টন সহরে কবির অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট হুভার তাঁহার সরকারী বাসস্থান হোয়াইট হাউসে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। আমেরিকা হইতে কবি সোজা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জার্ম্মানীতে যখন ছিলেন তিনি ওবেরামের্গাওয়ে 'প্যাসন প্লে' নামে খৃষ্টানদের পবিত্র অভিনয় দর্শন করিতে যান। দ্বিপ্রহরে যখন বিরাম ঘণ্টা বাজিল—কবি যখন ভীড়ের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন—তাঁর সেই সৌম্য খৃষ্টের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে পথ করিয়া দিল এবং জার্ম্মান পল্লীবাসীরা "খৃষ্ট খৃষ্ট" বলিয়া উঠিল। তারা যেন জীবন্ত খৃষ্টের আবির্ভাব দেখিতেছে।

ড্রেস্‌ডেনের অনতিদূরে এল্‌ব নদীর তীরে এক ছাত্র-উপনিবেশে কবি আমন্ত্রিত হন। বহু শত ছাত্র-ছাত্রী একত্র হইয়া সঙ্গীত, সাহিত্য এবং শিল্পের আবহাওয়ায় কবিকে যত্নভরে আতিথ্য দান করিয়াছিল। সেখানে রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। হোহেনস্টাইন্ উপনিবেশে যুবক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ছেলেরা কবির জন্যে নিজ হস্তে একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কবি সেইখানে দু'দিন বাস করেন। জার্ম্মান রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র ন্যাশন্যাল গ্যালারির জন্য চাহিয়া লইল।

দ্বাদশবার বিদেশে ভ্রমণ—১১ই এপ্রিল, ১৯৩২ সালে, বাহাত্তর বৎসর বয়সে কবি বিমানপোতে পারস্যদেশে গমন করেন। বুসায়ার নগরে ফুলের শোভার মধ্যে কবিকে শাসনকর্ত্তা অভ্যর্থনা করেন। কবি হাফিজ্ ও সাদীর দেশের অনেক স্থান ঘুরিয়া পারস্যর রাজধানী তেহারিন নগরে একপক্ষ কাল রাজ অতিথি হইয়া রবীন্দ্রনাথ বাস করেন। সেই চিরপ্রসিদ্ধ গোলাপ আতরের দেশে, মনোরম পারস্যদেশের ঐশ্বর্য্যের লীলাক্ষেত্রে কবির ৭৫শে বৈশাখে জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তারপর ইরাক্, বোগ্‌দাদ্ ভ্রমণ করিয়া কবি বিমানপোতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শিশু-রবি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রবির উদয় নিশির তিমির ভেদি
উষার সিঁথিতে নব সিন্দুর-শোভা
শুভ্র মেঘের মায়া-যবনিকা ছেদি'
সে রবি-রশ্মি শিশুপ্রাণ মনোলোভা।

শিশু রবি দেয় শিশুর আননে হাসি
নয়নে তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতির রেখা,
নধর অধরে যে লালিমা ওঠে ভাসি'
উদয় ভানুর সেই ত মনের লেখা।

রবির ভাষায় ফুটিল শিশুর ভাষা
কণ্ঠে ঝরিল আধ-ফোটা জুঁইফুল,
নবীন জীবন নব প্রভাতের আশা
আলোর প্লাবনে তরঙ্গ-সমাকুল।

রবির উদয় দূর নভো নীলিমায়
সাগর-বেলায় শিশুদের ধূলা খেলা
তারি মাঝে মন কখন হারায়ে যায়
আলোক-আঁধারে ঘনায় গোধূলিবেলা।

গোধূলিবেলায় খেলায় ভোলে না মন—
মার কোলে শিশু ফিরিবে কতক্ষণ?

পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুশী হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। (রবীন্দ্রনাথ)

পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্ত্তি। উপরের তলায় একটু খানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। (রবীন্দ্রনাথ)

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি। (রবীন্দ্রনাথ)

বাইশে শ্রাবণ

রাখাল তালুকদার

মহাস্মরণীয়, মহাবরণীয়
মৃত্যু-স্মরণ উৎসব দিন ;—
হে কবি নবীন !
স্মরণ করি।
বরণ করি।
প্রণাম করি।
অমৃত-স্মরণ
বাইশে শ্রাবণ—
নব নব রূপে বরণ করি,
চির নূতনেরে স্মরণ করি,
প্রণাম করি।

উদয় শিখরে উদিত রবির
অস্তাচলের অস্ত-রবির
প্রণাম রাখি।
বাইশে শ্রাবণ গিয়েচে ডাকি !

হে মহাস্মরণ,
হে মহামরণ,
মনে-প্রাণে আজ প্রণাম করি।
বরণ করি।
স্মরণ করি।
প্রণাম করি॥

বম্বে লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

● সম্পত্তি—১ কোটী টাকার উপর
● নূতন বীমা '২৪ ,, ,, ,,
● চলতি বীমা ৬ ,, ,, ,,

মেসার্স সেন এণ্ড কোং
চীফ এজেণ্টস্
১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে

আপনার ভবিষ্যত কর্ম্মজীবন। তখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহাই আপনার সমস্যা। আপনাকে আমাদের বীমাক্ষেত্রে যোগদান করিতে আহ্বান করি। পূর্ণ-স্বাধীনতা ও যথেষ্ট সম্মান সহকারে প্রচুর উপার্জ্জনের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন ঃ

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস ঃ
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

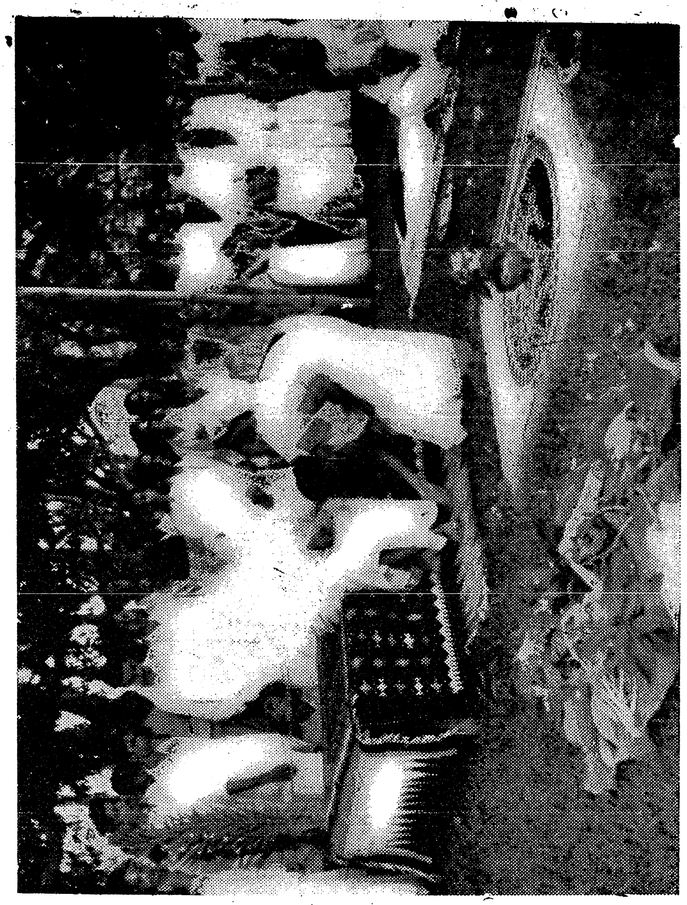

শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব

ব্লক সৌজন্যে

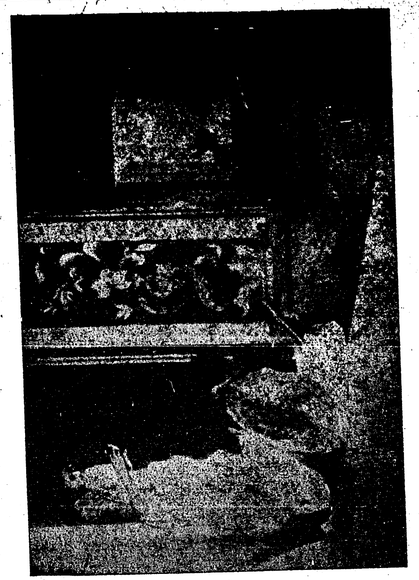

শান্তিনিকেতন কলাভবন

উত্তরায়ণ

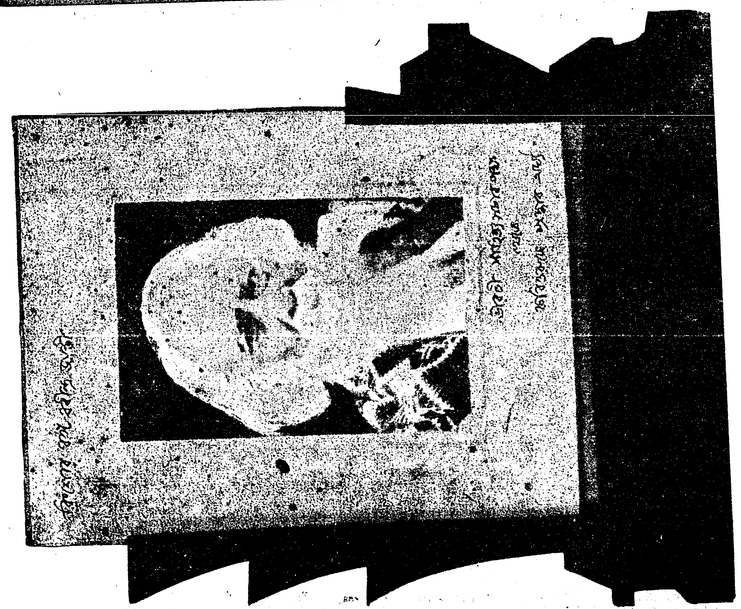

কিশোর-বন্ধু রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

রংমশাল

শিশু-সাহিত্য আসরের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরম সুন্দর

ইন্দিরা দেবী (মধুদি, মৌচাক)

পরম সুন্দর তিনি। তাই তাঁকে প্রণাম করি, প্রণাম করি শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে। সুন্দর তিনি তাঁর দেহ মনে, সুন্দর তিনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সমস্ত কাজে, সুন্দর তিনি তাঁর কর্ম্মে, চিন্তায়, ভাবে। এই সুন্দর মানুষটি শুধু নিজেকে, নিজের পরিবেশ ও আবেষ্টনীকে সুন্দর করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। সুন্দরের আবির্ভাব ঘটাতে চেয়েছিলেন আমাদের সমাজের, আমাদের জাতীয় জীবনের অসুন্দরকে আঘাত করে। যা অন্যায় তাই তো অশুচি, অ-সুন্দর। এই অন্যায়, অবিচাররূপী অসুন্দরকে তিনি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলয় করতে চেয়েছিলেন। তাই নেমে এসেছিলেন কবিতার কল্পলোক থেকে বাস্তবের মর্ত্তলোকে। নেমে এসেছিলেন অসুন্দরের মাঝে! যে অসুন্দর তোমাদের আমাদের সকলের জীবনকে ঘিরে আছে নানা মূর্ত্তিতে। এই সুন্দর মানুষ আমাদের জাতীয় কবি, সমস্ত জগতের কবি। দিকে দিকে তাঁর প্রতিভা ব্যপ্ত হয়ে সুন্দর ও সার্থক করেছে—যা তিনি ছুঁয়েছেন তাই সুন্দর হয়েছে তাঁর শুভস্পর্শে। তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি তাঁকে দেখি সুন্দরের পূজারী হিসেবে। সুন্দরের পূজা করতে গিয়ে তিনি সারা জীবন ধরে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেছেন স্বদেশে বিদেশে। সংগ্রাম করেছেন সারা জীবন ধরে, বাহুশক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে। অন্যায়কে তিনি কোনও কালে ক্ষমা করেন নি।

আজ তাঁকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করো, প্রণাম জানাও এই শুভ সুন্দরকে। তোমাদের চারিপাশে অহরহ যে অন্যায়, অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, তার প্রতিকার হোক আর নাই হোক, প্রতিবাদ করো, তোমাদের কণ্ঠে তাঁর বাণী, তোমাদের অন্তরে আশা, তোমাদের দেহে তাঁর বলিষ্ঠ ভাব যেন জাগ্রত হয়। তোমাদের কাজে কর্ম্মে ভাবে তাঁর সুন্দরের পূজার আয়োজন যেন চলতে থাকে। আশা আছে জাতির জীবনে ঘটবে সুন্দরের আবির্ভাব। অন্ধকার রাত্রি তপস্যা করে পরিচ্ছন্ন প্রভাতের জন্যে। আমাদের সেই তপস্যা সুরু হোক—এই 'পরম সুন্দর'কে স্মরণ করে।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (রামধনু)

প্রায় দু' হাজার বছরেরও আগে চাণক্য পণ্ডিত বলেছিলেন "রাজা শুধু নিজের দেশের লোকের কাছেই সম্মান পান, কিন্তু বিদ্বানের সম্মান সর্ব্বত্র"। কথাটা যে কি রকম খাঁটী, কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

আমাদের এক বন্ধুর দেশ ভ্রমণের বাতিক ছিল। তাঁর কাছে শুনেছি, যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই তাঁর দেশ কোথায় জানতে চেয়ে লোকে যখন শুনেছে তিনি ভারতবাসী, তখনই তারা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে জানতে চেয়েছে—তিনি কি 'তাগোরের' (টেগোর—অর্থাৎ ঠাকুর) দেশের লোক ? তাঁর কাছে 'তাগোরের' গল্প শুনবার জন্য সে সব দেশের লোকেরা বিশেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা কি আকুল আগ্রহই না দেখিয়েছে। বন্ধুবর বলেন, "সে গল্প করতে করতে আমার বুকখানা যেন গর্ব্বে দশ হাত ফুলে উঠ্‌ত। মনে হ'ত, "হুঁহুঁ, দেখ তোমরা, আমি যে সে লোক নই—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক।"

পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় দেশ থেকেই রবীন্দ্রনাথ কোন না কোন সময়ে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং যখনই সেখানে গেছেন রাজার অধিক সম্মান পেয়েছেন। এখন যে জার্ম্মানীতে ইহুদী ব'লে আইন্‌ষ্টাইন্‌এর মত লোকের স্থান হ'ল না, নোবেল পুরস্কার পাবার পর একবার সেই জার্ম্মেনীরই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি সেখানে বক্তৃতা দেবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল্ ঘর এবং তার আশপাশের বারান্দা, সিঁড়ি লোকে গিস্‌গিস্ করছে। তার মধ্যে ছাত্রছাত্রী এবং বাইরের লোক সবাই আছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হল্ নয়, তার সামনের রাস্তাও হাজার হাজার লোকের ভিড়ে এমন জমাট বেঁধে গেছে যে তার ফাঁক দিয়ে একটি লোকেরও ভিতরে ঢুকবার সাধ্য নেই। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ এলেন ; কিন্তু ভিড়ের এমন অবস্থা যে তাঁকেও ভিতরে নেওয়া সম্ভব হ'ল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক চীৎকার ক'রে বল্লেন, "প্রাচ্যের কবি আজ আমাদের অতিথি। তাঁকে দেখবার জন্য এত লোক জমেছে যে তাঁকে ভিতরে আনতে হ'লে কতক লোককে হল্ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।" অধ্যাপকের কথা শুনে পাঁচ ছ'শ ছাত্র তখনই হল্ থেকে বেরিয়ে এল তখন বহুকষ্টে কবিকে ধ'রে বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

আর একবার রবীন্দ্রনাথ কোপেনহেগেন যাচ্ছেন। দুপুর রাতে তাঁর ট্রেন্ কোপেনহেগেন সহরের প্ল্যাটফর্ম্মে এসে হাজির হ'ল। সেখানে তখন রক্ত-জমাট করা শীত,—চারদিকে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মশাল জ্বেলে কবিকে অভ্যর্থনা করতে ষ্টেশনে হাজির হয়েছে। শুধু হাজির হওয়া নয়, সেই দুরন্ত শীত অগ্রাহ্য ক'রে তারা কবিকে নিয়ে মিছিল ক'রে তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়ে তবে ছাড়্‌ল।

কবি যখন চীনে যান তখন সেখানকার ছাত্ররাও তাঁকে কম সম্মান দেখায় নি, চীন সরকারের কাছে তারা অনুরোধ জানাল—প্রাচ্যের এত বড় কবিকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে। তাঁর থাকবার জায়গা দিতে হবে চীন-সম্রাটের বাড়ীর পাশে। জাপানীরাও রবীন্দ্রনাথকে কম সম্মান দেখায় নি। তাঁর জাপান ভ্রমণের বিবরণ থেকেই তা জানা যায়। আর একবার রবীন্দ্রনাথ এক বৃটীশ জাহাজে ক'রে বিলেত যাচ্ছিলেন, পথে এক জাপানী জাহাজের সঙ্গে দেখা। জাপানী জাহাজের লোকেরা কি ক'রে জানতে পেরেছিল যে ঐ জাহাজে কবি রবীন্দ্রনাথ আছেন। তারা তাদের ক্যাপ্‌টেনকে বল্‌ল, তারা কবিকে একবার দেখবে। ক্যাপ্‌টেন তখনই ওয়ার্‌লেসে বৃটীশ জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্‌কে অনুরোধ করলেন, তাঁদের জাহাজখানা যেন একটু সময়ের জন্য জাপানী জাহাজটার পাশে আনান হয়। দুই জাহাজ পাশাপাশি দাঁড়াল। মহাসমুদ্রের বুকের উপর ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে বিদেশী জাহাজে তাদের বিদেশী কবিকে সম্মান জানিয়ে আবার জল কেটে ছুটতে লাগ্‌ল।

২২শে শ্রাবণ

শ্রীনরেন্দ্র দেব (পাঠশালা)

অশ্রুজলে যারা আজ করিছে তর্পণ
তোমার যাত্রার তিথি—বাইশে শ্রাবণ,
তাদের করিও ক্ষমা ; কৃপাপাত্র তারা ;
তুমি যে গো মৃত্যুঞ্জয় জানেনা তাহারা !

দিনান্তে বিদায় নিলে—স্বল্প-আয়ু কেহ
বিয়োগ ব্যথায় তার প্রাণহীন দেহ
যেমন শোকার্ত্তে ঘিরি করে হাহাকার—
তোমার অভাবে আজ সেই সবাকার
'বাইশে শ্রাবণ' করে নয়ন সজল,
করে তারা স্মৃতি-পূজা—ক্ষুদ্রের সম্বল,
বর্ষে বর্ষে উদ্‌যাপিত করে মৃত্যু-তিথি
যেটা শুধু সামান্যেরে শ্রদ্ধাদান নীতি !

কিন্তু যারা অসামান্য—সপ্তলোক প্রিয়,
পরম প্রীতির পাত্র—আত্মার আত্মীয়,
তাদের বিচ্ছেদ কভু ঘটেনা জগতে
যাত্রী তারা চিরঞ্জীব অনন্তের পথে।

তুমি কবি কালজয়ী ভাস্বর ভাস্কর
লোকোত্তর প্রতিভার মূর্ত যুগন্ধর ;
প্রজাপতি বরপুত্র ভূমালগ্ন প্রাণ
তোমার জীবন শিখা চির-অনির্বাণ !

মৃত্যু নাই মর্ত্যলোকে ঋষি ও দ্রষ্টার
সৃষ্টির আদর্শ যিনি নিখিল স্রষ্টার—
নশ্বর নহে সে সত্তা—চির অবিনাশী,
অবিচ্ছিন্ন মনোরাজ্যে মর্ম-লোক-বাসী !
মহাপুরুষের কভু নাহি যে মরণ
একথা বোঝেনা—যারা মূঢ় সাধারণ !

তুমি এসেছিলে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ
তব কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে শাশ্বতের গান,
শুভ নববর্ষে শ্রুত মন্ত্র-পূত ডাক্—
চিরস্মরণীয় তাই পঁচিশে বৈশাখ !

মানি তব আবির্ভাব—নহে তিরোভাব ;
ভুবনে অক্ষয় তব অমৃত প্রভাব ;
অনন্ত ঐশ্বর্য তব—অন্তহীন দান—
আনন্দে ভরিবে নিত্য নিখিলের প্রাণ ;
তোমার প্রসাদে মোরা চিরন্তন ধনী—
'বাইশে শ্রাবণ' তাই তুচ্ছ মনে গণি !

শতশতাব্দীর সূর্য্য

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (ভাইবোন)

গ্রন্থাবলী পড়তে তোমার মন চ'লে যায় তেপান্তরে ;
মন চ'লে যায় জিন্ ক'সে কোন্ পক্ষীরাজের পিঠের পরে !
মেঘমালাকে দিগ্‌বালারা জড়িয়ে যেথায় নৃত্যবিভল,
নীল্‌গিরি আর ঝর্ণাধারার মধ্যিখানে কার গৃহতল ?
রামধনু রং বিচ্ছুরিত পীত বরণের মঞ্জরীতে,
মন চ'লে যায়, মন গ'লে যায় বন-সায়রে সন্তরিতে।

তোমার গানের গুঞ্জরণে জাগে নতুন স্বপন্ যত !
আজ কবি তাই তোমার তরেই উচ্ছ্বাসে হই অসংযত।
চিন্তা যত বুকের কোনে গোপন ছিল আঁধার-কোলে,
ভোর্ আলোতে জোর গলাতে ছড়িয়ে দিলে কী কল্লোলে !
ছড়িয়ে দিলে ভরিয়ে দিলে বিশ্বভুবন্ কোন্ সুবাসে ?
দুঃখদিনের ঝড়বাদলে ঐ বুঝি মোর বন্ধু আসে !

অশ্রুজলের পিছল্ পথে যে সুন্দরের পায়ের ধ্বনি,
সঙ্গীতে তার আভাষ দিলে, যার আসা হায় চিরন্তনী !
কাব্যে তোমার বাঞ্ছিতকে উদাস হিয়া ধরতে ছোটে।
হৃদ্‌কমলের নবীন কলি নিদ্‌মহলের মধ্যে ফোটে।
তোমার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙেছে হাজার যুগের,
মুগ্ধ মনের ভাব জেগেছে দৃষ্টিতে আজ মিষ্টি মুখের !

আজ্‌কে ভালোলাগার সনে ভালোবাসার আমেজ লাগে।
তোমার গানে গানে কবি প্রাণে প্রাণে আবেশ জাগে।
তাইত' তোমায় আপন ভেবে আসন পেতে সবাই খোঁজে;
কাজলকালো বাদল রাতে তোমার ধ্যানে নয়ন বোজে।
তাইত' তোমার জন্মতিথি মন্‌মোহিনী আশায় ভরা ;
তাইত' তোমার মৃত্যুদিনে অশ্রুমুখী বসুন্ধরা !

শ্রদ্ধা-নিবেদন

নির্ম্মল বসু (কিশোর বাংলা)

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সাধনা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ও আলাপ আলোচনা করে অনেকেই দেখাবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবন দেশের ও জাতির সেবায় ব্যয় করে গেছেন। তাঁর সাধনা ও ত্যাগের কথা সবাই জানে। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে তিনি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের যে মহান স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই বাস্তব রূপ তাঁর বিশ্বভারতী, তাঁর শান্তিনিকেতন। তোমরা যখন আরো বড় হবে তখন দেখবে, অনুভব করবে একটা মানুষের ভেতর অধঃপতিত অত্যাচারিত জাতির নবজাগরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি কাজের মধ্যে, ভাবনার মধ্যে প্রতিদিনকার জীবনে উচ্চারিত হতে হতে কেমন করে তা আত্ম-বিস্মৃত জাতির অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়েছিল।

তবে কি জানো, কবির চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের অন্তরের কিছুটা যোগ থাক্‌লেও সবটা যোগ স্থাপিত হয় নি, তাই আমরা তাঁর চিন্তাসঙ্গী হতে পারি নি। তাই সমস্ত দিক থেকে তিনি এগিয়ে গেলেও—তাঁর পথটা আমরা ঠিক অনুসরণ করতে পারি নি, তাঁর চিন্তাধারা ও কাজকে অনুধাবন করতে পারি নি—তাই ভুল হ'য়েছে পদে পদে, এগিয়ে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে পেছিয়ে পড়েছি।

তাই আজকে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে একটা কথা আমার বার বার মনে হ'য়েছে যে তাঁকে বুঝতে হলে, জান্‌তে হলে, চিন্‌তে হলে, তাঁর কর্ম্মধারা, তাঁর ত্যাগ ও তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করতে হবে। তা যদি তোমরা সমবেত ভাবে পারো, তাহলে দেশ ও জাতির মুক্তি সাধনার বিঘ্নবহুল পথটাকে সহজগম্য করে আন্‌বে। তখনই হবে কবির প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-স্মৃতি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কৈশোরক)

গ্রামের স্কুল ছাড়িয়া ঢাকা সহরে আসিয়া থাকিতাম হিন্দু হোষ্টেলে। হোষ্টেলটির নাম ছিল ঢাকা রাজচন্দ্র হিন্দু হোষ্টেল। এই হোষ্টেলটি স্থাপনের জন্য ঢাকার একজন বড় জমিদার প্রতাপচন্দ্র দাস মহাশয় অনেক টাকা দিয়া তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য নাম রাখিয়াছিলেন—রাজচন্দ্র হিন্দু হোষ্টেল। ঢাকা সহরের মালিটোলার গলিতে এই বাড়ীটি ছিল—সে বাড়ীটি এখনও আছে। প্রথম জীবনের কয়েকটি বৎসর সেই হোষ্টেলে কাটিয়া গিয়াছে। সে সময়ে সে বাড়ীতে ঢাকা কলেজ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও গভর্ণমেণ্ট সার্ভে স্কুলের ছাত্রেরা থাকিয়া পড়া শুনা করিতেন। হোষ্টেলের তত্ত্বাবধান করিতেন একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমাদের সময়ে কলেজের হেডক্লার্ক, কলেজের অধ্যাপক ও কলেজিয়েট স্কুলের প্রবীণ শিক্ষকদেরও কাহাকেও কাহাকেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করিতে দেখিয়াছি। এই হোষ্টেলের ছাত্রেরা সেকালে পরস্পর পরস্পরকে পরম প্রীতি ও স্নেহের ডোরে বাঁধিয়া বাস করিতেন। সে সময়ে যাঁহারা ঢাকার হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে এই বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কতজন খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কতজন পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, সে হিসাব এখন করা কঠিন। পরলোকগত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি চ্যাটার্জ্জির (বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কথা মনে পড়ে, তিনি হোষ্টেলের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিতেন ; তাঁর সেই কিশোর বয়সের দিব্য সুঠাম গৌর তনু ও প্রতিভাদীপ্ত মুখশ্রী এখনও মনে পড়ে। এইত সেদিন তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন।

সেকালে রাজনীতির হুজুগ কোথাও বড় বেশী ছিল না—ঢাকাতেও নয়। সাহিত্য বলিতে স্বর্গত সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষের কথাই সকলে বলিতেন। তিনি তখন সগৌরবে 'বান্ধব' পত্রিকা পরিচালনা করিতেন—আর 'প্রভাত চিন্তা' 'নিভৃত চিন্তা' 'নিশীথ চিন্তা' প্রভৃতি 'চিন্তার' বই একটির পর একটি প্রকাশ করিতেছিলেন। আমাদের হোষ্টেলের একজন বি. এ ক্লাশের ছাত্র একদিন আমাকে বলিলেন :—ওরে রবিবাবুর নাম শুনেছিস্ ? আমি বল্লাম—শুনেছি, যিনি কবিতা লেখেন। তবে তাঁর কবিতাত পড়ি নি। শুধু শোনা কথা মাত্র। ওই ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় ২৭।২৮ হইয়াছিল। কয়েকবার বি. এ ফেল করিয়াছেন। ইঁহার বেশ কালো লম্বা দাড়ি ছিল। সেজন্য তাঁকে ওই দাড়ির গুণেই বোধ হয় হোষ্টেলের ছাত্রেরাও যেমন, তেমনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত সমীহ একটু করিতেন। আর তিনি ছিলেন যাঁকে বলে লীডার জাতীয় লোক। ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন, আবার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ঢাকা আসিলে নগর কীর্ত্তনেও যোগদান করিয়া বাতাসা বিলির ভার লইতেন এবং হরির লুঠে বিনা আহ্বানে ভক্তদের মধ্যে মিলিয়া সন্দেশ বিতরণের ভার নিতেও তিনি আলস্য করিতেন না। আবার আমাদের হোষ্টেলের ছাত্রদের খাওয়া দাওয়া বা অন্য কোনও ব্যবস্থার সামান্য ত্রুটি হইলে—সকলের পক্ষ হইয়া ওকালতি করিতেন। আমরা হোষ্টেলের প্রায় সকলে তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। আমাকে যদি তোমরা এখন তাঁহার নাম কি ছিল জিজ্ঞাসা কর তবে ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। আন্দাজি নাম দিতে গেলে তিনি যদি আমার এই লেখা পড়েন তবে রাগ করিতেও ত পারেন। জানিনা তিনি আজও জীবিত আছেন কিনা—থাকিলে তাঁহার বয়সও আশীর কোঠায় গিয়া পৌছিয়াছে। তবু তোমাদের বুঝিবার জন্য নাম দেওয়া গেল রসিক দাদা !

একদিন রসিক দাদা, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া বুক পকেটে কাপড়ের একটা ফুল গুঁজিয়া লম্বা একটা

লাঠি হাতে করিয়া হোষ্টেলে আসিলেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বুঝাইয়া দিলেন—ঢাকায় শীঘ্রই যে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইতেছে তাহাতে তিনি একদল ভলেন্টিয়ারের কাপ্তেন হইয়াছেন। রসিক দাদা বলিতে লাগিলেন বাঙ্গালা দেশের যত সব বড় লোকেরা ঢাকা আসছেন—আর সব চেয়ে আনন্দের কথা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আস্‌বেন। রসিক দাদা আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তার কারণ ছিল, আমি সেই বালক বয়সেই কবিতা লিখিতাম। আর রসিক দাদা ছিলেন সে কবিতার সমঝদার। তিনি শুধু আমাকে বাহবা দিতেন। তাঁহার মুখে কতদিন জ্যোছনা রাত্রে হোষ্টেলের ছাদে আমরা যখন গ্রীষ্মকালে হাওয়া খাইতে বসিতাম তখন গান শুনিতাম—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোম রি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।

রসিক দাদা তাঁহার দাড়ি দোলাইয়া সবলে বাহু আন্দোলন করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটি যখন গাহিতেন তখন আমরা একটু তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া বসিতাম, পাছে তিনি অক্ষম দুর্ব্বল বাহুর বীরত্ব দেখাইতে এবং অসির কলঙ্ক-মলিন ভাব দূর করিবার জন্য আমাদের দেহের উপরই তাহার পরীক্ষাটা করেন এই ভয়ে, কেননা দুই একবার এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে।—এই রসিক দাদা সত্য সত্যই ছিলেন সদানন্দময় পুরুষ। আমি এই রসিক দাদার কৃপায়ই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। রসিক দাদা ভলান্টিয়ারের ক্যাপ্টেন হইয়া প্রাদেশিক সমিতির কাজে নানাদিকে ছুটাছুটিও করিতেছিলেন খুব। তিনি আমাকে এক সময়ে বলিলেন—যোগীন্, রবিবাবুকে যদি দেখতে চাস্ তবে কাল আমার সঙ্গে আসিস্, তাকে দেখতে পাবি। আজ সব বাঙ্গলাদেশের বড় বড় লীডাররা এসে পৌছবেন। I am very busy—একটি ষ্টেসনে যেতে হবে। পরের দিন রসিক দাদা প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিলেন না এবং সভা গৃহের মধ্যে একটি বেশ ভাল যায়গা দেখিয়া আমাকে বসাইয়া দিলেন। রসিক দাদা অন্যান্য ভলেন্টিয়ারদেরও আমার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেলেন। তাঁহারাও আমাকে ছোট মানুষ বলিয়া বিশেষ আদর যত্নও করিয়াছিলেন।

সেদিন দেখিলাম ঢাকা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সব বড় বড় লোকেরা সভাস্থল পূর্ণ করিয়াছেন। তখন ঢাকা সহরে 'ক্রাউন থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার ছিল। সেই থিয়েটার হলে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন স্বর্গত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রাউন থিয়েটার এখন আর নাই। সেখানে এখন জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ী। আর সে সময়ে তাহার পেছনে যে বিস্তৃত মাঠে আমরা ক্রিকেট দেখিতাম সেখানে এখন জগন্নাথ কলেজের বিরাট অট্টালিকা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

একটি আশ্চর্য্যের কথা এই যে সভাপতি মহাশয়কে দেখিবার জন্য জনতার যতখানি আগ্রহ ছিল তার চেয়ে বেশী আগ্রহ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে। দেশের অন্যান্য নেতাগণের সহিত রবীন্দ্রনাথ আসিলেন যেন গ্রীক্ ভাস্করের খোদিত এপোলো দেবতার মূর্ত্তি। সভাস্থলে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি হইল। সকলে উচ্ছসিত ভাবে নেতাদের অভিনন্দন করিলেন। আমি অপলকে রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব্ব দেবকান্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। দীর্ঘ ঋজুদেহ। মাথায় দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ—স্কন্ধে ও বক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে গুচ্ছে গুচ্ছে—চোখে চশমা। গায়ে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি ও সুন্দর উড়ানি। পরিধানে জরিপাড় দেওয়া

ক্ষ পক্ষীর পালকের মত পরিচ্ছন্ন ধুতি—পায়ে রাউলপিণ্ডির সাদা জুতা। তাঁহার উজ্জ্বল সহাস্য মুখমণ্ডল এবং দীপ্ত প্রতিভা গরিমায় প্রতিভাত চক্ষু দুইটি হইতে যেন আনন্দের অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িয়াছে! সভাপতি নির্বাচিত হইল। সম্ভবতঃ কালীপ্রসন্ন ঘোষ কি আনন্দ রায় মহাশয় সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন উদ্বোধন সঙ্গীত। 'অয়িভুবন মনোমোহিনী।" সে সুরতরঙ্গ সারা সভাখানিকে জনগণকে কোথায় যেন কোন সুরলোকে লইয়া গেল। তাঁহার মধুর কণ্ঠে গীত হইল :

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী!
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল,
অনিল বিচুম্বিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী!

তখন আমরা যেন চোখের সম্মুখে ভারতের বিরাট দৃশ্য দেখিতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের মুখে সেদিন আবেগপূর্ণ কণ্ঠে যে সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, জীবনে তেমন শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সভাপতি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার পরেই সেই ইংরাজী বক্তৃতাটি আগাগোড়া বাঙ্গালাতে বলিতে লাগিলেন। সেকি সুর—সেকি কণ্ঠধ্বনি—রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সেই বাণী মূর্চ্ছনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন সে কণ্ঠের ঝঙ্কার বীণার মধুর সুরলহরী লীলার সঙ্গেই মাত্র তুলনা করা চলে। সভাশেষে সকলের মুখে মুখেই শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা, তাঁহার গানের, তাঁহার বাণীর, তাঁহার অপরূপ দেহ, সৌন্দর্য্যের এবং বিনয়পূর্ণ সম্ভ্রম ব্যঞ্জক ব্যবহারের।

তোমরা যদি পঞ্চাশ বৎসর আগেকার পাঠ্যপুঁথি খোল, তাহা হইলে কোথাও রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও সঙ্কলিত দেখিতে পাইবে না। আমরা সেকালে পদ্যপাঠ তিনভাগ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়িয়াছি। তাহাতে রবি বাবুর কোনও কবিতা সঙ্কলিত হইত না—কাজেই আমাদের কি গ্রামের স্কুলে কি সহরের বিদ্যালয়ে আসিয়াও রবিবাবুর কবিতা পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এমন কি সে সময়কার এণ্ট্রান্স স্কুলের কোন বাঙ্গালা বইতেই রবিবাবুর কোন কবিতা আমরা পড়ি নাই। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মত কি নয়? আমি হোষ্টেলে আসিয়া আমার দাদা স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও মামা নলিনীকান্ত সেনের কাছে আব্দার করিলাম আমাকে তোমরা রবিবাবুর একখানা বই কিনে দাও না?

আমি রবিবাবুকে দেখিয়াছি, তাঁহার মুখের গান শুনিয়াছি এ সংবাদে তাঁহারা খুবই খুশী হইলেন এবং সত্বরকার আমাকে লইয়া চলিলেন রবীন্দ্রনাথের বই কিনিবার জন্য। ঢাকাতে তখন খুব বেশী বইয়ের দোকান ছিল না। ষ্টুডেন্স লাইব্রেরীই ছিল প্রধান। তোমাদের কাছে একথা হয়ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে কিন্তু অতি সত্যকথা যে রবীন্দ্রনাথের রচিত একখানা বইও আমরা কোথাও পাইলাম না। একদিন যাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি সারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবী গৌরবান্বিত করিয়াছে, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা কবিতার সংবাদ সে সময়ে বা কয়জনেই রাখিতেন। ঢাকা সহরেত নয়ই। আমরা অবশেষে ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী হইতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত একখানি 'হাসি ও খেলা' কিনিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা সঙ্কলিত ছিল।

সেই 'হাসি ও খেলা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি প্রথম পড়িলাম সে কবিতাটির নাম, 'বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান।' বাসায় আসিয়া মনের আনন্দে পড়িতে লাগিলাম—

দিনের আলো নিবে এলো, সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ওপারেতে বিষ্টি এলো ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এলো বান।

কবিতাটির সাথে একখানি সেকালের উড্‌কাট ছবি ছিল। ছবিতে ছিল নদীর ওপারেতে মন্দির দেখা যাইতেছে, বর্ষার ধারা অজস্র ধারে নদীর জলে ঝরিয়া পড়িতেছে। সংস্করণের বই দেখিলাম—দেখিলাম সেই উড্‌কাট ছবিখানা এখনও আছে। দেখিয়া শৈশবের কত কথাই না মনে পড়িল।

এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে এমন আনন্দ হইত যে আমি বারবার পড়িয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না—মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং সকলকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া তবে তৃপ্তিলাভ করিতাম।

আমাদের সময় স্বর্গত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কঙ্কাবতী' নামে একখানি ছোটদের উপন্যাস বাহির হইয়াছিল, সে বইখানা আমি পড়িয়াছিলাম। আর আমার দিদিমা বলিতেন অফুরন্ত রূপকথা। তিনি যে কত সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প বলিতেন সে সব এখন সব মনেও নাই। এজন্য এই বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কবিতার সুয়োরাণী দুয়োরাণী ও কঙ্কাবতীর সহিত আমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল, তাই আরও আনন্দের সহিত উহা পড়িতাম।

'মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেওয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্‌-ঝুপ্‌-ঝুপ্‌—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ্‌।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর্‌-টুপুর্‌ নদেয় এলো বান॥'

আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া একটি ছোট নদী প্রবাহিত। সেই নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া আমরা সেই ছেলেবেলার মেঘলা দিনে দেখিতাম ওপারে বিষ্টি নামিয়াছে, গাছপালাগুলি ঘন বর্ষণ ধারায় ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে—ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে—সেই চোখে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে কবির বর্ণনা মিলিয়া যাইত—তাই মুগ্ধ হইয়া এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে ভাবিতাম নিশ্চয়ই কবি, আমাদের গ্রামের এই ছোট নদীর পারে এক মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ় প্রভাতে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে সেই যে প্রথম দেখিয়াছিলাম, যে দুইদিন তিনি ঢাকা ছিলেন—সে দুইদিন স্কুল কামাই করিয়া কোথায় গেণ্ডারিয়া—স্বর্গত দীননাথ সেন মহাশয়ের বাড়ী তিনি গান গাহিতে গিয়াছেন, কোথায় নদীর পারে যে বাড়ীটিতে তিনি ছিলেন—সেই বাড়ীর পাশে কেবলি আমরা ছেলের দল জটলা করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কাছে যেতে সাহস হইত না। তারপর কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি কত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি। এবং সেবার যখন রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন—তখন বুড়ীগঙ্গার মধ্যস্থ বোটে দুই তিন ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে আবার আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন আমি তাঁহাকে ছেলেবেলায় তাঁহাকে এই প্রথম দেখায় গল্প বলিয়াছিলাম তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—'কেন তোমরা এলে না তখন, কত খুশী হতাম তা হলে।'

তোমাদের কাছে সেই ছেলেবেলার গল্পটি আজ বলিলাম। সেই যে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখিয়া মনের মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম—সেই আনন্দ সেই উৎসব ও শ্রদ্ধা ও ভক্তি যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিনই অতীতের সেই স্মৃতি-মুহূর্ত্তগুলি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঢাকা সহরে সে সময়কার আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন—মহাষ দেবেন্দ্রনাথের তপস্যার ফল।

আমারও সেই কথাই মনে হয়—যুগে যুগে পৃথিবীতে কল্যাণ-প্রদীপ হস্তে মহামানবেরা আসেন, সে প্রদীপের জ্যোতিঃতে অন্ধকার দূর হইয়া সমগ্র জাতি ও সমাজ নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুক্তিপথের সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মুক্তিপথ প্রদর্শক ঋষি—মহাতাপস। তিনি দেশ ও জাতিকে উন্নত—জাগ্রত ও মহিমান্বিত করিতে আসিয়াছিলেন—লীলা শেষে চলিয়া গিয়াছেন। —কবি তোমায় নমস্কার।

অমর রবীন্দ্রনাথ

বাগ্‌বান
পরিচালক, মুকুলের মহফিল "আজাদ"

আমরা সাধারণতঃ দেখে আসছি, কবি ও সাহিত্যিকদের মৃত্যুর পরে তাদের লেখার বিচার শুরু হয়। তিনি জাতিকে কি দান দিয়ে গেলেন, কী দাম তার, কতদিন স্থায়ী হবে সে ঐশ্বর্য্য, তা নিয়ে যাচাই হতে থাকে সমালোচকদের কষ্টি পাথরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। যুগজয়ী প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য উদয়ের সাথে সাথে দুনিয়াকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। আজ সে সূর্য্য অস্তমিত। তাঁহার মরদেহ আজ অনন্তে বিলীন, কিন্তু তাঁর অমর প্রতিভা কালজয়ী, তার বিনাশ নাই, তাঁর দান অক্ষয়।

রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন, এই প্রশ্ন যদি মনে উদিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে একথাও জিজ্ঞাসা করতে হয়, রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন না? আমাদের বাঙ্গলার কবি শুধু বাঙ্গালীর কবি ছিলেন না, দেশ ও কালের গণ্ডী কাটিয়ে তাঁর আসন রচিত হয়েছিল বিশ্বের মনীষীর দরবারে। তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে যে সুধা ক্ষরিত হয়েছে, তা তিনি শুধু বাংলাকে পান করান নি, দুনিয়ার সুধী-সমাজ তা আকণ্ঠ পান করে ধন্য হয়েছে; তাই তিনি শুধু বাংলার কবি নন—তিনি বিশ্ব-কবি।

সাধারণতঃ যাঁরা কবি, কাব্য রচনাই তাঁদের ধর্ম্ম, যাঁরা নাট্যকার, তাঁরা নাটকই রচনা করে থাকেন, উপন্যাসিকদের কাজ শুধু উপন্যাস রচনা করে যাওয়া; এদের প্রতিভা একমুখী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। একাধারে তিনি ছিলেন কাব্য, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস, রাজনৈতিক-সাহিত্য প্রতিভার বেগবান প্রস্রবন। এর প্রত্যেকটী ধারা শক্তির প্রাচুর্য্যে ভরপুর। প্রতিভার এত বড় জ্যোতিস্কের সাক্ষাত জাতির ভাগ্যে শতাব্দিতে একবার ঘটে কিনা সন্দেহ। আমরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। কখনও তাঁকে দেখি ক্ষ্যাপা বাউল রূপে; তাঁর গানের মধ্য দিয়ে উদাসী পাগলের একতারার সুর ভেসে এসে মনকে মাতাল করে দেয়; তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে মহাসাধক দার্শনিকের ভাব-গম্ভীর রূপ; তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর রুদ্র-সংস্কারকের নিষ্করুণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি। আবার যখন দেখি:

খবর পেলেম কল্য
তাঞ্জামেতে চ'ড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চল্‌ল।
সময়টা তার জলদি কাটে;
পৌছল যেই হলদিঘাটে,
একটা ঘোড়া রইল বাকী
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরাণহাটায় পৌছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল॥

তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সকল গাম্ভীর্য্যের ভিতর থেকে একটী শিশু-মন মাথা তুলে খিলখিল করে হেসে উঠছে।

চিন্তার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের দান সীমাবিহীন, ভাব-জগতের সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের দান বিপুল, তবুও তাঁর অবসরহীন জীবনে শিশুদের জন্য যে স্থানটুকু ছিল, তাও সামান্য নয়। রূপকথার ঠাকুর্দ্দার মত তাঁর ঝোলাঝুলি পূর্ণ থাকত সহজ রচনার ল্যাজেঞ্জুস্ আর চকোলেটে। তিনি লিখেছেন :

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো॥

তেমন সহজ নয় যা-তা লেখা, তাই সহজ লেখার জন্য কলম ধরেছিলেন ওস্তাদ—শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। এবং রবীন্দ্রনাথের সহজ লেখাই আজ বাংলার শিশু-চিত্তকে জয় করতে সমর্থ হয়েছে।

রংমশালের মশাল-ধারীরা তাঁদের মশালের রঙীন আলোয় রবীন্দ্র প্রতিভার ভাণ্ডারের মধ্যে রত্নের সন্ধান করছেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, যে ভাণ্ডারের মধ্যে রত্ন ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে সন্ধানের প্রয়াস কি পণ্ডশ্রম নয় ? আজ শ্রাবণের সন্ধ্যায় এই কথাই ভাবছি ; ভাবছি রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার কথা অবাক বিস্ময়ে এমন সময় পাশের বাড়ী থেকে গান ভেসে এল, রবীন্দ্রনাথেরই গান :

শ্রাবণের গগণের গায়
বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় থাকি থাকি
শর্ব্বরী শিহরিয়া ওঠে হায়।

গান শুনে মনে হল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়নি ; রবীন্দ্রনাথ দুনিয়া থেকে চির-বিদায় নিতে পারেন না ; গানের মধ্য দিয়ে যে তাঁর স্বর্গ-মর্ত্তে আসা-যাওয়ার পথ রচিত হয়েছে ! তিনি অমর।

একটি চিঠি

আমার সোনার বাংলার আদুরে ছোট ভাই-বোনেরা,—

আজ আমায় 'রংমশালে'র পরিচালক মহাশয় পত্র মারফত আদেশ করে পাঠালেন ("অনুরোধ" নয় কিন্তু কারণ তিনি আমায় যথেষ্ঠ স্নেহ করেন), যে, তোমাদের জন্যে কবিগুরুর যে পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সংখ্যাখানি প্রকাশ করছেন তার জন্যে কিছু লিখতে হবে কবির সম্বন্ধে।···কিন্তু কি লিখি বলতো ? সূর্য্যের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হয়তো সূর্য্যকে ছোট করে ফেলবো সেই ভয়েই আমার মন বার বার ভীত হ'য়ে উঠছে।···বাসুকির মত যিনি আপন মস্তকে ধারণ করে রেখেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুভার, যিনি ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের অভিভাবক, আজ যে তিনি নেই এই কথাই সকলকে বলতে শুনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামধারী একজন আশীবৎসর বয়ক্রম ক্লান্ত বৃদ্ধকে আমরা হারিয়েছি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইনি। দিনে যিনি সূর্য্য হয়ে আমাদের কল্যাণ সাধনা করেছেন, আমাদের সৃষ্টিকার্য্যকে উৎসাহিত করেছেন, রাত্রে তিনিই চাঁদ হয়ে স্বপ্নময় মায়া বিস্তার করে সৃষ্টিকে শ্রীমণ্ডিত করবেন।

আমাদের পত্র যাত্রায় যিনি ছিলেন আলোর বর্ত্তিকা, আজ এই অন্ধকার পথে তিনি তারা হ'য়ে আলোর সারা মেলে ধরলেন। যে ছিল ভাষা সে হ'লো ভাব, যে ছিল গান সে হ'লো সুর, যে ছিল কর্ম্ম সে হ'লো প্রেরণা, যে ছিল ফুল সে হ'লো সুরভি।

আজ আমাদের ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, আমাদের চলা, কলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবই আজ রবীন্দ্রময়। আজ তাই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা মানে নিজেকে অস্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া মানে নিজের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। আজ তাঁরই কথায় তাঁকেই বলি···"···খোকা সে কি হারায়

আছে আমার চোখের তারায়
লুকিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।"

তোমাদের প্রিয়—
'বিজনদা'

ছুটির ঘণ্টা : দীপালী
শ্রাবণ : ৮০ রবীন্দ্রাব্দ

আবর্তন

আতশবাজ (নবযুগ)

পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তে আকাশের রবি
অস্ত-সাগরে হয়েছে বিলীন, মুছেছে আলোর ছবি।
আবার প্রভাতে উদয় অচলে জাগিবে জ্যোতির রেখা
সবুজ পাতায়, ঝর্ণার বুকে আলোর মিলিবে দেখা।
অস্তরবির ক্ষীয়মান আলো দিয়েছে পথের দিশা—
মহামানবের যাত্রার গান জাগিবে পোহালে নিশা।
কচি-কাঁচা যতো শ্যাম-কিশলায় শুনেছে সে গান কবে
আজি জগতের তাণ্ডব মাঝে জাগে ভৈরব রবে।
শ্রাবন মেঘের শুরু গুরু ধ্বনি ডম্বরু হেন বাজে
তারি মাঝে দেখি রিক্তা ধরণী সেজেছে শ্যামল সাজে।
এই বর্ষণ বাদল-ক্লান্ত দিবসের অবসানে
শরৎ-রবির উদয়ন শুধু আলো-অভিষেক আনে।
মোরা জানি রবি রয়েছে গোপন শ্রাবণ মেঘের পারে
বনময় যতো আছে কিশলয় আহ্বান করে তারে।

দৃষ্টিপথের আড়ালে যদিও, তবু জানি মন মাঝে
আলো-সংগীত অপরূপ সুরে চিরদিন শুধু বাজে।
হংস-বলাকা আজি তাই দেখি চলেছে মেঘের দেশে
বেগের গানের হয় সে উধাও ঘন বাদলের বেশে
হারাণোর শোক নাই এর মাঝে, নাই সে ব্যথার বাঁশী
বিশ্বের মাঝে রয়েছে ছড়ায়ে তারি পরশের রাশি।
শুধু শোন সবে, কাণ পেতে শোন তার আহ্বান বাণী
মহামানবের রথ-নির্ঘোষ অমোঘ শব্দ খানি।
চারিদিকে আজি কুটিল হিংসা সশব্দ পদপাতে
শান্তির দ্বারে ঘন দেয় হানা নৃশংসতার সাথে।
এই যে ঘৃণিত হানাহানি শুধু, অকরুণ বিদ্বেষ
মানবজাতির শিয়রে হানিছে অকৃপণ-মহাক্লেশ,
তারি মাঝে জাগে বিশ্বকবির আহ্বান সংগীত—
মহামানবের আগমন-ধ্বনি জাগায়রে সম্বিত।

কাজের ভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাণিক কহিল, "পিঠ পেতে দিই
দাঁড়াও।
আম দুটো ঝোলে, ওর দিকে হাত
বাড়াও।

উপরের ডালে
সবুজে ও লালে
ভরে আছে, ক'ষে
নাড়াও।

নিচে নেমে এসে
ছুরি দিয়ে শেষে
বসে বসে খোসা
ছাড়াও।

যদি আসে মালি
চোখে দিয়ে বালি
পারো যদি তারে
তাড়াও।

বাকি কাজটার
মোর পরে ভার
পাবে না শাঁসের
সাড়াও।

আঁটি যদি থাকে
দিয়ো মালিটাকে
মাড়াব না তার
পাড়াও।

পিসিমা রাগিলে
তাঁর চড়ে কিলে
বাঁদরামি ভুত
ঝাড়াও।

২৩ চৈত্র ১৩৪৩, শান্তিনিকেতন

[প্রথম প্রকাশিত
রংমশাল (বৈশাখ, ১৩৪৪)

বাড়ি তৈরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাবনায় বাড়ি হবে গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি,
রাধুনি মহল তরে করোগেট্-শীট্ কিনি।
ধার ক'রে মিস্ত্রির বিলগুলো চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত দুড়দাড় কী বিষম শব্দ যে
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্‌খিট্-খিট্‌কিনি।
কী করি না ভেবে পেয়ে আগ্‌রায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে সাবেকটা পাকা বাড়ি
বানাবার মতলবে পোড়ো এক ভিটে কিনি।
তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,
সিঁড়িটা রইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেরই,
তাই নিয়ে গৃহিনীর কি যে নাক-সিট্‌কিনি॥

৫ই বৈশাখ, ১৩৪৪, শান্তিনিকেতন

[প্রথম প্রকাশিত
রংমশাল (আষাঢ় ১৩৪৪)

পাঙ চুয়াল্

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত কাল পাঁচটায়
তেলে ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে
ছিল সাথে খেঁচ্‌কি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
আর ওঠে হেঁচ্‌কি।
মহারোষে তিনুরায়
যেতে চায় আগ্‌রায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে দেলে
পাছে ট্রেন নাই মেলে
ভোরে ওঠে তাই আজ
হাওড়ায় চল্‌ল॥

৫ই পৌষ, ১৩৪৪

[প্রথম প্রকাশিত
রংমশাল (আশ্বিন ১৩৪৫)

"সে"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।

"সে" বলতে কাকে বোঝায় একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিই! পুপুদিদিমণিকে যে গল্প বলি সেই গল্পের প্রধান লোকটি হচ্চে সর্ব্বনামধারী সে। সেই সে থাকে কথা আঁকড়িয়ে, গল্পের বাইরে তাকে ধরা ছোঁওয়া যায় না! এখন যিনি এলেন ইনি হচ্চেন তারি আদিপুরুষ। গল্পের "সে"-কে যখন সরেজমিনে সনাক্ত করার দরকার পড়ে তখন এই অ-গল্পের সে-কে খাড়া করে দিই। দেখে পুপুরাণীর বড়ো চোখ আরো বড়ো হয়ে ওঠে। খুসি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে ওকে খাইয়ে দেয়, লোকটা অসম্ভব রকম জিলিপি ভালোবাসে। আর ভালবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্।

নাম বলিনে কেন? নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিই হয়ে দাঁড়াবেন, আর কেউ হবেন না এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন, তুমিও আছ একজন, সেই আমি তুমি ছাড়া বাকি আর সকলেই তো সে। জগতের সেই অসংখ্য সে-কে নিয়েই গল্প। রাজপুত্তুরও সে, কোটালের পুত্তুরও সে, দুয়োরাণীও সে, সুয়োরাণীও সে। আমার এই রক্তমাংসের সে, যিনি চায়ের টেবিলে এসেছেন, ইনি গল্পের সকল সে-র খোঁটা বললেই হয়। এই খোঁটায় আমার গল্পের সে-গুলিকে বেঁধে ধরে রাখি; এই ব্যাগারের কাজে এঁর বেশ মজা, আর যিনি গল্প শোনেন তাঁর তো মজার অন্ত নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

ও বললে, "আছে।"

চট্ ক'রে ব'লে ফেলো, আমাকে এখুনি বেরতে হবে।

কোথায়?

লাটসাহেবের বাড়ি।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি?

না, ডাকেন না। ডাকলে ভালো করতেন।

ভালো কিসের?

জানতে পারতেন ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে পারি। কোন রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। সে কথা তুমি জানো।

জানি। কিন্তু আজকাল আমাকে নিয়ে তুমি বড়ো বেশী যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফরমাস।

হোক না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও তো।

আচ্ছা বলি শোন।—স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ক্ষিদে গেলনা, উল্টো হোলো, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্‌টর্লনি মন্যুমেণ্ট্। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্য্যন্ত নিলেন চেটে।

বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট হলে বসে জুতো সেলাই করছিল সে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বললে—"আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড় জিনিষটাকে এঁটো ক'রে দিলেন!" "তাবা তোবা" ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ আপিসে খপর দিতে।

স্মৃতিরত্নমহাশয়ের হঠাৎ চৈতন্য হোলো মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দারোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে নিয়ে সেলাম করে বললে, "কোমা ভূ পোর্ত্তে ভূ সি ভূ প্লে।"

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে বললেন, "বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল আমি জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরাল। দুটান টেনে বললে, "তাহোলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবষ্টার ডিক্‌সনারী, দেখুন বিধান কী?

স্মৃতিরত্ন বললেন, "তাহলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।"

পাঁড়ে বললে, "কেন কী করবে, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?"

স্মৃতিরত্ন বললেন, "তুমি খপর পেলে কেমন ক'রে? সে তো পড়েছিল পশুদিন। ছুটতে হোলো উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে; তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।" পাঁড়েজি বললে, "তবে ডাণ্ডায় তোমার কি প্রয়োজন?"

পণ্ডিত মশায় বললেন, "দাঁতন করতে হবে।"

পাঁড়েজি বল্‌লেন, "ও তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তাহোলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হোত।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে গুড়গুড়িটা কাছে নিয়ে দু'টান টেনে "সে" বললে, "দেখো দাদা, তোমাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কেননা তোমার ঐ অসাধারণ ফাউণ্টেন পেন্‌টা স্বয়ং গণেশের শুঁড়-প্রদত্ত বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু না ব'লেও তো থাকতে পারিনে।"

আমি বল্‌লুম, "সঙ্কোচ করতে হবে না, বলে ফেলো।" সে বল্‌লে, "কিচ্ছু না বাড়িয়ে ঠিক কথাটি বলা সব চেয়ে শক্ত; তার চেয়ে সহজ, যথা পরিমাণ বাড়িয়ে বলা; আঠারোআনা বাড়িয়ে বলাটাই নেহাৎ সহজ।"

"চটেছ বলে বোধ হচ্চে।"

"কারণ আছে। আমার খাওয়া নিয়ে পুপুদিদিকে সে দিন যাচ্ছেতাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ ব'লেই দিদি হাঁ ক'রে সব শুনেছিল। কিন্তু অদ্ভুত খাওয়ার কথা যদি বলতেই হয় তারমধ্যে অদ্ভুতের কারিগরি চাই তো।"

"সেটা ছিল না বুঝি?"

"না ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সুদ্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্ষে-বাঁটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাট্‌কা ধরে আনা জলহস্তী আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা চচ্চড়ি, তাহোলে আমি বলতুম ওটা হলো স্থূল, ওরকম লেখা সহজ।"

"আচ্ছা, তুমি হোলে কী রকম লিখতে?"

"বলি, রাগ করবে না! দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়। কম ব'লেই সুবিধে। আমি হোলে বলতুম, তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে, দেখা-বিন্‌তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্ত্তা, আর গিন্নির নাম ছিল, শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুক্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামকুনি দেবি, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিণ্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্য্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানিনে; কাকগুলো বালি জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিনঘণ্টা ধরে। এতো গেল তরকারী। আর জালা জালা ভর্ত্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকস্থটো ফলের ছোবড়াচোঁয়ান। বড়ো

বড়ো জোয়ানরা ঘটি উঁচু ক'রে ধরে ঢালে ঘড়ঘড় ক'রে গলার মধ্যে, ঠোঁটে লাগলে তার রং কিছুতে উঠতে চায় না। তারপরে শিকল দিয়ে খাইয়েদের বেঁধে রাখতে হয়। হঠাৎ কী বুদ্ধি হয় তারা চীৎকার ক'রে বলতে থাকে আমরা জলচর, আমরা পরম পানকৌড়ি। উবুর হয়ে ডাঙায় সাঁৎরাতে সাঁৎরাতে পেটের চামড়া যায় ফেটে, মুখে ফেনা উঠতে থাকে, এমন ঘোরতর মজা। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই, ঝুড়িভর্ত্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দলে দিল, তারপরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে, তারপরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পায়, ভিখিরি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্ত্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজার দাঁতীরা পঞ্চাশদাঁতীর ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরো দাঁতী ওদের বাড়িতে কেটকু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্‌কিয়ে মারা গেল, হাজার দাঁতীর পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুইধারের লোকেরা খেসারতের দাবি ক'রে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত।"

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, "হয়েছে হয়েছে আর নয়। এখন তোমার কী ফরমাস বলো।"

সে বললে, "অসম্ভব গল্প যদি বলতেই হয়, জোড় মিলিয়ে বোলো, যাতে গল্পটা বিশ্বাস করবার মতো হয়। নইলে আজ কাল যা বলছ তা একে আজগুবি, তাতে খাপছাড়া, ওরকম গল্পের সঙ্গে নাম জড়াতে আমার লজ্জা করে।" আমি বললেম, "আচ্ছা এমন ক'রে গল্প বলব, যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু লাটসাহের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়?"

"বোঝায়, তুমি গেলে ছুটি পাই। একবার বস্‌লে তুমি উঠতে চাও না, তাই "তুমি যাও" কথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হোলো।"

"বুঝেছি, আচ্ছা তবে চললুম।"

[প্রথম প্রকাশিত: রংমশাল ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সে। দাম ৵ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

এই সংখ্যায় বিশেষ স্থানাভাবে রংমশালের উপন্যাসগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। আগামী মাসে উপন্যাসগুলি আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার জন্য আমরা গ্রাহকগ্রাহিকাদের কয়েকটি সুন্দর রচনাও পেয়েছিলাম কিন্তু উপরুক্ত একই কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রাহকগ্রাহিকাদের কয়েকটি নির্ব্বাচিত রচনা আগামী গ্রাহকগ্রাহিকা সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চন্দনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল বৃষ্টি হবে বুঝি। আমার সভাসদরা বললে, "ঠাকুরদা, এক সময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে। এখন শোনাও না কেন।" আর একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, "ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।" এমন সময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, "আজকাল আর বুঝি তুমি পারো না" এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতীর মাথায় অঙ্কুশ, আমি বুঝলুম আজ আমার নিস্তার নেই। বললুম "পারিনে তা নয়—পারি। তবে কিনা—"বাকিটা বলা হোলোনা। মনে মনে তখন রাজপুতানা থেকে গল্প তলব করতে আরম্ভ করেছি। খানিকটা কাসলুম। একবার বললুম, "রোসো একবার একটুখানি দেখে আসি কে যেন এল।" কেউ আসেনি। শেষকালে বসতে হোলো।

যমদূত গুলো মোঠের উপরে হাঁদা। একটু নড়তে গেলেই ধুপধাপ ক'রে শব্দ করে আর তাদের শেল শূল ঝনঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।

"সন্ধ্যে হয়েছে পথিক চলেছেন গোরুর বাড়ীতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজ মহলে পৌঁছলে নৌকা নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তার নাম অরজিৎ সিংহ। বাংলা দেশে ছোট কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতানায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ এক সময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ীর চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, "ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন?"

গাড়োয়ান বললে "আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।"

তার পাগড়িটা আড় ক'রে পরাছিল। সোজা করে পরতেই অরজিৎ বললেন, "চিনেছি। ডাকাতের সর্দ্দার পরাক্রম সিংহের চর তুমি। অনেকবার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।"

সে বললে, "ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না চলুন আমার কাছে।"

অরজিৎ বললেন, "উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাপূর্ণ হবে না।" গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক। অরজিৎ বড় ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিল কেড়ে, তিনি এলেন বাংলা দেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরী হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন এই ছিল তাঁর পণ। এদিকে পরাক্রম সিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে, অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয় এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু জাতিতে তিনি অরজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজী নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করিয়ে পরাক্রম বললেন, "ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর ছদিন পরে। তোমার জন্য বর সজ্জা তৈরী।"

অরিজিৎ বললেন, "অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে আপনার শুচিতে মুসলমান রক্তের মিশল ঘটেছে।"

পরাক্রম বললেন, "কথাটা সত্য হোতেও পারে, সেই জন্যেই তোমার মতো কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্যে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাইনে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরুবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা করতে পারো।"

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমন সময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, "আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দ্দারের মেয়ে। আমার নাম রঙন কুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেকদিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম আপনি রাজী হচ্ছেন না। কারণ কি, বলুম আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।"

অরিজিৎ বললেন, "কোন মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না শাস্ত্রে বলেছে।"

"তবে কি আমাকে দেখতে ভাল নয় ব'লে আপনার ধারণা।"

"তাও নয়, আপনার রূপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।"

"তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।"

অরিজিৎ বললেন, "কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্ম্মল কুমারী আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাকে বাঁচিয়ে আনব ঠিক করেছি। তার আগে আর কোথায় আমার বিবাহ হতে পারবে না এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোট, রাজার শক্তি অল্প। বেশিদিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলাম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কি করা যায় তাই ভাবছি।"

মেয়েটি বললে, "আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাতেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ-বনের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরী দেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কি দরকার পথেই জানতে পারবেন। অরিজিৎ চোখ-বাঁধা হাত-বাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্য দিয়ে চন্দনীর পিছন পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহুঁশ কেবল পাহারায় যে সর্দ্দার ছিল সে ছিল জেগে। সে বললে, "চন্দনী কোথায় চলেছ।" চন্দনী বললে, "দেবীর মন্দিরে।"

"ওই বন্দীটি কে।"

"বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।"

সে বললে, "একলা কেন?"

"দেবীর আদেশ, আর কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।"

ওরা বনের বাইরে বাইরে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, "আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।"

অরিজিৎ চললেন দূর পথে। নানা বিঘ্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হোতে লাগল সময় মতো হয়তো পৌঁছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জয় রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক্, কাল হোক্, মুসলমানরা দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহার নিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বুঝলেন, মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্যে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পৌঁছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষেরা তাদের শেষ লড়াই লড়েছে। নির্ম্মল কুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, যতদিন হোক আমি চেয়ে থাকব।"

তারপর দুইমাস চলে গেল। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌঁছলেন। শাঁখ বেজে বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায় ওড়ালো বাসন্তী রঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্য্যন্ত হল আমার গল্প। তারপর বরাবর অভ্যাস মতো শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বারান্দায় হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে হবে করছে। সুধাকান্ত দেখতে এলেন দরজা জানালা ঠিক মতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোন উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে চলুন বিছানায়। কোন সাড়া নেই। পর পর চৌষট্টি ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

গল্পসল্প। দাম ১৲
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে রবীন্দ্রনাথের ছবি ও রচনা এই সংখ্যায় ছাপা হ'ল, সেজন্য তাঁদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—সঃ।

আমার ভাই বোনেরা!

তোমাদের সঙ্গে আমার চিঠি-চিঠি খেলা চলছে কতদিন ধরে। এসব চিঠি তোমাদের মনের মুকুর। চিঠির মধ্যে তোমরা সকলে স্পষ্ট হয়ে ওঠো আমার কাছে, আবার কেউ কেউ নিজেকে প্রকাশ করতে পারো সহজ ভাবে তোমাদের চিঠির মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সকলে জানি বিশ্বকবি বলে, জানি তাঁকে আরো নানারূপে। কিন্তু জানো কি, তিনি চমৎকার চিঠি লিখতে পারতেন—যাকে আমরা পত্র সাহিত্য বলে অভিহিত করতে পারি? তাঁর আগে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে চিঠিপত্র সাহিত্যের একটা অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।

আমরা চিঠি লিখে মনের ভাব প্রকাশ করি, ঘরোয়া খবর লিখে পাঠাই, কুশল জিজ্ঞাসা করি, স্নেহ ভালবাসা প্রকাশ করি। আমাদের চিঠিপত্রের ধারাটা গতানুগতিক, বাঁধা সড়ক ধরে তার যাতায়াত, বৈচিত্র্যহীন তার গতিপথ। এই গতানুগতিক চিঠি লেখার ধারাটাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে বদলে দিলেন। গুণীর হাতে যন্ত্র পড়লে তাকে নিত্য নতুন সুরে বাজান যায় তা তিনি প্রমাণ করে দিলেন। তাঁর চিঠিপত্রের মাঝে কতশত বিষয়ের তিনি যে আলোচনা করে গেছেন সুন্দর ভাবে, তার ঠিক নেই। তাঁর চিঠিপত্রকে অবলম্বন করে আমাদের দেশে পত্র সাহিত্য গড়ে উঠলো।

তাঁর চিঠিপত্রের মাঝে আরো একটা লক্ষ্য করার বিষয় আছে যে ইংরাজী শব্দে কণ্টকিত করে তিনি চিঠি লিখতেন না, যেটা আমরা প্রায়শঃই করে থাকি। মুখে অনেক সময় বলি, ইংরাজি শব্দ বা ভাষা ব্যবহার না করলে নিজেকে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু বাংলা ভাষা কি এত দুর্ব্বল? নিজেকে প্রকাশ করার মত ভাষা বা শব্দের অভাব কি বাংলা ভাষায়? রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এইসব কথার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়। সাধারণ সাহিত্য আলোচনা ছাড়া, অনেক দুরূহ সমস্যা নিয়ে কতশত পত্রের মধ্যে আলোচনা করেছেন তার ঠিক নেই, কিন্তু কোথাও ইংরাজী ভাষা বা শব্দের অহেতুক প্রয়োগ দেখা যায় না। অথচ বাংলা ভাষার মত ইংরাজী ভাষার উপরে তাঁর কম দখল ছিল না। প্রসঙ্গ ক্রমে মনে পড়ছে দু'টী চিঠির কথা। ডায়ার সাহেব পাঞ্জাবে জালিয়ানাবাগে নিরস্ত্র অসহায় নরনারীকে হত্যা করে ইংরেজ রাজত্বের যে পরিচয় দিয়েছিলেন—সে কাহিণী প্রতি ভারতবাসীর রক্তকণিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অসহায় পরাধীন জাতির এই অসহ বেদনা ও ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হলো প্রতিবাদ বাণী। যে প্রতিবাদ রূপ পেলো পত্রাকারে। অদ্ভুত সে পত্র। রাজদত্ত বিজয় মাল্য—রাজপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দিয়ে যে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন, তা অধঃপতিত জাতির সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় সোনার আখরে লেখা আছে। দ্বিতীয় চিঠিখানি মিস্ রুথবেনের অর্থহীন অভিযোগ ও ভারতবাসীর প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তরে লেখা। তখন তিনি রুগ্ন, অসুস্থ। জাতির ও দেশের সমান যেখানে আহত হয়েছে সেখানেই কবি বিস্মৃত হয়েছেন

আপন অসহ্যতার কথা। রুথবেনের প্রত্যুত্তরে সেদিন রোগজীর্ণ মানুষটির কণ্ঠে জাতির সমবেত কণ্ঠধ্বনিত হয়েছে।

১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে যা তিনি অনুভব করেছেন, দেখেছেন, বুঝেছেন তাই প্রকাশ করেছেন পত্রগুচ্ছে। 'রাশিয়ার চিঠি' ভ্রমণকাহিণী হলেও পত্রাকারে লেখা। আজকে কবিকে স্মরণ করে 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে তোমাদের কিছু উপহার না দিয়ে পারলাম না। তোমরা সকলেই বইখানি যোগাড় করে পড়বে।

"...সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো এখনও অনেক বাকী আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে সুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

"...দেশেবিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্য আমরা দুঃখ করবো না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করিনে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলাতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

"...আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি। মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মানুষেরা এদের অধার্ম্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয়, দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।

"...আটবছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।"

"...আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করেছে তার ভালোমন্দ বিচার করার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি মজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে। তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা। কত যুগ থেকে কত ট্যাকসো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্ব্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে...॥" —**রাশিয়ার চিঠি।**

এই চিঠির বায়ুর জন্ত, যাঁরা তোমাদের ভালবাসেন, বাংলাদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবিদের কাছ থেকে পত্রাকারে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু আদায় করে এনেছি। সেগুলিও এই সঙ্গে তোমাদের উপহার দিলাম। এইসব কিশোর-দরদী বন্ধুদের তোমাদের তরফ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি—কারণ অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নিমন্ত্রণে তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

২২শে শ্রাবণকে স্মরণ করে তোমাদের সম্মিলিত হ'য়ে—বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে জানাই স্পর্শহীন শ্রদ্ধা প্রণাম। তোমাদের—

দিদিভাই

দিদিভাই, দেখি হাতে কী ও,—একি
রংমশাল!
আলোতে শিখাতে রাঙাবে কি রাতে
শিশু কিশোরের মনমসাল।
যে আলো জ্বলিল বলো কোথা ছিল
উৎস এর,
কোন্ সে কবির বীণার গভীর
বাণীর আরতি উৎসবের।
দিগ্‌জয়ী কবি কোথা সেই রবি
বিশ্বরাজ,
নিখিল ভারত নিখিল জগৎ—
যাঁহারে হারায়ে নিঃস্ব আজ।
কবে বৈশাখ দিল তাঁরে ডাক
লভিনু তাই;
আবার শ্রাবণে অশ্রু প্লাবনে
চিরতরে তাঁরে দিনু বিদায়।
আলোর বীণার বাজিবে না আর
সে ঝঙ্কার;
প্রেমের বেণুর শুনিব না সুর
চির সুমধুর চমৎকার।
কবি নাই জানি, তবু মনে মানি
নিত্যদিন,—
আছে তাঁর দান চির অফুরান
চির অম্লান মৃত্যুহীন।
গল্পে ও গানে কবিতা-বিতানে
সুধা ধারায়
আছে তাঁর ভাষা, আছে তাঁর আশা,
আছে ভালবাসা, সেকি হারায়।
আজি ধরণীর শুষিছে রুধির
স্বার্থবাদ;—
শুনি ক্ষণে ক্ষণে গগনে পবনে
পীড়িত প্রাণের আর্ত্তনাদ।
দম্ভ ও লোভ হানে বিক্ষোভ
অহর্নিশ;
মর্ত্ত্য মানব মূর্ত দানব
অন্তরে ক্ষরে ঈর্ষা বিষ।
জ্বলে লক্-লক্ প্রলয় পাবক
বিশ্ব ত্রাস!
আসে পৃথিবীর নবসৃষ্টির
পূর্ব্ব লগনে সর্ব্বনাশ।
এ মহা আহবে দিকে দিকে হবে
ইন্দ্রপাত।—
তবু জানি মনে জাগিবে স্মরণে
'মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথ'।
জানো দিদিভাই, হেন নিধি নাই—
তিন লোকে;—
এমন করিয়া নিখিলের হিয়া
কবি বিনা কবে জিনলো কে।

গেয়ে তাঁর গান গা'ক নব প্রাণ
জড় ভারত,
রবির আলোকে বালিকা-বালকে
খুঁজে নিক জয়যাত্রাপথ।
হোক তাঁরি নামে শহরে ও গ্রামে
গ্রন্থাগার;
কবির স্মৃতির পূজা আরতির
নাহি নাহি জেনো পন্থা আর।
করো তাঁর পূজা জানো যেটুকু যা
ভুলো না ভাই।
শান্তি ও প্রেম মোরা পেলেম
সে দানের তাঁর তুলনা নাই।
তোমার আসরে তব স্নেহ ডোরে
বাঁধা যারা,
তাদের মহৎ সাধনার পথ
হোক্ শুভ, হোক্ বাধাহারা।
তুমি জ্বেলে দিয়ো রূপে রমণীয়
রংমশাল,—
প্রেমে উজলিয়ো জন্মতিথি ও
বিশ্বকবির জন্ম সাল।
দিদি, ভাই, তব অন্তরে লভ'
পরশ তাঁর!
সহব্রতীর লহ সুগভীর
শ্রদ্ধা, প্রীতি ও নমস্কার।

—কৃষ্ণদয়াল বসু

দিদিভাই,
রবিবাবুর কথা কিছু লিখতে কবিতাতে
তাগিদ্ করা তোমার চিঠি কাল্‌কে পেলাম রাতে।
কাগজ যখন 'প্রেসে' যাবে, এমনি শুভক্ষণে
হঠাৎ আমার কথা জাগলো তোমার মনে?
যাহোক আমার ভাগ্য ভালো, যাওনি আমায় ভুলে,
তাড়াতাড়ি লিখতে বসি কলমখানা তুলে।
'রবি'র কথা লেখা কি যায় করলে তাড়াহুড়ো?
'রবি'ঠাকুর ছিলেন যেন হিমালয়ের চুড়ো,
আমরা ছোট নুড়ি পাথর, ভুল কি তাতে আছে?
আমরা ক্ষুদে জোনাক্ পোকা দীপ্ত 'রবির' কাছে।
রবিঠাকুর অসীম সাগর, আমরা বালুর কণা,
সাধ্য কি আর তাঁহার কথা করব আলোচনা।
কিন্তু 'তবু' গর্ব্ব মোদের বুকটি ওঠে ঠেলে;
রবীন্দ্রনাথ—রবি ঠাকুর, বাংলাদেশের ছেলে।
এত বড় কবির কথা কে শুনেছে কবে?
এত বড় 'মানুষ' কি আর বিশ্বে আবার হবে?
এত বড় সমালোচক, বক্তা, অভিনেতা,
এত বড় শিল্প-রসিক, এমন স্বাধীনচেতা,
একটি লোকের মধ্যে বলো কোথায় গেছে দেখা?
সত্যি করেই বলছি তিনি একশো ছিলেন একা।
গানের রঙীন রংমশালে ভুবন দিলেন ভরি—
ছন্দে সুরে বিশ্ব জুড়ে ঝর্ণা পড়ে মরি।
এত রূপের, এত গুণের যে জন অধিকারী
ক্ষুদ্র আমি, তাঁর কথা কি বলতে বেশী পারি?
তবু'—তবু' গর্ব্ব আমার বুকটি উঠে ঠেলে
বাংলাদেশের ছেলে তিনি, বাংলাদেশের ছেলে॥

—সুনির্ম্মল বসু

বিশ্বকবিকে বিশ্বের ভিতর থেকে ছোটদের রাজ্যে এতটুকু আসতে বলবে? কেন ডাকবার আয়োজন? তিনি সেখানেই দিনরাত। 'গল্পসল্প' বইয়ের যেমন খানিকটে গল্প আর খানিকটে কবিতে, রবীন্দ্রনাথ আসলে ছিলেন তাই। বড়দের রবীন্দ্রনাথের ভিতরেই ছোটদের রবীন্দ্রনাথের আনন্দ উজ্জ্বল ছুটোছুটি ছিল বলেই, ছোটদের জন্য শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছিল। আমি যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেম, তখন কল্পনা কি করে কাজ হয়ে দেখা দিচ্ছিল, দেখলেম। বিকেলবেলা, আশ্রম শান্ত। ছেলেরা এদিক ওদিক দিয়ে মাঠের পথে বেরিয়ে পড়েছে। আশ্রমের পূবপাশে দক্ষিণমুখো রাস্তা দিয়ে চলেছেন তিনি! সেই দ্বিতীয় দিনে ডেকে নিয়ে আমাকে সঙ্গে। ছেলেদের কথাই হলো। বিদেশের ছেলেদের কথা। দেশের নানা বয়সের ছেলেদের কথা। পুরাণো দিনের কথা। সে সময়ের কথা। কখনো শান্ত চোখ। কখনো দীপ্ত হয়ে উঠছে চোখ তাঁর। কথার চাইতেও মনের ভিতরে যেন তাঁর, কাদের জন্য অসীম আদর উথলে উঠছে। কতক্ষণ হয় কথাবার্ত্তা একটু থেমেছে। দক্ষিণ মাঠে, ছেলেরা একটু দূরে গিয়ে পশ্চিমে ঘুরলে। দেখছিলেম সেইদিকে চেয়ে। বাতাস বেজে উঠলো তাঁর সুরে। আস্তে আস্তে তিনি গাইলেন। 'নব আনন্দে জাগ রে!—' ওই গানটি শুধু। আজও মনে পড়ে গম্ভীর মধুময় সুর, কমল কলির মত সেই ছোট্ট গান। শিহরিত শালবনের ভিতরে সমস্ত আশ্রম যেন জেগে উঠলো। প্রায় আধসন্ধ্যে বেলা! সন্ধ্যে ঘোর হবার আগেই ফিরে এলো ছেলেরা। সন্ধ্যে দীপের সঙ্গে সঙ্গেই গান তাদেরও সুরু হল। সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের বুক জাগায় শুধু একজন, সে রূপকথা। কিন্তু অপরূপ কবিতার মত সেদিনের শান্তিনিকেতনের জাগরণ আমার মনে গাঁথা রইল। শান্তিনিকেতনের কথায় বিশ্ব আজ ভাবছে। যদি রূপকথাকে কেউ সত্য করে থাকে পৃথিবীতে, তবে তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তা করেছেন ছেলেদের জন্য।

মনে মনে যা ভাবছিলে, আমি তা জানি। তা যে হবেই। মনে, শরীরে, কাজে, ছেলেরা গল্প এবং কবিতা দুই-ই হয়ে উঠবে অর্থাৎ ছোটরা হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তারই জ্যোৎস্নামাখা পথ এঁকে গেছেন ও রেখে গেছেন।

কিন্তু তিনি যাননি কোথাও। তাঁর স্নেহ আমরণ চোখ জেগে রয়েছে সেই পথের ওপরে। একটি লহমা তার, নাও এই।

—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

রংমশালের ছোট বন্ধুদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'চার কথা আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছ, তাই এই সুদূর সমুদ্রতীর (বোম্বাই) থেকে রংমশালের ছোট ছোট ভাই বোনেদের জন্য দু'একটী ঝিনুক কুড়িয়ে তোমায় পাঠাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, বাঙালীর ঘরে ঘরে যে-শিশু ভোলানাথ, অনাদরে শুকিয়ে যায়, অতি আদরের অর্থহীন আওতায় পচে যায়, শিক্ষা আর শাসনের লোহার বেড়ি পারে হাঁটতে গেলে খুঁড়িয়ে চলে, তার একমাত্র বন্ধু। তাঁর নিজের শৈশবের মধ্যে সারা দেশের শিশুদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনা তিনি নিজে বুঝতে পেরেছিলেন···তাই সারা জীবন ধরে তিনি সাধনা করে গিয়েছিলেন যাতে, এই মানব শিশু, পৃথিবীর এই আলো বাতাসে, তার সত্যিকারের মায়ের খোঁজ পায়···।

তিনি আজ আমাদের কাছ থেকে সরে চলে গিয়েছেন···কিন্তু তাঁর আশীর্ব্বাদ রয়ে গিয়েছে বাংলার জলবায়ু, গাছপালা, ধূলোমাটীর সঙ্গে মিশে···সেই বাংলার জলবায়ু সেই বাংলার গাছপালা সেই বাংলার ধূলোমাটী, তাঁর আশীর্ব্বাদের মানে যেন তোমাদের প্রত্যেকের দেহ মনে পৌঁছে দেয়।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লেখা চেয়েছেন, তার মানে আপনি কৌশল ক'রে আমার কাছ থেকে দুচার হাজার পৃষ্ঠার একখানা বই লিখিয়ে নিতে চান। কিন্তু আমি আগেই বলে রাখি সে ক্ষমতা আমার হবে না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুচার কথায় কিছু লেখা যায় না, অন্ততঃ আমি সেরকম লিখতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করি। বহু বিচিত্র গুণ এবং ধর্ম্মের সমন্বয় ঘটেছিল একা রবীন্দ্রনাথের জীবনে—কোথায় তার আরম্ভ এবং কোন পথে কি তার পরিণতি ঘটেছিল তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা দরকার। কবি সম্পর্কে কোনও কথাই অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিচিত্র ভাবধারা আমরা লক্ষ্য করি তারও পিছনে যে মনটী কাজ করেছে সেই মনের পরিচয় পেতে হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল করে পড়া দরকার। কবি তাঁর সমস্ত লেখার ভিতর দিয়েই তাঁর সমস্ত পরিচয় দিয়ে গেছেন, সে পরিচয় কোথায়ও হয়তো স্পষ্ট, কোথায়ও হয়তো অস্পষ্ট, কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি তাঁরই লেখার ভিতর দিয়ে, তাঁর মুখের কথার ভিতর দিয়ে অন্যেরা শুনে লিখেছেন। তাঁর কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প-উপন্যাস, চিঠিপত্র এবং ছবির ভিতর দিয়েই তাঁর পূর্ণ-পরিচয় আমরা পেতে পারি। কখনও খোলাখুলি ভাবে, কখনও আভাসে ইঙ্গিতে, কখনও বা নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর সমস্ত পরিচয় তিনি নিজেই রেখে গেছেন ঐ সবের ভিতরে। তাঁর লেখা কবিতা গল্প প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় হ'তে থাকে—এক আধবার পড়লে কিন্তু তা হয় না, বহুবার পড়তে হবে। যা প্রথমে অস্পষ্ট মনে হয়, পড়তে পড়তে তার একটা অর্থ মনের মধ্যে আপনা থেকেই প্রকাশ হ'তে থাকে। তা ছাড়া তাঁর একটা কোনো সম্পূর্ণ পরিচয় নেই—বিচিত্র পাঠক মনের কাছে তাঁর পরিচয়ও পৃথক, অর্থাৎ একটা কোনো বাঁধা ধরা পরিচয়ের মধ্যে তিনি শেষ হয়ে যান না। আর ঠিক এই কারণেই তাঁর আকর্ষণ আমাদের কাছে কখনও কমে না। তাই আপনার ছোট বন্ধুদের কাছে আমি এই বলতে চাই, তোমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যিনি যা বলবেন তাতো শুনবেই, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তোমাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হবে তাঁর লেখা বার বার প'ড়ে। পড়তে থাক—তাঁর যে লেখা তোমাদের খুব ভাল লাগে বার বার পড়তে থাক—এইভাবে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ার অভ্যাসটি বজায় রাখতে পারো, তাহলে নিজেরাই প্রতিদিন কবির নতুন নতুন পরিচয় পেয়ে ধন্য হতে পারবে।

—পরিমল গোস্বামী

আপনার চিঠি মংপু ঘুরে এখানে এলো তাই উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হলো মার্জ্জনা করবেন।

আমাদের পরম প্রিয় কবি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনি আমায় কিছু লিখতে বলেছেন—কিন্তু তাঁর কাব্য সম্বন্ধে এবং জীবন সম্বন্ধেও কিছু লিখতে যাওয়া আমি ধৃষ্টতা মনে করি কারণ সাহিত্য উপভোগের যে আনন্দ তা লিখে কাউকে ভাগ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। প্রশংসাসূচক উচ্ছ্বাস বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ এর কোনোটার দ্বারাই তো কবিতার রসনির্ঝর, সাহিত্যের মাধুর্য্য অন্যকে বোঝান যায় না। বসন্তের বাতাসের মতো, পূর্ণিমা আলোর মতো তার মাধুরী সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করে ঝরতে থাকে, তবু দুই মুঠোয় ধরা যায় না। তেমনি তাঁর জীবন সম্বন্ধেই বা আমরা কে কি বলব? কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে, অসংখ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, সহস্র রকম ভাবনা বেদনা অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়ে তাঁর আশী বছরের সুদীর্ঘ জীবন যে বিরাট আশ্চর্য্য রাগিনী বাজিয়ে চলে ছিল, আমরা কে তার কতটুকু জানি? এবং শুধু স্থান কালের নৈকট্য দ্বারা সেই অনির্ব্বচনীয় সত্তার সম্পূর্ণরূপ কেউ ধরতে পারে না, জানতে পারে না। যে তিনি একই সময়ে সকলের সঙ্গে, হাস্যে পরিহাসে দৈনন্দিন ছোটখাট ঘটনার মধ্যে, এক হ'য়ে অথচ আপন মহৎ ভাবনা বেদনা ও বিপুল কবিত্বের গভীরতায় সকলের অতীত হয়ে থাকতেন

সেই মানুষটাকে কে জানবে কে চিনবে? উপযুক্ত দর্পণ কোথায় ছিল যেখানে সেই মননশীল গভীরতার ছবি পড়বে?—

"যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে নারি—
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
আমি সেই কবি কে পারে আমায় ধরিতে"—

কিন্তু সেই স্বপন মুরতি গোপনচারী কবিই প্রতিদিন আপনি ধরা দিতেন শিশুর কাছে শিশু হয়ে, দুঃখীর কাছে সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে, আনন্দিত মুহূর্ত্তে কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বার বার তিনি ধরা দিতেন অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে। সেই তাঁর সঙ্গে অলৌকিক মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়ে থাকত। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ছোট খাট ঘটনাও যেন এক একটি আশ্চর্য্য সুন্দর ফুলের মত বিকশিত হ'য়ে সুবাসের মাধুর্য্যে সেই অসীম গভীরতার প্রতি ইঙ্গিতও করে ফুটে থাকত। তাই তাঁর কাছে থাকলে তাঁর প্রত্যেকটি ভঙ্গী প্রত্যেকটী ব্যবহার এমন একটি গীতি কবিতার মত সুষমাময় মনে হতো। এমন কি যখন রাগ করতেন বা বিরক্ত হোতেন তখনও তাঁর ব্যবহারের ছন্দপতন হ'তে দেখিনি। প্রত্যেক দিন কত অবাঞ্ছিত অনর্থক চিঠি আসত, নানারকম উদ্ভট দাবী নিয়ে, তাঁর দুর্ব্বল শরীরের উপর, মহামূল্য সময়ের উপর জুলুম করে, বিরক্ত হোতেন না যে তা নয়, তবু নিজ হাতে উত্তরটুকু দেওয়া চাই। একবার একটি কলেজের ছাত্রের কবিতায় চিঠি এল, সে কবিতা ঠিক মুখস্থ করে রাখবার মত নয় বলে উদ্ধৃত করতে পারলুম না কিন্তু তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে—"আমি তোমার একজন ভক্ত। তোমার জন্মদিনে প্রণাম পাঠাচ্ছি—আশা করি পত্রপাঠ মাত্র এর একটা ভালো উত্তর দিতে দ্বিধা বা কার্পণ্য করবে না কারণ আমি শীঘ্রই তোমার মত বড় কবি হব এবং তখন আমার ভক্তরা আমায়ও এমনি চিঠি লিখবে—আর আমি তো তার উত্তর দিতে দেরী করব না!!!" উনি তো খুব হাসলেন, বল্লেন—"বড্ড ভয় দেখিয়েছে রে, একটা আশীর্ব্বাদ না পাঠিয়ে আর উপায় কি, তবে ওর সেই শুভদিনে আমায় বোধ হয় উপস্থিত হবে না—এই যা ভরসা।"

বাংলাদেশের বহু ছেলেমেয়েরাই তো তাদের কবিদাদুকে অনবরত চিঠি লিখত, তাঁর কর্ম্ম ও বার্দ্ধক্যপীড়িত সময় তাতে ব্যয় হতো বটে, কিন্তু তিনি তাঁর স্নেহ রসটুকু সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। বার বার বলতেন "এই যে অহেতুকী প্রীতি, এ অমূল্য এ দুর্লভ।"

আজ এইখানে শেষ করি। আপনাদের কাগজের নিশ্চয় অভাব নৈলে তাঁর কথা বলতে গেলে কথা তো ফুরোতে চায় না, সে অমৃত সমান, যে বলে ও যে শোনে উভয়েই কৃতার্থ হয়।.....

—মৈত্রেয়ী দেবী

আমাদের নিবেদন

আর কিছুদিন পরেই আসবে ২২শে শ্রাবণ, আসবে শ্রাবণী পূর্ণিমা। ঐ দিন বাংলার কবি, যাঁকে সারা-বিশ্ব বরণ করে নিয়েছিল, মরদেহ ত্যাগ করে' অমরত্ব লাভ করেছেন। আমরা ভারতীয়রা মহাপুরুষদের মৃত্যু মানি না, কারণ আমরা মানি আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার বিনাশ নেই। যাঁরা বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের কীর্ত্তিকলাপের ভেতর দিয়ে। শতাব্দীর সীমা অনায়াসে পার হয়ে যায় তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের খ্যাতি। তাই কালিদাস আজও বেঁচে, সেক্‌স্‌পীয়ার, গ্যেটে, ডিক্টর হুগো আজও আমাদের আত্মীয়।

তবুও ২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবণ, এর মধ্যে একটি নিবিড় যোগ আছে। আমাদের মধ্যে যাদের বিশ্বকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল, ২৫শে বৈশাখ এসেছিল একটি অপরূপ সোণালী মুহূর্ত্ত নিয়ে। তাকে আমরা আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, স্মরণ করি। কিন্তু আজকের দিনে তোমরা যারা ছোটো আছো তাদের কাছে ২২শে শ্রাবণ আসে একটি বিশেষ বার্ত্তা নিয়ে। সেদিন আমরা তোমাদের জানাবো, যে রবীন্দ্রনাথকে তোমরা হারিয়েছ তিনি আমাদের জীবনে, আমাদের জাতির জীবনে, কি ছিলেন—আর তোমরা সেদিন জাতীয় শ্রদ্ধাবাসরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে তাঁর স্মৃতিকে, আলোচনা করবে তাঁর অপূর্ব্ব লোকোত্তর প্রতিভা, এবং কবির আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে যে সময়টুকু তিনি আমাদের মধ্যে কাটিয়েছিলেন তাকে স্মৃতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে বেঁধে দেবে—সেই-ই হবে কবির অমরত্বের একমাত্র প্রতীক।

তাই আজ ২২শে শ্রাবণের সার্থকতা আছে। এই দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে বন্দনা করব, আমাদের উৎসব হবে—"শোকের সমারোহ" নয়, পূজার নৈবেদ্য। ২৫শে বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে' ২২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রতিটি দিনের ইতিহাস আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারকে যে পরিপূর্ণতা দিয়েছে তার মধ্যেই আছে এই সার্থকতা। ২৫শে বৈশাখ যখন প্রথম এলো রবীন্দ্রনাথের জীবনে, তখন জাতির ভাগ্যবিধাতা তাঁর ললাটে মঙ্গল চন্দন পরিয়ে দিলেও—জাতি তার নিজের সেই ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণভাবে জানতে পেরেছিল তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন, ২২শে শ্রাবণ। তার আগের প্রতিটি দিন ছিল অসম্পূর্ণ, কারণ প্রতিটি উষা নিয়ে আসতো নূতন সম্ভাবনার আশা ও আবেগ। ২২শে শ্রাবণ নিয়ে এলো পরিপূর্ণ একখানি ম্লানহীন ফুলের সাজি। আজ সেই ফুলে পূজা। তাই এই ২২শে শ্রাবণের সার্থকতা।

আমাদের এই সামান্য উদ্যমেরও অনুপ্রেরণা ঐখানে। আজ নানাপ্রকার জাতীয় দুর্যোগের দিন। কিন্তু জাতির ভবিষ্যতকে আমরা ম্লান হতে দেব না। রবীন্দ্রনাথ সেই ভবিষ্যতের স্রষ্টা। তাই আজ এই শ্রদ্ধাবাসরে তোমাদের আমন্ত্রণ করছি। প্রতিটি লেখা, প্রতিটি রচনা লিখেছেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, অনুরাগী ভক্তেরা। আমরা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলাম সকল সাহিত্যিককেই। প্রায় সকলেই সাড়া দিয়েছেন এই আহ্বানে,

কারণ এ আহ্বান ত তোমাদেরই। পারিবারিক গোলোযোগে বা অসুস্থতা-নিবন্ধন কেউ কেউ এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি, তাঁদের তোমরা ক্ষমা কোরো। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের শুভ-ইচ্ছা এবং সহযোগিতা না পেলে এ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হোতো না।

বিশেষ করে, আমাদের শিশু-সাহিত্য-আসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাঁরা জড়ো হয়েছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ তোমাদের নিঃসঙ্কোচে জানাচ্ছি যে এতো বড়ো আত্মীয়তার ক্ষেত্র, দলাদলির বাইরে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সহযোগিতার এত বড় মিলনক্ষেত্র, আর কোনো শিশু-কিশোর সাময়িক পত্রিকায় সৃষ্টি হয়েছে কি না স্মরণ নেই। এই মিলনের মধ্যে হয় তো দু-একজনকে তোমরা দেখতে পাবে না। এইটুকু তোমাদের বলতে পারি যে আমাদের আমন্ত্রণের কোনো ত্রুটি হয় নি। এমন কি, যাঁরা লেখা পাঠিয়েছেন, স্থানাভাবে অনেকের লেখা টাইপে সেট করেও, শেষ পর্য্যন্ত ছাপাতে পারি নি। আশা করি তাঁরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

যে লোকোত্তর মহাপুরুষের নামে এই সংখ্যাটি উৎসর্গীকৃত করা হোলো, তাঁর আশীর্ব্বাদ দেশের ভবিষ্যতের পথ সুগম করুক এই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বী র্ন সন্ত্বোষধীঃ ॥

মধু নক্ত মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌ রস্তু ন পিতা ॥

মধুমান্ নো বনস্পতি
র্মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

"বাতাস মধু বহিতেছে, মধু ক্ষরিতেছে নদ ও নদী, আমাদের ওষধি সকল মধু॥ মধু হউক রজনী ও উষা, পৃথিবীর ধূলিকণা মধু হউক আমাদের পালন করেন যাঁরা ঐ দ্যুলোক, মধু হউক॥ মধু হউক আমাদের বনস্পতি, মধু হউক ঐ সূর্য্য, আমাদের ধেনুগণ মধু হউক॥"

বেদের অমর-ঋষির উচ্চারিত এই বাক্য যে আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্রনাথ আজ তারই অধিবাসী, আমরাও সেই আনন্দ-লোকের সহ-বাসী। তিনি অমর, তিনি আজ ঋষি-কল্প, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন

তালিকা

ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে সম্মিলিত মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করে সিসিলির বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে এবং সিসিলির আরো ভিতর দিকে অগ্রসর হয়েছে। সিসিলি অভিযানের একশ' মাইল উপকূলবর্ত্তী রণাঙ্গনের সমস্ত এলাকাই এখন মিত্রপক্ষের দখলে। মিত্রপক্ষের স্থল জল ও আকাশ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মনে হয় শীঘ্রই সমস্ত সিসিলি দ্বীপ ফ্যাসিষ্ট শত্রুকবল থেকে মুক্ত হবে। কর্শিকা ও সার্দিনিয়া ও ক্রীট দ্বীপ অধিকার করাও মিত্রপক্ষের লক্ষ্য। এই সমস্ত দ্বীপগুলি দখলে এলে খাস্ ইউরোপ আক্রমণ অনিবার্য্য। ইতিমধ্যেই মিত্রশক্তির বিমানবহর ইতালীর নানাস্থানে বোমাবর্ষণ করে শত্রুর বিস্তর ক্ষতি করেছে। শুধু বিমান হানাতেই শত্রুপক্ষকে অনেকটা কাবু করে আনা যাবে এই মতলবে বোমাবর্ষণ ক্রমশঃ ব্যাপক করা হচ্ছে। এই যুদ্ধের ফলে, রুশিয়ার ওপর থেকে জার্ম্মানদের চাপ কমবে আশা করা যায়। রুশিয়ার প্রায় দুশো মাইল রণাঙ্গনে নানাদিক থেকে যে জার্ম্মাণ আক্রমণ সুরু হয়েছিল, তার তিন দিনের মধ্যে রুশরা জার্ম্মানদের ৩০,০০০ সৈন্য, ১৫৩৯ ট্যাঙ্ক ও ৬৪৯ বিমান নষ্ট করেছে। এখন ওরেল-কুরস্ক রণাঙ্গনে দুইপক্ষে ভীষণ ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলেছে। লাল সেনাবাহিনী অসীম বীরত্বে আক্রমণ চালিয়েছে, এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অনেকক্ষেত্রে জার্ম্মান বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করা দূরে থাক, আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একদিক থেকে রুশকে ও অন্যদিক থেকে ইংলণ্ড-আমেরিকা-ফ্রান্স যদি এরূপভাবে জার্ম্মান-ইতালি ফ্যাসিষ্টবাহিনীর ওপর নির্ম্মম আক্রমণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, তাহলে শত্রুপক্ষের অবস্থা হবে between the devil and the deep sea.

ষ্টাণ্ডার্ড বিস্কুট কোং এর
জেম্
লভা
খিন্‌এরারুট
বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু।

রিলায়েন্স
বাটার—
১ পাঃ, ½ পাঃ ও ¼ পাঃ টিনে
পাওয়া যায়।
দি জি, এস্, এম্‌পোরিয়াম্ লিঃ
৪৭-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ)
কলিকাতা।

ন্যাশনাল কন্‌ফেকসনারীর
ড্রপস্
বলস্
স্লাইসেস্
সুমিষ্ট লজেঞ্জুস।

এবারের কলিকাতায় লীগ ফুটবল খেলা প্রথমার্দ্ধে তেমন না জমলেও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষভাগে খু জমে উঠেছিল এবং শেষ খেলা পর্য্যন্ত মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল কোন্ দলটি যে লীগ পাবে তার নিশ্চয়তা ছি না। ইষ্টবেঙ্গল এগিয়ে ছিল কিন্তু শেষ কয়েকটি খেলায় সে সুবিধে করতে না পারাতে তার চ্যাম্পিয়নশিপে স্বপ্ন ভগ্নপ্রায় হল এবং শেষ খেলায় কাষ্টমসএর কাছে হেরে যাওয়ায় সে মোহনবাগানের নীচে নেমে গেল। অপর পক্ষে মোহনবাগান শেষ কয়েকটি লেখা ভাল খেলাতে তার ভাগ্য ফিরে গেল এবং ইষ্টবেঙ্গলের চেয়ে দু' পয়েণ্ট বেশী পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন হ'ল। কিন্তু আর একটা ঘটনা ঘটল! ইষ্টবেঙ্গল কাষ্টমসএর বিরুদ্ধে এক নালিশ পেশ করল এই বলে, যে কাষ্টমস্এর একজন খেলোয়াড় কাষ্টমস্এর হয়ে খেলতে পারে না কারণ সে নাকি অনুমতি নেয়নি, অতএব পুনরায় খেলা হউক। লীগ কর্ত্তারা দু'একদিনেই তাঁদের রায় দেবেন। যদি তাঁরা বলেন, কাষ্টমস্এর উক্ত খেলোয়াড় খেলে কিছু অন্যায় করেনি, তাহলে ইষ্টবেঙ্গলের হার হ'ল এবং তার ফলে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন থেকে গেল। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন, আবার খেলা হওয়া উচিৎ, তখন ইষ্টবেঙ্গল আর একবার চান্স পাবে। অর্থাৎ তারা যদি কাষ্টমস্কে হারাতে পারে তাহলে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের সমান পয়েণ্ট হবে এবং মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল আবার একটি খেলা হবে। এই খেলা তখন হবে চূড়ান্ত। যে দল জিতবে সেই দল হবে লীগ চ্যাম্পিয়ন, আর যদি ড্র হয়, তাহলে চ্যাম্পিয়নশিপ দুই দলে সমান ভাগ হবে।

২৪শে শ্রাবণ—কলিকাতা রেডিওর ছেলেদের আসরে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনায় আগামী ২৪শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার বৈকাল ৫টায় **'রবীন্দ্র-স্মৃতি বার্ষিকী'** উপলক্ষে একটী বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে

১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কনট্রাক্টার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

অস্ত-রবির আলো

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রেখা } দুই বন্ধু
গীতা }

মণ্টু—গীতার ছোট ভাই

রেখা

সারাটা দিন বাদল ঝরে, ফুরিয়ে এলো বেলা
ওরে গীতা কোথায় গেলি, করবি না আজ খেলা ?
ওলা একি, বিকালবেলা বসে ঘরের কোনে
একা একা বইটি খুলে পড়িস্ কি এক মনে ?

গীতা

কিছুই ভাল লাগছে না আজ, শোনরে রেখা বলি
শ্রাবণ বেলার শেষে আমি পড়ছি 'গীতাঞ্জলি'।

রেখা

ওরে তুই হাতে "গীতাঞ্জলি" শ্রাবণ দিনের শেষে,
শুভক্ষণ হেথায় আমি হাজির হলাম এসে।
ফুরিয়ে আসে বাদল বেলা সাঁঝের নাহি বাকি,
গীতাঞ্জলির একখানা গান শুনিয়ে দিবি নাকি ?

গীতা

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে,"
আচ্ছা শোনো গাইছি আমি বোসো আমার পাশে।
(গান)
"মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে—"

রেখা

মধুর, মধুর, গানখানি তোর, মধুর অতি গলা,
গানখানি যে মধুর কত যায়না সেটা বলা।

গীতা

আমার গলা মধুর কিনা জানিনা ভাই রেখা,
গানখানি ভাই সত্যি মধুর, বিশ্বকবির লেখা।
এই চেয়ে ছাখ্ মেঘের ফাঁকে অস্তরবির আলো,
দিগন্তে ঐ ঝিল্‌মিলিয়ে উঠ্‌ছে রে জম্‌কালো।
অপূর্ব্ব এই রূপের ছটা শ্রাবণ বেলা শেষে,
অস্ত পারে যাচ্ছে রবি মলিন হাসি হেসে।

রেখা

সত্যি তো ভাই অস্ত-রবির স্বর্গীয় এই ছবি,
মোদের ছেড়ে কোন্ দেশে বল্ যাচ্ছে মোদের রবি ?
মোদের ধরা আঁধার করে কোথায় উদয় তারি,
কোন্ সে দেশে, কোন্ সুদূরে দিচ্ছে রবি পাড়ি ?

গীতা

ওরে গীতা, বলিস্ কি তুই, পাগল হলি যে রে,—
কোথায় যাবে রবি, মোদের আঁধার মাঝে ছেড়ে ?

মোদের রবি মোদের থাকে চিরদিনের তরে
সেই গরবে অধীর মোরা সারা জনম ভরে'।
জানিস্ নাকি মোদের ভারত রবির আলোয় ভরা
তার জ্যোতিতে দীপ্ত হোলো সমস্তটা ধরা।

রেখা

ঠিক্ বলেছিস্ অন্তরে আজ উঠ্‌ছে আমার বেজে
রবির ভারত, আলোর ভারত, জ্ঞানের ভারত সে-যে।
রবির দরদ ভালোবাসা, প্রীতি, প্রণয়, স্নেহ
রবির নীতি, রবির গীতি, ভুল্‌বে না আর কেহ।
সঞ্জীবনী মন্ত্র যে তার ছড়িয়ে সদা আছে,—
নিত্য যে তার প্রকাশ দেখি তোমার আমার কাছে।

রেখা

দিগন্তে ঐ আকাশ কোনে ছাখ্‌রে চেয়ে গীতা
ঠিক যেন ঐ নদীর কূলে উঠ্‌লো জ্বলে চিতা,
শ্রাবণ দিনের শেষে বেলাতে ফুরায় রে কার আয়ু?
কেঁদে কেঁদে মরছে যেন ক্লান্ত বাদল বায়ু।
ঐ যে রবি ডুব দিল ঐ দিগন্তেরই পারে,
এসো এসো আমরা দু'জন প্রণাম করি তারে।

(গীতার ছোট ভাই মণ্টুর প্রবেশ।)

মণ্টু

গীতাদিদি, গীতাদিদি, আজকে আমার ছুটি
মা বল্লেন, জেলী দিয়ে খাও তুমি পাউরুটি।
ঝলমলিয়ে মেঘের ফাঁকে ঐ যে জ্বলে আলো,
আজকে আমার রুটি জেলী লাগ্‌ছে না আর ভালো।
বল্‌না দিদি গল্প কিছু ঘুমিয়ে পড়ার আগে,
তোমার মুখের গল্প আমার বড়ই ভালো লাগে।

রেখা

মণ্টু তুমি দিদির কাছে গল্প নিও শিখে
সন্ধ্যা হোলো, এখন আমি যাচ্ছি বাড়ীর দিকে।

(প্রস্থান)

গীতা

মণ্টু তুমি গল্প শোনো, আমার কাছে বোসো,
অপূর্ব্ব এক গল্প আমি বল্‌ছি তোমায় রোসো।
একদেশে এক ছিলেন রাজা, মস্ত রাজা উনি।
যেম্‌নি তাঁহার রূপের বাহার, তেমনি তিনি গুণী।

মণ্টু

কোথায় তাঁহার রাজ্য ছিল বুঝতে পারি না-যে—

গীতা

—তাঁহার আসন পাতা ছিল সবার হৃদয় মাঝে
রাজ্য তাঁহার মস্ত বড় সবারই অন্তরে;
মুগ্ধ ছিল সকলে তাঁর যাদুরি মন্তরে।
দেশ-বিদেশে খ্যাতি তাঁহার গিয়েছিল রটে—

মণ্টু

সত্যি নাকি, তবে তিনি ধন্য মানুষ বটে!

গীতা

রাজার ছিল অস্ত্র দুটি কলম এবং তুলি,
মধু-র চেয়ে মধুর ছিল তাঁহার মুখের বুলি।
তাঁহার কাছে আস্‌তো যারা মুগ্ধ হয়ে যেত,
তোমাদেরই মত শিশু কতই আমোদ পেত।
গানে গানে বিশ্ব ভুবন দিয়েছিলেন ছেয়ে,
বিজয়-মালা নিয়ে এলেন যশের তরী বেয়ে।

মণ্টু

কোন্ দেশেতে জন্ম রাজার বল্‌বে গীতা দিদি?

গীতা

তিনি ছিলেন বাংলা মায়ের অঞ্চলেরই নিধি।
তাঁরে পেয়ে ধন্য হোলো সারা ভারত ভূমি;
তাঁরে পেয়ে মোদের মাঝে ধন্য আমি তুমি।
বনের যত পাখী তাঁরে গান শোনাত এসে,
ফুলের দলে ভাব জমাতো মিষ্টি হাসি হেসে।
গাছপালারা করত প্রণাম নুইয়ে তাদের শাখা—
স্নেহের পরশ বুলায় বাতাস ভালোবাসায় মাখা।

চাঁদের আলো, গভীর রাতে তারার ঝিলিমিলি
বলত তারে প্রাণের কথা সবাই নিরিবিলি।
ছয়টি ঋতু করত বরণ সেই সে যাদুকরে
নদী পাহাড় ধন্য হোত সঙ্গী তারে করে।

মণ্টু

গীতাদিদি, অবাক আমি তোমার কথা শুনি
সত্যি তিনি ছিলেন বটে গুণীর সেরা গুণী।

গীতা

রাজার মত অর্থ ছিল, হৃদয় ঋষির মত,
ধ্যানের রাজা, জ্ঞানের রাজা, বিদ্যা ছিল কত।
রবির মতই তেজ ছিল তার সবাই সেটা জানে,—
তাঁহার কথা ভাবতে গিয়ে গর্ব্ব জাগে প্রাণে।
দেশবিদেশের কত মানুষ নদী সাগর বেয়ে
আসত ছুটে, ধন্য হোত তাঁহার দেখা পেয়ে
অস্তরবির পানে চেয়ে ভাবছি মনে মনে;
অস্তরবির কথা আজি জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।

মণ্টু

গীতাদিদি, গীতাদিদি, এমন রাজার সনে
আলাপ যদি থাকত আমার, সুখী হতাম মনে।
তাহার সাথে আসতাম ঠিক নানান্ দেশে ঘুরে
অস্ত লোকে যায় যেখানে কল্প-লোকের পুরে।
দিনের বেলা তাঁহার সাথে জুড়ে দিতাম খেলা,
গল্প কত শুনে নিতাম সন্ধ্যা সকাল বেলা।

বল্লে তুমি গীতাদিদি, বনের পশু পাখী
তাঁহার মনে এসে সবাই ভাব জমাতো নাকি!
আমিও ঠিক রাজার সাথে ঘুরে বনে বনে
মনের সুখে ভাব্ জমাতাম পশু পাখীর সনে।
তারার সাথে চাঁদের সাথে আমার কথা হোত,
রাজার সাথী হয়ে আমার আমোদ হোত কত।

গীতা

রাজার ছিল মস্ত বড় যাদুকরের ঝুলি
সেই ঝুলিরই যাদুর মোহে সবাই যেত ভুলি।

মণ্টু

রাজার কাছে ঝুলিটি ঠিক চেয়ে নিতাম আমি
সকল জনে তাক্ লাগিয়ে দিতাম দিবাযামী।
বন্ধুরা সব অবাক হয়ে ফিরতো পাছে পাছে,
যাদুর খেলা দেখিয়ে দিতাম তাদের সবার কাছে।
বল বল গীতাদিদি আজকে সাঁজের বেলা,
কোথায় গেলেন, কোন্ দেশেতে দেখাতে তাঁর খেলা।

গীতা

এমনি বাদল শ্রাবণ দিনে ছেড়ে গেলেন ধরা
আজো তাঁহার জাগ্‌ছে স্মৃতি পরাণ্ পাগল করা।
কোথায় গেলেন কোন্ সে দেশে বলতে পারি না-যে
রাজার মত আজও তিনি আছেন সবার মাঝে।

আশ্চর্য্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আর এক বাইশে শ্রাবণ পৃথিবীর দিগন্ত থেকে বিদায় নিয়ে গেল। বাংলা দেশের মন থেকে আর যা কিছু মুছে যাক, এই চোখের জলে লেখা তারিখটি কোন দিন মুছে যাবার নয়। যাঁকে পেয়ে বাংলাদেশ চিরকালের জন্য ধন্য, সেই মানুষের মধ্যে আশ্চর্য্য মানুষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের বেদনা নিয়ে এ তারিখটি অবিস্মরনীয়। আজ দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, তাদের হয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে মিলিত হয়ে আমরা যদি তাঁকে আমাদের মধ্যে থেকে হারাবার বেদনাটিকেই বড় করে দেখি, তা হলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, যে তাঁর মত যে সব মহামানবকে পেয়ে বহুযুগের তপস্যায় পৃথিবীর ইতিহাস কখনও কখনও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মৃত্যুর পরেও তাঁরা অমর। তাঁদের কোনদিন আমরা হারাতে পারি না। তাই রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নেই এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে তিনি আছেন। আমাদের মুখের ভাষায় আমাদের মনের চিন্তায় ও কল্পনায়, হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে একান্ত ভাবে মিশে আছেন ও থাকেন।

আজ যারা ছোট তাদের অনেকেরই বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখবার কখনও সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তার জন্যেও তাদের দুঃখ করবার কিছু নেই, কারণ যে পৃথিবীতে তারা বড় হয়ে উঠবে, সেখানে চোখে দেখার চেয়ে আরো অনেক অন্তরঙ্গ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিপদে তাদের হবে। রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য এ পৃথিবী আর একটু নতুন করে গড়ে দিয়ে গেছেন, সমস্ত ভাবীকালের ওপর তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর কোন দিন মুছে যাবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের মত আশ্চর্য্য মানুষকে মৃত্যু তাই আমাদের কাছ থেকে একেবারে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না। তিনি আমাদের মধ্যেই থাকেন আমাদের সমস্ত চিন্তায় ভাবনায় কল্পনায় অদৃশ্যভাবে মিশে।

আজ শ্রাবণের আকাশে যে মেঘ জমা হয়েছে, তাঁর মনের রঙ লেগেই তা আমাদের কাছে আর একটু মধুর হয়েছে, তাঁর মনের রঙ চিরকালের মত লেগে গেছে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সব কিছুতে। মানুষের জীবনকে তিনি উজ্জ্বলতর আর এক মহিমা দিয়েছেন, পৃথিবী তাঁর প্রতিভায় আর এক মানে পেয়েছে যেন।

পৃথিবীর সমস্ত ভাবীকাল যাঁর কাছে ঋণী সেই চিরকালের আশ্চর্য্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে আজ শুধু শ্রদ্ধা ও প্রণাম নয়, আমাদের আন্তরিক অনুরাগ আমরা জানাই আর তাঁর ভাষাতেই বলি—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।

বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক
তোমাদের স্মরি।

(রবীন্দ্রনাথ)

মহাবীরের পুঁথি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল পাকা ভাস্কর
নীলের লাঙ্গুলে তুলি দিল গড়।
লাঙ্গুল গড়—অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
সকটক তার মাঝে লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
সুগ্রীবের কোলে রাম কমললোচন,
অঙ্গদের কোলে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বিভীষণ পাহারা ফিরান
হাতে ডাক-লণ্ঠন।
কোঁৎকা হাতে রোঁদে ফেরেন মন্ত্রীবর জাম্বুবান,
লাঙ্গুল গড়ের দ্বারে খাড়া হনুমান।
মর্কট কটা মটকায় এ চোখ বোজে
ও চোখে চায় চোর খুঁজে,
গন্ধমাদন খন্দ-খানায় চোরের গন্ধ পায় কি না পায়
দেখছে মুখ বুজে।
নল নীল দু ভাই,
তাদের অন্য কাজ নাই—
চোর চায় ভাঙা বেড়া বলে সারা লাঙ্গুল গড়ে গজাল দিচ্ছে—
যথা তথা গুঁজে—
ওরে ভাই বুঝে সুঝে—
গবাক্ষ আছে গবাক্ষ, গয়শালে আছে গয়
গোদা ভোঁদা কয় দুজন
শূন্ শান্ রাত তখন—
সুগ্রীবের কোলে ঘুমান রাম, অঙ্গদের কোলে লক্ষ্মণ।

এমন সময় চৌকিদারী হাঁক দিলেন—এদিক থেকে জাম্বুবান, সেদিক থেকে বিভীষণ—লাঙ্গুল গড়ে কে জাগে!

—ভল্ল হাতে ভল্লুক জাগে; কুলুপে কপাটে উলুর জাগে!
—ছাতে জাগে কে?

—এসে দেখে !

—মশয় ছাতে যাবার সিঁড়ি ?

—এই দেখ বিশ্বকর্ম্মার ঘরখানি পাওয়া বিশ্বভাস্কর নীল বানরের কাজের ছিরি !

নল জল-ঘরের টনল থেকে উত্তর করলে—

"ছাদের পরে বিষ্ণু চক্কর ঘুরছে বন্ বন্
নিশ্চিন্ত র'ন !"

জাম্বুবান বল্লেন—"যাক খাই একটু তামাক নিশ্চিন্ত হয়ে।"

বিভীষণ বলছেন— "ওরে ভাই জেগে জুগে বসে থাকা চাই হয়ে হুঁস্তার,
কখন আসে চোর ঠিক নাই তার খবরদার।"

জাম্বুবান ধুমা ছেড়ে বল্লেন—"জো আছে কি নিশ্চিন্ত হবার !"

এই সময় দ্বারে হনুমান গান ধরেছেন বাজ খাঁই আওয়াজে শোনা গেল।—

"রাত যে যায় না কি করি—
কাটলে চার যাম বিপদে তরি
হে রাম, মশার জ্বালায় গেলাম, তায় পিপিলির কামড়ি।
দেবো দাম ও ব্যাপারি—
রাম নামের মশারি,
আন যদি পাস তলাস করি।"

এই সময় যেন অন্ধকারের মশারি ঠেলে ব্যাপারি হনুর সামনে দিয়ে "চাই মশারি, মশারি-পাটির ভাল মশারি" বলতে বলতে চলে যায়।

হনু তাকে যেমন ডাকা—"এদিকে আয় !" অন্ধকারে মশারি শুদ্ধ ব্যাপারি গায়েব, "কাল আসবো" বলে ! হনু অবাক !

এই সময় বিভীষণ পায় পায় এসে বলছেন—"হনু ! এসেছিলেন, বুঝেছ ব্যাপার ?"—হনু গম্ভীর !

—"মশারির ব্যাপারি নয় গো, উনি রামারি—এসে গেলেন, তদারক করে গেলেন—এক পহর তব সব কোই জাগে কিনা।"

—"জেগে তো আছিই।" বলে হনু মশা মারতে থাকলেন।

—"হাঁ জেগে থাকো— আপনি পবন যদি আসেন তব পিতে
দোরেতে দিওনা প্রবেশ করিতে।"

এই বলে বিভীষণ রোঁদ ফিরতে গেলেন।

চোখে মুখে জল দিয়ে রাম নাম করতে করতে হনুমান মশার কামড় খাচ্ছেন, এমন সময় আবার এক বাক্তি —হাতে ছড়ি, মাথে পাগড়ি, দাড়ি শুভ্র, গোঁফ শুভ্র, শুভ্র সর্ব্ব কেশ !

—"কে বাবা আবার মশারি নাকি, আমার কাজ নেই মশারিতে !"

—"না হে না, আমি রাজা শশরথ, রাম-লক্ষ্মণের পিতে।"

—"যাও, যাও, হনুমানের বাপেরও আজ ঢুকতে মানা !"

—"তা তো জানিনা।" বলে দশরথ সরেন চট্‌পট্।

জাম্বুবান হাঁকলেন—"কে যায় !"

হনুমান হাঁকলেন—"অযুদ্ধের দশরথ যায়।"

বিভীষণ হাঁকলেন—হুঁসার খবরদার, পাহারালা পাহারায় কে কে জাগে !"

উত্তর হল—"যে যে আছে এ বাগে সে বাগে !"

দুটো আপদ কাটলো, অস্তাচলে নামলো শশী
হনুমান গাইছেন বসি—
"হে রাম রঘুমণি চরণ সরোজ রজ ভূথা ভূথৈয়া রহে
জাগত রহে জপত রহো ভৈয়া রাম নাম চিতশুধাবলি।"

এমন সময় শুনলেন স্ত্রীকণ্ঠ—"ও রামদাস দেউড়ি খোলো।"

—"কে আপনি উদয় হোলো !"

—"আমি রামের মা কেঁকুই।"

—"কি বল্লি তুই।" বলে হনু যেমন জগদ্দল পাথর তোলা অমনি ভোঁ দৌড় ঘোমটা-খোলা মহীরাবন কেনুই পোকা হয়ে।

বিভীষণ এসে বল্লেন—"কে এলো, কে গেলো ?"

—"ওহে ছাড়ান দাও ও কথা, কত এলো কত গেল—
শশব্যস্তে শশরথ এলো, সে গেল
আস্তে আস্তে জনক ঋষি এল
জোনাকপোকা হয়ে নিশিরাত মিলিয়ে গেলে
ভরত এল ভুরুৎ পোকা হয়ে যুরুৎ পালালো
কেঁকই-রাণী এল, কেনুই পোকা হয়ে কুঁই কুঁই ডেকে পালালো
এখন ভালোয় ভালোয় বাকি রাতটুকু কাটলেই ভালো।"

—"তিসরা পহর চৌরা জাগে বুঝেছ ?"

—"যোগী ঋষি তো আগেই এসে গেছে।"

—"ওরে বলে চোরের চাতুরী—ঐ করেই তো ওরা লোক ঠকিয়ে জাগা-ঘরে করে চুরি।" বিভীষণ এই বলে গেলেন।

হনুমান কান পেতে শুনলেন—

গড়ের মধ্যে নাক ডাকছে দেদার—
কোন বাঁদর দাঁত কামড়াচ্ছে
স্বপনে কড়াই চিবাচ্ছে
ঘুমে বেহোঁস কে কার রাখে খোঁজ
হনু ভাবেন মজা দেখাবো রোস্
রাতটা হোক কাবার।

সবাই নিদ্রা যায়, যত দায় বিভীষণের আর আমার! ভাবতে ভাবতে বিভীষণ উপস্থিত রাখী হাতে।

—"এই গেলে এই এলে যে!"

—"বোসো, উঠোনা, রাম-লক্ষ্মণের হাতে রাখী আসি বেঁধে।" এই বলেই দ্রুত প্রবেশ গড়ের মধ্যে।

চোরা মায়া কত জানে সে মহীরাবণ
চক্ষে ধূলা দিয়া হনুর করিল গমন।
কি জানি কেমন ধূলা পড়া দিল উড়ায়ে
যেখানে যত বাতি দিল বুতায়ে।

হনু অন্ধকারে বসে ভাবছেন—বিভীষণ এই পথে গেল, আর যে ফেরে না। এই ভাবতে "খবর কি হনুমান!"—বলে বিভীষণ উপস্থিত।

—"আমার খবর ভালো, গড়ের ভিতরের খবর কি কও। রাখী বন্ধন করেছো?"

বিভীষণ অবাক—"সে কি, কিসের রাখী বন্ধন? রাখী পূর্ণিমা তো এখন নয়!"

—"আরে সে যাই হোক, এই তো এই পথ দিয়ে গেলে ভিতর, আবার কোন পথ দিয়ে বেইরে এলে?—

বিভীষণ হে এলে কোন পথ দিয়ে গড়ের বাহিরে
এই যে গেলে ভিতর গড়ে রাখী নিয়ে
সব তো পথ বন্ধ
মনে লাগছে সন্দ
থির কর বীর হনুমানের হিয়ে!
দুটো বিভীষণ তো নাই—
কোনটা আসল কোনটা নকল কি মতে ঠাওরাই,
সত্য কথা বল ভাই আমার মাথার কিরে!"

বিভীষণ চমকে উঠেছেন—"যাঃ ভুলাতে না পেরে শেষে হলি বিভীষণ?"

হনু বল্লেন—"সে কি তোমার কথা, শুনে যে ডর লাগছে।"

—"আর কথা! খেয়েছে তোমারও মাথা, আমারও মাথা!"

—"হা রাম! তোমার কাজে আজ বুঝি হেঁট হয় মাথা।" বলে হনুমান কপালে করাঘাত।

ইতিমধ্যে উঠলো হাঁক ডাক—
প্রমাদ প্রমাদ—অকস্মাৎ বজ্রাঘাত!

বাইরে থেকে এরা বলে—কি কি! ভিতর থেকে তারা বলে—কি কি! এমন কিকি কি শব্দ উঠলো যে কুম্ভকর্ণ বেঁচে থাকলে তারও ঘুম ছুটত।

কি কি রবে বানরেরা চেঁচায়—
যেন দলে-দলে চামচিকি পেঁচোপিঁচি
বিজী ও ছুঁচোয় বানর্য্যাষ্টক পড়ে যায়—
সমষকৃতি ভাষায়।
বাতাসে পাঠায় কেবলি ধ্বনির চিঠি
হয়েছে কি হচ্ছে কি তা কি কেউ জানায়!

এমন সময় জাম্বুবান এসে হনুমানকে বল্লেন—"ওহে প্রমাদ হয়েছে!"

—"আরে কি হয়েছে তাই বল।"

—"আরে বলি কি, দেখ গা, কি হতে কি হয়েছে!"

এরি মধ্যে সুষেণ বদ্যি দেখে এসে বলছেন—"ওহে ইয়ে হতে ইয়ে হয়েছে। একেবারে রস সিন্দুরের ছড়াছড়ি।"

—"আরে রাখ তোমার রসসিন্দুর। ভালো লাগেনা রসিকতা।"

—"আরে ভাই ইঁদুরে নিয়েছে রাম লক্ষ্মণ, কি বলি আর দুঃখের কথা।

—"ই—দু—র" বলে মহাবীর ঘুরে পড়াও যা, লাঙ্গুল-গড়ের দেওয়াল এলিয়ে পড়াও তা।—

এই বলে চাঁই-বুড়ো পুঁথির পাতা উল্টে দেখেন ৮৬/১৫ কথা ইঁদুরে কেটে ছারখার করেছে, পড়বার উপায় নাই!

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার
মহাবীরের পুঁথির পরিশিষ্ট কিছু রাখে নাই অবশিষ্ট
হে রাম, কি অনিষ্ট ঘটালে আমার!

এই ভাষ্য শুনিয়ে লম্ফ নিয়ে ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর হাঁচতে হাঁচতে আসর ত্যাগ ইঁদুরে কাটা পুঁথির পাতা ছড়াতে ছড়াতে!

—সমাপ্ত—

তেরো অধ্যায়

আঙ্গোরার যুদ্ধ

য়ুরোপের সঙ্গে এসিয়ার শক্তি-পরীক্ষা! এ নূতন দৃশ্য নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই এ দৃশ্যের অভিনয় হয়েছে বারংবার। এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসেও এজন্যে অমর হয়ে আছে পার্সী দরায়ুস, গ্রীক আলেকজান্দার, হুণ আটিলা ও মোগল জেঙ্গীজ খাঁয়ের নাম। বেয়াজিদও এই অভিনয়ে যোগ দিয়ে ফেল হয়েছেন।

কিন্তু য়ুরোপবিজেতার সঙ্গে এসিয়াবিজেতার শক্তিপরীক্ষার কথা আগে শোনা যায় নি। সুতরাং সারা পৃথিবী যে এই অপূর্ব্ব পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে এ হচ্ছে খুবই স্বাভাবিক কথা।

আগেই বলা হয়েছে, নিজের জয়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বেয়াজিদ আঙ্গোরা সহরের কাছে ছাউনি ফেলেছেন। তিনি স্থির করেছেন, বহুদূর থেকে আগত তৈমুরের পথশ্রান্ত সৈন্যদের বিশ্রামের অবকাশ না না দিয়েই আক্রমণ ও পরাজিত করবেন।

বেয়াজিদ ব'সে ব'সে অপেক্ষা করছেন—অপেক্ষাই করছেন! এক দিন, দুই দিন, তিন দিন! সিভা সহর থেকে এদিকে আসবার একমাত্র পথে বিরাজ করছে কেবল ধূ-ধূ শূন্যতা। ক্রমে সাতদিন কেটে গেল। তবু তৈমুরের দেখা নেই। গুপ্তচররা চারিদিক থেকে ফিরে এসে বললে,—তৈমুর সসৈন্যে সিভা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু তিনি যে এখন কোথায়, কেউ তা জানেনা!

শত্রু যুদ্ধযাত্রা করেছে, অথচ অদৃশ্য! বেয়াজিদ এমন ব্যাপার কল্পনায় আনতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সৈন্যেরা হালিজ নদীর ধারে ব্যূহরচনা ক'রে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু তারা কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? শত্রু কোথায়?···বেয়াজিদ ছাউনি তুলে, ব্যূহ ভেঙে নানাদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তারপর তৈমুরের খবর পাওয়া গেল। তিনি সিভার পথ ধরেন নি। হালিজ নদীর অন্য তীর দিয়ে যাত্রা ক'রে একেবারে আঙ্গোরা নগর অবরোধ ক'রে বসেছেন! এই আঙ্গোরাই ছিল তুর্কীদের প্রধান আশ্রয়—জমা করা ছিল তাদের যা-কিছু রসদ।

তৈমুরকে খোঁজবার জন্যে আশ্রয় ছেড়ে দূরে এসে প'ড়ে কি অন্যায়ই যে করেছেন, এতক্ষণে বেয়াজিদ তা ভালো ক'রেই বুঝতে পারলেন। কিন্তু এখন আর অন্য উপায় নেই। এখান থেকে আঙ্গোরা সাতদিনের পথ—এখন এই দীর্ঘ পথই তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। প্রথম চালে জিতে গেলেন তৈমুর।

তৈমুরকে বাধা দেবার জন্যে বেয়াজিদ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন। কিন্তু যতই অগ্রসর হন ততই তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে যায়। তৈমুর সমস্ত গ্রাম ও শস্যক্ষেত লুণ্ঠন করেছেন—কোথাও এককণা খাবার নেই। পথিমধ্যে যত জলাশয় বা উৎস ছিল, তাতাররা সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে—কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। এমন কি আঙ্গোরা সহরের সুমুখ দিয়ে যে নদীটি বইত, তৈমুর বাধ দিয়ে তারও মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন! সে নদী বইছে এখন তাতার-সৈন্যদের পিছনদিকে। দ্বিতীয় চালেও তৈমুরের জিৎ।

তুর্কীরা এসেছে শুনে তৈমুরও আঙ্গোরা ছেড়ে এগিয়ে এলেন। তখন যুদ্ধ করা ছাড়া বেয়াজিদের আর কোন উপায় রইল না। তাঁর সৈন্যেরা পথশ্রান্ত, দারুণ পিপাসায় প্রাণ তাদের কণ্ঠাগত। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা সম্ভব নয়—কিন্তু যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে!

দুই পক্ষের সৈন্যদলের সম্মুখভাগ পনেরো মাইল দীর্ঘ। তুর্কীরা হৈ হৈ রবে করতাল ও জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু তাতাররা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। সূর্য্য তখন প্রখর।

তৈমুর তখনও ঘোড়ায় চড়া দরকার মনে করলেন না—প্রাথমিক যুদ্ধের ভার রইল তাঁর সেনাপতিদের হাতেই। তাঁর পৌত্র রাজকুমার মহম্মদ ছিলেন সেনাদলের মধ্যভাগের কর্ত্তা। এখানে বর্ম্মাবৃত হস্তীদলও ছিল। ভারতবর্ষ থেকে তৈমুর যুদ্ধে হাতী ব্যবহার করবার পদ্ধতি শিখে এসেছেন।

তাতার ফৌযের দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করছেন তৈমুরের সবচেয়ে নিপুণ সেনাপতি নূরউদ্দীন। বেয়াজিদের পুত্র সুলেমান অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে সর্ব্বপ্রথমে সেই দিক আক্রমণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাতারদের স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল। তারা শত্রুদের উপরে নিক্ষেপ করতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ও জ্বলন্ত "ন্যাপ্‌থা"। তুর্কীরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতাররা আক্রমণ করলে প্রবল পরাক্রমে। সে আক্রমণ সইতে না পেরে অনেক তুর্কী রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সেই সময়ে তাতারদের বামপার্শ্বও তুর্কীদের উপরে ভেঙে পড়ল সমুদ্র-তরঙ্গের মত। দুইদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে তুর্কী অশ্বারোহীদের অবস্থা হয়ে উঠল বিষম শোচনীয়।

তখন তৈমুর তাঁর পৌত্রকেও বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে তুর্কীদের অধীনস্থ সার্ভিয়ান অশ্বারোহীদের আক্রমণ করবার জন্যে হুকুম দিলেন। কাড়া-নাকাড়ার তালে তালে অস্ত্রে অস্ত্রে উঠল সে কি ঝনৎকার! হাজার হাজার তরবারির বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে চোখ হ'তে চায় অন্ধ এবং যোদ্ধাদের বিজয়-হুঙ্কারে কাঁপতে থাকে যেন আকাশ-বাতাস!·····খানিক পরে দেখা গেল তুর্কী-ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব একেবারে ভেঙে গেছে। সার্ভিয়ার রাজা পিটার নিহত এবং তাতার রাজকুমার মহম্মদও আহত। (পরে আহত মহম্মদেরও মৃত্যু হয়)।

এতক্ষণ পরে সুসময় বুঝে মধ্যভাগের সেনাদল নিয়ে স্বয়ং তৈমুর অগ্রসর হলেন। তুর্কীদের বিখ্যাত 'জেনিসারি' পদাতিকরা তৈমুর-চালিত তাতার অশ্বারোহীদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না—তারা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে লাগল।

বেয়াজিদ যেন পাগলের মতন হয়ে উঠলেন। নিজের রক্ষী সৈন্যদের নিয়ে স্বহস্তে কুঠার ধারণ ক'রে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন—কিন্তু বৃথা! রক্ষী সৈন্যেরা কেউ পালাল না বটে, কিন্তু একে একে সবাই মারা পড়ল। একা বেয়াজিদ হ'লেন বন্দী।

এর পরের দৃশ্য হচ্ছে তৈমুরের তাঁবুর ভিতরে। পুত্র সা রুখের সঙ্গে তৈমুর দাবা-বোড়ে খেলছেন। এমন সময়ে বন্দী বেয়াজিদকে নিয়ে তাতার সৈন্যদের প্রবেশ।

তৈমুর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।

বেয়াজিদের আত্মগর্ব্বে আঘাত লাগল। তিনি বললেন, "ভগবান যাকে মেরেছেন, তাকে দেখে উপহাসের হাসি হাসা ভদ্রতা নয়।"

তৈমুর ধীরে ধীরে বললেন, "আমি কেন হাসছি জানো? তোমার মতন অন্ধ আর আমার মতন চক্ষুর উপরেই ভগবান দিয়েছেন কিনা পৃথিবী শাসনের ভার।" তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, "তোমার হাতে বন্দী হ'লে আজ আমার কি হাল হ'ত সেটাও অনুমান করা কঠিন নয়।"

বেয়াজিদ এ কথার জবাব দিতে পারলেন না। তৈমুর হুকুম দিলেন, "সুলতানের বন্ধন খুলে দাও।"

বেয়াজিদ প্রার্থনা জানালেন, তাঁর পুত্রদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে।

রণক্ষেত্র থেকে সুলতানের এক পুত্র—মুসাকে এনে হাজির করা হ'ল। আর এক পুত্র যুদ্ধে মারা পড়েছেন। বাকি ছেলেরা পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

·····ওদিকে নুরউদ্দীন পলাতক তুর্কীদের পিছনে ধাবিত হয়ে বেয়াজিদের রাজধানী ব্রুসা শহর দখল ক'রে ফেললেন। সুলতানের সমস্ত ধনরত্ন হ'ল তৈমুরের হস্তগত।

বেয়াজিদ যথেষ্ট আদর-যত্ন পেলেন বটে, কিন্তু মুক্তি পেলেন না। এক বৎসর আগে তৈমুরকে তিনি যে অপমানকর পত্র লিখেছিলেন, আজ তাঁকে তারই ফলভোগ করতে হ'ল। কিন্তু য়ুরোপবিজেতা বেয়াজিদকে যে চরম অধঃপতনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নি বেশীদিন। মাস-কয়েক পরে বন্দী-অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আঙ্গোরার যুদ্ধের ফলে তুর্কীদের বিষ-দাঁত একেবারে ভেঙে গেল। এর পর দীর্ঘকাল তারা আর মাথা তুলতে পারে নি। পূর্ব্ব-রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ও করলে নিশ্চিত পতন থেকে আত্মরক্ষা।

দুর্দ্ধর্ষ তুর্কী সুলতানের এই কল্পনাতীত পরাজয়ে সমগ্র য়ুরোপ হ'ল বিস্ময়ে হতভম্ব। য়ুরোপীয় রাজা-রাজড়ারা ভয়ও বড় কম পেলেন না—কি জানি, যদি তৈমুরের য়ুরোপ বেড়াবার সখ হয়, তাহ'লেই তো সর্ব্বনাশ! ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস ও ইংলণ্ডের রাজারা তাঁকে খুসি করবার জন্যে অভিনন্দন পাঠাতে দেরি করলেন না। মিশরও নত হয়ে তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করলে।

কিন্তু তৈমুরের য়ুরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা হ'ল না। য়ুরোপের তখনকার রাজারা তাঁর কাছে ছিলেন নগণ্য, তাঁদের রাজ্যে এমন কোন আকর্ষণ বা গৌরবজনক বস্তু নেই, তৈমুরের উচ্চাকাঙ্খাকে যা করতে পারে জাগ্রত। বেয়াজিদের দেশ থেকেই তিনি আশাতীত ঐশ্বর্য্য লাভ করলেন। এবং তাইতেই তুষ্ট হয়ে সসৈন্যে স্বদেশে ফিরে এলেন।

কিন্তু তাঁর চিত্তকে অধিকার ক'রে রইল আর এক উচ্চাকাঙ্খা। তাঁর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হ'য়েছে, বাকি আছে কেবল একটি। "আমি হচ্ছি সমগ্র ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর আমীর তৈমুর—পৃথিবীতে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রেখে যাব না।"

তৈমুরের সামনে জেগে আছে আর একটিমাত্র দেশ! তাকে দমন করতে পারলেই তাঁর সমস্ত কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয়!

তৈমুরের বয়স এখন উনসত্তর বৎসর। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিনি জানতেন, তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। মহাপ্রস্থানের আহ্বান আসবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি শেষ যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে

১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাক্টার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

এই বংশের একটু ইতিহাস এইবার জানা দরকার।

প্রদীপের প্রপিতামহের নাম ছিল হারাণ। ও নামে কিন্তু তিনি পরিচিত ছিলেন না, লোকে তাঁকে জানত হারু ডাকাত ব'লে। ইচ্ছামতীর চরে, ধলেশ্বরীর ধারে, আড়িয়ল খাঁর পারে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় হারু ডাকাতের দলবল দূরের যাত্রীদের পথরোধ ক'রে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করত। এই জলদস্যুর দলকে মহাজন ভারী ভয় করত।

কিন্তু হারু ডাকাতের দলের একটু বিশেষত্ব ছিল এই যে ধনীর, বিশেষ ক'রে অত্যাচারী ধনীর, ধন লুণ্ঠন ক'রে তারা বিলিয়ে দিত দরিদ্র নিরীহদের হাতে।

অর্থাভাবে অন্নাভাবে গরীব বিধবারা যখন রুগ্নশিশু কোলে নিয়ে নিরুপায়ভাবে ক্রন্দন করছে, হঠাৎ তাদের হাতে মোহরভরা থলি এসে পড়েছে কতদিন। কে দিলে, কেন দিলে, তার কোন পাত্তা নেই।

হারাণ তাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বরকে এ সব ব্যাপার থেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন এবং ভালো শিক্ষকের হাতেই তার পড়ার ভার দিয়েছিলেন। নানান্ ভাষা, নানান্ বিষয় মেধাবী ছাত্রের মতন বিশ্বেশ্বর অধিগত করছিল। কিন্তু অনেক রাত্রে পিতা আসেন না, এ সংবাদও তার কাছে গোপন রইলো না।

রাশি রাশি টাকা নিয়ে এসে ভোররাত্রে আলো জেলে বাইরের ঘরে ভাগ-বাটোয়ারা; মাঝে মাঝে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে মায়ের কান্না; আত্মীয়স্বজনদের বকাবকি; সব কিছু জড়িয়ে বিশুর শিশুচিত্ত এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠত। দুল্‌তে দুল্‌তে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ভাবটা কেটে গিয়ে বেপরোয়াভাবের উদ্রেক হল, দলের অন্য অন্য সঙ্গীদের কাছে নানা বীরত্বের গল্প শুনে শুনে তার মনেও ঐ রকম অসমসাহসিক কিছু করবার বাসনা জাগলো। পড়াশোনা উঠলো মাথায়।

নিতান্ত ছোট যখন সে, তখন থেকেই এক সাকরেদের কাছে লাঠি খেলা তার শেখা হল। শেষে এক রাত্রে সে গিয়ে বসলো এক চরে।

অন্ধকার নদীর বুকে একটা নৌকার আলো দেখা গেল, তারপরই সন্‌সন্ ক'রে ছিপ্ চল্‌লো কয়েকখানা। তার 'হারে রে রে রে!' কী ভীষণ আওয়াজ নদীর এপার ওপার কাঁপিয়ে—তারপরেই মেয়েদের গলার আকুল আর্ত্তনাদ। পিতার আড্ডা কুসুমপুরের চর থেকে বিশু এই সব শুন্‌লো। ফিরে এলো খাড়িটায় সাঁতার কেটে।

বৃদ্ধবয়সে হারাণের দল যখন ভেঙে গেছে প্রায়—এলো তৈরী হ'য়ে বিশু সর্দ্দার তেল পাকানো বাঁশের লাঠি নিয়ে। 'বিশু ডাকাত' 'বিশে ডাকাত' প্রসিদ্ধ হ'য়ে গেল গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায়।

লম্বা লম্বা রণ্‌পায় চ'ড়ে বিদ্যুৎগতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে তারা লুটের মাল উত্তর বাংলা থেকে পূর্ব্ব বাংলায় নিয়ে যেত।

রক্তে রাঙা হ'য়ে যেত নদীর জল, রক্তে রাঙা হয়ে যেত বাঁধানো আঙিনা। তিন টাকার জন্যে বিশু খুন করত। বিশু ডাকাতের হাতে কারুর নিস্তার ছিল না।

বৃদ্ধ রুগ্ন হারাণ বার বার বল্‌তেন—ওরে, এত পাপ সইবে না। দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার করিস্ না। আর প্রাণে মানুষকে মারিস্ না। আজ অবধি আমার হাতে মরেনি কেউ।

রাখো তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব—বিশু গর্জ্জন ক'রে উঠত। যে হারু সর্দ্দারের ভ্রূ একটু কুঁচ্‌কে গেলে সা-জোয়ান লোকরা কাঁপ্‌তে থাক্‌ত, আজ সে জরাজীর্ণ ব'লে সেদিনকার-ছেলে বিশু তাকে উপহাস ক'রে যায়! বাপ হ'লেও এতটুকু মানে না। গায়ের জোরে, দলের প্রতাপে বিশ্বেশ্বর তখন ধরাকে সরা দেখ্‌ছে।

হরিণডাঙা গ্রামের ছিটেবেড়ার ঘরে হাঁপানী রোগী সারা রাত কাসে, কাঁথায়, বালিশে সেলাই করা বেচারার কটাই বা টাকা আছে?

রাত দুটোয় এক ধাক্কায় ভাঙা দরজা ভেঙে পড়লো—বুড়ি জিগ্যেস করলে—কে পেসন্ন এলি?

প্রসন্ন বুড়ীর ভাই পো।

উত্তরে একটা হুঁ ব'লেই গলায় পড়লো হাত। খানিকটা ছটফটানি, তার পরেই সব শেষ। অপঘাত মৃত্যুর মুখে বুড়ি জেনে গেল তার ভাইপো তাকে প্রাণে মারলে, যাকে সে মানুষ করেছে। বিছানা বালিশ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে পাওয়া গেল একশো পাঁচ টাকা। তারই জন্যে একটা প্রাণী হত্যা হ'য়ে গেল।

জমিদারের বাড়ীতে সন্ধ্যেরাতে ডাকাত পড়লো। দরোয়ান বেহারা বিশু ডাকাতের নামেই তটস্থ, বাধা দেবে কি? গ্রামের লোক বিশু ডাকাতের গলার আওয়াজেই কাঁপছে, বেরোবে কি! দরজার পর দরজা ভেঙে অবলীলাক্রমে বিশু এগিয়ে চল্‌লো। জমিদারকে বেঁধে বিষম মারলে। মেয়েদের শিশুদের কাউকে বাদ দিলে না। ধর্ম্মভীরু জমিদার অনুনয় ক'রে বল্‌লেন—যা নেবার সব নাও, প্রাণে মেরোনা।

বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো, বড় ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, সিন্দুক ভেঙে যথাসর্ব্বস্ব ধনসম্পত্তি, মেয়েদের গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়ে ধানের গোলা লুট ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। গ্রামের চালা গুলো ধরে গেল। বোম্ কালী, বোম্ মহাদেব, হর-হর বোম্ বোম্,—পাপমুখে ভগবানের নাম করতে করতে বিশুডাকাতের দল রণ্‌পায় চ'ড়ে বস্‌লো।

পাঁচদিন পরে যে দারোগা তদন্ত করতে এলো, যারা সাক্ষী দিতে গেল, সকলকার মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভেসে চল্‌লো।

রাত ছেড়ে সে দিনে ডাকাতি সুরু করলো। বিশু সর্দ্দারের ভয় নেই। কোনোখানে কোনো প্রমাণ সে রাখত না।

হারাণ তখন মারা গেছেন। দলে এসেছে ভাঙন, এসেছে বিশ্বাসঘাতকতা। বিদ্রোহ করছে সব।

সেই সময়ে একদিন ঘন জঙ্গলে মহারাণী বসন্তকুমারীর হাতিতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্বখাজনা চলেছে, বিশু আট্‌কালো পথ। মাহুতকে বল্‌লে, হাতির মাথায় মারো ডাঙস্, করো তাকে পাগল। আমাকে টাকা দিয়ে মানে মানে প্রাণ বাঁচাও।

পাগলা হাতি বন থেকে বনে ছুটে চল্‌লো। ঠিক্ দিনে সদরে খাজনা জমা হলোনা। নীলামে উঠ্‌লো জমিদারী, কিনে নিলে বিশ্বেশ্বর মল্লিক, মহারাণী বসন্তকুমারীর সেরা সেরা মৌজা ও তালুক।

সেই থেকে তিনি জমিদার মহ্‌লন্দপুরের। লোকের চোখে সম্মানিত, রাজার দরবারে সমাদৃত।

স্ত্রী পরিহাস করলে বলেন—বাংলার কথা ছেড়ে দাও, ভারতবর্ষে কজন জমিদার আর রাজা মহারাজা আছেন, নাম করো ত' যাদের পূর্ব্বপুরুষ ডাকাত ছিলনা?

তারপর উঠ্‌লো গঙ্গার ধারে প্রাসাদ। তারপর হ'ল পড়বার ইচ্ছে, আর বইয়ের সখ। এলো মাইনে করা অধ্যাপকরা।

বিশ্বেশ্বর রাজসাক্ষী হ'য়ে ধরিয়ে দিলেন তার দলকে। কেউ গেল ফাঁসী, কেউ বা দ্বীপান্তর। তিনি মুক্তি পেয়ে আরামকেদারায় গিয়ে বস্‌লেন। তাঁর 'দক্ষিণ হস্ত' কুঞ্জলাল বধমঞ্চে ওঠ্‌বার আগে ব'লে গেল, খুন জখম রাহাজানি—কিছুই তুমি বাদ দাওনি। আমরা যা কিছু করেছি—সবি তোমার হুকুমে। করেছ রাশি রাশি অন্যায়, তারপর আমাদের ধরিয়ে দিয়ে নিজে সাধু সেজে স'রে গেলে! এতখানি পাপ কি ভগবান সহ্য করবেন? আইনের বিধান এড়িয়ে গেলে, কিন্তু বিধির বিধান কি এড়াতে পারবে সর্দ্দার? আমি ত এই মুহূর্ত্তে ম'রে শান্তি পাব, কিন্তু তোমার জীবনে তিল তিল ক'রে যে মৃত্যু যন্ত্রণা, তার কথা কি ভেবে রেখেছ?

বিশ্বেশ্বর শুধু হেসেছিলেন।

ভগবান কি আছেন? যদি থাকেন, নিদ্রিত। কত অন্যায় পৃথিবীতে নিত্য হ'য়ে যাচ্ছে, কত অত্যাচার, কত অপরাধ, কী শাস্তি তার দেখা যায়?

হোম যাগ যজ্ঞ পাঁঠাবলি উপাসনার ঘুষ দিয়ে মানুষ কি অনায়াসে মুক্তি পাচ্ছে না?

টাকার গদীর ওপর ব'সে বিশ্বেশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে মৃদু হাস্য করেন মাত্র!

সাত ছেলে চার মেয়ে তাঁর।

বড় ছেলে আর বড় মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—ঘর আলো-করা বৌ, সভা উজ্জ্বল-করা জামাই।

অন্য ছেলেমেয়েগুলি স্বাস্থ্যে বুদ্ধিতে শক্তিতে দীপ্ত।

স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারকে সুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তিনি লাইব্রেরী ঘরে ঢোকেন। দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার, গ্রহউপগ্রহের অসংখ্য খবর! রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের আলো ক্রমে পড়ে তাঁর প্রসন্ন মুখে, বিস্মৃত অতীতকে তিনি ভুল্‌তে চান, রমণীয় ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তুল্‌তে চান। দেখ্‌তে চান বিস্মৃত অতীতের ওপর অনাগত ভাবী কাল তাঁর জন্যে কত পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে।

দশহরায় বাড়ীর পাশে গঙ্গাস্নানে গেছেন, ছোট ছেলে তাঁর চোখের সাম্‌নে ডুবে গেল, কিছুই করতে পারলেন না।

দিন পনেরো বাদে অন্নের গ্রাস সবে মুখে তুলেছেন—বড় মেয়ে একেবারে পাগল হ'য়ে ফিরে এলো খবর নিয়ে জামাই মারা গেছে হার্টফেল ক'রে।

ঝড়ে বাগানের গাছের ডাল ভেঙে প'ড়ে সেজ ছেলে পড়লো আর মরলো।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—বিধাতার বিচার সুরু হয়ে গেছে।

প্রতিকার করতে বেরোলেন।

গ্রামের প্রান্তে বিধবা নিস্তারিণী একটি ছেলে নিয়ে থাকে। সেদিন অপরাহ্ণকালে সেই ছোট ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। সেদিনও পৃথিবী কাঁপিয়ে ঝড় উঠ্‌লো, নিস্তারিনীর ছেলে ফিরে গেল না। অরণ্যের মধ্যে পুরাতন ডাকাতে কালীর সামনে যে এক নরবলি দেওয়া হয়েছিল সকল গ্রহের শান্তির জন্যে, সে কথা তার মা জানলো না। 'ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও' ব'লে অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে সে ফিরে গেল।

বছর না ঘুরতেই পঞ্চম পুত্র আর ছোট মেয়ে এমন জ্বরে পড়লো যে, ছমাসের বেশী বাঁচলো না।

নিজে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হ'য়ে বিশ্বেশ্বর শুন্‌লেন—বড়ছেলের কুষ্ঠ দেখা দিয়েছে, বড় বৌ আত্মহত্যা করলো। এক একটা আঘাত শেলের মতন এসে বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো।

বংশ যখন যেতে বসেছে, তখন তাঁর নজর পড়লো বড় নাতি—একমাত্র পৌত্র প্রদীপের দিকে। রুগ্নকণ্ঠে তিনি আর্ত্তনাদ ক'রে বল্‌লেন—বাঁচাও, ওকে আগে বাঁচাও। বাঁচাও ওকে সমস্ত বিপদ্ থেকে। ও থাক্‌লে, আমার সব থাক্‌বে।

সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে ঘুমন্ত প্রদীপের গলা কে টিপে ধরেছে। [ক্রমশঃ

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

সে তো শেখে নাই কারে বলে শেষমরণ কাহারে কয়,
জীবনের সুরে ছিল তার রেশ আত্মার হ'বে জয়।
দূরকে নিকট আত্মীয়তার দিয়েছিল নব বাণী
অসীমের গানে দূর পরপার ছিল তার সন্ধানী।
অন্তরে তাঁর শত সূর্য্যের তীর্থের আঙিনায়
স্বপন দেখেছি মোরা ঊর্ধ্বের সকাল ও সন্ধ্যায়।

বিশ্বের কবি, বাঙলার বীর দেশেরে বেসেছে ভালো,
ভীরু ভারতের তমসার তীর লভিয়াছে তাঁর আলো।
সন্ধ্যাতারার মতো জ্বলে তার ঝিল্‌মিল্ রোজ বাতি,
নূতন স্বপনে আসিবে সে পুনঃ মানুষের হ'বে সাথী।
আশিসে তাঁহার মোরা বেঁচে আছি মরিব না কোনো দিন,
পূব দিগন্তে নব সুর যাচি সাধিবারে নব বীণ।

ক্ষুব্ধ মলিন আঁধারের ছায়া জ্যোছনায় ওঠে হাসি',
সারা মানবের পরাণের মায়া মৃত্যুরে দেয় ফাঁসি।

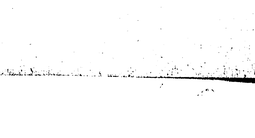

রংমশাল

গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনা

'শাঙন প্রাতে'

শ্রীরেবারাণী রায় (১৮৬৬)

'শাঙন প্রাতে' সারা সকাল, দেখ্‌ছি কেবল চেয়ে,
পশ্চিমে ওই ভীড় করেছে কাদের কালো মেয়ে,
কালো রূপের মধুর আলো,
আজিকে মোর মন ভুলালো ;
বর্ষারাণীর ঝর্‌ঝরাণী সকল আকাশ ছেয়ে।

ঘোম্‌টা খুলে ঝিলিক দিয়ে মেঘ পরীরা চায়,
ডাক্‌ছে দেয়া গুরু গুরু, হৃদয় দুরু হায়।
অধীর আজি চাতক পাখী,
"জল দে' আরও" বল্‌ছে ডাকি।
মৌমাছিরা মায়ে পোয়ে জুটলো কেয়ার ছায়।

বর্ষারাণীর পরশ পেয়ে কদম ফুলে জাগে,
শাপ্‌লা দোলে মৃদুল বায়ে ঢেউয়ের পরশ লাগে।
ভুঁইচাঁপা ফুল হঠাৎ আজি,
থোকায় থোকায় উঠলো সাজি',
হানাহানি জুঁইএর দলে পাগল বাতাস রাগে।

নীল আকাশে পালটি তুলে সাদা বকের দল,
বইছে হাওয়া জাগ্‌লো নদী হঠাৎ কলকল্।
বর্ষা হঠাৎ আসলো বলে,—
এলো মেলো সবাই জলে,
শাঙন প্রাতে সকল হেরি তাই বুঝি ছল্‌ছল্।

সাহিত্যিকের আত্মহত্যা

সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮০৫)

গৌরচাঁদ বটব্যালের কথাই বলছি। আমাদের দলের মধ্যে থেকে যে কি ক'রে একটি ছেলে এভাবে একেবারে বেয়াড়া ধরণের জিনিষে মত্ত হ'লো, বুঝতে পারি না। গৌরচাঁদ সাহিত্যিক, আর আমরা সকলে কুস্তিগির। সকালে রোজ আদাছোলা খেয়ে ডন, বৈঠক, কুস্তি করি। গৌরচাঁদ আমাদের মায়া ত্যাগ করতে পারে না ব'লে আখড়ায় আসে, কিন্তু সেখানে ব'সে সে কবিতা লেখে।

জনান্তিকে বলে রাখি, তার কবিতা সে নিজে ছাড়া আর কেউ পড়ে না। এমন কি কাগজের সম্পাদকেরাও না। কত কথাই শুনি, একবার নাকি কোন এক সম্পাদক তার লেখা খারাপ হয়েছে বলে ফেরৎ দিয়েছিলেন, তার ফলে তাঁর নামে গেছিল চারটে মোটামোটা খাতা, প্রত্যেকটাই গৌরচাঁদের কবিতায় ভর্ত্তি। গৌরচাঁদ তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকত্বে ভূষিত ক'রে সবিনয়ে জানিয়েছিল যে ওই কবিতাগুলি অমনোনীত হ'লে আরও কুড়িটা খাতা পাঠিয়ে দেবে। সম্পাদক মশাই নিলেন ছ'মাসের লম্বা ছুটি, আর প্রেসের কম্পোজিটাররা সকলে নাকি চাকরি ছেড়ে দিল।

তারপর অনেক সম্পাদকেরই সে দ্বারস্থ হয়েছে এবং তার খাতার বহর দেখে দু'একটি লেখা ছাপিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করেন। সুতরাং সে আমাদের একটু কৃপার চোখে দেখে। প্রত্যেক সাহিত্য-সভায় তার যাওয়া চাই-ই এবং বসবে গিয়ে সমস্ত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের মধ্যমণি হ'য়ে। শোকসভায় তার কবিতা শুনে সকলেরই চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে।

ওকে নিয়ে আমাদের মুস্কিল কম না। নেমন্তন্ন হ'লে ওকে বাদ দিয়ে তো আর যাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে গিয়ে ও এমন কাণ্ড করবে যার জন্য আমাদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বরযাত্রী হয়ে একবার গেছি স্বরূপকাঠি। গান বাজনার আসরে বসে হঠাৎ খেয়াল হ'লো গৌরচাঁদ আমাদের পাশে নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখি, পুকুরের একটি ঘাটে বসে গৌরচাঁদ তার কবিতা আবৃত্তি করছে এবং সেই শীতের মধ্যে একগলা জলে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো, চোখে মুখে তাঁর অত্যন্ত কাতরতা এবং অসহায়ের ভাব। ব্যাপারটা বুঝলাম। তখন গৌরচাঁদকে আমরা ঘাড় ধ'রে টেনে নিয়ে এলাম আমাদের আসরে। এই ব্যাপারের পরেরটুকু একটু ট্র্যাজিক। সেই বুড়ো নাকি ডবল নিমোনিয়াতে মারা যান এবং সব সময়ে প্রলাপ বকেন—

কাকেরা গাইছে গান শরতের ফুলের মত
রাশিয়াতে আলু নেই,
কালোর মতন আলোয় সকালে নেমেছে যত দিন,
চায়নার পাশে আছি আমি।

কবিতাটি আমাদের গৌরচাঁদের।

আমাদের পাড়ার বিশুবাবু মারা যাওয়ার তাঁকে নিয়ে আমরা শ্মশানে গেছি। বিশুবাবুর বড় ছেলে শ্মশানে একটি গাছের নীচে চুপ ক'রে বসে আছেন। হঠাৎ দেখি তাঁর পাশে আমাদের গৌরচাঁদ বসে। ছুটে গেলাম, আবার না জানি কি কাণ্ড করে! গিয়ে শুনি, গৌরচাঁদ বলছে—মন খারাপ করে আর কি করবেন? সকলে তো আর চিরকাল থাকে না। তার চেয়ে আসুন একটু সাহিত্যচর্চ্চা করি, মনটাও প্রফুল্ল হবে—

অমল আর সইতে পারলো না। গৌরচাঁদের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে এলো। গৌরচাঁদ রাগে গরগর করতে করতে বললো—হ্যাঁ, তোমরা বুঝবে কি সাহিত্যের কদর?

একটা বুড়ো এবং অতিশয় মোটা ষাঁড় শুয়েছিল। তাকে দেখিয়ে বললো—স্বাস্থ্য চর্চ্চা করে তো ওইরকম ষণ্ডবৎ হয়ে পড়ছো।

গৌরচাঁদ দিন দিন মন মরা হয়ে পড়ছিল। একটুকুতেই আমাদের বলে—আমাদের দেশের উন্নতি কোনদিন হবে না। সাহিত্যকে কেউ একটু স্থান দিতে চায় না, শুধু খেলা আর সিনেমা। তাদের বাড়ীতে অতিথি প্রায়ই কেউ হতেন না। কারণ তার বাবার জেরায় পড়ে যদিও বা কেউ আতিথ্য নিত, কিন্তু গৌরচাঁদের সাহিত্য-চর্চ্চা বরদাস্ত করতে না পেরে সেই সহর ছেড়ে পালাতে হতো।

এক সন্ন্যাসী গৌরচাঁদের বাবার হাত হ'তে নিস্কৃতি পেয়ে পরিপাটি করে বসেছেন এমন সময় গৌরচাঁদ সেই ঘরে হাজির। সাধু সন্ন্যাসীর উপর সাধারণতঃ প্রত্যেক স্কুলের ছেলেদের একটু রাগ থাকে। তাই আমরা মজা দেখবার জন্য সেই ঘরে চুপি চুপি হাজির হলাম।

গৌরচাঁদ প্রথমেই বললো—ভাত খাওয়ার একটু দেরি আছে। আসুন একটু সাহিত্যচর্চ্চা করা যাক্।

সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, গৌরচাঁদও কম অবাক হয় নি। তবু সে বললো—তবে আধুনিক সাহিত্যই ধরা যাক।

সন্ন্যাসী বললেন—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগের সাহিত্য নিয়ে চর্চ্চা করলে আপনার আপত্তি আছে কি? আমার ওই সাহিত্যটা একটু ভাল ক'রে পড়া আছে।

গৌরচাঁদের আপত্তি ছিল ষোল আনা। কিন্তু আমাদের সামনে ছোট হ'তে সে রাজি নয়। তাই বললো—না, না—এমন আর আপত্তি কি?

সন্ন্যাসী বললেন—আসুন তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য নিয়েই পড়া যাক। ওঁর বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ সত্যিই কি অপূর্ব্ব বই! আচ্ছা বানান করুন তো "উপচিকীর্ষা"।

আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি, গৌরচাঁদও তাই। সন্ন্যাসী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—কৈ, সাহিত্যচর্চ্চা করছেন না কেন? আচ্ছা, ওর বানান পারলেন না। তবে বানান করুন তো "ত্র্যম্বকার্জ্জুন" কিংবা উর্দ্ধান্ত, কিংবা "মূর্দ্ধন্য"—

গৌরচাঁদের অবস্থা দেখে আমাদের হাসি পেয়ে গেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন—ওটা, যখন পড়া নেই, তখন এখন তবে অন্য কারও সাহিত্য নিয়ে পড়া যাক্।

গৌরচাঁদ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ওসব কটমট বানান নেই তো!

সন্ন্যাসী বললেন—বেশ, এবার তবে লোহারাম শিরোরত্নের সাহিত্য ধরা যাক। আচ্ছা বলুন তো "অহর্নিশ" কি সমাস? কিংবা "সার্ব্বজনীনের" উৎপত্তি কি? বলুন তো "বিজিগীষা" মানে কি? "বিহগ" শব্দে খ-প্রত্যয় হবে না খ-প্রত্যয় হবে?

গৌরচাঁদের অবস্থা কাহিল। সন্ন্যাসী রাগের চোটে তাঁর তেলমাখানো লাঠিটা মাথার উপরে তুলে ফেলেন। চীৎকার করে বলে উঠলেন—সাহিত্যচর্চ্চা করতে এসে পিছিয়ে গেলে চলবে না। বলুন—

সেই লাঠির দিকে একবার তাকিয়ে গৌরচাঁদ চোঁ চোঁ দৌড় দিল। আমরাও বেগতিক দেখে তার পদানুসরণ করলাম।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সাতদিন পরে দেখি গৌরচাঁদ আমাদের আখড়ায় কুস্তি করছে। বললো—সাহিত্য ছেড়ে দিয়েছি। স্বীকার করলো, সেই সন্ন্যাসীর মতো বড় সাহিত্যিক সে আর দেখে নি। রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে থাকা যায়, কিন্তু ওই সন্ন্যাসীর সামনে—বাব্বাঃ।—

পাহাড়ের স্মৃতি

শ্রীপথিক (১৮৪২)

সুসঙ্গের উত্তর প্রান্তে, পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত সুবিশাল গারো পাহাড়। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। এতদিন এর অনুপম শোভা দূর থেকেই দেখে এসেছি। কিন্তু এর ভিতরকার নানা দৃশ্যের কথা ও অন্যান্য কৌতূহলদীপক ব্যাপারের কথা শুধু লোকমুখেই শুনে এসেছি।

তখন বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাস। শীত তার আগমন বার্ত্তা ঝিরঝিরে হাওয়ার ভিতর দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে। এসময়টাই পাহাড় ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। আমরা চার বন্ধুতে ঠিক করলুম যে, যে কোরেই হোক এবার গারো পাহাড়ের কিছুটা অংশ অন্ততঃ বেরিয়ে আসতেই হবে। সমতল জায়গার চেয়ে পাহাড়ে শীত অনেকখানি বেশী। তাই, অগ্রহায়ণ মাস হ'লেও আমাদের মাঘমাসের উপযুক্ত দেহাবরণ নিয়েই যেতে হয়েছিল।

যেদিন আমরা রওনা হবো, তার আগের দিন বৈকালেই সব ঠিকঠাক করে ফেল্‌লুম। আমাদের সাথে পথপ্রদর্শক ও চাকর হিসেবে যাবে রামু। কারণ রামুর এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমরা রওনা হলুম। রামুর কাছে আমাদের সব খাবারের জিনিষ রইল।

বেলা সাড়ে ছ'টা আমরা ফাড়ং পাড়া ছাড়িয়ে চলেছি। পূর্বদিকে চেয়ে দেখলুম, কে যেন আকাশে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চলার পর দেখলুম সূর্য্যদেব উদিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর যেন একটা কেমন কেমন ভাব, মনে হয় তাঁর অলস নিদ্রালু ভাবটা যেন কাটেনি।

রামু আমাদের উৎসাহ দিয়ে বল্‌লে—"তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়ে চলুন, রোদ বেশী কোরে উঠলে আর চলতে পারবেন না। এখন'ত সবে ফাড়ংপাড়া ছাড়িয়েছেন, ভবানীপুর আরও মাইল তিনেকের পথ। সেখানে গিয়ে পৌঁছলে কতকটা নিশ্চিন্ত, আজকের মত সেখানেই থাকতে হবে।"

রামুর একথা শুনে আমরা খুব জোরে চলেছি। রামু কিছু পিছনে ছিল। আমরা একটা পার্ব্বত্য ঝরণা অতিক্রম করে এক জায়গায় দেখি, গারো স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে মাদল বাজাচ্ছে আর নাচ সুরু করে দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এ দৃশ্য দেখ্‌ছি, এমন সময় রামু বল্‌লে যে এটাকে গারোদের 'পাবন' বলে। কতটুকু জায়গায় তারা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে যে, এখানে তারা পাবন করবে। তাদের দলের লোক ছাড়া যদি অন্যলোক এই সীমানার ভিতরে প্রবেশ করে তবে তারা তাকে মেরে ফেলবে অথবা তার কোন একটা ভীষণ অনিষ্ট করবে। এটাই হলো তাদের নিয়ম। যে জায়গাটায় তারা পাবণ করছে, সে জায়গা দিয়ে আমাদের যাওয়ার 'সোজা' পথ। কিন্তু পথ থাকলেও সেখান দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সে জন্যেই আমাদের অন্য রাস্তা ধরতে হলো। প্রায় এক মাইল ঘুরে আরও গোটা দুই ঝরণা পার হয়ে যখন আমরা ভবানীপুর পৌঁছলুম, তখন বেলা সাড়ে ন'টা।

ভবানীপুরে সুসঙ্গ রাজবাড়ীর একটী সুন্দর 'বাংলো' আছে। 'বাংলো'টী একটী ছোট পাহাড়ের উপর। সমতলভূমি থেকে তার উচ্চতা হবে প্রায় আড়াইশ' ফিট। সে বাংলোর পাহারাওয়ালা সেখানকারই এক গারো। সে আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করলে। ঘর খুলে পরিষ্কার করে দিলে। মানে, আমাদের যাবতীয় সুবিধেই সে করে দিলে। একথা বলা বাহুল্য যে আমরা সেখানে পৌঁছেই আমাদের প্রাতরাশ সম্পন্ন করলুম।

ভবানীপুরের উত্তর দিককার দৃশ্য অতি মনোরম। 'সোমেশ্বরী' নদী ভবানীপুরের পাশ দিয়েই কলকল করে চলেছে। আর একদিক দিয়ে একটা খুব বড় ঝরণা এঁকে বেঁকে গিয়ে নদীতে মিশেছে। এ জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর। ভবানীপুরের অপর দিকে বিজয়পুর পাহাড়। এ জায়গাটাও খুব সুন্দর। বিকেল বেলায় আমাদের বিজয়পুর যাবার খুব ইচ্ছে হলো। বাংলোর ঐ গারো পাহারাওয়ালাকে আমাদের ইচ্ছাটা জানালুম। সে সম্মত হলো। ঘাটেই নৌকা ছিল। আমরা সেই নৌকায় উঠে পাড়ি দিলুম। সেখানে কিছুক্ষণ ঘুরাফিরি করে, যেস্থানে 'বাংলো' তৈরী হচ্ছিল সে স্থানটায় গেলুম। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য এইত সুন্দর, এতই মনোমুগ্ধকর যে, সেখানে গিয়েই আমার মনে পড়লো বিশ্বকবির একটি কবিতা। তিনি শিলং পাহাড়ের বর্ণনা করে লিখেছেন :

মেঘ বিছানো শৈলমালা গহন মায়া অরণ্যে
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, কোলে আমার শরণ নে।
... ...
বেশ আছি এই গিরিবনে যখন তখন ফুল তুলি,
নাম না জানা পাখী ডাকে শিষ দিয়ে গায় বুলবুলি।

সূর্য্যদেব তখন আকাশের গায়ে এলিয়ে পড়েছেন, আর তারই রশ্মি কিছু কিছু করে গিরিচূড়ায় পড়ে তাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে।

আমরা যখন ভবানীপুর এসে পৌঁছলুম, তখন পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিক থেকেই নানা জাতীয় পশুর ডাক শুনতে লাগলুম, যা আমরা ইতি পূর্ব্বে কোথাও শুনিনি। রাত্রি দশটার মধ্যেই আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে পথশ্রম ক্লান্ত দেহ বিছানার কোলে এলিয়ে দিলুম। পরদিন যখন ভোরের আলোয় চোখ মেলে চাইলুম, দেখলুম—চারদিকেই কুয়াসা, কেবল কুয়াশা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলুম কুয়াশা একটুও পরিষ্কার হলো না, তখন আমরা আমাদের প্ল্যান মতো—বংবাদোর যাবার জন্যে তৈরী হয়ে পড়লুম।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নদী পার হয়ে, বংবাদোরে পৌঁছলুম। সেদিন হাটবার ছিল না, তাই বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। কয়েকটা ছোট খাটো দোকান-পাট এখানে স্থায়ী ভাবেই আছে। এ ছাড়া হাটবারে বহুদূর থেকে গারোর দল জিনিষ বিক্রী করতে আসে। এ বাজারে বেশীর ভাগই বাঁশ, কাঠ প্রভৃতির আমদানী হয়। এখানে একটা Forester's office আছে। তারা বাজারের শুল্ক আদায় করে। তাঁদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া আর সবাই গারো। এ বাজার থেকে Forest গভর্ণমেণ্টের আয় নাকি অনেক টাকা।

বংবাদোর ও তার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গাসমূহ দেখে, আমরা আরো উত্তর দিকে এগোতে লাগলুম। কিছুদূর এগিয়ে আমরা একটা পাহাড় দেখতে পেলুম। পাহাড়টায় গাছপালা কিন্তু কিছু নেই। শুধু পাথর। পরিষ্কার ঝরঝরে পাথর। পাহাড়টী বেশ উঁচু। উপরে উঠবার রাস্তাও আছে। সবাই আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। কিছু উপরে যখন উঠলুম, তখন দেখি আমাদের বাঁ দিয়ে একটী সুন্দর ঝরণা বয়ে চলেছে। আরও কিছুদূর উঠে দেখি আরও একটা ঝরণা,—তবে এটা আগেরটার চেয়ে অনেক ছোট। এমনি উঠতে উঠতে আমরা প্রায় সাতটা ঝরণা দেখতে পেলুম। এ ঝরণা গুলোর জল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি পরিষ্কার। সবার উপরে উঠে আমরা একটা সুন্দর জায়গায় বিশ্রাম করতে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে চেয়ে দেখি পাহাড়ের গায়ে নানারকম নাম খোদাই করা রয়েছে। বুঝলুম আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীরা তাদের নাম লিখে রেখেছে। আমরাও টুকরো পাথর দিয়ে পাহাড়ের গায়ে আমাদের নাম লিখলুম।

তারপর আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলুম। হঠাৎ এক জায়গায় আমার নজর পড়তে, দেখলুম, সেখানে নানা রংয়ের টুকরো টুকরো পাথর রয়েছে। আমরা সেগুলি ইচ্ছামত কুড়িয়ে নিলুম। তারপর ক্রমেই বেলা হয়ে যাচ্ছিলো বলে বাংলোয় ফিরলুম। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার একটু বের হলাম। পথে একজন গারোর সাথে দেখা হলো। সে তার পিঠে ঝোলানো ঝাঁকা থেকে আমাদের প্রত্যেককেই পার্ব্বত্য আলু দিলে। তার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে বাংলোয় ফিরলুম। সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে আমরা বেলা পাঁচটায় বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। এবার আমরা অন্যপথ ধরে চললুম। চল্‌তে চল্‌তে আমরা এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে সন্ধ্যা হলো। সে জায়গাটার একধারে পাহাড় আর তারই পাশ দিয়ে চলেছে পায়ে, চলা পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে চাঁদের উদয় হোল। চাঁদের আলোতে সমস্ত জায়গাটাকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। সমগ্র বনভূমির যে দৃশ্য হয়েছে তা' দেখে চোখ ফেরানো যায় না। বনভূমির শোভা রাত্রে যে এত সুন্দর হয় তা আমাদের কল্পনার বাইরে। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত মমতা দিয়ে এ বনভূমিকে সৃষ্টি করেছেন। এমন সময় আমাদের এক বন্ধু 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। সময়টা এবং জায়গাটা প্রাণ ঢেলে গাইবার পক্ষে উপযুক্ত। তারপর আমরা আস্তে আস্তে চলতে লাগলুম। ক্রমে ক্রমে আমরা সুসঙ্গ রাজবাড়ীর সম্মুখে এসে যখন পৌছলুম তখন রাত্রি ন'টা। রাজবাড়ী থেকে আমাদের কারুই বাড়ী বিশেষ দূর নয়। একে একে অন্যান্য বন্ধুরা নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চল্‌লেন। আমিও বাড়ীমুখো হ'লুম। বাড়ীটে পৌছতে আধ ঘণ্টা লাগলো। বাড়ী পৌছতেই ভাই বোনদের আনন্দ হলো সব চেয়ে বেশী। তারা আমায় নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলো। আমিও আমার ভ্রমণ কাহিনী তাদের বললুম। যদিও কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা পাহাড় ভ্রমণে গিয়েছিলুম কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তার একটী মোহন ছবি মনের কোনে অঙ্কিত রয়েছে।

তালগাছ

আজমাতুন্‌নিসা বেগম (১৯৩৪)

প্রথম যবে দেখি ওরে চেয়ে—
পাশের বাড়ীর এইটুকু এক মেয়ে—
চপলতায় ছোট্ট তনুভরা,
ধরাকে সে বলেই নাকো ধরা !
দুষ্টু আমার পড়ার ঘরে ঢুকে,
হিজিবিজি কাট্‌তো খাতার বুকে ;
বই খুলে সব রঙীন্ ছবিগুলি,
রাঙিয়ে দিত নতুন রঙে, চালিয়ে দিত তুলি !
বল্‌লে কিছু জোরে,
জুতোজামা নিয়ে আমার পালিয়ে যেতো দূরে !
আপন মনে কাব্য লিখি যবে,
লুকিয়ে এসে, পেছন পথে হবে,
হাতের কলম কেড়ে নিয়ে, দুষ্টু চপল মেয়ে,
হাস্‌তো আমায় চেয়ে।
কত না দিন কলেজ থেকে ফিরে
দেখেছি, সে দাঁড়িয়ে নত শিরে !—
সামনে আমার পড়ার টেবিলখানা ;
লাল কালো সব কালির রেখা টানা,
আজ্‌ওবি যে কত কী-না মরি,
এঁকেছে সে মনের মতো করি !

রাগ যেতো মোর চ'ড়ে,
তাড়িয়ে দিতাম গাল দুটোকে ধ'রে !
পালিয়ে যেতো হয়ত নয়ন-নীরে,
একটু পরেই আস্‌তো আবার ফিরে—
পেছন থেকে চোখ টিপে মোর ধ'রে
বল্‌তো, "এখন পড়্‌বে কেমন ক'রে ?"
কর্‌বো কী আর ছাই !
টেনে নিয়ে বলতাম, "কই আয় !"
দুষ্টুমি যার শাসন নাহি মানে,
বিদ্ধ তারে কর্‌বো কিসের বাণে !
সোহাগ দিয়ে তাইতো নিতাম বাঁধি !
অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌তো অপরাধী—
"মার্‌লে কেন ? তোমার সাথে আড়ি !"
হায়রে আমি কর্‌তে কী আর পারি,
শুধু বক্ষে টানি—
ললাটপটে এঁকে দিতাম স্নেহের পরশখানি !

পরসে আমার বল্‌বে কে-বা ওকে !
আমার বিশ্বলোকে—
সে যেন রে আপন হ'তেও কাছে ;
শাসন করার পালা এলে সংগখানি যাচে,
সোহাগ কর্‌তে গেলে,
অভিমানে বসে একটু হেলে !—
সবার সে যে অতি মধুর ভাই,
তুলনা তার নাই !
সেই,
ও দিন এখন নেই !—

পুরোপুরি দশটি বছর কাল,
বিদেশ ঘুরে কাটিয়ে এলাম কা'ল !
সেই আগেকার পড়ার ঘরে মোর,
সকাল বেলা একলা আছি ভোর,
রবিবাবুর নতুন কাব্য নিয়ে,
দুয়ার খুলে ঐ যে ও-পাশ দিয়ে,
কাছে এলো : চিনে নিলাম দেখে—
বক্ষঃপটে ছবিখানি আপনি গেল এঁকে !
মনে হ'লো এইটুকু সে হ'য়েছে বেশ বড়,
পূর্ণ দেহে পূর্ণ দড়'শড়',
আঁখির কোণে তবুও সেই রেশ
চঞ্চলতার, কাঁপ্‌চে অনিমেষ !

দুষ্টু মেয়ে বল্‌লে আমায় হেসে—
তেম্‌নিতর পরিচিতার বেশে—
"চিন্‌তে পারেন ? আমি যে সেই মণি !
আজকাল তো বড় হ'য়েছি শুনি !"—
নয়নপটে উঠ্‌লো আমার ভেসে,
দশ বছরের আগের ছবি এসে !
স্নেহের ভারে ছল্‌কি উঠি হিয়া,
আমার ধরা উঠ্‌লো আকুলিয়া !

মনে আসন কর্‌লো যে রে জয়—
তারে কি আর এম্‌নি ভোলা হয় !
হেসে বলি, "আছ তেমনি ঠিক !"
আমার পানে তাকিয়ে অনিমিখ,
ভাব্‌লে কি সাত পাঁচ ;
বল্‌লে হেসে, "মা যে বলে হ'য়েছি তালগাছ !"

গল্প হলেও সত্যি !

অশোক সেনগুপ্ত (১৯০১)

(এক)

ভারতের কোন প্রদেশের একটি ছোট স্কুল। মাষ্টার মশায় পড়াচ্ছেন। যেমনি তিনি রাগী তেমনি আবার রুক্ষ। কোত ছেলেই তার মুখের ওপর কিছু বল্‌তে পারত না। এমন কি পড়া বলার সময়ও তারা ঠক্ ঠক্ কোরে বলির পাঁঠার মত কাঁপ্‌তে থাকে।

সেই ক্লাশে একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে পড়তো। মা-বাপ কেউ নেই তার। ভাল-ছেলে বোলে সমস্ত স্কুলের মধ্যেই তার বেশ সুনাম ছিল। বড় বড় অঙ্ক যা' সেই ক্লাশের-ই অন্যান্য ছেলের পক্ষে কঠিন, সেই ছেলেটি সে-সব অঙ্ক চোখের পলকে শেষ কোরে দিতে পারত। তা' ছাড়া ভূগোল, ইতিহাস কিছুতেই কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

একদিন মাষ্টার মশায় বোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে দিলেন। সেটি দেখে সমস্ত ছেলের-ই চক্ষু চড়কগাছ! তারা তো এ সব অঙ্ক করে নি কখনো! আজ তবে সবার ভাগ্যেই মার আছে? মাষ্টার মশায়ের মুখ কিন্তু গম্ভীর। চকটাকে টেবিলে রেখে ছাত্রদের বল্লেন, "যে এই অঙ্কটি কোরে দিতে পারবে, সেই-ই আজ সামনের বেঞ্চে এসে বসবে। আর যারা পারবে না তারা সবাই কানমলা খাবে—এই পনের মিনিট সময় দিলাম। নাও আরম্ভ করো",—ব'লে তিনি একটা বই নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

কিন্তু 'আরম্ভ ক'রো' বল্লেই তো আর আরম্ভ হয় না! ছেলেরা সব অঙ্কটির দিকে চেয়ে হা কোরে বসে রইলো, কখনো ঘড়ির দিকে চায়, কখনো পাশের ছেলের খাতা দেখে, সমস্ত ক্লাশের-ই এই অবস্থা। দশ মিনিটের মধ্যে কারো খাতায় একটা আঁচড়-ও পড়লো না। মাষ্টার মশায়কে-ও কিছু জিগ্যেস করতে পারে না, পাছে মার খেতে হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটি টক্ টক্ কোরো অঙ্ক কোরে যেতে লাগলো। তার আশেপাশের ছেলেগুলো সেই দেখে' যা' তা' কোরে খাতা ভর্তি কোরে টেবিলে রেখে এলো। মাষ্টার মশায় সে-সব দেখেও কিছু বল্লেন না, নির্বিকার ভাবে বই পড়ে যেতে লাগলেন। তার কিছু পরে সেই ছেলেটি তার অঙ্ক নিয়ে এলো। তখন মাষ্টার মশায় ক্লাশের দিকে একবার চেয়ে এক একটা খাতা নিয়ে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে মাথা তুলে বল্লেন, "উঁহু, তোমরা কেউ অঙ্কটি করতে পারো নি।" তারপর সেই ব্রাহ্মণ ছেলেটির দিকে চেয়ে বল্লেন, "গোপাল, শুধু তোমার করা অঙ্ক-ই ঠিক্ হয়েছে। তুমি সামনের বেঞ্চে এসে বোসো, আর যারা যেখানে বোসে আছে, তাদের কাণ ধরে তুলে' দাও—।"

সেই ছেলেটি উঠে বল্লো, "না স্যার, তা' আমি পারব না।"

"কেন?"

"এই অঙ্কটি আজই সকালে আমার দাদা কোরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেইটে-ই আমি করেছি, এতে আমার কোন বাহাদুরী নেই। অন্যায় ভাবে আমি নাম কিন্‌তে চাই না···।"

ছেলে বেলায় এ' রকম সৎ ছিলেন বলে, ভবিষ্যতে এই ছেলেটি-ই একজন বড়ো দেশপ্রেমিক হতে পেরেছিলেন। ইনি কে জান? মহাপ্রাণ গোখলে।

এক-ই দেশের ছেলে হোয়ে তোমরা-ও পারবে নাকি এ' রকমটি হতে?

(দুই)

কোলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে একটি স্কুলের একজন শিক্ষক নূতন-করা প্রশ্নাবলী দেখাতে এসেছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার মশাই তখন কী লিখ্‌ছিলেন, সেটা তুলে রেখে প্রশ্নগুলো পড়তে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, এ সব আমার কাছে থাক্। কাল বেলা ঠিক্ দশটার সময় নেয়ে খেয়ে একবার এখানে আসবেন, এখন যেতে পারেন—।" শিক্ষকটি তখনকার মতন উঠলেন।

তারপর দিন তিনি ঠিক্ সময়ে-ই এসে উপস্থিত হলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার মশায় তাঁকে সেখানে বসিয়ে বাড়ীর ভেতর চোলে গেলেন। তারপর এক গাদা সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল এনে বল্লেন, "আমি আপনার সব প্রশ্ন-ই দেখেছি, সে-সব বেশ ভাল-ই হ'য়েছে, কিন্তু এই প্রশ্নটার উত্তর এখানে বসে করে দিন্ তো! তিন ঘণ্টা সময় দিলাম, এই নিন্ কাগজ, পেন্সিল—।" বোলে তিনি আবার লেখায় মন দিলেন। শিক্ষকটি প্রথমে বেশ হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভাইসচ্যান্সেলার মশায়ের গম্ভীর মুখ দেখে তিনি প্রশ্নের উত্তর লিখতে আরম্ভ কর্লেন।

এক ঘণ্টা···দু' ঘণ্টা···আড়াই ঘণ্টা···তিন ঘণ্টা···সাড়ে তিন···চার···সাড়ে চার···তাঁর উত্তর লেখা আর শেষ হয় না, তখনো লিখে-ই চ'লেছেন। ভাইসচ্যান্সেলার মশায় তাঁর কাছ হ'তে খাতা নিয়ে দেখেন, শেষ হতে তখনো ঢের বাকী। ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে তিনি শিক্ষকটিকে বল্লেন "দেখুন, এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর লিখতে আপনার তিন ঘণ্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘণ্টা লাগালো, এতেই বুঝছেন প্রশ্নটা কত শক্ত? ছাত্ররা তবে অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে এর উত্তর চার ঘণ্টার মধ্যে কী কোরে শেষ করবে, বলুন? অথচ এইটাতে-ই তো দেখছি সব চেয়ে বেশী নম্বর রয়েছে! ছাত্ররা বেশী নম্বর পাওয়ার লোভে এটি করতে গিয়ে সমস্ত সময় কাটিয়ে দেবে, এই তো আপনার মতলব?···আপনারা কি কখনো কোনো প্রশ্ন লেখার পর ভেবে দেখেন না, এটা যাদের জন্যে করা, তাদের পক্ষে শক্ত হবে, না, সহজ হবে? আপনাদের মত শিক্ষকের জন্যেই আমাদের দেশের ছাত্ররা কখনো 'মানুষ' হতে পারে না।" তারপর একটু হেসে বল্লেন, "আপনাকে এত কথা বল্‌লাম বোলে কিছু মনে করবেন না, আমাকে বাধ্য হয়েই একটু কঠিন হতে হোল। যাই হোক্, আজ দুপুরে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন···!"

ছাত্র-বন্ধু এই ভাইস-চ্যান্সেলার মশায়টি কে জান? বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ।

এই পৃথিবীতে অন্য লোকের মনের মতন হোয়ে যে চল্‌তে পারে, যার কোন কথা বা আচরণে অন্যের মনে ঘা' না লাগে, তাকে সবাই ভালবাসে। স্যার আশুতোষ এই জন্যেই আজো আমাদের স্মরণীয় হোয়ে আছেন আর চিরদিন থাকবেন-ও।

বাঙ্‌লা ভাষার উন্নতির চেষ্টা

সতীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (১০৭৯)

সাহেবমুখো বাঙালীরা বাঙ্‌লাভাষা বাদ দিয়ে খুব বেশী পরিমাণে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতে শিখেছেন। বাঙালীরা মাতৃভাষার চেয়ে বিদেশী ভাষার প্রতি সমধিক পরিমাণে মর্য্যাদা দান করছে। তাঁরা কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবার সময় লজ্জা বোধ করেন। নব্যশিক্ষিতেরা ইংরেজীতে চিঠি লেখা যতটা পছন্দ করেন, বাঙ্‌লায় মোটেই ততটা করেন না; যদিও বা বাঙ্‌লায় চিঠি লেখেন, ঠিকানাটা যেন বাঙ্‌লায় কিছুতেই লিখতে পারেন না। কোন বড় জন-সভায় বক্তৃতা দেবার সময় ইংরেজী তো চাইই! এইরূপে তাঁরা বাঙ্‌লা ভাষার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। তাঁরা হয়তো ইংরেজীতে বহু গ্রন্থ পাঠ করেছেন, কিন্তু ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ—'রামায়ণ', মহাভারত'ও পড়বার সময় পান না। তাঁরা যদি সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক গ্রন্থগুলি ও বাঙ্‌লা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, জার্মান প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করেন, তা'হলে জগতে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বাঙ্‌লা ভাষার প্রচার হয়।

সুদূর পাশ্চাত্যে ইংরেজ জাতির বাস। ভাগ্যক্রমে তারা আমাদের দেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। তাই বলে ইংরেজদের ভাষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, জাতীয়তার দিক থেকে এর চেয়ে গ্লানি আর কিছু নেই। অন্যজাতির প্রভুত্বের অনিষ্টকারিতা আছে, কিন্তু কোন জাতির ভাষা যখন সে নষ্ট করে, তখন সেই অনিষ্টকারিতা চরমে ওঠে, জাতি তার সর্বস্ব হারায়। প্রায় দেড়শো বছর ধরে এদেশে বৃটিশ শাসন চলে আসছে এবং ভারতে ইংরেজী ভাষা 'রাজভাষা' রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার ফলে অনেক ইংরেজী শব্দ বাঙ্‌লা ভাষার মধ্যে চলে এসেছে। সেগুলো হয়তো বাঙ্‌লা থেকে আর বাদ দেবার উপায় নাই। কিন্তু এমন অনেক ইংরেজী শব্দ বাঙ্‌লার মধ্যে পুরে দিয়ে আমরা খিঁচুড়ি পাকিয়ে ব্যবহার করি—যেগুলো সহজেই বাঙ্‌লা করা যায়। 'ভারতবর্ষ' কথাটা যেন কারও মুখ দিয়েই বেরোয় না, তার বদলে বেরোবে—ইণ্ডিয়া। কতগুলো জায়গার নাম আমরা ইংরেজদের মত উচ্চারণ করে গর্ব অনুভব করি, যেমন—ক্যালকাটা, বম্বে, মাদ্রাজ, বারডোয়ান, মাইশোর, চায়না···ইত্যাদি। অতিশয় গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' চেপে দিয়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ধরেছেন। তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' বল্‌তে লজ্জাবোধ করেন।

আমরা বিলেতি জিনিষ খুব পছন্দ করি, এবং যেকোন ভাল জিনিষকেই আমরা 'বিলেতী' নামে অভিহিত করি। এমনকি আমাদের দেশের জমিতে উৎপন্ন দেশী ফসলকেও আমরা 'বিলেতী' নামে অভিহিত করি। যেমন—বিলেতী আমড়া, বিলেতী আলু, বিলেতী কুল, বিলেতী কুমড়ো প্রভৃতি। এগুলো বলা মানে —দেশমাতার স্নেহের দানকে উপেক্ষা করা। এগুলোর বদলে আমরা—মিষ্টি আমড়া, রাঙা আলু, নারকেলি কুল, মিষ্টি কুমড়ো বল্‌তে পারি।

এইরূপে বাঙ্‌লা দেশেই ইংরেজী ভাষাকে বাঙ্‌লা ভাষা থেকে বেশী মর্য্যাদা দান করছি। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাতৃভাষাকে আমরা এখনও বিদেশীর দরবারে পরিপূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি। এমনকি মাতৃভাষা থেকে বিদেশীর ভাষার প্রতি আমরা অত্যধিক যত্নবান হয়ে উঠেছি। অবশ্য

বিদেশী ভাষাকে মূল্য না দিতে বলছি না। কিন্তু মনে থাকে যেন আমরা ভারতবাসী, আমরা বাঙালী—আমাদের একটা সভ্যতা আছে, একটা সংস্কৃতি আছে এবং আছে নিজেদের সাহিত্য ও ভাষা। নিজেদের সেই সাহিত্য বা ভাষার মর্য্যাদা ভিত্তি করেই বিদেশীর ভাবধারা গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের ভাষার উপর নিজেদের মর্য্যাদা যদি আমরা হারাই তবে নিজস্ব বল্‌তে আমাদের থাক্‌বে কি? আমাদের বাঙ্‌লা ভাষায় সম্পদ মোটেই কম নয়। বাঙ্‌লার আদি কবিগণ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে সম্পদ দান করে গেছেন, তার তুলনা নাই। বাঙ্‌লা ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে এবং ভারতের সবচেয়ে বেশী লোক-বাঙ্‌লা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। মহাত্মা গান্ধী ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রচলন করতে চান। বাঙ্‌লা ভাষা সেই রাষ্ট্রীয় ভাষা হবার সর্বাংশে যোগ্য। প্রত্যেক বাঙালীকে বিদেশী ভাষার মোহ ভুলে তাকে যোগ্যতর করে তুলতে হবে। তবেই হয়তো বাঙ্‌লা ভাষা একদিন বিশ্বের দরবারে সুপরিচিত হতে পারবে।

ডাকটিকিট সংগ্রহ

শ্রীমতী সাধনা বিশ্বাস (১৬৬২)

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানস্পৃহাও বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। তাই দেখতে পাই মানুষের প্রতিভার বিকাশ নানাদিকে। বর্ত্তমান সভ্যতায় ডাকটিকিট একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব মনীষার সঙ্গে পরিচয়ও সম্ভব আজ এই ডাক টিকিটের ভেতর দিয়ে। এ বিষয়ে যে জানবার কতো আছে, ভাবলে অবাক হতে হয়। আমি এই ডাকটিকিট কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলবো।

বাজারে জিনিষপত্র বেচাকেনা করবার জন্য ব্যবসা চলে এ আমরা জানি। ঠিক সে রকম সাধারণের ব্যবহার করা ডাকটিকিটগুলি সংগ্রহ করবার জন্য একদল ব্যবসায়ী আছেন। এরা জিপ্‌সী, মিশনারী প্রভৃতি অনাথ বন্ধুদের সাহায্যে নিজ দেশের ব্যবহার করা ডাকটিকিটগুলো সংগ্রহ করে বিক্রয়ের জন্য বিদেশে পাঠান। পরিবর্ত্তে তারা সেই সেই দেশের পরিত্যক্ত টিকিটগুলো নিজের দেশে আনিয়ে বিক্রী করে বেশ কিছু উপায় করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্রুসেলস্‌এর জে, বি, মোয়েন সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

লেখাপড়া শিখতে হলে যেমন ভূগোল, বিজ্ঞান, ইংরেজী সকল বিষয়ই আগে খানিকটা পড়তে হয়, টিকিট সংগ্রহের ব্যাপারেও ফরাসী ছাত্রদের মত কোন বাছ-বিচার না করে সমস্ত পৃথিবীর যেখান টিকিট সংগ্রহ করতে হয়।

প্রথমে একখানা stamp-album দরকার। কারণ এলবামের পাতায় যে ছবিগুলো দেয়া থাকে সেগুলি দেখে প্রথম শিক্ষার্থী বুঝ্‌তে পারে কোন্‌টি কোন্ দেশের টিকিট।

যাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব বিদেশে আছেন, চিঠিপত্র লেখালেখি করে সেই সেই দেশের কয়েকটি টিকিট তারা পেতে পারে—duplicateগুলির অদলবদলও চলে। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা ভাল টিকিট সংগ্রহে কিছু পয়সা খরচ করতেই হবে নইলে সংগ্রহ তেমন এগোবে না।

টিকিট কিনতে হলে প্রথমে দু'তিন হাজার টিকিটে ভরা "All world" অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর টিকিটের একটা প্যাকেট কিনতে পারলে ভালো হয়, না হলে "সেক্সন্যাল প্যাকেট" এর এক একটি করে কিনেও সংগ্রহ আরম্ভ করা যেতে পারে। এরপর কেনা উচিত "ওয়ান্ কান্ট্রি সেট্স্"।—এভাবে সংগ্রহ আরম্ভ করলে duplicate হবারও ভয় থাকে না। তবে এই দু'সেট ছাড়া নিজে না দেখে যদি আর কোন প্যাকেট কেনা হয় তাহলে সব টিকিটই হয়তো duplicate হয়ে যেতে পারে। কারণ সাধারণতঃ চলতি সস্তার টিকিট দিয়ে এই প্যাকেট তৈরী হয়।

টিকিট সংগ্রহ করতে গেলে কয়েকটি আনুষঙ্গিক জিনিষও প্রথম থেকে চাই। যেমন টিকিট ভেজানোর জন্য একটা ট্রে, শুকোবার জন্য ব্লটিং, ভাগ করে রাখবার জন্য কয়েকখানা পাতলা অয়েল পেপারের খাম, একটা বাক্স বা জার।

এরপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের টিকিটগুলোকে ভাগ ভাগ করে যে টিকিটে যে দেশের নাম থাকবে এলবামের ছবি দেখে সেই দেশের নাম লেখা পৃষ্ঠার ছকে "হিঞ্জ" দিয়ে পরিষ্কার করে আট্কাতে হবে। "হিঞ্জ" অনেক রকমের পাওয়া যায়—দাম চার আনা থেকে একটাকা পর্য্যন্ত—প্রত্যেক প্যাকেটে হাজারখানা করে থাকে। সাধারণ আঠা দিয়ে টিকিট মারলে টিকিট প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়,—প্রয়োজন মাফিক এলবামের পাতা না ছিঁড়ে টিকিটখানা উঠান যায় না। 'হিঞ্জ'এর গঁদ খুব পাতলা আর কলে শুকনো থাকায় এ অসুবিধা ঘট্তে পারে না। 'হিঞ্জ' দিয়ে টিকিট মারার আরও সুবিধা এই, কোন্টা কোন্ সালের বা কত দামের তা টিকিটখানাকে বাক্সের ডালার মত করে তুলে তার তলায় লিখে রাখা যায়।

সাধারণতঃ বুণ্ডী, জালাওয়ার, নেপাল, নবনগর, রাজপীপলা প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যগুলির টিকিটে হিন্দী; ফরিদকোট, হায়দরাবাদ, জম্মু, কাশ্মীর, ঝিন্দ, আফগান, নেজাদ, পার্শীয়া তুর্কী প্রভৃতি অটোমান রাজ্যগুলির টিকিটে আরেবিক; আরমেনিয়া, ক্রীট, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যগুলির টিকিটে গ্রীক; আজারবাইজান, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, সাইবেরিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি রাজ্যগুলির টিকিটে রাশিয়ান; জার্ম্মান, অষ্ট্রিয়, ডানজিগ প্রভৃতি রাজ্যগুলির টিকিটে জার্ম্মান এবং চীন, জাপান, কোরিয়ান প্রভৃতি এশিয়াটিক রাজ্যগুলির টিকিটে চীনালিপির অনুরূপলিপি ব্যবহৃত হয়। আবার এমন কতকগুলো রাজ্য আছে যারা রোমানলিপি ব্যবহার করলেও, তাদের ভাষা ও উচ্চারণ ইংরাজী থেকে আলাদা। যেমন,

আবিসিনিয়া = Ethiopie.	জার্ম্মানী = Reichspost.
ফ্রান্স = Francaise.	লিথুয়ানিয়া = Lietuva.
ইতালী = Italiane.	নরওয়ে = Norge.
হলাণ্ড = Nederland.	পোলাণ্ড = Poczta-Polska.
জাভা = Ned-India.	সুইডেন = Sverign.
	সুইটজারল্যাণ্ড = Helvetia. প্রভৃতি।

পৃথিবীতে প্রায় ৯০,০০০ রকমের টিকিট আছে, তার প্রত্যেকখানায় আবার কত প্রভেদ ঘটেছে। সে সব সংগ্রহ করা কোন একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঁচ-মিশালী পাঁচ ছয় হাজার টিকিট সংগ্রহ করা হলে কিন্তু আর এভাবে টিকিট সংগ্রহ করা উচিত হবে না। তখন উচিত হবে উচ্চ শিক্ষার্থীর মত, কতকগুলো বিষয় অবশ্য শিক্ষনীয় রেখে, একটা বিষয় ভাল করে জানবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ বিশেষ একটা দেশের টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা করা।

চিঠি ও অটোগ্রাফের মূল্য

(সংগ্রহ)

শ্রীঅধীররঞ্জন দাস (১৩৪২)

আজ আমি তোমাদের কাছে কতকগুলি চিঠি ও কয়েকজন বিখ্যাত লোকের স্বাক্ষরের (autograph) দামের কথা বলব। এই সকল চিঠি ও স্বাক্ষরের দামের কথা শুনে অসম্ভব বলে মনে হলেও এগুলি কিন্তু সবই সত্য।

বর্ত্তমান যুগ খেয়ালের যুগ। এই খেয়ালের জন্য যে কতলোক পয়সা খরচ করে ডাক টিকিট, দেয়াশলাইয়ের লেবেল, ছবিওয়ালা কার্ড ও বিখ্যাত লোকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ কচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

স্বাক্ষরের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। স্বাক্ষর যোগাড় খেয়াল আজকাল ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত স্বাক্ষর বিক্রেতারা মিলে 'স্বাক্ষর সমিতি' খুলেছেন। তারাই সাধারণতঃ স্বাক্ষরের দাম ঠিক করেন। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা যো লুইর স্বাক্ষরের দাম ১০ শিলিং। বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্ব্বোর স্বাক্ষরের দাম ৩০ শিলিং। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরের দাম ১০ পাউণ্ড কিন্তু লয়েড জর্জ্জের স্বাক্ষরের দাম মাত্র ৫ শিলিং। বিখ্যাত শিশু-অভিনেতা শার্লি টেম্পলের স্বাক্ষরের দাম ১ শিলিং। বিখ্যাত অভিনেতা রবার্ট টেলরের স্বাক্ষরের দাম ৬ শিলিং। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের স্বাক্ষরের দাম ১০ পাউণ্ড। কোনান ডয়েলের স্বাক্ষরের দাম ১০ শিলিং। জর্জ বার্ণার্ডশ'র স্বাক্ষরের দাম ৫ পাউণ্ড। আব্রাহাম লিঙ্কনের স্বাক্ষরের দাম ২ শিলিং। সেক্সপিয়রের স্বাক্ষরের দাম সবচেয়ে বেশী। তাঁর স্বাক্ষরের দাম ২০০,০০০ পাউণ্ড।

ভূতপূর্ব্ব রাজা ৫ম জর্জ্জের স্বাক্ষরের দাম ৪ পাউণ্ড। মুসলিনির স্বাক্ষরের দাম ৮ পাউণ্ড ও হিটলারের ৭ পাউণ্ড। রাণী এলিজাবেথের ২০০ পাউণ্ড। মহাত্মা গান্ধীর স্বাক্ষরের দাম মাত্র ৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই বিনামূল্যে স্বাক্ষর দিতেন। তারপর ফাউস্বরূপ তিনি তার সঙ্গে দুই এক ছত্র কবিতাও দিতেন।

তারপর চিঠির কথা। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁর কর্ম্মচারিদের সঙ্গে যেসব চিঠি লেখালেখি করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকখানা কয়েক জনের হাত ঘুরে ২৪৬৯ পাউণ্ডে বিক্রয় হয়েছে। তার প্রথমা পত্নী জোসেফাইনকে লেখা কয়েকখানা চিঠি ৪৪০০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছে। তাঁর আর এক স্ত্রী মারি লুসির নিকট লেখা কয়েকখানা চিঠি ১৫,০০০ হাজার পাউণ্ডে ফরাসী সরকার কিনে নিয়েছেন। ইংরাজ কবি শেলীর একখানা চিঠি ১৪২ পাউণ্ডে বিক্রয় হয়েছে। শেলী ইংরাজ কবি কিট্সের নিকট যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাঁর একখানির দাম ২৬২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটন বাল্যকালে তাঁর এক ভাইকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি নিউইয়র্কের এক ভদ্রলোক ৬০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনে রেখেছেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ষোড়শ লুইয়ের পত্নী মেরী আঁতোয়ানেত্কে বিপ্লবীরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে লেখা চিঠিখানি একজন মার্কিন দেশীয় ধনী ৫০০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনে রেখেছেন।

এই সকল চিঠি বেশী দামে বিক্রি হবার কারণ আছে। মনে করো বড় হয়ে তুমি রবীন্দ্রনাথের মত একজন নামজাদা লোক হয়ে গেলে। তখন তোমার ছেলেবেলার খবর নেবার জন্য এই রকম ক্রেতারা ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবের কাছে লেখা চিঠি অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনে নেবে।

তাছাড়া, আজকাল বড় বড় কবি ও লেখকদের লেখা চিঠিপত্র বইয়ের আকারে বের হচ্ছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র"। তোমার আমার চিঠিরও মূল্য আছে। কারণ বড় হয়ে তুমি যে একজন বিখ্যাত লোক হবে না তা কে বলতে পারে?

নবযুগের কাব্য

শ্রীচিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৪১০)

কবি, গাহ আজি নূতনের জয় গান,
বহ্নি জ্বালাও দীপ্ত, অনির্ব্বাণ।
সমরাগ্নিতে মৃত্যুযজ্ঞ মাঝে,
দিক্‌দিগন্তে অগ্নিবীণায় বাজে
নবসুর ঝঙ্কার,
রহিয়া রহিয়া কম্পিত করি জাগে
শিবধনু টঙ্কার॥

কবি, তোল তব বীণায় দীপ্ত তান,
আগমনী সুরে, রজনীর অবসান।
আসিছে নবীন তীব্র দীপ্তিময়,
শিহরি সভয়ে তমসা পাইছে লয়,
নবীন জ্যোতিষ্মান,
তীব্র নিদাঘে দহিয়া দিগন্তর,
আগত পূর্ণ প্রাণ॥

কবি, গাহ আজি জীবনের জয়গান,
পূর্ব্ব-অচলে নবীনের অভিযান।
নবীন আসিছে ব্যাপিয়া দিগন্তর,
নবীন আসিছে আগুনে করিয়া ভর,
নূতন জ্যোতির্ম্ময়,
সূর্য প্রভায় অন্যায় করি দূর,
নূতন অভ্যুদয়॥

কবি, দূর হোক্ প্রাচীন কাব্যগীতি,
শিকলে জড়ানো প্রাচীন ন্যায় ও নীতি।
যারা পশ্চাতে জাতি-অভিশাপ, জাগো,
রক্তমূল্যে বিধাতার বর মাগো,
শতাব্দী অভিশাপ
নবীন আলোকে দূর হোক্ যত গ্লানি,
যুগসঞ্চিত পাপ॥

কবি, গাহ আজি নবীন মন্ত্রগান,
মহাগীতে জাগে মহামানবের প্রাণ।
প্রলয় নাচনে নটরাজ আজি নাচে,
হেসে খলখল প্রমথ ছুটিছে পাছে।
প্রলয়ের অভিযান!
নূতন মন্ত্র উচ্চারি' জয়গীতে,
কবি গাহ জয়গান॥

"পাগল"

শ্রীউষা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫৭০)

এপাড়ায় রেমো পাগলাকে সকলেই চেনে। তার সাজসজ্জা বড়ই অদ্ভুত। পরণে একটা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট—মাথায় একটা গামছা জড়ান। রেমো ভাবে এই পোষাকে বুঝি তাকে সাহেবের মতই দেখায়। তাই সে কাউকে দেখলেই বলে "গুড মরনিং"—তখন সকালই হোক বা বিকেলই হোক। কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, "আমার নাম শ্রীরামচন্দ্র।"

মাথাটা তার একেবারেই খারাপ। পাড়ার সকলেই তাকে স্নেহ করে। তাই তার খাবারের ভাবনা নেই। ক্ষুধা পেলে কোন বাড়ীতে ঢুকে সে বলে, "মাগো, দুটী খেতে দে।" চিড়ে, মুড়ী যা পায় তাতেই সে সন্তুষ্ট হয়।

রাস্তার দুধারে বড় বড় বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতেই পাগলার অবাধ গতি। রাস্তার শেষে একটা মেথরদের বস্তী। এই বস্তীতে থাকে মুন্নি বলে একটী ১০।১১ বছরের মেয়ে। তার কাল চুল ও কাল চোখদুটী বড় সুন্দর। তার সঙ্গে রেমোর বড় ভাব। মুন্নি তার সমস্ত মনের কথাই রেমোকে বলে।

সে একদিন গল্প করতে করতে বল্লে, "রেমোদা, তুমি রায়বাবুদের বাড়ীর ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে দেখেছ?"

রেমো বল্লে, "কে? ঝুমী? হ্যাঁ তাকে দেখেছি'। কেন?"

মুন্নি বল্লে, "জান, মেয়েটা ভারী বোকা। একদিন নেড়া ওদের বাড়ী গিয়েছিল। তখন মেয়েটা কি একটা খেলনা নিয়ে একা একা বসে খেলছিল। নেড়া বলে 'ওটা নাকি ইনজিন্ গাড়ী'। তা' নেড়া গিয়ে, যেই বলেছে 'খুকী ওটা দাও ত'—অমনি বোকা মেয়েটা খেলনাটা নেড়াকে দিয়ে দিল। তুমি যদি মেয়েটাকে একবার আমার কাছে এনে দাও, তবে ওর খেলনাগুলো নিয়ে আমি একটু খেলতে পারব। এনে দেবে ওকে, রেমোদা?"

রেমো গম্ভীর হয়ে বল্লে, "কিন্তু তুমি যদি ওকে মার?"

মুন্নি ব্যগ্রভাবে বল্লে, "না, না। সত্যি বলছি আমি ওকে মারব না। আমার ভাই বোন নেই বলে বড় কষ্ট হয়। ওকে পেলে আমি ওর সঙ্গে খুব খেলা করব—ভালবাসব।"

রেমো একটু ভেবে বল্লে, "আচ্ছা ওকে এনে দেব।"

রায়বাবুদের বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে ঝুমী। সবে সে চলতে শিখেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সে সমস্ত বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের নূপুর ঝুম্ ঝুম্ করে বাজে। তাই সকলে ওকে ঝুমঝুমি বলে ডাকে। আবার কেউ কেউ ওকে ছোট করে বলে ঝুমী।

একদিন সকালে রেমো পাগলা এসে ঢুকল রায়বাবুদের বাড়ীতে। তখন ছোট্ট ঝুমী তার ঠাকুরমার কাছে—বারাণ্ডায় বসে দুধ সন্দেশ খাচ্ছিল। ঠাকুরমা রেমোকে দেখে তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কারণ এ বাড়ীতে এসে পাগলা সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরমার চরণ বন্দনা করে। ঠাকুরমা তাতে মোটেই খুসী হন না। আজ আবার তিনি এখনই স্নান করে এসেছেন। তা'ছাড়া তিনি জানতেন যে ক্ষুধা না পেলে রেমো এ বাড়ীতে বিশেষ আসে না। তাই তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে মুড়ী বার করতে লাগলেন।

এদিকে রেমো দেখলে যে ঝুমী এখন একলা বসে আছে। কাছাকাছি কেউ নেই। আর মুন্নির কথাও তার মনে পড়ল। রেমো এ সুযোগ উপেক্ষা না করে ঝুমীকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঝুমী কিন্তু রেমোর কোলে উঠে একটুও খুসী হয়নি। তাই সে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। রেমো দেখলে যে ঝুমীর কান্না শুনে যদি কেউ এদিকে আসে তবেই ত' সর্ব্বনাশ! তাই রেমো একহাতে ঝুমীর মুখ চেপে ধরে দৌড়তে লাগল।

সেই সময়ে এক ভদ্রলোক সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। যদি একটা লোক সোনার গহণা পরা একটা ছোট্ট মেয়ের মুখ চেপে ধরে দৌড়য়, তবে প্রত্যেকেরই সন্দেহ হয়। তাই ভদ্রলোকটী "চোর, চোর" বলে রেমোর পিছন পিছন ছুটলেন। তাঁর চীৎকার শুনে পাড়ার অনেক লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। রেমো পাগলা পালাতে না পেরে ধরা পড়ে গেল। অনেকেই ঝুমীকে চিনত। তাদের একজন ঝুমীকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে এল।

তারপরে সকলে মিলে রেমোকে মারতে আরম্ভ করলে। একজন বল্লে, "পাগলা না আরও কিছু! পেটে পেটে শয়তানী! গয়নাগুলো নেবার মৎলবে ছিল।" সকলের অবিশ্রান্ত কিল, চড়, ঘুসির চোটে রেমো মাটীতে গড়িয়ে পড়ল। তার সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠল—মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। সকলে যখন দেখলে যে শাস্তিটা বেশ ভাল রকমই হয়েছে, তখন সবাই রেমোকে ফেলে রেখে চলে গেল। রেমো পাগলা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল।

সে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। বোধ হয় সে ভাবছিল যে, দুটী সুন্দর ছোট মেয়ের মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্যই ত' সে ঝুমীকে আনছিল। ঝুমীকে ত' সে চুরী করতে চায়নি। আর মুন্নি ত বলেছিল ওকে ভালবাসবে! তবে কেন তাকে এত মার খেতে হল!

শ্রাবণ

শ্রীআশীষ দত্ত (১৫৬৯)

রাতের শেষে গুরু গুরু শুনছি মেঘের ডাক,
খোকা কাঁপে মায়ের বুকে শুনে তারই হাঁক।

ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপন ধরায়,
ডোবার মাঝে ব্যাং গেয়ে যায়,
ভিজছে জোনাক ওই অসহায়
বাজছে মেঘের ঢাক।

প্লাবন নিয়ে এলো শ্রাবণ,
কোন্ অজানায় চলছে কেমন,
পেরিয়ে নগর গ্রাম ও বন—
পুকুর, নদীর বাঁক।

ছেলেবেলার বাদল ভীতি,
অতীত দিনের মধুর স্মৃতি,
অনেক কথা, অনেক গীতি
বাজায় মনে শাঁখ।

রুম ঝুমাঝুম বাদল ঝরে,
ছন্দ দিয়ে ভুবন ভরে,
চারিটি দিক আঁধার করে—
আজ শ্রাবণের ঝাঁক।

বিপদ

শ্রীযশোধন ভট্টাচার্য্য (১২০৯)

এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। মনে তাঁর ভয়ানক স্ফুর্ত্তি—মুখে হাসি। কারণ তিনি লটারীতে অনেকগুলি টাকা পেয়েছেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সামনেই দেখতে পেলেন এক মস্ত বন। বন পেরিয়ে তবে তাঁর বাড়ী। তিনি বনের গাছপালা হাতে করে' সরিয়ে সরিয়ে যেতে লাগলেন।

মাঝ-বন অবধি গেছেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যেন একজন লোক কাঁদছে। যেথান থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল সেখানে গিয়ে দেখেন সত্য সত্যই একজন লোক কাঁদছে। লোকটিকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সেই লোকটি কান্নার সুরে বল্‌ল, "হুজুর আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সে সর্ব্বনাশ এমন, যে বলবার উপায় নেই। না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমার সঙ্গে চলুন।"

ভদ্রলোকের মনটি ছিল অতি সরল এবং তিনি ছিলেন অতিশয় দয়ালু। সেইজন্যে লোকটির কান্না-মিশানো অনুরোধ ও দুঃখ শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বল্‌লেন, "চল।"

লোকটি আগে আগে চলতে লাগল। ভদ্রলোক তার পিছন পিছন যেতে লাগলেন। অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়ে লোকটি দাঁড়াল। পথে কোন কথাবার্ত্তা হয়নি। শুধু লোকটির ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

তারপর সেই লোকটি দুটি আঙুল মুখের মধ্যে পুরে শিষের মত আওয়াজ করল। অমনি আর একটি লোক লাঠি হাতে বেরিয়ে এল। যে লোকটি পথ দেখিয়ে এনেছিল, তার নাম গদা। আর যে লোকটি লাঠি হাতে বেরিয়ে এসেছিল, তার নাম পদা। গদা বল্‌ল, "এই পদা! বাঁধ্ একে। আর পকেটে হাত দিয়ে দেখ্ কিছু আছে কিনা?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকটির বা গদার এরকম পরিবর্ত্তন দেখে ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে গেল। বল্‌লেন, "তোমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সেটা তো দেখালে না?" ভদ্রলোক ভাবছেন, সত্যি সত্যিই বুঝি কিছু সর্ব্বনাশ হয়েছে। কিন্তু আসলে কান্না-টান্না যে একেবারেই ভুয়ো তা তিনি জানেন না। তাঁর নিজেরই যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তাও তিনি বুঝতে পারেন নি।

এদিকে ততক্ষণে গদা ও পদা তাঁকে বেঁধে ফেলে পকেট থেকে লটারীতে পাওয়া সমস্ত টাকাগুলি বার করে নিলে। ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সেটা তো দেখালে না?" বার বার ঐ এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে গদা চীৎকার করে বল্‌ল, "আরে মশাই বুঝতে পারছেন না কার পাল্লায় পড়েছেন? বুঝিয়ে বলে দিতে হবে বুঝি? শুনুন—আমরা ডাকাত। এখন টাকাগুলি আমরা পেয়েছি। আপনি যেতে পারেন।"

ভদ্রলোক যে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন এতক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি একেবারে ভড়কে গিয়ে বললেন, "না না, আমার টাকাগুলি ফেরৎ দাও, তবে আমি বাড়ী যাব।"

গদা বলল, "এখান থেকে যাবেন কিনা বলুন? নইলে এই যে লাঠি দেখছেন, এর বাড়ি মাথা ফাটিয়ে

দেবো।" ভদ্রলোক আর দেরী করলেন না, অমনি গদার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "দোহাই বাবা তোমার। মাথা ফাটিয়ো না। আমি একটা কথা বলছি বাবা। আশা করি রাগ করবে না। —বলব?"

গদা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বল্‌ল, "বলুন না কি কথা?"

তিনি বললেন, "বলি তা' হলে। এই—এই—এই আমার টাকাটা ফেরৎ দাও। না দিলে আমি তোমাদের পা ধরে' পড়ে থাক্‌ব বাবা।" বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর পদার মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল। পদা গদাকে বল্‌ল, "দিয়ে দেরে টাকা কটা, বড় কাঁদাকাটা করছে।"

গদা টাকাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে ফেরৎ দিল।

ভদ্রলোকের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি টাকাগুলি পকেটে পুরে ডাকাতদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে ছোট ছেলের মত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে' ডাকাতদের সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন। ডাকাতদের চোখে কিন্তু তাও ধরা পড়ে গেল। তারা বলল, "আস্তে আস্তে যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি ইচ্ছে করলে গট্‌গট্ করে চলে যেতে পারেন। এমন কি দৌড়োতেও পারেন।" তাদের মুখে এরকম অভয়বাণী শুনে ভদ্রলোক দৌড়োনোই স্থির করলেন। কারণ যদি আবার ডাকাতদের মতিগতি বদলায়। বলা তো যায় না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এক দৌড় দিলেন। ডাকাতদের কাছ থেকে মাইল খানেক যাবার পর দম নেবার জন্য তিনি দাঁড়ালেন।

তিনি প্রথমেই যাকে দেখতে পেলেন, তাকে আগাগোড়া ঘটনাটি বললেন। সে সব কথা শুনে বল্‌ল, "এও জানেন না যে গদা ও পদা নামে দুজন পাগলা লোক প্রায়ই এই রকম করে' অনেক লোককে ভয় দেখায়? এঃ! আপনাকে খুব ভয় দেখিয়েছিল তো।" বলেই সেই লোকটি হো-হো হি-হি হা-হা করে হাসতে লাগল। হাসি শুনে ভদ্রলোকেরও হাসি এসে গেল। কারণ তিনি হাসি শুনলে স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি এমন বিকট হাসলেন যে, সেই লোকটি ভয় পেয়ে সোজা বাড়ীর দিকে চোঁচা দৌড় দিল। ভদ্রলোক মনে মনে ভাবলেন—এই ব্যাপার? দুটো পাগলে ভয় দেখিয়েছিল? আমি তো আচ্ছা পাগল।

আপনার দাঁত ও মাড়ির
স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে
"ইউমেন্থল"
দাঁতের মাজন ব্যবহার
করুন।

হিমালয়ে কিছুদিন

অপূর্ব্বলাল মজুমদার (১৭৮৩)

মৌন পাহাড়ের রুক্ষ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে নাকি একটা কোমল রূপ আছে। ছোটবেলায় বেহারের পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখেছিলাম। কিন্তু তুষার আবৃত শুভ্র পর্ব্বত-শিখরে নব-সূর্য্যের আলিঙ্গনের বিচিত্র দৃশ্য কবিতা ও গল্পেই পড়েছিলাম—দেখবার কোন সুযোগই পাইনি। হঠাৎ পরীক্ষার পর লম্বা-ছুটির মাঝে একটা সুযোগ এসে পড়তে রওনা হয়ে পড়লুম।

অতি প্রত্যূষে সূর্য্যদেবের ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিলিগুড়ি এসে পৌছলাম ও কালিম্পংগামী ছোট্ট ট্রেনটায় চেপে বসলাম। দূরে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী দেখা দিল···নীল আকাশপটে ওর সীমারেখা হারিয়ে গেছে। উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বাইরের অজানাকে জানবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কখন্ পাহাড়গুলো অতি কাছে এসে পড়বে। রেললাইনের দুপাশে লম্বা লম্বা শাল গাছের ছায়ায় আমাদের গাড়ীটা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে। ভূগোলে যে ভীষণ তরাইয়ের বনভূমির কথা পড়েছি, এই সেই নিবিড় অরণ্য। লতা-গুল্মহীন শাল গাছের পরিষ্কার তলদেশের একটা মনভোলান শক্তি আছে। ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ের মধ্যে এসে পড়লাম। রেললাইনের ডান পাশ দিয়ে গভীর খাদের মধ্যে বয়ে চলছে তিস্তা। কঠিন পাহাড়ের বিরাট বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার কি মহান প্রচেষ্টা। প্রকৃতির এমন ক্রুদ্ধ গর্জ্জন এমন সাধনা আর কোথাও দেখিনি। দুপাশের ঘন অরণ্যের দিকে চাইলে মনে হয় ওর মাঝে কোনদিন কোন প্রাণের স্পন্দন ফুটে উঠেনি। তিস্তার বুকে ঝুকে পড়া লতাগুল্মের পাশে পাশে সুন্দরী ঝরণার ছবি শুধু কল্পনা আর উপলব্ধির জিনিষ···ভাষায় বলবার নয়!

আঠারো মাইল চলবার পর আমরা কালীঝোরা দেখতে পেলাম। প্রায় ৬০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত হতে নেমে এসে তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ঝরণাটা একটা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা সমতলভূমিকে পিছনে ফেলে অসমতলের রাজ্যে এগিয়ে চলছি। আমাদের এখানেই নামতে হবে। রিয়াং থেকে সাত আট মাইল দূরে মংপু গ্রামে গভর্ণমেণ্টের সিঙ্কোনা চাষের প্রধান কেন্দ্র। দাদা ওখানকার হস্‌পিটালের ডাক্তার। ওখানে কিছুদিন থেকে কালিম্পং যাব এই ঠিক। দাদাকে দেখলাম ষ্টেশনের ছোট ঘরটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

একটু আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখানে ওখানে তার ছোয়াচ এখনো লেগে রয়েছে! আমাদের জন্য দাদা ঘোড়া ঠিক করে রেখেছিলেন। ওরই পিঠে করে আমাদের পর্ব্বতসঙ্কুল জীর্ণ পথে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে হবে। প্রশস্ত পাহাড়ীপথ ধরে খানিকটা গিয়ে ডানহাতের উঁচু পথটায় কতকদূর এগিয়ে গেছি। দূর থেকে দাদা বললেন, ওপথ নয় আমাদের সোজা অনেকটা যেতে হবে। ঘোড়াটাকে বহু কষ্টে ফেরালাম। মংপু যাবার এ পথটা বেশ ভালই। কিন্তু এপথে পৌছতে দেরী হবে বলে আমরা ঘোড়া চলবার পথেই অগ্রসর হলাম। ঘোড়সওয়ারের কাছেও এপথ সোজা নয়। আমি যে ভয় পাব সেটা একটুও আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, পথে আমাদের সেদিন কোন বিপদই হয়নি।

দুটোর সময় বাংলোয় এসে আমরা সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। প্রথম দর্শনেই যায়গাটার বিচিত্র সম্পদ আমার ভাল লেগে গেল। সহরের কোলাহল-মুক্ত শ্যামল বনভূমির নীরবতা আমাকে আপন করে নিল। কাচের জানলার ওপাশে পাহাড়ের অসমতল সীমারেখা, নীচে কুইনাইন ফ্যাক্টরীর কর্ম্ম চঞ্চলতা···নতমুখী বাঁশঝাড় আর ঝরণার উচ্ছৃঙ্খল কলতান সব মিলে সৃষ্টি হয়েছে এক স্বপণপুরীর মাধুর্য্য।

কয়েকদিনের মধ্যেই মংপুর প্রত্যেকটি গাছপালা, নুড়ি, ঝরণা আমাদের পরিচিত হয়ে উঠল। মাঝে কয়েকদিন বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথের উপর এখানে ওখানে নেমেছে ধ্বস। বাংলোর পাশের সৃষ্টি হয়েছে ছোট্ট একটা ঝরণা। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ক'দিন ধরে বৃষ্টি আর মেঘের অত্যাচারে ঘর থেকে আমরা কেউ বের হতে পারিনি। দরজা জানলা বন্ধ করে বোবার মত বসে থাকতে হয়েছে। তাই আজকের মৃদু রোদটা মিষ্টি লাগছিল। উত্তর দিকে দেখা দিল শুভ্র তুষারের রাজ্য। কয়েকদিনের অস্বস্তি কয়েক মিনিটেই কেটে গেল।

কালিম্পংটা দেখবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরে আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে যাওয়ায় বর্ষাতি ও ক্যামেরাটা নিয়ে মোটরে উঠে বসলাম। কাঁকর বিছানো বিসর্পিল পথ বেয়ে আমাদের মোটরটা ধীরে ধীরে এগতে লাগল। দু'পাশে অপরিণিত সিঙ্কোনা ধরেছে ছোট ছোট ফুল। মংপুকে পিছনে ফেলে মটোরটা রিয়াংয়ের নিকট পৌছে গেল। ষ্টেশনটাকে ডানদিকে রেখে কিছুটা এগিয়ে চলতেই আমরা তিস্তার পাশে এসে পড়লাম। এখানে তিস্তার বেগ কল্পনাতীত। এরই পাশ দিয়ে আমাদের তিস্তা-ব্রিজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে হবে। ওপারে নিবিড় অরণ্য আর এপারে পাহাড়-কাটা পথ। অনেক সুন্দর ঝর্ণা এসে গড়িয়ে পড়েছে তিস্তার কোলে, ইচ্ছা করে প্রত্যেকটা ছবি তুলেনি। একটু পরেই আমরা গিলখোলা ষ্টেশনে এসে পড়লাম। কালিম্পংগামী যাত্রীদের এখানেই নামতে হয়। এখান থেকে মটোর, আর ঘোড়া ছাড়া কালিম্পং পৌছান অসম্ভব। এর পর তিস্তা-ব্রিজ। কালিম্পংয়ের পথে যতগুলো দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে, তার মধ্যে দূর থেকে এই ব্রিজের দৃশ্যটাই সবচেয়ে ভাল লেগেছে। উপর থেকে নীচের তিস্তার ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথের বড় ভাল লেগেছিল, তাই তিনি লিখেছেন :—

"নীচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।"

ব্রিজটা পার হয়ে আমরা আর একটা পাহাড়ে পড়লাম। এবার আমাদের কয়েক হাজার ফিট উপরে উঠতে হবে। মটোরটা যখন ঘুরপাক খেয়ে উঠতে থাকে, তখন বারে বারেই মনে হয় এবার হয়ত শেষ হয়ে গেল···কিন্তু একটু পরেই সে ভুল ভেঙ্গে যায়। এমনি ঘুরতে ঘুরতে বেলা দেড়টায় আমরা কালিম্পং পৌছলাম।

সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে কালিম্পং ৩,৯৩৩ ফুট উচু। এখান থেকে কাঞ্চনঝঙ্ঘার তুষরাবৃত শিখর স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়! শহরের মধ্যে যেতে প্রথমেই ডানপাশে পড়ল একটা স্কুল। সময় আমার অল্প, একটু পরেই আমাকে রওনা হতে হবে, তাই এখানকার দেখবার মত সবই আমাকে দেখতে হবে। মটোরটা থেকে নেমে পড়লাম। বাজারের নিকটে সুবৃহৎ 'গথিক' রীতিতে নির্ম্মিত গির্জ্জা, একটু দূরে তিব্বতীয় রীতিতে নির্ম্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তোরণ। সিকিম থেকে লামা এসে কার্নিসের কারুকার্য্য ও উজ্জ্বল স্তম্ভগুলি খোদাই করে গেছে। কালিম্পংএর উত্তরপ্রান্তে গ্রেহামের সেণ্ট এনড্রুজ কলোনিয়ল হোমজ নামে একটী শিক্ষাকেন্দ্র। এটা সমুদ্র থেকে ৫,৫০০ হাজার ফুট উচু। ইউরোপীয় বালক বালিকাদের এটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। তিস্তা জঙ্গল বিভাগের সদর এই কালিম্পং সহরটা। একটা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলে এখানে সিকিমী, তিব্বতী, নেপালী, ভূটানী ও চীনিক ইত্যাদি নানা জাতীয় লোকের সমাবেশ হয়েছে।

এরপর মংপুতে অনেকদিনই ছিলাম। তারপর একে একে আমাদের স্কুল কলেজ খুলে যাওয়ায় ফিরে যেতে বাবার চিঠি পেলাম। তাই একদিন সুন্দর দুপুরে দু'জন নেপালী চাকরসহ আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। কিন্তু মংপুকে ভালবেসেছিলাম তাই—আজও পাহাড়ের কোল থেকে আসে তার নীরব হাতছানি।

মানুষের যাত্রা

নিবেদিতা, সব্যসাচী ও ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩২)

পথ।

বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত পথ। চলে গেছে অজানার পানে। তার বুকে কত পথিক এসে মিলেছে, গন্তব্যস্থলে পৌছবার তরে। অজানা পথের কত যাত্রী চলে গেছে এর বুকের ওপর দিয়ে।

এই পথ। জীবনের পথ।

মানুষ, তার লক্ষ্যস্থলে নিজের আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে, এগিয়ে চলে। এই পথের ওপর দিয়ে।

মানুষ চলেছে। জীবনের পথে আদর্শের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে, মানুষ এগিয়ে চলেছে। সাথে তার কত সাথী। তাদের সহযোগিতায়, সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এই সাথীরাই মানুষকে যুগে যুগান্তরে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে, পৃথিবীর মধ্যে—বিশ্বের মধ্যে। এই সাথী—সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ত্যাগ এইসব।

পথ চলে তারা। চলতে চলতে, শ্রান্ত সঙ্গীরা এক দিন চোখ তুলে চায়। দেখে·····মানুষের সাথে এসেছে একজন নূতন সাথী। তার মুখের কোমলতা ভেদ করে চেয়ে দেখে সেখানে রয়েছে হিংস্রতা। তার মনের ভিতরে, গুপ্তভাবে রয়েছে কুটিলতা।

মানুষের পুরানো সাথীরা মানুষের কাছ হতে আস্তে আস্তে সরে যায়।

মানুষ তার নূতন সাথীকে বেঁধে নেয় প্রীতি-বন্ধনে। ভুলে যায় পুরানোদের। এগিয়ে চলে নূতনের সাথে।

এই নূতন সাথীর নাম যন্ত্র।

হঠাৎ—

মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখে·····একি!

তার নূতন সাথীর মুখের কোমলতা কোথায়? তার সেই বন্ধুত্বের ভাব কই?

মুখের আবরণ তার সরে গেছে। তার মধ্যে থেকে হিংস্রতা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করছে।

দু'হাতে সজোরে সে মানুষের গলা টিপে ধরে। মানুষ আর্ত্তনাদ করে ওঠে—

আজ বিশ্বব্যাপী শোনা যাচ্ছে কি তারই মুমূর্ষু আর্ত্তনাদ?—

আগামী আশ্বিনে—

রংমশালের শারদীয়া সংখ্যা

উপন্যাসে গল্পে চিত্রে বৈচিত্রে নূতন রঙীন প্রচ্ছদপটে
নূতন রূপে দেখা দিবে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নূতন লেখা "—কঞ্জুষের পালা"।

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে

ইলারাণী বসু (১২৫৪)

(১) কোন্ দেশে পান খাওয়ার খুব সুবিধা ? (২) কোন্ রাস্তা জল দিয়ে তৈরী ? (৩) কোন্ পথে সকলে খেতে যায় ?

অরুণা ও নিতু (১৩২৩)

(৪) কোথাকার লোকেরা না-পাওয়ার দুঃখে চেঁচায় ? (৫) কোন্ দেশের লোক অভাব প্রকাশ করে না ?

বটকৃষ্ণ মাঝি (১৯৬৭)

(৬) চীনের কোন্ সহরে রাজা নেই ?

জয়ন্তী সেন মজুমদার (১৫৫৬)

(৭) কোন্ পল্লী একটি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ?

অলকা ঘোষ (৮৫১)

(৮) কোন্ উপকূল অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে ?
(৯) সুন্দরীর ভূষণ আমি তিন অক্ষরে নাম
ইচ্ছা হয় কাটি মোরে কর খান্ খান্
পদ মোর কেটে দিলে
দেখিবে মাঠের কোলে
মস্তক কাটিলে কিন্তু হব ভয়ঙ্কর
তারপর পেট যদি কেটে ফেল হায়
সুরসাল মিষ্ট ফল লভিবে তথায়
আমি কে এখন তাহা বল বন্ধুবর ?

* আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর *

(১) টিউনিস (২) রাস্তা (৩) কাগজ

নির্ভুল উত্তর দাতা ঃ—রেণু, বেবী, রথী ও সতী মৈত্র, রাজসাহী।

যাদের একটি ভুল হয়েছে—যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া ; তিমিরবরণ বরাট, পাটনা ; সাতকড়িপতি সিংহ, মেদিনীপুর ; পঞ্চানন, কেদারনাথ ও গোপীনাথ রুই, কলিকাতা ; অধীররঞ্জন দাস, ছাত্রসঙ্ঘ লাইব্রেরী, বরিশাল ; নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, কৃষ্ণনগর ; শক্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার, ঢাকা।

"...মণি অতুলন ছিল সে গোপন সৃজনের শতদলে
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষী ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেবক্কনে মোরা মুক্ত বেণীর তীরে ॥ —সত্যেন্দ্রনাথ।

বন্ধুরা !

নতুন কথা কি লিখবো তোমাদের জন্য ? আমার তোমার চারিপাশে পুরাতন পৃথিবীর সেই আদি পুরাতন স্বার্থ সংঘাত, সেই লোভ, হিংসা দ্বন্দ্ব জর্জ্জরিত অভাব, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের লোক সত্যযুগের আশা করেছিল আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে,—যখন আমাদের এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়ে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হতো, আসতো সত্যযুগ, জাগতো নতুন দিন। সেই আশায় ছিলে নাকি ?

এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়ে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে একদিন সত্যি, কিন্তু সেদিন কি বিনা তপস্যায়, বিনা চেষ্টায়, বিনা আন্তরিকতায় আসে ? হাত, পা, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি নিয়েও জড়ভরত হয়ে বসে থাকবো সত্যযুগের আশায় ? তখন ভগবান বা কোনও অবতার দয়া করে এসে এই পৃথিবী ধ্বংস করে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে নতুন দিনের আবির্ভাব ঘটাবেন—এ অলস কল্পনায়, ভাবী সুখের আশায় উল্লসিত হওয়া ভিন্ন আমাদের কি আর কিছু করার নেই ? প্রতিদিনকার জীবনে অসত্যকে নিজ জীবন থেকে বিদায় দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে অনুভব করো। সত্যযুগ আনয়নের জন্যে যে ত্যাগ তেজের দরকার, যে পরার্থবোধ ও মমত্বের দরকার, তার শুভ সাধনায়, অন্তরের রত্নবেদীতে আপনাকে জাগ্রত ও যোগ্য করার আয়োজনে তপস্যা মগ্ন থাকো। তৈরী করো, যোগ্য করো নিজেকে—যেমন করে অল্পে অল্পে তিলে তিলে সৃজিত হয় প্রবাল দ্বীপ সাত সাগরের তলায়। তোমাদের এই নিজেদের যোগ্য করার সাধনাই সত্যযুগের কাছে নিয়ে আসবে।

এবার এসো তোমাদের মনের নিভৃত নির্জ্জনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা অনুচ্চারিত ছিল বহু যুগ ধরে, সে মনুচ্চারিত আশা আকাঙ্ক্ষা শোনো 'আশা ও ভাষার' ভেতরে—

আশা ও ভাষা

...এমনি করে আঘাতের পর আঘাত করে জাগিয়ে তুলতে হবে দেশের কিশোর বীরদের। আমি জানি খাঁটি মানুষ যদি কোথাও পাওয়া যায়, তা যাবে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে। তাদের মধ্যেই আছে অনাগত যুগের শত শত ঘুমন্ত বীর, যারা একদিন বলতে পারবে—

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।

—**বরুণ রায়** (জঙ্গীপুর)

"…বড় হবার ব্যাকুল আগ্রহ, বিশ্বকে একান্ত নিজের করে দেখবার একটা প্রচণ্ড মোহ আমায় পেয়ে বসেছে। ছোট্ট ঘরের মধ্যে আটকে রেখে কিশোর মনের সমস্ত কোমল আশাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া কি মহাপাপ নয় দিদিভাই? বাইরের বিশাল জগতের সঙ্গে আমি অল্পই পরিচিত…অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার প্রকৃত সময় এসেছে।…

—**অপূর্ব্বলাল মজুমদার** (কৃষ্ণনগর)

তোমার খোলা চিঠি মনে খুব দাগ কেটেছে। আমরা কিশোর, ভাবীকালের মানুষ। ভবিষ্যৎ ভাববার ভার আমাদের হাতে। আমরা যদি সাধারণ মানুষের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকি, জাতীয় দেবতার জাগ্রত মন্দিরে তার আলো কে জ্বালাবে? তাই বড়ো হবার, সেবায়, কর্ম্মে, জ্ঞানে সত্যিকারের মানুষ হবার জন্যে একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে হবে আমাদের। জানো দিদিভাই, আমরাও ভাবি সেই সাম্য আস্‌বে কবে—যখন মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাক্‌বে না। সারা পৃথিবী জুড়ে থাক্‌বে এক মানুষ জাতি এক আত্মা হয়ে। দেশের দুঃখ, মানুষের হাহাকার অহঃরহঃ মনে আঘাত করে। সত্যি, দেশকে কত ভালবাসি! তার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পার্‌বো না? তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা উৎসাহ বাণী আমাদের পেছনে থাকবে, প্রেরণা জাগাবে আমাদের"—

—**রেণুকা ও সাধনা বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম)

এবার তোমাদের চিঠির অরণ্যে বসে তোমাদের চিঠির জবাব দিই। স্থানাভাবে যাদের চিঠির জবাব দেওয়া হলো না, তাদের নাম স্বীকার করে নিয়েছি, রাগ করো না যেন।

ইলারাণী বসু (১২৫৪) কলিকাতা। তবু ভাল যে রেডিও শুনতে গিয়ে মনে পড়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের চিঠিতেই তোমরা জানিয়েছ রবীন্দ্র সংখ্যা তোমাদের আশাতীত খুসী করতে পেরেছে। ইন্দিরাদি অবশ্যই আছেন তবে বাজার তেমন ভাল নয় দেখে বোধ হয় চুপচাপ আছেন। **অপূর্ব্বলাল মজুমদার** (১৮৩৩) কৃষ্ণনগর। টাকা ফিরে গেছে কেন একথা ইন্দিরাদিকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন বাড়ীর নং ছাপার ভুল হয়েছে—আসলে ওটা ৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হবে। যদিও পরে পেনসিলে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তোমার লেখনীবন্ধু তরেন্দ্রনাথ কেন চিঠি দেয়নি বা মোগলসরাইএর বিশ্বনাথের চিঠি ফিরে এসেছে কেন বুঝলুম না। **জ্যোতির্ম্ময় দাশ** (১১১৭) তেলেনীপাড়া। তোমাদের সব রকম লেখাই আমি পড়তে পারি বুঝেছ? হ্যাঁ পুরীর রথ আরো বড় এবং প্রতি বৎসর নূতন করে তৈরী হয় তিনখানাই। **গীতা সেনরায়** (১০১০) বন্দর। তোমার কথার আমিও প্রতিধ্বনি করি—সত্যিই সুন্দর। হ্যাঁ গিয়েছিলাম বৈকি ভাই। লেখনীবন্ধুর জন্য পোঃ কার্ডও পাঠাতে পারো। দেশের জনসাধারণের দুঃখ দূর করবার জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বা করা উচিত জেনো। **যতীন্দ্রমোহন দে** (১৮৫৩) শ্রীহট্ট। তোমাদের 'রবীমেলা' নামটি একটু অপরের নকল মত হয়ে গেছে, যা করবে তাতে যেন কৃত্রিমতার লেশ মাত্র না থাকে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো তোমরা। **আবতুল গাফ্‌ফার চৌধুরী** (১৫৫৪) উলানিয়া। কি রকমের প্রতিযোগিতা দিতে চাও সে সম্বন্ধে লিখে এবং

পুরস্কার সমেত অফিসে পাঠালে সানন্দে তার ব্যবস্থা করা হবে নিশ্চয়। বন্ধুর জন্য টিকিট পাঠাতে পারো। **বরুণ রায়** (১৬০৬) জঙ্গীপুর। বিকাশ পাল কেন তোমায় চিঠি দেয়নি তাতো বলতে পারলাম না। তুমি যা প্রস্তাব করেছ তা বর্ত্তমানে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। তুমি বরং কিছু পাঠিও, দেখবো কি করতে পারি। **অরুণ মুখোপাধ্যায়** (বাঁশবেড়িয়া) তুমি নিশ্চয় চৈত্র সংখ্যা পেয়েছ—পৌষ আর নাই। নাম জানিও বন্ধুর। **কালো মেঘ** (১৮৯৫) কলিকাতা। ঐ কবিতাটি ভাই মনোনীত হয়নি। ইন্দিরাদেবীর ঠিকানা তো রংমশালেই পাবে—কিন্তু তোমার কথা বুঝলুম না। **পরিমল রায়** (১৮৬৬)। তোমার চিঠি পড়ে অবাক! কবিতা যদি প্রকাশ করা না হয়—তাহলেই বুঝি সব খারাপ হবে? আশ্চর্য্য কিন্তু। প্রত্যেক লেখা কপি রেখে পাঠান উচিত, সব সময় অমনোনীত লেখা সযত্নে রাখা সম্ভব হয় না। **তরেন্দ্রনাথ ঘোষ** (১৪১৪) নিউদিল্লী। 'অপূর্ব্ব' ভীষণ রেগে গেছে—ঠিকানা আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাকে চিঠি লেখো। **রেণুকা বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম)। শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ এখন শান্তিনিকেতনে আছেন—তাঁর শরীর তেমন ভাল নয়। আমার মনে হয় তাঁকে এখন লেখার জন্য পীড়াপীড়ি না করাই ভাল। আমি লিখতে জানি না—সুতরাং ওটা আশা করো না ভাই।

পারুল সেনগুপ্ত, অশোক সেনগুপ্ত, শক্তিরঞ্জন ঘোষ, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, মীরা ও হীরক সান্ন্যাল, বিনীতা ঘোষ, মীরা সেন, নারাণ, মণিমালা, দুলালচাঁদ আঢ্য—তোমাদের চিঠি পেয়েছি। আমার স্নেহ নিও। ইতি—

দিদিভাই

চলন্তিকা

এই সংখ্যার জন্য আমরা গ্রাহকগ্রাহিকাদের এত বেশী লেখা পেয়েছিলাম, যে তা থেকে প্রকাশ-যোগ্য বেছে নির্ব্বাচন করা বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু যেমন আমরা আশা করেছিলাম, অবশ্য আমাদের আশা এতটা উচ্চই ছিল, দুঃখের বিষয় তেমন সুন্দর রচনা আমরা পাইনি। যাহোক, কয়েকটি লেখা বেশ ভালই হয়েছে, সেগুলি আমরা ছাপলাম। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি লেখা আমাদের পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ স্থানাভাবে সেগুলি আমরা ছাপতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সেই লেখাগুলির মধ্যে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য—

মহাচীনের সংগ্রাম—অরুণ ঘোষ	এলিজাবেথ ফ্রাই—অপূর্ব্ব মজুমদার
কন্‌ফুকিয়াস্—রথীন্দ্র মজুমদার	শিশু-সাহিত্য—বরুণ রায়
ডানপিটে—মণিমালা দেবী	সন্ধ্যা—কুমারী নির্ম্মলা চক্রবর্ত্তী
দোকানদার ও বাঁদর—নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়	দুঃখে যাদের জীবন গড়া—কিষণচাঁদ বর্ম্মণ

গত ২৪শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রবীন্দ্র-স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা রেডিওর ছোটদের আসরে অধ্যাপক

খগেন্দ্রনাথ সেন পরিচালিত অনুষ্ঠানে শ্রীসুনির্ম্মল বসুর যে নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল এবং শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, এবারের রংমশালের প্রারম্ভে সে দু'টি লেখা ছাপা হ'ল।

এবারের যুদ্ধে ইউরোপের এখন সবচেয়ে জব্বর খবর অর্থাৎ মুসোলিনীর আশ্চর্য্য পতনের কথা, তা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। মুসোলিনী মহাশয় এখন যে কোথায় ফেরার হয়েছেন তা কেউ জানে না। কেউ বলছে তিনি স্পেনে পালিয়েছেন, কেউ বলছে তিনি হিটলারের বন্দী, কেউ বলছে তিনি এক সাবমেরিণে জলমগ্ন হয়ে ইহলীলা সাঙ্গ করেছেন। যাহোক মুসোলিনীর সঙ্গে ইতালী থেকে ফ্যাসিষ্টবাদ আজ নির্মূল হতে বসেছে। ইতালীতে ফ্যাসিষ্টবাদের শেষ অধ্যায় লেখা হচ্ছে। এখন যাদের হাতে ইতালীর শাসনভার পড়েছে সেই ইতালীর রাজা ও মার্সাল বদোগলিও ইতালী লোকদের শান্ত করতে পারছেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি পূর্ব্বের মত তারা হিটলার-সেলামী নীতি অবলম্বন করেন ও লোকেদের স্বাধীনতা দমন করেন, তাহলে তাঁদের ভাগ্যের কথা ভগবান জানেন। মুসোলিনীর পতনের সঙ্গে আজ ইতালীর রাজনীতির আমূল পরিবর্ত্তন আরো অনিবার্য্য, বিশেষ করে যখন মিলিত শক্তি ফ্যাসিষ্ট-ইতালীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান সুরু করেছেন। রোমকে 'অরক্ষিত সহর' বলে ইতিমধ্যে প্রচার করা হয়েছে। এদিকে সমগ্র সিসিলি মিত্রপক্ষের হাতে আসতে দেরী নেই। ইতালীতে এবার ফ্যাসিষ্ট ইতিহাসের যবনিকা স্বরূপ একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ অনিবার্য্য। ওদিকে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ সীমান্তে জার্ম্মানরা দিন দিন ঘায়েল হচ্ছে ও রুশ লালসেনা বহু নতুন এলাকা দখল করেছে।

বিধাতার অভিশাপ স্বরূপ ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করে বাংলায় ভীষণ বন্যা হয়ে চারিদিক যে হাহাকার তুলেছে তার তুলনা নেই। বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি বন্যা-প্রপীড়িত জেলাগুলির দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। কত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে, কত গৃহপালিত পশু, কত শস্যসম্পদ যে নষ্ট হয়েছে, এক গ্রামের পর গ্রাম যে ভেসে গিয়েছে তার ঠিক হিসেব এখনও হয়নি। ওদিকে মেবার আজমীরের মত নির্জলা মরু ভীষণ বন্যার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হয়েছি, সেখানেও বহু লোকজন মারা গিয়াছে, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছে। উপবাসী পদানত দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবাসীর আজ যেন সমস্ত দিক দিয়ে একটা ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা সুরু হয়েছে। ভারতের ভাগ্যবিধাতার হিসাবে বোধ হয় এ সবের কোন একটা গূঢ় প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে ভারত যেন এত কখনও এত বিপন্ন হয়নি। আজ তাই সব দিক থেকে নিজেরা মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের নিজেদের দেশবাসীকে সমস্ত দুর্দ্দশা নিজেদের শক্তি দিয়ে মুক্ত করতে হবে। নিজেরাই নিজেদের মুক্তিপথের ব্যবস্থা না করলে আর কেউ করবে না, তারই গূঢ় ইঙ্গিত আজ বিধাতার এই অভিশাপে যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এবারের শীল্ড খেলায় শেষের দিকে ভীষণ প্রতিযোগিতা দাঁড়াল-কলিকাতার ফুটবল দলগুলির মধ্যেই। বিদেশী দলগুলি আস্তে আস্তে বিদায় নিল। মহামেডান স্পোর্টিং বি এণ্ড এ রেলওয়ে দলের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরে গেল। এরিয়ান্স পুলিশের কাছে হারল। ইষ্টবেঙ্গল বি এণ্ড এ আরকে সেমি-ফাইনালে ৭-১ গোলে হারিয়ে একটা রেকর্ড করলে। ইষ্টবেঙ্গল ফাইনালে উঠেছে এবং মোহনবাগান—পুলিশ এই দু'টি দলের একটির সঙ্গে খেলবার জন্য অপেক্ষা করছে। যে দলই উঠুক না কেন, ইষ্টবেঙ্গল দলের জেতবার সম্ভাবনাই একটু বেশী, কারণ ইষ্টবেঙ্গল শেষের দিকে অতি সুন্দর খেলছে। মোহনবাগান যদি ফাইনালে ওঠে তবে খেলাটা যে খুব জোর হবে তা বলা বাহুল্য। সকলেই আগ্রহে আশা করছে, যদি এই খেলাটি হয় তা হ'লে খুব আনন্দের হয়। মোহনবাগান —পুলিশ দু'দিন ড্র হয়েছে, তৃতীয় দিনের খেলায় একটা মীমাংসা হয়ে যাবে নিশ্চয়। আর বোধ হয় ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহেই শীল্ড-ফাইনাল খেলারও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। দেখা যাক, কে শীল্ড পায়!

রংমশাল—

ছুটির দিনে

তয়েরি গল্প

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

—আসর—

প্রীতীশ, নীতীশ, অশোক, অমরেশ, সমীর, সৌম্যেন্, রবি

= সভাতে ভোট =

'গল্প—পদ্যে

সুরু প্রীতীশের ; তপির পালা করে চলছে

● ●

প্রীতীশ

বিনয়েন্দ্র পড়ল এসে।
তোলা হবে ফটো।
"ও সব হবে না, শোনো!"—
বললে ভোলা—
"হটো— —
রয়েছে ডজন ছবি, দাঁড়িয়ে ও বসে'।"

নীতীশ

"আধ-শোয়া? বললে শিশির,
"তা-ও বিনোদ বোসে
তুললে, যেবার স্কুল-ফিল্ড্এ, শিল্ড্ নিয়ে ম্যাচ্।"

অশোক

এগোয় সতীশ,
"মনে আছে? আমাদের ব্যাচ্
জিতু সেনের তাজী ঘোড়া পাকড়ে এনে, শেষ—
"Bravo!" রবে ভরিয়ে দিলে Novemberএর রেস্!"

অমরেশ

"জিতলে?—"

সমীর

"বিনু!!" বললে ভোলা—ফিল্ম্ ওর উঠালে,
সিনেমাতে বিখ্যাত তা হত সে-কোন্ কালে!

সৌম্যেন্

"স্পেশাল ফটো—ঘোড়ায় চেপে—"

রবি

"আমারো সেই ঝোঁক,"
বললে ধীরু, সেকেণ্ড্ করে সতীশকে, "যে হোক
করে রাখতে হবেই মিটিংএর মান!"

প্রীতীশ

"তা তো
বটেই! ও—একশোবার! কিন্তু শোনো ভ্রাতঃ!
বিনু না হয় রেডি আছে, অশ্বটি যে কোথা—"
বলতে শিশির—

নীতীশ

ধম্‌কে' "আহা! কি করে বলো তা?"
ভোলা ওঠে, "এ সভার সভ্য হয়ে, —শ্যেম,
ডুবুচ্ছ কি দেশের, বিনুর, আমাদের ন্যেম?"

অশোক

"ও রকমে রেস্-জেতা সে জ্যান্ত কথাটাকে
যেতে দেবে?"
ধরল সতীশ, ধীরু-যতীনদাকে।

অমরেশ

"Let there be no Alps!' and, so, 'Horse
There must be!—"
"—You Big বীরবরস!
কি করে এড়াবে এবার?" সতীশ আঙুল তোলে
ধীরুর কথার সমর্থনে, সভার গণ্ডগোলে।

সমীর

"অল্—রাইট!!"
চলল সভা। — — —

সৌম্যেন্

" — — — পাচ্ছি ঘোড়া কার?"

রবি

বললে যতীন,
"শাদা ঘোড়া, ইয়াসিন মিঞার।"

প্রীতীশ

"বলেছিস্!"
—বললে ভোলা, "দেখতে বিষম ভালো
ও-ঘোড়াটা!

নীতীশ

"সায়েস্তা খুব!"

অশোক

"কী হবে জাঁকালো!—"

অমরেশ

"—ওকে নিয়ে তুললে ফটো!" বললে সাথে সাথে
সতীশ, ধীরু, প্রায় চেঁচিয়ে ফার্সিতে, বাংলাতে।

সমীর

শিশির এবার দেয় এসে যোগ,
"—ও ঘোড়াটা হলে,
ছবি?—

সৌম্যেন্

—হাঁ তা হবে বটে!"—

রবি

—"ছবি যাকে বলে!"
বললে ধীরু, "ঘাড় বাঁকানো, দাঁড়ানো ভঙ্গীতে
সে ফটো? ঠিক কইবে কথা, ফটোরি সঙ্গীতে!"

প্রীতীশ

বললে সতীশ, "কবিত্বে তোর, ছবিত্বকে আরো
ভীষণ এগিয়ে দিচ্ছে!"

নীতীশ

"যাতে এখন পারো
উড়িয়ে নিতে ঘোড়াটাকে পক্ষিরাজের মত"—
বললে যতীন, "—রাজপুত্র সব আছ কি সম্মত
ভাবতে সেটুক?"

অশোক

"ভাবতে?
টুকু! একেবারেই ঠিক
হয়ে গেছে" বললে ভোলা, "কি করে যে Leak
করবে ঘোড়া পাচিল গলে', অকস্মাৎ উধাও
হবে সেই পাড়া থেকে, এঁকে দিচ্ছি তাও
সোনার কালিতে, শোনো, জিমনাষ্ট্ দল!"

অমরেশ

"Hear!" "Hear!" সভাশুদ্ধ অধীর চঞ্চল
নিমেষে!

সমীর

আর হাতের গায়ের মাংসপেশীগুলি,
কথাতে কান, মনের ভিতর লোহাও করছে ধূলি!

সৌম্যেন্

বদলে' গেল কোঁচাগুলি বীরকোঁচাতে এসে,
জামার যত হাতা তারা প্রায় নিরুদ্দেশে
যায় গুটিয়ে, সভা-ভাঙার কথা কইতে থাকে
জুতোর দল অবাক্ হয়ে!

রবি

চড়ুই ঝাঁকের ফাঁকে
হাওয়া এসে দেয় দোলা সর্ সর্ সর্
শূন্য হয়ে হাই তোলে শুধু সভার ঘর।

দুই

প্রীতীশ

ঘুমোয় যেন অজগর ফুলের বাগান ছেড়ে
মাঠের দিকে—

নীতীশ

—সেই পাচিল, টপ্‌কে, হাত নেড়ে
ডাকল ভোলা, দলের লীডার, ছাদের কোণে উঠে'।

অশোক

জিমনাষ্টের দল ঠিক ওই উপায়েই জুটে'
পড়ল নেমে আস্তাবলে।

অমরেশ

শ্বেত পাথরের চেয়েও
শান্ত যেন শাদা ঘোড়া ! লোকের সাড়া পেয়েও !

সমীর

মাঠের দিকে দোর খুলে যায় বইয়ের পাতার মত,
পুকুরের এপার দিয়ে, ঘোড়াও থতমত
চললে প্রায় খেলার সাথী !

সৌম্যেন্

নিতান্তই একা
ছিল কি না ? স্ফূর্ত্তি হল পেয়ে ওদের দেখা !

রবি

এরপরটাও বলা ভালো। লাগাম, গদি, সব
ওই রকমেই পাওয়া।
নেই বলার উপদ্রব !

প্রীতীশ

শুধু বলা হয়েছিল ফটোগ্রাফারটিকে।

নীতীশ

তার কারণ যে, একেবারেই অকেজো ওদিকে
ডিগবাজিটে ! ফটোগ্রাফীর আর্টের নদীটি যে—
নয়কো চেনা, পার হওয়াও যায় না।
—অমন bridgeএ !

অশোক

তবু শেষে যোগাড় হল, যা কিছু চাই সব,
নিতু রায়ের ভাল সূট্‌টা এবং ফুলের টব।

অমরেশ

রোদটা ছিল দারুণ কড়া। অবশেষে এবার
সূর্য্যদেবের মর্‌জি হল দূরে বিদেয় নেবার।

সমীর

ভালো করে রোদের ঝাঁঝটা পড়ে আসার আগেই
এসে গেল ক্যামেরাম্যান।

সৌম্যেন্

অনেকখানি রাগেই
বললে বিনয়, (দোষ তারো নয়,
কোটটা যে বেশ্ টাইট্,
চারজনে কি করেছে কম পরাতে তা ফাইট্ ?
যা হোক শেষে হয়েছে সাজ super-চমৎকার !)
বলছে বিনয়,
"ঘামছি বড়োই, কতই দেরী আর ?"

রবি

পাশের কলের টিন-সেডের ওই এখনো তাত্ আসে,
রুমাল নিয়ে চলে battle গরম ও বাতাসে ?
"নেইক দেরী, এই হয়েছে।
সব করে নে' ঠিক,
ক্যামেরাম্যান্ বললে, "এবার আসুন—এই এ—দিক !"

প্রীতীশ

কি, না, একটু ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিতে হবে।

নীতীশ

ঘোড়াকে যা মানিয়েছে !

অশোক

কথা কে আর কবে !
স্ক্রীনের দুদিক দুটি সারি টবে ফুলের গাছ।
'সেণ্টার'-এ-ই থাকবে ঘোড়া। এই হয়েছে আঁচ্।

অমরেশ

ফটোগ্রাফার বললে, "তা সে মন্দ হবে নাকো।
বড্ড হবে চাপা শুধু, একটুখানি ফাঁকও
থাকবে না তায় কি না? বেশ; একটু সরে হেথা
আসুন দিকি—

সমীর

—তা'লেই হবে ঐ ধরণের কেতা।"

সৌম্যেন্

"—এই রকমে হোক, এ— —ই"
সাজালে ঠিক করে।'
বিনয় সোজা বসে রল লাগাম হাতে ধরে।'

রবি

ফোকাস্ এবার নিতে হবে, দেখতে এল চলে'
ক্যামেরাটির পাশে গ্রাফার; ঠি— —ক থাকতে বলে।'

তিন

প্রীতীশ

গেছে বসে সতীশ, ধীরু, শিশির, যতীন এসে
ভোলার পাশে, চেয়ার নিয়ে বোঠকখানা ঘেঁসে।
দেখছে অশেষ খুশিতে আর চলন্ত পাখায়
জুড়োচ্ছে সব শরীরটাকে, ঢালা বারান্দায়।

নীতীশ

আস্তে চলে বলাবলি।

অশোক

"নেকটাইটে ঠিক
হয়নি নাকি?" "হাঁ হয়েছে।" "এবার তুলে নিক্।"
"আঃ, আবার লাগামটাকে ঢিলে বুঝি দিলে?"
"টেনেছে। ব্যস্। grand হবে কী এবার তুলে নিলে!"

অমরেশ

"এত দেরী হচ্ছে কেন?" "জায়গা একটু কম"
"তোদের বাড়ী হলেই কিন্তু ঠিক হত একদম
নারে যতে?"

সমীর

সুধয় শিশির, "বল দিকি কি কচ্ছে?
বললে ভোলা "অতক্ষণ ওই অমনতরো হচ্ছে—
কেবল এগোয় কেবল পেছোয়, কী এ ফটোগ্রাফার!
ওবারে হল তো ফটো ক' সেকেণ্ড কাবার।

সৌম্যেন্

—এ্য হয়েছে, শুনুন মশাই,"
বললে ভোলা,
"দেখুন,
ছবি না হয় হাফ বডি হোক, আপনি একটু এগুন্।"

রবি

"এগোবো কি," বললে গ্রাফার "রাখুন একটু ঠিক্র
এখানটাতে। ঠিক হল না! আরেকটু— —ও—দিক,—
ঘোড়া উনি ঠিক রাখলে এতক্ষণে ছুটি
তুলে নিয়ে প্লেট আমি পেয়ে যেতেম ছুটি!"

প্রীতীশ

ঘেমে জল, তাতে আরো ঠিক থাকবার চাপ,
বোধ হচ্ছে নিশ্চয়— ফটোও হবে হাফ্!

নীতীশ

এ কথাটা বিনয়ের আসছে না কি মনে?—

অশোক

তাজীতে রেস্ জেতা 'হিরো' যাচ্ছে বোকা বনে'
একটা এমন বাজে ঘোড়ার কাছে অবশেষে?—

অমরেশ

"চাপলুম কি এ গাধার পিঠে ফটো তুলতে এসে ?—
কেন ও হবে না ঠিক—"

সমীর

ভাবতে গিয়ে রেগে
স্‌সটাং করে হাতের চাবুক কশালে সুবেগে।

সৌম্যেন্

শান্ত ঘোড়া ভাবেনিক' এমন হঠাৎ হবে,
এতটা সাজ সজ্জা যখন—

রবি

—সুরু কেবল সবে !
ঘাবড়ে গিয়ে বিশাল ঘোড়া প্রচণ্ড সু-লাফে,
উধাও হল পক্ষিরাজের মতই অতুল দাপে !

চার

প্রীতীশ

কে দেখে আর, পড়ল কোথা ?—
—কোথায় হল কী যে,

নীতীশ

আর সেথা যা হল যাদের তারাই জানেনি যে !

অশোক

হাত পা মাথা নাক চোক কান টেবিল চেয়ার ডেস্ক্
ভেঙে চুরে একেবারে— **O—Λ—N—X** (এক্স্) !

অমরেশ

কোনটি যে কার বুক পা চোক, দাঁত হাত পিঠ মাথা,
হিসেব নিতে—
— —খুলতে হবে—
—রেজেষ্টারির খাতা !

সমীর

দীঘীর ধার ; সাবধানে খুব গেট ওদিকে বন্ধ,
কাজেই হল বারান্দার খোলা দিক পসন্দ,
ভড়কে' বিষম—

সৌম্যেন্

—কপাট চ'কাট সঙ্গেই সব নিয়ে
Farewell নিলেন ঘোড়া পাড়াটাও ডিঙিয়ে !

রবি

উঠল তাতে সেদিকটাতে দারুণ কলরব !
স্ক্রীনের নীচে বিনয় তখন
—নিতান্ত নীরব !

প্রীতীশ

দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে' বসে ফটোগ্রাফার,
ভাবছেন,
"কী ! পৃথিবী কি ঘুরবে নাকি আবার ?"

নীতীশ

চিৎপাৎ ?
ওঃ যখন ওটি বিনয় হয়েছিলেন,
ক্যামেরা ! লাথিতে, তার আগেই বিদেয় নিলেন।

অশোক

সামলে' যা হোক, ফটোগ্রাফার···দশাটি ঠিক দেখে,
উঠেন।

অমরেশ

ঝুলছে চোকের তারা।

সমীর

পিলেও গেছে বেঁকে !

সৌম্যেন্

বিনয় যেই বসছে এবং ভোলা আসছে খুঁড়িয়ে.

রবি

দুজনার কান ধরে' দিলেন মাথা ওদের ঘুরিয়ে।

প্রীতীশ

তারা বলতে "কি এ ব্যাপার?—কেমনতর এটা?"
"এখনো সব উঠিনি, এ কেমন অসভ্যতা?"

নীতীশ

"মানে তার?" "কী রকমটা?" "কেন মশাই, সে কি!"
"পাগল নাকি আপনি?"

অশোক

"না— Devil কি, or ঢেঁকি?"

অমরেশ

"পাগল নয় তো কী হব আর, দেখুন দেখি মশাই—
হলুম সারা একবারেই যে, গেল যে ব্যবসাই!"

সমীর

"তা হলই বা! না হয় আপনি নিয়ে নিতেন দাম,
এমন করে তাই বলে কি ধরবেন আপনি কান?"

সৌম্যেন্

দুদিকে তুমুলতর! ফটোগ্রাফারটিও
বোধ হয় ছিলেন, এক সময়ে দুর্ব্বাসার প্রিয়,
একেবারে বিনয়ের ধরে কোটের ঝুঁটি
খুব ঝাঁকানি দিলেন করে' ভীষণ ভ্রুকুটি!

রবি

বিনয় তার মূর্ত্তি দেখে "বা—প! এ—কি রে!" বলে'
পেছোতে পেছনে, পা পড়ল দীঘীর জলে!

পাঁচ

প্রীতীশ

ওই ওপারে তখন থেকেই ঘোড়ার বিষয় নিয়ে
সহরখানা ভেঙে—"ব্যাপারটা এ কী এ!"

নীতীশ

রেস্ খেলে' যে আস্ত কবাট আস্তাবলে হাজির!
অস্থির ছেলের হল্লা! রাস্তাটা ভোজবাজির
মতই মস্ত লোকারণ্য!

অশোক

চাঁদ আসছে হেসে!
রিক্সা, বাস্, লাল পাগড়ি, এক্সা হয়ে মেশে
হঠাৎ!

অমরেশ

টুপি টিকি দাড়ি ছড়ি গোঁফ জামা
মাথা ছাতা যত কিছুর ছোটার হাঙ্গামা—

সমীর

মিঞা এলেন ইয়াসিন, লাঠিখানি হাতে,
এবং যিনি দেখলেন তাঁর টব নেইক' ছাতে!
গদি, স্যুট্ যাঁর, যাঁর লাগাম পান না খুঁজে',
সিং রামভজন—সেপাই, দাড়ি কানে গুজে'!

সৌম্যেন্

দীঘীর ধারের তিনটি পাড়ে গিস্‌গিসে গিস্ লোক!
দেখে, এদের কাজেই—এবার পাল্টে গেল চোক!

রবি

আস্তে কেউ উঠছে তাদের নাক-হাত-পা নিয়ে,
ভোলা পড়ল বসে। আর অবাক্ তাকিয়ে—
ভাবছেন ফটোগ্রাফার,
"এটা কোথায় হেথা এলেম
এবার তুলতে ফটো?"

প্রীতীশ

বিনয় ভাবলে, "এই রে, গেলেম!"
প্যাণ্টুলান U-Boat, প্রায়-বেলুন Coatএ
গেছে বেজায় এঁটে বোতাম, যায় না খোলা মোটে!

নীতীশ

চলছে জল—প্রাণপণে—ঢোকে ঢোকে খুব,
দিচ্ছে সাঁতার জানত যত, 'সোল্ডার' 'ব্যাক্' ও 'ডুব'!

অশোক

পাড়ে ওঠা, জলে থাকা, কোনটা হবে ঠিক?
ভাবতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দিক!

অমরেশ

তারো চেয়ে, দাঁড়িয়ে সাঁতার দেবার বেলাতেই
সে ভারি মুস্কিল!—

সমীর

—দেখে, চোকের সীমে নেই!
শুধুই চোক, আর চোক—

সৌম্যেন্

—চোক ছোট বড়ো!
"সাবাস!"—আর ক্ল্যাপে ক্ল্যাপে দিক থরোথরো!

রবি

"বীর সাঁতারু এ রকম—" "কক্ষণো আর
যায় নি দেখা এ সহরে—!"

"—Never! Never!"

সভাশুদ্ধ

যদি এরি ঠিক ফটো স্ন্যাপে তোলা হতো,
খাঁটি Heroর ফটোর মতই—

—সেইটি হতো ফটো!

কঞ্জুষের পালা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(চালচিত্রকরের চিত্র দর্শান)

ও দেখেন দেখেন—
কঞ্জুষ বুড়ো যক্ষি,
লক্ষ্মীর ঘরে বসে আছেন
যেন শকুন পক্ষী।
আগলে মোহরের থলি,
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

[প্রস্থান।

—কঞ্জুষের প্রবেশ—

(ক্যাশবাক্স হাতে গীত)

ক্লীং ক্লীং ক্লীং
ক'টাকায় কটা গিনি কত শিলিং।
একে এক, দুয়ে দুই তিনে চারে
ফিলিং ফিলিং ফিলিং রাতদিন।
পয়সা টাকা রিলিং রিরিং লিলিং।
সোনার রিং, রূপার রিং ইয়ার রিং বেয়া রিং।

অর্থমনর্থং! লুকিয়ে রেখে স্বস্তি নেই। বাইরে রাখলে তো রাতারাতি লুট হাতাহাতি। চোর ভয়—রাজা, চোর, দস্যুজন অনলের ভয়—আপন জনার ভয়, তাও কম নয়! এই তো আমি টাক মোহর ঘাঁটছি দিনরাত, গন্ধ তো নাকে পাইনে একটু, লোকগুলো কিন্তু কেমন করে যে বাতাসে বাতাসে টাকার গন্ধ পায় তা তো ভেবে পাইনে। এবারে একেবারে দিচ্ছি মাটি চাপা—থাক এইখানে আজ রাতটা মা লক্ষ্মী ছেঁড়া চটের বালিসের খোলে মুড়ি দিয়ে চুপটি করে মুখটি গুঁজে! চিনতে না পারে যেন দেখো মা, কাল সকালে তাও-খানায় রেখে আসবো তোমায়। আরামে থাকবে সেখানে অসূর্য্যম্পশ্যা মহারাণীর মতো।

খুট্ করলো কি? ইঁদুর না মানুষ? দেখতে হল তো—ইট পাটকেল আঁচিল পাঁচিল ফাটি কুটো যেখানকার যা ঠিকঠাক ধরা আছে নাকি?

(গীত)

ইট পাটকেল, জমা ওয়াশেল
বাকিটারে জুড়ি, একা বুড়ো নাই বুড়ি
জমা বড়ো খরচ ছোট বাকি তার রয়
জমা ছোট খরচ বড় ফাজিল বলে তায়

কড়া নাড়ে কোন রাস্কেল !—কে কে তুই !

—ভিখারীর প্রবেশ—

ভিখারী। আমি কড়ার ভিখারী।

কঞ্জুষ। বিশ্বাস হয় না।

ভিখারী। তবে ক্রোড়পতি ধনপতি এখন তুমি কে তাই বল।

কঞ্জুষ। যে-নোপভক্তুং ন তক্তুং শক্নোতি বিষয়া ন—আমি সেই বৃদ্ধ—
কোনরূপে ভোগ্যবস্তু না পারি ভুঞ্জিতে ;
অথচ লালসা পুরো সঞ্চিত কিঞ্চিতে।
দন্তহীন লোভে যথা চাটে মাত্র অস্থি,
সেই সে অবস্থা মোর বলি ভাই সত্যি—
প্রাণে নাই স্বস্তি এক রাত্ত !

ভিখারী। উপভোগ নাহি যার নাহি কোন দান—
সে ধনে তাহারে যদি বল ধনবান,
তবে তো মাটির নীচে কিবা ধন নাই—
সে ধনেও ধনবান আমরা সবাই

কঞ্জুষ। বাঃ, বাঃ, এই তো ঠিক কথা, পাকা কথা বলেছো, তবেই বোঝ—
সন্তোষ অমৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে না জানে,
শান্তিপূর্ণ তার প্রাণ যে আনন্দ পায়।
ধন লোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা,
নিঃস্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি তারা নাহি পায়।
আমি দাদা ঠেকে শিখেছি—বড় পাজি জিনিস অর্থ—হাঁ—
অর্থের অর্জ্জনে হয় অশেষ যাতনা,
অর্থ লাভ নষ্ট করে বুদ্ধি বিবেচনা।
অর্থের বিনাশে লোকে করে হাহাকার,
হেন অর্থ কিসে হল সুখের আধার !

অর্থের চেষ্টার দিকে যেওনা ভাই—
ধর্ম্মের জন্যও যদি ধন চেষ্টা কর,
তথাপি সে ইচ্ছা তুমি দূরে পরিহর।
আগেতে মাড়ায়ে পাঁক পরে ধোয়াপেক্ষা
পাঁকেতে নাই দিলে পূর্ব্বে থেকেই পা !

টাঁকশালের পাঁকে পা দিও না—কাদা ধুতে দেদার খরচ হতে পারে, চামড়া পর্য্যন্ত লোকসান হয়ে যায়। আমি দেখ ওসব জঞ্জাল ঝেড়ে সাফ সুৎরো হয়ে বসেছি। অর্থ চেষ্টা ছেড়ে দাও—ভুক্তভোগীর কথা শোনো, বলি ইতিহাস। দেখ, তোমারও নাম আমি জানিনে, আমারও নাম তোমার জেনে লাভ নেই, ঘটনাটা বলি :—

আশার ছলনে এক বেঁধেছিনু ঘর,
রাজার ঐশ্বর্য্যভারে, সাজাইনু যত্ন করে,
ঝলমল চারিভিতে হীরক ঝালর।
সুবর্ণ দেউটি পাঁতি, ভাস্বর কান্তি
নিশীথে দিবস ভ্রান্তি ধাঁধাতো নয়ন।
একদিন কালের ঝড়ে, মড় মড় শব্দ করে
হল সব তছ্ নছ্ মিলালো স্বপন !

তারপর কুঁড়ে বেঁধে রইলেম কুঁড়েয়। একদিন হাটে চলতে হঠাৎ শুনলেম রৈ রৈ !

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—
স্মরণে বরষে আঁখি,
জননী সদৃশ সেই পবিত্র কুটির ;
যাহার শীতল বুকে
শ্রান্ত দেহে মাথা রেখে
থাকিতাম, বহে যেত শান্তির সমীর—
সেখানিও চুরমার
চিহ্নমাত্র নাই তার
কে জানে কি দুর্য্যোগে আগুন লেগে—
বস্ ভস্মসাৎ !

সেই থেকে করছি—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে। অপরম্বা হবে কিবা তাতো

(গীত)

কিছু নাইরে কিছু নাইরে দাদা,
কেবলি আছে খালি হাত পা,

ছেঁড়া জামা পকেট কাটা,
ছাত নেই, আছে ছাতা-ভাঙা ডাঁটা
ট্যাঁকে পৈতে গেরো বাঁধা !

বুঝলে তো—ধন যখন ছিল, দুহাতে বিলিয়েছি। এখন সে দিন গেল, দুহাতে বুক চাপড়ে মরছি !

দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল মরণের ক্লেশ,
মরণে বারেক কষ্ট, দারিদ্র্যে অশেষ।
এই তো সেই মানুষ চেহারা তেমন—
সেই নাম, সেই বুদ্ধি, চলন বলন।
সকলি তেমনি আছে, শুধু লক্ষ্মী নাই,
ভিন্ন লোক বনে গেছি—লক্ষ্মীছাড়া ভাই !

ধন বিলোতে নেই, লক্ষ্মীকে বিলোতে গেলেই লক্ষ্মী চটেন। বড় অভিমানিনী মা লক্ষ্মী বিলোবার নামে বিমুখী হন ! যারা সহজে মুঠো খোলে না, গট হয়ে বসে থাকে লোহার সিন্দুকের উপর আসন করে যোগীবৎ তাদেরই কৃপা করেন চঞ্চলা ; চালাক লোক বুঝে তিনি দয়া করেন তাদেরই যারা—

(গীত)

ধনং প্রাপ্য বসে রয় স্বর্ণ জাপ্য,
দেয়না থোয়না বুঝে নেয় নিজের প্রাপ্য।
ও সে একপ্রকারের যোগী তারা,
ধন থেকেও ধন-হারা,
ভোগ বাসনা করেছে সমাপ্য !

ভিখারী। দীয়তাং, ভূজ্যতাং, দীয়তাং।

কঞ্জুষ। বল্লেই হলো না তো দীয়তাং, ভূজ্যতাং—দেয় কে ! আমার দেবার ইচ্ছে আর জাগিও না, থাকতো দিতেম—নেই, দেবো কি ?

ভিখারী। যা হয় দুমুঠো—

ক্ষুধার জ্বালায় নিত্য হইয়া কাতর
অন্ন পাক হেতু ফিরি দেশ দেশান্তর।
পোড়া ভাগ্য নাহি মিলে বিন্ধেও ইন্ধন,
সাগরে গিয়াও জলের না দেখি লক্ষণ।
তণ্ডুল চক্ষেতে নাহি দেখিলাম ভবে,
হায়রে ভিক্ষুর অন্ন কোথা মিলে কবে।

কঞ্জুষ। কি আপদ, এত ঘুরেছো, একথা বোঝোনা—
পরদ্বারে অন্নতরে যে চলে ভিক্ষায়
তাহার যতেক গুণ সব নাশ পায়।

ভিখারী। ঠিক বলেছেন—দারিদ্র্য দোষো—গুণরাশি নাশো !

(গীত)

ওমা লক্ষ্মী, এ সংসারে মূর্খ যেই জন,
তাহারেই বহুধন কর বিতরণ।
আহা মাগো, পণ্ডিতে কেন হও নিরদয়
ভিখারী যে তার প্রতি কেন না সদয় !

কঞ্জুষ। এ আর আমি বুঝিনে—ছেড়ে দাও ভাই কৃপণ কঞ্জুষের কথা !

কৃপণ আপন ধন করিতে রক্ষণ,
যতই মৃত্তিকা তল করয়ে খনন।
ততই সম্মুখে সে আপনার করে
আপন নরক-পথ পরিস্কার করে।

[illegible] ভাই, তাদের নাম কোরো না—হাঁড়ি ফেঁষে যাবে। যাও এখন অন্যত্রে—আমিও চলি।

ভিখারী।—আয়াতি চ যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ
প্রয়াতি চ যদা লক্ষ্মী গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

কঞ্জুষ। সে আর একবার বলতে—

ক্রীড়ার কন্দুক সম মানুষের ধন,
কখনো আসিছে হাতে উড়িছে কখন।

[illegible] ভাই, ও ওদিকে নয়, ওই সোজা রাস্তা চলে যাও—

শুক্ল বন পায় হংস যাহার কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিত-বর্ণে শুক শোভা পায়,
ময়ূরে দিলেন যিনি বিচিত্র বরণ,
তাঁহারি কৃপায় হোক তোমারও ভরণ।

[illegible], তোমাকে কি বা দিই, কি বা আছে হাতে। এলে এতদূর, কিছু না দেওয়াও ভাল [illegible]—পূজোর সময়টা—তা দেখ, এই পুরোনো পেরেকটা নিয়ে যাও।

ভিখারী। দিচ্চেন নিলেম হাত পেতে, কি করতে হবে বলে দেন।

কঞ্জুষ। শোনো বলি—

ওই তেমাথা পথে পাকুড় তলে,
সন্নেসী ঠাকুর দেখবে গিয়ে—
শুয়ে আছেন খাটুলির পরে,
গজাল পেরেক পিঠে দিয়ে,
সামনে তার সোনার বরণ—
এক কড়া ঘী ষষ্ঠীচরণ।
জ্বাল দিচ্ছে বিনি-আগুনে, ঠাণ্ডা জলে।

সন্নেসীর পায়ের তলায় পেরেকটি ঠেকিয়ে বলবে—দিলেম নোয়ার পেরেকটি, হোক সোনার গজালটি! কৃপা কর বাবা, কৃপা কর! দেখতে দেখতে রং ধরবে লোহার গায়ে। কত মেয়ে-ছেলে হাতের নোয়া সোনা করে নিয়েছে এই করে!

ভিখারী। আপনার ঐ লোহার বাস্‌কোটা দেন না, সোনা করে এনে দিই।

কঞ্জুষ। বাস্‌কো? বাস্‌কো লোহার? ওঃ ওইটের কথা বলছো? ও হবে না—নতুন কিনা, পুরোনো হলে হতো। রং চটে যাক্ তখন দেখা যাবে, যাও এখন বিদায় হও! (স্বগত) পাক্কা চোর! ঘরের দুয়োরে দিতে একটা তালা না কিনলে আর—

[ভিখারীর প্রস্থান

—চলে না দেখি। যে সে ফসাফস্ ঢুকে পড়ছে। তালা দিলেও বিপদ—পাঁচজনের চোখে পড়বে—না জানি কি মালই আছে ঘরে। দুত্তোর, পারিনে, একটু গড়াই। অ আ, বলি অ তত্‌লা! অ আ, বলি অ তত্‌লা, দেখ সাড়া দেয় না! বলি, অ অরে, তোর নাম কি?

তোতলা।—শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি,
রাত যায়নি, ডাকছে ঝি ঝি,
কেন উঠলেন মিছি মিছি।

কঞ্জুষ। দিনে দেখিস রাত, রাতে দেখিস দিন, বলি তোর হল কি? চোখ রগড়ে ভাল করে দেখ দিকি, এটা দিন না এটা রাত্রি।

তোতলা। জেগে জেগে স্বপন দেখতেছি।

কঞ্জুষ। তোমার মুণ্ডু করতেছো। তোকে যে বল্লেম, একটা তালা যোগাড় করে সদর দরোজায় লাগাতে!

তোতলা। দোর নেই চৌকাঠে তালা দেবো নাকি?

কঞ্জুষ। দোর কোথায় গেলরে? কর্ত্তাদের আমলের পিয়াশাল কাঠের দোর! তুমিই চুরি করেছ।

[ক্রমশঃ

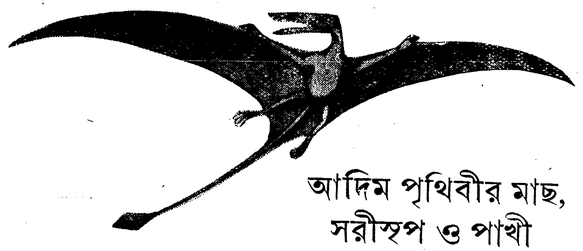

আদিম পৃথিবীর মাছ, সরীসৃপ ও পাখী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমরা কি কোনদিন ভেবে দেখেছো পৃথিবী ও জীব-সৃষ্টির ক্রমবিবর্তন কী আশ্চর্য কাহিনী? সত্যি, কবে পৃথিবীর উৎপত্তি হোলো, কতদিন থেকে ও কী ভাবে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি আরম্ভ হোলো—এ' সবের ধারাবাহিক ইতিহাসের চেয়ে রোমাঞ্চক ও রহস্যময় আর কিছুই নেই। কারণ, আমরা এই পৃথিবীর সন্তান; পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিকাশ যে আমাদেরই ক্রমপরিণতির ইতিহাস।

পৃথিবীর উৎপত্তি হোয়েছে দু'শো কোটি বছরেরও আগে। পদার্থ ও নক্ষত্র-বিজ্ঞান আরো প্রচুর পরিমাণে উন্নতিলাভ না কোরলে পৃথিবীর বয়স সঠিক বলা যাবে না। তবে, এবিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, আমাদের এই পৃথিবী দু'শো কোটি বছরেরও আগে থেকে একটি স্বতন্ত্র গ্রহ হিসেবে বিদ্যমান।

তারপর, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে' ক্রমশঃ পৃথিবীর উত্তাপ বিপুলভাবে হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে, তাপক্ষয় হোতে হোতে দ্রব-অংশ শক্ত পাহাড় ও মাটিতে পরিণত হয় ও বাষ্প মেঘে রূপান্তরিত হোয়ে জলাশয় সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর শীতলতার সেই প্রাথমিক যুগ জীবসৃষ্টির মোটেই অনুকূল ছিলো না। তখনকার পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগেই আগ্নেয় পাথরে ভর্ত্তি ছিল। মাটি কিম্বা কোনরকমের উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র ছিল না। তখনকার প্রকৃতি ও আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে আবহাওয়া জীবন ধারণ ও জীববিস্তারের উপযোগী ছিল না।

ক্রমবিবর্তনের পথে ধাপে ধাপে আদিম যুগের এই বর্বর পৃথিবী একদিন জীবের উপযোগী হোলো, সুরু হোলো জীবসৃষ্টি।

প্রথম প্রাণীসৃষ্টি সম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সর্বাগ্রে যে ঠিক কী অবস্থায় প্রাণ সৃষ্ট হোয়েছিলো, এ'বিষয়ে তাই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তবে তাঁরা

প্রায় সকলেই স্বীকার কোরেছেন যে, সম্ভবত প্রথম প্রাণ-সৃষ্টি হোয়েছিলো উত্তপ্ত ও লবনাক্ত জলে কিম্বা কর্দমাক্ত জায়গায় আর বিস্তার লাভ কোরেছিল জলের মধ্যে।

তখনকার দিনের শৈল-স্তরে যে-সমস্ত 'চিহ্ন' দেখ্‌তে পাওয়া গেছে আর সে সময়ের প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ (Fossil) যা' আবিষ্কৃত হোয়েছে, পৃথিবী ও জীবসৃষ্টির ইতিহাসের জন্যে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের প্রধানত তাদের ওপরেই নির্ভর কোরতে হোয়েছে। এইসব জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ বা প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (জীবাশ্ম) বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা কোরে তাঁরা ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক সূত্র, যতখানি সম্ভব, গ্রথিত কোরেছেন। প্রস্তর-স্তরে সে-যুগের কোন চিহ্ন যদি না থাক্‌তো, উদ্ভিদ ও প্রাণীর 'ফসিল' যদি না আবিষ্কৃত হোত, তাহলে বোধ হয় পৃথিবীর রহস্য অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থেকে যেত!

পৃথিবীতে যখন মানুষের আবির্ভাব হয়নি, তখনকার কথা এবং তারও অনেক আগের কথা জানবার জন্যে পাহাড় আর মাটির স্তর, উপত্যকা আর জলাশয়ের তীর, নদী আর সমুদ্র, ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নানারকম প্রস্তর ও 'ফশিল' নিয়ে যেন তৈরী হয়েছে প্রকৃতির বিরাট বই। এই 'প্রকৃতির বই' নিয়ে গবেষণা কোরে বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর প্রায় একশো ষাট কোটি বছরের ইতিহাস আমাদের জানিয়েছেন।

সবচেয়ে প্রাচীন স্তরগুলিকে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন 'আর্কিয়োজোয়িক' স্তর (Archaeozoic), এদের গায়ে কোন প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া যায় না বলে। তাঁদের বিশ্বাস যে, এই যুগ চলেছিলো প্রায় আশী কোটি বছর ধরে। সুতরাং এই একশো ষাট কোটি বছরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ছিলো পৃথিবীর প্রাণী-হীন অবস্থা। অবশ্য সেই বিরাট অতি যুগের শেষভাগের স্তর থেকে অতি-ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ যায়। এ ছাড়াও নাকি আর্কিয়ান প্রবালের যত জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।

যা হোক, এর পরের যুগ থেকেই আমরা জীব সৃষ্টির সঠিক প্রমাণ পেলাম। ভূ-শাস্ত্রে এই যুগের নাম 'প্যালিওজোয়িক যুগ' (Palaeozoic Age) ; এই যুগের প্রথম ভাগে যেসব প্রাণী উদ্ভূত হোয়েছিলো বলে' প্রমাণ পাওয়া গেছে তারা সামুদ্রিক, আর তারা মেরুদণ্ডহীন ও আকারে খুব ছোট ছিলো আর তাদের গায়ের আবরণও ছিলো শামুকের মত কঠিন। এদের অনেকের খোলের চেহারাও ছিল শামুকের মত। এরা জলে জন্মেছিলো। এই যুগে জলজ শৈবাল, দু'এক রকম সামুদ্রিক পোকা প্রভৃতির অস্তিত্বও ছিলো। এর কয়েক লক্ষ বছর পরের এক শ্রেণীর সামুদ্রিক বৃশ্চিকের চিহ্ন আবিষ্কৃত হোয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, এরা পূর্ববর্তী প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশী জীবন্ত ও শক্তিমান। এই সমস্ত বৃশ্চিকের আকৃতি বিশেষ বড়ো ছিল না। যতগুলি 'ফসিল' পাওয়া গেছে তা'র মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বৃশ্চিক-টির দৈর্ঘ্য হ'চ্ছে ন' ফিট। এই সময়ের স্থলজ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায় না আর ওই বৃশ্চিকগুলি ছিলো মেরুদণ্ডহীন।

প্যালিওজোয়িক যুগের প্রথম ভাগে যদিও প্রাচীনতম প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, তবু, এর আগে যে জীবসৃষ্টি হয়নি, এ'বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসন্দেহ নেই। কারণ, যদি খুব ছোট ছোট নরম শরীরের প্রাণী জন্মে থাকে, তারা কাদায় বা শৈল-স্তরে কোনরকম চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। কাজেই হয়ত তাদের বিষয়ে তাঁরা কিছু জান্‌তে পারেন নি। তারপর এই যুগের মধ্যভাগে এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে একটি নতুন শ্রেণীর প্রাণীর অর্থাৎ মৎস্য এদের অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়।

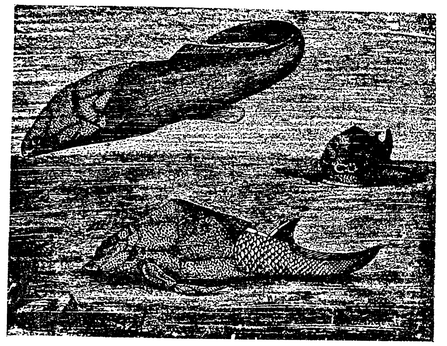

প্যালিওজোয়িক্ যুগের বর্ম্মধারী মৎস্য

এরাই প্রথম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী এবং আধুনিক মাছের আদিমতম নিদর্শন। কয়েক লক্ষ বছর ধরে মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ বিপুলভাবে বেড়ে এসেছে। মাছ-বংশের এই প্রসারের জন্যেই সে যুগকে বলা হয় মৎস্য-যুগ। তখন যে ধরণের মাছের অস্তিত্ব ছিলো, এখনকার মাছদের সঙ্গে তার বিশেষ সাদৃশ্য নেই।—বেশীর ভাগই কালক্রমে লুপ্ত ও বহুলাংশে পরিবর্তিত হোয়ে গেছে। এ-যুগের একটা 'শার্ক'-এর মতন মাছ তখন ছিলো—বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন। তবে, এখনকার তুলনায় তারা খুব বড়ো ছিল না। সাধারণতঃ মাছের দৈর্ঘ ছিলো দু'তিন ফিটের মধ্যেই—অবশ্য কুড়ি ফিট লম্বা মাছের প্রমাণও পাওয়া গেছে। মাছেদের এই প্রাচীনতম প্রতিনিধিরা জলের রাজ্যে এক নতুন জীবন স্পন্দন এনেছিলো।

তখনো পর্যন্ত স্থলভাগে সম্ভবতঃ কোন প্রাণীর আবির্ভাব হয়নি।

মৎস্য-যুগের শেষের দিকে জলের প্রাণী ক্রমে ডাঙ্গায় উঠ্‌তে লাগলো। জীবতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা যে জলচর জীব স্থলে উঠে উভচর (Amphibia) হবার আগেই স্থলভাগে উদ্ভিদের উৎপত্তি হোয়েছিলো। যেসব প্রাণী জল থেকে উঠে আসতো, তারা পাহাড় প্রভৃতি অনুর্বর জায়গায় না গিয়ে জলের ধারেই থাক্‌তো। জলের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ তখনো ছিন্ন হয়নি আর তাদের সৃষ্টিও হোয়েছে জলের মধ্যে।

এর পর একবার আবহাওয়ার ভয়ঙ্কর ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তন হোয়েছিলো। এ' সময়ের শৈল-গাত্রে তাই জীব-দেহাবশেষ অতি অল্পই পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে অত্যধিক মাত্রে পূর্ববর্তী যুগের অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ লুপ্ত হোয়ে যায়।

তারপর, ঠাণ্ডা খানিকটা কমে আসবার পর জীবসৃষ্টির ধারা এক নতুন পথে অগ্রসর হোলো। অনেক নতুন নতুন জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি আরম্ভ হোলো। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এক শ্রেণীর স্থলজ প্রাণী ডিম প্রসব করে—এর আগের কোন যুগেই যা সম্ভব হয়নি। এই সব নতুন প্রাণী সরীসৃপ নামে পরিচিত আর এই যুগ—'মেসোজোয়িক যুগ' (Mesozoic Age)। কুড়ি কোটি বছর এই যুগের বয়স ধরা হোয়েছে। মেসোজোয়িক যুগে নানা রকমের পতঙ্গ, বীজ-বিশিষ্ট গাছ প্রভৃতিও জন্মেছিলো।

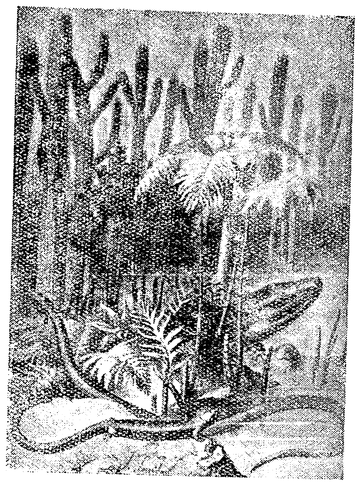

প্যালিওজোয়িক্ যুগের শেষভাগের অতিকায় উদ্ভিদ ও উভচর প্রাণী (amphibia)

এখন সরীসৃপ জাতীয় যে সমস্ত জীব দেখা যায় যেমন, সাপ, কুমীর, অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপ —এদের পূর্ব্বপুরুষরা তো সে সময়ে ছিলই; উপরন্তু আর এক শ্রেণীর ভীষণ দর্শন অতিকায় প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল যাদের আজ কোন বংশধরই জীবিত নেই। এদের নাম ডাইনোসর বা অতিকায় সরীসৃপ (ডাইনো-অতিকায় বা ভয়ানক, সরাস-সরীসৃপ); ডাইনোসরের বংশ সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে গেছে। এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার।

সে সময়ের নীচু জমিতে প্রচুরভাবে উদ্ভিদের জন্ম আরম্ভ হয় আর সরীসৃপগুলিও আকারে দিন দিন বৃহত্তর হোতে থাকে। এই সমস্ত জন্তু যে কী প্রকাণ্ড ছিলো, তা, তাদের কয়েকটির পরিচয় থেকে বুঝতে পারবে। 'ডিপ্লোডোকাস' (Diplodocus) ছিল ৮৪ ফিট লম্বা (নাক থেকে লেজ পর্যন্ত); 'জাইগান্‌টোসরাস' (Gigantosaurus)-এর দৈর্ঘ ছিল আবার একশো ফিটেরও বেশী। আমাদের দেশে জব্বলপুরের নিকট 'বড়-সিমলা' পাহাড়ে এক অতিকায় সরীসৃপের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত ছিল। আর একটি ছিল প্রায় ৩০ হাত, এর নাম 'টাইটানোসরাস'। এদের দেহ ছিল প্রকাণ্ড, কিন্তু সেই অনুপাতে এদের মাথা ছিল খুব ছোট। এরা উভচর ছিল।

সে যুগের সরীসৃপদের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এদের মধ্যে একটি শ্রেণীর দেহের অংশ কিয়দংশে পাখীর মত ছিল (তিন আঙুলে চ্যাপ্টা পা) কারুর বা সামনের অংশে বাদুড়ের মতন পাখা দেখা দিয়েছিলো। এই সমস্ত সরীসৃপেরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে আক্রমণ কোরে ছুটোছুটি

কোরতো। এমনিভাবে তারা লাফাতে শিখলো ও ক্রমে বনের মধ্যে গাছে গাছে উড়ে বেড়াতে লাগলো। এই উড়ুক্ সরীসৃপ বা সরীসৃপ-পাখী জাতদের বলা হয় 'টেরোডাকটিল'। এদের ধারালো দাঁত ছিল। টেরোসোর বা flying dragon এই যুগের বিচিত্র সরীসৃপ পাখী। মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে টেরোডাকটিলই সর্বপ্রথমে আকাশে ওড়ে। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে তার কীর্তি অভিনব; নয় কি?

ডাইনোসর ও টেরোডাকটিল-দের যখন প্রবল পরাক্রম, তখন আর এক শ্রেণীর অল্প-পরিচিত জীব বাহ্য জগতের সঙ্গে নিজেদের চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নেবার অবিশ্রাম সাধনা কোরে চলেছিলো। এবং এ বিষয়ে তারা বেশ খানিকটা শক্তি-সঞ্চয় কোরেছিলো! এরাও ছিলো সরীসৃপেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ডাইনোসর প্রভৃতি বিরাট শক্তিমানদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তা'রা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হোয়েছিলো। সেখানকার দুর্জয় শীত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ক্রমে তাদের গায়ে পালকের উদ্ভব হতে লাগলো। একটি 'ফসিল' পাওয়া গেছে, যার আকৃতি সর্বাংশে সরীসৃপের মতন, কিন্তু পাখীর মতন ডানাও আছে। তাদের দাঁত ছিল যা আজকালকার পাখীর নেই। এই সমস্ত প্রমাণের ওপর নির্ভর কোরে গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির কোরলেন যে, সরীসৃপ থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে এক সময়ে পাখীর উৎপত্তি হোয়েছে। সরীসৃপ-যুগের আয়ু ছিলো আট কোটি বছর।

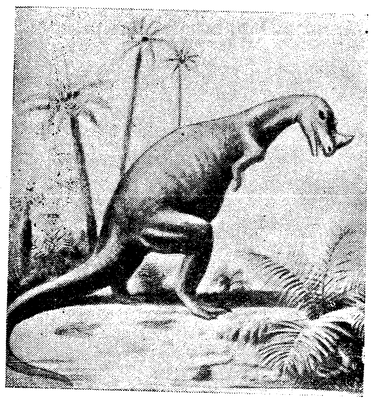

সরীসৃপ যুগের রাক্ষুসে ডাইনোসর

এই যুগের শেষে আবার এক প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক বিপ্লবে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। পরের যুগে পত্তন হোল জীব-সৃষ্টির আর এক ক্রম-বিবর্তনের পালা। স্তন্যপায়ী জীবদের আবির্ভাব ঘটলো। এই যুগের নাম—'কেনোজোয়িক যুগ' (Cainozoic Age)—এর পরিচয় শৈলস্তর আমাদের জানিয়েছে। এ সময়ে পৃথিবীর স্থলভাগে ঘাস জন্মাতে আরম্ভ করেছিলো ও স্তন্যপায়ী জীব প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়েছিলো।

তারপর জীবসৃষ্টির ধারা ক্রমে ক্রমে যতই বর্ত্তমানের দিকে এগিয়ে এসেছে, আজকালকার সঙ্গে প্রাচীনকালের প্রাণীর সাদৃশ্য তত-ই স্পষ্ট ভাবে দেখা গেছে। অবশ্য' এখন আমরা যে-সমস্ত

জীব-জন্তু দেখ্‌তে পাই, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস জানা যায় নি—জান্‌বার পথে কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, তোমরা দেখলে তো? ক্রমবিবর্তনের ধারা তো সরল ও এক-রেখাভিমুখী হোয়ে চলে আসেনি, আর সব যুগের নির্ভরযোগ্য নিদর্শনও পাওয়া যায়নি!

তবে এখনকার হাতি, ঘোড়া, উট প্রভৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন। ঘোড়ার 'পূর্বপুরুষ' ছিলো 'ইয়োহিপ্পাস'। তখন কিন্তু এর পায়ে ছিলো চারটি আঙ্গুল (খুর)। ক্রমপরিণতির পথে একে একে আঙ্গুলগুলি হারিয়ে (এখনমাত্র একটি আছে) ঘাড়ের ও মুখের অনেকখানি পরিবর্তন স্বীকার কোরে আধুনিক কালের 'সভ্য' ঘোড়া হোতে হোয়েছে।

মোগল দরবারে নিকোটিন্

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-টি; এম্-এ আর এস্-টি (লণ্ডন)।

খুব বেশী দিনের কথা নয়—ভারত সম্রাট আকবর তখন প্রৌঢ়।

একদিন তিনি আগ্রাদুর্গের দেওয়ান-ই-আমে বসে আছেন। তাঁর দুই দিকে বসে আছেন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং অমাত্যের দল, গায়ে তাঁদের সোণারূপা জরির কাজ করা বিচিত্র সাজ। সম্রাট সেদিন পর্য্যটক আসাদবেগের উপঢৌকন গ্রহণ করছিলেন। উপঢৌকন গুলি ছিল বিচিত্র এবং অদ্ভুত। থেকে থেকে সম্রাটের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ সম্রাটের চোখ পড়ল একটা রূপার পাত্রে। তার উপরে রাখা ছিল চমৎকার কাজ-করা একটা চামড়ার থলে, একটা সোণার প্রদীপ, একটা মণি-মুক্তার কাজ-করা ফাঁপা নল। এই নলের একদিকে ছিল একটা রঙীন এনামেলের পাত্র। আকবর আশ্চর্য্য হয়ে খানিকক্ষণ এই জিনিষ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—"এতে কি আছে?" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থলেটার মুখ খুলে ফেল্লেন এবং বলে উঠলেন, "ওঃ পাতা!!"

খান-ই-আজম্ আজীজ কোকা উত্তর দিলেন, "পাতা নয়, জাঁহাপনাহ্! পবিত্র মক্কা ও মদিনাতে এগুলিকে লোকে ঔষধ বলেই জানে। হকিম আসাদবেগ এই ঔষধ বহুদূর থেকে এনেছেন।" তখন রাজাদেশে এই পাতা কি ভাবে খেতে হয় আসাদ তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন, "জঁহাপনাহ্! এই পাতার নাম তামাক। প্রথমে এই তামাক এনামেলের পাত্রে রেখে জ্বালতে হবে। তারপরে নলের অপর দিকটা মুখের মধ্যে পুরে মুখ দিয়ে শ্বাস টানতে হবে। তখন নাক ও মুখের ভিতর দিয়ে এক প্রকার সুগন্ধ ধোঁয়া বেরুবে এবং দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন শরীরের ভিতরে আগুন লেগেছে।"

সম্রাট অবাক! কখনো এমন কথা তিনি শোনেন নি। তক্ষুনি তিনি আসাদকে তামাক প্রস্তুত করে দেবার জন্য আদেশ অল্লেন। দরবারের হকিম সাহেব এতক্ষণ মন দিয়ে সব কথা শুনছিলেন এবং বিল্লের কোন আশঙ্কা না দেখে চুপ ছিলেন, এখন তিনি সম্রাটকে সম্বোধন করে বল্লেন, "জাঁহাপনাহ্! যে ঔষধের গুণ আমাদের অজ্ঞাত, তা কখনো আপনার খাওয়া উচিত নয়।"

আকবর বল্লেন, "আমার শরীরের ভাল মন্দের জন্য আপনার এই উৎকণ্ঠা আমি প্রশংসা করি, হাকিম সাহেব। কিন্তু আসাদ সুদূর মক্কা থেকে আমাদের রাজধানীতে এসেছে তার এই আশ্চর্য্য জিনিষ দেখাবার জন্য, তাকে কি ব'লে ফিরিয়ে দি? এই ঔষধ যদি আমি একবারও গ্রহণ না করি তবে এই পর্য্যটক যে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, হাকিম সাহেব।" একথা বলে সম্রাট মুখের ভিতরে নল পুরে দিয়ে দু'তিন বার টানলেন।

হকিম আর সহ্য করতে পাল্লেন না; সম্রাটের মুখ থেকে নলটা কেড়ে নিয়ে খান্-ই-আজমকে টানতে দিলেন। তাকে বল্লেন, "ভিজারৎপনাহ্! আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে আপনি এখনো কি করে স্থাণুর ন্যায় বসে আছেন!. আপনি কি দেখছেন না যে সম্রাট আল্লার আদেশ অমান্য করে তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করবার চেষ্টায় আছেন?"

আকবর তখন সহাস্যে বল্লেন, "শান্ত হোন মসীহ্-উল্-মুল্ক্, শান্ত হোন। আপনার তৃপ্তির জন্য এখনি আতরকে ডেকে এই পাতার গুণ পরীক্ষা করাচ্ছি।

অতি অল্পক্ষণের ভিতরেই রসায়ণবিদ আতর এসে হাজির হলেন এবং পাতার গুণ পরীক্ষা করে বল্লেন, "খোদাবন্দ্! এ এক নূতন আবিষ্কার। আমাদের পুস্তকে যদিও এই পাতার কোনও উল্লেখ নেই, কিন্তু ইউরোপীয় ডাক্তারেরা এই পাতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।"

হকিম বলে উঠলেন, "হতে পারে এটা একটা ভাল আবিষ্কার, হয়তো এই পাতাও ভাল। কিন্তু কোন নূতন জিনিষ পরীক্ষা না করেই সম্রাটকে দেওয়া যেতে পারে না—বিদেশীয়েরা যতই এই পাতার প্রশংসা করুক না কেন।"

তখন পর্য্যটক আসাদবেগ বল্লেন যে ইউরোপীয়েরা এত নির্ব্বোধ নয় যে তারা ভালরকমে পরীক্ষা না করেই কোন জিনিষ ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যেও জ্ঞানী আছেন। তিনি হকিমকে একথাও জিজ্ঞাসা কল্লেন যে জিনিষের গুণাগুণ মোটেই পরীক্ষা না করে তিনি এক তরফা রায় কি করে দিলেন। জিনিষের গুণাগুণ বিবেচনা করেই তার বিচার করা উচিত।

হকিমের মুখে আর কোন কথা নেই। তিনি শুধু বল্লেন, "আমরা ইউরোপীয়দের অনুকরণ করতে চাই না। আমরা এমন কোনও নূতন রীতির প্রশ্রয় দিতে পারি না যা আমাদের জ্ঞানী পণ্ডিতরা তাঁদের পুস্তকে বলে যান নি।"

"আপনি অতি অদ্ভুত তর্ক করেছেন, হকিম সাহেব," আসাদবেগ উত্তর দিলেন। "প্রত্যেক

রীতিই কোন না কোন সময়ে নূতন ছিল। আদমের সময় হ'তে আজ পর্য্যন্ত আমরা কেবল রীতিই গড়ে আস্‌ছি। প্রত্যেক নূতন জিনিষ প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ হ'লে পরেই লোকে তা গ্রহণ করে।"

হকিম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন যে তিনি তাঁর তর্কশক্তিতে মোটেই মুগ্ধ হন নি এবং তাই তামাক খাওয়া স্থির করেছেন। তারপর তামাক খাওয়া আরম্ভ করার পূর্ব্বে তিনি মুফ্‌তী সাহেবকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করতে বল্লেন যেন এই মহৎ কার্য্যের পরিসমাপ্তি মোগল দরবারেই না ঘটে, আর এর প্রচার যেন ক্রমে সারা ভারতে ছেয়ে যায়।

মুফ্‌তী সাহেবের আশীর্ব্বাদের পর সম্রাট সমস্ত সভাসদগণকে বল্লেন, "আপনারা 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে তামাক খেতে আরম্ভ করুন। আমি চাইনা ভবিষ্যতে একথা কেউ বলে, যে অর্দ্ধেক সভ্যজগতে যা প্রচলিত ছিল তা মোগলেরা জানত না।"

সভাসদেরা সকলেই এই শুভ কার্য্যে যোগ দিল। সুতরাং আসাদকে আরও পাতা সরবরাহ করতে হ'ল। শীঘ্রই সওদাগরেরা তামাকের আমদানি আরম্ভ করে দিল এবং মুফ্‌তী সাহেবের আশীর্ব্বাদ অতি দ্রুত ফলে গেল।

মহান সম্রাট আকবর নিজে কিন্তু কখনও তামাক খাওয়া অভ্যাস করেন নি।

[পুরাতন ফার্শী পুস্তক হইতে গৃহীত]

সাপের রোজা তিনকড়ি

গল্প

শ্রীশামুক

রাতদুপুরে ছোট পিসিকে কিসে কামড়ালো! অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম, মা ঠেলে তুলে দিল,—যা একবার তিনকড়িকে ডেকে নিয়ে আয়!

তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠি। চোখ খুলতে চায় না, ছোটপিসির কান্না শুনতে পাই।

—কি-সে কামড়ালো মা—?

—কি জানি বাবা বড় ছটফট করছে। চটকরে ডেকে নিয়ে আয় তিনকড়িকে, উনি আবার বাড়ি নেই আজ।

মনে পড়ে বাবা গেছেন পাটনা, কাল ফিরবেন। বয়স তখন কত হবে আমার—তেরোর বেশী নয়।

দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে খেয়াল হয়, তিনকড়ির বাড়ি যেতে হবে এই রাতের অন্ধকারে! থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, গণেশ। কথাটা বলেই মনে হল কি বোকা আমি, চাকর গণেশ বাবার সঙ্গে গেছে। বাড়িতে আমি একলা পুরুষ আমাকেই যেতে হবে!

মা কাছে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে,—ভয় করিস না, উপায় নেই যে বাবা, যেতেই হবে মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য।—

কথাটা শেষ হবার আগেই ছোটপিসির হঠাৎ বেশী কান্না শুনতে পেয়ে মা দৌড়ে চলে গেল, আমিও ছুটলাম পিছনে।

ছোটপিসি বিধবা মানুষ, বারান্দার দিকে ছোট ঘরটায় শোয়। গিয়ে দেখি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে পাগলের মত হাত পা ছুড়ে কাঁদছে,—মাটিতে নানান আকারের চোখের জলের দাগ।

তিনকড়িদের দু'পুরুষ আমাদের পাড়ায় বাস। ওর বাবা কেদার নাপিতকে একটু একটু মনে পড়ে। মাথার চুল ধব-ধব করছে সাদা, মুখে একমুখ পান, বগলে কামাবার পুটলি চেপে উড়ুনি গায়ে, বাড়ি বাড়ি চলেছে। হেঁকে গলার হাঁক,—বড়বাবু আসবো নাকি?

তিনকড়ি নাপিতের কাজ করলো না। বাদামী জিনের কোট গায়ে দিয়ে, তালিমারা ছাতা ও একটা মস্ত লম্বা মলাটের খাতা বগলে সে আপিস যায়। দশাসই চেহারা, লম্বায় ও চওড়ায় সাধারণ মানুষের চারগুণ। মিশ কালো রং, কপালে ভুরু নেই, চোখের পাতাও নেই প্রায়। মোটা মোটা কান, পুরু ঠোঁট, মাথার চুল কদম ছাঁট। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা বড় তামার মাদুলী কালো সুতো দিয়ে মাথার সঙ্গে আঁট করে বাঁধা!

এরকম মাদুলী পরা আর কারুর দেখিনি। মনে হত শোবার সময় ওটা মাথায় ফুটে যায় না কেন, কলের ভাবতাম মুখ থুবড়ে ত' আর কেউ শোয় না। যাই হোক ওটা কিসের মাদুলী সকলেরই জানা ছিল। তিনকড়ি যে সাপের রোজা আর ঐ মাদুলীর মধ্যে আছে তার মহাশক্তি, এ কথা খুব ছোট বেলা থেকে শুনে তবে ওর কেরামতি দেখবার কোনদিন সুযোগ হয় নি। তিনকড়ির ঘন ঘন ডাক আসতো বস্তি অঞ্চল থেকে কাছাকাছি পাড়াগাঁ থেকে। এবার সে রাত্রে কি হ'ল বলি।

সদর দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি থমথম করছে চারিদিক। রাস্তা মরা সাপের মত এঁকে বেঁকে পড়ে আছে। দুপাশের নানা আকারের বাড়ি সারি সারি জানালার চোখ খুলে চুপ করে তাকিয়ে দেখছে। গ্যাসের আলো জ্বলছে ঝিম ঝিম। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলি। নিজের জুতোর শব্দ কি রকম অদ্ভুত শোনায়। মনে হয় কে যেন পিছু পিছু আসছে। আর ঘুমন্ত রাত্রির কত রকমের শব্দ—যেন বারবার পাশ ফিরে ফিরে শুচ্ছে, তার মধ্যে মট মট কট কট আওয়াজ!

দশবারো খানা বাড়ির পর এদিকে সিধু ঘোষের তিনতলা বাড়ি ওদিকে কাঠগোলা, মাঝখান দিয়ে গেছে একেবারে অন্ধকার গলি। গলির মোড়ে এসে থামলাম।

দিনের বেলার এই জায়গার চেহারা মনে হল। সিধু ঘোষের বাড়ির এদিকটায় জানালা নেই। জমি থেকে কার্নিশ সাদা পাঁচিল যেন সেই আকাশ পর্য্যন্ত উঠে গেছে। কাঠগোলায় সাজিয়ে রাখা উপরি উপরি কাঠের গুঁড়ি, চেরা কাঠ, একপাশে গাদা করা কাঠের গুঁড়ো-ছিলকে। মাঝখানে এক চৌকো গর্ত্তএর উপরে কাঠের গুঁড়ি কামানের মত মুখ তুলে রাখা হয়, একজন মানুষ গর্ত্তের ভিতর আরেকজন কামানের উপর দাঁড়িয়ে হিস্ হিস্ শব্দে করাত চালায়।

বৃষ্টির সময় এই গর্ত্তটার অনেকখানি জলে ভরে যায়। আমরা তখন লাঠির আগায় সুতো ও সুতোর সঙ্গে কাগজ বেঁধে কত মাছ ধরা ধরা খেলেছি। একদিন দীর্ঘাঙ্গী পণ্ডিত মশায়ের ছেলে বুলেকে নানকু ঠেলে এর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আবার বুলেকে হাত ধরে তুলতে গিয়ে নানকুও। ওদের যা চেহারা হয়েছিল সেদিন।

রাত্রে কিন্তু এ জায়গাটার রূপ একেবারে বদলে গেছে। সিধু ঘোষের বাড়ি আর বাড়ি নেই। প্রকাণ্ড এক বরফ ঢাকা পাহাড়! কাঠগোলার স্তূপগুলি নানা আকারের সব অতিকায় জন্তু হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে গেছে! আর অন্ধকার গলিটা একটা তরল নদীর মত গড়িয়ে এসে আমার পায়ের কাছে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!

মনে হ'ল ফিরে যাই। কি নিষ্ঠুর নির্জ্জনতা, কত ভয়ানক একলা আমি। এ সময়ে যদি একজন ডাকাতও 'হারেরে' করে ছুটে আসতো ত' মনে হত সে পরম বন্ধু আমার।

মনে পড়লো ছোটপিসির কান্না, মনে হল মার পিঠে হাত বুলানো কথাগুলি। সিধু ঘোষের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলি। একটু গিয়ে নিজেকে আর দেখতে পেলাম না-হারিয়ে ফেললাম অন্ধকারে। সিধু ঘোষের বাড়ি শেষ হতে আরম্ভ হয় খোলার ঘর। প্রথমে লালমোহনদের, তারপর তিনকড়ির, এরপর এক ফালি সরু গলি, একজন মোটা মানুষ সোজা যেতে পারে না। দিনের আলোয় দেখা এ সমস্ত খুঁটিনাটি ছবির মতন চোখের সামনে ভাসে।

একটা ছুঁচো চিক-চিড়িক্-চিক করে ছুটে পালালো, হাতড়ে হাতড়ে তিনকড়ির দরজায় তখন পৌঁছেছি। —মাগো—আঙ্গুলে কি কামড়ালো? সাপ? আমার দুপাশের পাঁজরার গুম গুম করে কিল মারে কে?

ভয়ে পাগল হয়ে গেলাম কয়েক মিনিট। মাটিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হল, প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছা হল, ইচ্ছা হল লাথি মেরে কিল মেরে চারিদিকের বাড়ি ঘর সব ভেঙ্গে চুরমার করে দি।

হঠাৎ মনে হয় দরজার উপরে সাপ কি করে হবে? সত্যি ত', হাত বুলিয়ে দেখি একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু তখনও পাঁজরায় কিল মারে কে? ও, ভয়ে এমন কাঁপছি যে নিজের দেহে নিজেই কতগুলো গুঁতো দিচ্ছি! অবাক কাণ্ড!

সামলে নিয়ে ডাকি,—তিনকড়ি—ও তিনকড়ি।

উত্তর নেই। কতবার ডাকি তবু উত্তর আসে না। ভিতরে কার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাই, টাঙ্গানো পেয়ারা গাছের পাতা ঝির ঝির করে আওয়াজ করে, কিন্তু কোন মানুষ সাড়া দেয় না।

দেরী করা চলে না। দরজায় দমা-দম ঘা দিলে আশ পাশের সকলের ঘুম ভেঙ্গে যাবে হয়ত ভয় ভাবতেও পারে। করি কি? পাশের সেই সরু গলির দিকে মুখ বাড়াই। সব অন্ধকার কিছু দেখা যায় না: ঐ যে একটু আলো যেন আসছে তিনকড়ির চালা বাড়ির শেষ দিক থেকে। পড়ি ত' মরি করে চলি আলোর নিশানার দিকে, কত কি মাড়িয়ে, কত ইট পাথরের ঠোক্কর খেয়ে।

ছোট জানালার একপাটি খোলা। উঁচু হয়ে দেখি—চমক লেগে যায়। ঘরের ভিতর দেওয়াল থেকে ছাদ পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকা গাঢ় কালো রং এর! যেন সত্যি জীবন্ত সাপ ফণা তুলে চকচকে চোখ নিয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। জমিতে তিনকড়ি পূজার আসনে চোখ বুজে বসে, সামনে ফুল ছড়ানো। পিদিমের আলো নিবু নিবু হয়ে এসেছে ধুনার ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছা অন্ধকার। বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়ানক অস্বস্তি লাগে ভয় করে, সর্ব্বদা মনে হয় চারিদিকে হাওয়ায় সাপ—কত সাপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ডাকি,—তিনকড়ি, ও তিনকড়ি।

—কে—হাঁড়ির ভিতর দিয়ে আওয়াজ বেরোয় যেন।

—চটকরে একবার এস, মা ডাকছে ছোটপিসিকে কিসে কামড়েছে।

পিদিম উসকে হাতে নিয়ে তিনকড়ি জানালা দিয়ে আমার মুখ দেখে। আর আমি দেখি ওর টকটকে লাল চোখ, কপালের উপর চকচকে মাদুলী।

দুজনে যখন আমাদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন ছোটপিসি কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মা চোখে মুখে জল ছিটিয়ে একটা হাত-পাখা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করছে। তিনকড়ি প্রথমে ছোটপিসির ডান পায়ের গোড়ালি ভাল করে দেখে কোথায় কামড়েছে। বলে,—হু, মা মনসার চেলার কাজ ভুল কিছু নেই, তবে পিসিমা এত কাঁদছেন এটা ভয়ে—এতে জ্বালা যন্ত্রণা বেশী হয় না।

মা চমকে উক্ করে এক ভয়ের আওয়াজ করে উঠে, এতক্ষণে মনে আশা ছিল হয়তো আসলে সাপ না হতেই পারে বিছে বা ঐ রকম কিছু। আমার কিন্তু এতটুকু ভয় তখন ছিল না। সাপের বিখ্যাত রোজা যখন এসে গেছে তখন যে অবস্থাই হোক বাঁচিয়ে তুলবে।

তিনকড়ি ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে এক চারকোণা ঘর কাটে। তার মাঝখানে নিজে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলে—স' পাঁচ আনা পয়সা, চারটি গাঁদা ফুলের পাতা, দুটি কালো জিরে, আর বাটবার একটা নোড়া চটকরে এনে দাও বৌদি—ও ভুলে গেছি একটা তামার পাত্রে খানিকটা দুধ। কালো জিরে, সরষে নয় কিন্তু।

দৌড়ে গিয়ে ছাদের টব থেকে গাঁদা পাতা নিয়ে আসি। অন্য জিনিষগুলি মা দু'মিনিটে জোগাড় করে এনে দেয়। তিনকড়ি ট্যাঁক থেকে ছোট এতটু একটি শিকড় বার করে বলে,—ভাগ্যিস আজ এইটুকু বাকী ছিল, কাল আবার জোগাড় করে রাখতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি,—কি গাছের শিকড়, নাম কি?

—বলতে নেই, বললে গুণ থাকে না।

চুপ করে বসে দেখি। তিনকড়ি শিকড়ও গাঁদাপাতা মেঝেতে ঘসে বেটে নিল। তারপর তামার পাত্র দুধ চারিদিকে ছিটিয়ে দুটি দুটি জিরে ছড়াতে ছড়াতে বিড় বিড় করে বলে,—

মা মনসা মা মনসা তোমার আমি দাস।
গুরু আমার কালীচরণ দত্তপুকুর বাস॥
আস্ত সাপ বাস্ত সাপ গোখরো কিংবা কেউটে।
যেথায় যত পদ্মপাল বসুক তোমার পইঠে॥
তোমার শ্রীচরণেরই কৃপায়
বিষ যত অমৃত হয়ে যায়।
ঘুরক ঘুরন ঘুর ঘুরো
উপড়া উপড়া গুম গুরো।
যা যা নাগমাতার আদেশে
বিষ কেটে যা
গুরু কালীচরণের হুকুমে
বিষ চলে যা॥

এবার তিনকড়ি এক কোষা জল নিয়ে কপালের মাদুলী ডুবিয়ে ঢক করে খেয়ে ফেলে, সে হাত মাথায় বুকে কাঁধে মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে বলে,—অনন্তায় নমঃ, বাসুকয়ে নমঃ, তক্ষকায় নমঃ, কর্কটায় নমঃ, পদ্মায় নমঃ, মহাপদ্মায় নমঃ!

বাস্ উঠে পড়ে বাটা শিকড় নিয়ে ছোটপিসির ডান পায়ের গোড়ালিতে প্রলেপ দিয়ে দিল।

আশ্চর্য্য এই যে ছোটপিসি এতক্ষণ পিট্‌পিট্ করে দেখছিল আর গোঙাচ্ছিল কিন্তু ওষুধ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণার স্বর চলে গেল এবং আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকলো!

একগাল হেসে কপালের মাদুলীতে হাত ঠেকিয়ে তিনকড়ি বলে, দেখলে বৌদি দেবীর কি মাহাত্ম্য! দাঁড়াও বাছাধনকে পাকড়াও করি, অনেকদিন ধরা হয়নি।—কাজ কি ভাই এই রাত ভিতে, সকাল হোক বরং —মা বলে।

তিনকড়ি ততক্ষণ বাকী দুধটা ও জিরেগুলি ঘরের কোণে ছড়াতে সুরু করে দিয়েছে।

রুমালের মত এক টুকরো কালো কাপড় বাঁ হাতের মুঠোয় নিল। আমি এক লাফে ঘরের চৌকাঠে। সাপ ধরাধরি খুব নিরাপদ কাজ নয় দর্শকের দিক থেকেও—কখন কোন দিক থেকে ফস্ করে বেরিয়ে আসে, ত?

ছোটপিসি এতক্ষণে বেশ্ সুস্থ হয়েছে। তিনকড়ির ইসারায় মা তাঁকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে এল। তিনকড়ি যেন ঘরের মেঝেতে নেচে বেড়াতে থাকে। জানলার আশপাশ খটাখট আওয়াজ করে, আলমারীর পিছনে পটাপট চড় মারে, যেখানে যা জিনিষ আছে ধড়ধড় করে নাড়া দিয়ে দেয়। আর বিড়বিড় করে কি বলে দূর থেকে আমরা শুনতে পাই না।

ঘরের এক কোণে একটা নরদমা কাঠের ঢাকা দিয়ে বন্ধ করা। সড়াৎ করে ঢাকাটি খুলে গেল। কিছু নেই। উপুড় হয়ে বসে ঝুঁকে দেখে মাথা নাড়ে, না কিছু নেই। হঠাৎ কয়েকটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে উঁ করে এক আওয়াজ করে হাত বার করে নেয়। বলে,—কামড়েছে আমায় কামড়েছে শিকড় নিয়ে বেটে দাও পাতা নিয়ে এস চট করে। ও শিকড় যে ফুরিয়ে গেছে, কি হবে আমার? মা কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলে হাউ হাউ করে। আমি তিনকড়ির হাত ধরে ধরা গলায় বলি,—কি শিকড়ের নাম বল ভাই এনে দি দৌড়ে? তিনকড়ি ওক করে এক বিকট চীৎকার করে ধড়াস করে মাটিতে শুয়ে পড়ে হয়ে গেল।

আমাদের চীৎকারে পাড়াপড়শীদের আসতে দেরী হ'ল না, তিনকড়ির বাড়ির লোকেরা এল, ডাক্তারকেও ডেকে আনা হল। কিন্তু সেই দশাতেই ভীমের মতন দেহ যেমন পাথর হয়ে পড়েছিল, তেমনি পড়ে এতটুকু নড়লো না আর।

ডাক্তারবাবু বললেন যে সাপের বিষ ওর শরীরে ভাল করে ঢোকবার আগেই ও মারা গেছে। বিষ নষ্ট করবার ওর নিজের ওষুধ যে ফুরিয়ে গেছে একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ভীষণ আতঙ্ক ওর দম আটকে মারা যেতে আর তর সয়নি।

হ্যাঁ, সেই সাপকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরদিন লোক লাগিয়ে কত খোঁজাখুঁজি করা হল, পাওয়া গেল না।

কতদিন হয়ে গেছে এ ঘটনা। আজও মনে হয় যখন শেষ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখনও যদি বলতো ঐ গাছের শিকড়, তাহলে হয়তে জোগাড় করে এনে ওর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হত। আবার মনে হয় মন্ত্র ত জানিনে?

আজও কোন কারণে তিনকড়ির নাম উঠলে ছোটপিসি কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, বলে,—আমার ভুলা ছেলে জোয়ান সেদিন প্রাণটা দিলরে, আমার মরণ হল না কেন!

কবিতা

দুপুরের বিল

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

উজানচরের বিল—
মাথায় তাহার কোমল আকাশ
স্বপ্নের মত নীল।
সাদা দুপুরের অধিবাসী সেথা ঝল্‌'মলে গাঙ চিল।
দু'পারে তাহার সোণালী ফসলে
অভিসারী টিয়া-ঝাঁক—
চাষীদের যত ছোটো অবসরে তোলে সুমধুর ডাক।
কাঁচা পথ হ'তে থেমে থেমে মৃদু ঝিম্‌ঝিমে বায়ু আসে—
সুদূর মাঠের রাখালিয়া বাঁশী
তারি ফাঁকে ফাঁকে ভাসে।
হেথা হোথা কভু কল্‌মির বনে ধ্যানী বক ব'সে রয়—
আশে পাশে যত মাছের জগতে নেমে আসে ঘন ভয়।
কভু দেখা যায় মহিষের পিঠে কৃষাণ ছেলের দল
বিলপারে চলে। ভিজে দেহগুলি
সূর্য্যেতে ঝলোমল।
রূপনগরের বাঁকের মাথায় জেলেডিঙি চোখে পড়ে—
জাল ফেলে ফেলে কারা যেন ক্রমে এদিকেতে আসে স'রে।
যত ছাখো তত নেশা লাগে চোখে,
ঘুম ছেয়ে আসে মনে—
দিবা-স্বপনেরা ভীড় ক'রে আসে শিয়রের বাতায়নে।
সাদা দুপুরের বিল—
মাঝ-আকাশের প্রখর-আলোয় শুধু হাসে ঝিলিমিল্।

টিপে ধরেছে তার মেজকাকা।

সহজ মানুষ, বেশ ছিল, হঠাৎ কখন পাগল হ'য়ে গেল।

প্রদীপ ঘুমোচ্ছিল, শাঁখের মতন সাদা, ফুলের মতন নরম গলাটি দেখে তার মনে হল চেপে ধ'রে দেখা যাক, কি হয়! পাগলের ত কাণ্ড!

শেষ হ'য়ে যেত ছেলেটা, বাঁচালো পার্ব্বতী, পাশ থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে মেজবাবুকে সরিয়ে দিলে, সরিয়ে দিতেই সে রেগে দিলে তার আঙ্গুল কামড়ে, রক্তারক্তি কাণ্ড!

লোকজন ছুটে এসে পাগলকে বেঁধে ফেলে।

সেই পাগল থাকে বাঁধা এক ঘরে, মাঝে মাঝে চেঁচায়।

দুই মেয়ে পরস্পর বোবা হ'য়ে গেল, পাগলের বাড়ী, কথা কয় না, ন'ড়ে বসে না। খাইয়ে দিলে খায়, নয়ত না। রাত দুপুরে কী এক রকম শব্দ করে।

বাড়ীটা যেন চিড়িয়াখানা।

দাদুর অ্যালবাম্ খুলে একখানা ফটো দেখছে প্রদীপ—ঝুলের মতন কালো একটি মেয়ের, যা চেনা যায় না, কাপড় পুড়ে গেছে, চুল পুড়ে গেছে—বীভৎস চেহারা—পার্ব্বতী বলে তার মা মারা যাবার পরে তুলিয়ে এই ফটো তুলেছিল। ভয় করে দেখলে।

একদিন বিকেলে সদর অন্দরের মাঝামাঝি দালানে একটি লোককে আসতে দেখেছিল, মুখটা দুধে আলতা লাল, এক দিক্‌টা যেন গ'লে গেছে—দাদু ছুটে এসে বললেন—যাও, যাও তুমি আবার এসেছ কেন? তোমার ছেলে ভয় পাবে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখনি।

হাতে-পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় তবু লোকটি ভিতরের বারান্দার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো। দাদু অনেক চেঁচামেচি করলেন, পার্ব্বতীকে বললেন—খোকাকে টেনে নিয়ে যা, ও ভয় পাবে।

পার্ব্বতী বল্‌লে ঐ নাকি তার বাবা।

অন্য কাকারা ছুটে গেল তার বাবাকে ধ'রে বার ক'রে দিতে—একটা গোলমাল উঠ্‌লো—ওরা বলতে লাগলো—'রস লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের গায়ে—সর্ব্বনাশ, আমাদেরও কুষ্ঠ হবে' 'বেশ করব' 'খুব করব' 'ঘর করব'—কী গোলমাল হুটোপাটি!—প্রদীপ ভয়ে কাঁটা। তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়লো। তার বাবাকে সে দেখতে পেলেনা ভালো ক'রে। হ'লোই বা খারাপ দেখতে, তবু ত তার বাবা! বাবা হ'লেই ত ছেলেকে ভালোবাসেন। হয়ত তিনি ভালোবাসতেই এসেছিলেন!

কেন এসেছিলেন, সে জবাব মাষ্টার মশাইও দিতে পারলেন না।

এখন সে ইংরেজী পড়তে সুরু করেছে। ঝক্‌ঝকে নতুন বই—MODERN READER

কালো রঙের অনেক ছবি আছে। রঙীনও কয়েকখানা। সমস্ত ছবি সে দেখে শেষ করেনি, সব পাতা উল্টায়নি, পাছে সব ছবি দেখা হ'য়ে যায়, আর কিছু দেখবার না থাকে।

একখানা ভালো ছবি আছে মাঝখানে, সেটি শুধু আগেই দেখেছে, সীতাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে রাবণ জটায়ু পাখীর পাখার দিকে অস্ত্র তুলেছে। কষ্ট হয় দেখলে।

মাষ্টারমশাই বলেছেন রবি বর্ম্মার আঁকা বিখ্যাত ছবি ওখানা। কে রবি বর্ম্মা? উনি বলেছেন—রাজা রবি বর্ম্মা। কোনো রাজা এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে? সে ভাবতে পারে না।

মাষ্টারমশাই বলেন, পড়ো।

ও পড়ে—That cat on the mat can catch a bad rat. কী শক্ত মানে! কিছুতেই মনে থাকে না। সে এখন যোগ দিতে শিখেছে। ৪৯৬ লিখে তার তলায় ৫৮৭ লিখলে আঙুলে গুণে গুণে সে যোগফল লিখে দিতে পারে। খুব তাড়া দিলে হবে না। একটু সময় দিলেই হবে।

পড়া হ'য়ে গেলে মাষ্টার মশাই তাকে বেড়াতে নিয়ে যান, বেশী দূরে নয়, গঙ্গার ধারে।

ওদিকে বাজার আছে, অনেক বাড়ী আছে, অনেক লোক আছে, সেদিকে নয়। যেদিকে কেউ নেই, শুধু সেইদিকে। একটু অন্ধকার হয়ে গেলে হল্‌দে কুঠির দিকে লোকে আস্‌তেই চায় না। সবাই বলে—এ বাড়ীতে ভূত আছে। ভূত থাক্‌লে কখনো প্রদীপ থাকতে পারে?

একটা প্রকাণ্ড ঘরে সে একেবারে একলা শোয় শুনে বাবী ব'লে মেয়েটা ত অবাক্ হয়ে গেল।

ফুল তুল্‌তে এসেছিল সে। তাদের বাড়ীতে পূজো। তার ঠাকুমা বল্‌লে—যা ঐ বড় বাড়ীতে যা। ওখানে অনেক ভালো ভালো ফুল আছে। চুপি চুপি নিয়ে আয়।

মালী ত' ঢুক্‌তেই দেয় না। অনেক বলে কয়ে প্রদীপ তাকে রাজী করায়। বলে—আহা নিক্ না ছেলেমানুষ!

শুনে বাবীর হাসি পায়। ঐ ত একফোঁটা ছেলে, ও আবার তাকে বলে ছেলেমানুষ। মনে মনে বলে ও রে ছেলেটা! সংসারে কারুর ভালো করতে নেই।

প্রদীপের জন্যেই ত বাবী কোঁচড়ভরা ফুল পেলে, আচলে ত রীতিমত একটা পোঁটলা বাঁধা হল কিন্তু সময়ে না একটা ধন্যবাদ, না একটু মিষ্টি ক'রে—আসি ভাই!

রাগে প্রদীপ কথাই বল্‌তে পারলে না।

অনেক কথা আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অত কথা সে জানেই না!

মেয়েটা কিন্তু প্রদীপের চেয়ে ভালো আছে বল্‌তে হবে! যে বাঁশবাগানের ওপারে কী আছে প্রদীপ জানে না, তার মাঝখান দিয়ে একলা মেয়েটা চ'লে গেল, কতক্ষণ অবধি তার টক্‌টকে লাল শাড়ী আর কুচকুচে কালো পাড় দেখা যেতে লাগলো—তারপর সে মিলিয়ে গেল। ওধারে হয়ত মাঠ আছে, সবুজ রংএর ক্ষেত আছে, কিম্বা নীল নীল সাদা গোলাপী একতলা দোতলা সব বাড়ী আছে, দূরে দূরে খোলার চাল ও খড়ের চাল দেওয়া বাড়ী আছে, কত কী থাকতে পারে। হাট বাজার এমন কি রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

ওদিক্‌কার কোনো খবরই প্রদীপ জানে না। মাষ্টারমশাইও যেতে দেন না।

বড় বড় নারকোল ও তালগাছের সিরসিরে পাতাগুলো ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে তাকে যেন ডাকে—দেখবে এসো এধারে কী আছে।

মেঘগুলো ভেসে ভেসে ওদিকে চলে যায়, পাখীরা উড়ে যায়—তারাও যেন ব'লে যায়—দেখবে এসো এদিকে কী আছে।

বাবী যেদিকটা থাকে সেদিকটা রহস্যময় না হ'য়ে যায় না। নইলে ও কোথা থেকে অত অফুরন্ত হাসি আর চঞ্চল গতি পায় ?

কাকাদের আর পিসিদের সে দেখতে পায় না। সমস্ত বাড়ীটায় সব ঘর শূন্য, শুধু লাইব্রেরী ঘরে আর তার পাশের ঘরে প্রদীপ আর দাদু।

মাঝে মাঝে—বছরে চারবার—বারবাড়ীর ঘরগুলো খুলে যায়—প্রজাদের খাজনা জমা নেবার জন্যে নায়েব খাজাঞ্চিরা পাততাড়ি খুলে বসে, তারপরে তারা কোন্ কাছারি বাড়ীতে চ'লে যায়।

সেই সময়টা টাকার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ, রাশি রাশি নোট আর রেজকি গোণার ব্যস্ততা, হাতে পায়ে ধরা, হুঙ্কার—সমস্ত নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে গম্‌গম্ ক'রে তোলে।

তারপরে আবার দীর্ঘ বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলি। অনেক রাত পর্য্যন্ত খটাস খটাস ক'রে দাদুর বড়মের আওয়াজ, আর ঝিলমিলের ওপারে অন্দরের দিক থেকে 'মারলে' 'মেরে ফেল্‌লে' আর্ত্তনাদ, কালপেঁচার ডাকের সঙ্গে ; অর্দ্ধেক রাত পার হ'য়ে যায়। জলজলে শুকতারা দিয়ে ভোরের আলো আসে প্রথম তার শিয়রের জানলা দিয়ে সমস্ত ভয় দূর ক'রে। ভারী আরামের ভারী ভরসার ভোরের আলো।

একটা বেস্পতিবার বাবী এলো সকালে ফুল নিতে।

প্রদীপ বলবার আগেই বল্‌লে—আজ আমি দুপুরে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসব। একলাটি আমি। আমার নাম স্নিগ্ধা, ডাকে বাবী বলে। তোমার যেটা খুসি বোলো। তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে একটু বড় হবে। তা হোক্‌গে বাপু তা ব'লে আমি দাদা বল্‌তে পারব না। প্রদীপই বল্‌ব।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে বাবী চ'লে গেল।

সত্যি এলো সে দুপুর বেলায়। প্রদীপ চেয়েছিল বারান্দা থেকে সেই বাঁশবাগানের দিকে। ইচ্ছে দুলিয়ে দুলিয়ে বাবীকে আসতে দেখে খুসিই হল।

সমস্ত দুপুর সমস্ত বিকেল কী যে গল্প হল তার ঠিক নেই, বাবী এত বক্‌তেও পারে! আর প্রদীপকে ভালো লাগাকেও বলি! সঙ্গী পায় না বেচারা!

'চলো ত দেখি তোমাদের লাইব্রেরী ঘর!' প্রদীপকে ঠেলতে ঠেলতে বাবী চল্‌লো।

দাদু তখন ছিলেন না, তিনি ছাতে।

সে ঘরে শুধু বই নয়, দেশবিদেশের আশ্চর্য্য সব সংগ্রহ ছিল—মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ, কৃষ্ণনগরের মাটির তৈরী খেলনা, জয়পুরের আগ্রার গয়ার মার্ব্বেল, সাদা ও কালো পাথরের শিল্প, মহীশূরের চন্দনকাঠ ও কাশ্মীরের চিত্রবিচিত্র কাঠের কারুকার্য্য, পাটলীপুত্রের পুরাতন শিলালিপি কত জিনিসই না থরে থরে সাজানো। একটি একটি করে নিবিষ্ট মনে দেখতে হয় সারাদিন ধ'রে।

দরজার পাশে একটা মানুষপ্রমাণ কালো নিগ্রো মূর্ত্তি ছিল কাঠের না কিসের তৈরী। সে নাকি কিনেছে কোন্ দূর দেশ থেকে আনা। সেই মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়ে বাবীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মুখটা অবশ্য খুবই কীভৎস কিন্তু তারো চেয়ে ভয়ের কথা আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে কথা মনে করতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়

প্রদীপের কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরে বাবী বল্‌লে—চলো ভাই, আমরা ওঘরে যাই।—তার গলার স্বর কিন্তু কাঁপছিল সেতারের তারের মতন। প্রদীপ বুঝতে না পেরে বল্‌লে—কেন ?

কেন আবার কি! দেখা ত' হল সব।

একেবারে বাইরের বারান্দায় প্রদীপকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সামনে পিছনে চারিধার দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বাবী বললে—ও মূর্ত্তিটার চোখ নড়ে ?

হেসে প্রদীপ বললে—চোখ নড়বে কি ? চোখের জায়গাটা ত ফাঁকা। ভেতরটা একদম ফাঁপা।

মানুষ ঢুক্‌তে পারে ভেতরে ?—বাবীর ব্যগ্র প্রশ্ন।

তা পারে বৈকি।

তাহ'লে কেউ ঢুকেছে আমি স্পষ্ট দেখেছি চোখের তারা নড়ছে এদিকে ওদিকে। একবার আবার চোখের পাতা ফেললে।

প্রদীপ ত হেসেই বাঁচে না! তা কী ক'রে হবে ? ওখানটা অন্ধকার ব'লে দেখতে ভুল হয়েছে।

চলো ত দেখি।—সত্যি হলে দারোয়ানদের ডাকব। ভয়টা কিসের ?

দুজনে গিয়ে যেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেছে, দেখে দাদু বসে আছেন। দেখেই রুক্ষ গলায় বললেন—এ ঘরে কেন ? যাও এ ঘর থেকে।

দাদুকে দেখলেই প্রদীপের গলা শুকিয়ে যায়। তবু বললে—দাদু, ঐ যে নিগ্রোর মূর্ত্তিটা আছে না, ওর চোখ না ?—

এ রকম 'না' দিয়ে কথা দাদু পছন্দ করেন না, থামিয়ে দিয়ে বলেন—কী বাজে বকছ ? ও মেয়েটা কে ?

ও বাবী।

বাবী আবার কে ? ও কেন এখানে আসে ?

আমার বন্ধু।

তোমার বন্ধু ? বাড়ী যেতে বলো। রাত হয়ে গেছে।

বাবী ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মনে মনে অরসিক বুড়োর মুণ্ডপাত করতে করতে।

যাবার সময়ে বলে গেল—প্রদীপ ভাই তুমি আজ একটু সাবধানে থেকো। আমি বলছি তোমায়, ওর ঘরে কেউ আছে।

—তুমি ভাই আজ এখানে থাকো না, তাহলে আমার সাহস হয়!

—বাবী গম্ভীর হয়ে পাকা গিন্নীর মতন বলে—আমার থাকার ভাই ঢের ঝঞ্ঝাট্! এদিকে তোমার দাদু বন্ধু, ওদিকে আমার দিদিমা বুড়ি দুজনেই সমান। এও থাকতে দেবে না, সেও থাকতে দেবে না। নইলে তোমাকে বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।

—তুমি কী করে বাড়ী যাবে ? অন্ধকার হয়ে এলো।

—ঐ ত একটু জ্যোৎস্না আছে। এক ছুটে চলে যাব।

বাবী আর দাঁড়ালো না।

দাদু একটুক্ষণের জন্যে বাথরুমে গেছেন, প্রদীপ গিয়ে মূর্ত্তিটার মুখে টর্চ্চ ফেললে—দেখলে দুটো চোখের পরক্ষণে চমকে পড়ে গেল! প্রদীপের শরীর তখন হিম হ'য়ে গেছে।

ক্রমশঃ

চাত্‌রার গাঁয়

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

চাত্‌রার মাঠে মাঠে ঘন কাশফুল—
শরতের মেঘ যেন দেখে হয় ভুল।
তুষার ঝর্ণা ঝরে সকালবেলা
কতো যেন সুরু হয় চপল খেলা।
টুক্‌রো রোদের আলো ঝরে ঝির্ ঝির্
দোলা দেয় খুসী মনে উতোল সমীর।

দুপুরবেলার কালে রোদের হাসি
দিল্ ভ'রে ডেকে যায় তাদের 'আসি'।
কানে ব'লে যায় কতো স্বপন কথা,
কাশফুল বনে জাগে চঞ্চলতা।

সন্ধ্যায় ঝিকিমিকি চিক্‌মিকি সাঁঝ
ক'লকাতা থেকে এসে দেখিলাম আজ।
দেখিলাম দূর হ'তে মেঘের দেশে
রঙিন্ ঝালর তার আকাশে মেশে।
রাতের বাসর ছেড়ে বাতাসে দোলে
রঙ তার লাগে কাশফুলের কোলে।

কালো রাত মনে হয় নদী যেন ঠিক্
উজান জলের ভীড়ে ঢাকা সব দিক্।
মন মোর আন্ মনে সেথা সাঁতরায়,
রূপকথা কতো যেন আছে চাত্‌রায়!

ট্রাফিক পুলিশ

রাখাল তালুকদার

লাল আলো—নীল আলো,
চোখ দুটি চম্‌কালো।
এ কি চোখ ইশারা!
পুলিশের পাহারা।

লাল আলো—সাবধান!
ঠোকাঠুকি লোকসান।
নীল আলো—পথ খোলা,
দাও ছুট্ বটতলা।

লাল নীল দুই চোখে
পুলিশটি পথ রোখে।
কার গাড়ি খোঁজ নেই—
লাট হোক্, জজ হোক্
রুখবে সে—রুখবেই।

আলো আঁটা দুটি চোখ,
এক চেয়ে—আর বুজে'
গাড়ি ঘোড়া বুঝেসুজে
রুখবে সে—রুখবেই।
লাল চোখ—নীল চোখ॥

"রেকর্ড ব্রেক"

শ্রীইন্দিরা গুপ্ত

এন, সি, মল্লিক ৪ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে ৩০ মাইল সাঁতারে রেকর্ড ব্রেক করেছেন। ইটালীর মেরি ও পেজা ১৬০১৬ ফিট উঁচুতে এরোপ্লেন উঠিয়ে রেকর্ড ব্রেক করেছেন। জাপানের কে সন ম্যারাথন রেস (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) ২ঘণ্টা ২০ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডে দৌড়ে রেকর্ড ব্রেক করেছেন।

আমাদের মাণিকলাল যদিও রোগা পটকা এবং বয়েসে মাত্র আট, তবুও সেদিন তিনি অবিশ্বাস্যভাবে ও অদ্ভুত সাফল্যের সহিত রেকর্ড ব্রেক করলেন।

অর্দ্ধেক প্রশংসা অবশ্য ছোটবোন সপ্তম বর্ষিয়া গীতার প্রাপ্য কারণ এই মহাণ কার্য্যের প্রেরণা দিয়েছিল সে-ই। তা—তাতে মাণিকের সম্মানহানি হবার কোনও কারণ নেই। আসল কাজ যা—ভাল বাংলায় যাকে বলে কৃতিত্ব সেটুকু সে নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করেছিল।

পোড়া বাংলাদেশ—গুণীর কদর করতে জানে এ দেশ? পাশ্চাত্যে এমনটি ঘটলে ছবি বেরোত কাগজে কাগজে, গুণগান হ'ত মুখে মুখে, ফুলের মালা উঠ্‌ত গলায়, বুকে দুলত মেডেল—তার পরিবর্ত্তে কিনা—

ভাগীরথী তীরে ছোট একটি দ্বিতল বাড়ী। ঢাকা বারান্দায় বসে সদ্য কোর্ট-প্রত্যাগত গৃহস্বামী হরিশচন্দ্র গুপ্ত কলাই শুঁটির কচুরী ফুলকপির শিঙ্গাড়ার অনুপানসহ ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মক্কেলের ব্রীফ ওল্‌টাচ্ছিলেন। পাশেই গীতা ও মাণিক তাদের ছোট প্লেট নিয়ে ব্যস্ত—এমন সময়ে হর্ণ বাজিয়ে স্কুলের বাস এসে থামল। এক গোছা বই হাতে বেণী দুলিয়ে চঞ্চলা চপলার মত তন্বী কিশোরী একটি ঘরে ঢুকল। বই খাতাগুলো ঝুপ ক'রে একপাশে ফেলে বাবার পাশে বসে পড়েই ধাঁ করে মাণিকের রেকাব থেকে একটা শিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে আয়েস ক'রে চিবোতে চিবোতে বল্ল—"বাঃ চমৎকার হয়েছে।" মাণিকের সহ্য হয়ে উঠল—"ও মা দিদি আমার খাবার নিলে।" মাতা উষারাণী দেবী সস্নেহে মৃদু হাসলেন—"আঃ কি করিস মণি, মুখহাত ধুয়ে খেতে বসনা বাছা।"

শান্তা চট্ ক'রে গীতার থাল থেকে একখানা কচুরি তুলে নিয়ে খেতে খেতে চলে গেল। গীতার তীক্ষ্ণ মধুর চেঁচানির সঙ্গে শান্তার ললিত কণ্ঠের মিষ্টি সঙ্গীত—

"আমার সব বেদনা সব চেতনা
রচিল এযে কি আরাধনা
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে—"

ব্যস্ত হ'য়ে গৃহস্বামীকে সচেতন ক'রে তুলল। তিনি চোখ তুলে বললেন, "বুলু কই—তাকে দেখচি না কেন?"

উষাদেবী ষ্টোভ্ হতে সদ্য ভাজা শিঙ্গাড়া তুলে স্বামী ও ছেলেমেয়েদের পাতে দিতে দিতে বললেন—"আজ যে তাদের কলেজে খেলার প্রতিযোগিতা আছে ফিরতে দেরী হবে বলেছিল।"

তাঁর কথা শেষ হ'তেই একটি দীর্ঘ সমুন্নত দেহ কিশোর "মাগো" ব'লে ডেকে ঘরে ঢুকল। তার হাতে

একটা রূপার কাপ্। মার কোল ঘেঁসে বসে বলল—"জান মা! আজ আমি কলেজের হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্ডস্ রেসে রেকর্ড ভেঙ্গেছি।"

হেমন্তের স্নিগ্ধ অপরাহ্নেও তার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদমালা; আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে তার পেশী বহুল বলিষ্ঠ দেহের পানে স্নেহভরে চেয়ে মা বল্লেন—"এইটা পেলি নাকি?"

গীতা মাণিক খাওয়া ফেলে ছুটে এসে কাপটি অধিকার ক'রে বসল। দাদা বলে কি! রেকর্ড ভেঙ্গে এই ঝক্‌ঝকে পেয়ালাটি পাওয়া গেল! বাবার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি—মায়ের মুখে পুলক। দিব্যি পেয়ালাটি কিন্তু আমি পেলে এইতে করে আইসক্রিম খেতাম। তা দাদা কি আর আমায় দেবে!

অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত প্রশ্ন করে গীতা—"হ্যাঁ দাদা তুমি রেকর্ড ভেঙ্গে এইটা পেলে?"

"হাঁ রে পেলাম।"

গীতা আশ্চর্য্য হ'য়ে পুনরায় বাবাকে জিজ্ঞাসা করে—"হাঁ বাবা, সত্যি!"

পিতা আদরিণী কন্যার গালটিপে বল্লেন—"সত্যি বই কি মা।"

বিস্ময়াপন্ন মাণিক বল্লে—"আচ্ছা বাবা, আমি যদি ভাঙ্গি আমিও পাব?"

বাবা সায় দেন—"নিশ্চয়ই"

গীতা মাণিকের চোখে চোখে তৎক্ষণাৎ কি যেন টেলিগ্রাফ বিনিময় হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই মাণিকজোড় অর্থাৎ গীতা ও মাণিক ছাতে চলে গেল পরামর্শ করতে—কি ক'রে রেকর্ড ভাঙ্গা যায়।

বিহারের ভূমিকম্প না বাংলা দেশের বন্যা কি একটা রিলিফ ফণ্ডে টাকা সংগ্রহ করে দেবার জন্য সারা বারাণসী সহর ব্যস্ত! শান্তাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেসও মেয়েদের নিয়ে একটা উদ্যোগ আয়োজন করেছেন। অভিনয় হবে বিশ্বকবির "নটীর পূজা"। অনেক টাকার টিকিট বিক্রী হ'য়েছে। শ্রীমতীর ভূমিকা দেওয়া হয়েছে শান্তাকে—কারণ শ্রীমতীর নাচটা অমন মনোরম ভাব ব্যঞ্জনার সহিত আর কেউই পারে না। বিজলীর গলাটি যদিও খুবই সুরেলা কিন্তু দেহটা তার মোটেই নাচের উপযুক্ত নয়। কাজেই সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে এই ভারটী পড়েছে বিখ্যাতা নৃত্যপটিয়সী শান্তার ওপর। শান্তা এর আগে অনেকবারই এই নাচটা করেছে, এমনকি সারনাথের মূলাগন্ধকুটী বিহারে দেবতার সমুখেও একদিন এই নৃত্য আরতিটি সে করেছিল। আর সেখানে সেদিন যে কটি বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুগ্ধ প্রশংসামুখর হ'য়ে উঠেছিলেন এই কিশোরীর নৃত্যলীলা দর্শনে—

কিন্তু তবু শান্তার কেমন ভয় ভয় করছে—মাগো, এতগুলো লোকের চোখের ওপর—অত উজ্জ্বল আলোর সামনে—যদি কিছু ভুল চুক হ'য়ে যায়! অঙ্গের রত্ন আভরণ খুলতে গিয়ে যদি বেধে যায়! বীণাটাও তেমনি, সে বলেছে—"কানন হতে তুলিনি ফুল, মেলেনি মোরে ফল" সেখানকার ভাব ব্যঞ্জনাটা তার তেমন ভাল হয় না। কলিকাতায় গৌরী বসু যখন প্রথম এই নৃত্যলীলা প্রদর্শন করে, তখন বীণা কলিকাতায়—সুতরাং তার কথার মনে আছে। কাশীতে কি ছাই পাওয়াই যায় কোনও জিনিষ। শান্তা তার জ্যোতিদাকে অনেক ধ'রে ক'য়ে কলিকাতা থেকে এই রেকর্ডখানা আনিয়েছে এবং সেটা বাজিয়ে বাজিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে নাচটা ভাল মত আয়ত্ত করে নিচ্ছিল।

আজ অভিনয়ের দিন, বিকেল চারটা-পাঁচটায় বাস আসবে। শান্তা তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নিয়ে শেষ বারের মত গানখানার সঙ্গে নাচের মহলা দিয়ে নিতে ড্রইংরুমে এসে দেখে—সর্ব্বনাশ!

"ক্ষম হে ক্ষম" রেকর্ডখানি ভেঙ্গে কুচি কুচি হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। সে অনুনাসিক স্বরে চীৎকার করে উঠল—"ওঁ মাঁ গোঁ—" মা শশব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন—"কিরে কি হয়েছে।" আক্ষেপে শান্তার চোখে জল এসে গেল—"দেখ মা আমার নতুন রেকর্ড কে ভাঙ্গল এমন করে? নিশ্চয়ই তোমার আদুরে দুলাল পত্তু, ঘর ঝাড়তে এসে ভেঙ্গেছেন।" পত্তু কিন্তু বারবার গঙ্গামাঈ ও বিশ্বনাথের 'কসম' খেতে লাগল—এমন কাজ যদি সে করে থাকে তাহলে যেন তার 'আঁখি ফুট যায়'। তবে ছোটা 'গাদেলা' দুজন অর্থাৎ মানবক দুটি এই ঘরে ঢুকেছিল একটু আগে, পত্তু তখন বাবুর জুতা সাফ্ করছিল তাই অতটা নজর করেনি, হয়ত ওরাই ভেঙ্গে ফেলেছে অসাবধানে বাজাতে গিয়ে—

এমন সময়ে ক্ষুদে মানব দুটি ঘরে প্রবেশ করল—শান্তা সগর্জ্জনে প্রশ্ন করলে—"আমার রেকর্ড ভেঙ্গেছে কে রে?"

দিদির মুখ চোখের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ নয়ত! কাপ্‌টা পাওয়া যাবেত! সন্দেহ দোলায় দুলতে দুলতে মার হাসিমুখের পানে চেয়ে সগর্ব্বে মাণিক বল্‌লে—"আমি ভেঙ্গেছি দিদি।"

গীতা ফোঁস ক'রে উঠল—"ইঃ তুই বইকি? আমিই ত বল্লাম যে দিদি নাইতে গেছে এই বেলা ভাঙ্গ্ মানিক।" মানিক প্রতিবাদ করে—"কিন্তু চেয়ারে উঠে আমিই ত পাড়লাম রেকর্ডটা আর ভাঙ্গলামও ত আমিই—"

আহা বেচারা মানিক! নিজের গুণপনার বর্ণনা শেষ হবার আগেই দিদি ঠাস করে মারল এক চড়—"বাঁদর ছেলে কোথাকার আর কিছু খুঁজে পেলে না ভাঙ্গবার—"

গীতা সমর্থন করে মানিককে—"ঐ রেকর্ডটাই যে নতুন ছিল দিদি—"

দিদি সক্রোধে তার কাণের দিকে হাত বাড়াচ্ছে দেখে গতিক সুবিধার নয় বুঝে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই সে সেদে যায়।

শান্তা সরোদনে বিলাপ করে—"এখন কি যে করি আমি—"

মা সান্ত্বনা দেন—"মন খারাপ করছিস কেন মা? বেশ খাসা তৈরী হ'য়েছে তোর নাচ, সবাই কত সুখ্যাতি করবে দেখিস।"

"হাঁ করবে! আমার যে কি হচ্ছে আমিই জানি।" বাস বারবার হর্ণ দিচ্ছে. অগত্যা মনকে প্রবোধ দিয়ে ভিক্টোরিয়া পীতবাসের অঞ্চল লুটোতে লুটোতে সে ছুটে চলে যায়।

মা রোরুদ্যমান শিশু দুটিকে কোলের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করে বলেন—"গীতা মানিক, লক্ষ্মী সোনা, ছি ও বাবা কেন ভাঙ্গলে ওটা—"

গীতা ঠোঁট ফোলায়—"আহা—দাদা রেকর্ড ভেঙ্গে ঝক্‌ঝকে পেয়ালা পায়নি?"

মানিক যোগ করে—"তাইত ভাঙ্গলায় আমরা—"

উষাদেবী হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন—"ওঃ—তাই বুঝি তোরা রেকর্ড ভাঙ্গলি।"

গীতা মানিক বাংলা দেশ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়ে—এখানে ভাল কাজের পুরস্কার হচ্ছে, 'ধমক—চড়—আমরা— এ দেশের উন্নতি হয় কখনও!

সমাধান

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"অম্‌লেটে নেই কেন কাঁটা ?"
বল্ল গোপাল।
'মাছ ভাজাতে তো আছে ?'
শুনে মাথা চুল্‌কান্ বাপ,
সদুত্তর আছে কার কাছে ?
'খোকাটা কি হোলো শেষে বোকা—'
ভাবেন আর করেন অনুতাপ।
"ছিঃ গোপাল, বোকো না প্রলাপ !"
বকে' ছান্ চোখ করে' লাল।
'বুঝেছি বুঝেছি—'বলে খোকা,
'বাবা তুমি জানো নাকো কিছু,
সেই কাঁটা পেল যে গোলাপ।'
বাবা কন্, "ভারী গোলমাল
পাকাচ্ছ দেখি,
অম্‌লেট্ খাও চুপ্‌চাপ্,
বুদ্ধির ঢেঁকি !"
গোপাল সেকথা শুন্‌বে কি !
বলে সে বাবার পিছু পিছু।
'কাঁটা বটে পেয়েছে গোলাপ
মাছের মতন তার গায়ে—
কিন্তু তবু দেখেচ কি বাবা,
কত বড় রয়ে গেছে ভুল ?'
"মাছের মতন কিরে হাবা ?
লোকে তোকে বল্‌বে বাতুল !
এক কাঁটা ফুলে আর মাছে ?"
খোকা বলে, '—ফুল ফোটে গাছে,
কাঁটা ফোটে কেন এই পায়ে ?
এমনটা কেন যে তফাৎ !'

বাবা তাঁর গালে ছান্ হাত—
মুখে তাঁর সরে নাক বাত—
চোখেতে ছাখেন সর্ষে ফুল—
সাম্‌নে আরেক 'ফুল' বুঝি
ছাখেন চোখে কি ?—
অন্য এক আলাদা বানানে ?
ভেবে কি পান্ না কোনোক্রমে
এতটুকু মাথার ভিতরে
কোথায় যে ধরে আর জমে
এত মুখ্যুমি ?

'আরো আমি পাচ্ছিনে খুঁজি
এসবের মানে—'
বল্ল গোপাল ঃ
কাঁটা যদি পেল সে গোলাপ—
পেল তার গায়ের উপরে—
তবে কেন হোলো না কাঁটাল ?
হতে তো পারত সোজাসুজি ?
আর তার পরে,
গোলাপ যায় না কেন খাওয়া ?—'
আরেক সমস্যা খোকা আনে
'—এই অম্‌লেটের মতন ?
গোলাপ খেয়েছ বাবা তুমি ?"
বাবা কন,—"কেন পাগ্‌লামি
করচ গোপাল ?
এত বকা অতিশয় পাপ—!
কেউ কি রহস্য এর জানে ?
অম্‌লেট্ কিম্বা গোলাপ ?

জান্‌লে তা জানে তোর মায়ে,
সে দেবে বুঝায়ে।"
বলিয়া হতাশে
বাবা মন ছান্ প্রাতরাশে।
মা বলেন, "আমি তো খেয়েছি,
গোলাপ পেয়েই বেঁচে গেছি !
গোলাপ খেয়েই আছি বেঁচে—
গোলাপের স্বাদ যে কেমন
তাও বলে-দিতে পারি এঁচে।
গোলাপ তো খাই রাতদিনই—
যখনি সুবিধে পাই আমি—
যেম্‌নি হাতের কাছে আসে—
যখন তখন—
যাদু, তুমি জানো এত কথা,
একথা কি জানো নাকি তুমি ?"
এই কথা বল্লেন তিনি—
গোপালের কচি মুখ চুমি।—

"গোলাপ খায়নি ঠিক বটে—
গোলাপের খেয়েছি অনেক।
একবার পেলেই নিকটে
গোলাপ না খেয়ে থাকা দায় !
দেখ্‌লেই খেতে সাধ যায়।···
গোলাপ যদিও অবাধ্য—
তবু ভেবে দেখি যতোবার
পাইনে তাহার মতো আর
অমন সুখাদ্য।—
গোলাপের শুনিয়া বারতা
গোপাল অবাক্।
"গোলাপে রয়েছে বটে কাঁটা—
কিন্তু তা যায় না কভু কাটা—
এই যথা তোমার এ নাক।
গোলাপ যতই কেউ খায়—
গোলাপ রে তবু না ফুরায়।"
এই বলে' গোপালের মা—
গোলাপের খেলেন চুমা॥

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি
এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায়
সুচারুরূপে করাতে হ'লে
১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়
কনট্রাক্টার
আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

"চতুর্ভুজ-লোক"

(Four Dimensional Space)

শ্রীঅমরেশ রায়

সিদ্ধিদাতা গণেশ চতুর্ভুজ! তা' ইহবেনই বা। এই ত্রি-ভুজ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে সিদ্ধি মিলিবার জন্য চতুর্ভুজ হইলেই সুবিধা! আমাদের গোচরীভূত ব্রহ্মাণ্ড ত্রি-ভুজ বিশিষ্ট (three dimensional),—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, এই ত্রিবিধ আয়তনে ইহা গঠিত। কিন্তু গণেশের চারিটি বাহু, গণেশলোকও নিশ্চিতই চতুর্বাহু বিশিষ্ট (four dimensional)। কাজেই সেই সিদ্ধলোকে একবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পাড়িয়া ফেলিলে সিদ্ধি মিলিতে আর কতক্ষণ! সে কিরূপ কথা? এবার তাহারই আলোচনা করিব।

চতুর্বাহুবিশিষ্ট আয়তন বা স্থান (space) আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে,—কাজেই ধারণারও বাহিরে। তবু, উপমার সূত্র টানিয়া কল্পনায় যতটুকু ইহার আভাষ দেওয়া সম্ভব, এই প্রবন্ধে তাহারই চেষ্টা করিব।

ত্রিবাহুবিশিষ্ট স্থান (three dimensional space) এর ভিতর দ্বিবাহু (two dimensional) বা এক বাহু (one dimensional) বিশিষ্ট স্থানের কল্পনা সহজেই করা যায়,—যদিও তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। এবং ত্রিবাহুবিশিষ্ট স্থানের সম্পর্কে দ্বিবাহুবিশিষ্ট কাল্পনিক জগত ও ত্রিবাহুবিশিষ্ট আমাদের জগতের মধ্যে সম্বন্ধের সূত্র খুঁজিয়া পাইব। এই বাড়ীটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে, ইহা তাই আমাদের জগতে সত্য বা real, কিন্তু সূর্য্যালোকে ইহার যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা অবাস্তব বা unreal ; কারণ তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে কিন্তু তৃতীয় পরিমাপ নাই ; সত্তা বা phenomenon হিসাবে উহাকে স্বীকার করিলেও বস্তু হিসাবে ইহা অসত্য বা মিথ্যা। তেমনি এমনও তো হইতে পারে, যে, এই ত্রিবাহুবিশিষ্ট জগত, চতুর্বাহুবিশিষ্ট জগতের ছায়ামাত্র; চতুর্থ বাহু (fourth dimension)র দিকে ইহার ক্ষীণতম ব্যাস বা বিস্তার আছে ; ফলে চতুর্বাহুবিশিষ্ট জগতের জীব ইহাকে অসার বলিয়াই মনে করিবে।

নির্বাহু স্থান হইল একটি বিন্দু, এক বাহুবিশিষ্ট স্থান হইল একটি সরলরেখা এবং দ্বিবাহুবিশিষ্ট স্থান হইল একটি সরলক্ষেত্র। সরলক্ষেত্রে একটি বৃত্ত আঁকিয়া দিলে বৃত্ত মধ্যবর্ত্তী স্থানটি একটি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ স্থান হইবে। দ্বিবাহুলোকের কোনও জীব ইহার ভিতরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে পারিবে না। কিন্তু ত্রিবাহুলোকের জীব—তৃতীয় বাহু (third dimension)র সাহায্যে ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া বৃত্তরেখাটিকে ডিঙাইয়া ওই বৃত্তের ভিতরে বা বাহিরে আসা যাওয়া করিতে পারিবে। দ্বিবাহুলোকে জীবের পক্ষে ইহা অলৌকিক বলিয়া মনে হইবে, ঠিক যেমন আমাদের মনে হয় ম্যাজিসিয়ান্‌কে বন্ধ বাক্স বা থলি হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিলে। অতএব আমরা দেখিতেছি, যে, বন্ধ বাক্স হইতে বা ফাঁপা গোলকের ভিতর হইতে বাহিরে আসা কিছুই কষ্টসাধ্য হয় না যদি চতুর্থ বাহুর সাহায্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ বড় বড় লৌহ সিন্ধুক ভিতরের মাল বাহির করিতে কিছুই লাগে না যদি সিদ্ধিদাতা চতুর্ভুজ সহায় হন। এখানে যেমন মোজা বা থলি উল্টাইয়া ভিতরের পিঠ বাহিরে আনা যায়, তেমনি সেখানে একটি এখানকার ফাঁপা রবারের বল্ না ফাটাইয়াও ভিতর বাহির উল্টান চলিবে।

অস্কার ওয়াইল্ডের একটি আধুনিক ভূতের গল্পে পড়িয়াছিলাম, যে, আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া ভূতটি চতুর্থ বাহু (fourth dimension) ধরিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। ইহা খুবই সম্ভব। চতুর্থ বাহুপথে এক পা সরিয়া গেলেই ত্রিবাহু জগতের জীবের নিকট তাহা বিলুপ্ত হইবে। আচ্ছা,—ভূতদের আর একটি ক্ষমতাও কি তাহাদের চতুর্বাহুলোকে সঞ্চরণের ফল? এই যেমন,—ইংলণ্ডে লোক মরিল আর সেই মুহূর্ত্তে তাহার ভূত আমেরিকায় হোটেলে তাহার বন্ধুর কামরায় আবির্ভূত হইল। হইবে না কেন? হয়ত চতুর্থ বাহুপথে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূরত্ব এক ইঞ্চির বেশী নয়;—যেমন এই বইটি মুড়িয়া রাখিবার সময় একটি পৃষ্ঠার কিনারা হইতে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার কিনারার ব্যবধান নিতান্ত সূক্ষ্ম, কিন্তু দ্বিবাহুলোকের জীবের পক্ষে ওই দুই স্থলের ব্যবধান, দুইটি পাতার সম্পূর্ণ বিস্তারের সমান।

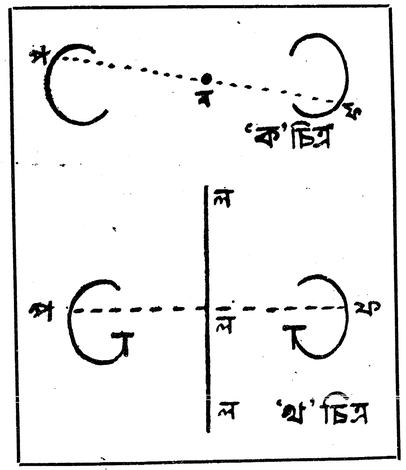

চতুর্বাহুলোকের আওতায় ত্রিবাহুলোকের যে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্ভব তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়; এখানে কেবল তাহার কয়েকটির আলোচনা করিব।

'ক' চিত্রে যে দুইটি রূপ (figure) রহিয়াছে উহারা বিন্দু-সম (symmetrical about a point);—অর্থাৎ 'ব' বিন্দু দিয়া যে কোনও সরলরেখা টানিলে তাহা ওই দুইটি রূপ (figure)কে যেখানে যেখানে স্পর্শ করিবে (যেমন প ও ফ) তাহাদের দূরত্ব 'ব' বিন্দু হইতে সমান হইবে (পব=ফব)। এরূপ দুইটি figure সরল ক্ষেত্রেই উল্টাইয়া আনিয়া একটির সহিত আর একটি মিলাইয়া দেওয়া (coincide) যায়। 'খ' চিত্রে যে দুইটি রূপ (figure) দেওয়া হইয়াছে, উহাকেও আমরা সাদা কথায় শুধু সমতা-সম্পন্ন বা symmetrical বলি, কিন্তু গণিতের দৃষ্টিতে 'ক' চিত্রের ও 'খ' চিত্রের সমতা বা symmetryর মধ্যে প্রভেদ আছে। 'খ' চিত্রের রূপ দুইটি রেখা-সম (symmetrical about a line), বিন্দুসম নহে। 'লল' রেখাটির উপর একটি লম্ব টানিলে উহা দুই দিকেই সমান দূরত্বে ওই রূপগুলিকে স্পর্শ করে (যেমন লপ=লফ)। এই দুইটি রূপ যেন একটি আর একটির প্রতিবিম্ব, বা একটি যেন ছাপার হরফ ও অপরটি ছাপা-হরফ। এই দুইটি রূপকে ওই পাতা সরল ক্ষেত্র হইতে না তুলিয়া কিছুতেই পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইবে না। দ্বিবাহু সমন্বিত জগতে 'ক' চিত্রের জিনিষগুলি বেশ মিলাইয়া ঘরে ঘরে সাজাইয়া রাখা যায়, কিন্তু 'খ' চিত্রের জিনিষগুলি সেরূপ সাজান যাইবে না। কিন্তু আমাদের জগতে 'লল' রেখা ধরিয়া তৃতীয় বাহুপথে (through third dimension) কাগজটিকে ভাঁজ করিলেই ছবি দুটি বেশ মিলিয়া যাইবে। অতএব আমরা দেখিলাম, যে, দ্বিবাহুলোকে রেখা-সম দুইটি জিনিষ মিলান যায় না, কিন্তু ত্রিবাহুলোকে তাহা সম্ভব। তেমনি আবার জগতে আর এক রকম সমতাসম্পন্ন দুইটি জিনিষ পরস্পর মিলান যায় না। ইহাদের বলে ক্ষেত্র-সম (symmetrical about a plane)। যেমন আমাদের ডান হাত ও বাঁ হাত। মুখোমুখী ধরিলে ইহারা যেন একটি আর একটির ছায়া; কিন্তু দুইটি করতালুই চিৎ করিয়া একটির

উপর আর একটি রাখিয়া কিছুতেই মিলান যাইবে না। এমনি ধারা আরো অনেক জিনিষ আছে ;—যেমন টিনের তৈরী পুতুলের ঠিক মাঝখান দিয়া যদি জোড় খুলিয়া ফেলা যায়, তবে এক অর্দ্ধের ভিতর অপরার্দ্ধ বসান যাইবে না। এইখানেই চতুর্বাহুলোকের চতুর্থ বাহু কাজে আসিবে। সেখানে চতুর্থ বাহুপথে এরূপ একটি জিনিষকে উল্টাইয়া লইলে অপরটির সহিত বেশ মিলাইয়া দেওয়া যাইবে। সেখানে ডান হাতকে উল্টাইয়া সহজেই বাঁ হাত করা যাইবে। এখানে যেমন টিনের বা কাঠের তৈরী হরফকে আমরা সহজেই সোজা বা উল্টা করিয়া রাখিতে পারি,—ঠিক তেমনি।

এখানে একটি গোলকের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশ করাইলে গোলকটি শলাকাকে মেরু (axis) করিয়া ঘুরিতে পারে,—কিন্তু চওড়া ছুরির ফলক বিঁধাইয়া দিলেও ছুরিটি ধরিয়া থাকিলে গোলকটি অনড় (fixed) হইয়া যাইবে। চতুর্বাহুবিশিষ্ট জগতে অতি গোলকটি এরূপ অবস্থায়ও সচ্ছন্দে ঘুরিতে পারিবে।

এবার এই চতুর্বাহুলোকের দুই একটা অতি সাধারণ জিনিষে রূপের বর্ণনার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চতুর্বাহুলোকে আমাদের জগত ছায়ামাত্র ; কাজেই চতুর্বাহুলোকের চারিবিধ পরিমাপ সম্পন্ন (four dimensional) সেখানকার বাস্তব ও আমাদের পক্ষে অতি-বাস্তব (Hyper-real) পদার্থেরই আমরা খোঁজ লইব। আমাদের পক্ষে সে জগত অতিজগত বা Hyper-space। আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে তাহার ধারণা সম্ভব নয়। আবার উপমার সহায়তা লই।

একটি সরলক্ষেত্রকে ভেদ করিয়া যদি একটি গোলকে অগ্রসর হয়, তবে সরলক্ষেত্রবাসী দ্বিবাহু জগতের জীব (two dimensional being) কি দেখিবে ? গোলকটি ক্ষেত্র স্পর্শ করা মাত্র সে একটি বিন্দু দেখিতে পাইবে,—পরে গোলকটি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুটি বিস্তৃত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃত্তে পরিণতি লাভ করিবে। গোলকটি যখন ঠিক মধ্যপথে, বৃত্তটি তখন বৃহত্তম,—তারপর উহা পুনরায় সঙ্কুচিত হইতে হইতে বিন্দুতে পরিণত হইয়া মিলাইয়া যাইবে। এবার মনে করা যাউক চতুর্বাহুলোকের একটি অতি গোলক (Hyper-sphere) আমাদের জগত ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছে ;—আমরা প্রথমে সরিষার ন্যায় একটি অতিক্ষুদ্র গোলক দেখিতে পাইব ;—অতিগোলকের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই ক্ষুদ্র গোলকটি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে ;—অবশেষে অতিগোলকের ব্যাসের সম ব্যাস বিশিষ্ট গোলকে পরিণত হইয়া ইহা পুনরায় ছোট হইতে হইতে মিলাইয়া যাইবে। গোলককে ক্ষেত্রদ্বারা বিভক্ত করিলে বৃত্ত পাওয়া যায় এবং অতি গোলককে ত্রিবাহুবিশিষ্ট ঘনস্থান দিয়া বিভক্ত করিলে গোলক পাওয়া যায়। বৃত্তের ব্যাসকে মেরু করিয়া ঘুরাইলে গোলকের সৃষ্টি হয়, তেমনি গোলকের কোনও ব্যাসক্ষেত্র (diametral plane)কে মেরু করিয়া ঘুরাইতে পারিলে অতি-গোলকের সৃষ্টি হয় ;—চতুর্ভুজলোকে এরূপ ঘুরান (rotation) সম্ভব আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আমাদের একক ঘনফুট স্থান—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক এক ফুট করিয়া। চতুর্ভুজলোকের একক অতি-ঘনফুট স্থান—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় ও চতুর্থ-বিস্তারে এক এক ফুট করিয়া। একটি একক ঘনফুট পদার্থ (cube) ও একটি একক অতিঘনফুট পদার্থ (hypercube)এর তুলনা করিলে দেখা যাইবে, যে, একটি cube ছয়টি সরলক্ষেত্র (plane surface) ও বারোটি সরল রেখা দ্বারা বেষ্টিত ;—এবং একটি একক অতিঘনফুট পদার্থের বহির্মুখগুলি ৮টি cubeএ গঠিত,—বাহিরের দিকে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র আছে ; ইহা ৪৮টি সরল রেখায় বেষ্টিত ! এরূপ হিসাব কেবল হিসাব মাত্র,—কল্পনায় কোনও ছবি জাগাইতে পারে না কিন্তু গণিতজ্ঞের নিকট এরূপ অতিজগতের জ্যামিতি নিতান্তই সাধারণ ও অন্যান্য জ্যামিতিরই ন্যায় সহজ

অনুশীলন যোগ্য। শুধু চতুর্ভুজ জগতে কেন, যে কোনও সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট (n-dimensional) জগতেরই বৈশিষ্ট্যের হিসাব গণিতজ্ঞের নখদর্পণে !

তাহা হইলেও চতুর্বাহুলোকের জ্যামিতি বর্ত্তমানে জড়বিদ্যায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মিঙ্কাওস্কি (Minkowski) ও আইনস্টাইন (Einstein) আমাদের ত্রিবাহু 'স্থান' (space)এর সহিত 'কাল' (time)কে চতুর্থ বাহু হিসাবে যুক্ত করিয়া একবিচিত্র জ্যামিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জ্যামিতি পদার্থ বিজ্ঞানের উচ্চতর অনুশীলনীর পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সসীম-অসীম বিশ্ব (finite infinite space) সম্বন্ধে ধারণার মূলেও চতুর্বাহু জ্যামিতি বর্ত্তমান। গোলকের উপরিতল যেমন সীমাহীন অথচ পরিমিতক্ষেত্র, তেমনি এই বিশ্বের বক্রস্থান (curved space) ও চতুর্থ বাহুর দিকে বক্রতার ফলে এদিকে ওদিকে জুড়িয়া গিয়া পরিমিত স্থান (finite space)এ পরিণত হইয়াছে, যদিও ইহার সীমারেখা কিছুই নাই।

বহু বাহুসম্বলিত বিশ্ব আমাদের ধারণাতীত। ত্রিবাহু সমন্বিত জগত আমাদের প্রত্যহ,—এবং চতুর্ভুজলোক গণিতবিশারদ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও বোধকরি প্রত্যক্ষ। ক্রমবিবর্ত্তনবাদের অতি উৎসাহী কোনও সমর্থক বলিবেন কি না জানি, যে, হয়ত মানবমনের ক্রমপরিণতির ফলে যুগে যুগে এমন অতিমানবের সৃষ্টি হইতে থাকিবে যাহারা ক্রমেই অধিকতর বাহুসম্বলিত জগতের প্রত্যক্ষ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে এবং নূতন হইতে নূতনতর অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইবে ! বলিবেন,—হয়ত মানসিক অসম্পূর্ণতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অধিকতর বাহু সম্পন্ন জগতে বাস করিবার এবং তাহার অনন্ত সুবিধা ভোগ করিবার পক্ষে অন্য কোনও বাধা নাই ! সাধু সাবধান। কল্পনার বল্গা শিথিল করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিবেন,—মানবচেতনা বা জীবচেতনার বিবর্ত্তনে অতীতে বা বর্ত্তমানে কোথাও, নিম্নবাহু, একবাহু বা দ্বিবাহু সম্পন্ন চেতনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ছোটদের সচিত্র মাসিক কিশোর বাংলা
বার্ষিক ৩ টাকা। বৈশাখ থেকে বছর আরম্ভ।
এতে আছে—চিঠির জবাব, ছোটদের আলোচনা, ছোটদের গল্প কবিতা প্রভৃতি শেখাবার পাতা, খেলাধুলা, গল্প, কবিতা, রূপকথা, উপন্যাস, ধাঁধা ইত্যাদি।
২৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"বাড়ী মেলা ভারি দায়"

শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্ত্তী

তিনকড়ি পাল্' কে,—
বাড়ী ছেড়ে দিতে হলো, ভোর রাতে কাল্‌কে,
সারারাত বসে বসে
মোটঘাট বেঁধে কসে
তালতলা ছেড়ে তিনু এল চলে শাল্‌কে !
ওবাড়ীটা ছিল খুবি বিদ্‌ঘুটে চেহারা,
বেজায় সে বেয়াড়া,
মান্ধাতা আমলের,
ইট করে দাঁত বের,
উঠোনের মাঝে বন—আম, জাম, পেয়ারা !
কিন্তু এ বাড়ীখানা একেবারে তোফা হে,
হয়ত বা বাড়ীও'লা জাতে হবে ধোপা হে,
ঝক্‌ঝকে ফিটফাট,
নেই বন—নেই মাঠ,
ভাড়াটে জনের কাছে অতি মনোলোভা হে !
গুণে গুণে দিল তিনু পঞ্চাশ টঙ্কা,
ভাবে মনে সস্তায় মেরে দিল ডঙ্কা
এরকম সুবিধায়,
বাড়ী মেলা ভারি দায়
হোক্‌না সে হংকং—করাচি—কি লঙ্কা !
কিন্তু হেথায় এসে তিনু ওঠে চম্‌কে,
থম্‌থমে মুখে হায় থেমে যায় থম্‌কে,
বাড়ীদের বাড়াবাড়ি,
এরকম আড়াআড়ি,
দেখে তিনু মনে মনে ডাকে শুধু যম্‌কে।
ওবাড়ী নিরালা ছিল এ বাড়ীটা ভরাতো,
মাথাগুলো দায় বটে গুণে শেষ করাতো
লোকজনে ঠাসাঠাসি,
নানা জাত পাশাপাশি,
যার যাহা খুসী করে ধরা দেখে সরা তো !

ওবাড়ীর মেঝে ভাঙা—এ বাড়ীর ছাদ্‌টা
বর্ষার দিনে কাটে জেগে সারা রাত্‌টী,
ছিলনাক জল সেথা
জলে জলাকার হেথা,
ছাদ দিয়ে বৃষ্টিতে নদী নামে সাতটী।

নেই বটে টিকটিকি এ বাড়ীর দেয়ালে,
তবু আছে আরশোলা ওড়ে খামখেয়ালে,
ইঁদুরের ছড়াছড়ি
পিঁপড়ের জড়াজড়ি
দেখে মনে হয় বুঝি প্রাণ যায় বেহালে।
ও বাড়ীতে কল নেই এ বাড়ীতে তিনটী,
তবু জল নিতে গিয়ে কাটে সারা দিন্‌টী
দুটোতে পড়েনা জল,
আরেকটা অবিরল,
আগলিয়ে বসে থাকে 'শামু' আর 'পিন্টী'।
হায় হায় ! একি দায় !—ভাবে তিনু হায় গো !
ভাল বাড়ী পেয়ে দেখি প্রাণ যায় যায় গো !
তালতলা, শাল্‌কে
তিনকড়ি পাল্‌কে,
বলে দিল পাবে না সে, যাহা পেতে চায় গো !

ওবাড়ীতে ছিল যারা হেথা নেই তাহারা,
তাদেরো চাহেনা তিনু আছে হেথা যাহারা
যতই ফিরাক্ ডেক
তার কাছে দুই এক,
সরাসরি প্রমোশন,—গোবি থেকে সাহারা।

হল্যাণ্ডের চিত্রকর

শৈলজা মুখোপাধ্যায়

চিত্র আর চিত্রকরদের বিষয় জানবার জন্য সকলেরই আগ্রহ থাকে। তোমাদের সকলেরও এ বিষয় আগ্রহ আছে নিশ্চয়। আজ এক দেশের চিত্রকরদের কথা তোমাদের বলব। হল্যাণ্ড নামটা তোমাদের পরিচিত। এই দেশের চিত্রকরদের কথা জানতে হলে, আগে জানতে হবে এদেশের লোকের হাবভাব, চালচলন, আকৃতি প্রকৃতি এই সব বিষয়। সমুদ্রের তীরে হল্যাণ্ডদেশ একসময় নাবিকদের আড্ডা ছিল। এখানকার লোকেরা চিরকালই সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। সমুদ্রের জলকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে এরা নিজেদের ঘর বাড়ী তৈরী করেছিল! কিন্তু ক্রমেই সেই ছন্নছাড়া ভবঘুরে নাবিকরা সভ্য হয়ে উঠতে লাগল। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে তাদের উন্নতি হল। তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন প্রতিভাবান লোকেরা যাঁরা জগতের মধ্যে শিল্পে, সাহিত্যে, সব দিকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানকার লোকের অদ্ভুত ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথমেই। নির্ভীক, কর্ম্মঠ আর বলিষ্ঠ এরা। দেখলেই বুঝা যায় বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই এদের প্রকৃতি।

প্রিন্সেস জুলিয়ানা আর প্রিন্স বার্ণার্ড হল্যাণ্ড দেখবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন। হল্যাণ্ডে গিয়ে দেখলাম, ঐ ছোট দেশে চিত্রশালার প্রাচুর্য্য। বড় বড় শিল্পীর প্রতিভার নিদর্শন সেই সব চিত্রশালায়। কতকগুলি বিখ্যাত চিত্রশালার নাম করব। রটারডামে বোইম্যান চিত্রশালা বিখ্যাত। হেগের সরকারী চিত্রশালা আর আমষ্টার্ডামের 'ক্রোণারমূলার' চিত্রশালা দু'টিই উল্লেখযোগ্য। 'ক্রোণারমূলার' চিত্রশালাটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে, অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়ায় অবস্থিত। মানব জীবনের কোলাহল সেখানে নেই, আছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। প্রকৃতই যারা শিল্পী, যাদের শিল্পীমন সচেতন তারাই ছুটে আসে এই জায়গায়। আমষ্টারডামে সরকারী চিত্রশালা উল্লেখ যোগ্য। ডেল্‌ফে প্রসিদ্ধ শিল্পী ভারমিয়ারের স্মৃতি বিজড়িত ভারমিয়ার চিত্রশালা অবস্থিত। হার্লেমে ফ্রান্স হলসের চিত্রশালা বিখ্যাত।

হল্যাণ্ডে এসে প্রথমেই মনে পড়ল রেমব্রাণ্টের কথা। বিখ্যাত শিল্পীর জীবনের সঙ্গে হল্যাণ্ডের প্রতি গ্রাম, জনপদ, নদ, নদী, ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পুরাদনো রাইন নদীর মোহনার উপর লেডেন গ্রামে রেমব্রাণ্টের জন্ম। এখন সেই লেডেন মস্ত সহর, সেখানে বিখ্যাত লেডেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই লেডেনেই বালকশিল্পীর শিল্পচর্চ্চা আরম্ভ হল। রেমব্রাণ্টের শিল্পীজীবনী অতি দুঃখের। দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি ভীষণ সংগ্রাম করেছিলেন। দেনার দায়ে তাঁর ঘর বাড়ী সব বিক্রী হয়ে গেল, রেমব্রাণ্ট ছবি আঁকার জিনিস পত্র নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন! তবুও তাঁর উৎসাহ কমে নি। বহুবার দুঃখে আত্মহারা হয়ে তিনি তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার তুলি, রং তুলে নিয়ে নূতন উদ্যমে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছেন। দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েও তিনি পৃথিবীর শিল্পভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ দান করে গেছেন। তিনি যখন ছবি আঁকা আরম্ভ করেন তখন

ইয়োরোপে ইতালীয় অঙ্কন-পদ্ধতি দু'টি প্রধান ধারা বৈজান্তাইন ও র‍্যাফেলিয় পদ্ধতির প্রভাব। সেই সময় ছবির

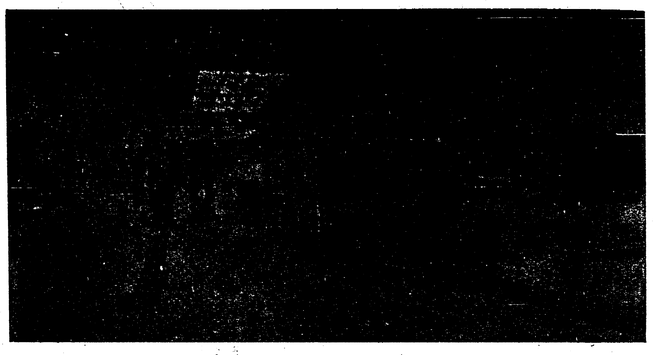

হল্যাণ্ডের একটি আধুনিক চিত্রালয়

বিষয়বস্তু ছিল রাজবংশীয় লোকের প্রতিকৃতি, আর বাইবেল বর্ণিত ঘটনাগুলির রঙ্গীন রূপ! কিন্তু সেই সময় কয়েক-জন সাহসী চিত্রশিল্পী পুরাতন বিষয়বস্তু এবং অঙ্কন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁদের মধ্যে হল্যাণ্ডের রেমব্রাণ্ট, ফ্রান্স হল্‌স্ ব্রোয়ার, ভারমিয়ার বিখ্যাত। আর অন্যান্য দেশে যাঁরা নূতন কোনো ধারার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হুইম্‌নাক্স, টার্ণার, ডেলাক্রোয়া, হলবাইন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। রেমব্রাণ্ট তাঁর ছবির মধ্যে দেখালেন আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশ। আলো-ছায়া নিয়ে খেলা তাঁর আগে কোনো শিল্পীই করেন নি। দেখতে দেখতে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়ল। বহুলোক তাঁর ছবির আলোচনা করতে লাগল। তাঁর ছবি ছিল সহজ সরল মানবজীবনের ছবি। বর্ণের লাঘবতা তাঁর ছবির আরও একটা বৈশিষ্ট্য। কম রংএ ছবি আঁকা পৃথিবীকে তিনিই দেখালেন। তাঁর ছবিতে বাদামী আর হল্‌দে এই দুই বর্ণের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়। ছবিতে যে আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশ, তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, তার নাম হয়ে গেল 'রেমব্রাণ্ট এফেক্ট'। তিনি বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী 'self-portrait' বা 'নিজ-প্রতিকৃতি' এঁকেছেন। এই ছবিগুলি আমষ্টারডামের সরকারী

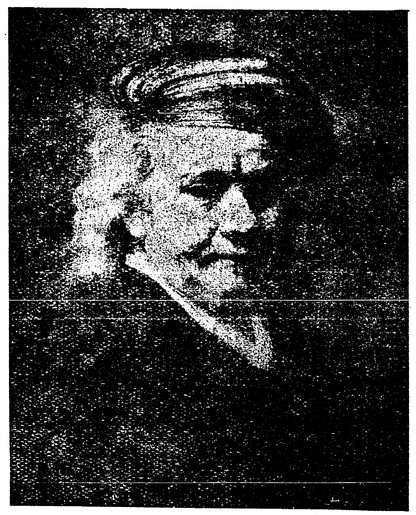

রেমব্রাণ্ট অঙ্কিত নিজ প্রতিকৃতি

চিত্রশালা এবং অন্যান্য বিখ্যাত চিত্রশালায় আছে। এখানে প্রথমে যে রেমব্রাণ্টের ছবি দেওয়া হল, তার কিছু বৈচিত্র্য আছে। রেমব্রাণ্ট যতগুলি 'নিজ-প্রতিকৃতি' এঁকেছেন তার মধ্যে এইটিই শেষ ছবি এবং মৃত্যুর কিছুকাল আগে আঁকা। তাঁর সব প্রতিকৃতিতেই বিষণ্ণভাব তাঁর দুঃখকাতর জীবনের আভাষ দেয়। কিন্তু এই ছবিটিতে আনন্দের স্পর্শ আছে, তার রেশ বুঝতে পারা যায়। রেমব্রাণ্টের আঁকা যে দ্বিতীয় ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে শুভজীবনের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে (এই প্রবন্ধের উপরের চিত্র দেখ)। ঘুমন্ত সিংহের দেহের সজীবতা অল্পরেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। রেমব্রাণ্টের শ্রেষ্ঠ ছবি 'নাইটগার্ড'। এই ছবিটি আয়তনে বিরাট।

হারলেম সহরে বিখ্যাত শিল্পী ফ্রান্স হল্‌স্ বাস করতেন। তাঁরও জীবনে দুঃখ ছিল। তাঁকে অনাথ আশ্রমে দিন কাটাতে হয়েছিল। ফ্রান্স হল্‌সের জীবনে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল, সেটি তোমাদের বলব। একদিন তিনি দোকান থেকে মাংস কিনে আনেন। হঠাৎ মাংস মোড়া কাগজটি

ফ্রান্স হলস্ অঙ্কিত একটি হাস্যরত যুবকের প্রতিকৃতি

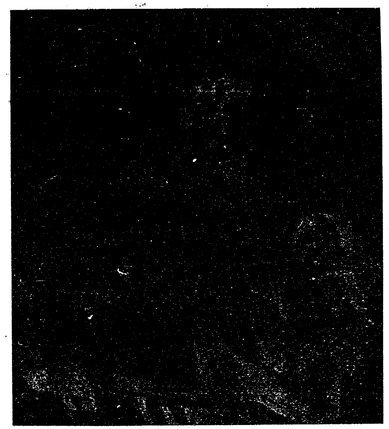

ফ্রান্স হলস্ অঙ্কিত একটি মহিলার প্রতিকৃতি

তাঁর নজরে পড়ল। তখনই সেই কাগজটি তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, সেটি আর কিছুই নয় রেমব্রাণ্টের আঁকা একটা মৌলিক 'এচিং'! রেমব্রাণ্টের ছবির এই দুরবস্থা দেখে তিনি শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁর মনে পড়ল নিজের এক দুর্দ্দিনের কাহিনী। এক রুটিওয়ালা তাঁর কাছে টাকা পেত। তিনি দিতে পারেন নি। সে তাগাদা করতে তাকে তিনি তাঁর একটা প্রতিকৃতি করে দিতে চান, রুটিওয়ালা তাতে রাজী না হয়ে ফ্রান্স হল্‌সের নামে আদালতে নালিশ করে দেয়। তাতে ফ্রান্স হল্‌সের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যায়। কিন্তু সম্পত্তি, ছেঁড়ামাদুর আর সামান্য দুই একটা আসবাব। এই সমস্ত হারিয়ে শেষজীবনে তিনি আনাথ আশ্রমে কাটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগেই সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তবে সুনাম আর অর্থ এক জিনিস নয়। তিনি সুনাম পেয়েছিলেন কিন্তু অর্থ পাননি। ফ্রান্স হল্‌সের ছবির বৈশিষ্ট্য এই, যে সে যুগের অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের ছবির চেয়ে তাঁর ছবিতে বর্ণবিন্যাস ও প্রতিকৃতির স্বরূপ সার্থকথা ফুটে

উঠেছিল বেশী ভাবে। এখানে হল্‌সের আঁকা যে ছবি দুটি দিলাম তাতেই বুঝবে তাঁর ছবির গুণ। তাঁর ছবিতে জড়তা নেই, অত্যন্ত সজীব মনে হয়। সমাবেশ ভঙ্গী সুন্দর। ছবির মধ্যে বাস্তব-ভাব ফুটে ওঠেছে।

প্রসিদ্ধ শিল্পী ভারমিয়ারের জন্ম হয় ডেল্‌ফে। তিনি আঁকলেন মানুষের সাধারণ অন্তঃপুরের ছবি। নারীর সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য তাঁর ছবিতে। তিনিও পুরাতন ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। মানুষের ঘরকন্নার ছবি তিনি এঁকেছিলেন। তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য তার কোমল ভাব। তুলির নরম স্পর্শ বোঝা যায় তাঁর ছবিতে। তাঁর ছবিতে নীল আর ঈষৎ হল্‌দে রংএর প্রভাব। ভারমিয়ারের নামও শিল্পজগতে অক্ষয় থেকে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রজগতে যুগান্তর আনেন ভ্যান্ গগ্। এখনও তিনি অতি আধুনিক বলে সর্ব্বত্র পরিচিত। ভ্যান্ গগের ছবির একক প্রদর্শনী আমি প্যারীর আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে দেখবার সুযোগ পাই। ভ্যান্ গগের ছবি সারা পৃথিবীতে আছে। সেই সব ছবি বিভিন্ন চিত্রশালা থেকে এনে একত্র করে প্যারী মহানগরীতে ১৯৩৭ সালে প্রদর্শিত হয়। সেই প্রদর্শনীতে ভ্যান্ গগের ছবি যারা দেখেছে তারাই মুগ্ধ হয়েছে। ইনি

ভ্যান্ গগ্ অঙ্কিত নিজ প্রতিকৃতি

জন্মেছিলেন হল্যাণ্ডের এক গ্রামে। প্রথম বয়সে তিনি হেগ, উট্রেক্ট, আমষ্টারডামে জীবন কাটিয়েছেন। এইসব জায়গাতে তাঁর শিল্পচর্চ্চা চলত। কোনো এক গ্রামে মাষ্টারিও করেছেন। তাঁর কাকার এক ছবির দোকান ছিল। তিনি সেই দোকানে ছবি আঁকতে গেলেন। কিন্তু তাঁর ছবির রসগ্রহণ করা সেকালের লোকের দুঃসাধ্য ছিল। তার ছবির রস পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা নিতে পেরেছিল। তার মনের উন্নতি এত দ্রুত ছিল, যে তিনি সেই সময়কার আব-হাওয়া কাটিয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। ফলে তাঁর ছবি তৈরী হল ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু কাকা তাঁকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। কারণ তিনি দেখলেন ভ্যান্ গগের ও ছবি কেউ নেবে না, ও ছবির কোনো মানে হয় না। ভ্যান্ গগকে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হল। দেশের লোকও তাঁকে তখন চিনতে পারল না, এমন কি তাঁকে পাগলা গারদে পাঠান হয়। সেখানেও তিনি ছবি আঁকেন। তিনি হল্যাণ্ড থেকে প্যারিতে আসেন। তাঁর শেষ জীবন দক্ষিণ ফ্রান্সের Arles-এ কেটে যায়। এই জায়গার মুক্ত প্রকৃতির ছবি তিনি আঁকেন। শেষে তিনি যখন বুঝলেন তাঁকে কেউ চিনতে পারবে না, তখন তিনি হতাশায় আত্মহত্যা করলেন। ভ্যান্ গগের ছবিতে রং-এর খেলা খুব জোর, ইনি প্রাথমিক রং-এ ছবি আঁকেন। তাঁর ছবিতে রং এবং রেখার অপূর্ব্ব সমন্বয় এক নূতন রূপ নিয়েছে। এঁর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সই প্রথম তাঁকে চিনতে পারে। ক্রমে সারা পৃথিবীতে তাঁর ছবির খ্যাতি প্রসারিত হয়। কিন্তু তিনি জীবিত অবস্থায় খ্যাতি পাননি, পেয়েছিলেন বিদ্রূপ, উপহাস ও অত্যাচার।

পৃথিবীর মানচিত্রে হল্যাণ্ডের স্থান কতটুকু! কিন্তু তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন যুগান্তকারী প্রতিভাবান লোকেরা। রেমব্রাণ্ট, ফ্রান্স হল্‌স্, ভারমিয়ার, ভ্যান্ গগ্ হল্যাণ্ডের গৌরব, পৃথিবীর গৌরব। শিল্পজগতে তাঁরা অমর।

রেশনিং

ছবি ও লেখা—**শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী**

এ খাবনা ও খাবনা
এখন কি আর বায়না চলে
লোকে এখন এইটুকুনও
মাথা খুঁড়ে পায়না ব'লে।
খল্‌সে চাঁদা কি করেছে
ন্যাদস্ পুঁটি খারাপ নাকি?
কালবোস আর পোনায় বাপু
এ বাজারে চল্‌ছে ফাঁকি।

দেখ দেখি যা কত মেনী
ফিরছে কেঁদে রাস্তা হেঁটে
কাঁটা কেন? আঁশটুকুনও
জুটছে নাকো বস্তা ঘেঁটে॥
অষ্ট প'হর হত্যে দিয়ে
লাইনেতে ঐ দাঁড়িয়ে থেকে
জুটিয়েছি এ—তবুও এখন
মুখ সিঁট্‌কে থাকলি বেঁকে?

ছাতুবাবুর ছাতা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাসে কিংবা ট্রামে, পথে কিংবা মাঠে, কোনো না কোনো সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা ছাতুবাবুকে দেখেছো। মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, মাথার চুল কাঁচাপাকা মেশানো, সামান্য টাক, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গলাবন্ধ এক কোট, পায়ে ফিতে-খোলা খয়েরি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। ভুরুগুলো ঘন কালো, মাঝে মাঝে এক মুখ গোঁফ-দাড়ি, মাঝে মাঝে একেবারে পরিষ্কার মুখ। সব সময়েই খুব চিন্তিত একটা ভাব। অনেক সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা ভেবেছো: কে এই ভদ্রলোক! আর কেউ নয়, তিনিই ছাতুবাবু।

পাড়ায় তাঁর অত্যন্ত বদনাম। লোকে বলে সকালে তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সেদিন ভাত জোটে না, ছেলেরা বলে পরীক্ষা দিতে যাবার আগে তাঁকে দেখেছিলো বলেই ফেল করেছে, অসুস্থ লোকের খবর

ছাতুবাবু নিতে গেলে আত্মীয়রা রোগীর আশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এ-সমস্ত কোনো কাজের কথা নয়। মিছিমিছি বদনাম দেওয়া লোকের একটা বদ্-অভ্যেস। আমি জানি আসলে ছাতুবাবু কৃপণও নন, বদও নন; তিনি অত্যন্ত হিসেবী। হিসেব করা তাঁর একটা বাতিক।

তোমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই। যাঁর এতো দুর্নাম সে-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করতে নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভয় পাও। কিন্তু আলাপ থাক্‌লে দেখতে, লোকটাকে যতটা খারাপ ভাবো তার সিকিভাগও তিনি খারাপ নন। নানা লোকের নানা শখ থাকে। কেউ ফুট্‌বল ম্যাচ দেখতে ভালোবাসে, কারুর বাতিক সিনেমা, কিংবা ডাকটিকিট জমানো, কিংবা ফটো তোলা। ছাতুবাবুরও তেমনি একটা শখ আছে: হিসেব করা।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হলেই ছাতুবাবু খুব সহজে বুঝিয়ে দেবেন, এই বোমার হিড়িকে কলকাতায় যত ব্যাফ্‌ল্-ওয়াল উঠেছে তার ইঁট দিয়ে প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের মতো একটা বড় বাড়ি করা যেতে পারতো। কিংবা প্রত্যহ পৃথিবীতে মানুষের মাথার চুল যত নষ্ট হয়, সেগুলো এক বছর জমালে পৃথিবীর প্রত্যেক লোককে তাই দিয়ে অন্তত দশটা করে কম্বল তৈরি করে দেওয়া যেতো, ইত্যাদি।

এই যুদ্ধের বাজারে লোকের খরচ ডবল তিন-ডবল কি আরো বেশি গেছে বেড়ে। ছাতুবাবু তার সহজ সমাধান করেছেন। প্রথমত ধর, ব্লেড্। চার পয়সার জিনিস আট আনা হয়েছে। ছাতুবাবু আমাকে বল্‌লেন, "অত ভাবচো কেন? আটগুণ দাম বেড়েছে তো আটগুণ কম ব্যবহার করলেই পারো। আগে যদি রোজ কামাতে, এখন আটদিন ছাড়া কামিও, আগে একদিন ছাড়া কামালে এখন কামিও ষোলদিন ছাড়া; তাহলেই দেখবে খরচ বাড়েনি।"

চালের দর পাঁচগুণ বাড়ায় ছাতুবাবু হিসেব করে বাড়ির লোকদের বুঝিয়ে দিলেন, বেঁচে থাকার পক্ষে যতটা খাদ্য দরকার, আমরা অন্তত তার পাঁচভাগ বেশি খেয়ে শরীর নষ্ট করি। অতএব আগে তাঁর বাড়িতে যে-জায়গায় পাঁচমন চাল আসতো, আজ সে-জায়গায় আসে একমণ। খরচ আগেও যা ছিলো এখন তাই আছে। ছাতুবাবুর হিসেবের সত্যতা হাতে হাতে পাওয়া গেল। কিন্তু চালের পরিমাণ পাঁচভাগ কমানোয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পরিমাণ দশভাগ গেল বেড়ে। ছাতুবাবু ঠিক করলেন এ-সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে আগে তিনি দিনে যত ঘণ্টা বাড়ির বাইরে থাক্‌তেন, এখন তার দশগুণ বেশি বাইরে কাটাতে পারলে। কিন্তু এইখানেই ছাতুবাবু পড়লেন প্রথম অসুবিধেয়, হার হোলো তাঁর হিসেবের। কারণ আগে তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা থাক্‌তেন বাইরে, এখন হিসেব মতো তাঁকে থাক্‌তে হবে একশো ঘণ্টা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একশো ঘণ্টা কি করে বাইরে থাকা যায়—ভাবতে-ভাবতে তাঁর চুলগুলো পট পট করে পাকতে আরম্ভ করলো। অথচ হিসেব তাঁর ভুল হতে পারে না। হিসেব তাঁর নিখুঁত।

একশো ঘণ্টা না হোক, ছাতুবাবু ঠিক করলেন যতটা সময় পারা যায় বাড়ির বাইরে কাটাবেন। সকাল নটায় তিনি আপিসে বেরিয়ে যান। পাঁচটায় আপিসের ছুটির পর ট্রামে ট্রামে ঘোরেন। বাড়ি ফেরেন রাত দশটায়। ট্রামে বেড়ানোয় তাঁর খরচ বাড়েনি। কারণ আজ পঁচিশ বছর ধরে তাঁর মাসিক টিকিটই আছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বর্ষা এসে গেল। অনেকদিন ধরেই ছাতুবাবুর ছত্রহীন জীবন যাপন করছিলেন। এরারকার বর্ষার দৌরাত্ম্যে তাঁকে একটা ছাতা কিন্‌তেই হোলো। দাম শুনে প্রথমে তিনি চম্‌কে উঠেছিলেন: দু'টাকার জিনিসটা বিণা বাক্যব্যয়ে একেবারে চোদ্দ টাকায় উঠেছে। সাতগুণ দাম বেশি। তিনি হিসেব করে দেখ্‌লেন, গত পঁচিশ বছরের মধ্যে গড়-পড়তা তিন বছর ছাড়া একটা করে নতুন ছাতা তাঁকে কিন্‌তে

হয়েছে। চোদ্দটা টাকা দিয়ে ছাতাটা কিনে মনে মনে তাঁকে হিসেব করে দেখতে হোলো একুশ বছরের মধ্যে তিনি আর ছাতা কিন্‌তে পারবেন না।

কিন্তু ভগবান স্বয়ং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলেন। ছাতা কেনবার তিনদিন পরে একদিন ট্রাম থেকে নেবে বৃষ্টিতে আধঘণ্টা ভেজবার পর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোলো মাথার উপর ছাতাটা নেই। মনে পড়লো ট্রামে ছাতাটা তাঁর পাশে ছিলো, নাববার সময় সেখানেই সেটা রয়ে গেছে। নাবাতে গেছেন ভুলে। প্রথমটায় তিনি কিন্তু আশা ছাড়েননি। যে-ট্রামে ওঠেন সে-ট্রামের নম্বরটা মুখস্থ করা তাঁর একটা বাতিক। নম্বরটা মনেই ছিলো। সোজা চল্‌লেন ট্রামের ডিপোয়! কিন্তু কোনো ফল হোলো না। সেই ট্রামের কণ্ডক্টরের ছুটি হয়ে গিয়েছিলো। সে বাড়ি যাচ্ছিলো। ছাতুবাবুর কথা শুনে বল্‌লো, "এখন আমার মনে পড়ছে মশাই! একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা লোক একেবারে নতুন একটা ছাতা নিয়ে ট্রাম থেকে নেমেছিলো বটে। লোকটার চেহারার সঙ্গে নতুন ছাতাটা একেবারেই মানাচ্ছিলো না। তাই আমার মনে আছে।"

ছাতুবাবু অত্যন্তই দমে গেলেন। এই বাজারে একেবারে আনকোরা নতুন একটা ছাতা হারানো খুব কম কথা নয়। তা'ছাড়া হিসেবের মধ্যে এই এ-ধরণের দুর্ঘটনার কথা তিনি ভেবে দেখেননি। আবার চোদ্দ টাকা খরচ করে একটা ছাতা কিন্‌লে তিনি আরো একুশ বছর অর্থাৎ মোট বেয়াল্লিশ বছর ছাতা কিনতে পারবেন না। কিন্তু আরো বেয়াল্লিশ বছর হয়তো তিনি না-ও বাঁচতে পারেন। এবং না-বাঁচলে সমূহ লোকসান। এবার গোড়া থেকেই তিনি অতিরিক্ত সাবধান হয়ে গেলেন যাতে হিসেবে কোনো ভুল আর না হয়। ঠিক করলেন ছাতা আর কিনবেনই না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়লে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাবেন! খরচ তাতে অনেক কম।

তা ছাড়া এই ছাতা-হারাণো ব্যাপারটা তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। বরাবরই তাঁর ছাতাগুলি হারিয়েই গেছে, ছিঁড়ে কিংবা ভেঙে যায়নি। কোনোটা হারাতে লেগেছে চার বছর, কোনোটা বা দু' বছর। গড়পড়্‌তায় তিন বছর অন্তর একটি করে ছাতা তিনি হারিয়েছেন। অনেকবার অনেক আশ্চর্যভাবে ছাতা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। এই ট্রাম-ডিপো থেকেই তো তিনি বার চারেক ছাতা ফিরে পেয়েছেন। তাই ছাতুবাবু মনে মনে একেবারে নিরাশ হলেন না। হয়তো একদিন দৈব উপায়ে ছাতাটা তাঁর কাছে ফিরে আস্‌বে—কেবলি এ-কথা তাঁর মনে হতে লাগলো। কিন্তু দৈব ঘটনার উপর তো কোনো হিসেব চলে না। তাই কবে যে ছাতাটা ফিরে আসবে সঠিকভাবে তিনি অঙ্ক কষে বার কর্‌তে পার্‌লেন না।

এদিকে ক্রমশ বর্ষা বাড়্‌তে লাগলো আর ছাতুবাবুও ক্রমাগত লাগলেন ভিজ্‌তে। ভিজে ভিজে বার চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়্‌লেন। তিন চার শিশি ওষুধও শেষ হোলো। অথচ ছাতার কোনো কিনারা হোলো না। কারুর হাতে নতুন ছাতা দেখ্‌লেই তাঁর চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে। কিন্তু সবাইকার হাত থেকে তো ছাতা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় না। অতি কষ্টে চুপ্‌চাপ্ বসে থাকেন। নতুন ছাতার গিছিল যেন তাঁর চোখের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষগুলোর বেহিসেবী কাণ্ড দেখে মনে মনে তিনি লজ্জা পান।

সেদিন অন্ধকার রাত। প্রায় তখন সাড়ে নটা হবে। এল্‌গিন রোডের মোড়ে ট্রাম থাম্‌বার জায়গায় ছাউনির তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হিসেব মতো বাড়ি ফের্‌বার সময় হয়েছে। এবারে তিনি ফির্‌তি ট্রাম ধর্‌বেন। সেখানে আরো দুজন লোক দাঁড়িয়েছিলো। অন্ধকারে তাদের চেহারা ভালো বোঝা যায় না। এটুকু শুধু বোঝা যায় তাদের একজন বেজায় মোটা আর একজন আবার তেমনি রোগা।

কথা শুনেই ছাতুবাবু বুঝ্‌তে পার্‌লেন লোক দুটো মাতাল। বেজায় তারা মদ খেয়েছে। তারা ও-পাশের পথ থেকে একটা ফিটন ভাড়া কর্‌তে চায়। গাড়িটা দূরে রয়েছে, এখান থেকে ডাক্‌লে গাড়োয়ান শুনতে পাবে না। যেতে হবে ওখানেই। এখন সমস্যা হয়েছে তাদের কাছে ছাতা রয়েছে একটা, আর সেই একটা ছাতার তলায় দুজনে তারা কুলোয় না। এদিকে বৃষ্টিটাও নেমেছে জোরে। ছাতুবাবুকে বুড়োসুড়ো লোক দেখে তারা তাঁর কাছে এসে প্রায় পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেল্‌লো।

"আহা করেন কি, করেন কি"—বলে দু' পা সরে এলেন ছাতুবাবু।

তাদের মধ্যে মোটা মাতাল বল্‌লো, "আপনি প্রবীন লোক, আমাদের বিপদের কথা তো শুন্‌লেন। এই এক ছাতার তলায় দুজনে গাড়ী ধর্‌তে গেলে দুজনেই আমরা ভিজ্‌বো। এখন আপনি একটা উপায় না করে দিলে আমাদের সারা রাত এখানেই থাক্‌তে হবে।"

ছাতুবাবু বল্‌লেন, "তা, আপনারা অত ভয় পাচ্ছেন কেন? এক কাজ করুন না। আপনারা একজন এখানে থাকুন আর একজন ছাতাটা মাথায় দিয়ে গাড়ি ডেকে আনুন।"

"তাই তো, সত্যিই তো," তাদের দুজনেই প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তারপর মোটা মাতাল বল্‌লো, "কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো মশাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনি না থাক্‌লে সমস্ত রাতই আমাদের দুজনকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হোতো। আর সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আমরা দুজনেই মরে যেতুম। আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচালেন। কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনার তো হাতে ছাতা নেই, এই ছাতাটা আপনি অনুগ্রহ করে নিন।"

ব্যস্ত হয়ে ছাতুবাবু আপত্তি জানালেন।

রোগা মাতালটা ততক্ষণে প্রায় কেঁদেই ফেলেছে। বল্‌লো, "কিছুতেই আপনার আপত্তি শুন্‌বো না মশাই। ছাতাটা নিতেই হবে। আহা ছাতাটা আমার বড় আদরের। ট্রামে এক বুড়ো ফেলে গিয়েছিলো। সে ট্রামেই আমি ছিলুম। অন্য লোকের পকেট থেকে বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নামবার সময় ছাতাটা একলা পড়ে রয়েছে দেখে নিয়ে নাম্‌লুম। ভারি পয়সার ছাতা মশাই। আপনাকে নিতেই হবে।"

"কিন্তু আপনারা যাবেন কি করে?"

"আমাদের জন্যে ভাব্‌বেন না। আপনি আমাদের জীবন দিলেন আর আপনার জন্যে আমরা সামান্য ভিজ্‌তে পার্‌বো না?" রোগা মাতাল বল্‌লো।

মোটা মাতাল তার হাত ধরে বল্‌লো, "আর দাঁড়াস্ নে নিধে। আয় চল্। ভদ্দরলোক আবার ছাতাটা হয়তো ফেরৎ দিতে চাইবে। দিয়ে নিলে কি হয় জানিস্ তো?"

"চল্‌লুম দাদা। চিরকাল আপনার দয়ার কথা…"রোগা লোকটা কথা শেষ কর্‌তে পার্‌লো না। মোটা মাতাল তার হাত ধরে টেনে সেই দারুণ বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে টল্‌তে টল্‌তে মিলিয়ে গেল।

ট্রামের আলোয় ছাতুবাবু দেখ্‌লেন ছাতাটা তাঁরই বটে; এক কোনে ছুরি দিয়ে তিনি 'C' লিখেছিলেন। অক্ষরটা এখনো স্পষ্ট রয়েছে।

কোন্ হিসেবে তিনি যে ছাতাটা ফেরৎ পেলেন ছাতুবাবু ভালো করে বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। এই প্রথম, হিসেবটা তাঁর কাছে বেশ জটিল ঠেক্‌লো।

কোথায় পূজোর আমোদ?

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পূজোর আমোদ কোথায় মাগো পূজোর আমোদ কোথায়?
আজ্‌কে পূজো নাই বা হ'ল পুরোণ সেই প্রথায়!
সবাই যাঁকে মা বলি মা, তাঁর ছেলেদের দুখে,
অঞ্জলি আজ দিতে কি মা বাজ্‌বে না তাঁর বুকে?
নাই বা আলো জ্বল্‌লো গো আজ পূজোর দালান জুড়ে,
কঙ্কালেরা যখন পথে মরছে মাথা খুঁড়ে!
মাঠের শস্য ভেসে গেছে, ঘরের শস্য সাবাড়,
লক্ষ লক্ষ দুঃখীজনের নেইকো মুখের খাবার;
বাংলামায়ের ছিন্ন আঁচল শূন্য প'ড়েই আছে;
এমন দিনে পূজোর আমোদ আস্‌বে কাদের কাছে?
নতুন জুতো চাইনা এবার, চাইনা কাপড় জামাও।
সার্ব্বজনীন দলে গিয়ে বল্‌ব, পূজো থামাও!
ক্ষুধায় যারা কাতর, তাদের' অন্ন বিলাও আগে,
অমৃত দাও দরিদ্র সব নারায়ণের ভাগে!
তারায় ভরা আকাশ হ'তে দেখ্‌বে মায়ের হাসি।
আমার চাঁদা তোমার চাঁদা তাইতে দিয়ে আসি।
হেথায় কারা মৃত্যুমুখে, কান্না শুনি হোথায়!
পূজোর আমোদ কোথায় মাগো পূজোর আমোদ কোথায়?

ভগবানের চাবুক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চৌদ্দ অধ্যায়

চীনের পথে অচিন দেশে

বজ্রের দর্পচূর্ণ। উনসত্তর বৎসরের ভার জীবনের উপর নিয়ে তৈমুর স্তিমিত দৃষ্টিতে একবার অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যেমন ক'রে শেষ-দৃষ্টিপাত করে অস্তাচলের সূর্য্য পূর্ব্ব-আকাশের দিকে।

যাদের সঙ্গে তরবারি হাতে ক'রে তিনি যাত্রাপথে বেরিয়েছিলেন, তারা সবাই হয়েছে আজ অনন্ত পথের পথিক। যাদের সাহায্যে তিনি বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন সেই সৈফুদ্দীন, জাকু বার্লাস্ ও আক্ বোগা প্রভৃতি সবাই করেছে আজ মহাপ্রস্থান। সর্ব্বপ্রথম পুত্র এবং তাঁর ছেলে মহম্মদও পরলোকে এবং চিরকালের জন্যে হারিয়েছেন তিনি জীবনের প্রথম সঙ্গিনী আল্‌জাইকেও। তিনি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী, কিন্তু অধিকতর শ্রেষ্ঠ কোন্ শক্তিধর তাঁর কাছ থেকে একে একে কেড়ে নিয়েছেন সব-চেয়ে-প্রিয় সহধর্ম্মিণী, আত্মজ, বন্ধু ও স্বজন। তিনি আজ একাকী, একাকী। অন্যান্য বংশধরও আছেন, সেনাপতিও আছেন, কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে এই বিরাট ও অতুলনীয় সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে পারেন এমন যোগ্য ব্যক্তি আর একজনও নেই। তাঁর চারিদিক ঘিরে বিপুল জনতা, কিন্তু তিনি একাকী, বড় একাকী!

তিনি আর কি দেখলেন?

দেখলেন নিজের হাজার হাজার ক্রোশব্যাপী অতি-দীর্ঘ যাত্রাপথ—কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নেই জীবনের মহোৎসব। সেই দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত ধূ-ধূ পথ জুড়ে ঢেউ খেলিয়ে বয়ে যাচ্ছে কেবল রক্তের রাঙা নদী। তার দুই পাশে জেগে আছে মরুভূমির পর মরুভূমি—সেখানে ফল-ফুল-তরু-লতা-শস্য জন্মায় না, সেখানে নেই ছায়াময় গ্রাম, সমৃদ্ধ নগর, সমাজ-সংসারের কলরব, তার বদলে সেখানে দেখা যায় সুধু গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা ও কুণ্ডলী-পাকানো ধূম্ররাশি এবং বীভৎস নরমুণ্ডের পাহাড়ের পর পাহাড়!

অতীতের দিকে তাকিয়ে তৈমুর কি দুঃখিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত হ'লেন?

একটিমাত্র যুদ্ধের পর দেশের দৃশ্য দেখে ভারত-সম্রাট অশোক চিরদিনের মতন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু তৈমুর অশোক নন। স্তিমিত চক্ষে অগ্নিবর্ষণ ক'রে বৃদ্ধ তৈমুর ঘোড়ায় চ'ড়ে আবার গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, "অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর! এস বীর তাতারীরা, চল আবার দিগ্বিজয়ে!"

সবাই বিস্ময়ে সচকিত! সম্রাট তৈমুর যার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারেন, পৃথিবীতে এমন দেশ আর কোথায় আছে?

তৈমুর বললেন, "আমরা প্রায় সমগ্র এসিয়া জয় করেছি, বাকি আছে কেবল চীনদেশ। আমরা এমন সব মহা মহা রাজার গর্ব্বচূর্ণ করেছি যে পৃথিবী চিরদিন আমাদের স্মরণ ক'রে রাখবে। কত যুদ্ধে তোমরা আমার সঙ্গী

য়েছ, কিন্তু তোমাদের পরাজয়ের কলঙ্ক মাখতে হয়নি কখনো। চীনদেশের পৌত্তলিকদের সাধ্য নেই, তোমাদের সামনে দাঁড়ায়! আমার সঙ্গে চল সেই দেশে!"

যে জেঙ্গীজ খাঁয়ের বংশধরদের সাম্রাজ্যকে অবলম্বন ক'রে তৈমুর করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠা, সেই মহান সম্রাট—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী জেঙ্গীজও জীবন-সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলেন দক্ষিণ চীনের পথে, নিজের দিগ্বিজয়-ব্রত সম্পূর্ণরূপে সফল করবার জন্যে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। জেঙ্গীজ হয়েছিলেন পৃথিবীর সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু মহাকালের পরিহাসে তাঁর শেষ-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তৈমুরও কি ভেবেছিলেন, জেঙ্গীজ যা পারেন নি সেই কার্য্যে সফল হয়ে তিনি জেঙ্গীজেরও যশকে ম্লান ক'রে দেবেন? সম্ভব।

মহাকাল? ও হচ্ছে পৌত্তলিক অভিধানের কথা, তৈমুর তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

"অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর! জেঙ্গীজ অক্ষম হয়েছিলেন, আমরা সক্ষম হব!"

অস্ত্রধারীর অভাব হ'ল না। সময়খন্দের সিংহদ্বার দিয়ে বহির্গত হ'ল দুই লক্ষ সৈনিক। দুই লক্ষ মৃত্যুদূত! তাঁর প্রিয় সমরখন্দের বাইরে এসে তৈমুর ঘোড়ার পিঠে ব'সে মুখ ফিরিয়ে নিজের রাজধানীকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করলেন। নীলাকাশকে স্পর্শ করতে চাইছে তার শত শত গুম্বজ ও মিনার। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁর দৃষ্টি অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাঁর চোখের পাতা এমনি ঝুলে পড়েছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তিনি নিদ্রিত। তৈমুর আবার অশ্বচালনা করলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

নভেম্বর মাস—শীত ফেলছে হু-হু ক'রে শীতল শ্বাস। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আরম্ভ হ'ল বরফ-পাত। তারপরেই জাগল তুষারের ঝড়। যে দুই লক্ষ বীর পদভারে পৃথিবীর বুক কাঁপাচ্ছিল তালে তালে, তাদের শীতজর্জ্জর পাগুলো পড়ল এলিয়ে। নদীর জল দেখা যায় না, সে গায়ে দিয়েছে বরফের চাদর। রাস্তাগুলো অচল হয়ে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারে। কত সৈন্য মরল, কত ঘোড়া মরল।—শিলাপাত, তুষারপাত! যুবক যোদ্ধাদের দেহ আর বয় না—কিন্তু বৃদ্ধ যোদ্ধা তৈমুর চলছেন, চলছেন, চলছেন! সত্তর বছরের উদ্দাম পথিক!

কোথায় চলছেন? কার আহ্বানে?……

শেষটা তাঁকেও থামতে হ'ল—ওত্রার সহরে গিয়ে। সেনাপতিদের ডেকে তিনি বললেন, "ঐ উত্তরগামী পথ—ঐ হচ্ছে চীনের পথ। আপাতত বাকি শীতকালটা এইখানেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু মনে রেখো, বসন্তকাল এলেই আবার যাত্রা করতে হবে।"

…… …… …… ……

…… ……

বসন্তকাল। তৈমুরের আদেশ কেউ ভোলে নি। সৈন্যরা আবার যাত্রা আরম্ভ করলে। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। উত্তরগামী চীনের পথ।

আবার মেঘধ্বনি করলে কাড়া-নাকাড়া, আবার আকাশে উড়ল পতাকার পর পতাকা, প্রতি রাত্রে আবার বাজতে লাগল বেণু-বীণা—দিগ্বিজয়ী তৈমুরের প্রশস্তি গাইবার জন্যে।

কিন্তু এ হচ্ছে মৃত দিগ্বিজয়ীয় প্রশস্তি-গান!

পৃথিবীপতি তৈমুর পৃথিবী ত্যাগ করেছেন ওত্রার নগরে। ভগবানের চাবুক ফিরে গেছে

ভগবানের কাছে তৈমুরের সুসজ্জিত শ্বেত অশ্ব সমতালে পা ফেলে, বৃহৎ বাদসাহী পতাকার ছায়া মেখে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু আজ আর তার পৃষ্ঠে নেই আরোহী।

শেষ-দৃশ্যে দেখি—

শয্যাশায়ী তৈমুর। পাশে ব'সে সম্রাজ্ঞী সরাই মুল্‌ক্ খানুম। চারিদিকে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর, ইমান ও চিকিৎসক প্রভৃতি।

তৈমুর ক্ষীণস্বরে বললেন, "আমাকে হারিয়ে তোমরা পাগলের মতন ছুটোছুটি হাহাকার কোরো না। তাহ'লে সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। বীরের মত তরবারি ধ'রে থাকো—একতা-বদ্ধ হও। চীনদেশে যাত্রা কর—"

... ...

তৈমুরের আদেশ! সেনাদল নিয়ে সেনাপতিরা চীনদেশের দিকে ছুটলেন।

বেশীদূর যেতে হ'ল না। দ্রুতগামী অশ্বে চ'ড়ে দূত এসে দেশের খবর দিলে। এরি মধ্যে তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে!

চীন ভগবানের চাবুকের মার আর খেলে না। সেনাদল নিয়ে সেনাপতিরা আবার ফিরলেন সমরখন্দের দিকে।

তৈমুর বড় হ'তে চেয়েছিলেন জেঙ্গীজ খাঁয়ের চেয়ে। কিন্তু জেঙ্গীজ খাঁ কেবল দিগ্বিজয় এবং তৈমুরের চেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্যই স্থাপন করেন নি, সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি এমন দৃঢ় ক'রেও গিয়েছিলেন যে তার আকার ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

আর তৈমুরের দিগ্বিজয়ের ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ানো রইল ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যও গেল ধ্বংসের পথে। তৈমুর কেবল ধ্বংস ক'রেই গেলেন, স্থায়ী কিছু সৃষ্টি ক'রে যেতে পারলেন না। তাঁর নাম আজও তাই পৃথিবীর কাছে মহামারীর মতই ভয়ানক!

তৈমুরের পুত্র ও পৌত্ররা স্থানীয় শাসনকর্ত্তার মত এখানে-ওখানে রাজদণ্ড চালনা ক'রেই তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা কেউ তৈমুরের ভয়াবহ তরবারি ধারণ করতে সাহসী হন নি—তাঁরা ছিলেন সাহিত্য ও চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তৈমুরের মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে তাঁর বংশের মধ্যে আবার নেচে উঠেছিল প্রচণ্ড তাতারের উত্তপ্ত রক্তধারা! এবং দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে ভারতে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবর করলেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষ মহান তৈমুরের স্মৃতিতর্পণ।

এইতেই বোঝা যায় রক্ত একবার জাগে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে।

সমাপ্ত।

খেলার মাঠ

কে ভট্টাচার্য্য

কয়েক বৎসর আগের ফুটবল খেলা এবং এখনকার ফুটবল খেলার দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ে খেলার মাঠের দর্শকদের অন্ধ পক্ষপাতিত্বের দিকে। এঁরা এখন শুধু চান যে তাঁদের প্রিয় দলটির কোনও রকম করে খেলার জিত হোক্। সে যে রকম খেলা খেলাই হোক্ না কেন। প্রতিপক্ষের ভুলেই হোক অথবা রেফারীর ভুলেই হোক, জিত্ হলেই তাঁরা খুসী। রেফারীও এই ধরণের দর্শকদের কাছে ঐ রকম একটা ভুল করার জন্য যতরকম উৎসাহ পাওয়ার দরকার সবই পায়। অন্য দলের সমর্থকেরাও চুপ করে বসে থাকে না। চিৎকার ও গণ্ডগোলের মধ্যে রেফারীর মাঝে মাঝে ভুল করে বসা মোটেই অসম্ভব নয়। ভুলটি যদি বেশী প্রিয় দলের হয় তাহলে সেদিন তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। দস্তুরমত পুলিশ পাহারা নিয়ে তবে তিনি মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে যেতে পারেন। এই অবস্থার মধ্যে রোজ রোজ আর কে পড়তে চায়? কাজেই যে দলের সমর্থক বেশী তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা একজন রেফারীর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। খেলার মাঠে সশস্ত্র পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত আজকাল একটি অতি সাধারণ দৃশ্য। খেলার জগতে এত বড় লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে। আবার খেলার দুটি দল যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তা হলে ত আর কথাই নেই। এই রকম অন্ধ সমর্থকেরা তাঁদের প্রিয় দলের বিরুদ্ধে অন্য একটি খেলোয়াড়ের ভাল খেলার প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক গালাগালি দিতে সুরু করেন। তার অপরাধ সে ভাল খেলেছে। "ওর পা ভেঙ্গে দাও", "ওকে মাঠ থেকে মেরে বের করে দাও" ইত্যাদি চিৎকার প্রায় শোনা যায়। এরকম চিৎকার সাধারণ দর্শকদের এবং সভ্যদের গ্যালারি থেকেও শোনা যায়।

সত্যি ভাল খেলে জিতলেও অন্য দলের সমর্থকেরা তা মেনে নেন না। হয় রেফারীর, আর না হয় ঐ রকম আর একটা কিছুর দোষ তাঁরা দেখাবেনই। এরকমও দেখতে পাওয়া যায় যে খেলার পর কোনও একজন বিশেষ খেলোয়াড়কে মাঠের বাহিরে সাধারণ দর্শকের দল ঘিরে ঘরে নানারকম গালাগালি করছেন। খারাপ খেললে দলের সমর্থকেরা অনেক সময় গালাগালি দিয়ে থাকেন কিন্তু এ ব্যাপারটা হচ্ছে সে ঐ দর্শকদের প্রিয় দলের বিরুদ্ধে অন্য দলের হয়ে ভাল খেলেছে বলে। তার জন্য কোথায় সে পাবে ভাল খেলার বাহাদুরি, না গালাগালি খেয়ে প্রাণ যাবার যোগাড়। এই অন্ধ সমর্থকদের পক্ষে তাকে দুএক ঘা মেরে দেওয়াও আশ্চর্য্য নয়। আবার কখনও কখনও শোনা যায় যে দুটি দলের সমর্থকেরা পাশাপাশি বসে খেলা দেখছেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন অপরপক্ষের একটি খেলোয়াড়ের প্রশংসা করছেন। কিন্তু খেলার মাঠে নীচতা আজ এমনি জায়গা জুড়ে বসেছে যে এই প্রশংসাকেও সেই অপরপক্ষের সমর্থক ঠিক সত্যি বলে নিতে না পেরে এবং ঠাট্টা করছে ভেবে হঠাৎ বলে বসলেন—"আরে ও ভাল খেলবে না ত কি তোদের অমুক ভাল খেলবে?" এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে।

ভাল খেলার প্রশংসা যাঁরা ভুলে গিয়েছেন তাঁদের খেলা দেখতে আসা এবং খেলোয়াড়ের পক্ষেও সেই রকম দর্শকের সামনে খেলার কি কোনও সার্থকতা আছে? একটি খেলায় দুটি দল ত একসঙ্গে জিত্‌তে পারে না। একদল জিতলে আর এক দলকে হারতেই হবে। হারাটাকে মেনে নিতে শেখা, হেরে মুষ্‌ড়ে না পড়া এবং জিতে গর্ব্বিত না হওয়া, এই হল খেলার আদর্শ। এই উদ্দেশ্য নিয়ে খেলা দেখতে ও খেলতে না পারলে খেলার, একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। খেলার মাঠ হওয়া উচিৎ একতা ও বন্ধুত্বের জায়গা। সেখানে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ থাকবে না। কিন্তু আমাদের কলকাতার খেলার মাঠের অবস্থা ঠিক তার বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ খেলার সার্থকতা কি, এ ভাববার সময় আমাদের হয়েছে। সমস্ত ক্লাবের খেলোয়াড়রা একসঙ্গে মিলে এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধন না করলে খেলা যে একেবারে নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে।

চলন্তিকা

আমরা রংমশালের কিশোর গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকাদের শারদীয়ার আন্তরিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। কতদিন ধরে আমরা সবাই কত আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি এই ছুটির দিনের জন্য, এই শারদীয় উৎসবের জন্য। এই পূজোর ছুটিতে বাংলা দেশ খুসীতে ভরপুর হয়ে ওঠে, নূতন জামা কাপড় পরে, কত উপাদেয় জিনিষ খেয়ে মিষ্টিমুখে আমরা বাংলার অপরূপ শোভা উপভোগ করি। কিন্তু হায়, এ বছর কত গরীবের ছেলেমেয়েরা নূতন জামাকাপড় দূরে থাক, একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রও পরতে পাবে না, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দূরে থাক, এক মুঠো ডালভাত তারা পেটভরে খেতে পাবে না। দেশের চারিদিকে আজ যুদ্ধ, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভীক্ষ। বাংলায় কত লোক আজ আশ্রয়হীন, কত বাংলার গ্রাম আজ মরণাপন্ন। পথে ঘাটে আজ শুধু তাই কঙ্কালের ছায়া। তাই আমাদের মধ্যে যাদের আজও ভাগ্য ভাল, যাদের পরণে নূতন বস্ত্র আছে, যারা খেতে পরতে পারছে, আজ এই পূজোর অবকাশে তাদের দেশের প্রতি একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। নগ্ন ক্ষুধিত আশ্রয়হীন ভাইবোনদের আজ আমাদের বস্ত্র দিতে হবে, অন্ন দিতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে ও তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

ইউরোপের যুদ্ধে নূতন খবরের মধ্যে মিলিতশক্তির নিকট ইতালীর আত্মসমর্পণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতালীর এই আত্মসমর্পণে ফাসিষ্ট ও নাৎসীশক্তি যে অনেকখানি খর্ব্ব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং মিলিত শক্তির বিজয় অভিযানের যে আরো সুযোগ সুবিধা হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। আশা করা যায় এই যুদ্ধের যবনিকার সূচনা হ'ল। অবশ্য এখনও অনেক কিছু বাকি। ইতালীর অনেকখানি এখনও শত্রুর করতলগত। ইতালীর মাটিতে আজ তিনদলের শক্তি পরীক্ষা সুরু হয়েছে। উত্তরে জার্ম্মানরা তাদের ঘাঁটি সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করছে, মধ্যে বদোগলিওর শাসন ও দক্ষিণে ও অন্যান্য এলাকায় মিলিত জাতিদের প্রাধান্য। ইতালীতে এই মিলিত জাতিদের শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শোনা যাচ্ছে মুসোলিনীকে উদ্ধার করে হিটলার তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। মুসোলিনীর নিরুদ্দেশ যেমন রহস্যময়, ততোধিক রহস্যময় তার পুনরাবির্ভাব। যাই হোক, ইতালীর জনসাধারণ ও মিলিত জাতিদের প্রচেষ্টার ওপরই ইতালীর ভাগ্য আজ অনেকখানি নির্ভর করছে। ওদিকে ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গণে রুশ লালসেনা বহু এলাকায় জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে চলেছে এবং এই রণাঙ্গণে জার্ম্মানদের অবস্থা যে কাহিল সে বিষয়ও নিঃসন্দেহ। রুশের জয়লাভের উপর এই যুদ্ধের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করছে।

ইষ্টবেঙ্গল ফুটবল দল পুলিশকে ফাইনালে রীতিমত হারিয়ে শীল্ডে জয়লাভ করে সকলেরই প্রশংসাভাজন ও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের এই কৃতিত্বে আমরা তাদের অতিনন্দন জানাচ্ছি। ইষ্টবেঙ্গল দল যে এ বছরের সবচেয়ে ভাল ফুটবল দল তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে চারিটি ভারতীয় দল শীল্ডে জয়লাভ করল প্রথম পথ প্রদর্শক স্বরূপ মোহনবাগানের নাম করিতেই হয়, তারপর দুর্দ্দমনীয় মহামেডান্স ও তরুণ এরিয়ান্স দল ও শেষবেশ অপরাজেয় ইষ্টবেঙ্গল। এই সঙ্গে আমরা অন্যান্য ফুটবল দলগুলিকেও উৎসাহ দিচ্ছি। আশা করা যায় আগামী বছরের শীল্ড খেলা আরো ভালো খেলা, আরো ধারালো প্রতিযোগিতা হবে।

SUPPORT

"DHAKESWARI" Products

Not for Sentiment But

For Quality, Durability & Finish

Insist on— its Excellent Products

To Buy "DHAKESWARI" *Products*
is
to get more for the money

THE

DHAKESWARI COTTON MILLS LTD.

Phone Nos. 9 & 207 Head Office : 5, Simpson Road, DACCA. Tele Add.: COTTON

FACTORIES :

Mill No. 1—DHAMGARH, NARAYANGANJ Mill No. 2—GODENYLE, NARAYANGANJ

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বইগুলি তোমরা পড়েছ কি? বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে তাঁর এই বইগুলি পড়ো।—

তরুণ তুর্কী—	১৸০
আজকের আমেরিকা—	৩॥০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরুণ বিজয়ী চীন—	৩॥০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	২॥০

কলিকাতার বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

হাই মেন্থল

আপনার দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে

"ইউমেন্থল"

দাঁতের মাজন ব্যবহার করুন।

আমাদের লাইব্রেরী

প্রভাত-রবি—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। প্রকাশনী: ১৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াইটাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও কৈশোর সম্বন্ধে বেশী বই প্রকাশিত হয়নি। বিজন বাবুর এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও কৈশোরের অনেক নতুন কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসরের নানা কথা এতে চমৎকার সহজ সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। তোমাদের কাছে বিজন বাবুর অপরিচিত ন'ন। রংমশালের রবীন্দ্র-সংখ্যায় তাঁর লেখা তোমরা পড়েছ। আশা করি, এই বইটি পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তোমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

মণি ও মীনু—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। দীপালী গ্রন্থশালা। মূল্য এক টাকা।

অতি চমৎকার রঙ্গীন প্রচ্ছদপটে ও প্রতি পৃষ্ঠায় মনোরম চিত্রশোভিত একটি ছোটদের কবিতার বই। ছেলেমেয়েদের উপযোগী নানা রকমের কবিতা আছে। সাজ-সজ্জার তুলনায় বইটির দাম কম বলতেই হয়।

* নূতন ধাঁধা *

পূজোর ছুটিতে ভগবতী ষ্টোরস্-এর মালিক তাঁর তিন কর্ম্মচারীদের উপহার দেবার জন্য ২৪টি ছোট ছোট রঙ্গীন কাঠের বাক্স তৈরী করালেন। এর মধ্যে ৮টি নীল রং-এর বাক্স—তার প্রত্যেকের মধ্যে ৫ আনা পয়সা রাখলেন, ৮টি লাল রংএর বাক্স—তার প্রত্যেকটার মধ্যে ৩ আনা পয়সা রাখলেন আর বাকি ৮টি হলদে রংএর বাক্স—তার প্রত্যেটার মধ্যে ১ আনা পয়সা রাখলেন। মহালয়ার দিন প্রত্যেক কর্ম্মচারী ৮টি করে বাক্স পেল এবং প্রত্যেকেই সমান পয়সা পেল। এখন বল কোন্ কোন্ রংএর ক'টি বাক্স এক একজন পেয়েছিল ?

গত মাসের এবং এই মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম আগামী কার্ত্তিকের রংমশালে প্রকাশিত হবে।

আগামী কার্ত্তিকে চিঠির বাক্স নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হবে।

আগামী কার্ত্তিকের রংমশালে—

অভিনব রেডিও টেক্‌নিকে চিত্রগুপ্তের লেখা একটি
রোমাঞ্চকর কাহিণী

Stratosphere অভিযান

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর একটি হাসির গল্প

স্বপ্নরাজ্যের তৈরী **পিটার প্যানের গল্প**

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের **ইউরোপ ভ্রমণ**

রংমশালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

রংমশাল

অষ্টম বর্ষ (৭) — কার্ত্তিক ১৩৫০

STRATOSPHERE-অভিযান

চিত্রগুপ্ত

স্থান—এরোড্রোম্

(একটি এরোপ্লেন্ নামার শব্দ)

সুশান্ত

কেমন লাগ্‌ল ?

রেখা

খুব thrilling ! আমার গা মাথা এখনও টল্‌চে।

সুশান্ত

চল্ বসিগে চল্। আরে রেবাও এসেচে যে !

রেখা

খুব মেয়ে যা হোক্। তবে যে তখন বল্‌লে আস্‌বে না ?

রেবা

তখন ভেবেছিলুম আস্‌বো না। পড়বো। কিন্তু পড়্‌তে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা ধরে উ'লো। কিছুতেই ছাড়লো না। তাই ভাবলুম মাথা ধরা নিয়ে আর পড়বো কি ক'রে ? তা ছাড়া, তুই কেমন এরোপ্লেন চড়িস্ তা দেখবারও একটু সখ হোলো। বাবাও ইতিমধ্যে কোর্ট

থেকে ফির্‌লেন ব'লে গাড়ীটাও পাওয়া গেল—সটান চলে এলুম। তা তুই কেমন এরোপ্লেন চড়লি বল্।

সুশান্ত

ও ব'লে বোঝান যায় না রেবা। তুমি একদিন চ'ড়ে দেখো।

রেবা

নাঃ আমার অত সখ নেই। আরেঃ প্রফেসর সেন না? উনি হঠাৎ এরোড্রোমে? এই যে, এই দিকেই আস্‌চেন।.....নমস্কার মিঃ সেন আপনি এখানে?

সেন

আরে, আমিও তো সেই কথাই তোমাদের জিজ্ঞেস্ করচি। আমি এসেছিলুম—কাল আমাকে এরোপ্লেনে ঢাকা যেতে হ'বে—তারই বন্দোবস্ত কর্‌তে। কিন্তু তোমরা এখানে কি করচ?

রেবা

রেখা এরোপ্লেন চড়তে এসেছিলো। এইমাত্র নাবলো।

সেন

বেশ, বেশ। তা, এ ছেলেটি?

রেখা

আমাদের মাস্তুতো ভাই সুশান্ত বোস্। সুশান্তদা, ইনি আমাদের কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর এস্, পি, সেন।

সুশান্ত

নমস্কার!

সেন

নমস্কার!

রেখা

এঁরই সঙ্গেতো আমি এরোপ্লেনে উঠেছিলুম। জানেন স্যার, সুশান্তদা একজন পাক্কা পাইলট্।

সেন

(হাসিয়া) হ্যাঁ? শেষে সুশান্ত বোস কিনা দুর্দ্দান্ত পাইলট? বেশ, বেশ। বাঙ্গালীর ছেলে এ্যাভিয়েসন্‌এ কৃতিত্ব দেখালে আমার বড় আনন্দ হয়। (দূরে কলরব করিতে করিতে কয়েকটী ছেলে আসিতেছে শোনা গেল) ওই যে তিনটী ছেলে আসছে ওরা কারা?

সুশান্ত

আমারই বন্ধুবান্ধব। এ্যাভিয়েসন্‌এ ট্রেনিং নিচ্ছে আমার কাছে।

সেন

বড় আনন্দের কথা। বড় আনন্দের কথা।

সুশান্ত

আপনার কি ফেরবার বিশেষ তাড়া আছে? তা যদি না থাকে, তো আসুন্ না এই ফাঁকা জায়গাটায় একটু বসা যাক্। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?

সেন

না, তাড়া খুব বেশী নেই। তবে আপনাদের যদি কোন কাজ থাকে।

সুশান্ত

না, আমাদের কাজ বিশেষ কিছু নেই। ট্রেনিং এর সময় সাধারণতঃ সকাল কিনা। এবেলা এম্‌নি আমরা সবাই এখানে জড়ো হই। গল্প গুজব চা টা খাওয়া হয়।

সেন

তা হ'লে আর আপত্তি কি?

সুশান্ত

তবে খানকতক চেয়ার দিতে বলি। ওদেরও ডাকি—ওরা নতুন লোক দেখে দূরেই দাঁড়িয়ে গেছে।.....ওহে তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে কেন? এদিকে এসো না, ইনি প্রফেসর সেন। এঁরা আমার বন্ধু, ইনি বিমল, ইনি অনিল, আর ইনি মন্মথ।

বিমল, অনিল, মন্মথ

নমস্কার!

সুশান্ত

আর এঁরা আমার মাস্তুতো বোন্—ইনি কুমারী রেবা মিত্র, আর ইনি কুমারী রেখা মিত্র।

(সকলের নমস্কার বিনিময়)

সেন

তা আপনারা কি যেন একটা আলোচনা করছিলেন—আমরা আপনাদের ডেকে তাতে বাধা দিলুম।

বিমল

না। আলোচনা বিশেষ কিছু নয়, প্রোঃ পিকার্ডির Stratosphere-যাত্রার কথা হচ্ছিল।

সেন

হ্যাঁ আজকের কাগজেই দেখছিলুম। আপনি পড়েছেন নাকি সুশান্ত বাবু?

সুশান্ত

দেখিচি বটে। তা দেখুন স্যার, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি আর আমাদের আপনি ব'লে লজ্জা দেবেন না।

বিমল, অনিল, মন্মথ

আমরাও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। আপনি আমাদের 'তুমি' বল্‌লে আমারে ভালো।

সেন

তা, বেশ, বেশ, তাই হবে।

রেখা

কি খবর বেরিয়েছে সুশান্ত দা? আমি কাগজ পড়িনি।

অনিল

এই যে, আমার কাছে কাগজ আছে দেখুন না?

সুশান্ত

তুমিই পড়ে শুনিয়ে দাও না, অনিল।

অনিল (কাগজের খসখস্ শব্দ।

এই যে—

"আবার stratosphere যাত্রার উদ্যোগ! প্রফেসর পিকার্ডের অসম সাহসিক পরিকল্পনা! ভূপৃষ্ঠ হইতে কুড়ি মাইল উর্দ্ধে উঠিবার সংকল্প! রয়টার, ৩১শে জুলাই। প্রকাশ, যে বিখ্যাত বেল্‌জিয়ান্ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর পিকার্ড স্বীয় তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে একটী বেলুন প্রস্তুত করাইতেছেন। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ লইয়া প্রফেসর পিকার্ড্ উর্দ্ধতন লঘু বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে এই বেলুনে করিয়া শীঘ্রই আবার Stratosphere যাত্রার সংকল্প করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে এবার তিনি ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ কুড়ি মাইল উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইবেন। আর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই তিনি তাঁহার এই নব-নির্ম্মিত বেলুনে করিয়া এই নূতন অভিযান সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

রেখা

ঠিক বুঝলুম না। Stratosphere এর ব্যাপারটা কি? আপনি একটু বুঝিয়ে দিন না প্রফেসর সেন।

সেন

আবার এখানেও লেক্‌চার দিতে হবে?

সকলে

Please, আপনি ভাল ক'রে বলুন এবিষয়ে। আমাদেরও আপনার মুখ থেকে শুনতে খুব ভালো লাগবে।

সেন

বেশ, তোমাদের সকলেরই যখন এত আগ্রহ তখন বলি শোনো। আমাদের এই পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে আছে বাতাস। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে এই বাতাস ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো মাইল ওপরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই বাতাস পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগে যত ঘন—বেশী উপরে আর তত ঘন নেই। পৃথিবী থেকে যত উপরে উঠেছে, বাতাস ততই হাল্কা হয়ে গেছে। মাটী থেকে সাড়ে তিন মাইল উঁচুর মধ্যে যতটা বাতাস আছে, সাড়ে তিন মাইলের পর থেকে বাকী চারশো সাড়ে ছিয়ানব্বই মাইলের মধ্যে ঠিক ততটুকু পরিমাণ বাতাস আছে। এই থেকেই বোঝা যাবে বাতাস যতই উঁচুতে উঠেছে ততই সে কি পরিমাণ হাল্কা হ'য়ে গেছে। যাই হোক, এই বাতাস প্রধানতঃ দুটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম বা নীচের স্তরটী—যেটীর সঙ্গেই প্রধানতঃ আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সেটীর নাম troposphere। এই স্তরে সব রকমের ঝড় ও মেঘের দেখা মেলে। আর দ্বিতীয় বা ওপরের স্তরটি যেটীর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি—সেটীর নাম হচ্ছে Stratosphere—এই Stratosphere বিরাট স্থান ব্যাপী শান্ত বাতাসে পূর্ণ। এই Stratosphereএরই খানিকটা অংশে—ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৪ মাইল ওপর পর্য্যন্ত প্রোঃ পিকার্ড ইতিপূর্ব্বে বেড়িয়ে এসেছেন। তাও তিনি সহজে যেতে পারেন নি। এর জন্যে আলাদা কাঁচের জান্‌লাওয়ালা ধাতুর তৈরী প্রকাণ্ড বেলুন তৈরী করিয়ে তার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে এবং নিঃশ্বাস নেবার জন্যে অক্সিজেন প্রভৃতি নিয়ে তবে তিনি যেতে পেরেছিলেন। তাতেও তাঁকে কষ্ট বড় কম পেতে হয়েছে মনে করো না!

রেখা

আচ্ছা, Stratosphereএ যাবার জন্য এইসব লোকদের এত আগ্রহ কেন?

সুশান্ত

এটা আর বুঝ্‌ছো না? Adventureএর প্রতি আবহমান কাল থেকে মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণই এর কারণ!

সেন

হ্যাঁ, সুশান্ত যা বলেচে, প্রত্যক্ষভাবে কারণটা তাই বটে। কিন্তু এ ছাড়াও কথা আছে, শুধু একটা উত্তেজনার মোহ এবং সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থ এই সব দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতার বহুবিধ কল্যান সাধন অনেকাংশে এইসব দুঃসাহসিক অভিযানের মুখাপেক্ষা করে।

রেখা

সেটা কি রকম? আর একটু পরিস্কার ক'রে খুলে বলুন।

সেন

চেষ্টা কর্‌চি। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর কর্‌চে এই Stratosphere বা ওপরের স্তরের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয় তথ্যগুলির ওপর। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দরকার হ'য়ে পড়েচে এই Stratosphereকে চেনবার। ইতিমধ্যে দূর থেকে যন্ত্রপাতি এবং হিসাব নিকাশের সাহায্যে Stratosphere সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, বৈজ্ঞানিকরা তা করেচেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দাবীর কোন দিনই সীমা থাকে না। তাঁরা এইটুকু জ্ঞানার্জ্জনেই সন্তুষ্ট নন। Stratosphere সম্বন্ধে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁরা চান। এবং সে পরিচয় লাভ করতে হ'লে দূরে বসে কাজ হয় না। Stratosphereএর মধ্যে গিয়ে পরিচয় সংগ্রহ করে আস্‌তে হয়। সুতরাং দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের এইসব প্রচেষ্টার পেছনে তাঁদের পরোক্ষ ত বটেই বহুস্থলেই প্রত্যক্ষ অনুমোদনও থাকে। তা নইলে প্রফেসর পিকার্ড প্রমুখ বিজ্ঞ লোকেরা নিছক গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে বাহাদুরী পাবার লোভেই এসব ব্যাপারে অগ্রসর হতেন না। আজ পৃথিবীতে যেসব সুবিধে আমরা ভোগ কর্‌চি তার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকে কতনা কষ্ট করেছে, তবে না আমরা তা পেয়েছি।···আচ্ছা, এখন তাহ'লে আমি উঠি। সাড়ে সাতটার সময় আমার আবার একটা engagement আছে।

রেখা

নমস্কার। আপনাকে বকিয়ে কষ্ট দিলুম বটে কিন্তু অনেক কিছু শিখ্‌লুম।

সেন

(হাসিয়া) এতে আর কষ্ট কি? আচ্ছা!

সুশান্ত

কিন্তু চা খেয়ে যাবেন না?

সেন

না, ধন্যবাদ। চা খেয়েই বেরিয়ে ছিলুম। এখন আর খাব না।

সুশান্ত, বিমল, প্রভৃতি ও সেন

নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার!

[আগামী বারে সমাপ্য

গল্প

শীল্‌ড্‌-গাইড

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

তখনও সন্ধ্যা হ'তে কিছু দেরি ছিল। সমস্ত গড়ের মাঠটা হন্‌হন্‌ ক'রে পার হ'য়ে এসে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উত্তর দিক্‌কার রাস্তার একটা বেঞ্চের ওপর, জয়ন্ত ধপ্‌ করে বসে পড়ল। বেচারা আজ মোহনবাগান—ম্যাহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা দেখতে গিয়েছিল,—অনেক আশা ক'রে। দুপুর দেড়টা থেকে বেলা চারটে পঁয়তাল্লিশ্‌ পর্য্যন্ত। সেই চড়্‌চড়ে রোদ্‌ মাথায় ক'রে সে-ও ঠায়ে ধর্ণা দিয়েছিল, পাঁচ আনার লাইনের মধ্যে ঢুকে। কিন্তু টিকিটঘরের নাকের কাছে গিয়েও তাকে ফিরে আসতে হ'ল! টিকিট পাওয়া গেল না।

শুধু তাই নয়! পাঁচ আনার খদ্দের হ'লেও তার কোঁচার খুঁটে তখনও একটা টাকা লুকোন ছিল। টাকাটা তার মা সেইদিনই তাকে দিয়েছিলেন, তার আগামী জন্মদিনে, খুচ্‌রো আধ্‌লা-পয়সা ক'রে গরীব-দুঃখীদের দান করবার জন্যে! সেই টাকাটা সম্বল করেই,—যদি দশ আনা বা এক টাকা চার আনার টিকিট পাওয়া যায়,—এই আশায় সে দৌড়তে আরম্ভ ক'রে! কিন্তু তাতেও বিধাতা বাদ সাধলেন। মাঝপথ থেকেই তাকে সার্জ্জেণ্টের চাবুক্‌ আর ঘোড়ার গায়ের লাথি খেয়ে, গা-ময় গোবর মেখে ফিরে আসতে হ'ল।

কিন্তু এর পরও সে আশা ছাড়েনি! বরং জন্মদিনের টাকাটায় জন্যে মা'র কাছ আর বকুনি খেতে হ'বে না ভেবে, অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে সে বেড়ার ধারে গিয়ে খেলা দেখবার মৎলব করেছিল গুঁতোগুঁতি ক'রে। কিন্তু হঠাৎ চোখাচোখী হ'য়ে গেল প্রবীরের সঙ্গে। সে তখন তার গো-ময় চিত্রিত, ধূলি-ধূসরিত চেহারাটির দিকে চেয়ে, নাকে হাত বুলোতে বুলোতে ফিক্‌ ফিক্‌ ক'রে হাসছিল।

প্রবীর তাদের ক্লাসের,—যাকে বলে একেবারে লাষ্ট বয়—তাই। অসীম তার গুণ। এবং সেইজন্যে প্রায়ই তাকে গাধার টুপী মাথায় দিয়ে হলের মাঝখানে হাঁটুগেড়ে বসে থাকতে হয়। কিন্তু তার হাসি,—বিশেষতঃ ওই প্রবণের নাক্‌ চুলকোনো, ফিক্‌ ফিকে হাসি,—সে আরও মারাত্মক!

তাকে দেখেই,—সে যে তার প্রহার খাওয়ার ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে, এ কথা বুঝতে পেরেই, মুখ্‌খানা বাঁচার পাঁচের মতো করে জয়ন্ত মাঠের রাস্তা ধ'রে! লজ্জায়, ঘৃণায়, তার মনের অবস্থা তখন এমন হ'য়ে গিয়েছিল যে, টাম্‌মিনাসে গিয়ে তাকে যে বাড়ী যাবার জন্যে কালীঘাটের ট্রাম ধ'রতে হ'বে, সে কথা তার একেবারেই মনে ছিল না। গোঁ ভরে হন্‌হন্‌ ক'রে সমস্ত মাঠটা পার হ'য়ে এসে সে একেবারে ধপ্‌ করে সেই বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল।

"খোকা যে একেবারে রেলে-মেগে বেঞ্চ্‌ কাঁপিয়ে বসে পড়লে দেখছি! ব্যাপার কী? মোহনবাগান হারছে বুঝি?" বেঞ্চের ওধারে যে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন জয়ন্ত প্রথমে তা লক্ষ্য করেনি। করলে বোধহয় সে অমন সজোরে বসত না। কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শুনে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ল। খেলা যে সে দেখতে পায়নি তার জন্যে তখন আর তার মনে কোন দুঃখ ছিল না। বরং সে যে ইচ্ছে করলে তার জন্মদিনের টাকাটার ওপর তার নিজের জমানো আরও পাঁচ আনা পয়সা গরীব দুঃখীদের দান ক'রে, মায়ের নিকট থেকে

বাহবা নিতে পারে,—এই চিন্তাতেই ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্ছিল। কিন্তু তাই বলে যার তার মুখ থেকে কি মোহনবাগানের নিন্দে সহ্য করা যায়? না হয় তারা প্রত্যেকবারই হারে! কিন্তু তাই বলে,···

চড়াৎ করে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠল: না জেনে শুনে খব্···কথ্খোন অমন কথা বল্···ই'য়ে···বলা কি উচিৎ?"

অত্যন্ত চটে গিয়ে জয়ন্ত চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল: খবরদার অমন কথা বলবেন না বলছি।—কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'ল লোকটি প্রায় তার দাদুর মতোই বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর একেবারে উদারায় নামিয়ে এনে "খবরদারের" জায়গায় "কথখোন" এবং "বলবেন না বলছি"র জায়গায় মৃদুস্বরে "বলা কি উচিৎ?"—বলে মুখ চোখ লাল ক'রে সে থেমে গেল।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চোখদুটি ছ্যানাবড়ার মতো ক'রে জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। এবার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন: "আসল মোহনবাগানের খেলা দেখেছ কখনও? যখন মানুষ বল খেলত?"

জয়ন্ত ভড়কে গেল। মোহনবাগানের আবার আসল-নকল আছে নাকি?—বিমূঢ়ভাবে সে বলল: "মানুষে বল্ খেলতো? সে তখনও ভাবছিল,—আজকাল ভূতে বল খেলে নাকি? ভদ্রলোকটি এবার জয়ন্তর পাশে একটু ঘেঁষে বসে বললেন:" হ্যাঁ-হে হ্যাঁ, যখন শিবে বিজে গোল দিত? বল্ শুদ্ধ, গোলপোষ্ট শুদ্ধ, এমন কি গোলকীপার শুদ্ধ গড়িয়ে নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেত? দেখেছ সে খেলা?" ভদ্রলোক হঠাৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে থেমে গেলেন।

জয়ন্ত চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক তখন সামলে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন: "তুমি আর দেখবে কি করে? তুমি তো তখন জন্মাও নি! তোমার বাবাই হয়তো তখন নয় হামাগুড়ি দিতে শিখেছেন! কিন্তু আমরা সে সব খেলা দেখেছি বুঝলে? তখনকার খেলোয়াড়রা মাঠে নেমে বল্ সামলাত! আর এখনকার এঁরা? চুল সামলাতেই হিম্সিম্ খেয়ে যায় তো-বল!"

জয়ন্ত অবাক হ'য়ে বক্তৃতা শুনছিল। সে বয়সে বালক হ'লেও ভীষণ খেলা দেখিয়ে। বহু লোক অনেকের নিকট থেকেই সে সেকেলে ও একেলে খেলার আইন্-কানুন্ সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা শুনেছিল তাই বলল: "তাঁরা তো সব এলোপাথাড়ী খেল্তেন্! আজকালকার সাইন্টিফিক্ গেম্···" বাধা পড়ল ভদ্রলোক "হোয়াট" বলে একটা চীৎকার করেই ছিট্কে প্রায় হাত-খানেক সরে গেলেন। কিন্তু তক্ষুনি আবার সরে এসে বললেন:" আচ্ছা বেশ,—তা-ই না হয় হ'ল। কিন্তু গোষ্ঠ পাল, বলাই চাটুজ্জে, এরা তো আর এলোপাথাড়ী খেলত না? এদের খেলা ছিল যেমন 'সাইন্টিফিক্',—শরীরও ছিল তেমনি 'জাইগ্যানটিক্' বুক তো বুক,—গোষ্ঠ পালের ভুঁড়ীর বহর কত জান? প্রায় চার ফুট্—খাঁটি তেতাল্লিশ ইঞ্চি···"

—"কিন্তু ভুঁড়ী থাকলে তো ছোটা যায় না!"

—"ছোটবার দরকার কি বাপু? স্রেফ্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেল্লেই তো হয়!

"সেকি? ড্রিব্লিং, পাশিং,—এ সব না হ'লে সাইন্টিফিক্ গেমের···"

"আবার সাইন্টিফিক্ গেম্? দুত্তোর"···

ভদ্রলোক সক্রোধে উঠে উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এই সময়ে প্রকাণ্ড একটা মোটর গাড়ী এসে তাদের সামনে "ক্যাঁচ" ক'রে থামল।

গাড়ীর মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে কিলবিল্ করছিল। তারা সব টপাটপ্ লাফ্ মেরে গাড়ী থেকে নেমে

পড়ে সেই বৃদ্ধকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলতে লাগল: "মোহনবাগান জিতেছে দাদু···সত্যি বলছি··· বৃদ্ধ তাদেরকে দু'হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললেন: "যাঃ যাঃ, মোহনবাগান জিতেছে না হাতী! তোদের আমি চিনি না? আমার কাছে রোজ্ রোজ্ মিথ্যেকথা? দাঁড়া আজ তোদের বাবাকে বলে···"

যে যুবকটি গাড়ী চালিয়ে এসেছিল, সে এইবার গাড়ীর মেসিন্ বন্ধ ক'রে, বৃদ্ধর নিকটে এসে বলল: "আমি বলছি বিশ্বাস ক'রো দাদু—মোহনবাগান জিতেছে।"

প্রাণের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে বৃদ্ধ এবার যেন চীৎকার করে উঠ্লেন: মোহনবাগান জিতেছে,—সত্যি বলছিস্?"

—"সত্যি বলছি দাদু,—এবার বাড়ি চল?

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, কিন্তু তার আগে মার্কেটে চল। মোহনবাগান জিতেছে, কিছু না কিনলে চলে?

এই বলতে বলতে আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে, নাতি-নাত্নিদের কাঁধে হাত দিয়ে বৃদ্ধ গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। মাঠের সর্ব্বত্র ধোঁয়ার মতো কী যেন একটা ছড়িয়ে পড়ে আবছা অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত ক'রে তোলবার চেষ্টা করছিল। জয়ন্ত তখন বাড়ী যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে পাশ থেকে কে যেন করুণস্বরে বলে উঠ্ল: "শুনছেন···"

জয়ন্ত চমকে উঠল। ছেলেটি কখন যে চুপিচুপি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা সে মোটেই বুঝতে পারেনি।

"আমি বড় বিপদে পড়েছি, যদি একটু সাহায্য করেন···"

জয়ন্ত বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। সন্ধ্যের পর সে কখনও বাড়ীর বাইরে থাকে না। আজ শুধু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির জন্যেই তার এত দেরি হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিলম্ব দেখে মা তার নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন,—এ কথা বুঝতে পেরেও সে সেই ছেলেটির কথা শোনবার জন্যে আবার সেই বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

ছেলেটি কিন্তু প্রথমেই তাকে বাগিয়ে ফেলেছিল। জয়ন্তর যা বয়স, তাতে এ পর্য্যন্ত কেউ কখনও তাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেনি! আজ জীবনে প্রথম,—তার চেয়ে বয়সে বড় একজন ছেলে তাকে "আপনি" বলে কথা কইল। এমন একজনকে কি সে তাচ্ছিল্য ক'রে চলে যেতে পারে? মা না হয় একদিন একটু ভাববেনই। ছেলেটি বলল: আমার দাদার সঙ্গে মোহনবাগানের 'ম্যাচ্' দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু মাঠে ঢোকবার ঠিক পূর্ব্বেই দাদাকে হারিয়ে ফেলেছি···

—"হারিয়ে ফেলেছি,—মানে?"

—"মানে, আমি একখানা আই-এফ্-এ শীল্ড্ গাইড্ পড়তে পড়তে দাদার পেছন পেছন লাইন ধরে যাচ্ছিলাম। হটাৎ গেটের কাছে গিয়ে দেখলাম,—দাদা নেই। সেই থেকে দাদাকে কত খুঁজলাম,—পেলাম না। অথচ পয়সা-কড়ি সবই তাঁর কাছে। আমি এখন বাড়ী যাব কী ক'রে? আপনি যদি"···বলতে বলতে ছেলেটির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল।

এদিকে সাহায্যের কথা শুনেই জয়ন্ত ছেলেটিকে একটা বদমাইস্-জোচ্চোর ভেবেছিল। এমন অনেক চোর-জোচ্চোরের কথা সে তার বাবার কাছ্ থেকে শুনেছিল। কিন্তু পরে, সেই অবস্থা অন্ধকারের মধ্যেই

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পোষাক্-পরিচ্ছদ লক্ষ্য ক'রে সে যখন দেখল যে ছেলেটির জামা-কাপড় ভদ্রলোকের মতো,—বেশ্ ফর্সা, তখন আর তাকে অবিশ্বাস করতে পারল না। বলল: "আপনার বাড়ী কোথায়?"

চোখের জল মুছে ছেলেটি বল: "বর্দ্ধমানে। আমার দেরি দেখে মা হয়তো কত ভাবছেন! আপনি যদি দয়া ক'রে আমার গাড়ী ভাড়াটা এখন দেন্, তাহলে কালই আমি মনি-অর্ডার ক'রে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

জয়ন্ত এবার তার বাবার মতো মুখের ওপর একটা গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে তুলে বলল: "হুঁ—কত আপনার গাড়ী ভাড়া?"

ছেলেটি তখন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে, হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল: "বেশী নয়। টাকা দেড়েক্ হ'লেই আমার বাস্ ভাড়া, ট্রেণ ভাড়া সব কুলিয়ে যাবে। —দেবেন?"

ছেলেটার অবস্থা কল্পনা ক'রে জয়ন্তর প্রাণ তখন আকুল হ'য়ে উঠেছিল। তার মা তাকে বলেছিলেন টাকাটা ভাঙিয়ে গরীব-দুঃখীদের দিতে। কিন্তু কালীঘাটের ভিখারীদের তো সে চেনে! তাদেরকে কিছু দেওয়ার চাইতে সত্যিকারের অসহায় এই ছেলেটিকে সাহায্য করা ঢের ভাল কাজ! তাছাড়া টাকাটা তো সে আর একেবারে দিয়ে দিচ্ছে না! কালই যখন আবার ফিরে পাচ্ছে তখন ফাঁকতালে এমন একটা "পুণ্যি" ক'রে নিতে দোষ কী? কোঁচার খুঁট্ থেকে টাকাটা বার করতে করতে জয়ন্ত বলল: "আপনি বুঝি শীল্ড্-গাইড্ কেনেন? প্লেয়ার্সদের অনেক ছবি আছে ও'তে না? দিন্ না একটু দেখি?

—"য়্যাঁ?"

জয়ন্ত আবার বলল: "চলুন না ওই গ্যাসের তলায়,—একটু ছবি দেখি।"

—শীল্ড্-গাইড্?"

ছেলেটি ব্যস্ত হ'য়ে তার এ পকেট্ ও পকেট্ খুঁজল। তারপর একটা ঢোক গিলে বলল: তাইতে হারিয়ে গেল নাকি?"

ছেলেটির ভাবভঙ্গি দেখে জয়ন্ত কোঁচার খুঁট্ খোলা বন্ধ করেছিল। এইবার বলল: বুঝেছি। সরে পড় দেখি এবার? না হ'লে এক্ষুনি পুলিস্ ডাকব।"

জয়ন্তর কঠোর কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেটি আর কথাটি কইল না; ধীরে ধীরে রাস্তায় নামল। এদিকে জয়ন্ত মনে মনে: হুঁ হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকী—বলে যেমন বেঞ্চের ওপর হেলে পড়ে হাসতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে পা লেগে কী যেন একটা খড়্ খড়্ ক'রে উঠ্ল।

চমকে উঠে সে পায়ের কাছে হাত দিল। উঠে এল একখানা শীল্ড্-গাইড্। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্ল। —"শুনছেন,—শুনছেন্, ও মশাই···"

জয়ন্তর মনের অবস্থা তখন কল্পনাতীত। না জেনে-শুনে একটি সত্যিকার অসহায় ছেলেকে সে জোচ্চোর ভেবেছে! তাকে অপমান করেছে! কেমন করে সে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে? তার গায়ে কাঁটা দিল, কপাল ঘেমে উঠল; গলা শুখিয়ে গেল।

সেই ছেলেটি তখনও বেশীদূর যায়নি। ডাক শুনে নিকটে আসতেই জয়ন্ত তার হাতে গাইড্খানা আর এক টাকা পাঁচ আনা পয়সা এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল: "আর আমার কাছে কিছু নেই।"

—"ওঃ, কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!"

এই পর্যন্ত বলেই এক হাতে গাইড্খানা ও অপর হাতে এক টাকা পাঁচ আনা পয়সা মুঠো ক'রে ধরে ছেলেটি উর্দ্ধশ্বাসে বড় রাস্তার দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল।

দেখতে দেখতে ছেলেটি রাস্তার জনতার মাঝখানে মিশে গেল। জয়ন্ত তখন তার বিলীয়মান মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত মনে আবার বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল। একজন অসহায়কে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা ক'রে সে এত বেশী উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল যে, ছেলেটি টাকা ফেরৎ দেবার জন্যে যে তার বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে নিল না। সে কথাটা পর্য্যন্ত তার মনে পড়ল না। এমন কি যখন তার মনে হ'ল, তার কাছে আর একটা পয়সাও নেই,—এই রাত্রিতে তাকে হেঁটে বাড়ী ফিরতে হ'বে, তখনও সে ভয় পেল না। যে সৎকাজ আজ সে করেছে, তার জন্যে বাড়ী ফিরতে তার যত রাত্ই হোক না কেন, বাবা-মা যে তাকে কখ্খোন বক্বেন না, এ বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ী যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এক পা অগ্রসর হ'তে না হ'তেই, একটা মোটর গাড়ী থামাবার আওয়াজ শুনে তাকে আবার থামতে হ'ল। সে সবিস্ময়ে ফিরে দেখল সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সদলবলে গাড়ী থেকে নেমে, তার সেই সদ্য পরিত্যক্ত বেঞ্চটার আশে পাশে কী যেন খুঁজতে আরম্ভ করেছেন।

ছেলে-মেয়েরা ঠিক পূর্ব্বের মতোই কলরব করছিল। তার মধ্য থেকে বৃদ্ধর বড় নাতিটি বলল: "কেন মিছে কষ্ট করছ দাদু? চল আর একটা কিনে নি গে।"

দাদু তখন বেঞ্চের তলায় ঢুকেছিলেন। সেখান থেকেই সক্রোধে উত্তর দিলেন: "তুই থাম্। জানিস্ তাতে আমার কত দরকারি "রিমার্ক" লেখা আছে?"

ব্যাপার কিছু বুঝ্তে না পেরে জয়ন্ত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: "আপনাদের কিছু হারিয়েছে নাকি?"

—"হ্যাঁ, একটা আই-এফ্-এ শীল্ড্-গাইড্···"

"শীল্ড্-গাইড্"— জয়ন্ত যেন একটা নিদারুণ আঘাত পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্ল।

বৃদ্ধ তখন বেঞ্চের তলা থেকে বেরিয়ে এসে, তার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: "কি হ'য়েছে?"

জয়ন্তর তখন চোখে জল, কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ। তবুও সে একে একে তাঁকে সব কথা বলল।

শুনে বৃদ্ধ অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন: "চল দাদা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দি।

কবিতা

মধুমালা (রূপকথা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গহীন রাতি চাঁদের বাতি
নিবু নিবু প্রায়
ঘুম পরী আর স্বপন পরী
আকাশ পথে ধায়॥
মাথায় তাদের তারার কিরণ
মেঘ বরণের চুল
পারিজাতের হার যে গলায়
কুন্দ ফুলের দুল॥
হাওয়ায় মেলা হাওয়ার পাখা
হাওয়ার সাড়ী গায়
ঝুম্‌কো লতার পাড়ের বাহার
আশমানী রঙ তায়॥
সহর নদী বাস বেসাতি
কত নগর গ্রাম
যায় যে ছেড়ে কোন্ সুদূরে
কেই বা জানে নাম॥
তেপান্তরের মাঠের শেষে
ময়নামতীর পারে
ঘুম সে দেখে চাঁদের আলো
শ্যামল বনের ধারে॥
ঘুম বলে শোন্ ও বোন্ স্বপন
একি দেখি আজ
চাঁদ সে কোথায় ধরায় লুটায়
কিসে পেল' লাজ॥

তখন ধীরে কয় যে তারে
সেই যে স্বপন পরী
নয়ক'রে চাঁদ রাজার কুমার
দেখিয়ে দিতে পারি॥
আস্‌লো নেমে দুই বোনেতে
গুটিয়ে রঙীন পাখা
দেখল' কুমার রূপ যেন তার
ইন্দ্রধনু আঁকা॥
বল্‌ল হেসে স্বপন পরী
ঘুম পরীরে তার
নয়তো রে চাঁদ চাঁদ ধরা ফাঁদ
এ মদন কুমার॥
ঘুম্ বলে বোন্ বলি রে শোন
বাম হ'ল হায় বিধি
গড়ল না আর জোড়া ইহার
রচল' এমন নিধি॥
স্বপন বলে আছে বহিন
এই ফুলেরি মালা
এ যে দেখিস্ একটী মণি
সে মাণিকের ডালা॥
সোনার পুরের রাজকুমারী
মধুমালা নাম
সাত সাগরের পারে আছে
সোনায় রচা ধাম॥

দুই বোনেতে যুক্তি করে
পালঙ্ক যে ধরে
পৌছালো সে মদনকুমার
মধুমালার ঘরে।
সোনার দাঁড়ে শুক ও সারী
কনক প্রদীপ জ্বালা
সোনার খাটে সুখে ঘুমায়
কন্যা মধুমালা॥
মাথায় শোভে মোতির সিঁথি
মাণিক জ্বলে তায়
গলায় হীরার সাতনরী হার
সোনার নূপুর পায়॥
অমল ধবল কপোল তলে
দুল্‌ছে হীরার দুল
রঙিন্ তাহার ওষ্ঠ অধর
ঠিক সে ডালিম ফুল॥
মৃণাল বাহু পরশ পেয়ে
জড়িয়ে আছে তার
কাঁকন কেয়ুর বাজুবন্দ
কতই অলঙ্কার॥
দুক পরীতে দেখছে দোঁহে
মিটিয়ে মন সাধ
একই সাথে ভোরের রবি
পূর্ণিমারই চাঁদ॥
স্বপন পরী দিল বাতাস
ফুলের পাখা পেয়ে
নিদ্ টুটে যায় চোখ মেলে চায়
প্রথম রাজার মেয়ে॥
চমকে উঠে বস্‌ল খাটে
মধুমালা তার
নূপুরেরি শব্দে জাগে
মদনকুমার॥
কন্যা বলে কে গো তুমি
কোথায় তোমার বাসা
কুমার বলে রাজার ছেলে
শীকার কোরতে আসা॥
বনের কোলে গাছের তলে
ঘুমিয়েছিলাম মাঝে
স্বপনপুরের রাণীর কাছে
তলব কিসের কাজে॥
কন্যা বলে এই তো রাণী
নয়ক' স্বপনপুরী
আমি শুধু মধুমালা
রাজার কুমারী॥
বস্‌ল এসে রূপকুমার
রূপকুমারী পাশে
চকোর যেন চাঁদের পাশে
রূপ সুধা পিয়াসে॥
বদল হ'ল আংটী চাদর
বদল হ'ল মালা
মদনকুমার রূপ-সায়রে
ভাসল' মধুমালা॥
শুক সারী ঐ সোনার দাঁড়ে
দিচ্ছে হুলুধ্বনি
ঘুমপরী আর স্বপনপরী
করছে কানাকানি॥
শুকতারা সে সাক্ষী হ'ল
সেই সে মিলন ক্ষণে
তন্দ্রালসে আবেশ আসে
মধুর আলাপনে॥

ব্যাপারটা ভালো লাগ্‌লোনা প্রদীপের। এর আগেও ত ও মূর্ত্তিটা অসংখ্যবার দেখেছে, কখনো তার চোখ নড়তে দেখেনি। চোখ ত ছিলই না, তার তারা কোথায়? সবটা ত ফাঁকা।

মাছে মাঝে ওরও মনে হয়েছে পিছন দিক্ দিয়ে ভিতরে ঢুক্‌তে। ডালাটা আর সমস্ত মূর্ত্তিটা এত অসম্ভব ভারী যে নাড়াচাড়া করতে সাহস হয়নি। তাছাড়া মূর্ত্তির মাথা পর্য্যন্ত ও পৌঁছত না, অন্ততঃ সাড়ে পাঁচফুট লম্বা লোক হওয়া চাই।

খবরটা দাদুকে দেবে কিনা ভাব্‌ছিল। কিন্তু দাদু যা গম্ভীর। আর আজ ত সন্ধ্যা থেকে আকাশের তারা দেখ্‌ছেন তিনি। ছায়াপথ নিয়ে নাকি একটা প্রবন্ধ লিখ্‌বেন কাকে বলছিলেন। মাষ্টারমশাই কিম্বা পার্ব্বতীকেও কিছু বলা কি উচিত নয়? ভৌতিক ব্যাপারও ত হ'তে পারে? ভূতটা যদি চটে যায়? কাজ নেই রাত্রের অন্ধকারে কোনো কিছু করে। সকালবেলার আলোতে দেখে না হয় যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। খাওয়াদাওয়া সেরে সে শুতে গেল। একলাঘরে তার শোয়া। অন্যদিন ভয় করে না, আজ করছে। বাইরে দালানেই পার্ব্বতী শোয়। তবুও।

দরজার খিলটা আর ছিট্‌কিনীটা সে ভালো ক'রে বন্ধ করলো। মাথার দিকের জানলাটা খোলা রইলো, তার আবার গরাদে নেই। ওদিক্ থেকে কেউ আস্‌তে পারবে না। শুধু তারার আলো সেদিন পৃথিবীতে এসে পড়ছিলো, অন্ধকার পৃথিবীতে। ঘুমন্ত গাছগুলিতে অসংখ্য জোনাকী জ্বলছিল। যেন পাতায় পাতায় মুকুলে মুকুলে আলো, ঝিক্‌মিক্ ঝিক!

এগারোটা বাজ্‌লো, বারোটা বাজ্‌লো, প্রদীপ জেগে জেগে শুন্‌লে।

একটার ঘণ্টাও ঢং ক'রে বেজে গেল। তখনো তার ঘুম আস্‌ছে না। যদিও বা একটু আস্‌ছে, কোথাও কিছু খুট্ ক'রে শব্দ শুনে চট্ করে ভেঙে যাচ্ছে।

এবারে আওয়াজটা স্পষ্ট, দরজায় মিহি যন্ত্র চালাবার মতন যেন। ওপরের ছিট্‌কিনীটা যেন নেমে পড়লো। খিল্‌টা আস্তে আস্তে কে যেন তোল্‌বার চেষ্টা করছে।

পাশবালিশটাকে চাদর ঢাকা দিয়ে খাট ছেড়ে প্রদীপ নেমে পড়লো। ওধারের আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোলো। চোর কিম্বা ভূত যদি আক্রমণ করতে চায়, আগে পাশবালিশটাকে

কক্! সেখান থেকে শুনতে পেলে, খিলটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে গেল। ছায়ার মতন একটা মূর্ত্তি—দেখা যায় কি না যায়—তার খাটের দিকে এগোতে লাগ্‌লো। কি করলে সেখানে, দেখা গেল না। তারপর জান্‌লায় উঠে বাইরে পা বাড়ালে। ভূত নয়, ভূত অত স্পষ্ট হয় না, সাদা কাপড় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ততক্ষণে দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্রদীপ পার্ব্বতীকে তুলে তুলে বলেছে—চোর!

চোর? সঙ্গে সঙ্গে চীৎকারে দরোয়ান ও লোকজনেরা উঠে পড়লো। চোর—চোর—চোর বিশ্বেশ্বর উঠ্‌লেন। চোর কোথায়? চোর?

জান্‌লার ধারে এসে বিশ্বেশ্বর দেখলেন টর্চ্চ ফেলে—একটা লোক জলের কল ধ'রে সাবধানে নামছে, তার মুখে আলো ফেলে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—চিরঞ্জীলাল!

ততক্ষণে নীচে সে তৃণভূমির ওপর লাফ্ দিয়েছে, পায়ে লাগার দরুণ খানিকটা থম্‌কে গিয়ে তারপর অন্ধকারে ছুট্‌তে আরম্ভ করেছে।

দরোয়ানেরা ছুটে তাড়া করতে গিয়ে পেলে না তাকে।

ফিরে বিছানায় টর্চ্চ ফেলে বিশ্বেশ্বর চম্‌কে উঠ্‌লেন, পাশবালিশে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা সোজা!

পার্ব্বতীকে উনি বললেন—কুঞ্জলালের ছেলে চিরঞ্জীলাল আমার বংশলোপ করতে এসেছিলো। ভগবান্ রক্ষা করেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছ, এখন থেকে কত সাবধান হ'তে হবে? খুন ক'রে যেত প্রদীপকে ও নিজে বুদ্ধি ক'রে সরে না গেলে।

সাবধান হওয়া যার জন্যে, সেই শুধু বুঝতে পারলো না কেন এসব কাণ্ড? তাকে খুন করবে লোকে? কেন? সে ত কারুর কোনো ক্ষতি করেনি! খুন করা মানে ত' মেরে ফেলা? তাকে কেন মারবে? এ সম্বন্ধে বাবীর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তার বুদ্ধি একটু যেন বেশী।

সকালবেলা বাবী এসে সব কথা শুনে কেঁপে কেঁপে অস্থির।

বল্‌লে—আমারি ভুল হয়েছিল প্রদীপ, সে-ই যখন দেখ্‌লুম, কেন চেঁচিয়ে লোক জড় করলুম না! বুঝেছি, কেন তোমাকে খুন করতে এসেছিল। তোমার দাদু যে ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন,—

ধেৎ—প্রদীপ বাধা দেয়। অবিশ্বাস্য কথা কেন সে শুনবে?

না, সত্যি, আমি বাবা কাকা সকলের মুখে শুনেছি। মিথ্যে নয় এক কোঁট্টাও! ডাকাতি থেকে পরে জমিদার হয়েছেন। কুঞ্জলাল ব'লে ওঁর একটা সঙ্গী ছিল, উনি তাকে ধরিয়ে দিতে তার ফাঁসী হয়ে যায়। তারি ছেলেপুলেরা তোমায় মেরে ওঁকে শাস্তি দিতে চাইছে নিশ্চয়। তুমি ত' বল্‌ছ—দাদু বলেছেন চিরঞ্জীলাল কুঞ্জলালের ছেলে এসেছিল!

প্রদীপ প্রতিবাদ করে—উনি মেরেছেন, ওঁকে মারবে। আমায় মেরে তাদের কী লাভ?

কী লাভ, বাবীও সেটা ভালো বুঝতে পারে না। বল্‌তে পারে না। সত্যি ত' একজনের দোষে আর একজনকে মারা কেন?

শুধু বলে—তুমি বাপু একটু সাবধানে থেকো। আমার আবার ভাবনা ঢুকে গেল মাথায়। এ আবার এক জ্বালা হ'ল!

প্রদীপকে ভাল লেগেছে বাবীর।

বিশ্বেশ্বর মনে করলেন—চিরঞ্জীলালকে ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু ধরাবেন কি ক'রে? সেই ত' ফেরার। পুলিশেই ত' তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার। কি ক'রে সে এসেছিল কোথায় লুকিয়েছিল, প্রদীপের মুখে তার বিস্তৃত বিবরণ শুনে বল্‌লেন—মুখের গ্রাস ফস্‌কে গেল!

সেইদিনই প্রদীপের জান্‌লায় লোহার গরাদে বস্‌লো। চারিধারে পাহারা রইলো। ঘরের মধ্যে শুলো পার্ব্বতী। হুঁসিয়ার পার্ব্বতী।

সন্ধ্যে থেকে সমস্ত গৃহকোণ তন্ন তন্ন ক'রে দেখে সদরের কোলাপ্সিবল্ গেট্ বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। কিন্তু তবু সে রাত্রে অজানা আশঙ্কায় কারুর ঘুম হল না—না প্রদীপের, না তার দাদুর, না লোকজনের।

তার পরের রাতও এম্‌নি।

তারও পরের রাত।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—এরকম ক'রে ত শরীর খারাপ হয়ে যাবে। একটা বিহিত করা দরকার। নায়েবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির হল—কলকাতা যেতে হবে।

প্রণবও বল্‌লে—সেই ভালো। এসব ব্যাপারে কলকাতা শহর অনেকটা নিরাপদ। পল্লীগ্রামে কখন কি ঘটে বলা যায় না। হয়ত একদিন ডাকাতই পড়লো। ডাকাতরা কী না পারে? কেটেকুটে রেখে গেলেও কিছু করবার নেই।

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন—না, এ বাড়ীতে কখনো ডাকাতি হবে না, নিশ্চিন্ত থেকো। এ সর্দ্দারের কাছে যারা লাঠিধরা শেখে, তারা সব গুরুভাই। ডাকাতদেরও নীতি আছে। তবে পরের পুরুষ কী করে, বলা যায় না।

বিশ্বেশ্বরের সম্বন্ধে কানাঘুষা প্রণবও শুনেছিল। তাই হঠাৎ ব'লে বস্‌লো—যাই বলুন, ডাকাতি বড় ঘৃণ্য কাজ। যাক্ এখন তাদের বিষদাঁত ভেঙে গেছে, আগের মতন যেখানে সেখানে আর ডাকাতি হ'তে পারে না।

হ'তে পারে না বলেই দেশের কল্যাণ গেছে। একদিন বাংলা দেশে একদল ডাকাতি করত, আর একদল তাদের রুখ্‌ত, দুদলেরই গায়ে শক্তি ছিল, মনে সাহস ছিল। আজ সব

ভীরু দুর্ব্বল হয়ে গেছে। আজ যারা ডাকাত, তারাও ভীতুর একশেষ, অভাবে প'ড়ে এগিয়ে আসে, আর হাতের হাতিয়ারের জোরে কাজ সাফ্ করে। তাদের ঠেকাবার লোক ত' নেই দেশে বল্‌তে গেলে। ডাকাতের হুঙ্কার শুনেই আজ লোকে থরথর করে কাঁপে, বাধা দেবে কি? তাও সব বাঙালী ডাকাত নয়। পাঞ্জাবি, মুসলমান, পেশোয়ারী।

ও প্রসঙ্গ আর বাড়তে না দিয়ে প্রণব যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, প্রদীপ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কপালে কার ঠাণ্ডা হাত ঠেক্‌লো। চোখ মেলে দেখে, বাবী। কোমল কণ্ঠে সে বল্‌লে—তোমরা নাকি চ'লে যাচ্ছ প্রদীপ?

হ্যাঁ ভাই! আবার ত' আস্‌ব।

ম্লান হেসে বাবী বল্‌লে—কবে আস্‌বে তার কিছুই ঠিক্ নেই। তোমার সঙ্গে আর হয়ত আমার দেখা হবে না।

তুমিও আমাদের সঙ্গে চলোনা।—প্রদীপ প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো।

বাবী বল্‌লে—সে হ'লে ত বেশ হয়, কিন্তু—

দাঁড়াও দাদুকে বলি। বল্‌লে প্রদীপ উৎসাহে।

দাদু রাজী হলেন না। বল্‌লেন—না, ও পরের মেয়ে আমি নিয়ে যেতে পারবনা। ওর বাপমা ছাড়বে কেন?

হঠাৎ প্রদীপের মন কেমন ক'রে উঠ্‌লো। তার মনে হ'ল বাবী না গেলে তার বিপদ অনেক। সত্যি, ও পরের মেয়ে, তার প্রয়োজন ব'লেই ত আর যেতে পারে না! কী জোর আছে তার ওপর?

মুখ মলিন ক'রে বাবী চ'লে গেল। দেখে গেল প্রদীপের দুচোখে জল।

সে-ও বাড়ীতে গিয়ে খুব কান্না জুড়ে দিলে। সকলে বলে—কী হয়েছে?—না, প্রদীপ চ'লে যাচ্ছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছে, তোর কি? এ কথা ব'লে কোনো মীমাংসা হল না।

শেষ অবধি প্রদীপদের মোটর ওদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে বেরিয়ে গেল দেখে ও বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

ক্রমশঃ

কাহিনী

ঝড়

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

শন্-শন্-শন্—শোঁ-শোঁ-শোঁ—উ-উ-উ।

উঃ কী ভীষণ ঝড়! অনেকদিন বন্ধ থাকার পর পাগলা হাওয়া যেন হঠাৎ ছাড় পেয়ে মুক্তির আনন্দে দিশেহারা হয়ে জলে স্থলে প্রচণ্ড দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছে! আজ সে বন্ধনমুক্ত—তার প্রলয়নাচন রোধ করে কার সাধ্য?. সামনে সে যাকে পাবে তাকেই চুরমার করে দিয়ে যাবে। তার এই বিশ্বনাশী উদ্দাম নৃত্যে যোগ দিয়েছে আবার সাগরের ঢেউ। প্রভঞ্জনের বাঁশীর ডাকে তারা আর নিজেকে সামলাতে পারে নাই। ধ্বংসের অসহ্য পুলকে আত্মহারা হয়ে বার বার তারা লাফ দিয়ে আকাশকে ধরবার চেষ্টা করছে—কিন্তু প্রতিবারেই বিফল মনোরথ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর্দাম্বারল্যাণ্ডের শৈলগাত্রে—বাতাস ও সমুদ্রের এই রুদ্রলীলায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আকাশের চাঁদ দারুণ আক্রোশে অন্ধকারের আবরণে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। শুধু দূরে ক্ষুদ্র ফার্ণদ্বীপের লাইট্ হাউসের দীপশিখা কম্পিত কলেবরে তাদের এই উন্মত্ত মাতামাতি দেখছে।

এই ঝড়ের রাতে লাইটহাউসের একটি প্রকোষ্ঠে তিনটী প্রাণী নিদ্রাহীন চোখে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ কর্চ্ছে—বৃদ্ধ ডার্লিং, তার স্ত্রী ও কন্যা গ্রেস। তাদের কাছে এ দৃশ্য মোটেই নতুন নয়—তবু কেন যেন তারা আজ রাতে মোটেই ঘুমুতে পার্চ্ছে না। ভয়?—না, সমুদ্রের গর্জ্জন ও বাতাসের হুঙ্কারকে তারা একটুও ভয় করে না। এদের সঙ্গে তাদের অনেকদিনের পরিচয়। লোকালয়ের বাইরে তাদের এই একটানা নিঃসঙ্গ জীবনে এরাই মাঝে মাঝে একটু আধটু বৈচিত্র আনে। এমন রাতে উতলা বাতাস ও ক্ষিপ্ত সাগরের দ্বৈত-সঙ্গীত তাদের শ্রান্ত চোখের পাতে ঘুমপাড়ানিয়া গানের মত এনে দেয় প্রগাঢ় সুষুপ্তি। তবে আজ কেন তাদের চোখে মোটেই ঘুম নেই! একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা তাদের আজ বারবার পীড়া দিচ্ছিল। কারা যেন এই ভয়ঙ্কর রাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাণভয়ে তাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্চ্ছে! ঝড় ও সমুদ্রের গর্জ্জন ছাপিয়ে কাদের আকুল ক্রন্দন যেন মাঝে মাঝে ভেসে আসছে!

হঠাৎ গ্রেস আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা, বাবা, ঐ যে আবার আমি কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কি হবে বাবা?"

তিনজনই কিছুক্ষণ চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল।

একটু পরে ডার্লিং ব'লল, "না—ও কিছু নয়—ঝড়ের গোঙানি।"

আবার সবাই চুপ করে বসে রইল। বাইরে সমানভাবেই ঝড়ের আস্ফালন ও ঢেউয়ের আলোড়ন চলতে থাকল। মাঝে মাঝে সবাই যেন চমকে উঠে কাণ পেতে কি শোনবার চেষ্টা করে। গ্রেস উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এইভাবে রাত ক্রমেই বেড়ে চলল—তিনজনের কারুর চোখে আর ঘুম এল না।

* * * *অন্ধকার কেটে ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতেই গ্রেস দূরবীণ হাতে আলোকস্তম্ভের উপরে উঠে চারিদিক নিরীক্ষণ ক'র্ত্তে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল মাইল খানেক দূরে নিমজ্জিত শৈলশিখরে একখানা জাহাজের ভগ্নাবশেষ আঁকড়ে ধরে কয়েকজন লোক প্রাণপণ ঢেউয়ের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা কর্চ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের জল যেভাবে ফুলে উঠছে, তাতে তারা যে আর বেশীক্ষণ যুঝতে পারবে বলে মনে হয় না। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে গ্রেসের কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। এতগুলো প্রাণী তার চোখের সামনে এইভাবে ডুবে মরবে, আর তারা নিশ্চেষ্টভাবে তাই দেখবে তা হতে পারে না। সে দ্রুতবেগে নেমে এসে চীৎকার করে ব'লল, "বাবা বাবা, ঐ চোরাপাহাড়ের গায়ে জাহাজডুবি হয়ে কতকগুলো লোক ডুবে মর্চ্ছে—চলো—শিগ্‌গির করে চলো, ওদের যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে।"

ডার্লিং সমুদ্রের দিকে চেয়ে হতাশভাবে ব'লল, "কিন্তু মা, এই ভয়ানক ঝড়ে আমাদের ছোট্ট ডিঙিখানা যে ঢেউয়ের এক আঘাতেই ডুবে যাবে! ওদের বাঁচান অসম্ভব।"

ডার্লিং গিন্নি ধমকে উঠ্‌লেন, "পাগল্লামি করিস না খুকি, এই ঝড়ে ডিঙি ভাসাতে হবে না। ভগবান বেচারাদের রক্ষা করুন।"—এই বলে হাটু গেড়ে জোড়হাতে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

গ্রেস কোন কথা না তুলে জলের ধারে নেমে তাদের ছোট নৌকাখানা ভাসাতে চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌ল। "হাঁ-হাঁ—করিস কি, করিস কি" ব'লতে ব'লতে ডার্লিং ও তার স্ত্রী সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা ক'রল। গ্রেস চেঁচিয়ে ব'লল, "বেশ বাবা, তুমি যদি না যাও আমি একাই ওদের উদ্ধার করতে চল্লাম।" এই বলে সে ডিঙি জলে ভাসাল।

ডার্লিং আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল, "ওরে পাগলি ফিরে আয়—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ইচ্ছা করে পা বাড়াস নে।"

গ্রেস উত্তর ক'রল, "না বাবা, ওদের না নিয়ে আমি আর ফিরব না।"

তখন নিরুপায় হয়ে ডার্লিংও গিয়ে ঐ নৌকায় চেপে বসল। তারপর দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে ঝড় ও ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে একটু একটু করে এগোতে লাগল। কতবার মনে হচ্ছিল আর বুঝি তারা সামলাতে পার্চ্ছে না—ঐ বুঝি নৌকাখানা একেবারে তলিয়ে গেল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেটা ভেসে উঠে তাল সামলে নিল। এইভাবে অনেকখন যুঝবার পরে ডিঙিখানা গিয়ে সেই জাহাজের ভগ্নাবশেষের গায়ে ভিড়ল।—তারপর সেই হতভাগ্যদের নিয়ে তারা আবার তেমনি করে ঝড় ও ঢেউয়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে ফিরে এল।

* * * নর্দাম্বারল্যাণ্ডের উপকূলে ফার্ণদ্বীপের লাইট্ হাউস্ আজও তেম্নি দাঁড়িয়ে আছে, একজন ইংরেজ বালিকার বীরত্বের ও মহানুভবতার স্মৃতি বহন করে।

কঞ্জুষের পালা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোতলা। আপনি যে পুড়িয়ে খেলেন, জ্বালানি কাঠের পয়সা বাঁচাতে।

কঞ্জুষ। দেখচো, দেখচো—শোন বলি আজ রাতের মধ্যে একজোড়া দরজা মায় কবজা, পেরেক, কড়া, ছিকল, তালা, চাবি, হুড়কো, সিটকিনি আনতে যাও, না হলে পুলিসঘর করতে হবে। হাঁ করে থাকলে হচ্ছে না ; যাও চেষ্টা দেখ, আমি চল্লেম কাছারি।

তোতলা। বালিস বগলে কাছারি ? রেখে যান বালিসটে !

কঞ্জুষ। আহা মরি, তাইতো বলি—দশটা চারটে হয় দিব্বি আনিস্‌টে। চল্লো বালিস সঙ্গে আমার। [প্রস্থান।

তোতলা। তাকিয়া করবো ফুটো ধামার—ঘুম নষ্ট কে করে আমার।

(তোতলার গীত)

কার বা চাকরী কর রে মন,
ও তুই বা কে, তোর মানিক কে রে,
হলি কার নফর !
তোর আমদানিতে শূণ্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর্‌ ওরে ও মন,
মিছে কেন পাঁচ ভূতের
বেগার খেটে মর মনরে ও মন।

—সাধুবেশে চোর চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ—

(গীত)

এক পহর তক সব কোই জাগে,
দো পহর তক ভোগী।
তিসরা পহর চৌরা জাগে,
চার পহরা যোগী ঔর রোগী।

সাধু। বাবা ষষ্ঠীচরণ !

তোতলা। ঠাকুর, আমি ষষ্ঠীচরণ নয়, আমার নাম তোতলা।

সাধু। বেশ, বেশ, আমারই ভুল হয়েছিল। যখন তুমি আমার চেনা, তখন নিজে

নাম হল তোমার ষষ্ঠীচরণ। আর পরের ঘরে আছ যতক্ষণ, ততক্ষণ অন্নপ্রাশন নাম হল তোমার তোতলা। বেশ করে মনে রেখেছ দেখে খুসি হলেম। এসব না হলে ধরা পড়তে হয়।

(পদ্য)

চুরি বিদ্যে ভারি বিদ্যে
যদি না গেলেম ধরা,
পড়লেম ধরা, হাতে প'ল দড়া,
ঘানিতে হলেম জোড়া—
দুই পায়ে কড়া।

সাধু। বলি কাজের কতদূর ?

তোতলা। ছেঁড়া বালিস পর্য্যন্ত।

সাধু। তারপর ?

তোতলা। বালিস আলিস ভেঙে উঠে চোঁ চাঁ চম্পট দিয়েছে।

সাধু। গেল কোন বাগে ?

তোতলা। সেইটেই দেখতে যাচ্ছিলেম চক্ষু বুজে ধ্যান করে, এমন সময় মশায় এসে বাধাং দিলেন।

সাধু। অন্যায় হয়েছে। যাহোক একবার বুদ্ধির সিঁদকাটি চালিয়ে দেখি তো কোথায় গেল বালিস।

তোতলা। ধামা ধরি—

(গীত)

সিঁদ দে সিঁদ দে, চাতুরী সিদ্ধে—
কার্য্য সিদ্ধির আগেতে।
সান্ দিয়ে বুদ্ধে, ফলা কেটে সিঁদ দে।

ফলা ফলা কাচারী—রচাকা লাফ লাক—রাস্তার উপর গাড়ীর চাকার দাগ ! সেখানে লাফ দিচ্ছে কুমান গাছে, তারি গোড়ায় এক লাখ জমা আছে, তুলে নিলেই হয়।

সাধু। বস্ আর কথা না, চল—

(গীত)

সোনা রূপা রাং, দীয়তাং লীয়তাং,
যা হাতে পান তাই নিয়ে যান।

কিছু দিয়ে দান বাকি নিজে ভুজ্যতাং,
তুচ্ছ ধনে কিসের এত টান! সুতরাং—
অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং,
মায়া প্রপঞ্চং বিত্তং নিত্যং।
চিন্তয় নিশ্চয়—
দিনকয় ছাশ্রয় কুয়তাম্,
খাটিয়ায় আশ্রয় চিৎপটাং—
জপ করতাং সোনা রূপা রাং
আস্তানায় করি প্রস্থান।

(উভয়ের গীত)

পথের পাশে পাকুড় তলে
লুঙ্গীবাবা বসুন গিয়ে।
চিমটা নিয়ে আরশোলাটা
নিন গে ভেজে
সোনা-গালা গরম ঘীয়ে।
সেখানে মুদি ষষ্ঠীচরণ
কষ্টি কালো কিষ্টি বরণ
ফুলুরী ভাজুক ঠাণ্ডা জলে!

কঞ্জুষের প্রবেশ

কঞ্জুষ। একি তোতলা, তোর তো বেশ কথা ফুটছে।

তোতলা। আঁউ আঁউ আঁউ

কঞ্জুষ। হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ, ইনি বুঝি তোমার—!

তোতলা। হাঁউ আঁউ ওউ লুঙ্গিবাবা তোতলামোর ওষুধ খাইয়ে ভালো করেছেন আমাকে।

কঞ্জুষ। বাবা আমার দক্ষিণাবর্ত্ত কড়ি এককড়ি অনেকদিন হল বিবাগী হয়ে গেল, আর ফিরলো না, তার ভালো নাম ষষ্ঠীচরণ। বলতে পারো কোথা সে আছে, দেখত খড়ি পেতে একবার।

সন্ন্যাসী। আমরা খড়ি কড়ি বরগা এসবের ধার ধারিনে, সাধুপুরুষের ওসব চিন্তা করতে নেই। বাবা আসবে, ফিরে আসবে।

কঞ্জুষ। দেখ সাধুবাবা, সোনা করবার প্রেকরণটা যদি আমায় শিখিয়ে দিতে তবে আমার যথাসর্ব্বস্ব বেচে কিনে বেরিয়ে পড়তেম তোমার সঙ্গে—সাদা বাংলায় বলছি হাঁ—আর সোংসার ভাল লাগে না। পাড়ার কঞ্জুষ বলে বদনাম হয়ে গেছে, গ্রামে আর টেঁকা যায় না।

সন্ন্যাসী। সোনা করার ঝঞ্ঝাট আছে। আগে নিজের যা কিছু আছে তার উপর যক্ বসাতে হবে, তারপর—

কঞ্জুষ। যক্ পাই কোথায়?

তোতলা। আঁ আঁ আমার জানা আছে একজন—মেয়ে-লোক, বুড়ি।

সন্ন্যাসী। আমার জানা এক পুরুষ আছে, কিন্তু বুড়ো। দেখি যদি তারা এসে পড়ে তো খবর করব। কোন পথে বার হই বাবা?

কঞ্জুষ। যেপথ দিয়ে ঢুকেছেন সেই পথেই। এখানে দরজা নেই, কুলুপ নেই, খিড়কী নেই, সদর নেই—সব পথই খোলা, কেননা চুরি করার কিছু নেই এখানে এক কঞ্জুষ চক্রবর্ত্তীকে ছাড়া, সুতরাং চোর চক্রবর্ত্তী এলেও ইট পাটকেল ভিন্ন অন্য কিছু হাতাতে পারবেন না। ফুটো সিন্দুকের মতো বাড়িটা—বেরোও ঢোকো যত ইচ্ছা, যেদিক দিয়ে ইচ্ছা—নমস্কার। তোতলাকে একটু জেগে থাকার অষুধ দিয়ে দিও বাবা।

তোতলা। তালা চাবি তাহলে—কুলুপ দরোজা চৌকাট!

কঞ্জুষ। বাজে খরচের দরকার নেই সেই পয়সায় অষুধ করগা। যাও, বাবাকে আস্তানায় পৌঁছে দাও। আমি একটু বাজারে চলি। [তোতলা ও সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

হনুমান যাকে বলে! চাকার দাগ লাগিয়ে লাখ টাকার গাছে গিয়ে পড়বেন। আরে একি রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যে লাফ দিয়ে পড়বি আর তুলবি। এ হল কঞ্জুষ চক্রবর্ত্তীর টাকা হে চোর চক্রবর্ত্তী—আমার নিজেরই এক এক সময় ভুল হয়ে যায় কোথায় পুঁতেছি টাকা, থেকে থেকে স্মারকলিপি খুলে দেখতে হয়। এরা আবার কারা আসে? বাড়ি তো নয়, সদর রাস্তা—অবারিত দ্বার। কোনদিন পুলিস না ঢুকে পড়ে। কে আপনারা?—

ছোকরা ও যাত্রাওয়ালার প্রবেশ

উভয়ে। নাম দিয়েছি, চশমা লাগিয়ে পড়ে দেখেন।

কঞ্জুষ। যাত্রার প্রোগ্রাম ও তুমি বিশ্বেস বাড়ির ছেলে। কি নাম? রাধাকান্ত? তা বাপু দেখ যাত্রা করবে এ ভাল কথা—সাবালক হয়েছ, যাতে বুদ্ধি পাকে তাই তো করা কর্ত্তব্য। তা আমাকে কি করতে হবে বল।

ছোকরা। তেল বাতির বন্দোবস্ত, আর আপনাকে যেতেও হবে চক্কোত্তি মশায়।

কঞ্জুষ। বেশ, লণ্ঠন তেল বাতি হাতে করে হাজির হবো সময়ে; যাও এখন, নমস্কার। আমি চল্লেম বাজারের দিকে। [সকলের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

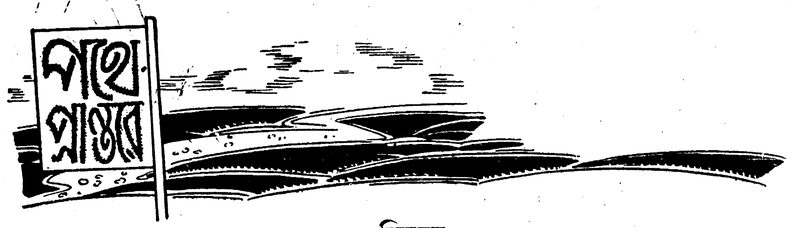

ভিয়েন

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস

ভিয়েন্ নগরের অপর নাম ভিয়েনা। এই শহরটি দেখবার আমার একটা বাতিক হয়েছিল। বাতিক হলে কি হয়, পথ ত কখনও আমার জন্য ছোট হয়ে যাবে না? পথের যতটুকু দুরত্ব ছিল ততটুকুই ছিল। এদিকে আবার পথগুলি একটু কম পিচ্ দেওয়া রয়েছে। পথগুলি মরা সাপের মত আকাশের দিকে যেন হা করে তাকিয়ে। ভিয়েনার অন্তস্থলে পৌছতে তখনও আরও কুড়ি মাইল বাকি। মনে হচ্ছিল যেন ভিয়েনার সুবার্বে এ বসে গেছি। ক্ষুধায় শরীরটা নেতিয়ে পড়ছিল। এদিকে আবার রেঁস্তোরাও নাই, তাই নাজি বা নাৎসী প্রথা মতে একটি কারখানার অপিসে হাজির হয়ে ম্যানেজারকে ইংগিতে জানালাম—"ক্ষুধা পেয়েছে" এবং সেই সংগে একখানা পরিচয় পত্রও দিলাম। ম্যানেজার পরিচয় পত্র দেখবার পূর্বেই খাবারের বন্দোবস্ত করতে আদেশ দিলেন, তারপর পরিচয় পত্র পাঠ করতে লাগলেন।

লোকটি সুপুরুষ, তবে বয়স্ক। আমার বিশেষ পরিচয় পাবার জন্য তিনি ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ল্যাটিন আমি বুঝতাম এবং এখনও বুঝি, যদি তার উচ্চারণ ঠিক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি 'টি' অক্ষরটিকে সকল সময় 'ত' উচ্চারণ করতে হবে। ভদ্রলোক আমার সংগে দু'এক মিনিট কথা বলার পরই খাবার এসে গেল। এক খানা প্লেটে অম্লেট এবং দু'টুকরা ভেড়ার মাংস, আর এক খানা প্লেটে কিছু মাখন ও রুটি ছিল। এর বেশি কিছু আমি আশাও করি নি। গরম জলে হাত ধুয়ে তাই খেতে লাগলাম। আমার খাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে লোকটি কি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দুজন অষ্ট্রিয়ান যুবক ভিনিক ভাষায় জানাল তারাও উপবাসী এবং তারাও পর্যটক। তাদের জন্যও কিছু খাবার আসল। নবাগতদের কাছে আমার পরিচয় নিয়ে কলের মালীক তাদের হাতে আমার পরিচয়-পত্র দিলেন। আমার পরিচয়-পত্র পাঠ করে নবাগত সমবয়সীগণ অবাক হলেন। এঁরা বেশ ইংলিশ বলতে পারতেন কারণ ভ্রমণ করার সময় তারা প্রায় ছয়মাস অর্থাৎ একটি শীত ইংলণ্ডে কাটিয়ে এসেছিলেন। তারা আমার কাছ হতে চীনের সংবাদ, ভারতের সংবাদ এবং অন্যান্য পূর্বদেশের সংবাদ নেবার পর আমি ইউরোপের কতকগুলি দেশ সম্বন্ধে তাদের কাছে অনেক প্রশ্ন করি। তারা আমাকে বললেন, রুশদেশ হতে আর্লেণ্ড পর্যন্ত সর্বত্র তারা ভ্রমণ করেছেন। রুশদের মত দাতা তারা আর কোথাও দেখেন নি এবং ইংলণ্ডের মত "নাদিনশা"ও কোথাও দেখেন নি। তাদের কথার বাস্তবতা ইংলণ্ডে যাবার পর বেশ অনুভব করেছিলাম। তবে এটা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলাম, ইংলণ্ডের লোকের দেবার ক্ষমতা নাই বলেই দেয় নি। নতুবা তাদেরও মন আছে, তাদেরও বন্ধুত্ব করার প্রবৃত্তি আছে। বন্ধুত্ব করলেই বন্ধু যে হাত পেতে বসে, সেজন্যই কেউ বন্ধুত্বও করতে রাজি নয়।

উত্তম খাবার খেয়ে যখন বিদায় নিলাম তখন বাস্তবিকই দুঃখ হয়েছিল, কেন আরও কথা ওদের সংগে বললাম না। কতক্ষণ যাবার পরই সুরু হল পাথর দেওয়া পথ আর দুদিকে বাগান। পাথর দেওয়া

পথে সাইকেল চালান বড়ই মুস্কিল। তবুও চলতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হল, এখানেই মিঃ পেটেল মারা গিয়েছিলেন এবং এখানেই তার কবরও দেওয়া হয়েছে। দুদিকের বাগিচাগুলি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম হয়ত এরই মাঝে কোথাও মিঃ পেটেলের কবর হবে। সাইকেল হতে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখতে লাগলাম, কিন্তু অন্তরের পিপাসা মিটল না। অতিকষ্টে পাথর দেওয়া পথ পার হয়ে নগরে পৌছে সেলভেসন আর্মির বাড়িতে আসলাম। সেলভেসন আর্মির বাড়ি আমেরিকানরা গড়েছিল, এখন এই বাড়ি বেকারগণই ব্যবহার করে।

তখন বিকাল বেলা। সূর্য পশ্চিমের আকাশে ডুব দিয়েছে। অন্ধকারও হয় নি। সেলভেসন আর্মির বাড়িতে লোক জন আছে তবে সবাই খাবার টেবিলেই ব্যস্ত ছিল। তারা তখন খেতেছিল। খাওয়া শব্দটা যেন কেমনতর শুনায়। যাঁরাই ভদ্রলোক, তাঁরা খাওয়ার কথা নিয়ে ঘড় কিছু লেখেন না, তারা লেখেন নাচ, গান, চায়ের মজলিশ, অথবা কাফের কথা। রুটি, কপি সিদ্ধ, পেয়াজ সিদ্ধ, মাংস সিদ্ধ এসব বাজে কথা লেখাটা যুক্তি যুক্তই নয়, এতে ভদ্রতা বজায় থাকে না। সুখের বিষয় আমি যাদের কথা বলছি, তারা কেউ জজ সাহেবের ছেলেও নয় মেয়েও নয়, জমিদারও নয়, এমন কি আমাদের লোকও নয়, তারা মামুলী মজুর। শুধু মজুরও নয়, তারা বেকার মজুর। বেকারের সংবাদ কেউ রাখে না। এদের জন্মই হয়েছে পরের সেবার জন্য, অতএব এদের সংবাদ রেখে লাভ কি? আমিও ওদের সংবাদ রাখতাম না, কিন্তু পারিনি কারণ টাকা ছিল না। যদি টাকা থাকত তবে রেল গাড়ি হতে নেমে, নাক চু করে হাওয়া খেয়ে কোনও বড় হোটেলে যেতাম এবং বলতাম হোটেলটা বড়ই নষ্টি, যাক এসে পড়েছি এর কি করা যায়, রাতটা কাটিয়ে যাই।

সাইকেলটা খাড়া করে রেখে, কড়া নাড়া মাত্র, একটা শব্দ শুনলাম, সেই শব্দের একটা মানে আছে। সেই কথাটার অর্থ হল, আর কোন্ বুভুক্ষু এলো অবেলায়, খাবার সবই যে শেষ হয়ে গেছে। তবুও দরজা খুলল। আমি ঘরে গিয়েই একটা খাবারের টেবিলে বসে চিৎকার করে বললাম, এখানে কোন লোক কেউ আছেন যিনি ইংলিশ বলতে পারেন? একজন লোক ঘরের কোণে বসেছিলেন, তিনি ধীর অপসরণ করে যখন আমার সামনে আসলেন তখন দেখলাম লোকটি প্রৌঢ় এবং নর্ডিক্ জাতীয়। তিনি এসে আমাকে বললেন, তিনি বেশ ইংলিশ বলতে পারেন! তাঁকে কাছে বসিয়ে বললাম, "এখন কফি খানতে বলুন।" গুণে দেখলাম টেবিলের চার দিকে আমরা পাঁচ জন লোক বসেছি। পাঁচ কাপ কফির আদেশ পেয়ে 'বয়' যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে হয়ত ভেবেছিল পাঁচ কাপ কাফির দাম দেবার ক্ষমতা আমার আছে কি? আমি তা বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম এবং নবপরিচিত লোকটিকে বললাম, 'আমার কাছে শিলিং আছে, দাম দিতে সক্ষম হব।' তৎক্ষণাৎ বয়কে জানিয়ে দেওয়া হল, দাম দেবার ক্ষমতা আমার আছে। এখানে কিন্তু নিয়ম কানুন অন্য রকমের। এখানে কোন কিছুর অর্ডার বা আদেশ দিতে নাই, এখানে চাইতে হয় এবং খাদ্য দ্রব্য পাবার সংগে দামটাও তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতে হয়। আমি এসেছি বুদাপেস্ত হতে। তথায় এরূপ নিয়ম নাই, তাই হংগেরীর প্রথামতেই আদেশ দিয়েছিলাম। কফি যখন তৈরী হল তখন পাচ পেনী করে দিয়ে কাফির পেয়ালাগুলি কভিণ্টার হতে নিয়ে আসতে হল। বুঝলাম যথার্থ গরিবদের আশ্রমেই এসেছি।

এখানে রাত কাটাবারও অন্য ব্যবস্থা। দু রকমের সিট আছে। পন্চাশ সেণ্ট এবং এক শিলিং

করে। দিনের বেলা কেউ বিছানাতে গিয়ে শুতে পারে না, ঘরগুলি বন্ধ থাকে। এক শিলিংএও রুম পাওয়া যায়, তথায়ও দিনের বেলায় থাকার আদেশ নাই। বিকাল সাতটা হতে সকাল নয়টা পর্যন্ত শুয়ে থাক, কেউ কিছু বলবেনা। আমি এরূপ স্থানে থাকতে পারবনা বলেই বুঝতে পারলাম কারণ এখানে দয়ামায়া খুব কমই দেখান হয়। যদি তুমি রোগী হও তবে হস্‌পিটালে যাও। এখানে থাকলে এখানকার নিয়ম তোমায় মেনে চলতেই হবে। আমি রোগী নই তবে পরিশ্রান্ত। দিনের বেলায়ও শুতে ইচ্ছা হয়। নবপরিচিত লোকটিকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বলায়, তিনি ম্যানেজারের কাছে আমার কথা পরিষ্কার করে বল্‌লেন। ম্যানেজার আমার প্রতি দয়া দেখালেন এবং দিনরাত শোবার আদেশ দিলেন। আমি দৈনিক এক শিলিং দিয়ে থাকতে পারব এটা আমি জানতাম কারণ কন্‌টিনেণ্টের লোক বড়ই দয়ালু। তারা সবাই কিছু কিছু দান করে।

নবপরিচিত ভদ্রলোক বাইরে এসে আমার সাইকেল দেখে বললেন, 'তবে সত্যিই দেখছি আপনি সাইকেলে ভ্রমণ করেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন বৃটিশ স্পাই! তারপর অষ্ট্রিয়া ত এখন প্রকৃত পক্ষে বৃটিশেরই, আপনি বেশ পাবলিসিটি পাবেন, কালই আপনাকে নিয়ে অনেকগুলি সংবাদ পত্র অপিসে যাব।' লোকটির উৎসাহ দেখে বড়ই সুখী হয়েছি জানিয়েছিলাম কিন্তু অন্তর আমার কেঁদে উঠেছিল। আমি জানতাম তখনকার দিনে অষ্ট্রিয়া একটি বাফার ষ্টেট ছিল। বৈদেশীক রাষ্ট্র প্রতিনিধিরাই প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রিয়ার কর্ণধার ছিলেন। ভারতবাসী এসব দেশে কোনরূপ প্রশংসা পায় তা বৃটিশ বুরক্রেটদের ধর্ম নয়, তাই আমি পাবলিসিটি পাব কি না তাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। এসব বিষয়ে চুপ করে থাকাই উচিৎ, তাই চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু পরের দিন যখন বিদেশগত ইংলিশ ভাষায় অভিজ্ঞ অষ্ট্রিয়ান্ প্রৌড় ভদ্রলোকটি আমাকে নিয়ে কয়েকখানা সংবাদপত্র অফিসে বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করে চোরের মত ফিরে এসেছিলেন তখন তার মনে এমন একটা ধাক্কা লেগেছিল, যার ফলে তিনি প্রভিন্স-এ-লিজম ভুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রৌড়ের পরিবর্তন দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। আমার কোনও দুঃখ হয়নি। আমি বরং সুখী হয়েছিলাম। লোকটা বুঝতে পেরেছিল সে কোন্ Quick sand এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনই বিকাল বেলা লোকটি আমাকে অনেকগুলি রেঁস্তোরায় ঘুরিয়ে আনল এবং আমাকে অনেকগুলি শিলিং এর মালিক করে দিল।

ভিয়েন্ মস্তবড় শহর। লোক সংখ্যা তিরিশ লাখেরও উপর। তাতে অনেকগুলি পাবলিক বাগিচা এবং মিউজিয়ম রয়েছে। আমার মন কিন্তু এসব দেখবার জন্য একবারও মেতে উঠত না। পাবলিক বাগিচায় ভ্রমণ করে যারা ভ্রমণ কাহিনী লেখেন আমি সে শ্রেণীর লোক নই। ইচ্ছা করলে অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেণ্টের সংগে দেখা করতে পারতাম, কিন্তু সেদিকেও আমি যাইনি। প্রেসিডেণ্ট ত প্রেসিডেণ্টই, আমার সেলাম পেয়ে তাঁর সম্মান কিছুই বাড়বেনা, বরং এতে আমার ক্ষতি হবে, কারণ প্রেসিডেণ্ট আমারই মত একজন লোক। তাঁকে সেলাম করলে আমার নৈতিক চরিত্র কখনও বাড়বেনা। নাৎসি পার্টির লোকও তখন গোপনে অষ্ট্রিয়ায় কাজ করত, তাদের সংগে কথা বলতেও আমার ইচ্ছা হতোনা, কারণ এদের মাঝেও বর্ণবৈষম্য ভাব রয়েছে। আমি মিশতে চাইতাম কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে, কিন্তু তাদের খুঁজে পেতাম না। তারাও গা ঢাকা দিয়েই কাজ করত, তবে বুঝতে পারতাম কে কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্ট কখনও মানুষকে ঘৃণা করে না, মানুষের উন্নতির চিন্তাই করে। একদিন একজন জার্মান কমিউনিষ্টএর সংগে সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রলোক নিজেই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান, কিন্তু ঘরে গিয়ে হঠাৎ যখন মনে হল তাঁর স্ত্রী নাৎসি পার্টির লোক তখন তিনি আমাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসতে বাধ্য হন। নাৎসি পার্টির লোকের সংগে বৃটিশ পুঁজিবাদী এবং বৃটিশ সম্মানিতদের বেশ

সাদৃশ্য আছে। উভয় শ্রেণীর লোকই কালা আদমীদের সংঙ্গে বসতেও ঘৃণা বোধ করেন। এসব কথা আমার কল্পনা প্রসূত নয়, এসব কথা আমার অনুভূতি হয়েছে বলেই লিখেছি। অন্য আর কখনও লিখতাম না। আমি যা বলেছি তা অনেকেই অনুভব করেছেন কিন্তু দেশে এসে ইজ্জত যাবে বলে বলতে পারেন না। যা হউক, ভিয়েনা তখনকার দিনের একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এখানকার ডাক্তারগণ পৃথিবীর সকল ডাক্তারদের চেয়ে ভাল চিকিৎসা করেন বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। যক্ষ্মা, কেন্‌সার এসব রোগী ভিয়েনায় এসে আরাম হতো। এই সম্বন্ধে আমারও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। অনেকদিন সাইকেল চালার ফলে অথবা অন্য যে কোন কারণেই আমার অর্শের মত হয়েছিল। ভিয়েনাতে পৌঁছে আমি এমন একটি ডাক্তারের আশ্রয় নিই, যে ডাক্তারের আশ্রয় ভারতের জনৈক রুলিং প্রিন্সও নিতে বাধ্য হন। ডাক্তার আমাকে বিনা পয়সায় ঔষধ দিয়ে কৃতার্থ করেন, আর চক্ষে দেখেছি, সেই রুলিং প্রিন্স ডাক্তারের পায়ে ধরে রীতিমত বিলাপ করতে। দেশেতে তাঁকে তাঁর দরিদ্র প্রজা যেমন করে পায়ে ধরে সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনিও তেমনি রীতিমত পায়ে ধরে বিলাপ করছেন। দৃশ্যটা দেখেই বোধহয় আমার রোগ সেরে গিয়েছিল। আর মনে হয়েছিল ভারতীয় জনৈক ভদ্রলোকের কথা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যে অসৎ কাজ করে অপরের সর্বনাশ করে, সেই অসৎ কাজের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে। রুলিং প্রিন্স তাই করছেন দেখে আমার দুঃখ হয়নি, বরং সুখী হয়েছিলাম এঁদের স্বরূপ অনুভব করে।

অনেক সময় দুঃখ হতে অনেক শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। আমার যদি অসুখ না হতো তবে ভিয়েনায় এসে ডাক্তারের কাছে যেতে হতোনা। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম বলেই এই গোপন তথ্যটিও দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

পিটার প্যানের গল্প

রাখাল তালুকদার

এক

অনেক দিনের কথা

পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য দেশ।

আশ্চর্য্য সে-দেশের ছেলেমেয়ে—আরও আশ্চর্য্য সেখানকার একটি বাড়ি। একটি শিশু-সদন। শোনা যায়, অমন একটি শিশু-সদন পৃথিবীর আর কোথাও নেই। যেমনটি দেখতে তেমনি ফিটফাট—গোছগাছদুরস্ত। বাড়ির শরিক তিন ক্ষুদে কর্ত্তা;—তাদের মিলমিশ চমৎকার, ঠাঁই-ঠাঁই নয়, তারা শরিক বলতে হয়তো হোমরা-চোমরা ভাবছো? শুনবে কেমন?—বয়সে তারা তোমাদেরই মতো ছোট্টটি—মা না শোয়ালে শোয়া হয় না; দিদি এসে না খাইয়ে দিলে খাওয়া হয় না; ঝি এসে স্নান না করালে স্নান হয় না। বুঝতে পারছো তো তারা কী-রকম—জন নেপোলিয়ন, ডেরিণ্ডি মোরিয়া আঞ্জেলা ও মাইকেল। মিঃ আর মিসেস্ ডারলিং দম্পতির ওরা তিন সন্তান।

পরিষ্কার খোলামেলা শিশু-সদনটি। একটি মস্ত জানালা—এতো বড়ো-যে বাইরের দৃশ্যপট তার ভিতর ক্রমে এটে সুন্দর ক'রে রাখা যায়। আগুনের চুল্লী ঘরের মধ্যে—বেশ মজবুত অগ্নিনিবারক তার গাত্রাবরণ। একটি বড়ো ঘড়ি সারাক্ষণ টিক্‌টক্ শব্দে সময়-পলের ঘণ্টা-নিশানা জানাচ্ছে। দেয়ালে ঝোলান ছড়ার ছবি; ছবিগুলি ছড়া দিয়ে রঙবেরঙে লেখাজোকা।

বাড়িটি কেমন সুন্দর, না? একটু আলাদা ক'রেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক্ সে।

লিজা ভা-রী সজাগ ছেলেমেয়েদের পরিচারিকারূপে। ফুট্‌ফুটে ছোট্ট সে একটি কুকুরী। আর থাকে একটি বড়ো কুকুর—গোমরামুখো নানা। তার দাপটে ছেলেমেয়েরা অস্থির—নাওয়াবে, পোষাক পরিয়ে দেবে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সমস্ত ঠিকমতো। শিশু-সদনের সে-ও কিন্তু একটি অধিবাসী।

—ভূমিকা শেষ। এইবারে আমাদের সত্যিকারের গল্প আরম্ভ হোলো একটি বিকেল নিয়ে। সামনের পা-দুটি সটান ক'রে মাথাটি তার মাঝখান ঠেলে দিয়ে নানা হাই তুলছিলো চুল্লীর সম্মুখে আল্‌সেমি ভাঙতে। মিঃ ও মিসেস্ ডারলিং চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন ইতিমধ্যে;—তারা যাবেন আবার নেমতন্নে। নানা'র হেপাজতে থাকবে ছেলেপুলে—যতোক্ষণ না তারা ফিরে আসছেন নেমতন্ন থেকে। কিন্তু ঘড়িটি বেতরো হয়ে বাজতে লাগলো এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—? সন্ধে ছটা। ছেলেদের বিছানায় শুয়ে পড়বার সময়-নির্দ্দেশ।

আর নাঃহে—। নানা ব্যস্ত হয়ে পড়লো; কাজে লেগে পড়লো সে ব্যস্ত বাগীশের মতো। প্রথমে ঘরের বিজলি বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিলে। আশ্চর্য্য হচ্ছো ত'? কেমন ক'রে একটি কুকুর করে এসব?—হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে ক'রে যায়। ভা-রী সে সেয়ানা! মুখমারফতে সে বাতিগুলো জ্বাললো এক-একটি বোতাম টিপে। তারপর সে বিছানার চাদর বিছিয়ে দিলে ঝেড়েমুছে টান-টান ক'রে পেতে। ছেলেদের পাজামাগুলো শুকোতে চুল্লীর আশপাশে সে মেলে দিলে। তারপর—তারপর সে জোর-কদমে ছুটলো স্নানের ঘরে। থাবা চুবিয়ে গরমজল গরম জলের উত্তাপ সে পরীক্ষা করলো: বেশি নয়, গায়ে সইবে—। তড়বড় ক'রে সে ছুটে আবার বেরিয়ে গেল মাইকেলের খোঁজে। সকলের ছোট মাইকেল, গা-হাত-পা ধুয়ে গরম জলে তাকেই আগে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে। মাইকেলকে সে পিঠদাবা ক'রে নিয়ে ফিরে এল স্নানের ঘরে। নানার পিঠে মাইকেল সওয়ার-ও সিয়ার নানা যেন মাইকেলের ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটি। পিঠ থেকে সে নাববে না, পয়পরিষ্কার হ'তে সে দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু নানাও ছাড়বার পাত্র নয়, নাছোড় মাইকেলকে সে শেষপর্য্যন্ত বাগ মানালো ভুলিয়ে ভালিয়ে। জানালাটি সে সবপ্রথম বন্ধ ক'রে দিলে, এই ভেবে যে, হঠাৎ মাইকেলের সর্দ্দিগর্ম্মি হ'তে পারে খালি গায়ে পরিষ্কার হবার সময়। গা ধুইয়ে দিয়ে জামা পরিয়ে দিতে হয় সঙ্গে-সঙ্গে, নানা পাকা পরিচারিকার মতো তা-ও করলো। মিসেস্ ডারলিং এসে একবার স্নানের ঘ'রে চুপি মেরে গেলেন। মাইকেল ভয়ানক দুরন্ত, তাকে নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা সর্ব্বক্ষণ। কোনোমতেই তিনি সোয়াস্তি পান না।

ঘরের ভিতর মিসেস্ ডারলিং দাঁড়িয়ে ছিলেন সেজেগুজে। ছোট একটি আচম্‌কা শব্দ জানালার বাইরেকার তিনি শুনতে পেলেন স্পষ্ট। তাঁর সন্দেহ হোলো এবং সে-সন্দেহ সত্যিও হোলো। তিনি ভিতর থেকে দেখতে পেলেন জানালার শার্সিতে একটি ছায়া—সে-ছায়া একটি ছোট ছেলেরই হবে। তিনি দেখলেন ছায়া মূর্ত্তিটি জানালার খড়খড়ি খুলবার চেষ্টা করছে বাইরে থেকে। দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠতেই সে-ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হোলো চোখের পলকে। তড়বড়িয়ে এসে তিনি জানালা খুললেন এবং চারদিকে কড়া নজরে দেখতে লাগলেন। কিন্তু চোখে শুধু তাঁর আশেপাশের বাড়িগুলির ছাদ-ই পড়তে লাগলো আবছা-আবছা। উপরে তাকিয়ে দেখলেন, মাথার ওপরকার আকাশ আশ্চর্য্য ঘননীল। তিনি ঘাবড়ে গেলেন, তাঁর মাথার ভিতর তখন চক্কর করছিলো যতো রাজ্যের ভূতুড়ে গল্প। কারণ, এ কাণ্ড যে গত পর্শুও ঘটেছিল একবার। নানা নিজেও ভুলেছে ওই জানীলাটি সে ঝট্‌পট্ বন্ধ না করে দিলে সেদিন কী মুশকিলেই না পড়তে হোতো!

ছেলেপুলেরা এসে জুটে গেল, মায়ের হাঁকডাকে। জন নেপোলিয়ন আর ওয়েণ্ডি খেলছিল 'কর্ত্তা-গিন্নি'

খেলা। জন কড়া মেজাজী কর্ত্তা আর তার গিন্নি ওয়েণ্ডি হাসিখুসী স্নেহপরায়ণা। এই খেলা তাদের হোলো সব চাইতে প্রিয়। এ'র মহড়া রাতদিন তাদের! দেখে ত' মিসেস্ ডারলিং রেগেচেগে উঠলেন: কী পাকা কর্ত্তা-গিন্নি! কথাবার্ত্তাগুলিও প্রায় নকল করে ফেলেচে দেখচি সব—। মিসেস্ ডারলিং শুনছিলেন আড়ি পেতে আর হাসছিলেন নিজের মনে।

গলার 'টাই' ঠিক ক'রে বাঁধতে বাঁধতে মি ডারলিং এই সময় হক্‌চকিয়ে এসে ঢুকলেন তাঁর-ই খোঁজ ক'রে। এই 'টাই' বাঁধা নিয়ে তিনি ঘেমেচেমে ওঠেন, আর বিকেলের 'টাই' বাঁধতে গিয়ে কতো না কাণ্ড করে বসেন। জানোই ত' তোমরা, কী রকম শক্ত কাজ ওটা? মিসেস্ ডারলিং এক নিমেষে বেঁধে দিলেন। দেখে তোমার আমার মিসেস্ ডারলিং-এর মনে হোলো, কী রকম সহজ কাজ এটা? তবুও এ হাতের প্যাঁচ, অন্যে পারবে কেন?

মাইকেলকে নিয়ে মিসেস্ ডারলিং মাতলেন। পিঠে নিয়ে তাকে সারাঘর তিনি ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছিলেন। মাইকেল নাছোড়বান্দা, মা'কে বিরাম দিতে চায় না। এই রকম করতে করতে পিঠ থেকে মাইকেলকে বিছানায় ফেলে দিলেন তিনি ঝপ্ ক'রে, 'বাপ্‌স্'—

নানা এর ভিতর এক কাণ্ড করে বসলো। মর্ম্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার কিন্তু। সে যাচ্ছিলো একছুটে স্নানের ঘরে—যেতেই মিঃ ডারলিং-এর সুদৃশ্য কালো কোর্ত্তা ঘেঁষে সে পড়লো পরস্পরে সামনাসামনি তারা এসে পড়তে। পাশ কেটে পড়তে তাই সামান্য ঘেঁষাঘেঁষি হোলো। কালো কোর্ত্তায় সেঁটে রইলো নানার গায়ের বাদামী লোম।—দু' একটি হলে হ'তো, এ-যে রাজ্যিখানেক? বড়োরা লোমভর্ত্তি কোর্ত্তা না-পছন্দ করেন। মিঃ ডারলিং তাই নানার উপর তেড়ে উঠলেন। সরাসরি গিয়ে তিনি মিসেস্ ডারলিং-এর কাছে নানাকে এক্ষুনি বরখাস্ত করতে প্রস্তাব করলেন। সত্যিই ত', তাঁর রাগটা এমন অন্যায়-ই কী-বা। তবে নানা বরখাস্ত হলে ছেলেদের আগলাবে কে এখন,—মিসেস্ ডারলিং ভাবতে বসলেন। তিনি বললেন, 'জানো না বুঝি নানা কি রকম কাজের? নানার কী-রকম ভয়ানক হাঁকডাকে সেদিন জানালার শার্সি থেকে ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হয়েছিল। জানালার ছিটকিনি সে বন্ধ করে দিলে আপদ রুখতে। ছায়ামূর্ত্তির ছায়াও সে মাড়ালো না। আমাকে ডেকে একেও দেখিয়ে রাখলে। সত্যি বাপু দাই হিসেবে ছেলেদের জন্য নানার তুলনা মেলা ভার।'—এইভাবে 'নানা'-প্রসঙ্গ মিসেস্ ডারলিং শেষ করলেন। সেবাপরায়ণা নানা সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো এক বোতল কুইনিন মিক্‌চার নিয়ে! মাইকেলের অসুখ; শরীর খারাপ তার লেগেই আছে। ভা-রী বদরোখা ছেলে সে; তেতো ওষুধ কিছুতেই সে খাবে না। এই নিয়ে একটি মজার কাণ্ডও হয়ে গেল। ওয়েণ্ডি আচ্ছা ধড়িবাজ, তার মাথায় সুন্দর একটা খেয়াল চাপলো, রাশভারীকণ্ঠে সে প্রস্তাব পাঠালো এই বলে, 'মাইকেলকে বাগাতে হলে বাবার-ই আগে কিছুটা ওষুধ আগে খেয়ে ফেলা উচিত।' 'আচ্ছা, তা-ই হোক্। আমাদের ভিতর কে সাহসী দেখা যাক্।' মিঃ ডারলিং বললেন ওয়েণ্ডির প্রস্তাবটা অনুমোদন ক'রে। মুহূর্ত্ত মধ্যে দু' গেলাস মিক্‌চার ঢালা হ'লো। 'এক দুই তি—ন'—ওয়েণ্ডি চেঁচিয়ে উঠলো। মাইকেল এক চুমুকেই খেয়ে ফেললো সবটা, কিন্তু মিঃ ডারলিং খাবার ভান ক'রে লুকিয়ে ফেললেন গেলাসটা। জন আচ্ছা ট্যাঁটন, হাতেনাতে ধরে ফেলে দিল সে গেলাসশুদ্ধ 'বাবা কিন্তু খাননি'।

মাইকেল ভেঙে পড়লো, গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠলো—'বু-উ-উ—উ-উ-উ'—মিঃ ডারলিং মাইকেলকে শান্ত করতে একটা ফিকির ফাঁদলেন। তিনি সবটা ওষুধ নানার খাবারের বাটিতে ঢেলে দিলেন। বেচারা নানা

ভাবলো, এ নিশ্চয়ই এক রকমের সুস্বাদু পানীয়। দৌড়ে সে ছুটে গেল আগ্রহ ক'রে পানীয় বস্তুটা খেয়ে নিতে। বাটিতে মুখ দিতেই সে-মুখ বিস্বাদে ভরে গেল; সে-দৃশ্য দেখে ঘরখানা বাজপড়া শব্দের মতন হাসির হুল্লোড়ে ফেটে পড়লো। কী সকরুণ কাতর দৃশ্য একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন! ছেলেরা নানাকে বিস্তর ভালোবাসে বুড়ি দাই ভেবে—তার দুঃখে তারা ব্যথিত। মুখ গুঁজে নানা পড়ে রইলো বারান্দার এককোণে—তার এই অসহায়কর করুণ দৃশ্যে ছেলেরা গুমরে উঠলো। মজাটা যেন ছেলেরা মোটেই না ধরতে পারে, এই ভেবে মিঃ ডারলিং রাগে ডগমগ হয়ে তেড়ে গেলেন এবং নানার গলার পটি ধরে তাকে টেনে হেঁচড়ে ঘরের বার করে দিয়ে বললেন, 'তোমার জায়গা হোলো উঠোনে—কুকুরদের যে-জায়গা ওই ওখানে।'

ছেলেদের কারুরই বারণ তিনি শুনলেন না। মিসেস্ ডারলিং তাদের সান্ত্বনা দেবার ছলে বিছানায় সবগুলোকে নিয়ে এসে জুটলেন। একে-একে তারা সবাই শুয়ে পড়লো। মা তাদের ঘুম পাড়াবার অবসরে গুন্ গুন্ স্বরে গান গেয়ে গালে মুখে চুমু দিতে লাগলেন। ছোট্ট একটা বাতি তিনি ঘরে এনে রেখে গেলেন। পা-টিপে পা-টিপে নিঃশব্দে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সময় যাচ্ছিলো, আর দেরিও করা চলে না—তাদের আবার নেমতন্নে যেতে হবে।

দুই

শিশু-সদনটি নিঝুম পুরীর মতন চুপ্‌চাপ্ একদম। কী কারণে ঠিক বোঝা গেল না ঘরের ভিতরকার বিজলি বাতিগুলো সব এক সঙ্গে হঠাৎ কেঁপে উঠলো, দপ্ দপ্ করতে লাগলো, তারপর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে একবারে সবগুলো নিবে গেল। অন্ধকার ঘুরঘুট্টে ঘর। একটি আগুনের গোলা ধাঁ ক'রে ঘরে এসে ঢুকে পড়লো—সারাঘর ছুটোছুটি করতে লাগলো, এবং শেষমেশ একটা কাচের হাঁড়িতে গিয়ে সেটি অদৃশ্য হোলো। তখন কি-না জানালার বাইরে থেকে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছিপ্‌ছিপে ছেলেমানুষ চেহারার একটি ছায়ামূর্ত্তি। মিসেস্ ডারলিংকে একদিন কিন্তু এই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। একটি মাত্র শব্দ—জানালা গেল খুলে, আর সেই ছায়া-মূর্ত্তিটি গুড়িসুড়ি মেরে ঘরে এসে ঢুকলো। সে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছিলো! তোমরা অনায়াসে ভেবে নিতে পারো, যে, সে তার ছায়াই খুঁজছিলো।

'টিঙ্ক, কোথায় তুমি?' ফিস্‌ফিসিয়ে সে বললো, এবং তারপরই একটা আলো দেখা গেল কাচের হাঁড়ির ভিতর 'টিঙ্ক, তুমি কি জানো আমার ছায়া কোথায় হারিয়ে গেছে?'

এখন একটা কথা তোমাদের আমি ফাঁস করে দিই। আগুনের ওই গোলাটি কিছুই নয়—ওটি হ'লো সত্যি একটি পরী—যে সব জানে, ব'লে দিতে পারে আমরা যা জানতে চাই। আর সব পরীরাই তা' করে আলো-আকারেই তোমরা শুধু তাকে দেখে থাকবে। তার কথা শুনতে পাবে স্পষ্ট। সে ছোট্ট একটি রূপোর ঘন্টির মতো টুংটাং ক'রে বাজে মৃদুমন্দ। সুন্দর সে-বাজনা। তাই তার নাম টিঙ্কার ঘন্টি।

টিঙ্কার ঘন্টি অবশেষে দুই নম্বর ড্রয়ারে গিয়ে ঠাঁই নিলে: সঙ্গে সঙ্গে ওম্‌নি ছেলেটিও ছুটলো এবং টেনে খুলে ফেললো একটি ড্রয়ার। আর সেখানে সে তার ফিতেপটি সুন্দর-করে-জড়িয়ে-রাখা অবস্থায় দেখতে পেল। মিসেস্ ডারলিং ভুল ক'রে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন ওই ফিতে পটিগুলি জানালায় চৌকাঠের ওপর—যে-দিন তিনি সবপ্রথম ছায়ামূর্ত্তিটি দেখেছিলেন। তার মাথায় এক খেয়াল চাপলো। চুল্লীর সামনে বসে সে গায়ে খুব ক'রে সাবান মেখে পটি এঁটে রাখতে চাইলে। চাইলেই হ'লো কি-না! কী রকম বোকামি বলো

ত'। ফিতেপটি ওগুলি ছায়া মাত্তর, সেগুলো আবার এঁটে রাখা যায়? লজ্জায় সে দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললো এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো একেবারে ভরসা ছেড়ে দিয়ে।

ওয়েণ্ডির ঘুম ভাঙলো কান্না শুনে। বিছানায় সে বসে প'ড়ে, একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে, জিজ্ঞেস করলো তাকে, 'তুমি কাঁদচো কেন?'

ভুঁইফোঁড় বাচ্চা খোকাটি পা-ভর ক'রে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রয়াদি দস্তুর মতো সে মাথার টুপি খুলে ওয়েণ্ডিকে অভিবাদন জানালো; পাল্টাপাল্টি ওয়েণ্ডিও তাকে জানালো। তবে অতোখানি সে পেরে উঠলো না বিছানার ওপর থেকে। ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'ওয়েণ্ডি মোরিয়া আঞ্জেলা ডারলিং। তোমার?'

'পিটার প্যান।'

'তুমি থাকো কোথায়?'

'ডাইনে ঘুরে এ-ই দুনম্বর ড্রয়ারে। সে কিন্তু সকাল বেলা অবধি।'

ওয়েণ্ডির কাছে পিটার প্যানের ঠিক ঠিকানা অর্ডুক ঠেকলো। তার দুঃখ হ'লো যখন সে শুনতে পেল যে পিটারের মা সেই। তার কান্না দেখে আশ্চর্য্য হবার তার কী আছে! পিটারের চোখে জল এল ত' আর মা হারাবার জন্য নয়। সে কাঁদছিলো তার ছায়া কোনো মতেই গুটিয়ে রাখতে পারছিলো না ব'লে। এ' কী সম্ভব! শুনে ওয়েণ্ডি মুখ টিপে হেসে ফেললো, বললো, 'সাবানে হবে কেন? সেলাই করতে হবে। ছুঁচ সুতো'—

পিটার ভ্যাবাঢাকা খেয়ে গেল: 'ছুঁচসুতো'—'হাঁ। আমি সেলাই ক'রে দোব। ওয়েণ্ডি সেলাইয়ের বাক্স খুলে নিয়ে বসলো এবং ঝটপট কাজে লেগে পড়লো। ছুঁচের ফোঁড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ, পিটার হিমসিম খেয়ে গেল খোঁচায় খোঁচায়। তবু সমস্ত, সে সহ্য করলো নীরবে। কাজটা যেন পিটারের মনঃপূত হ'লো, কী সুন্দর কাজে লাগানোই না হয়েছে! আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়ে সে মাতামাতি সুরু করে দিলে! পা তুলে হাত দুলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে সে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

'বাঃ, কী বুদ্ধি আমার?' পিটার চেঁচিয়ে উঠলো মোরগের ডাক অনুকরণ ক'রে। ঠিকই যেন সে একটি মোরগের ডাক অনুকরণ করলো।

'তুমি পরের নকল করো—আমি করিনে'—ওয়েণ্ডি পিটারকে জানালো!

'ওঃ, তুমিও করেচ একটু-আধটু।'

'একটু-আধটু! আচ্ছা, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্চি তবে,' ব'লে ওয়েণ্ডি চাদরে সারা গা-মুখ ঢেকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

দারুণ বিপদে প'ড়ে পিটার ঘাবড়ে গিয়ে বললো, ওয়েণ্ডি! এ তুমি কোরো না। আমি যখন আনন্দ পাই তখন ওইরূপ ডেকে উঠি—আমি তা না ক'রে পারিনে। একটি মেয়ে কুড়িটি ছেলের চাইতে কাজের, আমি মনে করি।' এটা একটা দুষ্টুমির চাল হাজার হোক পিটারের। কিন্তু এ শুনে ওয়েণ্ডি বিছানা ছেড়ে চলে এল। এসে সে পিটারকে জড়িয়ে ধরলো—আদর জানালো। কিন্তু পিটার ভেবেই উঠতে পারলো না, ওয়েণ্ডি কী প্রস্তাব করচে। আর ওয়েণ্ডি তার মুখে-চুলে-গালে হাত বুলোলো, এ'র কী মানে! আদর আবার কী রকম।

কী বোকা ছেলে বাপু পিটার। ওয়েণ্ডি হ'লো মায়ের জাত, পরের দুঃখ দেখে সে কাতর হয়ে পড়ে—

দুঃখ ঘোচাতে ব্যস্ত। এই রকম বোকামি দেখে ওয়েণ্ডি পিটারকে বিদ্রূপও করলো না একবার। বরং তার আরও ভালো লাগলো পিটারকে।

'পিটার, তুমি বুড়ো হয়েছো?' ওয়েণ্ডি বললো।

'জানিনে! তবে আমি কিন্তু বেশ ছেলেমানুষ আছি। যেদিন আমি জন্মেচি সেদিনই আমি পালিয়েচি'—

'পালিয়েচ—কেন?'

'শুনবে?—শোনো তবে। আমি আমার বাপ-মাকে আলাপ করতে শুনেছিলাম আমার বিষয় নিয়ে। বড়ো হয়ে আমি কি হবো। আর তাঁরা আমাকে কি বানাতে চান? অনেক-অনেক বড়ো। কিন্তু বড়ো আমি কিচ্ছুতেই হবো না—হ'তে চাইওনে। আমি চাই ছোট ছেলের মতো হাসিখুশী নিয়ে থাকতে। পালিয়ে এলাম আমি সেই কারণে। আমি ছোটই থাকবো—বড়ো হবো না। ছাখো না কেমন সুন্দর আমি পরীদের সঙ্গে বাস করচি।'

শুনে ওয়েণ্ডি তাক্ ব'নে চুপ মেরে গেল। সে এমন একটি ছেলের সঙ্গে বসে কথা বলছে, যে পরীদের বিলক্ষণ জানে, এমন কি চেনা-পরিচয়ও আছে,—এ কথা মনে ক'বে তার খুশীর বাঁধ ভেঙে পড়লো। তার বিস্ময় বিস্ময়তা কাটিয়ে নিয়ে সে বললো, 'পিটার, সত্যি তুমি পরীদের জানো। পরিচয় আছে তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ খু-উব। তারা তো আর বেঁচে নেই। এই ধরো না, একটি ছেলে জন্মেই প্রথম যে দিন হাসতে শিখলো, সে-হাসির শব্দ হাজার টুকরোয় ফেটে পড়লো চারদিকে। তারপর সে-হাসি আকাশে পাড়ি জমালো। এ'র থেকেই ত' পরীদের জন্ম। নতুন শিশুদের মুখের হাসিতেই পরীদের জন্ম। তা-ই কি সব ছেলের হাসিতে হয়, এখনকার ছেলেরা হাসে খুব, কিন্তু তারা পরীদের বিশ্বাস করে না। এই অবিশ্বাসের কথা শুনেই ত' পরীরা মরে গেছে সব। আজ তাই হাজার খুঁজেও তাদের-আর দেখা যায় না।'

পিটার ঘরের ভিতর কি যেন দেখতো লাগলো। বোধকরি, কাউকে-সে খুঁজে দেখছিলো। টিঙ্কার ঘণ্টি কি পালিয়েছে ইতিমধ্যে?—ভাবতে না-ভাবতেই বাইরে টুং-টাং বেজে উঠলো। পরীদের ভাষা পিটার সে জানে। সে শব্দ-ইশারায় তৈরি হয়ে নিল সে। ড্রয়ারটি সে টেনে খুলে ফেললো; টিঙ্কার তাতে ঝন ক'রে বেজে উঠলো, পিটারের ওপর রেগেই সে আগুন; কেন তাকে ড্রয়ারে আটকে রাখা হয়েছিলো। বেরিয়ে প'ড়ে সে ঘরময় দুড়দাড় করে বেড়াতে লাগলো। তা দেখে ওয়েণ্ডি খুসীভরে চেঁচিয়ে উঠলো। চীৎকার শুনে টিঙ্কা ভীত হয়ে পালালো গিয়ে দেয়াল ঘড়ির পেছনে।

'সত্যি, পিটার, তুমি যদি পরীদের সঙ্গে না থাকো, তবে কোথায় থাকো তুমি?' ওয়েণ্ডি বললো।

'কেন? আমি থাকি হারানো দেলেদের দলে।'

'তারা কোথায়? সঙ্গে কই তোমার?'

'আছে। যে সব ছোট ছোট ছেলেরা তাদের পরিচারিকাদের অসতর্কতায় ঠেলা গাড়ি থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়—তারাই। যদি সাত দিনের ভিতর তাদের কোনোরূপ খোঁজখবর না হয় তবে তাদের পাঠানো হয় গিয়ে অসম্ভবের দেশে। আমি সে-সব হারানো ছেলেদের সর্দার।'

'বাঃ, কী মজা! পিটার, তুমি কেন এখানে এলে?'

পিটার বসলো, 'শুনবে? আমি রোজ চুপ ক'রে শুনতে আসতাম তোমার মা যখন তোমাদের কাছে গল্প বলতেন। সবাইকে নিয়ে যখন তিনি গল্প বলেন, কী সুন্দরই না লাগে সে-গল্প শুনতে! হারানো ছেলেদের

নেই—কেউ নেই তাদের গল্প বলবার। শয়তানকে মারা, জলদস্যুকে ফাঁদে ফেলা, নেকড়েবাঘের তাড়া—কতো তারপর আরও—সুমুদ্দরে স্নান, জলপরীদের গান—সারাদিন জলে সাঁতার কাটা।—উঃ, কতো কতো গল্প তোমার মা।'—বলতে বলতে পিটার কেটে পড়তে চাইলে, 'আমি তবে আসি। আমার খুব দেরি হয়ে । জানো, আমার জন্য আর সবাই হাঁ-ক'রে চেয়ে আছে। আমি তোমাদের এখান থেকে গল্প শুনে তবে খানে গিয়ে বলি ওদের কাছে। একটা গল্পের এখনও শেষ বাকি রয়েচে—বলা হয়নি।'

'না-না, যেয়োখন।' ওয়েণ্ডি বললো বাধা দিয়ে। 'আমি তোমাকে কথা দিলাম, অনেক গল্প দেখো কে আমি বলবো। আর একটু থাকো, শুনতে পাবে—'

পিটারের একটা বুদ্ধি খেললো। সে বললো, 'ওয়েণ্ডি, শোনো! এসো না ইদিকে—। চলো আমাদের তুমি আমাদের তুমি গল্প শোনাবে, কাপড়-চোপড় পরিয়ে দেবে। রাত্তিরে সব্বাই মিলে এক ঠাঁই জড়ো । হারানো ছেলেদের তোমাকে পেয়ে তাদের মা হারাবার দুঃখ ঘুচবে। চলো না ওয়েণ্ডি, আমার —' ওয়েণ্ডিকে মস্ত লোভ দেখানো হোলো। কিন্তু ওয়েণ্ডি বুদ্ধিপ্রখরা, ধাঁ ক'রে সে বলে ফেললো, র, না। আমি পারিনে তা। আমার মা'র কথা ভাবো। আর আমি ত' উড়তে পারিনে।'

'আমি শিখিয়ে দোবো তোমাকে।'

যথেষ্ট। ওয়েণ্ডি ভিড়ে পড়লো, বললো, 'পিটার, আমাকে তাহ'লে শিখিয়ে দেবে কিন্তু।'

'হাঁ, নিশ্চয়ই শিখিয়ে দোবো।'

জন আর মাইকেলকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হোল। তারা সমস্ত শুনলো। অসম্ভবের দেশে দস্যুই ল; তবু এক পায়ে খাড়া তারা—যাবে তারা এক্ষুনি। পিটার ঘরের ভিতর তখন উড়ে বেড়াচ্ছিলো, তারা য়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। পিটারকে অনুকরণ করতে হাত দুটো জড়ো ক'রে ডানা না-মেলে দেওয়া র মতো তারা উড়তে চেষ্টা করলো।

'উঁ-হু, হোলো না'; পিটার তাদের বললো, 'আমি তোমাদের গায়ে আগে পরীদের ধুলো ছিটিয়ে দিই,— ত পারবে। আমার মতো তোমরা ক'রে দেখো না, ঠিক পারবে।'

নির্দ্দেশ মেনে তারা চেষ্টা করলো এবং সত্যি-সত্যি তারা উড়তে পারলো একটু একটু ক'রে, যেমন না থেকে মেঝে আর মেঝে থেকে বিছানা অবধি। তারপরই সমস্ত ঘর। ক্রমে ক্রমে সাহসও বেড়ে ল; ঠিক পিটারের মতো তারাও স্বচ্ছন্দে উড়তে পারলো নির্ভীকচিত্তে।

'টিঙ্ক, নিয়ে চলো এবারে!' পিটার বললো। পরীটা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ছোট্ট একটি তারার তো। ছেলেরা কেউই তাদের পোষাকও প'রে নেবার সময় পেলনা। মাইকেলকে সঙ্গে করে জানালার কাছ টপ্‌কে আসতে জন্ কেবল মাত্র তার টুপিটা নিতে পেরেছিলো। পিটার ওয়েণ্ডির হাত ধরাধরি করে ছ যাচ্ছিলো। উড়তে উড়তে নীলাকাশ সীমা পেরিয়ে তারাভরা আকাশের কোলে তারা মিলে গেল। রাত্তির আরও ঘনিয়ে এল।

নানাকে পেছন-পেছন নিয়ে মিসেস্ ডারলিং তার পরক্ষণেই ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলেন। নানা রকম অসোয়াস্তিতে ছিলো এতোক্ষণ! প্রভুর দেওয়া শাস্তি—গলার শিকল সে এমন কি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিলো। কিন্তু, কতো পরে—।

অসম্ভবের দেশের দিকে তারা-যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে!

(ক্রমশ)

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

অদ্বৈত মহাপ্রভু

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করেন—সেই সময়ই বাংলাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। মনুষ্যত্বের দিক হতে বাঙ্গালী জাতির এরূপ গৌরবময় কাল আর হয়নি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর জন্মের আগে হ'তে যাঁরা তাঁর বিজয়যাত্রার পথ প্রস্তুত করছিলেন তাঁরাও এক একজন ছোটখাটো চৈতন্য। তাঁদের মত একজন মহাপুরুষ জন্মিলেই যে কোন জাতির একটি শতাব্দী ধন্য হ'য়ে যায়। শ্রীচৈতন্যের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁরা সূর্য্যের প্রখর কিরণে গ্রহনক্ষত্রের মত ম্লান হয়ে আছেন। সেই সব মহাপুরুষের সহায়তা পেয়েছিলেন বলেই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে পেরেছিলেন। এই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্যের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য।—এঁর আসল নাম কমলাক্ষ (কমলাক্ষ) ভট্টাচার্য্য। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে এঁর আদি নিবাস ছিল। ইনি ছিলেন রাজা গণেশের মন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়েলের বংশধর। ইনি শ্রীহট্ট হতে শান্তিপুরে এসে বাস করেন। শান্তিপুরের এক টোলে ইনি নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। তারপর তিনি নবদ্বীপে আসেন। ইনি ছিলেন সেকালে বৈষ্ণব সমাজের গুরুস্থানীয়। ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য ও পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপবাসী সকলেই এঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। সেকালের ধর্ম্মব্যাখ্যা তাঁর ভাল লাগ্‌তনা। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব তিনি জানতেন। তাই ধর্ম্মের নামে লোকে অপধর্ম্ম অনুসরণ করছে দেখে তাঁর বড় দুঃখ হ'ত। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে সেকালের ধর্ম্মের দুর্দ্দশার কথা এইভাবে লিখেছেন—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকে সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করে জাগরণে।
বাসুলী পূজয়ে কেহ হয়ে একমন,
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

অদ্বৈত প্রভু এইরূপ লৌকিক ধর্ম্মাচরণকে অধর্ম্মই মনে করতেন। তিনি তাই ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতেন—"হে ভগবন্, যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় অধর্ম্মের উপদ্রব বাড়ে—তখনই তুমি অবতীর্ণ হবে—এ আশ্বাস তুমি দিয়েছ। এদেশে ধর্ম্মের গ্লানি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। হে প্রভু তুমি অবতীর্ণ হও। আর রক্ষা নেই।" বৈষ্ণবগণ বলেন অদ্বৈতের আহ্বানেই ভগবান শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপদে পল ভাবি করেন অর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

অদ্বৈত প্রভু দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। যখন শ্রীচৈতন্যদেব কিশোরবয়স্ক, তখনই তিনি বৃদ্ধ।

পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় মোহনিয়া
দাড়ি পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাইয়া।

তুই চরণ হ'তে তাঁর চেহারার একটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁর এই মূর্ত্তিই ভক্তগণের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আছে। অদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন—"জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। ভক্তি কিন্তু অন্ধ ভক্তিতে মুক্তি মিলবে না। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি চাই।" শ্রীচৈতন্যের সংসর্গে এসে তাঁর ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয়। তখন তিনি বুঝলেন—"কেবল ভক্তিতেই মুক্তি পাওয়া যায়। গভীর ভক্তির কাছে জ্ঞান তুচ্ছ। মুক্তির জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মহামূর্খ পতিত অধম ব্যক্তিও কেবল ভক্তির জোরেই মুক্তি পেতে পারে।" অদ্বৈত প্রভু যখন জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন, তখন তাঁর অনেক ছাত্র তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। আবার দু একজন শিষ্য তাঁকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার ব'লে প্রচার করতে লাগ্‌লেন। বাংলাদেশে তাঁরা সুবিধা করতে না পেরে আসামে গিয়ে তাঁরা তাঁদের মত প্রচার করতে লাগলেন।

অদ্বৈতের উপাধি ছিল বেদ পঞ্চানন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এঁকে শান্তিপুরের বুড়া মালী ও নাড়া বুড়া বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের মাতা শচী দেবী এই নাড়া বুড়াকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল—অদ্বৈতের প্ররোচনাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী এবং নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই অদ্বৈতের শান্তিপুরের বাড়ীতে দশ দিন ছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ লোক এই দশ দিন মহাসংকীর্ত্তনে পাগলের মত নেচে জ্ঞানের অভিমান একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। অদ্বৈত যখন পুরীধামে বাস করতেন তখন অদ্বৈত বৎসর বৎসর পুরী গিয়ে প্রভুকে দেখে আস্‌তেন।

অদ্বৈতের পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম নাড়া দেবী। তাঁর দুই পত্নী ছিল সীতা ও শ্রী।

হইয়া শ্রী সীতার পতি কত তপ করি নিতি
আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে।

ছয় পুত্র ছিল—তাদের মধ্যে তিন জন ছিলেন পিতার মত গৌরভক্ত—বাকী তিন জন পিতাকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈত এই তিন জন পুত্রকে ত্যাগ করেন।

ঈশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখেছেন—

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥

১২৫ বৎসর বয়সে অদ্বৈত দেহরক্ষা করেন।

কবি বলরাম দাস বলেছেন—

অদ্বৈত বন্দিব শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
নিত্যানন্দ চাঁদ সখা যার।
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি
উত্তম অধম জনে তরাইল ভক্তিদানে
এমন দয়াল দাতা নাই॥

উত্তম অধম মেলি করাইয়া কোলাকুলি
অন্ধ বধির যত আছে
পঙ্গুরা চলিল ধাএ হরি হরি বোলাইয়া
দুবাহু তুলিয়া তারা নাচে।
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য্য সেই
অনন্ত অপার রসধাম।
এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্যা
বঞ্চিত হইল বলরাম॥

কবিতা

রঙ্‌মশালের আলো

শ্রীসুধীর চন্দ্র গোস্বামী, বি, এ, কাব্যতীর্থ, কাব্যভূষণ।

শিশুমনের রঙ্‌মহালে—
রঙ্‌মশালের আলো,
জ্বালো আরও জ্বালো!
নাশো শিশুর অজ্ঞানতার
আঁধার নিকষ কালো,
জ্ঞানালোকের পীযূষ ধারা
ঢালো আরও ঢালো!
জ্বালো আরও জ্বালো,
রঙ্‌মশালের আলো!
শিশুমনের মণি-কোঠায়
বিবেক-মণি আলো ফুটায়,
মণির বুকে আজি লুটায়
তোমার রঙীন্ আলো!
রাঙিয়ে দিয়ে শিশুর মেলা
রঙে রাঙাও কিশোর খেলা,
আঁধার মাঝে চলার বেলা,
নাশো আঁধার কালো।
জ্বালো উজল আলো!
দাও প্রেরণা শিশুর মনে,
সঙ্ঘশক্তির সঙ্‌গঠনে,
জীবন-রণে জয় সাধনে—
কর্ম্ম পথেই চালো!
মুক্তিতরেই চিৎশোধনে,
ভক্তিজ্ঞানের উদ্‌বোধনে,
ঐক্যের ঐক্য- তান-বাদনে
মিলাও শিশুর ভালো!
জ্বালো সাধক জ্বালো.
শিশুমনের রঙ্‌মহালে—
রঙ্‌মশালের আলো!

গল্প

কারুক্ষে হাত দেখিয়ো না!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেবার রাঁচি গিয়ে পাগল হতে হতে অল্পের জন্যে বেঁচে ফিরেছিলাম সেই গল্প বলি।

মেয়েটি আমার হাত ধরে বল্‌ল: "হাত দেখে দেব আপনার?" ছোট্ট মেয়েটি!

তার জন্যে হাত ধরবার দরকার ছিল না। হাত দেখবার জন্যে এত করে সাধাসাধির অপেক্ষা করে না। কে না কাকে হাত দেখাতে চায়, বলো? কেউ হাত দেখে দয়া করে কিছু বলে' দিলে তো বর্ত্তে যাই।

ইতস্তত না করে' অম্লানবদনে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

"কী বল্‌বো বলুন?" এবার ভালো করে' আমাকে করায়ত্ব করে' বল্ল মেয়েটি: "আপনার দোষের কথা, না, গুণের কথা?" আমি একটু সমস্যায় পড়ি। ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ থেকে কি ধরণের আত্মজীবনী শোনা বাঞ্ছনীয় হবে সহসা ভেবে পাইনা।

"যা তোমার খুসি। হাতে যা যা বলেছে সব বলে দাও। কিচ্ছু গোপন কোরো না।"

"তবে আপনার দোষের কথাই বলি আগে।" বল্ল মেয়েটি: "উঃ, আপনার বিস্তর দোষ। আপনি একটি দোষের ডিপো, দেখা যাচ্ছে।"

আমার মন একথায় সায় দেয়। আমি যে একজন অতিশয় দুষ্ট ব্যক্তি সেবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিলনা। তবু লজ্জিত হয়ে কথাটা আমি চাপা দিতে চাই। বলি, "আমি কি খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবো?"

মারা যাওয়া ছাড়া আর কী আমি করতে পারি? দোষাবহ লোকের তো মারা যাওয়াই উচিত। সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। তাই মেয়েটির উক্ত আবিষ্কারের পর ঐ সদিচ্ছাটাই সব আগে আমার মনে আসে।

"তা যেতে পারেন। তেমন আশ্চর্য্য নয়। হার্ট্ লাইন্ আপনার খুব উইক্ দেখ্‌ছি। তা, কত তাড়াতাড়ি আপনি মরতে চান্?" জিগ্যেস্ করে মেয়েটি। আমার উইক্ হার্ট্ আর উইকেড্ হার্ট্ বড্ড বেশি টিপ্ টিপ্ করে। "আমি মরতে চাইনা।" একটু কিন্তু-কিন্তু হয়ে বলি।

"ওই আপনার আরেক দোষ।" আমার উত্তরে মেয়েটিকে হতাশ হতে হয়: "সবচেয়ে মহদ্দোষ। বলেছি তো আপনার দোষের অন্ত নেই।···আপনার আরেকটা দোষ হচ্ছে আপনি বড্ড একগুঁয়ে।···সমস্ত বাধাবিপত্তি আপনি পায়ের তলায় দলে' মথে' চলে' যান্।"

আমি পায়ের দিকে তাকাই। নিজের পায়ের দিক। ঘাড় হেঁট করতেই পদদলিত টেনিস্ স্যু'র দুর্দ্দশা চোখে পড়ে। একটু আগেই টেনিস্ খেলায় মেয়েটির কাছে উপরো উপ্‌রি তিন সেট্ হেরেছিলাম। খেলা জেতার পক্ষে, মেয়েটির চেয়ে ঐ জুতো জোড়াটাই বেশী অন্তরায় দাঁড়িয়েছিল। দলে' মথে' চ্যাপ্‌টা করে' ওদের আর কিছু বাকী রাখিনি।

"হ্যাঁ, কোনো বাধাকে বাধা বলে' আপনি মনে করেন না। পায়ের তলায় দলে পিষে দুম্‌ড়ে একাকার করে' ছাড়েন। একটা বাধা কোনোগতিকে একবার পড়লে হয় আপনার সাম্‌নে। কেন, এই একটু আগেই তো একটা বল্ হাক্‌ড়াতে গিয়ে একেবারে নেট্ টেট্ ছিঁড়ে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিলেন। নেটের বাধাকে আপনি বাধা বলেই গণ্য করেননি।"

আমি ঘাড় না ফিরিয়েই আড়চোখে ছিন্নভিন্ন নেট্‌টাকে দেখি। দুধারের বংশরক্ষায় লট্‌কানো জয়পতাকার মতো উড়তে দেখা যায় ওদের। ওই কীর্ত্তির জন্য খানিক আগে আমাকে অপ্রস্তুত হতে হলেও, এখন ওর মূল কারণ টের পাওয়া গেছে। আমি যে এমন অব্যাহত, এতটা দুর্দ্দমনীয়, বাধাবিপত্তিদের এতদূর অবাধ্য তা কে জান্‌ত? আমি নিজেও না।

"আপনার আরেকটি দোষ আপনি ভারী কঠোর-প্রকৃতি। আপনি,—মানে, আপনার স্বভাব—অর্থাৎ সমস্ত জড়িয়ে আপনি খুব সুবিধের লোক নন্।"

ওর কথাটার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হতে যদ্দুর পারি চোখমুখ পাকিয়ে আমি কটমট হবার চেষ্টা করি। কতটা পেরে উঠি জানিনে। (অপরের চক্ষে নিজেকে প্রত্যক্ষ করা খুব কঠিন।)

"আর, কোনোকিছুর ওপরেই আপনার আস্থা নেই। ভারী সন্দেহপরায়ণ লোক আপনি। এইগুলি হোলো আপনার দোষ। এইবার আপনার গুণের কথা বলি—"

গুণের কথা কানে আসতেই নিশ্চয় আমার কানের ডগা লাল হয়ে উঠেছিল, সাম্‌নে আয়না না থাকায় দেখা যায় না। আরক্ত মুখে আমি নিজগুণ বর্ণনার অপেক্ষা করি।

"আপনার একমাত্র গুণ হচ্ছে মনটা আপনার দিল্‌দরিয়া। গুণের মধ্যে আপনি লোকটা উদার। একটু কোমল স্বভাবই হয়ত বলা যায়। কেউ কিছু চাইলে কিছুতেই আপনি 'দেব না' বলতে পারেন না। 'না' বলা আপনার কুষ্ঠিতে নেই। এই যা একটু গুণ—একমাত্র সদ্‌গুণ দেখছি আপনার।"

এই বলে' আমার সমস্ত দোষগুণ যোগ করে' জড়ীভূত করে মেয়েটি একটা সাম্ টোটাল্ বানালো:

"এই যৎসামান্য গুণটিকেও আপনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পেরে ওঠেননি কিছুতেই। হ্যাঁ, এইগুলিই হোলো আপনার দোষ—এখনো বেশ উদার, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি, সন্দেহবাদী আর একগুঁয়ে, ভয়ানকরকম একগুঁয়ে। চলি আমি, কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

এইভাবে আমার উপসংহার করে' একছুটে সে চলে গেল। পাশের বাড়ীতে অন্তর্হিত হয়ে গেল চকিতে। আমি নিজের হাত ধরে' তারপরও খানিকক্ষণ বসে' থাক্‌লাম। বিচ্ছিন্ন নেট আর বিদলিত টেনিস্ স্থর দিকে ভ্রূক্ষেপ করতে লাগ্‌লাম থেকে থেকে।

কদিনমাত্র হোলো বায়ু-পরিবর্ত্তনে রাঁচিতে পদার্পণ করে' সব প্রথম পাশের বাড়ীর এই মেয়েটির সঙ্গেই ভাব হয়েছিল আমার। ফার্স্‌ট্ ক্লাসে না কি ফার্স্‌ট্ ইয়ারে পড়ে—আর যেমন পড়ায় তেম্‌নি খেলায়। টেনিসের বল্ তো ওর র‍্যাকেট্ ফস্‌কে ভুঁয়ে পড়তেই পায় না বল্‌তে গেলে।

মেয়েটির বাড়ীর লোকজনের সঙ্গেও এক আধটু পরিচয় যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু তাদের ভালো করে' চেনবার আগেই ওদের দুহিতার দৌলতে আত্মপরিচয় লাভ করার সৌভাগ্য আমার হোলো। আকস্মিক তার ধাক্কায় মুহ্যমান হয়ে আছি, এমন সময়ে—

মেয়েটির ছোটভাই এসে বল্ল আমায়: "আপনার র‍্যাকেট্‌টা একবার দেবেন? আমাদের কোর্টে একটু খেলব?

"এটা নেবে? তা নাও। খ্যালো গে—আর হ্যাঁ, এটা তোমায় আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। দিয়ে দিলুম একেবারে।"

খানিক বাদে মেয়েটির বড় ভাই এসে আমার সাইকেলটা ধার চাইলে। হাজারিবাগ বেড়াতে যাবে—দুএকদিনের জন্যে কেবল।

এবার আমার অম্লান মুখে ইষৎ ছায়া পড়ে। মুখের নৈঋৎ কোণটা একটু মেঘলা হয়ে আসে। ঝড় উঠবার মত হয়। সাইকেল্‌টা আমার ভারী আদরের—আর এই সেদিনের কেনা—তা হোক্! আমি—আমি যে কিঞ্চিৎ উদার-প্রকৃতির একথা তো ভোলা চলেনা তাবলে'। সাইকেলটা আমি ধার দিই।

দিতে অবশ্যি আমার বাধ বাধ ঠেকেছিল, সন্দেহবাদী মন না না ক'রে উঠেছিল—বলেছিল, এ সাইকেল আর তুমি ফিরে পাচ্ছ না,—এমনকি আমার স্বভাবকঠোর প্রকৃতিও হাঁ হাঁ করে' উঠ্‌তে দ্বিধা করেনি। কিন্তু হলে কি হবে, এখনো—এখনো যে আমি উদারতার শেষ আশ্রয়, সেকথা এর মধ্যেই ভুলে যাই কি করে'? কাজেই অন্তর্গত সমস্ত বাধা ইত্যাদি দুড়মুষ করে' ফেলতে আমার দেরি হয়নি।

রাত্রের দিকে মেয়েটির বাড়ীর চাকর এসে দরজায় ধাক্কা দিল: "আপনার ক্ষুরটা একটু দেবেন মশাই? দিদিমণির পেন্‌সিল্ বাড়ব?"

নাঃ, ঠিকই বলেছিল মেয়েটি। আমার আত্মাপুরুষ স্বভাবতঃই একটু নিষ্ঠুর—এমনকি, এই মুহূর্ত্তেই হিংসার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে উঠে ঘোরতর একটা লণ্ডভণ্ড করবার আমার লালসা হয়েছিল। লালসা হয়েছিল ওই ক্ষুর পেন্‌সিলের গোড়ায় না দিয়ে, সহাস্যবদন উক্ত ভৃত্যের গলায় বসিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু সাধ হলেও আমার সাধ্য হোলো না।—আমি—আমি যে—আমি যে একটু—!

ক্ষুরটা আমি পরিত্যাগ করলাম। জন্মের মতই ছেড়ে দিলাম। যত দোষই আমার থাক্, কিন্তু এখনো আমি—হুঁ!

পরের দিন সকালে মেয়েটির খুড়ো এলেন। ক্ষুর হাতে করেই বলা চলে, বেশী ভণিতা না করে—বেশী নয়—শ তিনেক টাকা তিনি ধার চাইলেন। তিন মিনিটের মধ্যে তিনশো টাকা খসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তিনি। অদৃশ্য ক্ষুরটা আমার গলায় বসিয়ে গেলেন।

একটা চৌখা কাগজে একখানা হ্যাণ্ডনোট্ লিখে নিয়ে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু সেটা গ্রহণ করা আমি বাহুল্য বোধ করলাম। মন বল্লে, অনর্থক। এ অর্থ একেবারেই জলে গেল। কাগজের জলাঞ্জলি নিয়ে কী হবে? আমার সন্দেহবাদী মন তো সন্দেহ করবেই, প্রত্যেক পদে করবে, জানা কথা। এমনকি, এই ব্যাপারে সে আমার চার হাতে পায়ে ক্ষুর আছে বলে' সন্দেহ করতে লাগল। করুক্, কিন্তু তা বলে' আমার স্বভাবসিদ্ধ উদারপ্রকৃতির যেটুকু ছিটেফোঁটা এখনো বজায় আছে তাকে তো অবহেলা করা যায় না। এবং সত্যি বল্‌তে, তাই আমাকে ভাবিত করে' তুলল। আর কিছু না, আমার প্রকৃতি-সুলভ উদারতাই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো আমার। এ রকম চল্‌লে, এই জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাক্‌লে—অ্যাঁ, কতদিন এরকম চল্‌তে পারে?—আমার নিজের বলতে কিছু আর থাক্ বা না থাক্, আমি নিজেই ঠিক থাকব কিনা কে জানে! হয়ত আমাকেই শেষে উদারতার প্রাবল্যবশেষরূপে এই রাঁচীরই আর কোথাও সরকারী কোনো অতিথ্‌শালায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চূড়ান্ত হয়ে থেকে যেতে হবে নাকি? যতই ভাবি ততই আমাকে আরো ভাবিত করে। অবশেষে—

অবশেষে আর কি, কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে' কলকাতায় পালিয়ে আসতে পেরেচি।

কাউকে হাত দেখালে যথাসর্ব্বস্বের সাথে নিজেও বেহাত হয়ে বিপদে পড়তে হবে এমন ফাঁড়ার কথা নিশ্চয়ই আমার হাতে লেখা ছিল না। কারো হাতেই থাকে না বোধ হয়। থাক্‌লে সেই চমৎকার মেয়েটি, অবশ্যই আমাকে বলত। কিন্তু সে না বল্লেও আমি বলি: কারুক্ষে তোমার হাত দেখিয়ো না। সাবধান!

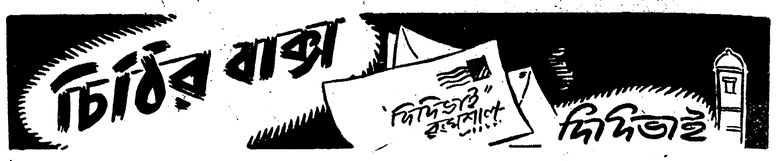

"মানুষ কাঁদিছে, মানুষ মরিছে, বেঁচে আছে তরবার
এর চেয়ে সেই বন্যজীবন ভাল ছিল শতবার—।"

আমার বন্ধুরা !

৺বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও স্নেহ তোমাদের জানালাম। আমাদের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব এবারের মত শেষ হয়ে গেলো—কিন্তু আমাদের দুঃখের দিনের কি শেষ হলো? শেষ হলো কি বুদ্ধিজীবিদের অপমৃত্যু? এ দেশের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের মুখের দিকে তাকালে কি বোঝা যায় যে সমস্ত বাংলা মৃতপ্রায়? তাই বলি এগিয়ে এসো। নিজেদের বাজে খরচ, বাজে ব্যয় আর অপব্যয় কমিয়ে, সিনেমা থিয়েটার বন্ধ করে, বিলাসিতা না করে, এদের একজনকেও অন্ততঃ একদিনের জন্যও যদি ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারো, প্রাণ বাঁচাতে পারো সেই হবে তোমাদের সব চেয়ে বড় কাজ। জানি—লঙ্গরখানা খুলে আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে একটা জাতি বাঁচে না কিন্তু সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ যেটি—সেই তো ভেঙ্গে পড়ছে—তারা না থাকলে আমরা তোমরা যে থাকবে না। মজুর আর কৃষক যদি হেজে পচে যায় তাহলে যারা ঐশ্বর্য্যের পাহাড়ে বাস করছে তারাও যে শুকিয়ে উঠবে। আমি মনে করি জাতির শোকাবহ যুগ এটা। বিলাসিতা আর অপব্যয় এযুগে পাপ। তোমরা এগিয়ে এসো—এদেশের ছেলে মেয়েদের বাঁচাবার কাজে। যার যা আছে—তা যতই অল্প হোক এসে যায় না। তোমাদের সাড়া পেয়ে তারা কৃতার্থ হবে।

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি—

"আচ্ছা, আজকাল তো প্রতি কাগজেই দেখছি, একটা না একটা ছোটদের আসর খোলা হয়েছে কিন্তু এতে কি শিশু সমাজের কোনও উপকার হবে বলে আশা করতে পারি, আমার ধারণা এতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হবে এবং হচ্ছেও। আমার ধারণা ও অভিমতের সঙ্গে তোমার মতের মিল আছে কিনা জানিনে তবে এসম্বন্ধে তোমার ও রংমশালের বন্ধুদের সঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই।"

সুশীলকুমার মণ্ডল (টালিগঞ্জ)

"সংসারে পিতামাতার পর তুমিই তো আমার চিত্তে আসন পেতেছো—তাই তোমায় না লিখে পারি না। আজ আর আনন্দ নেই দিদিভাই, চারদিকে শুনছি দেশবাসীর মুমূর্ষু আর্ত্তনাদ। এখানকার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অনাহারে প্রতিদিনই লোক মারা যাচ্ছে। আমাদের আশীর্ব্বাদ করো এই অবস্থা হতে মুক্তি পেয়ে যেন যোগ্য উত্তর দিতে পারি।···দেশকে ভালবাসতে কেন পারবো না দিদিভাই ?"···

জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ দস্তিদার (শ্রীনগর)

এগিয়ে এসো বন্ধুগণ! দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশ ও দশের মানুষের মত বাঁচবার জন্য কোন বাদ-বিচার না করে এগিয়ে এসো। বাংলা মায়ের কোল জোড়া সন্তান বলে যারা একদিন আমাদের গর্ব্ব ছিল তাদের সবাইকে আমরা হারাতে বসেছি। আজকে এই আমাদের সত্যিকারের কাজের মত কাজ করতে যাওয়ার দিনটিকে আশীর্ব্বাদ কর। শক্তি দাও, বল দাও আর দাও বাণী। যে বাণী দিয়ে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোনদিনই পিছু-পা না হই।···যে ক'টি কথা ক'দিন থেকে আমার মনে পাগলের মত ছুটাছুটী করছে তোমায় তা জানালাম। চিঠির

'আশা ও ভাষা' পর্য্যায়ের বরুণের কথা সত্যি আমায় উদ্দীপ্ত করেছে। এখন তাদের মতই আরো সবাইএর আসন বেশী।

রবীন্দ্রনাথ মজুমদার (খাগড়া)

তোমাদের চিঠির জবাব—

রবীন্দ্র মজুমদার (১৫২৫) খাগড়া। তোমার চিঠির মাঝে যে কথা আছে তা তোমার একার নয়। দেশের সকল ছেলে মেয়েদের ছোট্ট বুকের ভিতর একথা বাজছে। যতটুকু পারো সংগ্রহ করে এদের বাঁচাও। সময়ে একক সাহায্য তুচ্ছ নয়। কাজে পরিণত করো তোমার মনের কথাকে। **সুশীলকুমার মণ্ডল** (টালিগঞ্জ) প্রশ্ন নিষেধ কেন হবে? এ আসর তোমাদের, আমার নয়। তোমার বিজয়ার কবিতালিপি সুন্দর। তোমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে—তুমি কি তাদের একজনকে একটি দিনের সাহায্য করেছ? তোমাদের কাজকে বড় করে তোলো। **জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ দস্তিদার** (১৯৪১) শ্রীনগর। শক্তির অধিকারী হতে চাও সে কি শুধু আমার আশীষেই হবে? নিজের শক্তিকে জাগ্রত করো প্রতিদিনকার ছোট সেবা ও সঙ্কল্প দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ ভাদ্রমাসের জন্মষ্টমীতে ১৮৭৮ সালে। **সুধীর চট্টোপাধ্যায়** (১৯৪৯) জামসেদপুর। তুমি ডাকটিকিট বদলাতে চাও জানিয়ে দিলুম ভাই-বোনদের—কিন্তু কেমন করে সম্ভব হবে জানি না। তোমার তিনটী প্রশ্নের জবাব একটি—'হাঁ'। **আবদুল গফফার চৌধুরী** (১৫১৯) বরিশাল। তোমার পাঠান বইখানি পুরোণো বলে বড় মলিন হয়ে গেছে। ওটা কি পুরস্কার হিসেবে চলে ভাই? **সুনীল বন্দোপাধ্যায়** (১৯৭৩) বোলপুর। তোমার নাম সুনীল বলে অন্য কারো থাকতে নেই—বাড়ীর নামের বেলা একথাই খাটে, এতে কিছু আসে যায় না কিন্তু একনামে দুটি প্রতিষ্ঠান হলে গোলমালের সম্ভাবনা খুব বেশী। লেখা দুটি বিবেচনার জন্য যথাস্থানে দিয়েছি। **দেবকুমার চৌধুরী** (১৯১৩) কালীঘাট। তোমার চিঠি তোমার অন্তর দুঃখ বহন করে এনেছে। লঙ্গরখানা খুলে এক হাতা বিতরণ করে একটা জাতিকে এভাবে বাঁচান যায় না মানি—কিন্তু উপায় কি? অসহায়ভাবে একজনকে মরে দেখে যদি ভাবি তাকে বাঁচানো সরকারের কাজ তাহলে তোমার আমার মনুষ্যত্ব রইল কোথায়? সঙ্কোচ কেন—যা পারো করে যাও। **অধীর দাস** (১৩৪২) বরিশাল। প্রথম বর্ষের রংমশালের সব সংখ্যা নেই। কয়খানা সংখ্যা ভাল লেগেছে জেনে আনন্দ হলো। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও পৌষ নেই, বাকী আট মাসের আছে। না, ও পত্রিকাটী বন্ধ আছে। **রণজিৎ বিশ্বাস** (১৯২৫) চট্টগ্রাম। রবীন্দ্র-সংখ্যা খুসী হয়েছ—তুমি ও তোমার আত্মীয় স্বজন—জেনে খুসী হলাম। না, আমার কোনও বই নেই। **নিলিমা, উমা, সমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** (১৫৫০) আজমীর। আগে জবাব দি সমরেন্দ্রের, সে প্রথম এসেছে—এ আসরে। তোমায় আদর করে ডেকে নিলাম সমরেন্দ্র, আঁকা বাঁকা অক্ষরে চিঠি ভাল লাগলো। নিলিমা, তোমার চিঠির উত্তর দিইনি? আমি তো ভেবেই পাই না, মনে করো, যারা দূরে আছে তাদের আমি ভালবাসি! বাংলাদেশের জন্য দুঃখ করেছ—তাকে দুঃখের সময় একটু সাহায্য দিতে পারো না! উমা, তোমার জবাব শেষে—রাগ করো না, ভূতের চেহারা আমার মত। **জ্যোতির্ম্ময় দাস** (১১১৭) তেলেনীপাড়া। তোমাদের পরস্পরকে জানানো বিজয়া প্রীতি জানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এই সুন্দর পদ্ধতিটী অন্য ধর্ম্মেও আছে। সেদিন দিনটা আমাদের শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে মিলনের দিন ভারী সুন্দর রীতি। রাণীচন্দের 'ঘরোয়া' বইটা পড়। অবনীন্দ্রনাথের শরীর ভাল নয়, তাঁকে এখন ব্যস্ত করা কি ঠিক হবে? যদি সম্ভব হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী তোমাদের উপহার দেবো। **অমিয়া চট্টোপাধ্যায়** (১২৯১) পুরুলিয়া। তোমার

চিঠিতে প্রাণের স্পর্শ। দুঃখের দিন অবসানের জন্য শুধু প্রার্থনায় কি কাজ হবে বোন? প্রতিকারের উপা আছে তোমার, আমার সকলের হাতে। **দিলীপ দে চৌধুরী** (১৯৫১) কলিকাতা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হয়, মনের অবস্থা ভেদে একই জিনিসকে বিভিন্ন বলে মনে হয়। দুঃখের দি একটি মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারো বন্ধুর বেশে—সেখানেই হয় দেবতার আবির্ভাব। ভগবানের উপ সব ভার না চাপিয়ে যদি প্রত্যেকে কিছু কিছু করি তাহলে দুঃসময়ের দিনের চেহারাটা বদলে দিতে পারলেও—দুঃখ খানিকটা লাঘব করতে পারবো তো? **সাধনচন্দ্র বসু** (১৫২৩) কলিকাতা। আন্তরিকতা ভরা তোমার চিঠি। কথার চেয়ে কাজের দাম বেশী নয় কি? এ সময়ে পরম নিশ্চিন্ততার ভিতর যে বসবা করতে পারে সে হয় দেবতা, নয় দানব—মানুষ নয়। **সাধনা ও রেণুকা বিশ্বাস** (১৬৮২) অধঃপতনের চট্টগ্রাম তোমাদের দীর্ঘ চিঠি মন দিয়ে পড়লাম। আত্মসুখ ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা জাতিকে দিকে টেনে নিয়ে যায় পূজার দিনে আর্ত্তের সেবা করেছ—এবং রিলিফ্ ফাণ্ডের জন্য যে টাকা পাঠিয়েছ সেজন্য তোমাদের কি বলবে ভেবে পাচ্ছি না। ভাল কাজে ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে। মায়ের আশীর্ব্বাদকে সার্থক করো বাস্তব জীবনে আমার নমস্কার মা, বাবাকে দিও। **ছবি দেব** (১৭৬৪) শ্রীহট্ট। লেখনী বন্ধু হিসেবে কাকে চাও অবস্থা সর্ব্বত্র সমান। চোখের জলে কি এ দুঃখ ঘোচান যায় ভাই? যতটুকু পারো তাই করো **রহিমা খাতুন** (৭৭৭) ঢাকা গ্রাঃ। দিদিভাইএর উপর চটে গিয়ে পরিচালক মশাইকে পত্রাঘাত করেছ—অ উত্তর সেই দিদিভাইকেই দিতে হচ্ছে— কী বিপদ বলোতো? আবার পত্রিকা পাঠান হয়েছে পেয়েছ তো দুষ্টু দিদিভাই বেশী করে ভালবাসবে একথা জানিয়েছেন। **প্রবোধ বসু** (১৭৭৪) মেদিনীপুর। চিঠি দি উত্তর পাওনা সেটা যে ভুল কথা তার প্রমাণ আমার এই উত্তর। তোমার হাসির কবিতার বই বেরোচ্ছে জে সুখী হলাম। যা পাঠিয়েছ যোগ্যস্থানে গেছে—সুযোগ্য হলে ছাপা হবে। সাড়া তো দিয়ে যাচ্ছি ভাইবোনে অন্তরে সে সাড়ার সুর হয়তো ঠিক ধরা পড়ছে—এতো হতে পারে। মেদিনীপুর বাংলার শ্রেষ্ঠ ত সব দিক থেকে—এবং সেখানকার অধিবাসীরা যে আন্তরিক সাড়া দেবে তা জানি। **আশীষ দত্ত** (১৫৬ শ্রীহট্ট। তোমার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম—পৃথকভাবে ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠি দিয়েছ তিনি পেয়েছেন—জানা বলেছেন। বাংলা প্রগতিশীল ভাষা বলে চীৎকার করলে আর মাঝে মাঝে সভাসমিতি করলে কি হবে তাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্যে স্থির নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠান কাজে নামেনি বাংলাদেশে বড়লোক বাঙালীর অভাব নেই অথচ দেশের দুঃসময়ে বা জাতির মঙ্গল কামনায় কে এগিয়ে এসেছে বলো তো? এসব দেখে বড় কষ্ট হয় মনে। **সাধনা ও রেণু বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম) একটি সুন্দর চিঠি পেয়েছি —সেটা তোমাদের উপহার দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত হচ্ছি। যদি স্থানাভাব না ঘটে, পরের বার তোমাদের উপহার দেবো।

মীরা, হীরক, মিহির সেন, অসীম দেব গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ কাঞ্চী, জিতেন্দ্রনা **প্রামানিক, শ্রীনাথ রাউথ** (রংমশাল যেগুলি চেয়েছ প্রতিসংখ্যার দাম ছ'আনা পড়বে। ৫০ সালের বৈশাখে দাম পাঁচ আনা) **বিনীতা ঘোষ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, রণজিৎ বিশ্বাস** ও **দুলাল সেনগুপ্ত,** রেখা বসু **অপূর্ব্বলাল মজুমদার, বয়েজ লাইব্রেরী জলপাইগুড়ি, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অজিত** ভট্টাচার্য্য **বরেন্দ্র বর্ম্মণ, বিভূতি** ইত্যাদি তোমাদের চিঠি যত্ন করে রাখলুম—পরে তার উত্তর দেবো।

সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা আর একবার নাও। ইতি, তোমাদের—

দিদিভাই

চলতিকা

পৃথিবীর মানবতার কল্যাণকামী দরদী ফরাসী মহামনিষী রোঁমা রোঁলা (Romand Rolland) নাৎসী কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী এক শ্রেষ্ঠ ঋষি, দার্শনিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক হারাল। ভারত হারাল তার এক পরম বন্ধু যিনি ভারতীয় কৃষ্টি, দর্শন ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। গান্ধীজি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী লিখে রোঁমা রোঁলা তাদের বাণী ইউরোপে প্রচার করেছিলেন। নাৎসীনীতির তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী ছিলেন, তাই নাৎসীরা তার মত মহাপ্রাণকেও শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। রোঁমা রোঁলা ছিলেন যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকামী। রোঁমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও এক-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। বিখ্যাত নভেল 'জ্যাঁ ক্রিস্তোফা' লিখে তিনি ১৯১৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ-করেন। ইউরোপের ক্ল্যাসিকাল গানবাজনা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি নানা পুস্তকে বেটোফেন, মাইকেল এঞ্জেলো, টলষ্টয় প্রভৃতির জীবনী ও তাঁহাদের প্রতিভার আলোচনা করেছেন। আজ ইউরোপের রক্তাক্ত রণভূমিতে বন্দী অবস্থায় এই অমানব অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিশুর মতই বলি হলেন। সমস্ত শান্তিকামী পৃথিবী সমগ্র ভারতভূমি তাঁর অমর আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করবে।

মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হতভাগ্য বাংলাদেশের শবযাত্রার আজও কোন শেষ সীমানা দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। খুব কম করে হিসেব ধরলে দশ হাজারের বেশী লোক বাংলা দেশে প্রতি সপ্তাহে শুধু দুর্ভীক্ষের দরুণ মারা যাচ্ছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন অক্টোবর ১৮ই যে সপ্তাহ শেষ (দুর্গা পূজার পরের সপ্তাহ) কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা (সাধারণ ও দুর্ভীক্ষ) জানিয়েছেন ২,১৫৪। অথচ আজও যথার্থভাবে বাংলা দেশের এই অন্ন-সমস্যা, এই চরম জীবন মৃত্যু সমস্যার কোনরূপ প্রতিবিধান হ'ল না। এই অবস্থার যদি উন্নতি না হয়, যদি এমনিভাবে রোগে ও দুর্ভীক্ষে বাংলার লোক মরতে থাকে, তাহলে বাংলা আর কতদিন জীবিত থাকবে। এখনই সকলে মিলিত হয়ে এর প্রতিবিধান না করলে, গভর্ণমেণ্ট এই কাজে দল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জনগণের সঙ্গে না হাত মেলালে, এর সম্পূর্ণ প্রতিকার কখনই সম্ভব হবে না। এবং মৃত্যুর হার দিনে দিনে বেড়ে যাবে।

লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হয়ে এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রণাঙ্গণের সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক হয়ে ভারতে আগমন করেছেন। এঁরা দুজনেই যোদ্ধা, সামরিক কলা বিদ্যায় পারদর্শী। ভারতবর্ষ আজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া রণভূমির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযান এখান থেকেই পরিচালিত হবে। ভারতে লর্ড ওয়াভেল এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে আশা করা যায় দেশের সরকারী রাজনৈতিক এবং যুদ্ধনৈতিক ক্ষেত্রের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। আজ দেশের খাদ্য-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যার যে চরমে দাঁড়িয়েছে, তার আশু পরিবর্ত্তন করাই এখন সবচেয়ে জরুরী দরকার।

রুশ-জার্ম্মান রণাঙ্গনে ক্রিমিয়া ফ্রণ্টে মেলিটোপোলের যুদ্ধ চূড়ান্তে পৌঁচেছে। রুশ লাল সেনানী জার্ম্মাদের সব এলাকা থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করছে। জার্ম্মানরা মরিয়া হয়ে লড়ছে কিন্তু প্রচণ্ড রুশবাহিনী স্রোত তারা রুখতে

পাচ্ছে না। নানাস্থানে শত্রুব্যূহ ভেদ করে রুশসৈন্য তাদের ক্রম অগ্রগামী ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করছে। কিয়েভের উত্তরে রুশরা নীপার নদীর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছে। এই দুর্দ্দান্ত যুদ্ধে রুশরা জয়লাভ করলে এবং সেই জয়ের আশা এখনই দেখা যাচ্ছে, তাহলে জার্ম্মানরা আর রুশ রণাঙ্গণে কোথাও টিঁকতে পারবে না এবং সমগ্র ইউক্রেন অঞ্চলও রুশেদের হাতে ফিরে আসবে।

এদিকে ইতালীর যুদ্ধে বা রোমের যুদ্ধে ভলটুরনো এলাকা মিত্রশক্তির হাতে পড়ে শত্রু-নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অবশ্য নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের এলাকা এখনও জার্ম্মান সৈন্যদের হাতে এবং এর সম্মুখে মিত্রশক্তিদের বীরত্ব ও রণ-কৌশলের পরীক্ষা সমুপস্থিত। জার্ম্মান কামান ও গোলার মুখেই মিত্রশক্তির বিপুল বাহিনী অগ্রসর হয়েছে। এই পাহাড়ের এলাকা অধিকার করতে না পারলে রোমের পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত হবে। তবে রোমের যুদ্ধ যে ভীষণভাবে শুরু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান শুরু হয়েছে।

বিখ্যাত সাংবাদিক এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণের কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। তাঁর মত নির্ভীক স্বাধীনচেতা সাংবাদিক ও কর্ম্মী হারিয়ে বাংলা ও তথা ভারতবর্ষ আজ যে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সে কথা বলা বাহুল্য। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় তাঁর সতেজ নির্ভীক সম্পাদকীয় মন্তব্য অনুপ্রেরণা জাগাত এবং সকল সম্পাদকদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। তাঁর সরল সহজ ব্যবহারে তাঁর মধুর অমায়িক চরিত্রে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করতেন। অনাড়ম্বর ভাবেই তিনি জীবন যাপন করতেন ও তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন। বাংলার বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীকে বিরাট দানে তিনি ঋণী করে গেলেন। আমরা তাঁর আত্মার আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি।

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বইগুলি তোমরা পড়েছ কি? বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে তাঁর এই বইগুলি পড়ো।—

তরুণ তুর্কী—	১৸০
আজকের আমেরিকা—	২॥০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরণ বিজয়ী চীন—	৩॥০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	২॥০

কলিকাতার বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামত এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে

১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায়

কন্‌ট্রাক্টার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

সম্পাদকের সম্ভাষণ

তরুণ, শ্যামল বন্ধুগণ,

বিজয়ায় তোমাদের শুভ ইচ্ছা ও নমস্কার থেকে বঞ্চিত হইনি। এইটুকুই আমার পুরস্কার।

তোমরাও আমার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ প্রতি-নমস্কার নাও।

তোমাদের প্রত্যেককে আলাদা ক'রে পত্র লেখবার সময় বা শক্তি আমার নেই। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককে আমি আলাদা ক'রে দেখি না। তোমাদের দেখি সমগ্র ভাবে। কি রকম জানো?

যখন কোন বড় বাগানের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়াই, তখন আমরা কি দেখি? দেখি লাল, নীল, গোলাপী, বেগুনী, হল্‌দে ও সাদা রংবেরঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফুটে আছে থাকে থাকে কত-রকমের ফুল! তাদের কারুকে দেখে মনে হয় রামধনুকের বাণ-ভরা তূণ, কারুর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রূপোলী জোছনার ঢেউ, কারুর বুক গড়া ঠিক প্রভাতী রোদের কাঁচা সোনায়। তাদের কেউ চাঁদের থালার মতন বড়, কেউ ধ্রুবতারার মতন ছোট, আবার কেউ বা জোনাকীর মতন বিন্দু-পরিমাণ। কিন্তু আর কেউ তাদের আলাদা আলাদা ভাবে এত মেপেজুকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে দেখে না,—বাগানের মালী আর মালিক ছাড়া।

আমরা সাধারণত বাগানের ভিতরে গিয়ে দেখি, নানা দিকে নানা জাতের নানা রঙের ফুলেরা মিলে সৃষ্টি করেছে স্বপ্নশোভন কাব্যমধুর বিচিত্র ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অপূর্ব্ব এক সৌন্দর্য্যলোক। সেখানে ছোট্ট বকুল শিউলী জুঁই বেলা থেকে মস্ত জহরী-চাঁপা পদ্ম আর সূর্য্যমুখী পর্য্যন্ত সবাই যেন মিলে-মিশে এক হয়ে গ'ড়ে তুলেছে রঙের জগতে একটিমাত্র অখণ্ড রূপের বৃহৎ মূর্ত্তি। তার ভিতরে গিয়ে মুগ্ধ মন আর লুব্ধ চোখ আনন্দে এমন দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, তখন আর আলাদা ক'রে দেখবার উপায় থাকে না—কে বড় কে ছোট, কে সাদা কে কালো, কে কম-ভালো কে বেশী-ভালো! চোখ দেখে, এরা সবাই মিলে একমাত্র সুন্দরেরই মূর্ত্তি গঠন করেছে।

তোমাদেরও আমি ফুলের বাগানের মতন মনে করি। সেখানে তোমরা শিশু বালক যুবা সবাই আছ এবং সবাই মিলে-মিশে এক হয়ে সৃষ্টি করেছ একটিমাত্র অখণ্ড ও জীবন্ত রূপের মেলা।

কাজেই তোমাদের আলাদা আলাদা ক'রে নাম ডেকে সম্বোধন করবার দরকার নেই।

ইতি—

তোমাদের

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জানো কী ?

ফিলিপিনের নিকট প্রশান্ত মহাসাগর এত গভীর যে হিমালয়ও সেখানে ডুব-সাঁতার দিতে পারে। এই এলাকায় প্রশান্ত মহাসাগর ৩৫,৪০০ ফিট গভীর, পৃথিবীর কোন সমুদ্রের কোন অংশই এত গভীর নয়।

* * * * *

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে যে সহর, তার নাম হেমারফেষ্ট (নরওয়ে), সুমেরু বৃত্ত থেকে ২১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

* * * * *

পৃথিবীর উচ্চতম নির্ম্মাণ হ'ল মস্কোর 'সোভিয়েট প্রাসাদ'—১৩০০ ফিট উঁচু।—অর্থাৎ একটি ছোট পাহাড়। এরপর হ'ল আমেরিকার এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং।

* * * * *

'May-Fly' ২৪ ঘণ্টার বেশী বাঁচে না! প্রজাপতির আয়ু ২ মাসের বেশী না। পিঁপড়ে ১ বছর বাঁচে, হাঙ্গর-কুমীর ৩০০-৪০০ বছর বেঁচে থাকে কিন্তু নীলতিমি স্বচ্ছন্দে ৫০০ বছর বেঁচে থাকতে পারে।

* * * * *

পাখীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত হ'ল 'Swift' পাখী, ঘণ্টায় এরা ২০০ মাইল বেগে যেতে পারে। বাজপাখীও কম দ্রুত নয়, এরা ঘটায় ১৫০-১৮০ মাইল বেগে যেতে পারে। পায়রাও বেশ দ্রুত যেতে পারে—ঘণ্টায় একশ' মাইল তো বটেই। জন্তুদের মধ্যে চিতাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত।

* * * * *

পৃথিবীর যতগুলি ভাষা আছে, তাদের মধ্যে সংস্কতের অক্ষর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। সংস্কত ভাষার অক্ষর সংখ্যা হ'ল—৪৪। Celtic ভাষার অক্ষর সংখ্যা সব চেয়ে কম—মাত্র ১৭টি।

* * * * *

কোন্ দেশের মেয়ে পুরুষদের আয়ু গড়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী? অষ্ট্রিয়ার মেয়েদের আয়ু গড়ে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বেশী। এঁদের আয়ুকাল গড়ে ৬৭·১৪ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নেদারল্যাণ্ডের পুরুষদের আয়ু, গড়ে ৬৫·১ বছর—কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মেয়েদের চেয়েও কম। ভারতবর্ষের মেয়েপুরুষদের আয়ু এঁদের তুলনায় হাস্যাস্পদ। ভারতে পুরুষদের আয়ু গড়ে মাত্র ২৬·৯১ বছর, মেয়েদের আয়ু গড়ে ২৬·৫৬ বছর!

* নূতন ধাঁধা *

(১) ৭৭৭৭·····

একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ৭৭৭৭·····সবই ৭, এই সংখ্যাটি ১৯৯ দিয়ে ভাগ করা যায়, (বাকি কিছু থাকেনা)। সমস্ত ভাগফল না বার করে, ভাগফলের শুধু শেষ চারটি সংখ্যা কি ও কি করে বার করা যায় বল ?

(২) **ভেড়া ও আপেল—**

একটা খোলা মালগাড়ি ঘণ্টায় দশ মাইল আন্দাজ বেগে যাচ্ছিল (এঞ্জিন থেকে ছাড়া খেয়ে)। এই খোলা গাড়িটার ওপর পিছন দিকে একটা ছেলে একটা ভেড়াকে ধরে দাঁড়িয়েছিল। এখন সামনের দিকটায় গাড়ীটার ওপর কেউ একজন একটা লাল আপেল কায়দায় ব্যালেন্স করে রেখেছিল। ভেড়াটার নজর বার বার পড়ছিল ঐ লাল আপেলটার দিকে। হঠাৎ ছাড়া পেয়ে আনন্দে ভেড়াটা ভীষণ বেগে ছুট্ দিল আপেলটার দিকে। বলত ভেড়াটার হঠাৎ এই ভীষণ ছুটে গাড়ীর গতি কিছু কমবে কি না ? বুঝিয়ে উত্তর চাই।

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) জাপান, খয়েরপুর (২) পানিপথ, পানিহাটি (৩) খাইবার পথ (Khyber Pass) (৪) পাবনা (৫) চায়না (৬) নানকিং (Nankin=None King) (৭) বেহালা (৮) কঙ্কণ (৯) আলতা

আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর

একজন পেয়েছিল ২টি নীল বাক্স (৷৶০), ৪টে লাল বাক্স (৸০) এবং দুটি হলদে বাক্স (৵০)। বাকি দুইজনের প্রত্যেকেই পেয়েছিল তিনটি নীল বাক্স (৸৶০), দুটি লাল (৷৶০) এবং ৩টি হলদে বাক্স (৶০), অর্থাৎ প্রত্যেকেই মোট ১৷৷০ করে পেয়েছিল।

ভাদ্রের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

বীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণ, আসাম ; বিশু, রেণু ও গণেশ মুখোপাধ্যায় ; পারুল সেনগুপ্তা, কটক : দিদি, রথী, সুধী, মহী ও লতিকা মজুমদার, খাগড়া ; পবিত্র, নির্ম্মলেন্দু, সুধীর ও অধীররঞ্জন দাস, বরিশাল ; কমল, অশোক, নির্ম্মল ও অজিত ভট্টাচার্য্য, বরিশাল।

আশ্বিনের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর ; সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; গুণধর বেরা, মেদিনীপুর ; চণ্ডিচন্দ্র চন্দ্র, কলিকাতা ; কল্যাণকুমার জানা, মেদিনীপুর ; চিত্তরঞ্জন কর্ম্মকার, নিত্য, তেজেন, রমণী ও সুবোধ ঘোষ, ভোলা ; মঞ্জনা ও অসিম দত্ত প্রভৃতি, শ্রীহট্ট ; গোপালচন্দ্র পাল, উত্তরপাড়া ; অরুণা দাশগুপ্তা, বরিশাল ; অনাদিপ্রসাদ দাস, কালনা ; শ্রীনাথ ও প্রিয়নাথ রাউত, শ্রীনগর ; জ্যোতির্ম্ময় দাস, তেলিনীপাড়া ; রেখা বসু, শান্তিনিকেতন ; সাধনা ও রেবেকা বিশ্বাস, চট্টগ্রাম ; সাধনচন্দ্র বসু, কলিকাতা ; সুশীলকুমার মণ্ডল, কলিকাতা ; হাঁসি, দুলু, দাদু ও বিনীতা ঘোষ প্রভৃতি, কলিকাতা ; বিভূতি, — ; পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; জিতেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, যশহর ; বঙ্কিমমন্দিরের সভ্যবৃন্দ, চাপাই নবাবগঞ্জ ; কিশলয় সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ, চট্টগ্রাম ; আজমাতুনেসা কলিকাতা ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, কৃষ্ণনগর ; বটকৃষ্ণ মাঝি, বুড়ুল ; গোপাল ভট্টাচার্য্য, আসাম ; গীতাশ্রী মুখার্জি, উনাও ; বীরেনচন্দ্র বর্ম্মন, আসাম ; বাবুজি, গীতা ও অজিতকুমার দে প্রভৃতি, ফায়জাবাদ ; শান্তিরঞ্জন ঘোষ, নোয়াখালি ; বেলারাণী গাঙ্গুলী, শ্রীহট্ট ; সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বোলপুর ; দিলীপ গুপ্ত ও মায়া গুপ্তা, লক্ষ্ণৌ। শেখরেন্দ্র, সমীরেন্দ্র, শেফালীও সোনালী গাঙ্গুলী, পুরুলিয়া।

"ঢাকেশ্বরী"র বস্ত্র দাবী করুন

কেবল বাংলার বা বাঙ্গালীর বলেই নয়, ঢাকেশ্বরী বস্ত্র সুদৃশ্য, সুস্পৃশ্য ও সুলভ বলেও। "ঢাকেশ্বরী"র বস্ত্র ক্রয় করার অর্থ ঢাকেশ্বরীর আট হাজার বাঙ্গালী শ্রমিক ও ২২ হাজার অংশীদারকে সমর্থন করা

• দি ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিঃ •

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

ফোন নং ৯ ও ২০৭ প্রধান অফিস ঃ ৫, সিম্পসন রোড, ঢাকা। টেলিগ্রাফ ঃ "কটন্"

কারখানা ঃ

১নং মিল ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ। ২নং মিল—গডেনাইল, নারায়ণগঞ্জ

• পুরস্কার ! পুরস্কার !! পুরস্কার !!!

কুড়ি বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য গল্প-প্রতিযোগিতা। ফুলস্কেপ তিন পৃষ্ঠার মধ্যে গল্প হওয়া চাই। গল্পের বিষয়বস্তু যেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী হয়। গল্পের সঙ্গে পরিস্কার করে নাম, ঠিকানা, বয়স এবং **অভিভাবকের স্বাক্ষর পাঠাতে হবে**। এ-চারটী জিনিষ না থাকলে গল্প গ্রাহ্য হবে না। **প্রবেশ মূল্য চার আনা (Postal Stamp গ্রাহ্য হবে।)**

প্রথম পুরস্কার—১৫" ই রূপার চ্যালেঞ্জ কাপ, রৌপ্যপদক ও ছয়খানি বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার—রৌপ্যপদক ও ছয়খানি বই।

তৃতীয় পুরস্কার—ছয়খানি গল্পের বই।

পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প আমাদের **ত্রৈমাসিক বই "সন্তায় কিস্তি"তে** প্রকাশিত হবে। **গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৩।**

● কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক লেখার বিচার করবেন। ●

"অজানা সাহিত্য পরিষদ ।" ১০১, এলগিন রোড, কলিকাতা।

বংগশাল

অষ্টম বর্ষ (৮) অগ্রহায়ণ ১৩৫০

STRATOSPHERE-অভিযান

চিত্রগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিমল

কি হে সুশান্ত ! চুপ করে বসে ভাবছ কি ? (হাসিয়া) Stratosphere যাত্রার কল্পনা করছ নাকি ?

সুশান্ত

(হাসিয়া) ঠাট্টা করচো ? কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই ভাব্‌চি। ভাবচি আমি যাবো Stratosphereএ। দেখে আস্‌বো ব্যাপারটা কি ? এতক্ষণ সেই মতলবই ভাঁজছিলুম্।

মন্মথ

মানে ? তুমি যাবে কি ক'রে ? বেলুন পাবে কোথায় ? প্রফেসর পিকার্ডের মতন ঐরকম একটা বেলুন তৈরী ক'র্‌তে কত খরচ জানো ? অত টাকা তুমি পাবে কোথায় শুনি ?

সুশান্ত

আরে, বেলুনে যাচ্ছে কে ? আমি যাবো এরোপ্লেনে।

বিমল

হাসালে ! প্রফেস্‌র পিকার্ড্ তাঁর অত অভিজ্ঞতা, দেশের লোকের অত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েও যা করতে সাহস পাননি, তুমি যে তাই ক'রতে চাও ! পিকার্ড কোনোদিন এরোপ্লেনে ক'রে Stratosphereএ যাবার কল্পনা করছেন ? সুশান্ত ! তুমি পাকা পাইলট্ তা মানি, কিন্তু তা'বোলে নিজের সম্বন্ধে অতখানি মিথ্যে গর্ব্ব তোমার থাকা উচিৎ নয়।

সুশান্ত

দেখ, প্রফেসর পিকার্ড কোনদিন এরোপ্লেনে করে Stratosphereএ যাবার চেষ্টা করেননি তা জানি। কিন্তু এওতো জানি যে, যে যুগে বর্ত্তমানের এমন উন্নত-ধরণের এরোপ্লেনের সৃষ্টি হয়নি—তেমনি দিনেও পাশ্চাত্যের একাধিক বিমানবীর ঐ Stratosphereএ-ই ঘুরে এসেচেন মাত্র একখানি বাইপ্লেন সম্বল ক'রে? সেটা ছিল ১৯২০ কি ২১ সাল আর এটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল—আঠারো উনিশ বছর আগে যা' একজনের পক্ষে সম্ভব হ'য়েছিল আজ তার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতিওয়ালা এরোপ্লেন নিয়ে আর একজনের পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন?

অনিল

নিশ্চই সম্ভব হ'বে। তুমি ওদের কথা শুনো না সুশান্ত। আমি যাবো তোমার সঙ্গে তোমার এ্যাসিষ্টাণ্ট হ'য়ে। আশা করি আমার ওপর তোমার এইটুকু ভরসা আছে, যাতে আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারো।

সুশান্ত

নিশ্চই ভরসা আছে। আরে, আমি ত গোড়া থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছি—যে যেতে হ'লে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই নেবো না। এসব ব্যাপারে বরাবরের মতন এবারও তুমি হবে আমার সঙ্গী!

অনিল

তাই বলো।

মন্মথ

বাহবা সুশান্ত! তুমি নিজে যেমন গোঁয়ারের রাজা, সঙ্গীটীও পেয়েছো তেমনি। হবুচন্দ্র রাজা গবচন্দ্র মন্ত্রী। (সকলের হাস্য) একেবারে রাজযোটক!

মন্মথ

ওহে অনিল, দেখি তোমার হাতখানা!

অনিল

কেন? পাঞ্জা লড়বে? এসো না?

মন্মথ

উহুহু! গেছি, গেছি গেছি! ছাড়্, ছাড়্, ছাড়রে, রাস্কেল ছেড়েদে! (হাত ছাড়িয়া দিল) উঃ দেখি দেখি—হাতটা একেবারে ভেঙ্গে দেবার যোগাড়! গোঁয়ারের একশেষ!

অনিল

কেন? হাত দেখতে চাইছিলি যে!

মন্মথ

আরে, আমি কি তোর হাতের জোর দেখ্‌তে চেয়েছি? আমি তোর হাতের রেখা দেখবো।

সুশান্ত

তাই নাকি? এ বিদ্যে আবার কবে থেকে সুরু করেচো?

বিমল

ও, তা জানো না বুঝি? মন্মথ যে আজকাল এক জ্যোতিষীর কাছে দিন রাত জ্যোতিষের চর্চ্চা করচে!

অনিল

আরে, তাই নাকি? তাতো জান্‌তুম্ না। যাক্ ভালোই হোলো। দেখ্‌দেখি কবে Stratosphere জয় শেষ ক'রে ফিরে এসে আহ্লাদের চোটে তোর দাঁতের পাটীগুলো ঘুসি মেরে উড়িয়ে দেবো।

মন্মথ

বেশ দেখি। আরে ডান্ হাত, ডান্ হাত! ব্যাটাছেলের আবার বাঁ হাত দেখে নাকি? হুঁ! দেখি। হুঁ! যা ভেবেছি তাই! এবারকার Stratosphere যাত্রায় সুশান্ত নির্ঘাৎ পটল তুল্‌বে আর তুই যাবি তার সহমরণে।

অনিল

বটে? (চাপা গলায়) কি হ'চ্ছে বাঁদরামো! মহিলাদের সামনে।

মন্মথ

ওঃ আই অ্যাম্ সরি! এ—ই! লাগে ঃ— (ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দ)

বিমল

ওঃ রাত আটটা বাজ্‌লো! আর নয়। চলো ওঠা যাক। চলো হে সুশান্ত! বাড়ী যেতে হবে না?

সুশান্ত

না ভাই, তোমরা এগোও। অনিল আর আমি একটু পরে যাবো।

মন্মথ

ও, বুঝেছি। তোমাদের এখন Stratosphere যাত্রার আয়োজন নিয়ে পরামর্শ চল্‌বে কেমন?

সুশান্ত

(হাসিয়া) ঠিক তাই!

মন্মথ

বেশ তাহ'লে তোমরা থাকো—আমরা চলি। শুভরাত্রি! শুভরাত্রি মিস মিত্র। শুভরাত্রি।

সুশান্ত

যাক্ ওরা চলে গেছে ভালই হ'য়েছে। এবার নিরিবিলি একটু আলোচনা কর্‌বার সুবিধে হ'বে।

অনিল

আলোচনার আর কি আছে? যাওয়া ঠিকতো?

সুশান্ত

নিশ্চই এর আর নড়চড় আছে? "মরদ কা বাৎ"। ওঃ রেবা, রেখা তোরা কি করবি? পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে!

রেবা

তোমাদের আলোচনা যদি গোপনীয় হয়, তাহ'লে চলে যাই।

সুশান্ত

তবে একটু বোস্ একসঙ্গেই উঠবো।

রেখা

সেই ভালো আমারও এসব শুন্‌তে খুব ভাল লাগ্‌চে। ভয় নেই, চুপ্‌টী করে বসে থাক্‌বো—তোমাদের কথায় বাধা দেবো না।

সুশান্ত

দেখি যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ত সব ঠিক কর্‌তে হবে? তাতে কিছু সময়ও লাগবে।

অনিল

তা' লাগুক। ভালো ক'রে তোড়জোড় ক'রে বেরুতে হ'বে। সেবার তাড়াতাড়ি ক'রে রওনা হ'য়ে কি রকম বেগ পেতে হয়েছিলো মনে আছে তো? তবু সেবার কতটুকুই বা উঠেছিলুম!

সুশান্ত

হ্যাঁ। সেবারে একটু গোয়ার্তুমি করা হয়ে গেছলো বটে। তা সেবারে অত উঁচুতে ওঠবার কথাও আগে ঠিক ছিল না। ওপরে উঠে হঠাৎ খেয়াল হ'লো, তাই অমনটা হয়েছিলো। এবারে তো আর তা' নয়।

অনিল

এবারে কতটা উঠবে ঠিক করেচো?

সুশান্ত

Stratosphereএর ভেতরে গিয়ে পৌঁছতে হ'লে অন্ততঃ চল্লিশ হাজার ফিট্!

অনিল

বলো কি। এযে প্রায় সাড়ে সাত মাইল হ'লো।

সুশান্ত

হোলোইত! কেন? ভয় পাচ্ছো নাকি?

অনিল

ভয় আমি পাই না। তবে ভাবছি যে আয়োজনটা তাহ'লে কিছু অসাধারণ রকমই ক'রতে হবে

সুশান্ত

তাতে আর সন্দেহ আছে? শোনো তোমায় বলি আমার Plan কি। এবার আর অর্ডিনারী এঞ্জিনে কাজ হবে না। এতো আর দু' এক মাইল নয়? সাত মাইল উঁচুতে অর্ডিনারী এঞ্জিনগুলো কাজ করতে

চাইবে না। জানাতো উপরে বায়ুর চাপ কত কম? কাজেই আমাদের এঞ্জিনএ একটা সুপার চার্জ্জ (Super charge) ফিট্ ক'রে নিতে হবে সিলিণ্ডারে exploded airকে compress করবার জন্য। তা ছাড়া আমাদের ফুস্‌ফুসের কাজও ঐ বাতাস নিয়ে। কাজেই অত উপরের ওই অত্যন্ত হাল্‌কা পাত্‌লা বাতাসে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌গুলোকেও বৈজ্ঞানিক সাহায্য ছাড়া কার্য্যক্ষম রাখতে পারবো না। তা হ'লেই বুঝ্‌ছো তার ব্যবস্থা যদি কিছু না করে রওনা হই—তাহ'লে সাত মাইলে গিয়ে পৌঁছবার অনেক আগেই আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ হ'বে।

অনিল

তা'তো বটেই আমাদের অক্সিজেন নিয়ে যেতে হ'বে।

সুশান্ত

হ্যাঁ, ইস্পাতের সিলিণ্ডারের মধ্যে খাঁটী অক্সিজেন নেবো। আর তার সঙ্গে সংলগ্ন মুখোস থাক্‌বে আমাদের মুখে লাগানো। সেই মুখোসের ভিতরই চল্‌বে আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ।

অনিল

তা ছাড়া ওপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। শরীর গরম রাখা দরকার। নইলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়েই মরতে হ'বে।

সুশান্ত

সে আর বল্‌তে! তাই ভাব্‌ছি যে আমরা যে স্যুট্ পরবো তাকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে গরম করবার ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে।

(এরোড্রোমের ভেতর একটা মটরকার আসার শব্দ) আরে! ও আবার কার মোটর ঢুক্‌লো! এত রাতে এরোড্রোমে কে আবার এলো?

অনিল

এক সাহেব ব'লে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক! এক সাহেবই নাবলো। আমাদের দিকেই আস্‌ছে যে! কে বলো তো, চেনা চেনা মনে হ'চ্ছে যে!

সুশান্ত

আরে! এ যে Flight Lieutenant রেবেলো!—এই রেবা, রেখা! আলাপ কর্‌বি? যেমনি মস্ত লোক—তেমনি ভালো লোকও—আর adventureএর গল্প এমন জমাটী ক'রে বল্‌তে পারে! আর বাংলাও লিখ্‌ছে বেশ!

রেবা

তা' তুমি যখন রয়েচো—তা'তে বাধা কি? বেশ গল্প শোনা যা'বে।

সুশান্ত

তবে ওকে এইখানেই ডাকি। Hello, Lieutenant! Good Evening!

রেবেলো

Hello ! Old boy ! How goes it ?

সুশান্ত

Fine, thinks ! Meet my friend—

রেবেলো

We know each other ! Dont we ? How do you do Anil !

অনিল

How do you do ?

সুশান্ত

তারপর রেবেলো ? হঠাৎ এই অসময়ে এরোড্রোমে কী মনে করে ?

রেবেলো

Nothing in particular—আজ সারাদিন এক গাঁয়ে শিকার করে এই পথে ফির্‌ছিলুম। এখানে আলো জল্‌চে দেখে মনে কর্‌লুম নিশ্চয়ই অকর্ম্মার ধাড়ী সুশান্তটা এখনো আছে। মেম্‌সাহেব ঠিক্‌ই বলে যে আমি তোমার সঙ্গে মিশে বড় আড্ডাধারী হ'য়ে উঠ্‌চি।

সুশান্ত

বটে ? আড্ডা দেবে তুমি—আর দোষ হ'বে আমার ? সত্যি রেবেলো ! তুমি বাঙ্গালীকেও হার মানালে।

রেবেলো

আরে রাখো ! আমি ডানপিটে লোক। একেবারে বেপরোয়া—আমার মরণ গাছের আগায়। আদব-কায়দা মেনে চল্‌তে আমি হাঁপিয়ে উঠি !

সুশান্ত

যাক্। এসোচো ভালই হ'য়েছে। Wont you sit down ? And meet my cousins, Miss Mitra Senior,—

রেবেলো
How do you do ?

রেবা
How do you do ?

সুশান্ত
Miss Mitra Junior.

রেবেলো
How do you do ?

রেখা
How do you do ?

সুশান্ত

তারপর শোনো রেবেলো ! খবর আছে। খুব শীগ্‌গীরই অনিল আর আমি এরোপ্লেনে করে Stratosphere যাচ্ছি।

রেবেলো

Really ! And why ?

সুশান্ত

আজকের কাগজে পিকার্ডের খবর পড়েচো তো ?

রেবেলো

Yes, I did ! তাই দেখেই বুঝি Inspiration জাগলো ? তা বেলুনে না গিয়ে এরোপ্লেনে কেন ?

সুশান্ত

বেলুন পাবো কোথায় ?

রেবেলো

তা বটে, কিন্তু এরোপ্লেন উঠবেই বা কতটা ?

সুশান্ত

অন্ততঃ মাইল সাতেক ? পারিতো আরো উপরে আট, নয়, দশ মাইল ? ওঃ রেবেলা ভাব্‌তেও thrilling মনে হয়।

রেবেলো

Thrilling indeed ! কিন্তু সুশান্ত এ thrill উপভোগ করতে যাওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। জানোতো আমেরিকান বৈমানিক মেজর শ্রীডার্‌এর কথা ?

সুশান্ত

কিছু কিছু জানি। বিশেষ জানি না।

রেবেলো

আমার নিজের চোখে দেখা ! সে যা কাণ্ড !

অনিল

Please Lieutenant ব্যাপারটা বলো শুনি। I would like to listen.

রেবা ও রেখা (একসঙ্গে)

And me too !

রেবেলো

আচ্ছা বলি। সে অনেক দিনের কথা। ১৯২০ সাল। আমেরিকার ওহিওর Dayton Air Depot! মেজর শ্রীডার এরোপ্লেনে উঠ্‌বেন। তাঁর লক্ষ্য চল্লিশ হাজার ফিট উপরে! সরঞ্জাম যা কিছু সব ঠিক্! যে বাই-প্লেনে শ্রীডার রওনা হবেন, সেটাকে Hangar থেকে টেনে আনা হয়েছে। বন্ধুরা শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। উপযুক্ত পোষাক এঁটে শ্রীডার্ বাইপ্লেনের কাছে দাঁড়ালেন। এরোড্রোম একেবারে লোকে লোকারণ্য।

(রেবেলোর গলার স্বর মিলিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা জনতার চীৎকা ধ্বনি ভেসে আসে)

* * * *

প্রথম গলার স্বর—ঐ যে মেজর শ্রীডার্!
দ্বিতীয়—ওঃ! চেহারাটা কি সুন্দর!
তৃতীয়—সঙ্গে ওরা কারা?
চতুর্থ—বোধ হয় বন্ধুর দল! উৎসাহ ও বিদায় দিতে এসেছে।
প্রথম—স্ স্ স্! চুপ্!

(একটা অস্পষ্ট জনতার ধ্বনি)

(এবার বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার গলা)

চেরিয়ো মেজর!

মেজর শ্রীডার—চেরিয়ো অফিসার!
আর একজন—গুড্ লাক্ শ্রীডার!
মেজর শ্রীডার—ধন্যবাদ! তাহ'লে এবার আমি কক্‌পিট্‌এ উঠি। বব্! ব্যারোগ্রাফটা দেখেছ?
বব—নিশ্চয়! ঠিক আছে।
মেজর শ্রীডার—দেখি—হাঁ। সুন্দর কাজ দেবে।
জনৈক অফিসার—অক্সিজেন সিলিণ্ডারের স্টপ্‌ককটা দেখুন।
মেজর—দেখেছি। ঠিক আছে। এবার এঞ্জিনে ষ্টার্ট দেয়া যাক! (এঞ্জিনের শব্দ)
মেজর—বাঃ ঠিক আছে। এঞ্জিন চমৎকার কাজ দেবে।
অফিসার—তোমার স্যুটের সুইচ্?
মেজর—হাঁ, বিলকুল ঠিক। সব ঠিক আছে। এবার—Contact! (এঞ্জিনের জোর শব্দ)
সমবেত সকলে। গুড্ বাই! গুড্ লাক্! রেডিয়োফোনের কথা মনে রেখো।
মেজর। নিশ্চয়! তোমরা প্রতি মুহূর্ত্তে সব খবর পেতে থাকবে!

[প্লেনটার এগিয়েও ক্রমশঃ আকাশে উঠে যাবার শব্দ। জনতার কোলাহল, হাততালি তারপর ক্রমশঃ কোলাহল ক্ষীণ হয়ে আসে ও শেষে নিস্তব্ধ হয়। প্রায় ১৫ সেকেণ্ড ধরে এরোপ্লেনের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে, তারপর আর কিছু শোনা যায় না]

তারপর

রে ডি ও বা র্ত্তা

(রেডিও-ফোনে সঙ্কেত শোনা গেল, পরে একটা ভারী গলার স্বর)

"This is Dayton Air Depot! Calling Plane X. I4. Major Shroeder!

Major.—Yes, Shroeder speaking! Quite comfortable journey! Earth is fast dropping away, engines perfectly attuned!—Speedometre ticking off the miles—Just passed three miles·····fourth mile ahead!···Cold doesn't affect yet!···Suit is keeping warm···Oxygen O.K.—No, ill effects·····5th mile passed!···Instruments all well!·····(Pause) The Six-mile-mark just slipped by!—

···Supercharger compressing the air—engine delivers its full power!··· temperature—dropping···its 50 degrees below zero now!—Ah!···I feel queer!—Some thing wrong! (in a suppressed struggling voice) Something chokes me by the throat!·····Oxygen has ceased to flow!—Can't see anything!·····ice on the goggles! Oxygen!! Oxy ·····!!!·····(Pause):···

Voice from the Set.—"Come down! Do you hear? Get down!···Hello!··· Helio!! X. 14! Major Shroeder! Pull on the joystick!···spindown!···Hello! Major Shroeder!···Answer! the joystick!···the joystick!! ···(A different sort of sound denoting that plane is fast spining down, terrific friction! Things tumbling! etc)···Ah! Thats feeling better?

crowd roars in awe and shrieks

[From the set]

···"Come round! Come round Major! You were—within 15 seconds of death!··· Ah! thats fine! good work!···

(Here the crowd roar fades in, cheers from the crowd! Sound of the machine)

Voice of an Officer. (Excited yet natural)—Perfect landing!

Several voices together. Perfect landing!

Another voice. Get down Major! Look whats up!

Another voice. He is rigid in his seat! Eyelids are frozen solid! Ambulance!···

(Slight pause—then)

রেবেলো। বুঝ্‌লে সুশান্ত! শ্রীডারের ভাগ্য ভাল যে সে যাত্রা সে সেরে উঠ্‌লো!—
রেখা। কিন্তু শেষটায় তা'র কি হ'য়েছিলো তা ঠিক বোঝা গেলোনা।—

রেবেলো। Oxygen-এর flow বন্ধ হ'য়ে গিয়ে সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছ্‌লো!—

রেবা। তা' হ'লে নাব্‌লো কী ক'রে?

রেবেলো। সেইটাই আশ্চর্য্য! অক্সিজেনের supply বন্ধ হ'তে প্রথমটা সে কিছু বুঝ্‌তে পারেনি। তারপর বুঝ্‌লে অক্সিজেন পাচ্ছেনা। তখন অক্সিজেনের ট্যাপ্‌টা দেখ্‌তে গেল। কিন্তু ঠাণ্ডায় চশ্‌মার ওপর পুরু বরফ জমে গেছ্‌লো ব'লে, কিছু দেখতে না পেয়ে, goggles-টাকে ঠেলে—কপালের ওপর তুল্‌লে! বস্! সঙ্গে সঙ্গে explosion! তা'র মনে হোলো মাথাটা বুঝি উড়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার। চোখ্ চাইতে গিয়ে দেখে চাওয়া যায় না—ঠাণ্ডায় চোখ্ জ'মে গেছে! এদিকে সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হ'য়ে সে অজ্ঞান হ'য়ে গেল। কিন্তু পাকা পাইলটের আশ্চর্য্য আত্মরক্ষার সংস্কার! অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌তে পড়্‌তেও তা'র হাতদুটো আপ্‌না আপ্‌নি—আন্দাজে আন্দাজে joystick-টাকে টেনে ধ'র্‌লে! এদিকে প্লেনখানা তখন অসহায় অচৈতন্য পাইলট্‌কে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক ক্ষ্যাপা শূয়োরের মতন গোঁভরে প্রচণ্ডবেগে সোজা নীচের দিকে প'ড়্‌চে। আমরা নীচে থেকে লক্ষ্য বন্ধ ক'রে দেখ্‌চি। প্লেনটা যেন পাগল হ'য়ে গেছে!—তিন মিনিটের মধ্যে ছ'মাইল নেবে এলো। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্লেন যদি সোজা না হয় তা' হ'লে সব গুঁড়িয়ে ছাতু হ'য়ে যা'বে! কিন্তু ইতিমধ্যে পড়্‌তে পড়্‌তে নীচেকার গরম আর ঘন বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে—আর পড়ার জন্যে প্রবল বায়ুপ্রবাহ লাগার ফলে আস্তে আস্তে তা'র জ্ঞান ফিরে এলো। সৌভাগ্য যে, জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা'র প্রথম কথা মনে পড়্‌লো যে সে প্রচণ্ডবেগে মাটীর দিকে পড়্‌চে! তখন সে মাটী থেকে মাত্র দু'হাজার ফুট উঁচুতে—আছ্‌ড়ে প'ড়ে মরতে হ'য়ে যেতে আর দশ সেকেণ্ড মাত্র বাকী—ভালো ক'রে তখন জ্ঞানও ফেরেনি। কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তখনি Plane খানাকে সোজা ক'রে ধর্‌লে—Plane নিরাপদে মাটীতে নাব্‌লো! তখনো বেচারী চিট্ হ'য়ে নড়্‌তে পারে না। চোখ অন্ধ—ঠাণ্ডায় জ'মে চোখ পাথর হয়ে গেছে!! আশ্চর্য্য যে লোক্‌টা তবুও বেঁচে গেল—এখন বুঝ্‌চো সুশান্ত? এরোপ্লেনে stratosphere যাত্রার বিপদটা?

(ঘড়িতে ৯টা বাজার শব্দ

সুশান্ত। আরে! রাত নটা বেজে গেল? চল চল বাড়ী যাওয়া যাক!—Good night, Rebello! Good night! Good night!!

সমাপ্ত

গোখেল রোডে ওদের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

প্রদীপ যখন জান্‌লে—সেখান থেকে গড়ের মাঠ একেবারে কাছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেশী দূর নয়, কালীঘাটও মনে করলে যাওয়া যেতে পারে, চিড়িয়াখানাও হেঁটে পৌঁছনো যায়, তখন তার মনে খানিকটা ফুর্ত্তি হল।

তবু মোটরে ক'রে খানিকটা ঘুরে আসতে শহরে যখন আলো জ্বলে উঠ্‌ত, দোকানপাটের আলোর সারি রাজপথের দুধারে মালার মতন ছড়িয়ে যেত, তখন তার মনে পড়ত—অন্ধকার বাশবাগানের ওপারে কোনখানে এক বাড়ীতে বাবী ব'সে আছে একলাটি।

কলকাতায় কোনো বিপদ্ ছিলনা। কিন্তু একদিন সকালবেলায় কী এক চিঠি এলো, দাদু প'ড়ে রেগে অস্থির। তার মাষ্টারমশাই বল্‌লেন, তার ন-কাকা আর নতুন কাকা যারা নাকি জুয়া খেলে, রেস্ খেলে, কোথায় থাকে ঠিক্ নেই, চিঠি লিখে শাসিয়েছে অবিলম্বে বিশ হাজার টাকা না পেলে তার দাদুকে খুন করতেও পিছ্-পা হবেনা। তার চেয়েও কঠিন শাস্তি তারা দিতে চায়, প্রদীপের মাথা ফাটাবে, ঐ নাকি সকলের চক্ষুশূল! চিরঞ্জীলাল তাদের দলে আছে।

ভয়ের চেয়ে প্রদীপের হাসি আসে। বাপ মাকে যে দেখ্‌লো না, ছোটবেলা থেকে যে স্নেহমমতাবঞ্চিত, ভবিষ্যতে কী বিষয় পাবে না পাবে, তার জন্যে এত লোক তাকে শেষ করতে চায়! শেষ অবধি নিজের কাকারা! তার চেয়ে দাদু কেন সমস্ত টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়ে হাসে নিয়ে কোনো কুঁড়ে ঘরে চ'লে যান্‌না! কী দরকার ছিল রোজ রোজ এই সব বিপদ্ ডেকে আনবার?

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় দাদুর কাছে যেতে তিনি বল্‌লেন—আজ থেকে তুমি আর বাইরে বেরোবেনা। রাতদিন বাড়ীতে থাক্‌বে।

প্রদীপের চোখে জল এলো। সেইদিনই পড়ন্ত বেলায় গড়ের মাঠে সে ঘুরে এসেছে নরম সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে, মেমোরিয়ালের ধার দিয়ে। সেখানে রোজ রোজ যেতে তার ইচ্ছে করে, এখন থেকে আর যাওয়া হবে না! আরো এগিয়ে দেখেছে সিনেমাগুলির সাম্‌নে রঙীন আলো, উজ্জ্বল আলো, রাতকে দিন করবার চেষ্টা!

এই গোখেল রোডের পীচ্‌ঢালা নির্জ্জন গলিপথে শহরের সে সব সৌন্দর্য্য এসে পড়ে না, আসে না সেই সব বিচিত্র লোকেরা কোনোদিন রাস্তা ভুলে।

গ্রামের প্রকাণ্ড বাড়ীতে সে যেমন বন্দী ছিল, এখানেও ত প্রায় তেম্‌নি।

কিন্তু বেশী কিছু বল্‌তে পারলে না, বেশী বলা তার স্বভাব নয়।

বাড়ীর সাম্‌নে পাগড়ী ও পায়জামা-পরা কটা লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। ওপরের বারান্দার দিকে তারা কী দেখে?

প্রদীপ হয়ত দাঁড়িয়ে আছে, একটা দাড়ীওলা লোক তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো না গিল্‌তে লাগ্‌লো। প্রদীপ সরে না। শান্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একদিন দুপুরবেলা লোকটা বল্‌লে—খোকা টফি খাবে? চকোলেট খাবে? ত' এসো।

গম্ভীরভাবে প্রদীপ বল্‌লে—আমি ওসব খাই নে।

লোকটা চ'লে গেল, সোনালী রূপালী রাংতা মোড়া জিনিসগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে ঝল্‌ঝলে পকেটে পুরে। প্রদীপ মনে মনে বল্‌লে—আমি জানি তোমার বদ্‌মায়েসী, নীচে যাই ঐ সব নিতে, আর তুমি আমাকে ক্যাঁক্‌ ক'রে ধরো!

কোথায় কী একটা অসুবিধা হচ্ছিল, দাদু একদিন বিকেলে বল্‌লেন—আমরা এক জায়গায় যাব। কোথায় তা বল্‌ব না। লোকজন কেউ জান্‌বে না। শুধু সঙ্গে যাবে প্রণববাবু আর পার্ব্বতী।

ট্রেনে চ'ড়ে প্রদীপ জান্‌তে পারলে—ওরা দার্জ্জিলিং মেলে উঠেছে, তাহ'লে যাচ্ছে দার্জ্জিলিং।

বাবীটা কী বোকা, যদি আস্‌বার বাবস্থা কোনোরকমে করতে পারত, তাহলে এই সুযোগে দার্জ্জিলিং দেখা হ'য়ে যেত। প'ড়ে রইলো সেই গ্রামের অন্ধকারে। আর কি কখনো হবে? আর প্রদীপেরও কি একলা কিছু ভালো লাগ্‌বে? দার্জ্জিলিং যতই না কেন সুন্দর হোক্‌!

শিলিগুড়িতে ট্রেন থেকে নেবে দাদু একটা মোটর করলেন, তখন সবে মাত্র ভোর হচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে কী চমৎকার রাস্তা চলেছে! খানিক পরে ওরা যেন এলো পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের রাজ্যে। কোথায় কত নীচে নদী, গ্রাম, মাঠ! মেঘ কুয়াসা জঙ্গল পাহাড় অদ্ভুত সব দৃশ্য একসঙ্গে!

প্রদীপ শুন্‌লে ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে যে পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না, যার গায়ে ছোট্ট ছোট্ট সাদা বাংলো, সে সব ছাড়িয়ে ওপাশে আরো উঁচুতে চলে যেতে হবে।

জঙ্গল আর নেই। শুধু হাল্‌কা মেঘ ভেসে আস্‌ছে, আর শীত করছে। গরম জামা পরলো ও।

প্রণব বল্‌লে—পিছন থেকে একটা মোটর যেন আমাদের অনুসরণ করছে।

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন—অনুসরণ কেন করবে? আর একখানা গাড়ী আস্‌তে নেই? এ পথে ত' কত গাড়ী যায়!

কিন্তু দেখা গেল, গাড়ীখানার মত্‌লব খারাপ, যেখানটা গভীর খাদ্‌, সেখানে পাশ থেকে এসে ধাক্কা মারতে চায়। যেন অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটাবার মত্‌লব!

এ গাড়ীর ড্রাইভার চ'টে গেল। নেবে বল্‌লে—কেয়া মত্‌লব হ্যায় তুমারা? চলা যাও আগে।

ও গাড়ীর ড্রাইভার বল্‌লে, নিকাল যানেকো রাস্তা কাঁহা?

আচ্ছা ঔর আগে যাঁহা চওড়াসা সড়ক্‌ মিলেগা হুঁয়া তুম্‌কো জায়গা কর্‌ দেগা। আভি চালাও সামাল্‌কে।

গাড়ীতে বোর্‌খা পরা মেয়েরা ছিল।

পাগ্‌লা ঝোরার কাছাকাছি এসে—পথটা সেখানে ভারী বিপজ্জনক—লাগালে চাকায় চাকায় ধাক্কা! একটা প্রবল ঝাঁকুনীর সঙ্গে গভীর অন্ধকার!

[ক্রমশঃ

কঞ্জুষের পালা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, কেউ তো কিছু দেয় না—

(গীত)

অন্ন চিন্তা চমৎকার, কুল কিনারা কোথায় তার।
যদ্যপি অভাগা যায় সাগর শুকায়ে যায়।
অন্নপূর্ণা বন্ধ করেন অন্নসত্রের সিংহদ্বার।
লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মাগে, লক্ষপতি করে হাহাকার।

—কর্ত্তাবাবু, গিন্নীমা, ভিক্ষে দাও, বড় গরীব।

যক্ষি বুড়োর প্রবেশ, সঙ্গে সঞ্চি বুড়ি

(পদ্য)

যক্ষি। আমি যক্ষি বুড়ো, লক্ষ্মীপেঁচার খুড়ো,
কঞ্জুষ বাড়ির কুঞ্জিতলায় ধরাই মরচে গুঁড়ো।
মুড়ো ঝাঁটার নুড়ো জ্বেলে ধরাই চৌখো চুলো।

সঞ্চি। আমি সঞ্চি বুড়ি, যক্ষি বুড়োর খুড়ি,
বয়েস বছর কুড়ি।
দেখিনে গাছ পাথর নুড়ি, হাঁটি গুড়িগুড়ি
ধারে কিনি হাটবারে শালখে পারে
হুঁকো কলকী পান সুপারী
শনের নুড়ি কয়লা গুঁড়ো।
পরি ছেঁড়া ধোকড়া কাঁথা নেকড়া
মাস চটা খোঁড়া পাটা টেনে চলি
চুল পাকা ঝেঁকড়া সিঁথির কাছটা
একেবারে মুড়ো।

যক্ষি। বলি ও সঞ্চি খুড়ি, এই না সোনার গাঁ ?

সঞ্চি। বাড়ি ঘর কিছু দেখছো, না মাঠ ধূ ধূ ?

যক্ষি। কিছু কিছু বাড়ি কিছু কিছু গাছ,
কিছু কিছু ইট কিছু কিছু কাঠ,
কিছু পানা কিছু জল কিছু ডাঙা কিছু ঘাট,
বটের জটা ছালের ফাটা শ্যাল কাঁটা ছাই পাঁশ।

সঞ্চি। বাসা করে থাকার মতো জায়গা বটে।

যক্ষি। খরচ নেই, ইঁট কাট আগলাবো, উই চরাবো, ইঁদুর বেজি সাপ বেঙ পালবে, থাকবো কুটুম বাড়িতে।

সঞ্চি। বাড়িওলাকে পেলে হয় এখন, ছোঁড়াটা কোন বাগে গেল ?

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জ। বাড়িতে কেউ কোথাও নেই, খালি বাড়ি, দোর জানলা কপাট কিছু নেই একটা ঘুঁটে লেপা দেয়ায়ের গায়ে লেখা রয়েছে—ভোজনালয়, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিচালিত।

যক্ষি। শুধোলেনা কেন, বাড়ির কর্ত্তার নাম ?

কুঞ্জ। কাউকে দেখলে তো শুধাবো ?

সঞ্চি। এত দেরী হল যে তবে ?

কুঞ্জ। ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখছিলেম.

সঞ্চি। কি দেখলে তাই কও।

কুঞ্জ। বলতে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, দেখলেম কি শোনো।

যক্ষি। সঞ্চি খুড়ি বোসো এই ভাঙা দাওয়ায়। আর দাঁড়াতে পারিনা।

সঞ্চি। আচ্ছা, বল দেখি কি দেখলি ?

কুঞ্জ। দেখলেম কি শোনো—
বাড়ির পাছে আব্ধা পুকুর ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা,
চাইর দিকে শ্যাল কাঁটা বাবলা গাছের বেড়া।
কেউ কোথা নেই জনপ্রাণী, এখানে ওখানে ছেঁড়া কানি,
ভাঙাচোরা বাগান খানি, ফুল নাই চোরকাঁটাই আছে।
তারি মধ্যে হোগলা-চালা, কেলে হাঁড়ি চুন-সুরকী গোলা,
ওসে আব্ধা চোখে চেয়ে আছে কান্ধে অম্বল চেরা।
ও সে যেন ভূতের চেহারা—দিতেছে পাহারা,
নাকটা তার ভগ্ন, চোখ দুটো কোটরে নিমগ্ন।
আর একটা কানা—চোখ দিয়ে আকাশ পাতাল দেখছে
—আর কি যেন ভাবছে
তুলসী মঞ্চে হেলান দিয়ে বসে—
গা-ময় গোবর মাটি হাতে মস্ত গাঁতি !

যক্ষি। তাকেই খবর শুধোলে হতো।

কুঞ্জ। সে যে না জ্যান্ত না মরা কিম্ভূত কিমাকার। আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইতেই দে চম্পট।

সঞ্চি। আমার বোধহয় বাড়ি ভুল হয়েছে।

যক্ষি। এ বাড়ি হতেই পারেনা। কঞ্জুষ বাড়ির কুটুমের অগাধ পয়সা—সোণা-রূপোয় ঠাসা বাড়ি। এক এক ঘরে পাঁচটা করে লোহার সিন্ধুক হীরে জহরতে ভর্ত্তি ছিল ছেলেবেলায় দেখে গিছি, এ সে বাড়ি হতেই পারে না, ভুল হয়েছে।

সঞ্চি। এ কার বাড়িতে এনে ফেল্লে।

কুঞ্জ। আমি কি কখনো এ গাঁয়ে এসেছি যে ঠিক বাড়ি চিনবো ! দেখেই কেমন মনে হল, এই বাড়িই হবে। ঘুরে ঘারে ফিরে আসছি, দেখি না অন্ধকারে একটা চোর-কুটুরী, তার মধ্যে একটা লোক বসে কেবলি করছে রিড় বিড়াং স্বাহা ! তার সামনে মড়ার মাথার উপর একটা টোটা জ্বালানো থেকে থেকে নীল লাল আলো দিচ্ছে !

সঞ্চি। তারপর তারপর !

কুঞ্জ। বাপ্‌রে সে আমি বলতে পারবো না।

যক্ষি। বলতে পারবেনা তো সাথে এলে কেন ?

কুঞ্জ। ঘরের চৌকাঠে পা রেখেছি কি ঝপ্‌ করে আলো নিভে গেল।

সঞ্চি। তারপর!

কুঞ্জ। তারপর শব্দ শুনলুম যেন কে বল্লে—কস্তং ভো! আমি বল্লুম—কিসের কষ্ট হচ্ছে আপনার। সে বল্লে—কে তুমি। আমি বল্লেম—আমি কুঞ্জ। গম্ভীর স্বরে উত্তর হল—কাজ কর্ম্ম কিছু কর—গৃহমার্জ্জন, অন্নপাক? আমি বল্লেম—না, আমি যাত্রার দলে ভণ্ড-দূতী সাকি। গান গাই, খাই দাই, কাঁসী বাজাই ঠাকুর বাড়িতে। উত্তর হল—কি কারণে তুমি এত হইয়াছ ক্ষীণ! আমি ছড়া কেটে জবাব দিলেম—নিত্য অনাহারে মোর কাটিতেছে দিন। তারপরেই শুনলেম অন্ধকারটা যেন গর্জ্জে বল্লে—ধিক এই দেশ আর দেশবাসী জনে; গুণী হেথা দিন গুনি রয় অনশনে!

যক্ষি। তারপর কি হল?

কুঞ্জ। দেখলেম সট্ করে একটা সাদা সাপ।

সঞ্চি। চুপ চুপ! বল্ লতা লতা—বাস্তুলতা দেখেছিস্—তোর কপালে রাজদ্বি আছে।

কুঞ্জ। শোনো বলি ঠাকুরমা। সাপটা বেরিয়েই রূপ বদলে হ'ল একটা উল্কামুখী বেড়াল। তারপর বহুরূপী গিরগিটি না হয়ে লেজে পিঠে রামধনুকের রং ফোটাতে ফোটাতে সোনার বন্ন হয়ে ঢুকলো যেয়ে পাঁচিলের ফাটলে—বস্ আর কেউ নেই।

সঞ্চি। অন্নপূন্নার সোনার গোসাপ! বাপু, আজ থেকে তোমায় আর পেটের ভাবনা করতে হবেনা।

যক্ষি। গোসাপ দেখার আগে থেকে পিলে বেড়ে অবধি সে ভাবনা গেছে ছোড়ার। এটা হানা-বাড়ি, এখানে আর কাজ নেই, চলো দেশে ফিরি।

সঞ্চি। এতটা এসে ফিরবো?

কুঞ্জ। এটা হল আমাদের আপনার নোকের বাড়ি, এইখানেই রইবো আর যাবো কোথায়?

যক্ষি। চল ভিতরে যাই, তুমিও এসো বাপু।

কুঞ্জ। আমি পারবনা; ভর-সন্ধেবেলা ভুতুড়ে বাড়িতে ঢোকা আমার কর্ম্ম নয়। আমি বাজারে পড়ে থাকিগে।

সঞ্চি। সেখানে খাবি কি?

কুঞ্জ। কেন, আসবার সময় দরজায় শ্যালের গর্ত্তর কাছে এই ঘট্টে কুড়িয়ে পেলেম, এইটে বাঁধা দেবো। আসল খাগড়াই পিতল, ভারি দেখ না।

যক্ষি। দেখি, কাদা-মাটি ইট-পাটকেল ভর্ত্তি।

ছঞ্চি। রাখ ওটা সাবধানে—কোন সময় কাজে আসবে কে জানে—যাকে রাখে সেই রাখে।

যক্ষি। চল খুড়িমা, কুটুমবাড়ি ঢুকে আর কাজ নেই। বাড়ির চেহারা দেখেই বুঝেছি ওখানে ঘুঘু চরছে।

কুঞ্জ। একটা ছড়া আছে বলি শোনো, তারপর কুটুমবাড়ি ঢুকো।

দুদিন কুটুম এলে বাড়ি,
আদরের রয় বাড়াবাড়ি।
মন যোগাতে তাড়াতাড়ি,
পানের বাটা কাড়াকাড়ি।
জলপান চিনির পানা,
কাঁচাগোল্লা মিহিদানা।
অবশেষে ভাজা চানা
তাও দিতে মুখ নাড়ানাড়ি।

সঞ্চি। আমরা হলুম এ বাড়ির লোক, আমরা যাবো বাজারে বাসা করে থাকতে! না খেয়ে মরি সে-ও ভালো!

কুঞ্জ। হানা বাড়ি—শেষে ব্রহ্মদত্যির পাল্লায় পড়বো। কুটুমবাড়ির ভোজে কাজ নেই আমার, দাও আমার ঘটিটে।

যক্ষি। ঢের হয়েছে, অত লোভ কোরোনা; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!

সঞ্চি। কে যেন কাঁদচে না?

কুঞ্জ। আমি চল্লেম, থাক্ তোমরা।

যক্ষি। যাও, বাসা-বাড়ি ঠিক রেখো, আমরা এ দরজা দিয়ে ঢুকবো, ও দরজা দিয়ে বেরোবো। [সকলের প্রস্থান।

ক্রমশঃ

রঙ্-এর যাদু

শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গাঢ় মেটে রঙ্-এর উল্ কিনতে গিয়ে একটি ছেলে লাল রঙ্-এর উল্ নিয়ে এল। নীল রঙ্-এর উল্ কিনতে বলা হ'য়েছে, সে কিনল পাটল রঙ্-এর উল্। অবশ্য খেয়াল খুসিতে নয়, লাল রঙ্ সে চোখে দেখ্তে পায় না ব'লে। লাল রঙ্-কে সে দেখ্ছে মেটে রঙ্। পাটল রঙ্-কে নীল, এমনি। কিন্তু সে ভাব্ছে: একই রঙ্ সবার মত সে দেখ্ছে, যে গোল আছে তা শুধু নাম করলে। তাকে যদি বল': এর নাম নীল নয়, পাটল। হয়তো সে ব'লবে: হ্যাঁ! শুনেছি এ নাম, কিন্তু একে আমি নীল বলি। পাটল ও লাল রঙ্ আছে যা সে দেখ্তে পায় না, তাই ভুল ক'র্ছে, এ কথা কখনও তার মনে হ'বে না।

বিজ্ঞানী জন্ ডাল্টন্ও এমনি লাল রঙ্-কে দেখ্তেন মেটে ও পাটল-কে নীল। ডাল্টন্ই প্রথম রঙ্-না-দেখা—Colour-Blindness—বিষয়টি বুঝে লিখেছিলেন। তাই একে এক-সময় ব'ল্ত Daltonism. কয়েকটি সহজ প্রশ্ন থেকে আলো, রঙ্ ও চোখের স্নায়ু-পর্দায়-এর অনুভূতির কথা বুঝতে হবে।

সূর্যের সাদা আলো কী? সাতটি রঙ্-এর সমষ্টি, একটি শব্দে আছে সাত-রঙ্-এর নাম—Vibgyor-Violet, indigo, blue, green, yellow orange, red. আলোর উৎপাদক ঈথারের তরঙ্গমালা, কিন্তু তরঙ্গ নিজে আলো নয়। ঈথার-তরঙ্গ চোখের স্নায়ু-পর্দায় এসে ধাক্কা দেয়! এতে আলোর অনুভূতি হয়। তরঙ্গ যার চোখের স্নায়ু-পর্দায় এসে আঘাত দেয়, শুধু তারই চোখে আলো প্রকাশ করে। কিন্তু চোখ আলোর তরঙ্গ-মালার প্রতিটিতেই সাড়া দেয় না। এক এক রূপ তরঙ্গ এক এক রঙ্ হয়ে চোখে ধরা দেয়। সূর্য রশ্মিতে সকল তরঙ্গই আছে। তাই তরঙ্গমালার সকল রঙ্-এর মিশ্রনে হয় সাদার উৎপত্তি।

রঙিন বস্তুর রঙ্-এর মূলে কী আছে? রঙিন বস্তু সাদা আলো থেকে নিজের রঙ্ ছাড়া অপর ছয়টি রঙ্ নষ্ট করে দেয়। যেমন, লাল রঙ্-এর কাচ সাদা পর্দার সামনে ধরলে কাচ হ'তে বিচ্ছুরিত লাল রঙ্-এর জন্যই পর্দার রঙ্ লাল দেখাবে। এক কথায়, বস্তুর রঙ্ রঙ্-বিচ্ছুরণ ও গ্রহণের শক্তির উপর নির্ভর করে। নীল-চেলীতে যে রঙ্ আছে তা সাদা আলোর সকল রঙ্ শুষে নেয়, শুধু নীল রঙ্-ই ছড়িয়ে দেয়। গাছের পাতায় আছে—'Chlorophyll' বা পত্র-হরিৎ নামে এক পদার্থ। সাদা আলোর লাল ও নীল রঙ্-এরা শুষে

নেয়। অর্থাৎ চোখে যে আলো আস্বে তাতে লাল ও নীল রঙ্ থাক্বে না। প্রধানত, আলো থেকে সবুজ রঙ্-ই বিচ্ছুরিত হয়, তাই পাতার রঙ্ সবুজ। কালো সাদা-আলোর সাতটি রঙ্ই নিজের ভিতর শুষে নেয়। কোন রঙ্-ই বিচ্ছুরিত হয় না, তাই কালী রঙ্-হীন বা কালো রঙ্-এর।

প্রধানতঃ চোখের স্নায়ু-যবনিকায় তিনটি রঙ-এর অনুভূতি প্রবল,—লাল, সবুজ ও নীল। এ কথাও বলা হয়, এই তিন রঙ্-এর মিশ্রণেই নূতন রঙ্-এর সৃষ্টি হয়। Colour-Blind লোক কোন রঙ্-কে যে রঙ্-এর দেখে, অবিকল সেই রঙ্ কোন কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলে এর কারণ অনুসন্ধান সহজ হবে। এমন কাচ, যা লাল রঙ্-এর রশ্মি চোখে প্রবেশ হ'তে দেয় না। অধ্যাপক গিব্সন্ পরীক্ষা ক'রে ব'লেছেন, তা হ'ল সবুজ-নীল কাচ (greenish-blue glass) রেলওয়েতে সিগ্নাল-এর কাজে এই কাচ ব্যবহার হয়। একে তাই 'signal-green'ও ব'লে।

গাঢ় লাল রঙ্-এর পর্দা এই কাচের ভিতর দিয়ে কালো দেখাবে। কারণ, লাল পর্দা হ'তে লাল রঙ্-ই শুধু বিচ্ছুরিত হয়। সবুজ-নীল-কাচ-এর ভিতর দিয়ে লাল রঙ্ প্রবেশ করে না। লাল ছাড়া আর কোন রঙ্ই বিচ্ছুরিত হয় না, পর্দার রঙ্ তাই রঙহীন বা কালো। পর্দার রঙ্ খাঁটি লাল না হয়ে যদি লাল ও নীল-এর মিশ্রণ হয় তা হ'লে পর্দার রঙ্ কালো না হ'য়ে নীল হবে। কারণ, বিচ্ছুরিত নীল রঙ্ কাচ দিয়ে প্রবেশ করে। চোখে নীল রঙ্-এর অনুভূতি জাগায়।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ (magic lantern) দিয়ে রঙের এই খেলা দেখান হয়। ল্যাণ্টার্ণ-এর ছবির সামনে সবুজ-নীল-কাচ এঁটে দেওয়া হয়। আলোক-পথে ছবি পর্দায় এসে পড়ে। কিন্তু আলোর লাল-রঙ কাচ দিয়ে প্রবেশ করে না। তা হ'লে দেখ্ছি—ছবির রঙ হবে আলাদা। আবার কাচ তুলে সেই ছবি পর্দায় দেখালে রঙ হবে ঠিক ছবির মতন। রঙের এই খেলায় ম্যাজিকের চেয়েও কম আশ্চর্য নেই। কোনও বন্ধুকে চোখে সবুজ-নীল কাচ পরিয়ে তার সামনে নানা রঙ-এর উল্ ছড়িয়ে প্রতিটি উল-এর রঙ্ কী লিখ্তে ব'লো! সে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ব'ল্বে। 'কমলা রঙ্-'কে সে লিখ্বে 'গাঢ় সবুজ' 'হলুদ রঙ্'-কে বলবে 'হাল্কা সবুজ' ও 'পাটল রঙ্'-কে 'ফিকে নীল'!

অধ্যাপক গিব্সন্ লিখেছেন—'কোন Colour-blind লোক একটি গোলাপী রঙ্-এর কাপড় দেখে ব'ল্ত লাল। কিন্তু সে লাল রঙ্ মোটেই দেখতে পায় না। আমি নিজে কাচ দিয়ে দেখেছি, এতে নীল আভা আছে। কাচের চশমা দিয়ে গোলাপী রঙ্-এর কাপড় যেমন নীল দেখেছি, অবিকল সেই নীল আভার এক টুকরো কাপড় এনে লোকটিকে দেখাই, সে বলে এর রঙ্ লাল। এ হ'তে প্রমাণ হয় নীল রঙ্কে সে লাল বলে।"

গোলাপী রঙ্-কে সে নীল দেখে, কিন্তু বলে লাল। লাল রঙ্ কী সে জানে না। গাঢ় নীল ও গাঢ় গোলাপী রঙ্-এর দুটি উল্ তাকে দিলে রঙ্-এর বৈচিত্র্য সে ধ'রতে পারবে না। ব'ল্‌বে,—দুটোই নীল। কিন্তু গাঢ় গোলাপী ও ফিকে গোলাপী রঙ্-এর উল্ দেখে সে রঙ্-এর গাঢ়তার কথা সহজেই ব'লবে। অবশ্য রঙ্ গোলাপী দেখ্‌বে না, নীল দেখ্‌বে। এ কথা সে কিছুতেই বুঝবে না, সবার হ'তে ভিন্ন রঙ্ সে দেখ্‌ছে।

Colour-blind লোক পেলে সবুজ-নীল-কাচ দিয়ে নিজেরাও পরীক্ষা ক'রে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'তে পার। এখন হয় তো ক্লাসেরই কোন ছেলে কিন্তু সেও জানে না, তুমিও নও, রঙের এমনি অদ্ভুত অনুভূতি নিত্য তারই চোখে হচ্ছে।

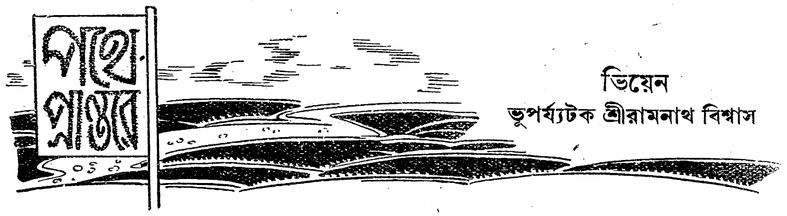

ভিয়েন

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভিয়েন্ ছিল একটি সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রকেন্দ্র। সে রাষ্ট্রকেন্দ্র আবার অনেক প্রাচীন। এই মহানগরীতে তাই এই মহানগরীতে গড়ে উঠেছিল নানা রকমের স্থাপত্য। চলতে চলতে এই স্থাপত্যগুলি দেখতাম আর 'টুরিষ্ট গাইড্'-এর ছবিগুলির সঙ্গে তুলনা করতাম। মনে হত, এর ফটোগ্রাফী যেন বাস্তব নয়। ফটোতে সম্রাটের প্রাসাদের দৃশ্য, মিউজিয়ম এবং পার্কগুলি কতই সুন্দর দেখায়, কিন্তু যখন সাদা চোখে দেখি তখন তাতে তেমন সৌন্দর্য্য দেখতে পাই না। মনে হয় যেন পরিত্যক্ত বাড়ি এবং বাগিচাগুলি শুধু সময়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট এবং রাজারা তাঁদের ইচ্ছা মত কত প্রাসাদ তৈরী করেছেন, তাতে সৌন্দর্য্যের বদলে ফুটে উঠেছে দাম্ভিকতা। তখনকার দিনে রাজা এবং সম্রাটদের দাম্ভিকতা সাধারণ লোক পছন্দ করত, কিন্তু এখন সেদিন আর নাই। সেজন্য দাম্ভিকতার সাক্ষ্য দিবার জন্য চুন সুরকী পাথর যেখানেই একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকেই বাস্তববাদী দূরে সরে যাচ্ছে। অষ্ট্রিয়ার লোক আজ আর সাম্রাজ্যবাদী নয়, তাদের বাসস্থান এত ছোট যে তারা এখন শুধু ভাবে, এমনি যদি সময় কাটে তবে তারা আর বাঁচবে না।

আমি ভিয়েণাতে যে সময়ে পৌঁছেছিলাম তখন নাৎসীদের প্রকাশ্যে কোন কাজ করবার ক্ষমতা ছিল না, এদিকে কমিউনিষ্ট মতাবলম্বিরা ত একদম মুখ বন্ধ করেই বসে থাকতে বাধ্য হতেন। তখনকার দিনে যে বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্যে থেকে অষ্ট্রিয়া আপন কাজকর্ম্ম চালিয়ে যেত সেই শক্তি নাৎসিদের তত ভয় করত না, যতটুকু ভয় করত কমিউনিষ্টদের। কমিউনিষ্টদের অষ্ট্রিয়াতে outlaw-এর মত ব্যবহার করা হত অর্থাৎ এদের যদি কেউ হত্যা

করত তবে হত্যাকারীর কোনরূপ শাস্তি হত না। এই যে দুর্যোগ, তারই মাঝে আমি ছিলাম এবং তথাকার লোক কি ভাবে জীবন চালাচ্ছে, তাই মন দিয়ে দেখতাম।

অষ্ট্রিয়াতে কাথলিকদের খুব প্রভাব একদিন ছিল। বুদাপেস্ত হইতে রওয়না হয়ে অষ্ট্রিয়া-সীমান্তে পৌঁছবার পরই দেখলাম, পথের পাশে মাটি দিয়ে গড়া একটি ক্রুশবিদ্ধ যিশু রাখা রয়েছে। আমাদের দেশে দেবদেবী গড়ে পূজোর পরে নদীজলে বিসর্জ্জন করতে পারলেই সকল আপদ চুকে যায়। অষ্ট্রিয়াও হংগেরীতে সেরূপ নয়। মূর্ত্তিটি এমনিভাবে গড়া হয়, যাতে করে অনেকদিন টিঁকে এবং তাতে বেশ কারুকার্য্য খচিত থাকে। আমি সেরূপ মূর্ত্তির পাশে দাঁড়াতাম এবং দেখতাম মূর্ত্তিটির গড়ন। অনেকে আমার সেই জিজ্ঞাসু মুখ দেখে হয়ত ভাবত আমি একজন যিশুর ভক্ত। তারা জানত না আমি কি চিন্তা করতাম। আমি মনে মনে আমাদের মূর্ত্তিকারদের সংগে ওদের দেশের কুম্ভকারদের তুলনা করতাম। তাদের চাহনি দেখে মনে হত, তারা যেন ভাবছে কোথাকার একটা কালো লোক, সেও আমাদের পরিত্যক্ত যিশুর নিকট প্রার্থনা করছে। তারা কিন্তু যিশুর মায়া কাটিয়েছিল। তাদের মনের গতি অন্য রকমের হয়েছিল তা আমি বুঝতাম কিন্তু কিছুই বলতাম না। এসব দেশে লোকে একটু চিন্তা করে কথা বলে কারণ তাদের প্রত্যেকটি কথার জন্য জবাবদিহী করতে হয়। আমরা সমাজের নিয়ম মেনে চলি কিন্তু যখনই সমাজের নিয়ম আলোচনা করি তখনই সমাজের মাথাওয়ালারা আমাদের দুকথা শোনান। অষ্ট্রিয়ায় সেরূপ কিছু নাই, তবে তারা জানে অনর্থক বাজে কথা বা মিথ্যা কথা বলে সমাজকে কুপথে চালে নিজেরই সর্বনাশ হবে। সেজন্য দরকারী কথা ছাড়া লোক অন্য কিছু বলেনা। আমিও তাদের নিয়ম মেনেই চলতাম। ভিয়েনের বুকের উপর সেরূপ অনেক দৃশ্য ছিল অর্থাৎ যিশুর মূর্ত্তি ছিল, কিন্তু সেই মূর্ত্তির অবয়বগুলির ঠিক ছিল না। অনেকে সেই মূর্ত্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলতে বা সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করত। আমার পরিচিত ইংলিশ-ভাষা দক্ষ মিঃ হেন্‌কিন্ একদিন কথা প্রসংগে বলেছিলেন, "মশাই, অষ্ট্রিয়া স্বাধীন একথা সবাই জানে, কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা অষ্ট্রিয়ার লোক মোটেই পছন্দ করে না। আপনি এই সহরে যত নরনারী দেখছেন তারা প্রায়ই ভিক্ষুক, তাদের ধর্ম্মের ভাঁওতা দেওয়া চলে না। প্রথম চাই রুটি, তারপর চাই কাপড় এবং থাকবার ঘর। এসব হলে খাবার পর মানুষের মতিগতি যেদিকে যায় তাকেই আমরা বলি সবচেয়ে ভাল ধর্ম্ম। শুনেছি ভারতে অনেক সাধু আছে যারা বনে জংগলে জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু এদেশে তা হবার সম্ভাবনা নাই। যদি তাই হত, তবে জার্মানীর উলংগদের সংখ্যা বেড়েই যেত। এখন লোক আর যিশুর ছবি ঝুলিয়ে রাখতে চায় না, বাইবেলের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখায় না। এখন অষ্ট্রিয়ার নরনারী চায় একটু বেঁচে থাকতে, শান্তির নিশ্বাস ফেলতে। সেই বেঁচে থাকবার অধিকার হতে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, শান্তির চিন্তা আমাদের লোপ পেয়েছে!" এ সম্বন্ধে কিছু বলিনি কারণ জানতাম্ এসব দেশে আমার বাচালতা চলবে না।

ভিয়েন-এ অনেক জিনিষ দেখার ও শেখবার আছে। যদি ভিয়েন দেখতে হয় এবং ভিয়েন সম্বন্ধে কিছু জানতে হয় তবে সেখানে থাকতে হবে। খাওয়া এবং থাকার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা দরকার। আমাকে ভ্রমণের জন্য কেউ দেশ হতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়ে দেয়নি, সে আশা আমি করিও নি। আমাকে আগাগোড়া নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। আমি ইউরোপ ভ্রমণ করতে যখন কলকাতা হতে রওয়ানা হই, তখন কলকাতার এক কলেজে লেকচার দিয়ে মাত্র শ' খানেক টাকা জমা করেছিলাম, সে টাকা পেশোয়ার পৌঁছবার পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কি করে টাকা অর্জন করতে হয় তা আমি জানতাম এবং তাই যাতে সে পথ ভিয়েনাতে বিচরণ করতে পারি তারই বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের আওতায় আসার পর এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়, সেই ভাষাকে বলা হত ভিনিক্। পূর্বে কিন্তু তা ছিলনা। ডচ্ ভাষা যেমন ভিয়েনের লোক বলত, বার্লিনের লোকও তেমনি ডচ্ ভাষাই বলত। ভিনিক ভাষায় এবং ডচ্ ভাষায় লেখা, পড়া এবং বলা কোনরূপ বেশকম নাই আছে শুধু নামের প্রভেদ। এরূপ নামেরও প্রভেদ হত না, যদি অষ্ট্রিয়া দেশ একদম ছোট না হয়ে যেত। জার্মাণী যুদ্ধে পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে পেরেছিল আর অষ্ট্রিয়া সে ধাক্কা সামলাতে পারেনি বলে অষ্ট্রিয়াতে একটা প্রতিক্রিয়া এসেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই অষ্ট্রিয়া জার্মাণী হতে পৃথক থাকার জন্য যথেচ্ছাচার করছিল। এরূপ যথেচ্ছাচার আমার মোটেই পছন্দ হত না কারণ আমাদের বাংলা দেশকে একবার বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই করুণ অবস্থার কথা মনে হবার পরই অষ্ট্রিয়ার শাসকশ্রেণীর উপর আপনা হতেই আমার একটা ঘৃণা এসেছিল। এখানকার শাসকের দল ইংরাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের নাচের পুতুল ছিল। কোন ভারতবাসী যদি অষ্ট্রিয়াতে যেত এবং তার কোন বিশেষগুণ থাকত, তবে তার কথা নিশ্চয়ই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছা করত, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সংবাদপত্র ফরাসী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের না জিজ্ঞাসা করে ভারতবাসীর সম্বন্ধে তাদের সংবাদপত্রে কিছুই লিখত না। লোকে বলত অষ্ট্রিয়া স্বাধীন আর আমি দেখতাম অষ্ট্রিয়া পরাধীন। এদিকে কিন্তু সেপাই সামন্তের বেশ তোড়জোড় ছিল। সে সব দেখে আমি হাসতাম।

ম্যাপ দেখে বুঝলাম অষ্ট্রিয়াতে মাত্র দু'শ কিলোমিটার পথ আমাকে সাইকেল চালাতে হবে। দু'শ কিলোমিটার পথ দুদিনে শেষ করা যায়। এদিকে ব্রাতিস্লভা শহরটি পথে ফেলে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে ভিয়েন হতে দুদিন পথ চললেই চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে পৌছবার নিশ্চয়তা আছে। অতএব ভিয়েন্ নগরে সপ্তাহ দুই থাকাই পছন্দ করলাম। দুই সপ্তাহ ভিয়েন্ শহরে থাকা আর দুই সপ্তাহ ঘুরে ফিরে দেখা। এতে আমার তিনশত শিলিংএর দরকার। এই শিলিংগুলি যোগাড় করতে হলে অন্তত হাজার পোষ্টকার্ড ছাপানো দরকার। এই ভেবে এক হাজার পোষ্টকার্ড ছাপাবার জন্য প্রেসে গেলাম। সংগে চললেন আমার দুভাষী। তিনিই দয়া করে ইংরেজী ভাষা হতে তথাকথিত ভিনিক ভাষায় আমার পোষ্টকার্ডখানা অনুবাদ করে দিলেন।

মধ্য-ইউরোপের মন এবং চালচালন আমাদের মতই। তাদের সংগে আমাদের যে একটু প্রভেদ আছে তা হল শরীরের চামড়ার। মধ্য-ইউরোপে এসে আমি বুঝি নাই যে আমি বিদেশে এসেছি। যিনি ছিলেন প্রেস ম্যানেজার তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে জিগ্‌গাসা করলেন, "আপনারা কি বৃটিশ শাসনে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় নাৎসিপ্রথা অবলম্বন করে দলে দলে পর্যটক হতে সুরু করেছেন নাকি? আপনাদের দেশ কি ইউরোপের সমান হয়। আপনাদের অপরের রাজ্যহরণের লোভ জেগে উঠেছে নাকি?" এতগুলি কথার উত্তর একসংগে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, শুধু বললাম, "আমাদের দেশ হতে সত্যিকারের ভূপর্যটক অতি কমই বিদেশে আসেন, অনেকে আসেন বিডন পাওলের দলে ভর্তি হয়ে বিদেশ দেখার জন্য, তারা দেখার মত কিছুই দেখেন না, কারণ তারা যে পরাধীন সেকথা তারা ভুলে যান। আমি কোন দলের লোক নই, আমাকে কেউ পাঠায়নি, স্বেচ্ছায় এসেছি স্বেচ্ছায় এবং আমি যা দেখব এবং যা শুনব হয়ত একদিন লিখব, এর বেশি আমার কোন উদ্দেশ্য নাই।" প্রেস ম্যানেজার আমাকে সহজে ছাড়লেন না। তিনি নানা কথার অবতারণা করতে লাগলেন এবং আমার এবং সংগের দুভাষীর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন। খাবার টেবিলে যাবার পূর্বেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নাৎসি-ইজম বলে যে একটা ইজম আছে তা আপনি জানেন?" আমি বললাম, "না মশাই, তার সন্ধান এখনও পাইনি।" তিনি বললেন, "জার্মাণীতে যখন যাবেন তখন নাৎসি-ইজম যে কি তা বেশ ভাল করে বুঝবেন। যাক্ বলুন ত, আপনাকে যদি এখন বাইরে বসিয়ে খেতে দেই, করমর্দ্দন না করি তবে আপনার দুঃখ হবে কি?" বললাম,

"নিশ্চয়ই দুঃখ হবে।" তিনি বললেন, "আপনার দেশ শাসন এবং শোষণ করে যদি আমার দেশের লোকের আরাম বাড়াই, আর আপনারা খেতে না পান তবে আপনি কি ভাববেন?" উত্তর দিলাম, "এটা খুব অন্যায় হচ্ছে ভাবব এবং প্রতিকারের চেষ্টা করব।" প্রেস ম্যানেজার বললেন, "এটাকেই বলে নাৎসি-ইজম।"

ভদ্রলোকের অকৃত্রিম ভালবাসায় আমি মোহিত হয়েছিলাম এবং মুখ খুলে মনের কথা বলতেও সক্ষম হয়েছিলাম। আমি জিগ্‌গাসা করলাম—"আপনাদের দেশের অবস্থা বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ অর্থনীতির দিকে আপনাদের অপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, বিদেশ হতে খাদ্য না আসলে আপনাদের চলেনা, বিদেশে গিয়ে বসবাস করবার অধিকার আপনাদের লোপ পেয়েছে, আপনারা এমন অবস্থায় কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবেন?"

"পরিবর্তন আসবে এটা নিশ্চয় কথা। তবে কখন এবং কিভাবে আসবে তাই হল বিবেচ্য বিষয়।"

এখন যেভাবে অষ্ট্রিয়ার পরিবর্তন এসেছে তা কিন্তু কেউ তখন ভাবেনি। তবে এটা মনে হয়েছিল, কতকগুলি লোক, বিশেষ করে যাঁরা কৃষক মজুর তারা শুধু জার্মাণীর সংগে মিশে যেতে চায়নি, তারা চেয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়া, হংগেরী, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মাণী মিলে একটি রাষ্ট্র হয়ে যায়। ছোট ছোট রাজ্য হওয়ার জন্য কৃষক মজুরদের যত অসুবিধা হয়েছিল তেমনটি আর কারো হয়নি। হংগেরীতে মজুরদের মাঝে একটা অস্বস্তি এসেছিল। এখানে এসে দেখলাম কৃষক মজুর ছটফট করছে। হংগেরীর মজুর অষ্ট্রিয়ায় এসে কাজ পাচ্ছেনা আর অষ্ট্রিয়ার মজুর ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়ায় যেতে পারছে না। অথচ মজুরে মজুরে বন্ধুত্ব রয়েছে, বিবাহ চলছে, কিন্তু রাষ্ট্রনীতির জরমিল থাকায় তারা কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ঘটনা আর কি হতে পারে। বৈদেশীক সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবছেন, ইউরোপের মধ্যভাগে ছোট ছোট রাষ্ট্র করার ফলে তাদের স্বার্থ বজায় থাকবে, তারা দেখবেন ইউরোপে যাতে আর যুদ্ধ না হয়, কিন্তু ইউরোপের কৃষক মজুর এবং কলের মজুর এসব কথার ধার ধারেনা, তারা দেখছে তাদের মাঝে যেন বৈরীভাব গড়ে তুলছে বৈদেশীক সাম্রাজ্যবাদীরাই।

অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত যেদিন পার হই, সেদিন দেখলাম কতকগুলি একঘোড়ার গাড়িয়ে আছে চেকোস্লোভাকিয়ার দিক হতে অষ্ট্রিয়াতে প্রবেশের জন্য। তাদের প্রত্যেকের গাড়িতে নানা রকমের শব্‌জী, ফল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে বোঝাই। চেক্‌দের কাস্টমস্ অফিসার এমনিভাবে গাড়িগুলি পরীক্ষা করছিলেন যে, কৃষকরা তা যদিও নীরবে সহ্য করছিল, তবুও তাদের মনের গতি এক বিকৃত আকৃতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখার পর আমার মনে হলো, জাতীয় মদিরার মোহ বেশিদিন থাকবে না, এক আঘাতে সবই ভেঙ্গে পড়বে।

প্রেস ম্যানেজার আমাকে বেশ করে খাইয়ে দিয়ে বললেন, "আগামী কাল বিকাল বেলা যেন আমি পোষ্ট কার্ডগুলি নিয়ে আসি। পোষ্ট কার্ডের এক পৃষ্ঠায় আমার ছবি ছাপান হয়েছিল, অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, "আমি একজন ভারতবাসী, আমি অমুক অমুক দেশ ভ্রমণ করেছি, এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করতে চাই, যারা পর্যটকদের ভালবাসেন তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন।" এর বেশি পোষ্টকার্ডে কিছুই লেখা ছিলনা। ভারতীয় ভাষায় এটাকে বলে 'ভিক্ষা করা', আর স্থানীয় অর্থাৎ ভিনিক ভাষায় এটাকে বলে—'আমার প্রাপ্য দাবী হতে আমাকে বঞ্চিত করোনা।' জার্মাণ কমিউনিষ্ট ভাষায় এই আবেদনকে বলে, 'আমি তোমাদেরই একজন, এটা তোমাদেরই কাজ, আমাকে আমার প্রাপ্য মজুরী দাও। অন্যান্য ভাষায় এটাকে কি বলে তার মত বলা হবে। দুঃখের বিষয় ভ্রমণকথা পড়ে আমাদের দেশের পাঠকরা ভাবেন অষ্ট্রিয়া একটা বৃহৎ রাজ্য, তা ভ্রমণ করতে অনেক বৎসর লাগে, কিন্তু ভৌগলিক সংবাদ রাখলে দেখা যায় বর্তমান অষ্ট্রিয়া আমাদের বাংলা দেশের যে কোন দু'টো জেলার সমান মাত্র।

[ক্রমশঃ

মারলে কি ছেলে ভাল হয়?

শ্রীরবীন্দ্র মল্লিক

গোলদীঘীতে সাঁতার শিখছে অসীম। সাঁতার শেখার অদম্য উৎসাহ। বাপ, মা, দাদা সকলের অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে যায় সকাল ছটার মধ্যে। গোলদীঘিতে পৌঁছুতে তার বাজে সওয়া ছটা। সাঁতার অভ্যাস ক'রে সে যখন বাড়ী ফেরে তখন বাজে সাড়ে সাতটা। কৌশলে সে বাড়ী থেকে বেরোয় আর বাড়ী ঢোকে। কেউ এর বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারে না। একদিন অসীম ধরা পড়লো। বাবা খড়্গ-হস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় ছিলি?"

বাবাকে অসীম চিরকাল ভয় করে। সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো,—"সাঁতার শিখতে গিয়েছিলাম, গোল—" অসীমের কথা শেষ হ'লোনা। তার বাবা চুলের মুঠি ধ'রে প্রবল বেগে একটা নাড়া দিয়ে বললেন,—"পাজি নচ্ছার কোথাকার! তোকে না একদিন বারণ ক'রেছি?" আবার চুলের ওপর সজোরে একটা টান দিয়ে ব'ললেন;—"সকালে পড়াশুনা গেলো—না সাঁতার শিখতে যাওয়া, মেরে একেবারে পাট ক'রে দেবো!" মা নীচে নেমে এলেন,—"এ্যাঁ, কি দস্যি ছেলে বাবা! বলা নেই কওয়া নেই সকাল থেকে উধাও। সাহসকে বলিহারি যাই! ছোট একরত্তি ছেলে, বিক্রম দেখনা!"

বাবা বলতে লাগলেন,—"ফের যদি কোথাও যাবি আমায় না বলে তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" ঠাকুরমা চেঁচামেচিতে নীচে নেমে এসে বললেন;—"বলি কি হচ্ছে? দুজনে মিলে দুধের ছেলেটাকে মেরে ফেলবি নাকি!" পরে অসীমের মায়ের দিকে ফিরে বললেন;—"বৌমা, তোমার না পেটের ছেলে! দয়ামায়া কি নেই প্রাণে? অমন করে বাপ মারছে; আর তুমি তাকে আরো উস্‌কে দিচ্ছো!" আবার অসীমের বাপের দিকে চেয়ে বললেন; "খোকা, তুই যদি কোনদিন আর 'অসু'র গায়ে হাত দিবি"—ঠাকুরমার গলা কেঁপে উঠলো, "আমি শুকিয়ে থাকবো সেদিন থেকে। যতদিন আমি আছি, তোকে এসব করতে হবে না।"

ঠাকুরমা অসীমকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন;—"যত দোষই করুক খোকা, এমন ছেলেকে মারতে তোর হাত ওঠে?"

অসীমের বাপ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন;—"না, মারতে হাত উঠবে কেন, পুজো করতে হাত উঠবে! আমার ঠাকুরমা আমার মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন, তুমিই বা আর বাদ দাও কেন?" পটপট করে তিনি চলে গেলেন।

ঠাকুরমার কোলে অসীম মুখ লুকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ঠাকুরমা তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, কোন উত্তর তিনি দিলেন না।···অসীমের দিনগুলো কাটতো এমনি কঠোর শাসনের মধ্যে দিয়ে। ছোট ছোট অপরাধে সে গুরুদণ্ড কতবার পেয়েছে।

স্কুল খুলতে সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হ'তে অসীমকে অলোক জিজ্ঞেস করলে;—"তুই আর সাঁতার শিখতে আসিস্ না কেন রে? অনেকটা শিখেছিলি, আর দিন তিন চার হ'লেই শেখা হয়ে যেতো! এদ্দিন এলিনি, আবার নতুন করে শিখতে হবে।" অসীমের বুকটা একটা প্রবল মোচড় খেলো। সে আস্তে আস্তে বললো,—"ভাই, বাবা বকে।"

—"বাবা বকে কিরে?" অলোক যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না;—"বাবা কেন বকবে?" একটু থেমে সে হেসে বললো;—"তুই বড়ো বোকা রে!"

অসীম বললো;—"তোর বাবা বকেতো তোকে!"

—"সব বাবাই বকেরে! ওটা ওঁদের নিয়ম! তা ছাড়া, নিজের ছেলেকে বকতে আর মারতে তো টেক্সো লাগে না! কেউতো বলবার কইবার নেই তাঁদের ওপর!"

—"সত্যি ভাই, বাবা আজকাল আমাকে ভারি বকেন। অবশ্য ঠাকুর-মার জন্যে মারতে পা'ন না। আমার কিন্তু ভাই রাগ হয় না, দুঃখু হয়। আচ্ছা, তোর কি হয় বলতো?"

—"আমার কিছুই মনে হয় না!" হেসে অলোক একটা ছড়া আবৃত্তি করলো:—

"বকো ঝকো কানে দিয়েছি তুলো
মারো ধরো পিঠ ক'রেছি কুলো।"

অসীম হাঁ ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—"ভয় নেই, ভয় নেই। তোর-ও দিন কতক বাদ আমার মতন অবস্থা হবে; তোর এসব সয়ে যাবে। তখন আমার মতন তুই হাসিমুখে সব সইতে পারবি।"

হাসিমুখে সব সহ্য করা যে কী তা সেদিন না বুঝলেও অসীম আজ বুঝলো। বিকেলে অলোকের বাড়ীতে গিয়ে সে দেখলো সাম্‌নের ফুট্‌পাতে অলোকের বাবা অলোককে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসেছেন। অতটুকু ছেলের বুকে অত বড়ো ভারী দেহ! দম্ আট্‌কে যাবে যে, অলোকের বাবার সেসব দিকে হুঁস্ নেই, তিনি জবাফুলের মত চোখ করে বিকট চীৎকার করছেন:—"বল্ বল্‌ছি বল্, আর কর্‌বি? তোকে আজ খুন করবো।" অলোক নির্ব্বিকারভাবে মাটিতে শুয়ে রয়েছে। অসীমকে দেখে সে চোখ টিপলো। অসীম বুঝলো অলোক তাকে অপেক্ষা করতে বলছে! অসীম একটু দূরে অপেক্ষা ক'রতে লাগলো। হঠাৎ অলোকের বাড়ীর ওপরকার সামনের জানালা খুলে গেলো! নারীকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল;—"অতো মেরে নাগো, ছেলেটা মরে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও!" কে সেসব কথায় কর্ণপাত করে! অলোকের বাবা চীৎকার চ'লেছেন;—"চুপ ক'রে আছো বদ্‌মাইস, ভিজে বেড়ালটির মতন, যেন কিছু জানো না! নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল,—"ওরে কে আছিস বাবা বাবা ধ'রে ওনাকে তোলনা। ছেলেটাকে—" আর তাঁর কথা শোনা গেল না। ততক্ষণে কতকগুলি ভদ্রলোক এসে পড়েছেন। একজন বলছেন;—"ক'রছেন কি মশায়, ছেলেটা যে দম আটকে

বল্ বলছি বল্, আর করবি?

মারা যাবে। অত ভারী শরীর নিয়ে ছোট ছেলেটার ওপর চেপে বসেছেন।" "আপনার কি মশায়?" অলোকের বাবা গর্জ্জে উঠলেন। অপর একজন বললেন;—"না আমাদের কিছু না, তবে উনি" জানালার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে "বলছেন বলেই।"

—"উনি কে? আমার ছেলে, আমি মারবো পিটবো যা খুসি তাই করবো, আপনার তাতে মাথা গলাবার কি অধিকার আছে।"

—"যা খুসি তাই করবেন মানে? থানা আছে জানেন?"

—"থানা? থানা আমার কি করবে?" অলোকের বাবা অলোককে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন;—ছেলেকে শাসন করছি, আর আপনারা আমায় থানা দেখাতে এসেছেন, খুব যা হোক ভদ্রলোক আপনারা!" একটু থেমে তিনি আবার বললেন;—"এই তো, আবার মারবো দেখি আপনারা কি করতে পারেন।"

অলোকের বাবা মুখ ঘোরালেন। অলোক সেখান থেকে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভদ্রলোকদ্বয় মৃদু হেসে প্রস্থান করলেন। অলোকের বাবা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলেন। মনে মনে তিনি বলছিলেন, আসুক একবার বাড়ী দেখবো কত বড়ো ছেলে!

অলোক ততক্ষণে অসীমকে নিয়ে সামনের গলিটা পার হয়ে ছুটতে ছুটতে বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে। হেসে বললো;—"এবার আয় আস্তে আস্তে হাঁটি, আর বাবা ধরতে পারবে না।"

অসীম বললো;—"এখন নয় ছাড়া পেলে, কিন্তু রাতে যখন বাড়ী ফিরবে তখন?"

—"তখন যা হবার হবে। চল্ এখন কেষ্টার বাড়ী যাওয়া যাক।"

—"কিন্তু তখন আবার এরকম মার খাবে তো!"

—"ও কিছু না। ওসব মার সয়ে গেছে।" একটু থেমে অলোক আবার বললো,—"কেষ্টারা নতুন বাড়ীতে উঠে গেছে তুই জানিসতো! চল আজ সারাদিনটা বেশ কাটবে।"

অসীম অবাক হয়ে গেলো অলোকের এই রকম কথাবার্ত্তায়। সে হেসে বললো;—"আচ্ছা তুই কি করেছিলি?"

—"তা দোষ করেছিলাম! কিন্তু ভাই, এবার বরাৎ-টা খারাপ, মিথ্যে কথাটা লাগলো না। প্রত্যেকবার ঠিক কেটে বেরিয়ে আসি, এবার আর তা হলোনা। বাবা ধরে ফেললো! তাই মারছিলো।" অলোক হাসতে লাগলো। অসীম মিথ্যে কথাকে বড়ো ভয় করতো। সে জানতো এর পেছনে অনেক কথার কারসাজি চাই, চাতুরী চাই, ছল চাই। সত্যি কথাকে সে চিরকাল তাই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

পড়াশুনোয় মন দিয়েছে ব'লে বাড়ীর সকলে অসীমকে আজকাল খুব ভালবাসে। মার দোর তো দূরের কথা, সকলে তার একটু কিছু হলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে!

অসীমের বাবা সেদিন বলছিলেন;—"ওগো শুনছ! ছেলেটাকে ছোটবেলায় মারতুম বলে, মা আমায় তখন কত কি বলতো! আজ দেখছো তো মারের ফল! ছেলে—" অসীমের মা বললেন,—"যাই বল বাপু, আমি তো তোমায় কিছু বলিনি। আমায় কেন শোনাচ্ছ। তার চেয়ে মাকে শোনাও।" অসীমের বাবা হাসতে থাকেন।

অসীমের পরীক্ষার খবর আজ বেরুবে। অসীম বিকেলের দিকে হাসিমুখে বাড়ী ফিরলো। জানালো,

ক নম্বরের জন্যে সে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। ঠাকুর-মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে অসীমকে বুকে জড়িয়ে রে কাঁদতে লাগলেন। অসীমের মা শুধু দূরে মুখখানা হাসি-হাসি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। অসীমের বাবা ফুল্ল মুখে নীচে নেমে গিয়ে ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে বললেন, "খোকা চলতো আমার সঙ্গে দোকানে কবার।" পনেরো টাকার একটা ভাল ঘড়ী কিনে ছেলের হাতে পরিয়ে তিনি সস্নেহে বললেন;—"খোকা তোকে াগে কত মেরেছি, বকেছি! এখন বুঝছিস তো কেন?" ছেলের হাত ধরে কাছে টেনে এনে আবার বললেন;—াতে তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়, যাতে ভবিষ্যতে তুই ক'রে খেতে পারিস্ সেই জন্যেই তো তোকে শাসন করতাম ত। এখন তোর মতিগতি পালটেছে। তোর সাফল্য দেখে আজ আমার কত যে আনন্দ!" মুখ নীচু করে সীম মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। পরদিন সকালে অসীম বললো;—"বাবা, আমি সাঁতার শিখতে যাবো।" সীমের বাবা হেসে বললেন;—"তোকে একলা ছেড়ে দিতে বড়ো ভয় করে বাবা! যদি অমঙ্গল কিছু—"

—"কত ছেলেই তো শিখছে! তা তোমার যদি ভয় করে দাদাকে সঙ্গে দাও না।" বাবা বুঝলেন, লেন;—"বেশ দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যা।" একদিন অসীম আব্দার ধরলো;—"বাবা সিনেমায় যাবো।" আগে মন কথা শুনলে হয়তো অসীমের পিঠের চামড়া ঠিক থাকতো কিনা সন্দেহ! কিন্তু আজ ছেলে ভাল হয়েছে, াবা হেসে বললেন;—"নে এই সাড়ে চার আনা।" অসীম আব্দার ক'রে বললো;—"না বাবা আমি ন-আনায় বো!"—"ন-আনায়? আচ্ছা তাই নে, যখন ছাড়্‌বি না।"

কিছুদিন কেটে গেছে। "—হ্যাঁরে তোদের prize distributionএর দিন কবে?" বাবা ছেলেকে জ্ঞাসা করলেন।

—"এখনো জানায়নি।"

—"অন্য অন্য স্কুলের সব prize দেওয়া হ'য়ে গেলো আর তোদের স্কুলের prize দিচ্ছেনা। কবে বে রে?"

—"যবে ওদের খুসি। কি ক'রে বলি বলুন?" ছেলে মুখ কাঁচু মাচু ক'রে জানালো।

—"কি রকম স্কুল রে তোদের?" বাবা হাসেন। অসীম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়!

সেদিন সন্ধ্যের দিকে অসীম, অলোক আর কেষ্টতে ব'সে ব'সে কথা হচ্ছিলো। অলোক বললো,—অস্থটা কি ছিল আর কি হ'লো! নিরীহ গো—ব্যাচারী ছিল আগে, আর আজকাল—"

—"আজকাল" অসীম হেসে বলল,—"তুই ভাই পরশমণি, তোর ছোঁয়াতেই সোনা হ'য়ে গেছি।"

—"এখন তো আমার দোষ দিবিই", অলোক বললো।

কেষ্ট বললো,—"ওঃ সাহস আছে বটে। ছমাস ধ'রে নাম কাটিয়ে টাকা নিয়ে ফুর্ত্তি হচ্ছে, আর বাড়ীতে গিয়ে বলে কিনা সেকেণ্ড হ'য়েছি।" অসীম হাসতে থাকে।

"তুই কি আর ভুলেও কখন সত্যকথা বলবি না?" কেষ্ট জিগ্যেস করলো।

"পাগলা! সত্যকথা বলতে গিয়ে একদিন যা মার খেয়েছি—আর কখনো সত্যকথা বলে? প্রাণ থাকতে তো না।"

—"আচ্ছা যদি তোর বাবা জানতে পারে, কি হবে তোর বলতো!"

—"ইস্" অসীম বললো; "জানতে পারলেই হ'লো আর কি? কি ক'রে জানবে? কে গিয়ে বলবে

বাবাকে ? অলোক না তুই ?" অসীম হাসতে থাকে,—"বাবা ক'দিন ধ'রে আবার prize prize ক'রে বড্ডো বিরক্ত সুরু ক'রেছে। দুটো তিনটে বই কিনে নিয়ে গিয়ে দেখালেই হবে। কি বল ?"

কেষ্ট হেসে বললো, "ঘটে তোদের সব বুদ্ধিই যোগায় দেখ্‌ছি।" অসীম হেসে উত্তর করলো,—"তোরও দিনকতক বাদ জোগাবে ভয় নেই।" কেষ্ট সবে দিনকতক হ'লো তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সুরু করেছে। অসীম কেষ্টকে বোঝাতে সুরু করলো,—"দেখ, মিথ্যে কথার মত জিনিস নেই। যত পারবি মিথ্যেকথা বলবি। এই দেখ্‌না আমার সঙ্গে বাড়ীতে আগে কি রকম ব্যবহার ক'রতো। আর আজকাল ?" অসীম গর্ব্বের হাসি হাসতে হাসতে বললো—"খালি একটি মিথ্যেকথার জন্য সেকেণ্ড হয়েছি। অবশ্য এর কদিন আগে থেকে খালি বই নিয়ে বসে থাকতুম্। তা না করলে কি করে চলবে বল ? ধরা পড়ে যাবো যে ! আর দেখ্—"

অলোক বলল,—"চল এখন ওঠা যাক, কোথাও ঘুরে আসি। একসঙ্গে এত বললে ও যা বোকা সব হজম করতে পারবে না। চল্, চল্।"

সকলে উঠে পড়লো।*

নীল নদের দান

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

মিশরের রাজকুমারী 'ফেনিও'র রূপের কথা তখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকুমারীর তখন কতই বা বয়েস, তবুও রাজা এরই মধ্যে দেশান্তরে লোক পাঠিয়েছেন রূপবান রাজকুমারের জন্যে।

দেশ বিদেশের রাজকুমারেরা আপনা থেকে এসেই ধন্না দেয়। রাজকুমারী ফিরেও চায় না। রাজদূত লোক বেছে বেছে আনে রাজকুমার—যাদের রূপে বনের পরীরাও মুগ্ধ ; ফেনিও তাদের দেখে শুধু কৌতুক করে অপমানে মাথা হেঁট করে বেচারীরা ফিরে যায়।.....

রাজা রাণী সকলেই চিন্তাকুল ! একটু আশা ছিল—লিবিয়ার রাজকুমার লিংকো আসবে। ফেনিওর অনেক দিনের বন্ধু সে। ফেনিওর হয়ত আপত্তি থাকবে না। কিন্তু সব আশা ভেঙ্গে দিল লিংকোর একখানি চিঠি। তাতে সে জানিয়েছে—ফেনিওর পাণিগ্রহণের জন্যে মহারাজের আমন্ত্রণ সে সসম্মানে গ্রহণ করত—যদি না আজ লিবিয়ার সীমারেখায় পড়ত শত্রুর ছাউনি।

মিশরের রাজার চোখে ঘুম নেই—রাজকার্য্যে মন নেই। রাজ্যশুদ্ধ লোকের মুখ বিষণ্ণ।..... একদিন দুদিন· ·হপ্তা···তারপর মাস গেল—ঘুরল বছর।

···হঠাৎ একদিন সভায় দেখা গেল রাজ পুরোহিতকে। রাজার মুখ শুকালো—মন্ত্রীর মাথা ঘুরল—

---

* আশা করি পাঠকগণ গল্পের নীতিটি ভুল বুঝিবেন না—সঃ।

রাণী কপালে হাত দিলেন।—সর্ব্বনাশ ! রাজা সভয়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন পুরোহিতকে। "আদেশ কি প্রভু ? সময় কি হ'ল ?" পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল,—"হ্যাঁ—দেবীর আদেশ, মহারাজ ! রাজকুমারী ফেনিওর আজ সপ্তদশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। দেশের নিয়ম অনুসারে রাজকুমারীর সত্বর বিবাহের ব্যবস্থা চাই।" মহারাজ নতশিরে সম্মতি জানালেন।.....

অনেক পরামর্শের পর স্থির হ'ল,—পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন কুমার ফেনিওর পাণিগ্রহণ করতে পারবে—শুধু যার দান হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাজকুমারী ফেনিওর অহংকারের এই শাস্তি ! আর এই বিচারের ভার গ্রহণ করবেন স্বয়ং মিশরের পুরোহিত 'পেণ্ডা'।

···আবার দেশ দেশান্তরের রাজকুমারদের ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়ল !—সাত সমুদ্র তের নদীর বুকে ভাসল—ময়ূরপঙ্খী,—তেপান্তরের ঘুমন্ত প্রান্তর রাজকুমারদের পদধ্বনিতে জেগে উঠল। নানা উপহারে রাজপ্রাসাদে আর জায়গা ধরে না। কেউ পাঠাল এমন চমকদার শাড়ী—দুনিয়ার বড় বড় তাঁতীরাও যার কল্পনা কখনও করেনি। মাকড়সার জালের মত হাল্‌কা—স্বচ্ছ—মিহি। কেউ পাঠাল চুণী-পান্নার এমন তৈরী মুকুট যার কাছে পৃথিবীর যে কোন রাজার মুকুট ম্লান হয়ে যায়, ঠিক যেমনটি হয় এক আর উজ্জ্বল আলোর মাঝে একটি নিষ্প্রভ প্রদীপ। আবার কেউ এনে দিল শুধু রাশি রাশি সোনার মোহর—যার মাঝে বেমালুম ঢাকা পড়ে যায় রাজকুমারী আর পুরোহিত !···এমনি নানা দেশের রাজার কাছ থেকে আসে নানা যৌতুক। কিন্তু পুরোহিত শুধু মাথাই নাড়ে।.....

একদিন সুদূর গ্রীস দেশ থেকে এল এক যুবক। যুবকের নাম 'নর্হলাঙ্গ' বা 'নীলাঙ্গ'। যুবকের শ্রী নেই। অদ্ভুত কদর্য্য চেহারা !···'নীলাঙ্গ' গ্রীসদেশের এক নিভৃত পল্লীর ছেলে। জুপিটারের মন্দিরের সে তরুণ পূজারী। জুপিটার জানালেন—পৃথিবীর সেরা সুন্দরী মেয়ের হাতে প্রসাদ খাবার ইচ্ছা। আর এর ভার দিলেন তিনি নীলাঙ্গের ওপর। দেবতার বাসনা। নীলাঙ্গ স্থির করল—পূর্ণ করতে হবেই তা যে কোন প্রকারে। ···রাজপ্রাসাদে হাজির হল নীলাঙ্গ। সবিনয়ে জানাল—ফেনিওর পাণিপ্রার্থী সে। রাজকুমারী ঘৃণায় চোখে আঁচল দিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে পুরোহিত জিগেস করল, "দান এনেছ ?" "দান !" আশ্চর্য্য প্রকাশ করল নীলাঙ্গ। "সে সংগতি ত আমার নেই প্রভু।" পুরোহিত তাকে কঠোর বিদ্রূপ করে বলল—"তবে এ সখ কেন ?" খানিক স্তব্ধ রইল নীলাঙ্গ। তারপর কোমর থেকে টেনে নিল একটা ছোরা ! জুপিটারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নীলাঙ্গ সে ছোরা ঈষৎ বসাল বুকে—তারপর দিল মৃদু টান। ঝর্ ঝর্ করে পড়ল তাজা রক্ত ! তাই দুহাতে ভরে নীলাঙ্গ এগিয়ে গেল পুরোহিতের কাছে। "ধরুন প্রভু ! আমার এ নগণ্য দান।" রাজা হাসলেন। "পাগল হে তুমি পাগল !" রাণী বোঝালেন—"বাবা—একে কি উপহার বলে ?"···কিন্তু আশ্চর্য্য !! সকলে দেখলে পুরোহিত অভ্যর্থনা করলেন নীলাঙ্গকে—"এস বাবা এস তোমার দানই সবার শ্রেষ্ঠ ! তোমার হাতেই তুলে দেব রাজকুমারীকে।" রাজা কাঁপলেন রাগে—রাণী কাঁপলেন কান্নায়—রাজকুমারী হ'লেন মূর্চ্ছিতা !—রাজা হুংকার দিলেন—"এ হতে পারে না"—গম্ভীর উত্তর এল "আমার আদেশ মহারাজ !" উপায় নেই। রাজা এবার নীলাঙ্গের উদ্দেশ্যে বললেন "তাহ'লে আমারও এক আদেশ আছে নীলাঙ্গ"। "আজ্ঞা করুন।" যোড়হাত করে দাঁড়াল নীলাঙ্গ। "আমার নিয়ম—আমার যে জামাতা হবে,—আমার অবর্তমানে তাকে যে কোন উপায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই মিশরকে।" ঈষৎ চিন্তা করে নীলাঙ্গ শপথ করল।.....

জুপিটার সন্তুষ্ট হ'লেন। কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল না তাদের দাম্পত্য জীবন ! ফেনিও তাকে ঘৃণা করে।

নীলাঙ্গ নিজের কুৎসীত চেহারার পানে চেয়ে লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।···একদিন সে বলল—"চল ফেনিও, তোমায় দেশে রেখে আসি। হয়ত সেখানে সুখে থাকবে।" ফেনিও তখনি রাজী হ'ল।

···দেশে এসে ফেনিও শুনল শত্রু জয় করে 'লিংকো' এসেছে তার পাণিগ্রহণের জন্যে। ফেনিও কাঁদল। জীবনে তার ঐ ছিল একমাত্র আশা। কিন্তু আজ? আর কি কোন উপায় নেই এই কুৎসীত পূজারীটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার?

নীলাঙ্গ ফেনিওর মাথায় হাত বুলিয়ে জিগেস করল, কি হয়েছে। ফেনিও জানাল তাকে তার সব কথা। নীলাঙ্গ আস্তে আস্তে সরে গেল।···

লিবিয়ার রাজকুমারের শিবিরে নীলাঙ্গের ডাক পড়ল। নীলাঙ্গ এল। রাজকুমার লিংকো সসম্মানে জানাল অভ্যর্থনা। "আমায় স্মরণ করেছেন প্রভু?" "হ্যাঁ নীলাঙ্গ শোন।" রাজকুমার নীলাঙ্গর কাঁধে হাত রাখল। "নীলাঙ্গ! জানি তুমি গ্রীক্ পুরোহিত। কিন্তু পারবে তোমার ঐ পদের যোগ্যতা রাখতে?" "চেষ্টা করব।" উত্তর দিল নীলাঙ্গ। "তবে এস।" নীলাঙ্গকে নিয়ে লিংকো প্রবেশ করল পাশের শিবিরে। "দেখেছ?" আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এক স্বর্ণ প্রতিমা। "চিন্তে পার একে?" নীলাঙ্গ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। "চিনেছি—ফেনিও।" "তুমি গ্রীক্ পুরোহিত—মনে আছে?" "হ্যাঁ।" নির্ভিক উত্তর। লিংকো মৃদু হেসে তার পিঠ চাপ্‌ড়াল। "শোন—এতদিন ধ'রে শুধু করে এসেছি এই স্বর্ণ-প্রতিমার পূজো। আজ চাই সেই সত্যকারের প্রতিমা পূজো করতে—যার পূজোর ভার এখন তোমার হাতে।" "কিন্তু—আর তা কি করে—হবে—।" "শুধু তুমি যদি একটু ইচ্ছে কর।" নীলাঙ্গ উত্তর দিল, "আমি ইচ্ছে করলেই?" লিংকো বলল "হ্যাঁ গ্রীক্ পুরোহিত।—হ্যাঁ—শোন, তুমি পুরোহিত। তোমার কর্তব্য শুধু এক মনে দেবতার পূজো করে যাওয়া;—এ পূজো তোমার জন্যে নয় পুরোহিত—নয়। এ বন্ধনের মধ্যে তুমি কেন নিজেকে এগিয়ে দিয়েছ? এই কি গ্রীক্ পুরোহিতএর কর্তব্য—নীলাঙ্গ?" নীলাঙ্গ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অদূরে স্বর্ণ-প্রতিমার পানে। ম্লান বৈকালী আলো মূর্তির অন্তরে অন্তরে যেন করুণভাবে ফুটে উঠেছে। উদাসভাবে জিগেস করল নীলাঙ্গ—"উপায়?" লিংকোর উত্তর হয়—"হ্যাঁ—উপায় আছে নীলাঙ্গ। তুমি গ্রীক্—সেই গ্রীক জাতি যার কীর্তিগাঁথা সুদূর এশিয়াও প্রতিধ্বনিত। তুমি সেই দেশেরই দেবতা জুপিটারের পুরোহিত। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। এতটুকু একটু বাধা—আমার আর ফেনিওর মাঝে। পারবে না তুমি সেই বাধাটুকু সরিয়ে দিতে?" "আজ্ঞা করুন। সম্ভব হ'লে গ্রীক্ পুরোহিত তাতে পেছবে না।"—ধীরে নীলাঙ্গ জবাব দেয়। "তুমি বীর—তুমি বীর নীলাঙ্গ! তুমি পারবে।" লিংকো আর একটু কাছে টেনে নিল নীলাঙ্গকে।—ফিস্ ফিস্ করে বলল—"বাধা শুধু তুমি—জীবিত।"···নীরব নীলাঙ্গ! ···"উত্তর দাও নীলাঙ্গ—পারবে?" নীলাঙ্গের মুখে ম্লান হাসি!

রাজা শুনলেন নীলাঙ্গ মরেছে। রাণী শুনলেন, রাজকুমারী শুনলেন। রাজকুমার লিংকো এল সান্ত্বনা দিতে। জিগেস করল, "লোকটা হঠাৎ মরল কেন?" সবাই ভাবল—তাই ত! মরল কেন! রাজা উত্তর দিলেন—"কারণ আছে কুমার। ফেনিওকে বিবাহ করবার পূর্বে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম—আমার অবর্তমানে এ রাজ্য রক্ষার ভার তার ওপর! আমার ঘোর সন্দেহ সে শুধু তারই ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।"···

তারপর সেই রাত্রেই পড়ে গেল সারা মিশরে আনন্দের হুল্লোড়। দেশের আনাচে কানাচে রাজপথে প্রাসাদ বাতায়নে জ্বলে উঠলো সহস্র দীপালোক।···পুরোহিত ফেনিওর হাতখানি সঁপে দিল লিবিয়ার রাজকুমার লিংকোর হাতে।···

পরের দিন ভোরে রাজ্যশুদ্ধ লোক অবাক! রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী! হঠাৎ এ নদীর আবির্ভাবে দেশের লোক হল শঙ্কিত। হয়ত বা দেশের মাঝে কি এক দুর্দিন নেমে আসছে—তারই চিহ্ন এই নদী! পুরোহিতের ওপর ভার পড়ল—এ নদীর আবির্ভাবের কারণ বের করতে। পুরোহিত শরণ নিলেন দেবমন্দিরে। দৈববাণী পেল পুরোহিত। সকলে জানল—নীলাঙ্গ ঐখানে তার বুকের শেষ রক্তবিন্দুটুকু ঢেলেছে। জুপিটারের ভক্ত পুরোহিত সে। তাই জুপিটার স্বয়ং তাকে পরিণত করেছেন এই নদীতে—যাতে তার অস্তিত্ব চিরদিনের মত এই পৃথিবীর বুকে রয়ে যায়।···সকলে এসে ভিড় করে দাঁড়াল নতুন নদীতীরে। রাজা বললেন,—"এ নদীর পরিচয় একটা দিতে হবে, মন্ত্রী। কি নাম হবে এর?" পেছন থেকে উত্তর এল—"নীল নদী।" সকলে চেয়ে দেখল ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রাজকুমারী ফেনিও, তার চোখের কোলে আজ অশ্রুবিন্দু!

তারপর বহু যুগ—বহু শতাব্দী কেটে গেছে। নীল নদী বহুদূর আজ বিস্তৃত। তাই সভ্যমানুষ আজ তার নাম রেখেছে 'নীল নদ।' আজ কোথায় বা সেই রাজা—কোথায় বা সেই রাজকুমারী ফেনিও। কালের স্রোতে আজ তারা কত মাটির তলায় তলিয়ে গিয়েছে—কে তার খোঁজ রাখে। কিন্তু আজও অমর হয়ে আছে নীল নদরূপী সেই নীলাঙ্গ।···

আজও নীলাঙ্গ ভোলেনি তার শপথ। গ্রীসের পুরোহিত সে। তা-ই জীবনে যা সম্ভব হয়নি—মরণে নিঃস্বার্থভাবে আজও তার শপথের প্রতি অক্ষরটি মেনে চলেছে। সে জানে মিশরকে বাঁচাতে হবে। এ ভার তার ওপরই ন্যস্ত! মরুর বুকেও মিশরকে শস্যশ্যামলায় আজ সে তাই বাঁচিয়ে রেখেছে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। তাই আবহমান কালের ইতিহাসে মিশরের পরিচয় 'নীল নদের দান।'

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বইগুলি তোমরা পড়েছ কি? বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে তাঁর এই বইগুলি পড়ো।—

তরুণ তুর্কী—	১৸০
আজকের আমেরিকা—	২॥০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরণ বিজয়ী চীন—	৩॥০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	২॥০

কলিকাতার বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে

১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কনট্রাক্টার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

কবিতা

শিবদুর্গার বিয়ে

(সংগ্রহ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোনে হিতকাম সবে শিবদুর্গার বিয়ের কথা
ঘটক নিত্য আসে নিত্য বসে কয়না তার মনের কথা
সেয়না মেয়ে যার ঘরে তার মায়ায় বেড়া জাল
ভাবি মিলন কাল।

নারদ গেলেন তাড়াতাড়ি মামার বাড়ি
মামার বিয়ের লগ্‌নো যায় বয়ে।
রংমশাল জ্বালে বাতি
জামাই এলেন বেয়ান রাতি
চাল্‌না তলায় বসলো বুড়া
টোপর মাথায় দিয়ে।
স্বর্ণদাতা কন্যা আমার
জলে ফেলে দিলো
যা ছিল কপালে তাই হ'ল
আইয়ে শুয়ে ডেকে আন
লগ্‌নো বহে যায়।
দিদি এ যে নেংটা দিগম্বর
পরা বাঘের ছাল
এই কি তোমার ভবানীর বর।
কি করবো দিদি
যা ছিল কপালে তাই হল
ঐ যে নারদ হাটখুড়ো
জ্বেলে দাও ওর মুখে আগুনের নুড়ো।
আধ পয়সা নেই আমার
সিদ্ধি কিনে খাওয়ার
কি যে দেবো তোমারে
শঙ্খ কিনে আমি
তোমার বাবা হিমন্ত রাজা
ধনের অধিকারি
শঙ্খ বস্ত্র পরবে তুমি
যাও বাপের বাড়ি।

সেই কথা শুনে গৌরির হরষিত মন
কার্ত্তিক নেলেন কোলে করে
গণেশ গেল হেঁটে।

চলন্তিকা

ভারতের অমর মহাকবি কালিদাসের বাসস্থান কোথায়, কোন্ দেশে বসবাস কালে তিনি তাঁর কাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত ছিলেন না। বহুদিন গবেষণার ফলে নাগপুরের কালিদাস-উৎসব সমিতি সম্প্রতি সুস্থির করেছেন যে নাগপুরের সন্নিকট হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র রামটেক্ মহাকবির বাসস্থান ছিল, রামটেকে বসবাস কালেই তিনি তাঁর অমর কাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন। কালিদাস-উৎসব সমিতির উদ্যোগে মহাকবির অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রামটেক্‌এ একটি সু-উচ্চ মর্ম্মর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই স্মৃতিস্তম্ভটি রামটেকের একটি পাহাড়ের ওপর নির্ম্মিত হচ্ছে। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হলে স্মৃতিস্তম্ভটি ১৫ মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে।

রুশ বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েট অধিনায়ক ষ্ট্যালিন মিত্রপক্ষের সম্মুখে পাঁচটি বিশেষ কর্ত্তব্যের বিষয় ঘোষণা করেন। (১) হিটলারের কবল থেকে ইউরোপের জনসাধারণকে মুক্ত করা (২) বিভিন্ন দেশের মুক্ত জনসাধারণদের নিজেদের ইচ্ছামত রাষ্ট্রজীবন সংগঠন অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া (৩) অপরাধ ও অত্যাচারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া (৪) ইউরোপে এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যার দ্বারা নূতন জার্ম্মাণ-আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করা এবং (৫) যে সমস্ত অঞ্চল জার্ম্মাণ ফাসিষ্ট কবলে নির্য্যাতিত, তাদের পুনঃ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্থায়ী সহযোগিতা স্থাপন। রুশদের এই বিশেষ জাতীয় দিনে (৬ই নভেম্বর) ষ্ট্যালিন আরো ঘোষণা করেন যে শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ আসন্ন। রুশ বিপ্লব বার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে সোভিয়েটের জার্ম্মাণ কবল থেকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের পুনরুদ্ধার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ষ্ট্যালিনের বক্তৃতার পর লণ্ডনে ৯ই নভেম্বর এক উৎসবে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলও বলেন যে ১৯৪৪ সালেই যুদ্ধের বোঝাপড়া হবে। ৮ই নভেম্বর মিউনিক্‌এ হিটলার এক বক্তৃতায় বলেছে যে জার্ম্মাণী শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবে এবং কখনও আত্মসমর্পণ করবে না। শক্ত শত্রুর পাল্লায় জার্ম্মাণী যে বিপর্য্যস্ত হচ্ছে, এবং বেঁচে থাকার জন্য যে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হচ্ছে, হিটলারের বক্তৃতায় তার বেশ আভাষ পাওয়া যায়।

বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু যেন বেড়েই চলেছে। চাঁদপুরের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ যে, ৫ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে, সেই কয়দিনেই চাঁদপুরে প্রায় ১১ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি অঞ্চলেও এক সপ্তাহের ভেতর প্রায় ৫০০ লোক মারা পড়েছে। বাংলায় সাপ্তাহিক মৃত্যু সংখ্যা

৪০ হাজার থেকে এক লাখ ; রুশ-জার্ম্মাণ কোন বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্রেও বোধহয় এত লোক মারা পড়েনি। গভর্ণমেণ্ট, মিলিটারী, রিলিফ সমিতিগুলি ও জনসাধারণ তাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ না করলে এবং এর গুরুত্ব মিলিত শক্তিগণ পূর্ণ উপলব্ধি না করলে বা তাঁদের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা না করলে, ভারতের এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। এই বিরাট কাজে সাহায্য দেবার জন্য বাংলার বন্দী নেতাদের এখনই মুক্তি দেওয়া উচিৎ। বাংলা আজ যুদ্ধ-সীমান্ত দেশ, ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ—এর গুরুত্ব বাদ দিয়েও, শুধু দুঃস্থ মরণাপন্ন মানবতার রক্ষাকল্পে আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর মিলিত জাতিদের এক চরম পরীক্ষা উপস্থিত করেছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় দুর্দ্দশাগ্রস্থ পরাধীন ভারতের এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কষ্টিপাথরে মিলিত-শক্তিদের বিশেষ করে ব্রিটিশ নৈতিক শক্তির পরীক্ষা সুরু হয়েছে। ভারতের নূতন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কি নূতন নীতি ও ব্যবস্থার পত্তন করেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নি। সরকারী লণ্ডনও আজ পর্য্যন্ত তার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় নি।

বন্ধুরা !

তোমাদের অসংখ্য কিশোর মনের মাঝখানে নিজেকে খুঁজে পেলুম, তোমাদের চিঠিতে তোমাদের কিশোর বয়সের ছাপ। অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা—উদ্বেলিত অন্তর তোমাদের। এই দুর্য্যোগের মাঝে তোমাদের শ্যামল কোমল সহৃদয় মন, সেবা সাহায্যে উন্মুখ অন্তর এ দেশের আশ্বাস। এই মন এই আগ্রহ সেবার এই তীব্র বাসনা যদি থাকে, দেশের পুরাতন জীর্ণতার মাঝে জাগবে নবীনতার প্রাণস্পর্শ। প্রার্থনা করি, এই শ্যামল সরসতা তোমাদের অটুট হোক।

মীরা ও হীরক (গ্রাঃ ১২৮৩ কলিকাতা) বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণ করে ইন্দিরাকেও জানিয়ে দিয়েছি। নিরন্নদের যে পূজার সময় খাইয়েছ তা জেনে ভাল লাগলো। ছোট হলেও অনেক বড়কে তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ। এ সময়ে প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেকের সেবা সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। **মিহির সেন** (গ্রাঃ ১৫১০ এলাহাবাদ) ফতেপুর ছেড়ে এসেছ তুমি এলাহাবাদে তা তোমার পত্রে জানলুম এবং ঐ ঠিকানায় রংমশাল যাবে। **অসীমদেব গোস্বামী** (১৬৮২ কলিকাতা) রংমশালের সমালোচনা দেখলাম অনেক দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে যে সে খবর আশা করি রাখো। যাঁর লেখা চেয়েছ তাঁর জন্য পত্রিকা মশাইএর কাছে দরবার করেছি। রাগ করবো কেন ? রংমশাল তোমাদের কাগজ কাজেই ভালমন্দ দিকে দৃষ্টি থাকে বেশী আমাদের। আমরা তো সকলের মনের কথাই জানতে চাই। বৈশাখ থেকে মাঘ

অবধি রংমশালের সমালোচনা লিখে পাঠিও। **সত্যেন্দ্র কাঞ্জী** (১৮৭৪ পাটনা) অসুস্থ অবস্থাতেও পোঃ কার্ডের উপর যে চমৎকার রেখাঙ্কন করেছ আমাকে বিজয়ার অভিবাদন জানাতে তা আমার খুব ভাল লেগেছে। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছ আশা করি। **জিতেন্দ্রনাথ প্রামানিক** (১৯৯৯ যশোহর) প্রথম বলে তোমার ভাই বোনদের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানাচ্ছি। লেখা-বিচারের ভার তো আমার নয় ভাই, তাই কোনও মতামত জানাতে পারি না। **শ্রীনাথ রাউথ** (১৪৪৭ ঢাকা) সবগুলি রংমশাল (১৯৪৯ না ১৩৪৯ ?) পাবে যদি ঠিকমত সালটা জানাও, প্রত্যেক সংখ্যার দাম ।৵০ আর ১৩৫০ সালের বৈশাখের দাম পাঁচ আনা। যদি দরকার থাকে পরিচালক মশাইকে জানিও। **বিনীতা ঘোষ** (১৪৮৯ কলিকাতা) হ্যাঁ আলাদা কাগজে ধাঁধাঁ পাঠালে আমাদের অনেক অসুবিধা দূর হয়। সব লোকের দুঃখ এক সঙ্গে দূর করা সম্ভব না হলেও একজনের দুঃখ দূর করা অন্ততঃ একবেলার জন্যও সম্ভব। সেটুকু তুমি কি করতে পার ? **বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য** (১৩০৯ মোগলসরাই) তোমার দীর্ঘ চিঠি পেলাম এবং পড়লামও মন দিয়ে। লেখাটা যথাস্থানে দিয়েছি। রংমশালে বিশেষ সংখ্যাগুলো ও বৈশাখের রংমশালে বিমল বসুর লেখা তোমায় যে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে তা জেনে ভালো লাগলো। অপূর্ব্বলাল মজুমদারকে তোমার ঠিকানা শীগ্‌গীরই জানিয়ে দিচ্ছি। নিরন্ন বাংলার জন্য যে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছ তা জেনে বড় ভাল লাগলো। তাই তো বলছিলুম তোমরা ছোট হলেও তোমাদের কাজ ছোট নয় তাতো দেখতেই পাচ্ছি। **রণজিৎ বিশ্বাস ও দুলাল সেনগুপ্ত** (১৯২৫ চট্টগ্রাম) তোমাদের কিশোরগড়া প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে যে সেবাকাজ করবার চেষ্টা করছ তা প্রত্যেকের অনুকরণীয়। আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম। **রেখা বসু** (১৩৩৬ শান্তিনিকেতন) শান্তিনিকেতনকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসাবে ধরতে পারি। ওখানকার আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ ঘটাতে পারো তাহলে সব দিক থেকে সুন্দর হবে। ধাঁধাঁ আলাদা কাগজে লিখে পাঠিও। অপূর্ব্ব মজুমদার, বয়েজ লাইব্রেরী (জলপাইগুড়ি) শারদীয় উপহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রীতি শুভেচ্ছা জানালাম। এই পর্য্যন্ত তোমাদের গতবারের চিঠির উত্তর। গতবারে যারা রাগে গাল ফুলিয়েছিলে তারা আশা করি রাগ থামাবে। কিন্তু এবারের চিঠি ভাই ঝুলি শুদ্ধু তোলা রইল। গতবারের একটা চিঠি তোমাদের উপহার দিচ্ছি।

'কি দেখলুম দিদিভাই?' মানুষের প্রয়োজন বেড়ে গেছে হাজার গুণ, যত পাচ্ছে ততই চাইছে। যাদের আছে তারা দু'হাতে আরো লুটছে আর শুধু নিজের জন্যে, আত্মসুখের জন্যে অতি-সঞ্চয়ের সে কী ব্যর্থ প্রয়াস! তুমি বাঁচো না বাঁচো কারো কিছু আসে যায় না—আমি বাঁচলেই হলো—এই ধরণের একটা কুশ্রী মনোবৃত্তি সারা জাতিটাকে যেন পেয়ে বসেছে। প্রাচুর্য্যের পেয়ালা বেয়ে যেটুকু পড়ে যাচ্ছে সেটুকু নীলাতেই গড়াচ্ছে—সবার নীচে সবার পিছে যারা তাদের মুখের কাছে পৌছবার আগেই প্রাণটুকু তাদের বেরিয়ে যাচ্ছে। কি ছবি দিদিভাই ? আজ আমরা গভর্ণমেণ্টকে তত দোষারোপ করতে পারি না—দেশবাসীর লিপ্সাই জাতিকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে। ভগবান্ শ্রীঅরবিন্দ কোথায় যেন বলেছেন যতদিন মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হবে না ততদিন পিলসুজের নিচে আলো আর পৌছবে না শুধু তেলটুকুই গড়াবে।

—**সাধনা ও রেণুকা বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম)

আজ এই পর্য্যন্ত—স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো তোমরা। ইতি,

দিদিভাই

গুরুতম মস্যা !

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু (গ্রাঃ নং ১৭৭৪)

হরিবাবুর শ্রাদ্ধ হ'বে পাড়ায় খবর রটে,
অনাহুত, রবাহুত, আহুতেরা জোটে।
কয়র্যাখালির ময়রা এল, ছইপুকুরের দই
পেটাইগড়ের মেঠাই এল, দিষ্টিপুরের খই।
গোলকুণ্ডার মণ্ডা এল, দানাপুরের ছানা
বীরপুকুরের ক্ষীরও এল, ডিহির মিহিদানা।
যোগাড় হ'ল সকল কিছু,—শ্রাদ্ধ হ'ল বেশ,
বামুন, অতিথ্ খেল মেলাই, খেল সারা দেশ।

একটা শুধু মজার ব্যাপার ঘটেছিল জানি,—
বক্রপুরের এসেছিল হরেন চক্রপানি,
খেয়ে দেয়ে, ঢেঁকুর তুলে বলেছিল মোরে,
'ভীষণ-খাওয়া এমন আমি খাইনি জীবন ভ'রে,—
গয়লাগুলো পয়লা মোরে দিয়েছিল দই—
মিষ্টি বেজায়,—তার চেয়ে ঐ দিষ্টিপুরের খই।
দানাপুরের ছানার মেঠাই,—ডিহির মিহিদানা,
এমন ভাল, এমন খেতে—ছিলনা, তা জানা।

কিন্তু বাপু, মনে আমার খট্‌কা শুধু আছে,
সে কথাটা বলিনিকো, লাজে কারও কাছে।
হরিবাবুর ভাইপো নগেন—ভালো তারে জানি
দাদা তাহার রমেশবাবু,—চোখে যাহার ছানি।
কেষ্টাটারে চেষ্টা ক'রে পেয়েছিলাম দেখা,
পিসিমা ত বল্লে কত—ডেকে আমায় একা,
কিন্তু একটা মজার ব্যাপার,—হরিবাবুর দেখা,
অনেক করেও পেলাম নাকো, তাইতে ভ্যাবাচ্যাকা !
হরিবাবুর ছেলে মেয়ে ঘুরছে হেথা হোথা
শ্রাদ্ধে যাহার খেতে এলাম—তিনি গেলেন কোথা ?'

নূতনা ধাঁধা

নীচের জোড়া নম্বরগুলির পরিবর্ত্তে এমন এমন জোড়া কথা বসাতে হবে যে সেই কথাগুলি ভিন্ন হবে কিন্তু অক্ষরগুলির ঠিক থাকবে, শুধু অদল বদল হবে মাত্র। যেমন (১) (১) নম্বরে যে দুটি কথা বসবে—তার একটি কথার অক্ষরগুলির অপর কথার অক্ষরগুলি একই থাকবে শুধু তাদের অদল বদল হবে। যেমন কদর, করদ। (২) (২), (৩) (৩) ও (৪) (৪) এদের বেলাতেও তাই। সবশুদ্ধ ৮টা কথা বসবে, প্রতি জোড়ার কথাগুলি ভিন্ন হবে বটে কিন্তু তাদের অক্ষরগুলি একই থাকবে। অক্ষরগুলির কেবল অদল বদল হবে।—

বাড়ীর কর্ত্তা চাকর নিতাইকে বললেন, "তুই একটা (১) (১) করা সত্ত্বেও (২) করা সেই ফুটো (২) নিয়ে এলি! এখন্ জল রাখবি কোথায়? আর তুই নির্জীব না (৩)—(৩) নিয়ে আসতে বললাম, আন্‌লি এক ঝুড়ি (৪), (৪) পেয়েছিস না?

* কার্ত্তিকের ধাঁধার উত্তর *

(১) শেষ চারটি সংখ্যা—৬৮২৩

(২) আগে স্থির হয়ে থাকার চেয়ে ভেড়ার ছুটে যাওয়ার দরুণ একটা জোর পড়েছে ও সেই অনুপাতে গাড়ীটার জোর আগের চেয়ে কম। কাজেই গাড়ীর গতি ভেড়ার ছুটে যাওয়ার দরুণ কিছু অন্ততঃ কমবে।

দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে এবার ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম ছাপা সম্ভব হ'ল না।

পিটার প্যানের গল্প আবার আগামী মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

কার্ত্তিকের রংমশালে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় 'অজানা সাহিত্য পরিষদ' (১০।১ এলগিন রোড) যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, সে সম্বন্ধে গল্প পাঠাবার তারিখ ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত করা হল।

"ঢাকেশ্বরী"র বস্ত্র দাবী করুন

কেবল বাংলার বা বাঙ্গালীর বলেই নয়, ঢাকেশ্বরী বস্ত্র সুদৃশ্য, সুস্পৃশ্য ও সুলভ বলেও। "ঢাকেশ্বরী"র বস্ত্র ক্রয় করার অর্থ ঢাকেশ্বরীর আট হাজার বাঙ্গালী শ্রমিক ও ২২ হাজার অংশীদারকে সমর্থন করা

• দি ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিঃ •

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

ফোন নং ৯ ও ২০৭ প্রধান অফিস ঃ ৫, সিম্পসন রোড, ঢাকা। টেলিগ্রাফ ঃ "কটন"

কারখানা ঃ

১নং মিল ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ। ২নং মিল—গডেনাইল, নারায়ণগঞ্জ

হ্যাভিল্যাণ্ড ফেস পাউডার

ইহার পরাগনিন্দিত সূক্ষ্মতা ও মাতোয়ারা গন্ধে আপনারা ব্যবহার করিয়া সুখী হইবেন। শুধু সামান্য একটু পাফে করিয়া লাগাইয়া দেখুন আপনার বর্ণে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে।

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত ও নানাবিধ রঙে যথা ন্যাচারালে, র‍্যাচেল নং ১ ও ২ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

একমাত্র পরিবেশক

ও, সি, ওয়ার্কস ঃ ঃ পোঃ বক্স ১০৮০৩

বঙ্গশাল

অষ্টম বর্ষ (৯) পৌষ ১৩৫০

না বি ক

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

মহা সাগরিক্ আমরা নাবিক ঃ
বন্দর-মায়া নাঁই—
অসীম পাথার সেচি বারেবার ঃ
নভ-নীলের সুধা চাই।
তাই ত' আঙনে বাঁধিনি যতনে
ঘর-ধু-করা প্রান্তর ;
হেলায়-ফেলায় বালুকা-বেলায়
গড়িনিক' খেলা ঘর।
তারকা দূরের ডাকিছে মোদের,
কাঁদন শুনেছি তার—
তাই নিশিদিন বিরাম বিহীন
ছুটে চলি হুঁশিয়ার।

তুফানের নীল কাঁপে ঝিলিমিল,
নাচে উত্তাল জল ঃ
উভ উপকূল অধীর আকুল
কাঁদে আঁখি-ছলোছল।
তবু পারাবার ভাঙি চুরমার
চ'লেছি বায়ুর আগে—
নয়নেতে কোন্ দারুচিনিবন-
দ্বীপের সুষমা জাগে।
শুধু অকূলের, অচিনপুরের
তীরে তীরে ছোটে প্রাণ ঃ
ঝড়ে, জোছ'নায় মোরা নির্ভয়
সাগরের সন্তান।

কঞ্জুষের পালা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(লণ্ঠন হাতে খাতাঞ্চি ও রাধাকান্ত)

খাতাঞ্চি। ওহে রাধাকান্ত, তোমাদের পাড়াটা সুন্‌ সান্‌ ঠেকছে যে!

রাধাকান্ত। আজ্ঞে সবাই যাত্রা দেখতে ছুটেছে।

খাতাঞ্চি। রোসো একটু জিরিয়ে নিই, কোমরটা দরদ করছে।

রাধাকান্ত। বসেন এই দাওয়ার পরে'।

খাতাঞ্চি। আঃ, এ বাড়িখানা কার হে—

দেখা যায় অট্টালিকা মহাকায়
পার্শ্ব পড়িতেছে ভাঙি—

রাধাকান্ত। কঞ্জুষ বাড়ি এটা।

খাতাঞ্চি— লোকালয় বলি চেনা যায় কোন মতে,
যেথাসেথা ভাঙা ঘর দালান্‌ নয়ন মন ব্যথে।
এ পাড়াটা যেন কেমন কেমন—
আঁধারিয়া আছয়ে বন বাদাড়,
আবুড়া খাবুড়া ভূমি, পগারে উগারে বাঁশ ঝাড়।
নানা খানা খন্দ, পথ করে বন্ধ,
দেখিলেই মনে হয় দেশটি উজাড়।
রাত বিরেতে চলতে ভয় লাগে।

রাধাকান্ত। এটা হানাবাড়ি, এখানে বেশীক্ষণ বসা কিছু নয়।

খাতাঞ্চি। ওটা কি দপ্‌ করে জ্বললো আর নিভলো।

রাধাকান্ত। ও কিছু নয়। চলেন, আর নয়। বোধহয় পুকুর ঘাটে কেউ যাচ্ছেন আলো নিয়ে।

খাতাঞ্চি। না হে, গাছের তলায় তলায় আলোটা ঘুরছে, যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রাধাকান্ত। ও আর দেখে কাজ নেই; প্রায়ই অমন ঘটে—কঞ্জুষ বাড়ির একটা বদনাম আছে কিনা!

খাতাঞ্চি। কিরকম ব্যাপার বল তো শুনি। বাড়ি আমার নেবার ইচ্ছে আছে হে রাধাকান্ত।

রাধাকান্ত। শুনুন তবে বলি এই বাড়ির পুরাকালের কাহিনী—যাদের এই বাড়ি তাদেরই—

এক কঞ্জুষের বেশ কিছু ছিল,
ঘর ছিল, দোর ছিল, জমী জমা সব ছিল,

আর ছিল একটি ভাবনা,
চোর ডাকাতে পাছে দেয় হানা—
লুট করে ঘুন-ধরা কড়ি,
খাটিয়ার দড়ি,
পাঁচিলের আমা ইট,
বালিসের সস্তা ছিট,
ব্যজনটা তাল পাতার,
বাসন কটা ফাটা কাঁসার,
ভাঙা ঘটি, ছাতি লাঠি, ছেঁড়া চটি ঠন্‌ঠনের,
আধপলা তেল পিতুমের, চাবি শিকলি সিন্ধুকের,
সাত-কেলে তৈজস পত্র আরো ঢের—

খাতাঞ্চি। তারপর, তারপর—

রাধাকান্ত। তারপর— অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া
মালামাল সর্ব্বস্ব বেচিয়া গিনি করিয়া
মুখবন্ধ লোটার মধ্যে ধরিয়া
নিভৃত স্থানে মাটিতে গাড়িয়া
ফেরে পাহারা দিয়া
আশে পাশে গুপ্তধনের মাঞ্জাসের

খাতাঞ্চি। বাড়িটা যকের বাড়ি বল। তারপর—বলে চল।

রাধাকান্ত—এইরূপ প্রতিদিন করাতে উহার ভৃত্যের মনে সন্দেহ জন্মিল
একদিন সুযোগ পাইয়া
সোনার তাল লইয়া
তাহার স্থানে ঢেলা রাখিয়া হইল অদর্শন।
কঞ্জুষ বুক চাপড়ি করিতে থাকিল কেবলি ক্রন্দন।

খাতাঞ্চি। কথামালার গল্পের মতো শোনাচ্ছে যে—

রাধাকান্ত। কঞ্জুষ বাড়ির গল্প শুনে বিদ্যেসাগর মশায় কথামালা লেখার সময়ে দেখতে এসেছিলেন বাড়িটা—পাড়ার সবাই জানে, কান্না পর্য্যন্ত শুনে গেছেন তিনি। চলেন, আর না, স্থান ভালো নয়।

(নেপথ্যে)

—চোর চোর—ওরে আমার কি হল রে—ওঃ ওঃ!

রাধাকান্ত। ঐ শোনেন, উঠে পড়েন, আর নয়, বিশ্বাস হল তো?

খাতাঞ্চি। ও কি ও, বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো, রোসো রোসো, ধর আমায়, ভাল করে শুনি!

রাধাকান্ত। আর শোনেনা, পালিয়ে আসুন, ব্রহ্মদত্যি বেরিয়েছে।

(নেপথ্যে)

—ও আমার সোনার গীতা, আমার বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, সোনার চাঁপা রে! সোনা কালি খাঁচার ময়না পালিয়েছে রে পালিয়েছে। যমরাজ তুমি কোথায়—যমরাজ, তুমি কোথায়? ও পুলিস, ও কন্‌স্টবল, ও তোতলা, চোর চোর ধর ধর!

রাধাকান্ত। চলে আসুন কি দেখছেন। [দ্রুত প্রস্থান

—কঞ্জুষের প্রবেশ—

কঞ্জুষ। চৌকিদার, চৌকিদার, আর চৌকিদার! হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ, এ কি করলে!

(গীত)

পেটে না-খেয়ে গেঁজে ভরলাম
শেষকালে তা-ও গেল,
এর চেয়ে কিছু না থাকাই ছিল যে ভাল।

—ভিখারীর প্রবেশ—

ভিখারী। দীয়তাং ভুজ্যতাং!

কঞ্জুষ। আর দীয়তাং ভূজ্যতাং।

ভিখারী। ভর দরিদ্রান পাল দরিদ্রান পাল—

কঞ্জুষ। হয়ে গেছে চক্ষুদান। প্রাণ গেল প্রাণ গেল!

ভিখারী— থেকেও ছিলনা টাকার কাঁড়ি,
তার জন্যে কেন আছাড়ি পিছাড়ি—
ভাবো না মাটিতেই রাখিয়াছ গাড়ি।
এখন ভিখারীর সাথে এস পা চালি।

কঞ্জুষ। ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, শেষ সবই গেল।

—সাধু ও তোতলার প্রবেশ—

টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে কোনো জ্বালা,
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘী ঢালা।

ভোজবাজী

মেজর **শ্রীবিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য** আই. এ. এম. সি.

সুরু হয়েছিল সামান্য থেকে। ডাঃ গুপ্তর মেয়ের বিয়ে পাটনা কলেজের প্রফেসর রায়ের ভাইপোর সঙ্গে। ডাঃ গুপ্তর বাড়ীতে বিয়ের রাত্তিরে পাটনা আর মেডিকেল কলেজের ছেলের দল ভূরিভোজন করে হোষ্টেলে ফিরছিল। খাইয়ে বটে মেডিকেলের বনতোষ আর পাটনা কলেজের নবেন্দু! বনতোষের একহারা চেহারা, মাথায় টাক, পাগলাটে গোছের ভাবভঙ্গী, কিন্তু পাতের ওপর থেকে লুচির গাদা, মাছ-মাংসের পাহাড়, আর শ'খানেক রসগোল্লা নির্বিকার চিত্তে শেষ করতে দেখে অবধি তার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। নবেন্দুর অবিশ্যি চেহারা কালো, মোটা, বিশালাকার—চোখে হর্নরিম চশমা, গলদঘর্ম হয়ে মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চশমা মোছে আর নিন্তের পর দিন্তে লুচি সাবাড় করে।

দু' কলেজের ছোকরারা তাদের খাবার বহর তুলনা করে তর্ক জুড়ে দিলে রাস্তাতেই। হাতাহাতি হবার যো—একদল বলে নবেন্দুর কাছেও ঘেঁষতে পারবে না বনতোষ—আর একদল বলে আমাদের কলেজের খাইয়ে বনতোষের কাছে মোটা নবেন্দু একটা ছারপোকা আর কি! শেষকালে ঠিক হ'ল একটা খাবার ম্যাচ করে সাব্যস্ত করতে হবে কোন কলেজে বড় খাইয়ে আছে—মেডিকেল না পাটনা।

পরের দিনই দু' কলেজের মুরুব্বি ছোকরারা দেখা-সাক্ষাৎ করে ঠিক করল, আসছে শনিবার পিণ্ট রোডের সন্ধ্যে সাতটার সময় খাবার ম্যাচ হবে। দু'দল থেকে খাইয়ে দু'জন ছাড়া দশ জন করে দর্শক ছাত্র থাকবে একজন করে পাত পরিদর্শক থাকবে—আর বিচারক হবে সায়েন্স কলেজের চন্দর মিত্তির প্রফেসর। পিণ্ট রোড কর্ত্তা খাবার সমান দু'ভাগ করে দেবে—পাঁচ প্রস্থ খাবার থাকবে। যে দল জিতবে তারা পাবে পিণ্ট রোডের কাছ থেকে ১০০৲ টাকা হোষ্টেলে ফিষ্ট করবার জন্যে—তা' ছাড়া হারিয়ে দলকে সমস্ত খাবারের দাম দিতে হবে। যথাসময়ে শনিবার হাজির হ'ল। আমরা মেডিকেলের দল, বনতোষের জয় যে নিশ্চয়ই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিনি। খাওয়ায় তাকে কেউ হারাতে পারে এমন ত' কল্পনাই করতে পারি না।

দুপুরে বনতোষের ঘরে গিয়ে দেখি কম্বল মুড়ি দিয়ে বনতোষ হি হি করে কাঁপছে! সর্বনাশ—ব্যাপার কি! দু' দিন দশ আগে মেদিনীপুরে বাড়ীতে গিয়েছিল—তখন সামান্য ম্যালেরিয়া হয়েছিল, আজ পূর্ণ প্রকোপে জ্বর এসেছে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? সেত' জ্বরে ভুগচ্ছে, সন্ধ্যের ম্যাচে খাবে কে? ভরসা দিল বনতোষ নিজেই বল্‌লে, "আমি ত' ভাই আজ ম্যাচ খেল্‌তে পারব না—তবে তোমরা হারিৎকে নিয়ে যাও। সে আমার হয়ে—যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।"

হারিতের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। খাইয়ে বলে তারও নাম আছে—তবে বনতোষের তুলনায় কিছুই নয়। মেসের বাবাজীদের সে চটেমটে মাঝে মাঝে কাঁদায় ডজন ছয়েক রুটি আর হাঁড়ি দুই ডাল খেয়ে—তার ঐ পর্য্যন্তই। তারপর মিষ্টি পর্য্যন্ত সে এগোতে পারে না। এই নাবালককে নিয়ে শেষে আমাদের ম্যাচ খেলতে হবে। লম্বা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি চেহারা তার—হয়ত' মানসিক ভয় হবে নবেন্দু আর তার পাটনা কলেজের বন্ধুর

দলের—এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়ে আমরা হারিতের ঘরে গিয়ে তাকে পাকড়াও করলাম। সে নিমরাজী হল—বল্লে, "আগে ত' জানতুম না—দুপুরে বাবাজী কাঁদিয়েছি।"

সন্ধ্যে সাতটার সময় আমরা ত' পিণ্টুতে হাজির হলাম। বনতোষ গ্রেণ কুড়ি কুইনিন খেয়ে সঙ্গে এসেছে—পাত পরিদর্শকের কাজ করতে রাজী হয়ে। পাটনা কলেজের দল নবেন্দুকে পুরোভাগে করে হাজির—বিচারক চন্দর মিত্তিরও আছেন।

টস্ হ'ল—নবেন্দু জিতল। প্রথম খাবার হুকুম দেবে সে। হাঁকল, ২০০ করে লুচি। দ্বিতীয় হুকুম দেবে হারিৎ—সে বল্লে ৫ সের মাছের আর ৫ সের মাংসের তরকারী। পিণ্টুর খোদ কর্ত্তা নিক্তি ওজনে সমান ভাগ করে ২০০ লুচি আর ১০ সের তরকারী আলাদা আলাদা করে ধরে গেল। নবেন্দু আর হারিৎ নির্বাক হয়ে ম্যাচ খেতে সুরু করলে। যুদ্ধের strategy হারিতের মন্দ নয়। মিষ্টি ত' বেশী খেতে পারে না—তাই লুচি তরকারীতে জিতবার চেষ্টা করছে—তবে নবেন্দুকে কাবু করা শক্ত।

আধঘণ্টা পরে নিঃশ্বেস করে খাবার শেষ করল। জল কেউ ছোঁবে না—খানিকটা বাজে মালে পেট ভরিয়ে কি হবে? তিন নম্বর হাঁকলে নবেন্দু—২ সের চাট্‌নি। চাট্‌নি শেষ হ'ল। এবার হারিতের পালা—হাঁকল, ১০ সের দই। নবেন্দু কটমট করে চেয়ে উঠল। দই সে বড় একটা খেতে পারে না। মিষ্টি অবশ্য যে ইচ্ছে দাও, শেষ করবে। কিন্তু ম্যাচের কানুনই হচ্ছে একজনের পর অপর একজন হুকুম দেবে।

যাই হোক, দই এলো। হারিৎ পরম আনন্দে দই আক্রমণ করলে। নবেন্দু কায়ক্লেশে দইটা শেষ করলে—হারিৎ সহজেই। এর পরে কি হয় শেষে—আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম।

নবেন্দু প্রতিশোধ নেবার জন্য হাঁকল, রাবড়ী দশ সের। দুটো প্রকাণ্ড হাঁড়ী ভর্ত্তি রাবড়ী আর তার সঙ্গে বড় দুটো চামচ এল। নবেন্দু এবার আগেই রাবড়ী আক্রমণ করলে। আমরা আশ্চর্য্য আর উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে আছি—হারিতের রাবড়ী ছোঁবার কোন লক্ষণ নেই। ওদিকে নবেন্দু প্রায় আধ হাঁড়ী শেষ করেছে কিন্তু তার রাউণ্ডে দই তার অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে—চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে—অল্প বমির ভাব হয়েছে—গাল দুটো ফুলে উঠেছে। হারিত করুণ কণ্ঠে ডাকল, "বনতোষদা"—বনতোষ কম্বল গায়ে এগিয়ে এল। হারিত তার কানে কানে কি বল্‌লে। অমনি পাটনা কলেজের ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠল, "ফাউল, ফাউল, ফাউল।" চন্দর মিত্তির গোলমাল থামিয়ে বললেন, "প্রথমে আমাকে শুনতে দাও হারিত বনতোষকে কি বলেছে—তারপর বিচার করব।"

বনতোষ বল্‌লে, "হারিত হতাশ হয়ে গেছে রাবড়ীর সামান্য পরিমাণ দেখে—আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, "বনতোষদা মোটে দশ সের রাবড়ী?" এ কথা শুনেই নবেন্দু প্রায় বমি করে ফেলে আর কি? চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল—বল্‌লে আমার দ্বারা আর চলবে না—হার মানছি—আমি চললাম।

হারিতের জয় জয়কার—নবেন্দু হার মেনেছে!!

দিন কতক পরে যখন জিতের টাকায় মেসে মস্ত ফিষ্ট হচ্ছিল, আমরা সবাই হারিতকে চেপে ধরলাম, "তুমি বনতোষকে সেদিন কানে কানে কি বলেছিলে?" সে বললে, "আমি বলেছিলাম, আর ত' পারছি না বনতোষদা, রাবড়ী একফোঁটাও মুখে দিতে পারব না।"

জয় বনতোষ—জয় গায়েও আমাদের ভোজবাজীতে জিতিয়ে দিলে!

কবিতা

ননীখুড়োর খেতাব প্রাপ্তি

শ্রীযামিনীমোহন কর

ননীখুড়ো বেঁটে বুড়ো মাথা জোড়া টাক।
হাত পা যে সরু সরু পেট জয় ঢাক॥
আট হাত কাপড়েতে অঙ্গ ঢাকা।
এক চোখ টেরা আর এক পা বাঁকা॥
ছেলে পুলে নেই তবু কৃপণের ধাড়ি।
এক বেলা তার বাড়ি চড়ে নাক হাঁড়ি॥
আঁধার হবার আগে খাওয়া দাওয়া করে।
শুয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গামছাটি পরে॥
ঘরে বাড়ি আলো জ্বালা দেখেনিক কেউ।
একটা কুকুর আছে করে ঘেউ ঘেউ॥
পর হতে একদিন ধরে এনে তারে।
মোতায়েন করে খুড়ো চোর ধরিবারে॥
সকাল বিকেল ছাতে কালোয়াতি গায়।
গান শুনে আশ পাশে টেকা প্রায় দায়॥
নিত্যই সকালে যায় করিতে বাজার।
কচু শাক চুনো পুঁটি বরাদ্দ খাবার॥
কেউ বলে নিশ্চয়ই বোমারু পিওর।
জাল নোট তৈয়ারি করিছে শিওর॥
খুনী বা ফেরারী ডাকু জাপানের স্পাই।
পাগল মাতাল কিছু কোন ভুল নাই॥
চোরের নজর আছে চুরি করিবারে।
পুলিশ পাহারা দেয় ফাঁকি ধরিবারে॥
বিখ্যাত ডাকাত-রাজ রামলাল বর্ম্মা।
গোয়েন্দার শিরোমণি হারাধন শর্ম্মা॥

দুজনেই দাঁও খোঁজে করি কুপোকাৎ।
খুড়োর কেমনে কবে হবে বাজীমাৎ॥
বিধির বিপাক কিবা একই দিন রাত্রি।
শর্ম্মা ও বর্ম্মা হইলেন যাত্রী॥
খুড়োর বাড়ীর দিকে অতীব গোপনে।
যা হবার হবে আজ ভাবি মনে মনে॥
শর্ম্মা পুলিশ লোক 'ল' তার ফেভারে।
সোজা চলে গেল তাই সদর দুয়ারে॥
সিঁদ কাটি দেয়ালেতে ঢুকিল যে চোর।
মনে ভাবে কপালেতে কিবা আছে মোর॥
আঁধারেতে দুজনেই গুটি গুটি পায়।
গানের আওয়াজ ঘরে কি বিপদ হায়॥
তবে কি জাগিয়া খুড়ো সকলি ফাঁসিল।
তীরেতে আসিয়া তরী বুঝিবা ডুবিল॥
যা থাকে বরাতে আর যা করেন কালী।
এতখানি এসে কিবা ভেবে হবে খালি॥
উভয়ই এক লাফে ঢুকিল ঘরেতে।
কলিশন হয়ে গেল পুলিশে চোরেতে॥
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খুড়ো গাইছিল গান।
হুড়োহুড়ি শুনে তার থেমে গেল তান॥
ধড়মড় করে খুড়ো উঠিয়া বসিল।
'কে রে তুই' উভয়ের কাণেতে পশিল॥
পুলিশ ধরেছে চোরে চোর পুলিশেরে।
কেহ নাহি যেতে দিতে চায় অপরেরে॥

তাড়াতাড়ি ঘর হতে হইয়া বাহির।
শিকল তুলিয়া দিয়া করিল জাহির॥
"বাড়ীতে পড়েছে মোর ডাকাত ভীষণ।
দুইজনে বাধিয়াছে প্রলয়ের রণ॥"
ছোটো বড়ো ছেলে বুড়ো সকলে আসিল।
বাহির হইতে সবে কত না শাসিল॥
খবর পাইয়া এল দারোগা অভয়।
সকল শুনিয়া বলে "নাহি আর ভয়॥"
দরজা খুলিতে বার হইল দুজন।
চুল ছেঁড়া নাক ফোলা দেখিতে ভীষণ॥
খুড়োরে দারোগা কহে বিনয় করিয়া।
"দেখালে সাহস বটে ডাকাত ধরিয়া॥
যে সে লোক নহে এ যে রামলাল শর্ম্মা।
চুরি, খুন ডাকাতিতে ও করিৎকর্ম্মা॥
কত লোক ওর হাতে হারায়েছে প্রাণ।
সরকার এর তব দেবে প্রতিদান॥"
রোজ আশা করে খুড়ো আসিছে খেতাব।
বাহাদুর না হলেও হবে রায় সাব॥
"খেতাব খেতাব" বুলি আওড়ায় সদা।
অবশেষে "রায় সাব" আসিল একদা॥
আনন্দ জোয়ারে খুড়ো লভিলেন অঙ্কা।
বাড়ী খুঁজে দেখা গেল সকলই ফক্কা॥
নগদ কুকুর ছাড়া ঘরে কিছু নাই।
ঘোঁট জোট যত কিছু থেমে গেল তাই॥

কাহিনী

কাজ, মৃত্যু ও অসুখ

অধ্যাপক **শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়**

দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই গল্প বহু পুরাতন কাল হতে প্রচলিত আছে। তারা বলে, ঈশ্বর প্রথমে এমন ভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাদের কাজ করবার কোন প্রয়োজন না হয়। তাদের বাড়ীঘর, কাপড়চোপড়, খাবার জিনিষ, কোন কিছুরই দরকার হোত না। তারা সকলেই একশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচত। আর তারা 'অসুখ' কি তা জানত না।

কিছুকাল পর মানুষরা কেমন আছে খোঁজ নিতে এসে ঈশ্বর দেখলেন যে তারা জীবনে সুখী হতে ত পারেই নি, পরন্তু পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেছে এবং প্রত্যেকেই স্বার্থের বশে সংসারকে এমন করে তুলেছে যে জীবন উপভোগ করা ত দূরের কথা, তারা তাদের জীবনকে অভিসম্পাৎ করছে।

ভগবান্ নিজের মনে ভাবলেন, "তারা যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকে নিজের জন্য বেঁচে থাকে তার জন্যই এরকম হয়েছে।" এই অবস্থা বদলে দেবার জন্য ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করলেন যে পরিশ্রম না করে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। শীত আর ক্ষুধার তাড়না থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মানুষ বাসগৃহ তৈরী করতে, চাষ করে ফল এবং শস্য জন্মাতে এবং জমা করতে বাধ্য হোল।

ঈশ্বর ভাবলেন, "কাজই এদের সকলকে একত্র করবে। যন্ত্রপাতি তৈরী, কাঠ কাটা এবং চালান শেখা, বাড়ী তৈরী, বীজ বোনা, চাষের ফসল জমা করা, সুতা কাটা আর কাপড় বোনা সব কাজই কেউ কারুর সাহায্য না নিজে নিজে করে উঠতে পারবে না। কাজ তাদের বুঝিয়ে দেবে যে তারা যত বেশী আন্তরিকভাবে একত্র কাজ করবে তত বেশী জিনিষ তারা পাবে এবং তার ফলে তাদের জীবন বেশী সুখের হবে। কাজই সব মানুষকে এক করবে।"

অনেক দিন কেটে গেল। মানুষরা কেমন জীবন কাটাচ্ছে আর তারা এখন সুখী হয়েছে কি না দেখবার জন্য ঈশ্বর আবার এলেন।

তিনি দেখলেন মানুষ আগের চেয়েও মন্দভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তারা একসঙ্গে খাটছিল বটে (তা না করে তাদের অন্য উপায় ছিল না), কিন্তু সকলেই একসঙ্গে নয়। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটা দল আর একদলের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তারা অনেক সময় এবং শক্তির অপচয় ক্ষয় করে পরস্পরকে বাধা দিত। এর ফলে তাদের দিন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না।

এরকম অবস্থাও ভাল নয় বুঝে ভগবান্ এমন ব্যবস্থা করবেন ঠিক কর্লেন যাতে মানুষ তার মরবার কাল না জানতে পারে এবং যে কোন সময় মারা যেতে পারে। তিনি মানুষদের কাছে তার কল্পনা প্রকাশ করলেন। ভগবান্ ভাবলেন, তাদের প্রত্যেকেই যে কোন সময় মারা যেতে পারে, এই কথা জেনে তারা ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ঝগড়া-বিবাদ করে তাদের জীবনের সময় ও সুখ নষ্ট করবে না।

কিন্তু ফল দাঁড়াল অন্য রকম। মানুষরা কেমন আছে দেখার জন্য ভগবান্ আবার যখন ফিরে এলেন তিনি দেখলেন মানুষদের অবস্থা আগের মতই খারাপ আছে।

মানুষ যে কোন সময় মরে যেতে পারে এই সত্যের সুবিধা নিয়ে অন্য লোকদের চেয়ে শক্তিমান লোকেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদের জোর করে দমন করত। কাউকে কাউকে তারা মেরেও ফেলত আর অন্য অনেককে সব সময় মেরে ফেলবার ভয় দেখাত। তা ছাড়া ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে এই সব শক্তিমান লোকেরা এবং তাদের বংশধরেরা কোন কাজকর্ম্ম করত না এবং আলস্যের অবসাদে কষ্ট পেত। অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকেরা তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করত এবং বিশ্রামের অভাবে কষ্ট পেত। এই দুই দলের লোকেরা পরস্পরকে ঘৃণা এবং ঘৃণা করত। মানুষের জীবন এইভাবে আরও অসুখী হয়ে পড়ল।

এই সব দেখে অবস্থার উন্নতি করবার জন্য ভগবান্ শেষ উপায় অবলম্বন করতে মনস্থ হলেন। তিনি মানুষদের মধ্যে সকল রকমের অসুখ পাঠিয়ে নিলেন। ভগবান্ ভাবলেন, "সকল লোকেরই অসুখের সময় আছে এই কথা জানলে তাদের অসুখের সময় সুস্থ লোকেরা তাদের দয়া এবং সাহায্য করবে।"

ভগবান আবার চলে গেলেন। অসুখের কবলে পড়ে মানুষ কেমন আছে দেখার জন্য ভগবান যখন আবার এলেন তখন তিনি দেখলেন মানুষের জীবন আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। ভগবানের পরিকল্পনানুযায়ী অসুখের ভয়ের জন্য তাদের এক হওয়া উচিত ছিল সেই অসুখই তাদের মধ্যে আগের চেয়েও বেশী বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। যাদের অন্য লোকদের বেশী খাটিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিল তারা নিজেদের অসুখের সময় এই সব লোকদের তাদের সেবা করবার জন্য বাধ্য করত কিন্তু তারা নিজেরা অন্য অসুস্থ লোকদের কোন যত্ন করত না। আর যারা অসুস্থ লোকদের সেবায় বাধ্য থাকত তারা পরিশ্রমে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে নিজেদের পরিবারদের অসুখের সময় তাদের কোন যত্ন নিতে পারত না। যাতে অসুস্থ লোকদের দৃশ্য ধনী লোকদের

আমোদ আহ্লাদের অন্তরায় না হতে পারে তার জন্য বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। যে সব লোকদে সহানুভূতি তাদের মনে আশা এবং আনন্দ এনে দিতে পারত তাদের দৃষ্টির বহুদূরে এই সব বাড়ীতে দয়াহী এবং ঘৃণায় ভরা ভাড়াটিয়া শুশ্রূষাকারীদের মাঝে গরীব লোকেরা অসুখে ভুগত এবং মারাও যেত। উপর অনেক অসুখকে লোকে সংক্রামক ভাবতে লাগল এবং এই সব অসুখের ভয়ে শুধু যে অসুস্থ লোকদের এড়ি চলল তা নয়, নিজেদেরকে শুশ্রূষাকারী লোকদের কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে রাখল।

তখন ঈশ্বর ভাবলেন, "মানুষ যদি এতেও না বুঝতে পারে কিসে তাদের সুখ আছে তবে তা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তা শিখুক!" তিনি মানুষকে নিজের উপর ছেড়ে দিলেন।

ভগবান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মানুষরা অনেকদিন পর বুঝতে পারল তাদের সকলেরই সুখী হওয়ার জ চেষ্টা করা উচিত এবং হয়ত তারা সুখী হতেও পারে। অনেকদিন পর তাদের মধ্যে দুচার জন বুঝতে সু করেছে যে কাজ সকলেরই করা উচিত। সমাজে কেউ কেউ যে কাজকে ভয় করবে আর অন্য সকলে ভয়ের ম খাটবে তা হবে না। কাজের মধ্য দিয়ে সুখ এবং একতা আসবে। তারা আরও বুঝতে শিখেছে যে মৃত্যুর মুখোমু দাঁড়িয়ে তাদের উচিত জীবনের প্রতিটি বৎসর, মাস, ঘণ্টা এমন কি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একতা এবং ভালবাসায় কাট উচিত। তারা বুঝতে শিখেছে যে অসুখের জন্য মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে ভালবাসা আর ঐ আসা উচিত।

Tolstoyএর Work, Death and Sickness গল্পের অনুবাদ।

ভাইফোঁটা

শ্রীসত্যব্রত বসু

দিদি!

স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বালাও ঘরে জ্বলুক শিখা
চন্দনটীপ দাও কপালে বিজয় টিকা!
হৃদয় ভরে আশীষ করো পুণ্যময়ী;
কীর্তি যত হ'ক রচিত মরণ জয়ী।
আমাদের পথ মাঝে যত বাধা বন্ধন,
হয় যেন কর্ম্মের প্রেরণায় খণ্ডন।

—ভাই

ভাই!

হও তুমি মহীয়ান,
কর্ম্মেতে গরিয়ান;
মর্ত্তের ছেলে হয়ে মৃত্যুরে কর জয়,
মোর দে'য়া টিপ যেন বিজয়ের টিকা হয়।
যমুনার ছোট ভাই ন্যায় বীর "যম"রাজ,
দিদির সে টিপ পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী আজ।
চারি দিকে শোন ঐ বাদ্যের কলরব,
যাত্রা কর আজ ছোট ছোট ভাই সব
স্বদেশের বুকে আজ কর ধ্বজা উড্ডীন,
যাক কেটে দুর্য্যোগ যাক চলে দুর্দিন।

—রিপি

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

কবিশেখর কালিদাস রায়

ভক্ত কৃষ্ণদাস লিখেছেন— রাঢ়দেশ নাম একচক্রাগ্রাম হাড়াই পণ্ডিতঘর
শুভ মাঘ মাসি শুক্লা ত্রয়োদশী জনমিল হলধর।

নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে ১৪৭৩ সালে খৃষ্টাব্দে মাঘমাস শুক্ল ত্রয়োদশীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন ইনি বলরামের (হলধর) অবতার। ইনি ছিলেন অবধূত সন্ন্যাসী। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করলে ইনি এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'ন। নিত্যানন্দের সমাগমে বায়ুসংযোগে অগ্নির মত শ্রীচৈতন্যের প্রেমাগ্নিও দ্বিগুণিত তেজে জ্ব'লে উঠল।

নিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র জাত্যভিমান ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের পর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হলে বাংলার বহুলোক অস্পৃশ্য ও পতিত হয়ে সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পড়ে গিয়েছিল। নিত্যানন্দ তাঁদের হরিনামে দীক্ষা দেন এবং হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনেন।

বৈষ্ণব কবির নিত্যানন্দকে বলেছেন—পাতকীজনার বন্ধু, কাঙালের ঠাকুর, দীনবন্ধু, অগতির গতি প্রেমদাতা, অক্রোধ পরমানন্দ, পতিতপাবন। তিনি ছিলেন বিনয়ে তৃণাদপি সুনীচ।

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥

দিগ্বিজয়ী নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

অধম পাতকী অন্যে ঘৃণা করে যারে।
নিতাই যাচিয়া নিজে তারয়ে তাহারে।
প্রেমে ডগমগ পদ নাচে বারে বারে,
জাতি কুল নাহি মানে তারে যারে তারে॥

জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা কে না জানে?

মূঢ় পাষণ্ডী ছিল জগাই মাধাই দুহুঁ
কাঁধা ফেলি মারিল কপালে।
রুধিরে বহিল নদী দু'বাহু পশারি তবু
পঁহু দোঁহে করলহি কোলে॥

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রচারে প্রধান সহায় ছিলেন। পুরীধামে শ্রীচৈতন্য এক সময় চিন্তা ক'রে দেখলেন—সন্ন্যাসীর দ্বারা গৃহস্থগণের মধ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার সম্ভব নয়। তা ছাড়া সন্ন্যাসীর দ্বারা বৈষ্ণব সমাজ গঠনও সম্ভব নয়। অথচ যে সকল পতিত অস্পৃশ্য নরনারীকে তিনি উদ্ধার করলেন, তাদের জন্য একটা সমাজ

গঠনের প্রয়োজন। তখন শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকেই এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে তাঁকে গৃহী হ
জন্য আদেশ দিলেন। নিত্যানন্দের তখন প্রৌঢ়কাল উপস্থিত হয়েছে—তবু প্রভুর আদেশে সমাজগঠনে ও গৃহ
গণের মধ্যে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য দণ্ড ভেঙ্গে বাংলায় ফিরে এলেন। নিত্যানন্দ জাত্যভিমান ত্যাগ করে
জাতির সঙ্গে মাখামাখি করতেন—সেজন্য তাঁকে কেউ কন্যাদান করতে রাজী হলেন না। বাংলার বণিক সম্প্র
নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিল। সে সম্প্রদায়ের উদ্ধারণ দেও নামক একজন ধনীভক্তের অনুরোধে সূর্য্যদাস সর
নিত্যানন্দকে কন্যাদান করতে রাজী হলেন। সূর্য্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বি
হয়। নিত্যানন্দ বাংলা দেশে বৈষ্ণবসমাজ গঠন করেন এবং সহস্র সহস্র নরনারীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দান করে
তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র খড়দহে ২৫০০ বৌদ্ধ নেড়া নেড়ীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দান করেন। নিত্যানন্দ ৬২ বৎসর ব
অম্বিকা কালনায় দেহরক্ষা করেন।

বৃন্দাবনদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে নিতাই চাঁদের মোহন ভাবমূর্ত্তির একটা আভাস পাওয়া যাবে—

বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুইদিকে শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে।
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবর শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড,
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড।
অঙ্গ হেরি শুদ্ধবর্ণ দুটি আঁখি পদ্মপর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
হিমগিরি বাহি যেন সুরধুনী বাহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলকছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী
বীরদাপ মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি।
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম্মদোষে
না ভজিলাম নিতাইপদদ্বন্দ্বে॥

কবিতা

যুদ্ধের ফেরে

বেগম সালেমা খাতুন

যুদ্ধের ফেরে ধরণীর বুকে
ওলট্-পালট্ চলে,
কচু-ঘেঁচু-আলু-আমলকী আর
কোন্ ভেদ নাই বলে।
আলু বলে আমি হ'য়েছি প্রধান,
কচু বলে মোর দেখে যাও মান,
গন্‌দুম্‌ও আজ বাহু ঠুঁকে কয়
বেঁচে যাও মোরে পেলে ;
কচু-ঘেঁচু-আলু-আমলকী আর
কোন ভেদ নাই বলে॥

চিনি তো আজিকে চিনিতে পারি না,
গুড় মেলা হ'লো দায়,
চায়ের কাপেতে গোপনে যে-ঘুঘু
ডিম পেড়ে দিয়ে যায়।
চাল সে আজিকে ধরিয়াছে চা'ল,—
'বালি কাঁকরে কি হয় জঞ্জাল ?'—
ময়দা সে বলে মহাশয় আমি
কে মোর নাগাল পায় ?
কয়লাও বুঝি হয়েছে ভয়াল,
হীরের চাহিদা চায় !

লুচি কচুরী তো হ'য়েছে ক্বচিৎ,
কথা ছেড়ে দাও তার ;
চিপিটক্ আজ হ'লো চিৎপট
মেলা হ'য়ে গেল ভার !

মুড়ি বলে আমি মুড়ুলিতে ভোর,
মুড়কী সে বলে দেখ মোর জোর,
কেক্ কাট্‌লেট্ বুঝি কট্‌ক'টে,
নট্‌খটে পাওয়া আর !—
চিপিটক্ যদি হ'লো চিৎপট
মেলা হ'য়ে গেল ভার !

তেলের হাঁড়িতে পড়েছে বুঝিরে
নতুন তেজের ঝাঁঝ,
লংকা সে চ'লে গিয়াছে লংকা
বলে সোনা দাও আজ !
দারুচিনি বুঝি দারু পিয়ে বসে,
এলাচি দন্তে হাঁকে দাম ক'সে,
সুপারী খদির টিট্‌কারী দেয়—
সাজ্ দেখি পান সাজ্ ?
তেজপাতও হায় দেখায় সে ভাই
নতুন তেজের ঝাঁঝ !

কাপড় যেন রে বুনেছে ফাঁপর—
তোয়ালিয়া গাম্‌ছায় ;
রিষ্ট্‌ওয়াচের বাবু খদ্দরে
নতুন ষ্টাইল চায় !
সাহেবের দেখি সার্জ্ নেই আর
মেম্‌সাহেবের শুধু শাড়ী সার—
হাতকাটা পরে কহিছে মানুষ
বেশ ত' মানিয়ে যায় !

রিষ্ট্‌ওয়াচের বাবু খদ্দরে
নতুন ষ্টাইল্ পায়!
পয়সা যেনবা পেখম্ পরিয়া
বিদেশিনী হ'লো ভাই—
অবয়ব তার প্রকাশ করিতে
লজ্জার সীমা নাই!
ফকির ধ'রেছে নতুন ফিকির—
'আনি' দিতে হবে? হায় তক্‌দীর!
দোটানায় পড়ে দুই টানে বুঝি
প্রাণ করে আইঢাই!
পয়সা যেনরে পেখম পরিয়া
বিদেশিনী হলো ভাই!

ছাতুখোর হ'লো ছত্র ধরিয়া
ভীমবপু গদীয়ান্;
লোটা কম্বলে হেঁকে কয় খালি
কীয়া বাত্ ভগবান্!

গদীর উপরে কয় ভুঁড়িদার,—
আছ কি হে কেউ মোর জুড়িদার,
কাক সে আজিকে পেতে চায় বুঝি
কোকিলের কুহু তান,
ছাতুখোর হ'লো ছত্র ধরিয়া
ভীমবপু গদীয়ান্!!

কোথা বম্বার, বোমা কোথা আজ
কিছু নাহি জানি তার,
আলু-কচু-ঘেঁচু বোমা মেরে যায়,
উপায় কী হবে আর?
এ-আর্-পি-র ব্ল্যাক্‌আউট্ প্যাঁচে
ম্যাচ্ কাঠি আজ ফাঁকি পেলে বাঁচে
গোঁপ নেই যার, গোঁপ রেখে সেও
বলে আমি সোল্‌জার!
আলু-কচু-ঘেঁচু বোমা মেরে যায়
উপায় কী হবে তার?

বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের এই বইগুলি পড়ো।—

তরুণ তুর্কী—	১৸০
আজকের আমেরিকা—	২৷৷০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরণ বিজয়ী চীন—	৩৷৷০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	২৷৷০

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

সকল প্রকার বাড়ী তৈয়ারী বা মেরামতি এবং জল ড্রেনের কাজ সুবিধায় সুচারুরূপে করাতে হ'লে

১২ডি হেশাম রোড, কলিকাতায় কন্‌ট্রাক্টার

আর এম গোস্বামীকে ডেকে পাঠান

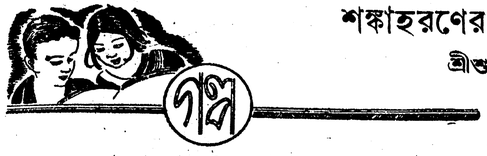

শঙ্কাহরণের সাহিত্যচর্চ্চা

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

একই ক্লাসে বার তিনেক সুবিধে করতে না পেরেই যে শঙ্কাহরণ সাহিত্যিক হয়েছে—এমন অপবাদ অন্য সকলে দিলেও আমি তা দিতে পারি না। বেচারী সত্যিই হরবোলাগোছের, সোণালি সৌখীন চুলের মত রাতদিনই উড়ছে যেন। বেঁটে নারকেলী কুলের মত সুষ্ঠু চেহারা, চোখে চশমা। বয়সে সে তোমাদের চেয়ে দু এক বছরের বড়ই হবে বোধহয়।

এ হেন শঙ্কাহরণ যে পরীক্ষায় ফেল করে সাহিত্যিক হয়েছে বৈরাগ্যের কোনো সূত্র ধরে, আমার তা মনে হয় না; মনে হবার কারণও নেই।

খুব ছোট বয়সে সে নাকি অদ্ভুত ছড়া মেলাতে পারতো। এখন শুধু সেটা পুষ্টতা লাভ করেছে, শঙ্কাহরণ এই কথা বলে। আর বলে—কত স্বপ্ন সঞ্চয় করেছি আমি, আশার কত রঙীন কল্পনা; কিন্তু বাড়ীতে বড় বাধা দিচ্ছে। লিখতে দেয় না মোটে, আর অন্য বই পড়তে দেখলে চাঁটায় মগজটুকু নষ্ট হয়ে যায়,—কার জোরে আর লিখবো তখন বলুন?

লিখতে বসেছে শঙ্কাহরণ। অঙ্কের খাতার ওপরই একটা গল্প লিখছে: একটি মোটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর পা তুলে বসলেন, হাতের কাছে সুইচ্ ছিল। তিনি তা টিপে দিলেন পাখা খুলে দেবেন বলে। এক মিনিট পরে—'আঃ শরীরটা জুড়োলো' বলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু ওপরদিকে চেয়ে দেখা গেল পাখা ঘুরছে না, আলো জলে উঠছে। আলো ও পাখার পাশাপাশি সুইচ্, তিনি সামান্য ভুল করেছেন, কিন্তু আঃ বলে আরামের নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এই গল্পটি ও ইনিয়ে বিনিয়ে বানাচ্ছে। ঘটনাটি আমারই বলা।

মেঝদা এলেন, গায়ক তিনি। নানাস্থানে ছাত্রছাত্রী আছে, তাদের কেউবা বাইরে গেছে, বেড়াতে, কারুর সাঙ্গীতিক চর্চ্চায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। কিন্তু ডাক বিভাগের মারফতে সংযোগ আছে সকলের সঙ্গে, এবং সেইটাই সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডী হয়ে দাঁড়িয়েছে শঙ্কাহরণের। তিনি বললেন—কি করছিস শঙ্ক—অঙ্ক? এখন থাক। এই দুখানা চিঠির কপি করে দে চট করে। আমি ততক্ষণ দুমুঠো খেয়ে নিই। বলে মেজদা অত্যন্ত কাছে সরে আসেন। ঘাবড়ে গিয়ে খাতা বন্ধ করে চিঠির নকল করতে বসে শঙ্কাহরণ।

দুপুরে স্কুলের বালাই নেই। তিন বছর এক শ্রেণীতে পড়ে থাকায় এবং ছোট বোন উমা উঁচু ক্লাশে উঠে যাওয়ায় শঙ্কাহরণের আর দশটার মধ্যে স্নানাহার সেরে ছুটতে হয় না স্কুলে হবু-কেরাণী হয়ে। শঙ্কাহরণের জীবনে এইটাই যা একমাত্র অনুকূল আশীর্ব্বাদ।

অফিস যাবার আগে বাবা মৃদু তাগাদা দিয়ে যান—বাইরে রোদে বেরোস নি শঙ্ক, ঘরে বসে লেখাপড়া করবি, পাঁচটা পর্য্যন্ত। বুঝলি? শঙ্কাহরণ মাথা নাড়লে যে সে বুঝেছে।

দুপুরে ঘরে খিল তুলে দিয়ে খাতা কলম নিয়ে রোজই বসে সে। সুস্থ হয়ে কিছুদূর চিন্তা করবার পর লিখতে সুরু করে। বুড়ী ঠাকুরমা আসেন—ও বাবা শঙ্ক, দরজাটা খুলে দে মাণিক, দরকার আছে একটু।

সর্ব্বনাশ! ঠাকুরমা এসেছেন, গীতা কিংবা রামায়ণের অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোনো তত্ত্ব এনেছেন পড়িয়ে নেবেন বলে। শঙ্কাহরণের চোখে জল আসার পরিবর্ত্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল। শঙ্কাহরণ সম্পূর্ণ নীরব এবং নিস্পৃহ হয়ে রইল।

পাশের ঘরে বসুমতী-পত্রিকা নিয়ে মা ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, ডাক দিলেন—শঙ্কু,—মার কথা বুঝি কানে যাচ্ছে না। উঠবো আমি?—ঢোক গিলে শঙ্কাহরণ খাতা ছেড়ে উঠলো—এই যে যাই মা, এই অঙ্কটা কষে নিলাম কিনা।

ঠাকুরমা ঘরে এলেন হাতে মধুকৈটভসার। আগাগোড়া দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। শঙ্কাহরণ ভীষণ শঙ্কিত হয়ে প্রমাদ গুণলে। এই অক্ষরের অপরিচয়েই তার ভাগ্যে বিড়ম্বনা এসেছে,—আজ আবার ঠাকুরমা—

ঠাকুরমা বল্লেন ভাঙাভাঙা গলায়—কাজ তোর সেরে নে, আমি এই বসে রইলাম। শিখেছিস বলেই তোর কাছে আসা; অংখার দেখাস নি অত,—মুখ্যু মানুষ আমরা।

বয়সের ভারে ঠাকুরমার নিদ্রা কমে গেছে। রাত্রে জ্বালাতন করবার উপায় না থাকায় এই সময় তিনি সকলকেই উদ্ব্যস্ত করতেন। তাই শঙ্কাহরণ বল্লে—দেরী হবে আমার অনেক, তার চেয়ে তোমার কাজটা আগে সেরে নিই ঠাকুর মা। কই, কি বই এনেছো দেখি। গোড়া থেকেই পড়বো ত'?

বহু চেষ্টা করেও একবর্ণ যখন বুঝতে পারা গেল না, তখন শঙ্কাহরণ উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ চালালে—ঠাকুমা, এ বড় গভীর তথ্য,—এ তুমি সহজে বুঝতে পারবে না।

তাইজন্যেই তোর কাছে এনেছি বাবা, নৈলে ত পুষ্পকে বলতে পারতাম। কিন্তু হাজার হোক মেয়ে। তোরা হলি ব্যাটাছেলে—তোদের বিদ্যের কি শেষ আছে র‍্যা—বলে ঠাকুরমা আর একটু নড়ে চড়ে বসলেন এবং শঙ্কহরণের দিকে কিঞ্চিৎ এগিয়ে এলেন।

শঙ্কাহরণ বয়ের দিকে চোখ রেখে বলতে সুরু করলে—বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন—বুঝলে কিনা ঠাকুমা, এ বড় সাংঘাতিক কথা।

—সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বলে যা তুই, নৈলে বুঝবো কেমন করে?—ঠাকুরমা উৎকর্ণ হয়েই বললেন এবং তিনি যে মূর্খ, এবারও তা স্বীকার করলেন এবং কারণ জানালেন তখনকার যুগে আজকালকার মত লেখাপড়া শেখবার রেওয়াজ ছিল না।

সাহিত্যিক শঙ্কাহরণ রীতিমত বৈদান্তিক টীকাকার হয়ে উঠেছে এবার। সে প্রবীণ পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে বলতে লাগলো—বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন, অর্থাৎ কিনা কদাচন নামে জনৈক দৈত্য বিদ্বন্মানক রাজাকে প্রহার করলে, তুলোধোনা করে একেবারে তঞ্চ নঞ্চ মানে তচ্‌নচ্‌ করে ছাড়লে তার রাজত্বটা! কী সর্ব্বনাশ বলত ঠাকুমা? তখনকার দানবদৈত্যগুলি সত্যিই বড় অত্যাচারী ছিল। এই যে এতবড় নিরীহ বিদ্বরাজ এমনি নিরাপদে তার রাজত্ব চালাচ্ছিলেন, কদাচন দৈত্যই সব মাটী করলে!

ঠাকুরমা বিদ্বরাজার দুঃখে চোখ রগড়াতে লাগলেন—যদি এই ছানিশীল চোখেও দু এক ফোঁটা সহানুভূতি বা সমবেদনা ঝরানো যায়। কিন্তু অশ্রু বড় বেরসিক—এখন তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তিনি হতাশ হয়ে বললেন—তারপর?

বিদ্বরাজার কাহিনী ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলো শঙ্কাহরণ। চাণক্যশ্লোকের পুঁজি ফুরিয়ে গেলে ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্র চালালে মাঝে মাঝে—সে কথাও আমাকে বলেছে। দস্তুর মত কেঁদে কেঁদেই বলেছে সে। তা

সাহিত্যচর্চ্চাটা বজায় রাখবার জন্যে তার ভণ্ডামি করাটা যেমন সত্য, তেমনি আমার কাছে তার সহজ এবং অকপট স্বীকারোক্তিটা ঠিক ততটা সত্য।

দুপুরটা কেটে যায় এম্নিভাবে।

বিকালে, জলখাবার খেয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে নিরাপদ একাকীত্ব উপভোগ করা শুধু অশোভন নয় এ বাড়ীতে, অসম্ভবও কিছুটা। কাকা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবেন—শঙ্কু, মারা পড়বি নাকি তুই? রাতদিনত' ঘরের মধ্যে বসে রয়েছিস—বাইরে একটু বেরো। চ বেড়িয়ে আনি কার্জ্জন পার্ক থেকে।

শঙ্কাহরণ যতটা গম্ভীর হতে পারে কাকার সামনে, ততটা গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই বলে—না, কাকা ভূগোল শেষ না করে আজ কিছুই করবো না ভাবছি। রোজ মনে করি—

কাকা ধমক দেন—তুই থাম শঙ্কু; ফেল আমরাও করেছি জীবনে, এক ক্লাসে তিনবার কেন চার পাঁচবার পর্য্যন্ত পড়েছি—তবুও এতটা চাড় দেখায়নি কোনোদিন। অত ধৈর্য্য সাধুতার লক্ষণ নয় কিন্তু।

কাকার শেষের কথায় শঙ্কাহরণ বিচলিত হয়ে পড়ে। অবশেষে কাকা জানতে পারল কি না কে জানে, সে তখন বাবার নাজির দেখায়। কাকা বলেন—দাদাকে বলবো আমি। যা জামা গায়ে দিয়ে আয়।

কাকার সঙ্গ শঙ্কাহরণের আদৌ প্রীতির বস্তু ছিল না; এবং তার একধিক কারণও ছিল। সবচেয়ে চরম দুর্গতির কথাটাই শঙ্কাহরণ জানিয়েছিল আমাকে। তা হচ্ছে এই: কাকার ডিসপেপসিয়া ছিল একদা, এবং চলনীস্থন কোনো ডাক্তার উপদেশ দেন যে সকাল সন্ধ্যা দস্তুর মত স্কিপিং করতে হবে। সকালে কাকার কোনোদিনই ঘুম ভাঙে না, তাই সর্কালটা বাঁচোয়া; এবং বিকাল হতে না হতেই তিনি সরু দড়ি পকেটে ঝুলিয়ে পার্কে ছুটতেন, ভাইপো ভাইবীদের সঙ্গে টানতেন। আর সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ শঙ্কাহরণকেই পোহাতে হতো। ফেল-করা ছেলে সে, কাজেই গৃহস্থের ব্যবহার হীন দ্রব্যের মতোই নিস্প্রোজনীয় হয়ে গেছে এবং শোভন অশোভন—সব রকমের নির্য্যাতন আছে, সবই শঙ্কাহরণ মুখ বুজে সহ্য করে যায়। সাহিত্যিকদের নাকি কলহপরায়ণ হলে চলে না, আর প্রথম জীবনের বিড়ম্বনা এবং ব্যর্থতাই নাকি সাফল্যের পথে এগিয়ে দেয়—এই দুটো কথা শঙ্কাহরণ বিশ্বাস করে বলেই সে সহ্য করে ওসব।

সন্ধ্যার পর লোক কমলে পার্কে শঙ্কাহরণকে কাকার সঙ্গে সরু দড়িটা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লাফাতে হয়। সে লাফায় আর ভাবে—এই লাফানোর চেয়ে দড়িটা গলায় লটকে কোনো গাছে ঝুলে পড়া অনেক সহজ তার পক্ষে। আসল জীবন হতে বঞ্চিত হওয়াও ত' একরকমের মরা। লাফাতে লাফাতেই শঙ্কাহরণের কেঁদে ফেলবার মতো মুখের অবস্থা হয়।

রাত্রে মা ও বাবার আলোচনা চলে: শঙ্কুর আর কিছু হল না। রাতদিন পড়ছেও ত' বাপু। একটা সিনেমা বাইরে যায় না, একটা ছেলের সঙ্গে মেশে না। আসলে, ওর মাথা নেই কোনো বিষয়ে। কাজে কর্ম্মে ঢুকিয়ে দিলে হয় এবার, কোনো কলে কারখানায়, হাতের কাজ শিখুক। কলম চালাতে ত' পারবে না।

শঙ্কাহরণের চোখে জল আসে। সারাদিন একটা মিনিটও সময় করে উঠতে পারেনি বেচারী, যাতে সেই সময়টুকুতে সে কলম চালাবার নিভৃত কারসাজী দেখাতে পারে! অথচ কলে কারখানায় তাকে ভর্ত্তি করে দেবার কথা চলছে! এ যদি হয়, তবে সে আত্মহত্যা করবে কিনা এখনো ভেবে উঠতে পারছে না, তবে অনশন সুরু করে সে দেবেই।

একমাত্র আমার কাছেই শঙ্কাহরণ বলেছে সব কথা। বেচারীর বেদনাতুর মুখের দিকে চেয়ে

কষ্ট বোধ করতাম। ওর বাড়ীর লোকেরা সত্যি বড় নিষ্ঠুর। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে সে খাতার পর খাতা পূর্ণ করে কবিতা লিখে যাচ্ছে—আর নিজে পড়ছে। অন্যকে পড়াবার সময় আর সুবিধা করে উঠতে পারতো না, বাড়ীর শাসনের জন্যেই পারতো না।

শঙ্কাহরণ অসম্ভব রকমের হাসাতে পারতো সবাইকে।—একদিন ওকে বললাম—বাড়ীতে এত বকছে তোমাকে, কবিতা লেখা কিছুদিন বন্ধ করে পড়াশুনোয় মন দিলে হয় না?

শঙ্কাহরণ তা পারবে না বলে জানালে—বকাটা ভালো, নৈলে একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবো।

সেদিন কি কথায় কথায় ধাপ্পা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই শঙ্কাহরণ বলেছিল—শুনুন, আমারই লেখা আবগারী দোকানের একটি কথোপকথন: একটি গাঁজাড়ে বল্লে—হজমীগুলি খেয়ে দ্বারিক ঘোষের এক দোকান খাবার সাবাড় করে দিয়েছি কিছুদিন আগে। উক্তদলের অন্য একজন বললে—আরে, হজমের কথা বললে যদি তবে সেই হজমী লেবুর কথা বলতেই হল। এ গল্প নয় দাদা, একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। একবার হজমী লেবু আনা হয়েছিল বাড়ীতে। ছুরি দিয়ে কাটছি এমন সময় কে যেন ডাকলে বাইরে। ছুরিটা লেবুর মধ্যে রেখেই গেলাম এবং এক মিনিট পরে কাজ সেরে ফিরে এসে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ছুরির ফলাটা নেই, হজম হয়ে গেছে।—তৃতীয় জনের নেশা বেশ গাঢ়ই হয়েছিল, সে হার স্বীকার করবে কেন? দ্বিতীয়জনকে সমর্থন করে সুরু করলে—শিলংএর লেবু ত? আমার জানা আছে ওর গুণ! দাদা নিমন্ত্রণ খেয়ে এলেন। এমন সেঁটে এলেন যে আর নড়তে পারেন না। স্রেফ দুফোঁটা ওই লেবুর রস খাইয়ে দিলুম, বেশী পেটে ধরবে কেন? গলা পর্য্যন্ত লুচি পোলোয়ায় টই টম্বর। মাত্র দুফোঁটা রস,—ব্যস। সকালে দাদার অবস্থা দেখতে গেলাম যে ঘরে তিনি শুয়েছিলেন, সেখানে। দাদা নেই, শুধু দাদার পাঞ্জাবী আর কাপড় পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। সর্ব্বনাশে চোখে জল এসে পড়ল। দাদা হজম হয়ে গেছে।

চমৎকার হাসতে পারে শঙ্কাহরণ। কথায় কথায় ও একদিন আমাকে বল্লে—অনেক কবিতা লিখেছি আমি, আপনাকে পড়িয়ে শোনাবো একদিন।

নানা কাজে সময় করে উঠতে পারিনি তখন। তারপর হঠাৎ বাইরে চলে গেলাম চাকরি পেয়ে। কাজেই তখন শঙ্কাহরণের কবিতা শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।

বছর তিন পরে ফিরে এসে শুনলাম শঙ্কাহরণ মারা গেছে যক্ষ্মা রোগে। মনটা বিষন্ন হয়ে উঠলো।

আরও শুনলাম তার পড়ার ঘরে মোটা মোটা কবিতার খাতা আবিষ্কার করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সব কবিতাগুলিই সে নিজের নামে খাতায় লিখে রেখেছে। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সে নাকি ওই সব বই আর মোটা মোটা খাতা কিনেছিল—আর ও থেকেই তার সাহিত্যচর্চ্চা চলতো! আর হাসির গল্পগুলোও ওর নিজস্ব নয়; এর ওর থেকে শুনে শুনে সে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করতো।

আমি বিস্মিত হলাম,—কিন্তু ছেলেটীর প্রতি শ্রদ্ধা আমার এতটুকু কমলো না। বড় কষ্ট বোধ করলাম তার জন্যে। শঙ্কাহরণ সাহিত্যিক কিনা জানি না, তার সাধনা কিন্তু মিথ্যে নয়।

পিটার প্যানের গল্প

রাখাল তালুকদার

তিন

অসম্ভবের দেশে।

গভীর এক বন। তার মাঝখানে বরফছাওয়া ছোট্ট একটি হ্রদ। আর তারি উঁচু পাড়ে ডেরা বেঁধেছে হারানো ছেলেরা। এ কিন্তু সেই দেশের খবর, যা কখখনো-সম্ভব হবে-না, মানে অসম্ভবের দেশের বিচিত্র খবরবার্ত্তা। তোমরা চোখে দেখতে যদি না পাও, আমার দোষ কী, বলো! এ তো ডাহা সত্যি নয়; স্বপ্নে-দেখা গল্প কী কখখনো সত্যি হয়? অদ্ভুত সেখানকার গাছগাছড়া ন্যাড়ামাথা, ধিঙ্গি খাড়া একটার ঘাড়ে আর একটা উঠে; লজ্জার মাথা খেয়ে যেন সব বনের ভিতর গাদা মেরে। কী গভীর বন—অসূর্য্যম্পশ্য; তার উপর আবার জন-মনিষ্যির দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আছে শুধু হারানো ছেলের দল আর জঙ্গলের জানোয়ার। নেকড়ের হামলা, বুনো পশুর দেঁতোল আক্রোশের দাপট—একেবারে যেন নরক গুলজার। এই সব উৎপাত নিয়ে তাদের হয় দিন গুজরান। সাহস আছে বলতে হবে হারানো ছেলেদের!

কী কারণে যেন জলদস্যুদেরও বেতরো আক্রমণ যখন-তখন হারানো ছেলেদের উপর। তারা তাদের পেছু লেগেই আছে। বাঁচোয়া শুধু রেড ইণ্ডিয়ানরা, যারা প্রকৃতভাবে হারানো ছেলেদের বন্ধু, গভীর বনে লুকিয়ে থেকে তারা তাদের আগলে বেড়ায়; বিপদ-আপদের নিশানা দেয় গুপ্‌টি মেরে বনের আবডালে: সামাল তোমরা। দুষমন সামনে—

অদ্ভুত দেখায় যখন হারানো ছেলেরা ভালুকের পোষাক পরে;—ঠিকই যেন ভালুকের সাজ, আর দেখায়ও তেম্‌নি। পিটার কেন ফিরে আসচে না,—এ'ভাবনা ভেবে তারা সব্বাই অস্থির। পল ঘণ্টা দিন ব'য়ে গেল, তবু পিটারের দেখা নেই: হারানো ছেলেরা পিটারকে হারাবার ভয়ে প্রমাদ গণলো মনে-মনে। তারা বসে বসে ভাবছিলো একজোট হয়ে; সেখানে এসে জুটলো পালের গোদা শ্লাইট্‌লি, আর টুটুল্‌স্ আর নিব্‌স্। তারপর এলো কারলি এবং আরও যমজ একজোড়া ভাইও এলো। তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যমজ জোড়াটিকে একই নামে ডাকা হ'তো, অর্থাৎ কি না তাদের আবার আদল ঠিকই, প্রভেদ মাত্রও ছিলো না। মাটির নিচে তাদের বাস ছিলো ইঁদুরের মতো। দস্যু ও নেকড়ের ভয়ে তারা অতিষ্ঠ,—মাটির নিচ থেকে বেরোবার সাহস ইস্তক তাদের উপে' যেতো। প্রকাণ্ড একটি গাছের খোঁড়লে তাদের বিভিন্ন বাসা ছিলো উপরতলা নিচতলার মতন—এক ঘর থেকে আর এক ঘর। অনায়াসে তারা গাছের শিকড় বেয়ে সুড়ৎ ক'রে দৃষ্টির বা'র হয়ে যেতো। কিন্তু এখন তারা খেলছিলো মজার এক খেলা, যদিও তাদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিলো না পিটারের জন্য।

শ্লাইট্‌লি বাঁশি বাজাচ্ছিলো নেচে নেচে তালে তালে, সঙ্গে তার ছিলো একটি উটপাখি। সঙ্গীটি কেমন বলো? আজগুবি কাণ্ডকারখানা। বেশিক্ষণ যায়নি, এরই মধ্যে হঠাৎ 'পালাও-পালাও' রব! জলদস্যুর তাড়া, প্রচণ্ড হৈ-চৈ আর বিকট আওয়াজ। নিব্‌স্ ছিলো যেন কিছুটা দুঃসাহসিক, আলগোছে সে সবাইকে সামলে নিলে। গাছের খোঁড়ল খপ্পরে তারা একে-একে সব্বাই অধিষ্ঠান হ'লো খামকা হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ ক'রে না উঠে। নিব্‌স্ বুদ্ধি খাটিয়ে সামলালে সব। ওম্নি এলো একখানা শ্লেজের গাড়ি ও তার সওয়ারি জল-দস্যুদের ক্যাপ্টেন। বনবাদাড় দলিয়ে মাড়িয়ে জল-দস্যুরা শ্লেজের গাড়িখানা টেনে নিয়ে চললো।

ক্যাপ্টেনটির কিন্তু আচ্ছা ভয়-পাইয়ে-দেবার চেহারা। তোমরা ভাবতেই পারবে না কী রকমের সাংঘাতিক সে-চেহারা বাপু। নাম তার জেম্‌স্ হুক—চেহারার উপযোগী-ই নাম বটে। একজোড়া শয়তানী চোখ মিটমিটে জ্বল্-জ্বল্; সারা মুখ তার চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে নেতানো। দুষ্টুবুদ্ধির রেখায় দাগ-কাটা চওড়া কপাল। চ্যাপ্টা থ্যাবড়া চোয়াল শজারুর কাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে পরিপূর্ণ। মাথার চুল আলম্ব—কালো, চোখ-মুখের উপর অসতর্কতায় ছড়ান কোঁকড়ানো চুলের দু'এক গোছা।—সে আবার গানও গাচ্ছিলো গলা ছেড়ে দিয়ে। একটি ত' হাত, তার ওপর আবার সেই কাটা হাতে জোড়া দেওয়া দুটো লোহার হুক। হুক নাম সে-কারণে! জল-দস্যুদের মধ্যে সে-ই হ'লো ডাকসাইটে পাকা বদমাস! মতলববাজী তার লেগেই আছে সারাক্ষণ নানান ফিকির ফন্দি এঁটে। এমন কি তার নিজের লোকজনও তাকে দেখে কম ডরাতো না; তারা নিজেরাও এক একজন কিন্তু কম যেতো না,—তবুও তারা ডরাতো। আশ্চর্য্যের কিছু নেই, এ' দেখে হারানো ছেলেরা খোঁড়ল-খপ্পরে পালিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করবে না ত', কী করবে!

পিটারের জন্য কিন্তু ক্যাপ্টেন হুকের হুঁসিয়ারি নজর; পিটারকে তার খোঁজাখুঁজির অন্ত নেই। এই ত' কয়েকদিন আগে হারানো ছেলেদের পক্ষ নিয়ে পিটার দস্যুদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তার ডান হাতখানা কেটে দিয়েছে। আর কেটে ফেলেই পিটার সে-হাতখানা কুমীরের মুখে তুলে দিলে। কুমীরটি লুফে নিলে সে-হাতখানা গলাধঃকরণ ক'রে এবং বাকি আর অংশের জন্য কুমীরটি ত' জিব চেটে অস্থির। এ-দেশে, এ-সাগরে সে-সাগরে কুমীরটি হারা অংশের উদ্দেশ্যে হুকের খোঁজে ফিরতে লাগলো। স্বাদ বটে লেগেছিলো কাটা হাতখানার!

তাই পিটার ছিলো ক্যাপ্টেনের দু'চক্ষুশূল। ক্যাপ্টেনের খোঁজ খবর পিটার-ই কুমীরটিকে বলে দিতো। কোনো জায়গা আর বাদ ছিলো না—কুমীরটি ক্যাপ্টেনের পেছু লেগেই আছে। জলদস্যুদের সর্দ্দার হ'লে কী হ'লো, ভয়ডর তারও আছে! থাকবে না কেন,—এ ত' আর যেমন তেমন নদী নালার মেছো কুমীর নয়, ভয় তরাসে আঁৎকে দেবার ভীষণ চেহারা—মানুষখেকো আসল বাঘা কুমীর। ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে দিয়েই পিটার সরে পড়তো কুমীরটির সামনে থেকে কোন্ ফাঁকে। এ'ঘটনা তো প্রাত্যহিক; কুমীরটিকে নিয়ে ক্যাপ্টেনের বুক ধড়ফড়ানি কাণ্ড যেন নিত্যকার। একটি দিনেরও কামাই নেই—এমন কি একটি ঘণ্টার।

ক্যাপ্টেন শুধু রেহাই পেতো কিছুক্ষণের জন্য কুমীরটির ধাওয়া থেকে, যখন কুমীরটি ঘুম যেতো; আর তখনই পালাবার মতন একটি জায়গা সে খুঁজে নিতো তার-ই দ্রুতগামী জাহাজে পাড়ি জমিয়ে। ও, বেচারার কী হায়রানি!

পেছু-পেছু এমনি ধাওয়া করতে করতে কুমীরটি এক মজার কাণ্ড ক'রে বসলো একদিন। ক্যাপ্টেনের খোঁজে এসে সে তার এলার্ম ঘড়িটি গিলে ফেললে স্বচ্ছন্দে। এলার্ম ঘড়ি জানো নিশ্চয়ই কেমন শব্দ ক'রে বাজে;—দম থাকলেই, ব্যস্, বাজবে। এলার্ম ঘড়ি কুমীর গিললে,—আমরা আজকালকার মানুষ এ'র আজগুবি বিশ্বাস করবো কেন! ঘড়ি ত' আর ভাঙেনি বা বিগড়োয়নি—আস্তই আছে কুমীরের পেটে। কতো পুরোনো ঘড়ি সেটি; নকল কলটল নেই যে দম হারাবে। এখনকার হ'লে বা হ'তো! উল্টো ফল তখন, কুমীরটির নড়াচড়ায় দোল-দোলুনিতে ঘড়িটি বাজতে থাকে—যেমন করে বাজতো বাইরে। এ' এক সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার হ'লো কুমীরটির। কিন্তু তা'তে ক্যাপ্টেনেরই হ'লো প্রকাণ্ড সুবিধা। সে শব্দই যথেষ্ট; ক্যাপ্টেনের কানে গেলেই হলো, অম্নি সে চম্পট্ দিতো।

—কী করা যায়! এভাবে কতো দিন আর কাটাই? আচ্ছা ফ্যাসাদ বাপু! ক্যাপ্টেন একটু মন-মরা

হয়ে পড়লো এই সব ভেবে চিন্তে। যার মাথা তার ভাবনা, তোমার আমার সে-ভাবনায় কাজ নেই। তবু একবার ভেবে ছাখো, কী রকম-ই না নাস্তানাবুদ সে হচ্ছিলো! ভয়ে দুঃখে মর্ম্মান্তিকতায় সে গিয়ে লুকোলো একদিন বনের ভিতর, যাতে কেউ-ই তাকে আর দেখতে না পায়। অসম্ভবের দেশের আবার সব কিছুই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি; বনজঙ্গলের ত' কথা-ই নেই। অসম্ভব ঝড়। সে একটি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো; হুঁস হারা অবস্থা তার। অনেকক্ষণ হবে। কিন্তু ক্রমে জায়গাটি তেতে উঠতে লাগলো এবং এতোই তেতে উঠলো যে, সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলো না সেখানে, তিন লাফে কয়েক হাত সরে গেল। তখন সে দেখতে পেলে যে, সে একটি হাপরের চিমনির ওপর বসে ছিলো এতোক্ষণ। নিশ্চয়-ই সে-চিমনিটি মাটির নিচেকার কোনো বাড়ির হবে।

—বাড়িটি কার জানো? পিটার-ই এখানা তৈরি করে রেখেছিলো। সময়ে-অসময়ে লুকোবার মতো একটা আস্তানা ত' দরকার। হুক বুঝতে পারলে যে, হারানো ছেলেরা এখন এখানেই এসে জুটেছে আপাতত। তার মাথায় চাপলো অগ্নি সর্ব্বনাশ দুষ্টুবুদ্ধি। এক চিন্তা: কেমন ক'রে সে হারানো ছেলেদের সর্ব্বনাশ করবে। ওদের মা-বাপ নেই, ন্যাংলা হাভাতের দল—ভালো খায় না বা ভালো পরে না। মা যদি না থাকে তবে ভালো খাওয়ানো বা ভালো পরানো কার দ্বারা সম্ভব! মতলব ভেঁজে সে ঠিক করলো যে, বেশ বড়ো এক টুকরো কেকের ভিতর সে বিষ পুরে ওদের কাছে খেতে ফেলে দেবে। তার ধারণা, হারানো ছেলেরা খুবই লোভী, পেলে সাথে-সাথে সব্বাই মিলে এক নিমেষে ওখানা সাবাড় করে ফেলবে। তারপরই সুরু হবে ওদের পেটের ভিতর অসহ্য বিষক্রিয়া। সিমি, ক্যাপ্টেন হুকের ধড়িবাজ সাকরেত, একথা শুনে ত' আহ্লাদে আটখানা। খুশির চোটে সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

—'হাতে হাত মেলাও,' হুক সিমির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে। সিমি তার নিজের হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে ক্ষমা চাইলে, 'না, পারবো না'—

—'কী'—।

'পাঞ্জা কষতে'—বলেই সিমি মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

'ছি-ছি! সিমি'—ক্যাপ্টেনের মুখে ভৎর্সনার স্বর ফুটে উঠলো। সিমি হকচকিয়ে সামনে সটান হয়ে দাঁড়ালো এবং পট ক'রে সে তার ডান হাতখানা ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে দিলে। অম্নি ক্যাপ্টেন আর সিমি হাত ধরাধরি ক'রে আনন্দ-উল্লাস জুড়ে দিলে গান গেয়ে বীভৎস গলায়:—

—ওঃ হো-হো! ধরতে না-ধরতেই হাত,
হাতের কব্জি ভাঙলো, বলিস্—
হাত বুঝি বেহাত!

ভয়ঙ্কর মাতামাতি চলছিলো। হঠাৎ তাদের কানে এলো বুক ঘেঁষে চলবার নাগাড়ে' শব্দ—খস্-খস্-স্—। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো আর এক শব্দ—টিক্-টাক্ টিক্-টাক্ টিক্-টাক—ঠিক্ এলার্ম ঘড়ির শব্দের মতন।

—ওরে-রে? বাব্বা? কুমীর! কুমীর! একসঙ্গে সিমি আর হুক প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে উঠলো আঁৎকে উঠে এবং চোখের পলক মধ্যে তারা উধাও হ'লো ঊর্দ্ধশ্বাসে।

জল-দস্যুরাও পালিয়েছে আর অম্নি বনজঙ্গল ভেঙে রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের খোঁজে ঝটকে এলো। ওরা ছিলো ঘুপ্‌টি মেরে বনের ভিতর। টাইগার লিলি ছিলো ওদের সর্দ্দারণী, আগেভাগে সে ছুটছিলো দস্যুদের পেছু ধাওয়া ক'রে। মাটির উপর কান পেতে শুয়ে থেকে দস্যুদের পদশব্দের দূরত্ব তারা অনুমানও করে নিচ্ছিলো।

টাইগার লিলি ছিলো টিঙ্কার বেল আর ওয়েণ্ডির মতন পিটারের প্রিয়পাত্রী—পিটারের দুষমন তারও দুষমন। ওরা ছুটে বেরিয়ে গেল, আর এম্নি ক'রে ওরা একেবারে দৃষ্টির বা'র হয়ে গেল গভীর বনের ভিতর।

এই অবসরে নিরপত্তার নিশানা পেয়ে হারানো ছেলেরা গাছের খোঁড়ল খপ্পর থেকে তাদের সোনা-মুখ বের করতে লাগলো। দেখলো, বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু, তবু তাদের উঁকি ঝুঁকির অন্ত নেই; মোটেই সাহস পাচ্ছিলো না বেরিয়ে আসতে গর্ত্ত থেকে। সমস্ত লক্ষ্য ক'রে তবে তারা বেরিয়ে এল, এবং একত্র এসে জড়ো হ'লো খোলা মাঠে উপর।

হায়, তবু বিপদ—যেন কামাই নেই কোনো। চারদিক থেকে হঠাৎ একদল নেকড়ে রুখে এল তাদের উপর আবার। যেন একটার উপর আর একটা বিপদ—উপর্যুপরি। নিব্‌স্ ছিলো জোট ছাড়া হয়ে খানিকটা দূরে; দেখে সে ভোঁ-দৌড়ে ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়লো। ক্ষুধিত নেকড়ের চোখ যেন ছিঁটকে পড়বার উপক্রম হ'লো অসহ্য আক্রোশে আগুনের গোলার মতো। সত্যি তারা নেকড়ের দল কর্ত্তৃক চড়াও হ'লো। এখন কী করা যায় তবে? এ-যে মস্ত ভাবনা। ধাঁ ক'রে কে তাদের বাৎলে দেবে? পিটার থাকলে বা হ'তো! সবাই ভাবছিলো কী করা যায়—বিপদের মুখ থেকে বাঁচতে ত' হবে। হঠাৎ একজনের মাথা থেকে বেরিয়ে পড়লো পিটারের-ই এক মজার কৌশলের কথা; বুনো-জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার সহজ উপায়। কোনো বুনো-জানোয়ার তাড়া করলে পিটার সাধারণত তার দিকে পিছন হেঁটে তেড়ে যেতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। অন্য বুনো-জানোয়ারের তখন আক্রমণ ত' ছাই, পলায়নের ফুরসৎ জুটতো না। হারানো ছেলেরা তাই করলো এবং আশ্চর্য্য তার প্রতিক্রিয়া; নেকড়েরা নিমেষ মধ্যে দল ভেঙে পালিয়ে গেল। ভয়ানক হাঁকডাক শোনা যেতে লাগলো নেকড়েদের বনের ভিতর, কিন্তু বাইরে নয়।

এ' কৌশল খুব কাজে খাটান। কিন্তু এ'র আবার মস্ত ঝুঁকিও আছে। তাই প্রথম প্রথম পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয় মাঠে চড়া গোরু ঘোড়ার উপর, আর তা না হ'লে চিড়িয়াখানার পোষা জানোয়ারের খাঁচার সামনে। সাবধান, জঙ্গলের জানোয়ারের সঙ্গে আগেই নয়!

[ক্রমশ

শৈশব স্মৃতির এক অধ্যায়

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাহিত্যভূষণ

১৯২৬ সনের কথা। সেবার শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রথম এলেন সাজাদপুরে, সংগে এলেন গগনেন্দ্রনাথ এবং সমরেন্দ্রনাথ। তখন আমি সাজাদপুর হাইস্কুলের ফোর্থ ক্লাশে পড়ি। বর্ষাকাল, গ্রামের আশে পাশে জল একাকার। আমাদের বাড়ীর সামনে 'ঝাটপাড়ার জোলা' দিয়ে খরস্রোতে ঘোলা জলের ঢেউ ছুটে চলেছে।

সেদিন ছিল জ্যোছনা রাত, আকাশে একটুও মেঘ ছিল না। ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদের আলোক যে স্বপ্নমায়া রচনা করেছে। বিছানায় শুয়ে জানালার ফাঁকে সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ঘুম ভাঙলো বাবার ডাকে। তিনি বল্লেন: উঠে এস।

বাবাকে দেখে তখন ভয় করতুম, ভাবলুম কিছু অপরাধ করেছি বুঝি, তারই শাস্তি পেতে হবে কিনা

অনেক চেষ্টা করেও কোনও অপরাধের কথা স্মরণ করতে পারলুম না! চোখ মুছতে মুছতে উঠে চল্লুম বাবার পেছনে পেছনে। বৈঠকখানায় এসে দেখি একটা হারমনিয়ম রয়েছে।

বাবা বল্লেন: অবনী ঠাকুররা আসছেন, তোমাকে তাদের অভ্যর্থনা সভায় গান গাইতে হবে।

কিছুদিন আগেই অবনীন্দ্রনাথের 'তেপান্তরের মাঠ' বইটা পড়েছিলাম। আমি সোৎসাহে গান শিখতে লেগে গেলাম। তারপর আমাদের অধীর প্রতীক্ষার শেষে এক রবি করোজ্জ্বল স্নিগ্ধ বর্ষা প্রাতে ঠাকুরদের ষ্টীমারখানা এসে ভিড়লো সাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর ঘাটে।

আমায় কি খাতির। অবনীন্দ্রনাথকে গান গেয়ে অভ্যর্থনা করবো আমি। ছাত্রদের প্রত্যেকেই আমার কাছে বারে বারে আসে,···আমি কি গান গাইব···কেমন শিখলাম···ভড়কে যেন না যাই···গান শুনে অবনীন্দ্রনাথ কি বলেন তাদের বল্‌তে হবে···এমনি কতভাবে তারা আমার সাথে আলাপ কর্‌তে লাগলো। ক্লাশ রুমে আমার পাশে কে বসবে এই নিয়ে একদিন রীতিমত ঝগড়াই হয়ে গেল। ফার্ষ্ট বয়ের চাইতেও আমার আদর তখন বেশী। একটা দল ছিল, যারা আমায় হিংসে করতো, আমার এই ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যে তারা ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠলো। অন্যের কাছে বলে বেড়াতে লাগলো···যে গানই নরেশ গায়। ওর বাবা গান শেখায় কাজেই যা গাইবে তাতেই বাহবা পাবে।

যা হোক শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে অবশেষে আমাদের সেই প্রতীক্ষীত শুভদিন এলো। সভায় লোকে লোকারণ্য। আমার উদ্বোধন সংগীত গাইবার ডাক পড়লো। গানটি আমার স্বর্গত পিতৃদেব নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্তীর রচিত। গানের সবটা আজ আমার মনে নেই, তবে প্রথম লাইন ছিল, 'নাচিছে হৃদয় হরষ পুলকে কি মৃদুমারুত আনে সমীরণ···।' গান শেষ করে ঠাকুর ভ্রাতৃত্রয়ের কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলাম! অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন: বেশ হয়েছে গান, কে শিখিয়েছে গান?

বললাম: বাবা লিখেছেন এবং তাঁরই সুর।

অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: বেশ, বেশ···বলেই তাঁর সম্মুখস্থ টেবিলের ওপর সাজানো নানাবিধ ফলশুদ্ধ একখানা প্লেট আমার হাতে দিলেন। আমার আনন্দ ধরে না, বুক যেন দশ হাত উঁচু হয়ে উঠলো।

রাত্রে আমাদের কুঠিবাড়ীতে রেডিও শোনবার নিমন্ত্রণ ছিল। সে আজ প্রায় আঠার বছর আগের কথা। তখন কেবল নূতন রেডিও বেরিয়েছে। গ্রামের লোকেরা তো রেডিওর নামই শোনেনি, সহরেও বেশীর ভাগ লোকই ছিল রেডিও সম্বন্ধে অজ্ঞ। তখন রেডিও শুন্‌তে হলে কাণে এক রকম যন্ত্র লাগাতে হতো। বাংলা গান রেডিতে দেওয়ার রেওয়াজ তখনো আরম্ভ হয়নি। সেই যুগে আমরা প্রথমে রেডিও শুনি।

আমাকে দেখেই অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: এই যে, এসো, তোমার নামটা যেন কি, ভুলে গেলাম।

আমার নাম বল্লাম।

বাবা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, ধমক দিয়ে বল্লেন: নমস্কার কর হাত জোড় করে'।

লজ্জায় ও ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। বাড়ীতে গিয়ে হয়তো আজ পিঠেও কিছু পড়বে। অবশ্য সে কথাটা আজ ভাল মনে নেই যে পৃষ্ঠদেশে কিছু পড়েছিল কিনা। তোমরা হয়তো বল্‌বে, এত কথা মনে আছে আর মার খাওয়ার কথাটা বুঝি মনে নেই। তার কৈফিয়ৎ আছে, সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিলাম নৌকো করে, বোধহয় বাবার কোলে ঘুমুতে ঘুমুতে।

যে কয়দিন অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন, সমস্ত সাজাদপুরের আবহাওয়ায় যেন একটা রংয়ের পরশ লেগেছিল,

আনন্দ মেলা বসেছিল সাজাদপুরের অলিতে গলিতে। নানা স্থানে নানা সভা সমিতির হিড়িক পড়ে গেল। আমার কি অবসর আছে? বাবার লেখা এবং সুর দেওয়া নূতন নূতন গান শিখ্‌ছি আর সভায় গিয়ে অসংখ্য দর্শক জন সমক্ষে সেগুলো গেয়ে হাততালি পাচ্ছি। আমি আনন্দে তুড়ি দেওয়া পায়রার মত উড়্‌তে লাগলাম, নিজেকে হারিয়ে ফেল্লাম এক নূতন প্রাণ-প্রেরণায়, যেন আমি এ জগতের মানুষই নয়। বাবার শাসনের রাশ আলগা হয়েছে। পড়ার বইয়ের সংগে সাক্ষাৎ করবার অবসর নেই। এমন কি সময় মত খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত হয়ে পড়ে না। থিয়েটার, যাত্রা, ম্যাজিক হরদম লেগেই আছে। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সুধীর সেনের চাণক্যের অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বলে গেলেন: He is the Sisir Bhaduri of muffasil.

আমাদের স্কুল থেকে একদিন ঠাকুরদের নিমন্ত্রণ করা হল। স্কুল সাজানো হল, ষ্টেজ বাঁধা হল, ছাত্রদের প্রাণে কত উল্লাস। আবৃত্তি, ডায়ালগ, সংগীত, কেরিকেচার ছাত্রদের ভেতর থেকে অনেকেই করলো। আমার আজো মনে পড়ে সেদিনের সভায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল থার্ড ক্লাশের বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়।

গগনেন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় সেদিনের সভায় আস্‌তে পারেন নি, কাজেই পরদিন কুঠিবাড়ীতে আবার স্কুলের ছেলেদের আবৃত্তি ও গানের আয়োজন হলো। আমাদের সেদিনের উৎসবও খুব জমকালো হয়েছিল। সেদিনের সভায় গগনেন্দ্রনাথ আমাদের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একখানা শ্মশ্রু বিলম্বিত অপরূপ প্রতিকৃতি দশ মিনিটের মধ্যে এঁকে দিয়েছিলেন।

এমনি আনন্দের হাটে আট দশ দিন বেশ কেটে গেল। আমার কিশোর মনেও সেদিন একথা জেগেছিল, একেই বুঝি বলে বেঁচে থাকা। এরই ভেতর বুঝি পাওয়া যায় জীবন-দেবতার মোহন স্পর্শ। একদিন বিকেলে সাজাদপুরের অধিবাসীদের প্রাণে ব্যথার দীপালী জালিয়ে দিয়ে ঠাকুরদের ষ্টীমারখানা চোখের অন্তরালে চলে গেল।

তারপর এক বছর কেটে গেল। এর ভেতর আমাদের সংসারের ওপর দিয়ে বয়ে গেল বিপর্যয়ের ঝঞ্ঝা। দারুণ বসন্ত রোগে বাবা চলে গেলেন পরপারের পথে। আমি ছিলাম বড়, কাজেই এগার বছর বয়সে সংসারের গুরুভার মাথায় পড়লো। তবু স্নেহময়ী জননীর অঞ্চল ছায়ায় থেকে অভাবের বেদনা কোনদিন জান্‌তে পারিনি। গান শেখায় পড়ে গেল ফুলষ্টপ। বাবা কত যত্ন করে শিখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে, মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে।'···মনে মনে ভেবেছিলাম একদিন হয়তে এমন সংগীত আমার কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে পারে, যে রাজার রাজা তাঁর সভায় শত শত গুণীর গান ফেলেও বরণ মালা হাতে নিয়ে আমার বিজন ঘরের কাছে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সে স্বপ্ন আমার ধূলার তাজমহলের মত কোথায় মিলিয়ে গেল। আবার বর্ষা এলো। আবার অবনীন্দ্রনাথের রঙচঙা নৌকো এসে ভিড়লো কুঠিবাড়ীর ঘাটে। এবার মনে হতে লাগলো, পৃথিবীর যেন আনন্দ বলে কিছু নেই। পাখীদের কণ্ঠে বিষাদের গান, লোকজনের চলাফেরার ছন্দ কেটে যাচ্ছে। সজ্জিত তোরণে পুষ্প পাতায় যেন লেগে রয়েছে মলিনতার কৃষ্ণ ছায়া। আমার ব্যথার সুরে যেন সমস্ত সাজাদপুরের ব্যথার বাঁশী সাহানায় সুর দিয়েছি। আজ বাবা নেই, তাই আমার আর সে আদর নেই। বন্ধুরা ঠাট্টা করে: কি রে, এবার অবনীন্দ্রনাথকে দু একখানা গান শুনিয়ে দে।

আমি শুধু ম্লান মুখে নীরবে তাকাই তাদের দিকে।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ এলেন আমাদের স্কুল দেখ্‌তে। স্কুল সাজানো হ'ল। এবার আর আবৃত্তি বা সংগীতের আয়োজন করা সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌লো না। অতি সাধারণ ভাবে শিল্পগুরুকে আহ্বান করা হল আমাদের

প্রাণের শুভ-সাধনা দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের ক্লাশে ঢুকলেন, সংগে ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী, খানবাহাদুর মোয়াজ্জম আলি খান এবং সাজাদপুরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিল্পগুরু ঘরে ঢুকতেই আমার সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র গুপ্ত ভায়া মহাশয় আমার দিকে অংগুলি তুলে অবনীন্দ্রনাথকে বল্লেন: এই সেই ছেলে যার কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন স্যার।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধকের মর্ম্মে সুদীর্ঘ এক বছর পরেও একটি পাঁড়াগেঁয়ে সাধারণ ছোট্ট ছেলের একটু স্থান পেয়েছে। আমার অন্তরের ঘুমায়িত আনন্দ শিশু জেগে উঠ্‌লো।

অবনীন্দ্রনাথ আমার বেঞ্চের কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন: তোমার বাবা মারা গেছেন শুনে বড়ই দুঃখিত হয়েছি. তোমার মা আছেন তো। বাবার প্রসংগে আমার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল, চোখ দুটি ভরে এলো জলে, আমি অতি কষ্টে বল্লাম: হ্যাঁ, আছেন।

অবনীন্দ্রনাথ বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বল্লেন: কেঁদোনা, এবার তো আমায় গান শুনালে না। কাল সকালে কুঠিবাড়ীতে গিয়ে আমার সংগে দেখা করো।

যাক, পরদিন ভোরে যখন আমি কুঠিবাড়ীতে গেলাম অবনীন্দ্রনাথ তখন কুঠিবাড়ীর দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। পেস্কার মশাই খবর দিলেন: নবদ্বীপবাবুর ছেলে এসেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঘরে এসে আমায় বস্‌তে বলেই বল্লেন: কি, গান শুনাবেনা।

আমি শুধু একটু হেসে বল্লাম: শুনাবো, কিন্তু হারমনিয়ম বাজাতে জানি না যে। অবনীন্দ্রনাথের সংগে ঠাকুর পরিবারেরই আরোও কয়েকটি যুবক এসেছিলেন, তাঁদের নাম আজ আমার মনেই নেই, তাঁদের একজন অর্গ্যান বাজালেন। আমি গাইলাম···'মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে।' আর একটি গান গেয়েছিলাম সেদিন কান্তকবি রজনীকান্তের 'কেন বঞ্চিত হব চরণে'। এ গানটি শুনে অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: তোমাদের পাবনা জেলার কবি আজ সারা বাংলার কবি হয়েছে খবর রাখ?

আমি বল্লাম: হ্যাঁ রজনীকান্ত, বাবার গানের গুরু ছিলেন, সাজাদপুরেও তিনি এসেছিলেন।

ঐসব কথার পরে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন: কেমন পড়া শুনা করছো, কোন্ কোন্ সাবজেক্ট তোমার ভাল লাগে? আমি বল্লাম: ইতিহাস আর সংস্কৃত আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

তিনি হেসে বল্লেন: ও দুটোর কোনটাই বিশেষ কাজে আসবে না হে।

সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি একথা কেন বলেছিলেন তিনি। আজ ঠিকের চেয়েও বেশী বুঝ্‌তে পারছি, অবনীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী আমার জীবনে সত্য হয়েছে। ইতিহাস ও সংস্কৃত কোনটাই আমার জীবনে কাজে লাগেনি।

সেবার অবনীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর এক ছাত্র শ্রীযুত মনিষী দে এসেছিলেন। তার ছিল খুব ঘোড়ায় চড়বার সখ। তাঁর সংগে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন বিকেল বেলা তিনি ঘোড়ায় চড়বার যোগাড় করছেন, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, একটি হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসে আমাকে বল্লে: হেঁই খোঁখাবাবু, মেনিজরবাবু আপকো বোলাতা ছায়, আইয়ে হামারা সাথ।

ম্যানেজার বাবু বল্লেন: চলহে কুঠিবাড়ীতে।

আমাকে দেখেই অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন: ওহে নরেশ, তোমার গান শুনে যদিও তখন বরণমালা দিয়ে

তোমার বিজন ঘরের দ্বারের পাশে যেতে পারিনি, তবু এই সামান্য পুরস্কার গ্রহণ করো। হাত পেতে দাঁড়ালুম। তিনি আমার হাতে আটটি টাকা দিয়ে বল্লেন: সামান্য উপহার।

আনন্দে এবং লজ্জায় আমি কথা বল্‌তে পারলুম না।

আমার একজন অভিভাবক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এই সুযোগে অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু মোটা রকমের আদায় করে ছাড়বি। কিন্তু বাইরের জগতের কোন স্বার্থের কথা আমার মনে এলো না। শুধু ইচ্ছা হচ্ছিল, তাঁর কাছে বসে অজস্র নূতন এবং অদ্ভুত গল্প শুনে যাই, সেই হবে আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

...তারপর এক বেদনামলিন সন্ধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের ছিপনৌকাখানি খালের বুকে ভেসে পড়লো, আনন্দ কোলাহল গেল নিভে।...

দীর্ঘ আঠার বছর কেটে গেছে, এখন কর্ম্ম জীবনে এসে পৌছেচি। সংসারের নানা সুখ দুঃখ প্রপীড়িত বাঙালী, আজ আমার মধ্যে বাসা নিয়েছে। দারিদ্র্য ও পরাধীনতার গ্লানি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনকে জর্জরিত করছে; তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে শৈশবের আনন্দ মধুময় স্মৃতি রাশি মনের কোণে উঁকি মারে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের মরমী হৃদয় ছড়িয়ে রয়েছে আমার মত শত শত মানুষের দিকে। কাছে এই সুদীর্ঘ আঠার বছর পর্য্যন্ত তিনি আমাকে মনে রাখবেন, এ দাবী করতে আমি পারি না। তবে আমি তো তাঁর মত দ্বিতীয় মানুষের সন্ধান আমার জীবনে পাইনি। তাঁর মত মহাপুরুষের পদতলে বসবার সুযোগ দ্বিতীয় বার পাইনি। কাজেই তাঁর পবিত্র স্মৃতিকে, আঠার বছর অল্পই, আজীবন কাল, ধরে রাখবো মনের কোণে, যেন রাখবো অম্লান পারিজাতের মালার মতন।

বিশ্বেশ্বর ভরা রিভল্‌বার নিয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

বলা নেই কওয়া নেই, তিনটে টায়ার ফট্ ফট্ ক'রে ফাটালেন।

তারপর বল্‌লেন, থাকো এখানো সারারাত হিমে প'ড়ে। চালাকি করবার আ জায়গা পাওনি?

বোরখা পরা তিনটি মেয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে যেন আসনের নীচে লুকোতে চায়।

বিশ্বেশ্বরের সন্দেহ হল, ওরা মেয়ে নয়। কিন্তু পরীক্ষা ত করা যায় না!

ড্রাইভারকে বল্‌লেন, কী ভেবেছ তুমি? মানুষ খুন করবে?

সে যেন কত ভয় পেয়ে গিয়ে বল্‌লে—হুজুর আচমক্ হো গিয়া। অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ এইসাই হোতে হেঁ।

আচ্ছা লম্বর দেও তুমারা। ব'লে নম্বর নিলেন! তারপর নিজের গাড়ীতে চ'ড়ে বস্‌লেন। গাড়ী চল্‌লো। প্রদীপ ততক্ষণে সহজ হ'য়ে উঠেছে। তার দাদু থাক্‌তে আর ভয় কি? ভরসা পেলেই মানুষের ভয় যায়।

পাগ্‌লাঝোরা ঝর্ণা কোন্ উঁচু থেকে ঝ'রে পড়ছে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। আর কত নীচে যে যাচ্ছে তারও কোনো হিসাব নেই। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে বেশ লাগে।

কিন্তু সময় ত ওদের বেশী নষ্ট করা চল্‌বে না। অনেক রকমের বিপদ আছে।

অনেক উঁচুতে এসে এক জায়গায় দাদু বল্‌লেন—গাড়ীটা রাখো ত, দূরবীণ ক'সে দেখি, ও ব্যাটাদের ব্যাপার কি!

যা ভেবেছি তাই, ব্যাপার সুবিধার নয়! গাড়ীখানাকে ঠেলেঠুলে রাস্তার এক পাশে রেখে ওরা পাহাড়ের গা দিয়ে যে পাক্‌দণ্ডী রাস্তা আছে, সেই সোজা পথে আস্তে আস্তে উঠ্‌ছে গাছ ধ'রে ধ'রে।

মতলব কি হে মাষ্টার?

প্রণব বল্‌লে, সম্ভবতঃ ওরা ওপরের রাস্তায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। যতক্ষণে ঘুর পথে ঘুরতে ঘুরতে আমরা ওপরের কার্টরোডে গিয়ে হাজির হব, ততক্ষণে অন্য কোনো মতলব বার ক'রে ওরা আমাদের গাড়ী রুখ্‌বে। দিন ত দূরবীণটা। ও কি? বোরখাপরা মেয়ে ত কেউ নেই, সব যে পুরুষ মানুষ! গাড়ীটায় ড্রাইভারটা শুধু রয়েছে, আর ত কাউকে দেখ্‌ছি না।

একশো মাইল জুড়ে যেখানে শুধু পাহাড় আর জঙ্গলের রাজ্য এক দিকের আকাশ আড়াল ক'রে, অন্য দিকে দূর সমতলভূমি সবুজ গাল্‌চের মতন প'ড়ে আছে তার নদী অরণ্য গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র নিয়ে—শুধু ডালিয়া ফুলের বর্ণসুষমা, গিরিপ্রসূনের গন্ধ, পাখীর কণ্ঠ আর ঝর্ণার গান, সেখানে এই অসীম নির্জ্জনতার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের হীনতম কাজে বনলক্ষ্মীর স্বপ্ন ভেঙে যাবার কথা।

কিন্তু তা হল না। তার বদলে প্রদীপদের ড্রাইভার ভয় পেয়ে গেল। সে আর এগোতে চাইলো না। যা হয় দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিলেই সে ফিরে যাবে বল্‌লে।

দাদু কি খানিকটা চিন্তা করলেন। তারপর বল্‌লেন—গাড়ী ঘোরাও।

নীচে থেকে একখানা ট্রেন উঠে আসছে। পাগ্‌লাঝোরার কাছে নেমে তাইতে উনি সকলকে নিয়ে উঠ্‌লেন। ট্রেণের সঙ্গে চালাকি করা অত সহজ নয়।

হল্‌দে রঙের গাড়ীখানি নীচের দিকে নেমে গেল।

দাদু সমানে চলন্ত ট্রেণ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন।

ওরা বোধহয় গাড়ীখানাকে ফিরে যেতে দেখেছিল।

ট্রেণ তখন চলেছে ওপরে, মোটরখানা নীচে যাচ্ছে। কখনো দেখা যায়, কখনো আড়াল পড়ে। হঠাৎ স্পষ্ট দেখা গেল ওপর থেকে একখানা পাথর ওরা গড়িয়ে ফেলে দিলে গাড়ীখানার মাথায়, একটু শব্দ পর্য্যন্ত এতদূর এলো না, তারপরেই ট্রেণ আর একটা পাহাড়ের উল্টো দিকে চ'লে গেল, কিছু দেখা গেল না। কুয়াসা আরো ঘন হ'য়ে উঠ্‌লো। ঠাণ্ডাটা আরো বেশী।

দার্জ্জিলিং যখন পৌঁছলো তখনো বারোটা বেলার রোদ্দুর দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকাল সাতটা। হ্যাপি ভ্যালি ভিউ—বাড়ীখানা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, তিনদিকে কোনো পথ নেই। একদিকে ব্রীজ বন্ধ ক'রে দিলে আসা কঠিন! দুর্গ বল্‌লেই হয়।

সেই বাড়ীর দোতলার ঘরের জানালা থেকে সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘা বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদীপের অপূর্ব্ব লাগ্‌লো আর বাবীর জন্যে মন কেমন করতে লাগ্‌লো নতুন ক'রে।

ডারজিলিং কথাটা উচ্চারণ ক'রে তার মনে একটু আভিজাত্য ভাব জাগ্‌লো।

কোথায় গেছলে? না ডারজিলিং, বলবার মতন কথা। যে-সে যখন তখন কিন্তু ডারজিলিং আস্‌তে পারে না! মাষ্টারমশাই নিজে বলেছেন। তিনিই ত এতখানি বয়সে এই প্রথম এলেন! বলা যেতে পারে এটা রঙের দেশ। নয়ত কি? যেখানে প্রত্যেক বাড়ীটি রঙীন, ফুলগুলি রঙীন, রাস্তা রঙীন, মানুষগুলো এবং তাদের পোষাকগুলো রঙীন, আকাশ রঙীন, পাহাড় রঙীন, সে যদি রঙের দেশ না হয় ত আর রঙের দেশ কোথায়? বর্ম্মায় নাকি আরো রং আছে, জাপানে নাকি তার চেয়ে বেশী রং। কিন্তু এই বা কে পায়! গ্রামে তারা কি দেখে? খালি সবুজ। কলকাতায়? রং-ই নেই। আকাশটা শ্লেটপাথর, রাস্তা ধূলোয় ধূসর। তাই ব'লে বলছে না যে তাদের গ্রামের চেয়ে খারাপ। গ্রামের চেয়ে ভালো স্বীকার করতে হবে বৈকি! তার নাম কলকাতার শহর! পুরোণ হাওড়া ব্রীজ ভেঙে যখন নতুন হাওড়া ব্রীজ শেষ হবে তখন একটা দেখবার জিনিস নিশ্চয়ই হবে। তখন হয়ত পুরোণটাকে কেউ পুঁছবেওনা। কিন্তু সেটাই কি কম আশ্চর্য্য? ছবিতে দেখা ছিল, এবার সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, বাবী যা দেখেনি। রাত্রে মনে হল এখানেও সেই গুণ্ডাগুলো ধাওয়া করবে না কি?

মাষ্টারমশাই বলেছেন, অত সহজ নয়। এ বাবা ডারজিলিং। বেশী চালাকী করতে এসো ত নিজেরাই মুস্কিলে পড়বে! আর তাদের বাড়ীতে যে ভুটিয়া দরোয়ান আছে সে কুকুরী নিয়ে ফেরে, কথায় কথায় পেটে গুঁজে দেয়। তারা হল পাহাড়ী, অসভ্য গোঁয়ার বটে, কিন্তু কুকুরের মতন বিশ্বাসী।

তার ওপর দাদু কোথা থেকে এনেছেন এক বিরাট কুকুর গ্রেট্ ডেন্, বাঘের মতন চেহারা। বাঘের মতন ডাক। চেন-বাঁধা অবস্থায় তার রোখ দেখলে লোকে সাত হাত তফাতে যায়। কিন্তু প্রদীপের কাছে? ও যেন একটি ইঁদুর! 'কলেট্' ব'লে ডাকলেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে! দাদু বলেন—কানাই ওর নাম। বাঙালী নাম বুঝি কুকুরের হয়? ও হ'ল কলেট্!

[ক্রমশঃ

পথে প্রান্তরে

ভিয়েন

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

যে ভাষায় পর্যটকের অন্নসংগ্রহকে বলে 'ভিক্ষা করা' সেই ভাষা হল আমার মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষার প্রসার সুরু হয়েছে যখন আমার মাতৃভূমি পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। স্বাধীনতা তখনকার দিনে স্বর্গ প্রাপ্তিকেই বুঝাত। আমি সে যুগের মানুষ নই। স্বাধীনতার সুখ তথাকথিত স্বর্গ সুখ হতেও মধুর। অতএব ইউরোপ ভ্রমণে এখন থেকে আমি আর 'ভিক্ষা' কথাটার ব্যবহার করব না, এই কথাটাকে তখনকার দিনের স্থানীয় ভাবের সংগে খাপ খাইয়ে বলব, "পোষ্টকার্ড বিক্রি।" অতএব এখন আমি পোষ্টকার্ড বিক্রি করে কি দেখতে পেয়েছিলাম, তারই কথা বলব।

ভিয়েনা প্রকাণ্ড নগর। আমি সর্বপ্রথমই মিঃ হেন্‌কিনকে সংগে নিয়ে বিরাট একটা কাফেতে গেলাম। সেই কাফেতে ৬০ পেনীতে এক পেয়ালা কাফি বিক্রি হয়। এত দামী কাফিতে আমার সাথী কখনও আসেন না অথবা আসবার ক্ষমতাও নাই বললে কোন দোষ হয় না।

তখন বেলা সাড়ে নয়টা। ঠাণ্ডা দেশের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে বসে অনেকেই কাফি খাচ্ছিলেন, গল্প করছিলেন, সংবাদ পত্র পাঠ করছিলেন। কাফেটির বিশেষত্ব হল, প্রত্যেকটি টেবিল চেয়ারের কাছে এক একটি ছাতা খোলানো ছিল, আবার প্রত্যেকটি ছাতার কাছেই একটি করে বৃক্ষ ছিল। এগুলি সাত ফিটের মত উচু এবং ঠিক ছাতার ডাঁটার মত উঠে গিয়ে একেবারে একটি ছাতাতেই পরিণত হয়েছে। এরূপ বৃক্ষ যুগশ্লাভিয়া, হংগেরী, পষ্টির ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমরা ছাতার নীচে না বসে ছাতারূপী সাত ফিট উঁচু বৃক্ষের ছায়ায় বসে দৈনিক 'লণ্ডন টাইম্‌স্' পড়ছিলাম। আমার মন সংবাদ পত্রের দিকেই ছিল, হঠাৎ দুভাষী মহাশয় বললেন, "ঐ দেখুন তিন জন বহুরূপী বসে আছে।" আমি চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, পান্‌জাবের স্যার সাজাতখানের বড় ভাই একটি ছাতার নিচে বসে কাফি খাচ্ছেন এবং তাঁরই পাশে তার ছেলে বসে আছেন। অন্যজন আমাদের পূর্বপরিচিত রুলিং প্রিন্স। আমি দুভাষীকে বললাম, "দয়া করে চুপ করুন, এঁরা আমারই স্বদেশ বাসী।" মিঃ হেন্‌কিন আর আমার কাছে না দাঁড়িয়ে একদম তাঁদের কাছে গিয়ে বেশ করে দেখে বললেন, "এত অপরূপ জীব, মশাই, এরূপ পোষাকধারী লোক অতি অল্পই দেখেছি।"

মিঃ হেন্‌কিনকে কয়েকটি কথা বলার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের এই তথাকথিত সম্মানিত লোকগুলি এখনও ইউরোপের দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচরণ করছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় প্রতিপালিত হয়ে এরা শিশুসুলভ ব্যবহার করছেন। আমরা এই শিশুদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলাম।

ফ্রান্স দেশটা তখনও আমার দেখা হয় নি। ফ্রান্স এখান হতে অনেক দূর, কিন্তু অষ্ট্রিচ্ দেশের লোক প্রায়ই ফরাসী ভাষা বলতে পারে। আমরা যখন প্যারী হোটেলের দিকে চলছিলাম তখন একজন ফরাসীর সংগে সাক্ষাত হয়। লোকটি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে লাগল এবং হাত পা নাড়তে সুরু করল। সাথীকে জিগ্‌গাসা করলাম, লোকটি কি বলছে? সাথী বললেন, যার খোজে আপনি সেই বড় হোটেলে যাচ্ছেন তিনি এখানে নাই,

তিনি এখান থেকে অনেক দিন হয় চলে গেছেন। কোন সংবাদ পত্র তাঁর আসা-যাওয়ার সংবাদ প্রকাশ করেনি, এরূপ বিশ্রী কাজ ফরাসী দেশে হতে পারে না। হউক না লোকটা আমাদের শত্রু কিন্তু তার প্রাপ্য সংবাদ আমাদের দেশের সংবাদ পত্র ছাপ্‌বেই। তিনি আরও বললেন, অষ্ট্রিয়া কোন মতেই স্বাধীন দেশ নয়। আমি লোকটিকে টেনে ধরে ইংলিশ ভাষায় বললাম, "মহাশয় চলুন একটু কাফি খেয়ে যান, আপনার সংগে আলাপ করে ধন্য হই।" কাছেই একটি প্রকাণ্ড কাফে। তাতে তিনজন তিনখানা চেয়ারে বসা মাত্র বয় কাফি এনে দিল। আমরা কাফি খাওয়া সমাপ্ত করে বক্তব্য বিষয় চর্চা করতে লাগলাম।

তখনকার দিনে ইউরোপে ন্যাজি এবং ফ্যাসিষ্ট বলে দুইটি কথার সমূহ প্রচলন ছিল। ন্যাজি কথাটাকে ইংলিশরা নাৎসী বলে, সেজন্যই আমাদের দেশেও ন্যাজি না বলে নাৎসী শব্দেরই প্রচলন হয়েছে। ফ্যাসিষ্ট কথাটার কোনরূপ রূপান্তর হয়নি এবং ন্যাজি কথাটা প্রায় লোকই ব্যবহার না করে ন্যাজি কথাটার স্থলে ফ্যাসিষ্ট শব্দেরই ব্যবহার করত। ফরাসীটি ভারতবাসীর প্রতি এতই সদাশয় ছিল, যে বারবার বল্‌ছিল "হক না লোকটি ফ্যাসিষ্ট, সে ভারতবাসী ত? এর মানে হল ভারতবাসী যদি ফ্যাসিষ্ট হয়, ন্যাজি হয়, তবুও তার মনে এসব ইজমে এমন কোন দাগ কাটতে পারবে না যাতে করে তার পুরাতন ইতিহাসের দাগ তার মন হতে মুছে যেতে পারে, অথবা তার পিতৃকুল মাতৃকুল প্রদত্ত সংগুণ লোপ করতে পারে। ভারতবাসীর প্রতি মধ্য-ইউরোপের লোকের একটা প্রবল শ্রদ্ধা রয়েছে দেখে আমার মনটা আপনা হতেই বড় হয়ে গেল কিন্তু বহুদিনের পরাধীনতার ফলে ভারতবাসীর সংগুণগুলি যে লোপ পেয়েছে তা ফরাসীটির মোটেই জানা ছিল না। আমাদের ফরাসী বন্ধু যদি মিঃ অগ্নিহোত্রীর কাজ কর্ম দেখতেন তবে তার মুখ হতে এসব কথা মোটেই বের হত না। মিঃ অগ্নিহোত্রী ইন্দো-অষট্রিচ্‌ নামে এক সমিতি করেছিলেন। সেই সমিতির পক্ষ হতে ভিনিক্‌ তথা ডচ্‌ ভাষায় একখানা পত্রিকা বের হত তাতে ভারতের সংবাদও থাকত। তার পুরাতন ফাইল ঘেঁটে দেখেছি কোথাও বিট্‌ঠল ভাই প্যাটেলের নাম নাই। আমি যখন তাকে জিগ্‌গাসা করেছিলাম, "আপনার কাগজে বিট্‌ঠল ভাই প্যাটেলের নাম নাই কেন?"—তখন তিনি বলেছিলেন, তাঁরা হলেন পলিটিকেল ম্যান, ওঁদের কথা এসব সংবাদ পত্রে স্থান পেতে পারে না।" অথচ এমন কয়টি লোকের নাম সেই পত্রিকাতে ছিল তারা প্রায়ই সেই 'শিশু শ্রেণীর' লোক, যাদের কয়েক জনের কথা একটু পূর্বেই বলেছি। কাফি খেয়ে মজুরদের বিশ্রামাগারে এসে বসেছি এমনি সময় একটি লোক আমার হাত ধরে ঘরটার এক কোণে টেনে নিয়ে চলল। টেবিলের উপর ভারতবর্ষের তিন খানা ছবি বিক্রয়ার্থ একজন হল্যাণ্ডবাসী হাজির করেছিলেন। যে লোকটি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে ভিনিক ভাষায় জিগ্‌গাসা করল, "সত্যই কি এরূপ আপনাদের দেশের অবস্থা? আমি লোকটির কথার জবাব না দিয়ে এই ছবি তিন খানা কার এবং কে তাহা এঁকেছেন তাই জিগ্‌গাসা করলাম। একজন লোক কাছে বসা লোকটিকে দেখিয়ে বলল, এই তিন খানা ছবি এই ভদ্রলোক বিক্রয়ার্থ হাজির করেছেন। তার মুখের দিকে তাকাতেই লোকটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "নমস্তে জী, এই ছবি তিন খানা আমি নিজেই এঁকেছি, আমি আপনাদের দেশে এক যুগ অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর কাটিয়ে এসেছি।" তারপর ছবি তিন খানা উঠিয়ে রেখে দিয়ে তার ভ্রমণ কাহিনী আমার কাছে সংক্ষেপে বললেন। তিনি হল্যাণ্ড হতে সাইকেলে করে ইটালীর বৃন্দিসী হতে সুয়েজ আসেন এবং সুয়েজ শহরে পা রেখেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম কবুল করে মিশর, সিরিয়া, পালেষ্টাইন, ফ্রান্স-জর্ডনিয়া ভ্রমণ করে ফের জাহাজে করে বম্বে এসেই আর্যসমাজীদের দ্বারস্থ হয়ে হিন্দুধর্মের সুশীলতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেনে শ্রেণীর অনুগ্রহ ভাজন হয়ে প্রায় পচিশ সহস্র "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রূপী" সংগ্রহ করে ফের স্বদেশে

প্রত্যবর্তন করেন এবং এক খানা ভ্রমণ কাহিনী লিখে বেশ দুপয়সা অর্জন করে এখন "রিটায়ার্ড লাইফ্‌" কাটিয়ে যাচ্ছেন।

এখন ছবি তিন খানার কথাই বলি। প্রথম ছবিতে ছিল বাংলা দেশের একটি ডোবার মাঝে একটি লোক হাঁটু জলে নেমে পঁচা পাট হতে পাট বার করছে আর একদিকে একটি স্ত্রীলোক সেই দুর্গন্ধ যুক্ত ডোবার জল কলসীতে ভরছে। অন্য ছবিগুলি আরো নোঙরা। এই ছবি দেখে এবং লোকটির গল্প শুনে তাকে জিগ্‌গাসা করলাম, ভারতবর্ষ হতে এত টাকা পেলেন, এত সুখ পেলেন, তার বিনিময়ে নিয়ে এলেন এই তিন খানা কদর্য ছবি, ভারতবর্ষে কি কোনই ভাল জিনিস দেখতে পান নি? লোকটি তার উত্তরে আমার কাছে সেদিন অনেক কথাই বলেছিল, তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

ইউরোপ সোসিয়েলিজম্‌ কি ন্যাজীইজম্‌ কি তাই নিয়ে যখন সাধারণ লোক হতে আরম্ভ করে ব্যারন কাউণ্ট, প্রেসিডেণ্ট এদের টনক নড়ছিল, তখন একজন হল্যাণ্ডবাসী ডচ্‌ ম্যান চিন্তা করছিল কি করে ইউরোপের অন্তস্থল থেকে আধ্যাত্ম তত্ত্বের গোড়া পর্যন্ত উৎপাটন করে আতলান্তিক মহাসাগরে নিক্ষেপ করতে পারা যায়। সেজন্য লোকটি কম পরিশ্রম করেনি, কম নির্যাতনও সহ্য করেনি। তাকে তার কাজের জন্য আমি ধন্যবাদ দিব কিনা তাই ভাবছিলাম। আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, এখনও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করি। সে অবস্থায় কি করে ভারতের ধ্বংসের সাম্রাজ্যবাদের দড়ি কেটে ফেলবার জন্য অন্যকে সাহায্য করতে পারি? সাম্রাজ্যবাদ বড়ই বালাই, যেই একবার সাম্রাজ্যবাদের আস্বাদ পেয়েছে সে কি স্বইচ্ছায় তা পরিত্যাগ করতে পারে? না, ধর্মের ভূয়া সাম্রাজ্যবাদও পরিত্যাগ করতে পারে? বিকালে ও ভদ্রলোকটি বলেছিলেন, আপনি ভূয়া কথার সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করতে পারছেন না, ইংলণ্ডের লোক কি করে তাদের সত্যিকারের সাম্রাজ্যবাদ আপনাদের উপর হতে উঠিয়ে নেবে, তাও একবার ভেবে দেখবেন। কথা কথাই, বেশিক্ষণ মনে থাকে না। আমি আমার সাথী মিঃ এন্‌কিন্‌কে যখন বললাম, চলুই মশাই আমরা বেরিয়ে পড়ি, তিনি বললেন, আজ বিকালে তিনি আমার সংগে কোথাও যাবেন না। তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। এই লোকটিকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে রাজি ছিলাম না। আমি একটা চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম তবে কি ডচ্‌টিকে আমার সংগে যেতে নিষেধ করেছে? আমার মনে শক্তি ছিল, শরীরেও চলবার ক্ষমতা ছিল, আমার ভয় করার কিছুই ছিল না। কতক্ষণ পর মিঃ এন্‌কিন বললেন, মিঃ বিশ্বাস এদেশে আপনি শুধু ভিক্ষা করতে আসেন নি, এদেশ হতে যাতে কিছু শিখে যেতে পারেন সেদ্রিকেও আপনার দৃষ্টি রাখা দরকার। যদি শুধু পেট ভরে খেয়ে পথে সাইকেল চালিয়ে বলেন আপনার পৃথিবী ভ্রমণ করা হয়েছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হব না। আপনার ইউরোপ সম্বন্ধে কিছু জানাও দরকার।

জানব এবং শুনব আমার ইচ্ছা মতে। অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিছু শিক্ষা করা আমার ধাতে পোষায় না। তারপর এরা বেকার, এরা মজুর, এদের কি অধিকার আছে আমার শিক্ষার পথ বলে দেয়? এদের হটকারীতায় আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল।

অনেক দেখলাম, তারপর যেখানে এমেরিকান এবং ভারতীয় ডাক্তারগণ ভিয়েনাতে তাদের জ্ঞান বাড়াতে গেড়েছিলেন, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের বাংলা দেশের একজন ডাক্তার আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে বেশ করে খাওয়ালেন, আদর যত্ন করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি আমার মনের কোণে তখন জাত্যাভিমানের কি একটা আগুন দাউ দাউ করে জলে উঠছিল। খাবার সময় মুখ ফিরিয়ে রক্ত চক্ষু করে ডাক্তারের

ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকাতাম আর মনের ভাব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। কোনমতে খাবার খেয়ে এবং দু একটা মিষ্টি কথা বলে, দেশের ভাই ডাক্তার সাহেবের কাছ হতে বিদায় নিয়ে যেখানে বড় বড় কাফে রয়েছে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেদিন দূর থেকেই কাফে ঘরগুলি দেখে মনে করে রাখলাম, এসব ঘরে কয়েকদিনের মাঝেই আসতে হবে এবং লোকচরিত্র পাঠ করতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি ফিরছিলাম গরীব গৃহে। মনে হল আমার উচিৎ একটা বড় হোটেলে গিয়ে থাকা। অর্থ থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম কিন্তু আমি দরিদ্র। দারিদ্র্য অনেক সময় অনিচ্ছায় এসে যায় তখন মনকে ছোট না করে মনকে আরও বড় করতে হয়। আমিও খুব চেষ্টা করে মনটাকে বড় করে পথ চলতে লাগলাম। লোক চলেছে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে আর আমি চলেছি মামুলী কাপড় গায়ে দিয়ে, তাও ময়লা। কেউ আমার কাছেও আসতে চায় না। কয়েকজন দরিদ্র আমার কাছ দিয়ে গেল সত্য কথা, তারাও যেন আমাকে ঘৃণা করতে চায়। এর কারণ কি? বর্ণ বৈষম্যের কথা মধ্য ইউরোপে কোথাও নাই। তবে দরিদ্র এবং ধনীদের মাঝে কি এতই পার্থক্য? নানা চিন্তায় মাথা নুয়ে আসছিল। ঘরে এসে একদম উপরে গিয়ে একটা বাজে উপন্যাস পাঠে মন দিলাম, এমনি সময় আমার দরজায় একটি লোক করাঘাত করল। আমি দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম, আমারই পরিচিত সেই হল্যাণ্ডবাসী ডচ্ ম্যান আমার সামনে দাড়িয়ে হাস্‌ছে।

[ক্রমশঃ]

স্নেহের বন্ধুরা!

দেখতে দেখতে এসে গেল শীত। বাতাসে সে মধুস্পর্শ নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, হাড়ের ভিতর কাঁপুনী ধরিয়ে দেয়। প্রকৃতির সমস্ত চেহারা বদলে যেতে সুরু করেছে: সবুজের মাঝে দেখা দিয়েছে পীতের আভা, প্রকৃতির মধ্যে আর্দ্রতা কমে আসছে। প্রকৃতির শ্যাম সমারোহের মাঝে দেখা দিচ্ছে কৃশ করুণ বিবর্ণতা। কিন্তু এই কৃশ করুণ বিবর্ণতা, এই শূণ্যতা, এই রিক্ততা কি প্রকৃতির শেষ ছবি? এই শূণ্যতা, রিক্ততা, বিবর্ণতার পিছনে ক্রমে জাগবে বসন্তের সমারোহ, ফলে ফুলে গন্ধে বর্ণে সমস্ত প্রকৃতি উঠবে ভরে, নয় কি?

আমাদের জীবনে রাত্রির দুঃস্বপ্ন এখনো কাটেনি। কৃশ করুণ বিবর্ণতা, রিক্ততা, শূণ্যতা জাতির সমস্ত অবয়বে। মনে হয় এই শূণ্যতা এই রিক্ততাই মৃত্যু···এই শেষ! কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সমস্ত শাখায় ফোটে ফুল ফল, গাছ তার মূল দিয়ে তার পাতা দিয়ে মাটি আর

বাতাস থেকে খাবার সংগ্রহ করে তা সঞ্চারিত করে তার শাখা প্রশাখায়—তারই মধুস্পর্শে শাখায় শাখায় ফোটে ফুল শীতের সমস্ত জীর্ণতা রিক্ততাকে এড়িয়ে।

আমাদের জাতীয় জীবনে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে না?···

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (১৫১৫) আজমীর। আমায় তুমি ভুল বুঝেছ। তোমাদের কি আমি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পারি? দেশের দুঃসময়ে বাংলার ছেলেমেয়েদের এমনিভাবে চিঠির ভিতর দিয়ে আহ্বান জানিয়েছি তোমরা সাহায্য করার জন্য। তোমাদের ব্যঙ্গ করতে পারি কেমন করে একথা মনে হলো বলো তো? **অপূর্ব্ব লাল মজুমদার** (১৭৮৩) কৃষ্ণনগর। তোমার অমনোনীত রচনা যাতে তোমার কাছে ফেরত যায় সেজন্য পরিচালক মশাইকে জানিয়েছি। **হীরক ও মীরা লাহিড়ী** (১২৮৩) কলিকাতা। আর একটি শ্রাবণ সংখ্যা পাঠান হয়েছে পেয়েছ তো? তোমাদের অবিশ্বাস করবো কেন? এ পৃথিবীতে যদি বিশ্বাস কাউকে করতে হয় তাহলে ছোটদের আসন সবার আগে। **বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১২৮৭) কলিকাতা। আশা করি ইতিমধ্যে সেরে গেছ। যে প্রশ্নগুলো করেছ আরও একটু স্পষ্ট করে লিখো—সম্ভব হলে উত্তর দেবো! **বনলারাণী গাঙ্গুলী** (১৪০৬) শ্রীহট্ট। উত্তর পাওনি বলে রাগ করেছ। সব সময় পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, স্থানাভাবও বটে আর উত্তর দেবার কিছু থাকে না বলেও। যাহোক ভাই রাগ করো না, এটা বোধহয় বোকামো নয়। সে বিষয় জানাতে চেয়েছ ইন্দিরাদিকে জানাতে বলেছি, উনি তা জানাবেন বলেছেন। লেখনী পেতে হলে ৵১৫ ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। **লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত** (২০১৪) জোতকেশব। তোমায় অভিনন্দন জানালাম। তোমার নালিশ সদরে অর্থাৎ পরিচালক মশাইএর কাছে পাঠিয়েছি। ঐ সংখ্যাগুলি যদি থাকে আগে তোমার কাছে পাঠান হবে। খুসী তো? **শান্তিরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার** (২০৩১)। কই পুরো ঠিকানা দাওনি কেন? প্রতিযোগিতা নেই দেখে অনুযোগ করেছ—শিগ্‌গির যাতে প্রতিযোগিতা হয় তার ব্যবস্থার জন্য পরিচালক মশাইএর কাছে দাবী করেছি। কবিতা বিচারকের কাছে পাঠিয়েছি। **রবীন্দ্রনাথ** চৌধুরী (১৫২৫) খাগড়া। ছাপার ভুলে রবীন্দ্রনাথ হওয়ায় তোমার দাদা নিজের নাম দেখে গর্ব্বিত? জ্বর অসুখ করলে তোমার হয়ে দাদাকে খানিকটা তেতো ওষুধ খাইয়ে দিও—শোধবোধ হবে—কেমন? পত্রবন্ধুরা নিশ্চয় যাবে—তিন পয়সার ডাকটিকিট পাঠাও। **প্রীতিকণা কর**—কাঁকুড়া গ্রাঃ?। খুব বকে দিচ্ছি কিন্তু—গ্রাঃ নম্বর নেই বলে। নিশ্চয় বোনেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। **অশোকচন্দ্র গুহ** (১৭১৩) বরিশাল। চিঠি আর লেখা পেলাম। সুশীল মণ্ডল (টালিগঞ্জ) যেকথা বলেছ সে সম্বন্ধে তুমি আমার মতামত জানিয়েছ—একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে ভাই। তবুও জানাবার চেষ্টা করেছি। **মনোরঞ্জন রায়** (দিল্লী) **কৃষ্ণ মিত্র, সাধনচন্দ্র বসু** (কলিকাতা) **জ্যোতির্ম্ময় দাস** (১৯১৭, সম্পাদক মশাইকে লেখা)। **বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী** (কলিকাতা) **সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** (বোলপুর) **রণজিৎ ঘোষ** (জজনি) **বিণামালা** (ভবানীপুর), তোমাদের চিঠি পেয়েছি।

কথা ও কাজ—

তোমরা ছোট হলেও তোমাদের করা কাজ ছোট নয়, এর গুরুত্ব অনেকখানি। দেশের দুর্দ্দিনে তোমরা ছোট বলে হাত পা গুটিয়ে নির্জ্জিবের মত বসে থাকনি, এ দেখে আশ্বস্ত হলাম। তোমাদের কথা ও কাজের মধ্যে পেলাম তোমাদের প্রাণের স্পর্শ।

"আমরা একটা সঙ্ঘ গড়েছি। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে রিলিফ কিচেনএ সাহায্য করছি। রংমশালের

বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছি—সবাই একহাতে হাত মেলাও। আমাদের দেশকে আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি...
—**রণজিৎ ও দুলাল বিশ্বাস** (১৯২৫) চট্টগ্রাম।

'এতদূরে থেকে যা করতে পারা যায় তার কিছুই ত্রুটি হয়নি দিদিভাই। তবে সে বিষয় বিজ্ঞাপ্ দেওয়া আমি সবচেয়ে বড় কাজ মনে করি না। শুধু এটুকু লিখলেই যথেষ্ট হবে যে যারা বাংলার বাইরে থা তারা বাংলাকে বাংলার লোকেদের চেয়েও কম ভালবাসে না···'—**নীলিমা চক্রবর্ত্তী** (১৫১৫) আজমীর।

'তুমি জেনে সুখী হবে আমরা ছাত্রেরা মিলে একটা রিলিফ কমিটি খুলেছি। আশীর্ব্বাদ করো নবীন উদ্যম নিয়ে আমরা এই উদ্যোগী হয়েছি তাতে যেন কৃতকার্য্য হই।'—**কান্তি ঘোষ** (১৮৫৯) নোয়াখালী।

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি—

সুশীলকুমার মণ্ডল গত মাসে যেকথা বলেছিল, তার প্রত্যুত্তর তোমাদের কয়েকজন ভাই যা জানিয়েছে সেগুলি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।—'আজকাল প্রত্যেক দৈনিক ও মাসিক পত্রে একটি করে ছোটদের আসরে উৎপত্তি হয়েছে এবং এটা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। কারণ সেই আসরের যিনি পরিচালক তিনিই তোমাদের পারেন অনুসন্ধিৎসু কিশোর মনের প্রশ্নের প্রকৃত খোরাক এবং এরূপভাবে নানাশিক্ষার মধ্যে কিশোরের মন বলি হয়ে গড়ে উঠতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কিশোরের নাম নিয়ে সমস্ত ছোটদের আসরেই যুবক প্রৌঢ়রা এসে হানা দিয়েছেন, আমার মনে হয় পরিচালকদের কঠোরনীতি অবলম্বন করা উচিত।'—**জ্যোতিষ্ম ঘোষ দস্তিদার** (১৯১১) শ্রীনগর।

'ছোটদের যেসব কাগজে ছোটদের জন্যে বিশেষ বিভাগ খোলা হচ্ছে তাদেরকে আমরা বাদ দি পারি। যেহেতু তাঁদের পত্রিকা ছোটদেরই এবং শিশুসাহিত্যের সেবাই তাঁদের লক্ষ্য। তাই তাঁদের বিরু বলবার বিশেষ কিছু আমাদের থাকতে পারে না। কিন্তু অনেক **বড়দের** মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনি পত্রিকায়ও আজকাল ছোটদের জন্যে আলাদা বিভাগ বসছে। অবিশ্যি এতে আমাদের আনন্দিত হবারই কথা কারণ ছোটরা যে আজ আর বড়দের কাছে উপেক্ষিত হচ্ছে না এবং তাঁরা যে তাঁদের পাশে আমাদেরও বস একটু ঠাঁই দিয়েছেন এতে করে বাঙলার কিশোর সমাজেরই প্রতিষ্ঠা বলবান্ হচ্ছে। কিন্তু অনেক ব্যাপারটা দাঁড়ায় বুড়োদের তামাকের আসরে বা খেলাধূলার আসরে ছোট ছেলের নিতান্ত বেহায়া উপস্থি মতই। এমন অনেক পত্রিকায় ছোটদের আসর আছে যেগুলিতে সিনেমা তারকাদের বিশিষ্ট ভঙ্গীর ছবি এ বড়দের উপযোগীই কেবল গল্প ও আলোচনার পাশেই ছোটদের নৈতিক আদর্শের কথা শোনানো হচ্ছে। সব আসরেও এক একজন দাদা বা দিদি আছেন, তাঁরা চিঠিপত্রও লেখেন, উত্তর দেন, সঙ্গে নানা উপদেশও তবুও এদের সঙ্গে কেন জানিনা ঠিক তেমনতর ঘনিষ্ঠতা আমরা করে উঠতে পারি না যেমনি পারি নি শিশুসাহিত্যের পত্রিকারই দাদা, কাকা বা দিদিদের সঙ্গে। এই যে আত্মীয়তা, এর পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য আ সেটা নষ্ট হচ্ছে। ক্রমে এইসব অবিবেচকদের লাভের ও লোভের তাড়নায়, এতে কিছু ক্ষতি যে হবে শিশুসমা এটা ত জানা কথা। তবুও বলি সুশীলকুমার মণ্ডলের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই; কারণ ছোটদের এ আসর যত বেশী হবে ছোটদের জ্ঞানের উৎকট সাহিত্যিক স্পৃহা ও সামাজিক ও নৈতিক বোধ ততই জাগ্রত যেখানে যে উদ্দেশ্যেই এরূপ প্রচেষ্টা হোক্, এর ফলে শিশুসাহিত্যের চর্চ্চা ও শিশুদের মধ্যে যে সাহিত্যিক চ প্রসরণ হয় একথা অনস্বীকার্য।—**অশোকচন্দ্র গুহ** (২০৪৩) বরিশাল।

তোমরা মতামতগুলি পড়ে তোমাদের মতামতও জানিও। স্নেহ ও শুভাশীষ নিও। ইতি, তোমাদে

দিদিভা

চলতিকা

জার্ম্মাণরা রুশ রণাঙ্গনে করেকদিন যাবৎ ভীষণ পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। জিতোমির-ফাষ্টভ রণভূমিতে দেড় লক্ষ সৈন্য ও কয়েকশত ট্যাঙ্কযোগে তারা এই আক্রমণ প্রসার করতে চেষ্টা করছে। আসল উদ্দেশ্য—নীপার নদীর বাঁকে ফাষ্টভ-ওডেসার যে ফাঁকটি আছে তাকে খোলা রাখা, যাতে পালাবার পথ না বন্ধ হয়। সোভিয়েট লাল সেনা কয়েকটি ঘাঁটি (জিতোমির) পরিত্যাগ করেছে বটে কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন এলাকাও যেমন করোস্তেন, রেচিৎসা প্রভৃতি দখল করেছে। তারপর, গোমেলে জয়লাভের পর লালফৌজ ঝলোবিন জংসনের (লেনিনগ্রাদ-ওডেসা রেলপথে) কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। নীপার ও নিকোপোলের বাঁকে রুশ সেনা নূতন আক্রমণ শুরু করেছে। গোমেলের দক্ষিণে ও ক্রিশেভের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। শীত পুরোপুরি না পড়া পর্য্যন্ত রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ তীব্রভাবে চলবে বলেই মনে হয়। জার্ম্মাণ সৈন্য রুশভূমির এই আসন্ন শীতকে অত্যন্ত ভয় করে, অপর পক্ষে রুশ সৈন্য এই শীতকে অভিবাদন করবে।

লণ্ডনে ২৭শে নভেম্বর এক খবরে প্রকাশ যে জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনের ওপর ৮ দিনে মোট ৬ হাজার টনেরও বেশী বোমা ফেলা হয়েছে। বোমারু বিমান বহরের শত শত বিমান এই ধ্বংস কার্য্যে যোগ দিয়ে বার্লিন ও অন্যান্য অঞ্চলের ভীষণ ক্ষতি করে জার্ম্মাণীকে বিপর্য্যস্ত করেছে। এই অতি বিরাট আক্রমণে কয়েকটি বৃটিশ বিমানও নিখোঁজ হয়। বারবার বিমান আক্রমণে জার্ম্মাণীকে কাবু করা, জার্ম্মাণীর কলকারখানা অচল করা ও জার্ম্মাণীকে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে বিপর্য্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করে তাদের মেরুদণ্ডে আঘাত হানাই হল এই বোমারু বিমান বহরের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ও কলিকাতার জনসাধারণকে খাওয়াবার দায়ীত্ব নিয়েছেন ভারত সরকার এবং সেজন্য ১৯৪৪ সালে বাংলায় ৬২৬০০০ টন খাদ্যশস্য পাঠাবার ব্যবস্থা হবে বলে জানা গিয়েছে। বাংলায় প্রতি বছর ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, এবার ১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে বলে তাঁদের আশা। কিন্তু এদিকে শোনা যাচ্ছে যে আমন ধান কাটার জন্য কৃষক মজুরদের অভাব ঘটছে। এ সম্পর্কে শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে, ১৯৪৪এ আশানুরূপ আমন ধানের অভাব ঘটতে পারে। বর্ত্তমানে বাংলার সমস্ত আশা ভরসা হল—এই আমন ধান। এবং যথাযোগ্য মূল্যে এই আমন চালের বিলিব্যবস্থায় বাংলার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। এখন বাজারে চালের দাম যথেষ্টভাবে এবং অবিলম্বে না কমলে এবং দেশের লোক কম দামে উপযুক্ত পরিমাণে চাল না পেলে অনাহারে এবং অনাহারজনিত নানা ব্যাধিতে আরো লোক মারা পড়তে থাকবে।

এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চলাচলের বিস্তর অসুবিধা দেখিয়ে বিজ্ঞানসেবীদের নিরাশ করেছেন। কাজেই ত্রিবাঙ্কুরের পরিবর্ত্তে দিল্লীতে এবার সায়েন্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ও আহ্বানে। এবার সায়েন্স কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত সরকার বিজ্ঞানের খাতিরেও তাঁকে একদণ্ড ছাড়তে পারে না। যা হোক, জওহরলালের অনুপস্থিতিতে আর একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। ইনি স্বনামধন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পদার্থবিদ্যার গবেষণাক্ষেত্রে আয়েনষ্টাইনের সঙ্গে এর নাম বিজড়িত। এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় সভাপতিমণ্ডলের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য। গণিত—বি, এম সেন ; পদার্থবিদ্যা—ডি, এস কোঠারি ; রসায়ণ—আর, সি রায় ; ভূতত্ত্ব-ভূগোল—এ, এস্ কালাপেসি ; উদ্ভিদ—টি, এস্ সাবনিস্ ; প্রাণীতত্ত্ব—ভি, নাথ ; নৃতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্ব—ভি, এলয়ুইন ; চিকিৎসা—কে, কৃষ্ণান্ ; কৃষি—ডি, বাল্ ; শরীরতত্ত্ব—এস্, মাথুর ; মননশিক্ষা—জে, সার্জ্জেন্ট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং—জে, ঘান্ধী।

আগামী রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সঙ্গে বিহার দলের খেলা ১৮ই ডিসেম্বর থেকে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে। দুঃখের বিষয় এখনও বাংলা দল নির্ব্বাচিত বা গঠিত হয় নি। এ সম্পর্কে অবশ্য গোটা দুই ট্রায়াল খেলা হয়েছে কিন্তু তাতে আমরা কয়েকজন নাম-করা খেলোয়াড়দের দেখতে পাই নি। অনেকের ধারণা যথাযথভাবে ভালো খেলোয়াড় নির্ব্বাচন না হলে বিহারের কাছে বাংলা দলের হেরে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমরা আশা করি বাংলার দলে ভাল বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের যেন বেশী দেখা যায়। সমস্ত দলটাই যদি বাঙ্গালী খেলোয়াড় হয় তা হলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে।

সম্প্রতি আগ্রা, পাটনা ও এলাহাবাদ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসবে যথাক্রমে পণ্ডিত অমরনাথ ঝা, ডাঃ জয়াকর এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের অভিভাষণ প্রদান করেছেন। একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে তিনটি অভিভাষণেই যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষাদীক্ষার পরিকল্পনা হওয়া উচিৎ তার আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে শিক্ষার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী, সেই শিক্ষা যাতে সুষ্ঠু হয়, সকলেই ধনীদরিদ্র জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যাতে সেই একই শিক্ষা পায় এবং যাতে তাদের শিক্ষা জাতীয় কল্যাণে কার্য্যকরী হয় সেইরূপ ভাবী আদর্শ শিক্ষানীতি যেন আমাদের দেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় একটা বড় স্থান পায়। অভিভাষণগুলির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষার বিষয় হল, ছাত্ররা যেন দেশের এই বিরাট ভূখণ্ডের মাঝে নানা বৈচিত্র্যেও যে পরম একত্ব রয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখেন। আমরা তোমাদের অভিভাষণগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি।

তুরস্কে গত ২৭এ নভেম্বর যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তার ফলে প্রকাশ, প্রায় দু' হাজার লোক মারা গিয়েছে এবং আরো দু' হাজার আহত হয়েছে।

লণ্ডনে গত ২৮এ নভেম্বর ট্রাফালগার স্কোয়ার গির্জ্জায় ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে এক বিরাট প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতের দুর্ভিক্ষের জন্য শোকপ্রকাশ করা হয়। প্রার্থনা শেষে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ লেখক ও ঐতিহাসিক এমিল্ লাড্উইগ্ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে আগামী ৪ মাসের মধ্যেই নাকি ইউরোপের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

নূতন ধাঁধা

নিম্নলিখিত ব্যাপারটি শুধু যে, কমা, দাঁড়ি, জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রভৃতি বাদ গিয়েছে তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন কথাগুলির মধ্যে কোন ফাঁকও নেই এবং সবশুদ্ধ ১৬টি অক্ষর বাদ। ভাল করে পড়লে, দেখবে—১ম অক্ষর এবং প্রথম থেকে প্রত্যেক নবম (৯নং) অক্ষরটিই বাদ গিয়েছে। এখন, তোমাদের ভীষণ কাজ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ১৬টি অক্ষর তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনা, কথাগুলিকে এর ওর ঘাড় থেকে সরানো এবং কমা, দাঁড়ি, জিজ্ঞাসার চিহ্ন ইত্যাদি দিয়ে ব্যাপারটিকে ধাতস্থ ও অর্থপূর্ণ করা :—

খনকোনবড়বানেরভিতরেবেঁড়িয়েডাইতখনআমরাদেখিদেখিলালনীললাপীবেগুণীহলদেসাদারং রের এফোয়ারাছুটিয়েফুটেছেথাকেথাকেকতরমেরফুলতাদেরকাকেদেখেমনেহয়রাধনুকেরবাণভরাণকারুর উপরদিবয়েযাচ্ছেরূপালীজোনারঢেউকারুরবুগড়াঠিকপ্রভাতীরোরকাঁচাসোনায়

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১), (১)—বানর, বারণ ; (২), (২)—বাতিল, বালতি ; (৩), (৩)—সজীব, সবজী ; (৪), (৪)—জাম, মজা।

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

যশোধন ভট্টাচার্য্য, বাঁকুড়া ; সত্যব্রত ব্যানার্জ্জী, হুগলী।

একটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

সাধচন্দ্র বসু, কলিকাতা ; শক্তিরঞ্জন ঘোষদস্তিদার, ঢাকা ; কিশোর-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ, চট্টগ্রাম ; গুণধর বেরা, মেদিনীপুর।

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

প্রদ্যোত, প্রভাত, প্রভাস, ছবি, রেখা, প্রবোধ, শ্রীনিভাষণ, নিতাই, কালু, কলিকাতা ; রবীন্দ্রমোহন মৈত্র ও সতী মৈত্র, রাজসাহী ; গুণধর বেরা ও শ্রীচরণ মাইতি, মেদিনীপুর ; রেখা বসু, শান্তিনিকেতন ; বিনীতা ঘোষ, হাসি, বাবলু ও মঞ্জু, কলিকাতা ; অপূর্ব্বলাল মজুমদার, কৃষ্ণনগর। (মাসের ১৫ইর মধ্যে যাঁরা নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছেন, কেবল মাত্র তাঁদেরই নাম এখানে প্রকাশিত হল।)

পৃথিবীর
মেঘলোক
নিখিল-ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)

দক্ষিণারঞ্জনের

পৃথিবীর
সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

ইহার পরাগনিন্দিত সূক্ষ্মতা ও মাতোয়ারা গন্ধে আপনারা ব্যবহার করিয়া সুখী হইবেন ! শুধু সামান্য একটু পাফে করিয়া লাগাইয়া দেখুন আপনার বর্ণে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে !

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত ও নানাবিধ রঙে যথা ন্যাচারালে, র‍্যাচেল নং ১ ও ২ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গশাল

অষ্টম বর্ষ
(১০)

মাঘ
১৩৫০

কাঞ্চনমালা

রঞ্জিতভাই

কথা কয়োনা না চুপ কোরে শোনো।

নীল আকাশের কোল ঘেঁষে মলয়পুরের পাহাড়—সামনে—অনেক দূরে—ঐ পাহাড়ে রক্তপলাশের বন। সেই বনের যে-চপল ঝর্ণা, তারই এক পাশে সবুজ ঘাসের স্বপ্নশয্যা .....

আস্তে আস্তে পা ফেলো—এসো আমার সংগে—এইদিকে—কাঞ্চনমালার ঘুম ভাঙিও না কিন্তু। চুপ কোরে শোনো : সবুজ গল্প, সবুজ নিশান···সবুজ এক স্বপ্নদেশ·····

ছোট্ট মেয়ে কাঞ্চনমালা। ফুলবনে গান গেয়ে, মৌ-বনে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে··· কাঞ্চনমালা স্বপন-পরীর পাখনা মেলে অসীম আকাশ বনে তারাফুলদের ঘুম পাড়ায়·····আর কুহু মি কোরে ডাকে : কুহু ! কুহু ! কুহু !

একদিন পথভুলে কাঞ্চনমালা এসে পড়লো রতনগড়ের সীমানায়।

রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় শোনা গেলো এক জ্যোৎস্না রাতে : কুহু ! কুহু ! কুহু !

সারা দেশময় সাড়া পড়ে গেলো। এম্নি সব আশ্চর্য্য কথা কেউ কোনদিন শুনেচে ?

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে চুণি-পাথর-হীরা-মাণিক এনে তৈরী হোলো রতনগড়ের রাজপ্রাসাদ, নীল আলোর ঝালরে সর্বদা যেন ঝলমল্ কোরচে—স্বপনপুরীর শংখমালার মতো। মহারাজ জয়সিংহের দুর্দান্ত প্রতাপে দেশের চাষা-মজুর থেকে নিয়ে রাজ্যশুদ্ধু লোকেরা সুখে-শান্তিতে বাস করে। কেন, মনে নেই ? সেবার মলয়কেতুর সংগে যুদ্ধ বাধলো যেম্নি

রতনগড়ের—অগ্নি হাজার হাজার আশ্রয়হারা প্রজা অনুমপা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রতনগড়ের জয় হোলো—কিন্তু সেই সব মানুষের স্মৃতি অনুমপার গর্ভে কোথায় মিলিয়ে গেলো!

এম্নিতরো যে দেশ রতনগড়—সেই দেশে আজ সাড়া পড়ে গেছে। আশ্চর্য্য, এ সব গল্প কেউ কোনোদিন শুনেচে? যদি না শুনে থাকো, আমার কাছে শোনো।

মহারাজের চোখের পাতায় নেমে এসেচে সকাল-মৃত্যুর ঘুম। মনে চিন্তার লে নেই—বয়সের সংগে সংগে মনের কোণেও পাক ধরেচে। রতনগড়ের রাণা হবে কে মহারাজ ভেবে কোনো কুলকিনারা পান না। চন্দ্রকেতুর ছেলে দুষ্মন্ত? সেই শয়তানের বাচ্চা না-না-না—। এম্নি সময় রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় কাঞ্চনমালা দুষ্টুমি করে ডাকে: কুহু! কুহু কুহু!—কে? কে এমন কোরে গান গায়? এই জ্যোস্না রাতের বিজন ধারায় কে আমা ডাকলো? মহারাজ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বাইরে নীল জোছ্না পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুমি আছে—সুন্দর নির্মেঘ আকাশ।

—কুহু! কুহু! কুহু!—আবার সেই গানের সুর ভেসে এলো।

মহারাজ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের ঐ চন্দ্রমল্লিকার দিকে···একি সত্যি স্বপ্ন না স্বপ্নের চেয়ে আরো আশ্চর্য্য গল্প?

—কুহু! কুহু! কুহু!—জয়সিংহের জয় হোক! ভোরের পাখীর মতো দূরের ঐ কাঞ্চনমালা গানের সুরে বললে: কুহু! কুহু! কুহু!

মহারাজ চেয়ে দেখলেন এক অপরূপ সুন্দরী নীল আকাশের পরী—গায়ে রূপো পাখনা দুটি চিক্‌মিক্ কোরচে। চাঁপাফুলের মতো ফুটফুটে রং—কাজলটানা চোখে স্বপ্নে আবেশে—অপূর্ব দেহলীতে স্বপ্নবিভোর গান! স্বর্গের কোন্ পারিজাত বনের মেয়ে পথভু নেমে এসেচে এই মাটির পৃথিবীতে? পরীর দেশ—স্বপ্নের দেশ। তারা কোনোদিন আ না এই আমাদের পৃথিবীর খেলাঘরে! তবে? মহারাজের চোখে পলক পড়ে না।

—আমাকে চিনতে পারচো না মহারাজ? কাঞ্চনমালা বললে।

—কই না? মহারাজ উত্তর দিলেন!

—আমি কাঞ্চনমালা। আকাশের তারাফুল আমাকে পাঠালে তোমার কাছে, তারা বললে—

—কী বললে? মহারাজ ব্যাকুল প্রশ্ন করেন।

আকাশের তারাফুল বললে: কী সুন্দর এই রাজপ্রাসাদ—কী সুন্দর এই তো দেশ রতনগড়—যাও বন্ধু ফিরে যাও সেই স্বপনপুরীতে·····

আমার দেশে তুমি আসবে কাঞ্চনমালা? কে তুমি? আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে তুমি আসবে?

—কেন, আমাকে আশ্রয় দেবে না?—দুষ্টুমি কোরে হেসে কাঞ্চনমালা বললে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয় দেবো! এসো ভাই এসো—আমার এই রতনগড় আজ ধন্য হবে—নীল আকাশের পরী এসেছে রতনগড়ে।—এসো—এসো আমার ঘরে·····

কাঞ্চনমালা পাখ্‌না মেলে গান গাইলো। কী মধুর সেই স্বপ্নময় গানের সুর! মহারাজ ঘুমিয়ে পড়লেন। আর ওদিকে বনমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা—বনমালার দল জেগে উঠলো। কাঞ্চনমালার গান শেষ হোলেও সে-সুর তখনো বাতাসের পর্দায় রিন্‌রিন্ কোরে বাজচে।

কাঞ্চনমালা বললে: কিন্তু মহারাজ তুমি ছাড়া দুনিয়ায় একথা আর কেউ জানবে না!

—বেশ তাই হবে। মহারাজ কথা দিলেন।

—আমায় যদি কেউ, পৃথিবীর মানুষ যারা, লুকিয়ে দেখে নেয়, আমি সেই মুহূর্ত্তে নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাব। কাঞ্চনমালা বললে।

—আজ থেকে তুমি আমার বন্দী: মহারাজ ডাক দিলেন—চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু!

—না-না মহারাজ, কাঞ্চনমালা বলে উঠলো: একমাত্র তুমি ছাড়া সাতরাজ্যের কোন লোক আমার কথা জানবে না। দিনে দিনে আমি আকাশবনে মিশিয়ে যাব, আর জ্যোস্নার আলোয় নেমে আসব এই রতনগড়ের দেউড়ীতে·····কেমন?

কিন্তু কে কার কথা শোনে? মহারাজ আনন্দে দিশেহারা হয়ে ডাক দিলেন: চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু! তোমরা সবাই শোনো! আমার রতনগড়ে আজ নীল আকাশের পরী কাঞ্চনমালা এসেচে। সাত রাজ্যের মুক্তো মাণিক এনে তৈরী কোরেচি এই রাজপ্রাসাদ—কোন দেশের লোক এমন কথা শুনেচে? মানুষের ঘরে পরী আসে? ওগো তোমরা শোনো: রতনগড়ের ইতিহাসে আজ এক স্মরণীয় দিন—তোমরা এসো—এসো—

মহারাজ পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বেগতিক বুঝে কাঞ্চনমালা মনের দুঃখে মলয়পুরের দিকে উড়ে চললো·····

পরদিন ভোরে রতনগড়ে সাড়া পড়ে গেলো। দেশশুদ্ধু লোক অবাক হয়ে ভাবে: এমন কথা কেউ কোনোদিন শুনেচে?

মহারাজ আদেশ দিলেন: চন্দ্রকেতু! সাতরাজ্যের লোককে খবর দাও—কাল থেকে রতনগড়ে আনন্দ-উৎসব সুরু হবে।

চন্দ্রকেতু অবাক হয়ে বললে: সেকি মহারাজ!

মহারাজ বললেন: আমার হুকুম। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে চাই না···

তারপর দলে দলে শিশু-কিশোর···ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে··· আর এলো গরীব চাষা-মজুর, সেপাই-সান্ত্রী আর সওদাগর। সবাই আজ নিজের জীবনকে সার্থক করে নেবে!

মহারাজের আনন্দের সীমা নেই। সমস্ত জগতের লোক যা—কোনোদিন জানেনি,

শোনেনি—আজ তারা রতনগড়ে চলে আসুক……দেখে যাক এই আনন্দ উৎসব। কিন্তু কাঞ্চনমালা কই?

চন্দ্রকেতু এদিকে দুষ্মন্তকে ডেকে বললে: আজ রাত্রেই কাঞ্চনকে সরিয়ে ফেলতে হবে……

দুষ্মন্ত অবাক হয়ে গেলো। বললে: কেন? তাতে আমাদের লাভ?

চন্দ্রকেতু বললে: তা হোলে মহারাজ পাগল হোয়ে যাবেন নিশ্চয়…আর সেই অবসরে……

বাকী কথাটা বুঝে নিলো দুষ্মন্ত।

সেইদিন ভোরবেলা রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে অসম্ভব রকম ভীড় জমায়েৎ হোলো। সেপাই-সান্ত্রী ছুটে এলো, হাতীশালার হাতী হেলতে-দুলতে মাহুতদের হাওদায় নিয়ে এলো …আর এলো মাথায় রঙীন পাগ্‌ড়ী আঁটা দুরন্ত ঘোড়সওয়ার। সে একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড! রাজ্যের লোক এসে হাজির।

এম্নি সময় মহারাজ সেই ঘরে এসে চমকে উঠলেন! সারা শরীর অবশ হয়ে এলো …চোখের পাপড়ি বুঁজে এলো…কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন সেইখানে। এও কি স্বপ্ন? মহারাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুধু চেয়ে রইলেন কাঞ্চনমালার দিকে……কিন্তু কাঞ্চনমালা কই?

সেই সময় চন্দ্রকেতু এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরের মেঝেয় এক অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারীর পাথরের মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে আছে! মহারাজের চোখে জলের বন্যা।

চন্দ্রকেতু মুখ টিপে হাসলো।

মহারাজ উন্মাদের মতো বললেন ফিরে যাও চন্দ্রকেতু…আমার সামনে থেকে চলে যাও, বন্ধ কোরে দাও এই আনন্দ-উৎসব…যাও-যাও—!

চন্দ্রকেতু ফিরে এলো।

প্রহরী রাজফটকের কাছে এসে ঘোষণা জানালো: মহারাজের হুকুম—সবাই ঘরে ফিরে যাও…উৎসব বন্ধ করো।

—কেন?—কেন? কি হোলো? সবার মুখে এই এক প্রশ্ন।

প্রহরী শুধু বললে: মহারাজের আদেশ। দেশ শুদ্ধু লোক কালো মুখ কোরে ঘরে ফিরে গেলো।

দিন নেই, রাত নেই—মহারাজ জয়সিংহ প্রলাপ বকেন: কাঞ্চনমালা! কাঞ্চনমালা! চন্দ্রকেতু মনে মনে খুসী হয় বৈকি, অথচ বাইরে কিছু বলে না।

একদিন দুষ্মন্ত বললে: বাবা! মহারাজ পাগলের মতো দিনরাত ছুটে বেড়ান—আর ডাকেন: কাঞ্চনমালা! কাঞ্চনমালা! এই সুযোগ…

চন্দ্রকেতু বললে: না। আরো কিছুদিন যাক্। তারপর সাবাড় করা যাবে……! দুষ্মন্তের মনে আর আনন্দ ধরে না। এবার সে হবে রতনগড়ের রাজা!

* * * * *

ফিরে এসো রতনগড় থেকে। মলয়পুরের পথে যেতে যেতে কাঞ্চনমালা ক্লান্ত হয়ে বসলো এসে এক বটছায়ার নীচে—। বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী, সেই নদীর ঘাটে বসে কাঞ্চনমালা গান গাইতে লাগলো: জাগো! জাগো! ওগো আমার বকুলবনের বন্ধুরা……। এদিকে বনের মাঝ বরাবর যে মেঠো-পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে কোন্ এক অজানা তেপান্তরের মাঠের দিকে—সেই পথ বেয়ে ছুটে এলো এক ফুটফুটে নয়নতারার মতো মেয়ে—আদুল গায়ে বনফুলের মালা, কপালে রক্তচন্দনের টিপ্, মাথায় চাঁপার গুচ্ছ! একটুখানি মৃদু হেসে কাঞ্চনমালার গলায় পরিয়ে দিলো দোলনচাঁপার মালা। তারপর কচি হাত দুখানা কাঞ্চনমালার গলায় জড়িয়ে মধুর স্বরে বললে: কি ভাই, আমায় চিনতে পারচো না? এই বলে হেসে উঠলো সেই বনের মেয়ে। কাঞ্চনমালা অবাক হয়ে জিগেস কোরলে: কে ভাই তুমি?

বনের মেয়ে বললে: আমি বনের মেয়ে, আমার নাম বনমালা। বনে বনে ফুলের মধু খেয়ে বেড়াই—আমার শুকনো পাতার খেলাঘরে মৌমাছিরা এসে গান গায়। তুমি যাবে সেখানে কাঞ্চনমালা?

—আমায় তুমি চিনলে কেমন কোরে? কাঞ্চনমালা অবাক হোয়ে গেলো।

—তোমায় চিনব না? বা—রে! বনমালা হেসেই আকুল: অমন যার সোণার বরণ দুধে-আল্‌তা গায়ের রং—সেই তো কাঞ্চনমালা!

সেই শুনে কাঞ্চনমালা খুসী হয়ে বনমালার গলে সেই দোলনচাঁপার মালা পরিয়ে দিয়ে বললে: আজ থেকে আমরা দুজন বন্ধু।

—উহু! বনমালা বললে: শুধু তাই বললে চলবে না। তুমি চলে গেলে আমি একা থাকব কি কোরে?

কাঞ্চনমালা বললে: রইলো এই দোলনচাঁপার মালা। সাতদিন সাতরাতের পর শুনতে পাবে সাত রাজ্যের চমক্-লাগা খবর। সেদিন আমায় ভুলো না বন্ধু?

—কি, কি খবর? বনমালা ব্যাকুল প্রশ্ন জানালো।

—আজ বলব না। কাঞ্চনমালা হেসে বললে।

—কেমন কোরে জানব ভাই সেই সাত রাজ্যের খবর?

—সে আমি জানি না। কাঞ্চনমালা আকাশের গায়ে মিশিয়ে গেলো। (আগামীবারে সমাপ্য)

কেনারামের চিঠি

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

কেনারাম আমাদের ডাকবাক্সে
রোজ রোজ এসে ভাই চিঠি ফেলে যায়।
বাহির-দেয়ালে লাগা ডাকবাক্সটা।
সন্ধ্যে হলেই কেনারাম আসবে
চিঠি হাতে। আমি থাকি বসে' জানালায়।
এত চিঠি রোজ রোজ কাকে সে পাঠায়?

কেনারাম বুদ্ধির মত তার মোটা।
পোস্টাপিসের ডাকবাক্স না ওটা
বুঝতে পারে না মোটে। বেকুব্ বেজায়।
মামার সেবার কেন হোলো সখ্, সে
লাল রঙ্ লাগালো লেটার্-বক্সে,
তারপর সেই রঙ্ লাগল জামায়।

ঘাড় ধরে' করে' দিল দরজার বার
বাক্সটাকে। আর সেই থেকে হায়,
ঘরের বাইরে তার শোভাবিস্তার ঃ
কেনারামসম কানারামকে ঠকায়।
সন্ধ্যে হলেই কেনারাম আসবে
হাতে নিয়ে চিঠি আর কপালে রেখা।

আমি তো তখন বসে' থাকি জানালায়,
ভাবি ছুটে বলে' আসি রামকানাকে।
গিয়ে দেখি চলে গেছে। কোথা সে থাকে?
চিঠি ফেলে ছুট্ দেয়, যায় না দেখা।
ফিরে এসে আমি ভাই পড়া ভুলে যাই,—
এত চিঠি কাকে লেখে, কোথা সে পাঠায়?

কেনারাম যতই না বোকারাম হোক্,
উত্তর পাবার কি নেই তার ঝোঁক?
এত এত চিঠি লেখে উত্তর নাই!
তাহলে কি লেখে কেউ? লিখে সুখ পায়?
কেনারাম কেন এতে পায় যে আরাম—
বার বার চিঠি লেখে, চায় না জবাব?

এ কেনারামের ভাই অবাক্ স্বভাব!
আমার চিঠির যদি নেই উত্তর
দেয় কেউ, আমি বলি, থাক্, ধুত্তোর!
তক্ষুনি হয় উৎসাহের অভাব।
উত্তর কোথা তার নেই কোনো খোঁজ—
কেনারাম চিঠি লেখে, চিঠি ছাড়ে রোজ।

অবশেষে একদিন আমি দেখলাম
গায়েতে উর্দী আঁটা পোস্টাপিসের
উৎসাহে ঘোরাফেরা করে কেনারাম।
চিঠিপত্রের যত আদান-প্রদান
রহস্য আছে বুঝি পেতে সব টের,
কেনারাম কাজ নিল পোস্টাপিসের।

কাজ নিয়ে গোড়াতেই এল আমাদের
মোড়-ঘেঁষা বাড়ীটার বাহির ভাগে।
বাক্সে একটা চিঠি ফেল্‌ল আগে।
তারপরে বাক্সতে মারল সে টান্।···
সাতশো আটশো চিঠি এক সাথে লাভ
হোলো তার—যদিও তা একটি জবাব॥

কেমন ক'রে তোৎলামি সারে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গল্প

মেসের নতুন বেয়ারাটি তোৎলা—অসম্ভব রকম তোৎলা।

সেদিন সকালে অটল তাকে ডাকলে, "বনমালী—বনমালী!"

বনমালী বলতে চায় "হুজুর", কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুল খালি "হু-হু-হু-হু-হু-হু-হু—"

পটল বললে, "থাক্ বনমালী, থাক্। তুমি যা বলতে চাও বুঝেছি। আর কিছু বলবার চেষ্টা কোরোনা, আমার হৃৎপিণ্ড হোঁচট খাচ্ছে। তার চেয়ে কথা থামিয়ে কাজ কর দেখি! বিশু-ময়রার খাবারের দোকান চিনতে পারবে তো?" বনমালী বলতে গেল "পারব", কিন্তু বার-দশেক পা-অক্ষরটি উচ্চারণ ক'রে হতাশভাবে থেমে গিয়ে কেবল মাথা নেড়েই জানালে—হ্যাঁ।

অটল ও পটল তো হেসেই অস্থির, কিন্তু নকুল একবারও হাসবার চেষ্টা করলে না। বরং তার মুখ দেখলে মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে।

অটল বললে, "কিহে, বনমালীর আবৃত্তি শুনেও তোমার মুখে হাসির চিহ্ন নেই কেন?"

নকুল গম্ভীরভাবে বললে, "আমি হাসব কেমন ক'রে ভাই? আমি যে ভুক্তভোগী!"

পটল বললে, "তার মানে?"

নকুল বললে, "তখন তোমাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি ছিলুম ভয়ানক তোৎলা। হয়তো বনমালীরও চেয়ে।"

পটল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তোমার তোৎলামি সারল কেমন ক'রে হে?"

নকুল বললে, "সে এক ইতিহাস। শুনতে চাও তো বলতে পারি।"

অটল বললে, "নিশ্চয়ই শুনতে চাই।"

নকুল আরম্ভ করলে—

তোৎলামির জন্যে জীবনটা আমার ভারবহ হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের হাসি-কৌতুক, অপরিচিতদের বিদ্রূপ, আত্মীয়দের হাহুতাশ এ-সব ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোন নতুন লোক আমার সঙ্গে কথা কইতে এলেই, আমার মাথায় যেন ভেঙ্গে পড়ত আকাশ! অবশেষে এক বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলুম।

ডাক্তার আমাকে সুধোলেন, "আপনার কি দরকার?"

আমি বললুম, "আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—"

ডাক্তার বললেন, "কি বলতে চান, বলুন।"

—"আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—আ—"

ডাক্তার বললেন, "বুঝেছি। গান গেয়ে বলুন।"

—"গা—গা—গা—গা—গা—গা—গা—গান····· ?"

—"হ্যাঁ, গান গেয়ে।"

আমি হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলুম।

ডাক্তার বললেন, "প্রায়ই দেখা যায়, যে-সব তোৎলা মানুষ সাধারণ ভাবে কোন-কথাই বলতে পারে না, গানের সুরে কথা বলতে আর তাদের বাধা হয় না। আপনি যা বলতে চান, গান গেয়ে আমাকে বলুন।"

আমি গানের সুরে বললুম, "আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু তোৎলা ব'লে কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। বড়ই বিপদে পড়েছি ডাক্তারবাবু। আপনি যদি একটা উপায় বাৎলে দেন।"

ডাক্তার বললেন, "বিশেষভাবে কোন্ কোন্ কথা আপনার আট্‌কে যায়?"

আমি আবার গান গাইবার উপক্রম করতেই ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, "না আর গান নয়, আপনার বক্তব্য লিখে জানান।"

একখানি কাগজ নিয়ে পেন্সিলের সাহায্যে আমি আমার তোৎলামির কথা বর্ণনা করলুম।

কাগজখানা পাঠ ক'রে ডাক্তার খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বিশেষ শক্ত 'কেস্' নয়। এ-রকম 'কেস্' আমি আরোগ্য করেছি। আপনাকে একটি উপায় ব'লে দিতে পারি।"

আমি গান গেয়ে বললুম, "বলুন ডাক্তারবাবু! আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌ব।"

ডাক্তার বললেন, "তোৎলামি হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। তোৎলারা প্রায়ই মুখচোরা হয়। কথা কইতে গিয়ে, ভয় পেয়ে, থতমত খেয়ে তাদের কথা আট্‌কে যায়। আপনাকে কি করতে হবে শুনুন। প্রতিদিনই আপনি অন্তত তিন জন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের কাছে কথা কইবার চেষ্টা করবেন। তাহ'লেই দেখবেন, দিনে-দিনে আপনার কথা বলবার ভয় ক'মে যাচ্ছে, আর আপনার তোৎলামিও ক'মে যাচ্ছে একটু-একটু ক'রে।"

ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাঁর হাতে আটটি টাকা গুঁজে দিয়ে এই নতুন জ্ঞান নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন আমি দেশে থাকতুম। দেশে ফেরবার জন্যে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে ট্রেনের কামরায় উঠে বসলুম।

ডাক্তার যে উপায় বাৎলে দিলেন, সেটা আমার ঠিক মনের মত হ'ল না। স্বভাবতই আমার প্রকৃতি হচ্ছে লাজুক। চেনা-লোকের সঙ্গেই আমি কথা কইতুম খুব কম, আর অচেনা লোক দেখলেই হয়ে যেতুম ঠিক বোবা! ডাক্তারের উপদেশ মানতে গেলে এই সহরটি আমাকে বদলাতে হবে দেখছি। কঠিন কর্ত্তব্য!

কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। গাড়ী যখন ছাড়ে-ছাড়ে, হঠাৎ এক মহা ও বেজায় রগুা ভদ্রলোক কামরার ভিতর এসে উঠলেন।

ভাবলুম, এঁকে নিয়েই পরীক্ষা সুরু করা যাক্। কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোন ভরসাই পেলুম না—লোকটির যে-রকম গুণ্ডার মতন চেহারা! যদি চ'টে যায়?

কিন্তু আমার আগেই ভদ্রলোক বেঞ্চের উপর ব'সেই কথা সুরু করলেন, "কি—কি—কি—কি কি-রকম মেঘলা দেখছেন? আজ জ—জ—জ—জ জল না হয়ে ছা—ছা—ছা—ছা ছাড়বে না দেখছি।"

বিষম দ'মে গেলুম। এই তোৎলা ভদ্রলোকের কথার উত্তরে আমিও যদি তোৎলামি প্রকাশ করি,

তাহ'লে নিশ্চয়ই উনি ভেবে নেবেন, আমি ওঁকে ব্যঙ্গ করছি! দরকার নেই বাবা কথা কয়ে, শেষটা কি ঘুসি খেয়ে প্রাণে মারা পড়ব?

কিন্তু আমি জবাব দিলুম না দেখে ভদ্রলোক বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "কি—কি—কি—কি কি-রকম লোক আপনি? জ—জ—জ—জ জবাব দিচ্ছেন না যে ব—ব—ব—হ বড়? কা—কা—কা—কা লা বো—বো—বো—বোবা নাকি?"

বুদ্ধিমানের মতন তখনই ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম, সত্যিই আমি কালা ও বোবা।

ভদ্রলোক তখন ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, "আ—আ—আ—আ হা, কা—কা—কা—কালা বো—বো—বো—বো-বাদের কি—কি—কি—কি ক—ক—ক—ক কষ্ট!"

আমাদের দেশে যেতে গেলে মাঝে একবার গাড়ী বদলাতে হয়। যে-ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতে হবে, সেখানে নেমে দেখলুম ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে। 'প্লাট্‌ফরম্'এর উপরে পায়চারি করতে লাগলুম। তখন মেঘ কেটে গিয়েছে, আকাশ সুনীল। পায়চারি করতে করতে ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে পড়লুম। রাস্তায় কোন লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল না, জায়গাটি বড় নির্জ্জন। কোন অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে পড়লুম। এক-জায়গায় একখানি বাড়ী দেখলুম, তার ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—"পাগলা গারদ"।

আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। মাথায় তার কোন প্রতিমা থেকে খুলে-নেওয়া পুরাণো একটা মটুক্, গায়ে জড়ানো লাল-রঙের একখানা গামছা, পরণে 'হাফ্-প্যাণ্ট্', পায়ে জরির জুতো! সে মাঝে-মাঝে 'হাফ্-প্যাণ্টে'র পকেটে হাত পুরে দিয়ে আবার বার ক'রে নিয়ে শূণ্য-হাতেই যেন কি ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে।

আমাকে দেখেই হাসিমুখে সে একবার ঘাড় নাড়লে। যদিও লোকটির সাজ-পোষাক যুৎসই নয়, তবু আমি স্থির করলুম, এর সঙ্গে খানিক আলাপ করলে মন্দ হবে না।

বললুম, "চ—চ—চ—চ চমৎকার নীল আকাশ!"

সে বললে, "আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হ'লুম। আমিই আজ আকাশকে চমৎকার হবার হুকুম দিয়েছি।"

একটু ভড়্‌কে গেলুম। তবু জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি কি—কি—কি—কি ছ—ছ—ছ—ছ ছড়াতে ছ—ছ—ছ—ছ ছড়াতে যাচ্ছেন?"

লোকটি বললে, "ও, তা জানেন্ না বুঝি? গরীব দুঃখীদের মোহর বখ্‌শিশ দিচ্ছি। রাজ-কর্ত্তব্য হচ্ছে দান করা। আমি কে জানেন?"

—"না—না—না—না না।"

লোকটি এগিয়ে এসে তার হাতের ভিতরে আমার হাত নিয়ে বললে, "আমি হচ্ছি চীন দেশের সম্রাট, ঐ হচ্ছে আমার প্রাসাদ", ব'লেই সে ইঙ্গিতে পাগলা-গারদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে।

বুক্‌টা ধড়াস্ ক'রে উঠল। বুঝলুম, আবার ভুল লোকের পাল্লায় পড়েছি। নিজের হাতখানা ছাড়াবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না——আমি যেন বজ্র-বাঁধনে ধরা পড়েছি।

চীন-সম্রাট আমাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গিয়ে ষ্টেশনের একটা গুদাম ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "ঘরটি বেশ নির্জ্জন, না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলুম একান্ত নাচারের মতন। এই নির্জ্জনতা ভয়াবহ!

চীন-সম্রাট বললেন, "আমি এখন তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।"

আমি বললুম, "তা—তা—তা—তা তাই নাকি?"

চীন-সম্রাট বললেন, "হ্যাঁ। নরবলি সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

ভয়ে ভয়ে জানালুম, নরবলি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

চীন-সম্রাট বললেন, "তোমার পছন্দ অপছন্দে কিছুই এসে যায়না। কারণ, আমি নরবলি পছন্দ করি। আমার রাজ্যে রোজই নরবলি হয়। আজও হবে। এখন ঘরের ভেতর ঢোকো দেখি।"

নরবলি সম্বন্ধে সম্রাটের মতের উদারতা দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। মনে হ'ল শরীর যেন রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করছে!

ঘরের ভিতরে গিয়ে সম্রাট বললেন, "তোমার কাছে একখানা বড় ছুরি আছে?"

জানালুম বড় বা ছোট কোন-রকম ছুরিই আমার কাছে নেই।

সম্রাট এতক্ষণের পরে আমার হস্তত্যাগ ক'রে বললেন, "ঐখানে চুপ্ ক'রে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘরটা খুঁজে দেখি ছুরি কি কাটারি পাওয়া যায় কিনা।"

পরমুহূর্ত্তেই আমি মস্ত এক লাফ্ মেরে সম্রাটের অগোচরেই ঘরের বাইরে এসে পড়লুম, তারপর ষ্টেশনের 'প্লাটফরমে'র উপর দিয়ে পাঁই-পাঁই ক'রে ছুটতে লাগলুম। তখন ট্রেন এসে পড়েছে। আর এক লাফে একখানা কামরার ভিতর গিয়ে প'ড়ে একেবারে বেঞ্চির তলায় ঢুকে অদৃশ্য হবার ব্যবস্থা করলুম।

সেই অবস্থায় বেঞ্চির তলায় উবু হয়ে শুয়ে হাঁফ্ ছাড়তে ছাড়তে দেখি, কামরার ভিতরে এসে ঢুকলেন একটি আধা-বয়সী মহিলা! উঁকি মেরে দেখলুম, একেবারে শিক্ষিত ও 'আপ্-টু-ডেট্' মহিলা। হাতে ছাতা, খবরের কাগজ ও খান্‌কয়েক কেতাব।

মহিলাটি ডাক্‌লেন, "কুলি! কুলি, ষ্টেশনে অত গোলমাল কিসের?"

কুলি বললে, "গারদ থেকে একটা পাগলা পালিয়েছে।"

"সর্ব্বনাশ!" ব'লে শিউরে উঠেই মহিলাটি গাড়ীর দরজা দড়াম্ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন।

ট্রেন চলতে লাগল, খানিক পরে মহিলাটির দেহের উপরার্দ্ধ একখানি খোলা খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ-সুযোগ আমি ছাড়লুম না। অতিশয় নিঃশব্দে একটু-একটু ক'রে দেহ সরিয়ে বেঞ্চির তলা থেকে আমি আত্মপ্রকাশ করলুম। তারপর বেঞ্চির উপর উঠে ব'সে একটি সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে "মুণ্ড" শব্দটি উচ্চারণ করলুম।

যে-কামরাতে এতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে হঠাৎ এই মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনেই মহিলাটি এমন ভয়ানক চম্‌কে উঠলেন যে, খবরের কাগজখানা তাঁর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেল। তাঁর মুখ হ'ল একটা দেখবার মত অপূর্ব্ব জিনিষ। কিন্তু তিনি একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না। যেন একেবারে বো হয়ে গিয়েছেন! যদিও মেয়েদের সামনে আমি আরও বেশী মুখচোরা হয়ে পড়তুম, তবুও স্থির করলুম, এঁর সঙ্গে দুই-চারিটি বাক্য-বিনিময় করা উচিত। কারণ ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়েছেন, প্রতিদিন আমাকে অন্তত তিনজন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

কিন্তু বাক্যালাপ করতে গিয়েই তোৎলামির বিপুল বন্যায় আমার কথা বলবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। এবং আমার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে মহিলাটিরও দুই চোখ ক্রমেই বেশী বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। তখন চট্ ক'রে আমার মনে প'ড়ে গেল ডাক্তারবাবুর আর একটি উপদেশ। সাধারণ ভাবে কথা কইতে না পারলে গানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আমি খুব মধুর সুরে বললুম, "দেখেছেন আজ্‌কের আকাশ কি-চমৎকার সুনীল! আজ আর বৃষ্টির ভয় নেই, কি বলেন?"

মহিলাটি কিছুই বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখ হয়ে গেল নীলনদের মতই নীল! গদীর উপরে হেলে প'ড়ে তিনি সভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে একেবারে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। বুঝলুম, সুরে বা বেসুরে কোন-রকমেই এঁর সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না। তখন কি আর করি, 'থার্ম্মসে'র 'ফ্লাস্ক্'টা বার ক'রে নিয়ে চা-পান করতে নিযুক্ত হ'লুম।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরতে গিয়ে ট্রেনখানা বেজায় দুলে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাত থেকে 'ফ্লাস্ক্'টা নীচে প'ড়ে গিয়ে সশব্দে ফেটে গেল।

মহিলাটি বিকট স্বরে চীৎকার ক'রে 'রকেটে'র মতন উপর দিকে লাফিয়ে উঠলেন এবং দুই-হাতে 'এলার্ম্ চেন্' ধ'রে দোদুল্যমান হ'লেন।

প্রথমটা আমি অতিশয় অবাক হয়ে গেলুম। কারণ ব'সে ব'সে কোন মানুষ যে এমন উঁচু লাফ্ মারতে পারে, আগে আমার সে ধারণাই ছিল না। কিন্তু তারপরেই যখন দেখলুম, চল্‌তি-ট্রেন থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চারিদিকে জাগল অনেক লোকের দ্রুত পায়ের শব্দ, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর জানলা দিয়ে করলুম লম্ফত্যাগ! এক-পলকেই দেখে নিলুম গাড়ী থেমেছে একটা ময়দানের মাঝখানে এবং মাইল-খানেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রীতিমত বড় জঙ্গল। আমি সেই জঙ্গল লক্ষ্য ক'রে দৌড় মারলুম।

'স্পোর্টে' দৌড়ের প্রতিযোগীতার দেশের কেউ আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। স্থির করলুম, সেই শক্তির দৌলতেই আজ আমাকে দেহের হাড় ও পিঠের চামড়া রক্ষা করতে হবে। দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে পেলুম দলে-দলে লোক আমাকে ধরবার জন্যে নানাদিক থেকে ছুটে আসছে। তাদের কেউ রেলের কর্ম্মচারী, কেউ গাঁয়ের লোক, কেউ বা চাষা কি রাখাল। অনেকেরই হাতে লাঠি দেখতেও ভুললুম না। গুণতিতে তারা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট জনের কম হবে না! এত তাড়াতাড়ি কি ক'রে যে এত লোকের টনক নড়ল, সবিস্ময়ে সেই-কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের পায়ের গতি দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ বাড়িয়ে দিলুম।

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে প'ড়েও বুঝলুম এই নাছোড়বান্দা জনতা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করবার আশা ছাড়েনি। একটা বেজায়-ঝুপ্‌সি বটগাছের উপরে গিয়ে আত্মগোপন করলুম খুব সাবধানে। তারপর রাত যখন দশটা বাজল, তখন আবার আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

অটল, এই হচ্ছে আমার ইতিহাস!

অটল বললে, "কিন্তু তোমার তোৎলামি সারল কি ক'রে, সে-কথা তো কিছুই বললে না?"

নকুল বললে, "ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে আমার কণ্ঠদেশের ভিতর থেকে তোৎলামির শিকড় নষ্ট হয়ে গেল, তা আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এসে সেদিন যখন লোকের কাছে আমার 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার'এর কথা জাহির করলুম, তখন আশ্চর্য্য হয়ে অনুভব করলুম, আর আমি তোৎলা নই। মহাবিপদের এক-ধাক্কাতেই তোৎলামি আমার গলদেশ ছেড়ে পলায়ন করেছে! বিশ্বাস কর আর না কর, এটা কিন্তু সত্য কথা!"

লেকের ধারে এক সন্ধ্যা

শ্রীশোভনলাল মুখোপাধ্যায়

পূজোর ছুটির আগে লেকের ধারে খুব বেশী ঘোরাঘুরি করতে অভ্যস্ত না থাক্‌লেও লেক্‌টি আমার অত্যন্ত পরিচিত। পূজোর ছুটির পর বিকেলের দিকে রোজই লেকের ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। এর ফলে কত অভিজ্ঞতাই না সঞ্চয় করেছি। একদিনের কথা বলা যাক্‌।

সেদিন দুপুরের দিকে বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হোয়ে গেছে। আকাশটা বেশ নীল এবং পরিষ্কার। বলা বাহুল্য, মেঘমুক্ত আকাশে তখন শোভা পাচ্ছিলেন সূর্য্যদেব। কেন জানি না, সেদিনটী আমার ভারি ভালো লেগে গেলো। তাই বিকেলে বেরোবার সময়ের একটু আগেই সখ ক'রে বেরিয়ে পড়লাম লেকের দিকে।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে মনের আনন্দে চল্‌তে সুরু করলাম। ঠিক টালিগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজের প্রায় কাছে যেম্‌নি এসে পড়লাম, অম্‌নি কানে গেল, "বাব্ধ্‌কে, সবুর, খবরদার।" ইত্যাদি। সভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, একটা নতুন ট্রাম ক্রমাগত ঘণ্টা নাড়ছে, আর একটা গোরুর গাড়ী তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে এবং তারই সাম্‌নে দিয়ে এসে পড়েছে একদল ভেড়া। যাই হোক্‌, মিনিট দুয়েক বাদেই ট্রামটা চল্‌তে সুরু করল। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে এসে পড়লাম লেকের একটা গেটের কাছে। যেখানে ছোট ছোট ছেলেদের খেল্‌বার জন্যে একটা জায়গা বেড়া এবং লোহার তার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, তারই সাম্‌নে আমার চিরপরিচিত চীনাবাদামওয়ালা আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—

"খাও তো মজা পাও,
টেস্‌ করিয়ে যাও,
চীনাবাদাম খাও
টাট্‌কা ভাজা চীনাবাদাম।"

সেটাকে চেঁচানি ঠিক বলা যায় না, কাবুলিওয়ালার বাজখাঁই গলার চমৎকার গান বল্‌লেই বোধ করি ঠিক হয়। আরও খানিক্‌টা যাবার পর আমাদের ক্লাসের পার্থ এসে জড়িয়ে ধরল, "কি শোভনলাল, খুব পড়ছ ত'?" আমি তখন বেপরোয়াভাবে নিজেকে মুক্ত ক'রে বল্‌লাম, "তোমরা মনে ক'রে নিতে পার।" বাস্তবিক, ছুটিছাটার পর স্কুলকলেজের বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা হ'লেই ঐ এক কথা।

খানিক্‌টা গল্প করবার পর পার্থ একদল ছেলের মধ্যে ভিড়ে গেল, আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম। খানিক্‌টা এগুতেই দেখা হ'ল আমাদের বাঙ্গলা-শিক্ষক তারাপদবাবুর সাথে। ভদ্রলোকের একটু বড় বড় অলঙ্কার, উপমা ইত্যাদি প্রয়োগ ক'রে কথা বলার অভ্যাস আছে। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল তিনি ব্রাহ্মণ, প্রণামী টনাম পেলে ভারি খুশী হন, পরীক্ষায় খুব ভালরকম মার্কস্‌ই দিয়ে দেন। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের নতুন কেনা বাটার জুতোজোড়াতে হাত দিলাম। ভদ্রলোক ত' গ'লে জল হ'য়ে গেলেন। ব'লে চল্‌লেন, "তোমরা ভাল ক'রে পড়ো। আমাদের বিদ্যায়তনের মান রাখা চাই-ই। তোমরা হচ্ছ বাঙ্গালা দেশের ভাবী নাগরিক বা citizen. শুধু বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'লে চল্‌বে না, জীবনযুদ্ধেও তোমরা যাতে জয়ী হ'য়ে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করতে পার, তার জন্যে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি।"

ভদ্রলোকের আশীর্ব্বাদ সাথে নিয়ে চুপচাপ চল্‌লাম। কিছু দূরে দু'জন পাঞ্জাবী যুবক স্যুটের পকেটে হাত দিয়ে গল্প করতে করতে চলেছেন। দু' একটা কথা কানের ভেতর চলে এলো—"কিস্‌মৎ কা অ্যাক্‌টিং বড়ি আচ্ছা হুয়া, লেকিন্‌ মিউজিক্‌…।"

তিনজন ব্রিটিশ্‌ সৈনিক খানিক দূরে সগৌরবে মার্চ্চ ক'রে চলেছে। তাদের বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে উচ্চারিত কথার মধ্যে শুধু শুন্‌লাম, "Metro, Elite" ইত্যাদি।

খানিক দূরে বড় বড় তালগাছ ও ঝাউগাছের নীচে দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক পরমহংসদেবের পেটেণ্ট্‌ ভঙ্গীতে ডান্‌ হাতের আঙ্গুলের ওপর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি সংস্থাপিত ক'রে ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে আছেন।

ছোট লেক পার হ'য়ে এইবার বড় লেকে এসে পৌছলাম। এখান্‌কার একটা কোনে ছোট একটা পুকুর আছে। ওর জলের ওপরে ভাস্‌ছে কতকগুলো পদ্মের ডাঁটা। চারপাশে চারখানি বড় পাথরের ওপর বস্‌বার স্থান নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। এদিক ওদিক চেয়ে একটা সীটের উপর বস্‌তে গিয়ে দেখি যে সেটি পূর্ব্বেই একজন যুবক কর্তৃক অধিকৃত। তিনি নিবিষ্টমনে একখানি বই পড়ছেন। কৌতূহল হ'ল বইখানি কি তা' জান্‌বার। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক হয়তো একজন কলেজ ষ্টুডেণ্ট্‌, বাড়ীর ঝামেলা থেকে স'রে এসে একখানি পাঠ্যপুস্তক এনে এখানে পড়ছেন। একটুখানি উঁকি মেরেই ভ্রম বুঝতে পারলাম। বইখানি হচ্ছে "কারাগারে মোহন।"

কিছুদূর যেতেই বন্ধুবর সমীরের সাথে দেখা। এবারে সে আশুতোষ কলেজে ঢুকেছে আই. এ. পড়বার জন্যে। কলেজে ঢুকেই তার মেজাজটা বিগ্‌ড়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের সে থোড়াই কেরার্‌ করে। যাই হোক্‌, বন্ধুবর শুনিয়ে দিলেন তাঁর একটি বুড়লোক জমিদার পুত্র বন্ধু জুটেছে। একথা সেকথার পর ফের চল্‌তে সুরু করলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

চল্‌তে চল্‌তে এসে পড়লাম বুড়োদের আড্ডার কাছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বক্তৃতার সুরে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে চলেছেন, "মাছের বাজার যা' হয়েছে, মশাই, আর তো হাত দেওয়া যায় না। এ সর্ব্বনেশে যুদ্ধে মাছও কি লড়াই করতে গেছে?…"

মাড়োয়ারী ক্লাবের কাছটাতে রেডিওতে বাজ্‌ছে একটা বেয়াড়া বিলিতী সুর। ওরা বোধ হয় ধরেছে লস্‌ এঞ্জেলস্‌, কি সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো কি ঐ রকম কোন একটা ষ্টেশন।

"রাজাবাবু, একটা ডবল পয়সা।"—হাত পেতে এসে দাঁড়াল একটা ছোট ছেলে। দুর্দ্দিনের বাজারে পয়সা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ডবল পয়সা চাইছে। আমার সাজপোষাকে আভিজাত্যের চিহ্ন বিশেষ কিছুই ছিল না। সাজগোজ সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর ছেলের মতই। কিন্তু ওদের চোখে কি রকম ভাবে যে রাজাবাবু হ'য়ে গেলাম, ভেবে হাসি পেল। পকেট হাতড়ে একটা আনি পেলাম, তাই দিয়ে দিলাম। ছেলেটা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুট্‌ল—বেচারা! রাস্তার ওপারে চোখানী নামে ধনী মাড়োয়ারীর প্রাসাদোপম সাদা ধব্‌ধবে বড় বাড়ীটা নিয়ে নিয়েছে মিলিটারী। এক ভদ্রলোক তাঁর কয়েকজন সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে যেতে বল্‌ছেন, "ঠিক হয়েছে, লোকের ধন শোষণ ক'রে মাড়োয়ারী ব্যাটা বড় বড় ইমারৎ তুলেছে, হেঁঃ, যাই হোক, মাথার ওপরে যে একজন আছেন, কি বলেন দাদা, হেঁঃ হেঁঃ।"

কয়েকজন ভদ্রলোক মোটরে ক'রে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এত জোরে তাঁরা গাড়ী চালাচ্ছেন যে ক্রমাগত ধুলো উড়ে উড়ে সেখানকার হাওয়াটাকেই সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লে দিয়েছে।

এক বুড়োগোছের ফলওয়ালা মাথায় ফলের বোঝা নিয়ে বোধ হয় বেচ্‌তে চলেছে বাজারে। মোটরের গতি দেখে সে কি করবে ঠিক করতে না করতেই তার পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে গাড়ীখানা চ'লে গেল। বিলাসী বাবুরা ক'রে উঠ্‌লেন অট্টহাস্য। আর একটু হ'লেই লোকটার প্রাণবিয়োগ হয়েছিল আর কি।

আশেপাশে ঘরগুলোতে তখন সন্ধ্যার শাঁখ বাজছে। সন্ধ্যার প্রদীপ কোন কোন ঘরে ধিকি ধিকি জলছে। এর মাঝেই এক সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে এলাম কলকাতার ঘটনাবলী। কখন যে বাড়ীতে এসেছিলাম, তা' মনে নেই।

কবিতা

পাখী পোষা

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই যে ছিল পাখীর বাসা পাকুড় গাছের মগ্‌ডালে
খবর না তার পেয়েই সেদিন, গোপলা উঠেই সক্‌কালে
আন্‌লো পেড়ে গাঙশালিকের ছোট্টছানা এইটুকু—
ডান্‌পিটে আর গাছে ওঠায় তার মতো তো নেই ঘুঘু।
ছোট্টছানা, মা ফেলে তার থাক্‌বে কেন একলাটি
গোপলা কতই যত্ন করে, রোজ খেতে দেয় একবাটি
আপন ভাগের দুধ থেকে, আর পোকা মাকড় তাও আনি।
ছিঁচকাঁদুনে শালিক ছানায় আদরে কয়—"খাও মানি!"
ছোট্টছানা, খাবারগুলো পারে না তো সব খেতে
একটুখানি ঠোঁট ঠেকিয়েই আবার ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দেতে
চেঁচিয়ে মরে, গোপলা ভাবে—"হয়তো খাওয়া হ'চ্ছে না
তাই কাঁদে সে, আমার আদর হয়তো মনে ধ'চ্ছে না!
কি করা যায়, কি করা যায়—কি উপায়ে পক্ষিটী
তার কাছে খুব পোষ মেনে খায় হ'য়ে থাকে লক্ষ্মীটি!"
শক্ত বড় সহজ তো নয় উপায়টী তার ঠিক করা!
ওদিকে মা বলেন—"ওরে! কোত্থেকে এ দিক্ করা,
লক্ষ্মীছাড়া, শালিক ছানা আনলি ঘরে বল দেখি?
রাত্রি দিনে চেঁচায় খালি—দি'আয় ফেলে, চলবে কি

এম্নি ক'রেই দিন কাটানো—কেবল অনাছিষ্টিতে?
আসুন উনি, বুঝ্‌বে মজা, পিঠে বেতের বিষ্টিতে!"
গোপলা ভাবে—"হায়রে, মা তো বুঝ্‌বে না মোর মর্দ্দানী—
বাসায় থেকে পাখীর ছানা পেড়ে আনার কারদানী।"
মার কথা তার বাজ্‌লো বড়, ভাব্‌লো মনে—"আজকেই
দিন ভ'রে ওই শালিক ছানার গলার আওয়াজ বাজ খেঁয়ী
যে হোক ক'রে থামিয়ে দেবো।" এই না ভেবে কোত্থেকে
এত্তো বড় একটি বাটী আনলো ছাতু জল মেখে;
গাঙশালিকের বাচ্ছাটারে খাঁচার থেকে বার ক'রে
বল্ল—"খা তুই কতই খাবি, চেঁচাস্ নাকো আর জোরে।"
একটু খেয়েই শালিকছানা আবার চেঁচায় দম ভ'রে
গোপলা বলে—"ব'কবে যে মা, চেঁচা না ভাই কম ক'রে।"
কথায় শালিক বোধ না মানে তেড়েই আসে ছোবলাতে—
ঠোঁট ভ'রে তার দেয় ছাতু তাই আঙুল দিয়ে গোপলাতে।
সেটুক খাওয়া শেষ না হ'তেই হাঁ করে যেই ফের পাখি,
চেঁচানো তার বন্ধ করে খাবার দিয়ে মুখ ঢাকি।
বারে বারে ঠোঁট ভ'রে তার গোপলা ছাতু দেয় ঠুসে—
বারে বারে হাঁ করে সেই শালিকছানা রাক্ষুসে।
তাই না দেখে গোপলা হাঁকে—"যত খাওয়াই হয় না কি
দেখব তবে খাস কতো তুই পেটটা কি তোর জয়ঢাকই?"
তারপরে ভাই ফাঁক না ক'রে শালিকছানার ঠোঁটদুটো
ঠেসে ঠেসে ছাতুর গোলা মুঠোর পরে দেয় মুঠো,
হাঁয়ের ভিতর আঙুল পুরে পেটের দিকে দেয় ঠ্যালা।
বলে—"আরো হাঁ কর, চ্যাঁচা, খেলা গলার সুর খেলা!
আপন মনেই গোপলা তখন ভীষণ গেছে রোখ চেপে
পাখির ঠোঁটে ছাতুর ওপর ছাতু ঢালে আর টেপে।
ছাতুর চাপে শালিকছানার পেটটি হ'লো ঢোল যেন
ও ঘর থেকে মা ডেকে কন—"শুনিনে আর বোল কেন
কি হোল তোর শালিকছানার?" বাইরে দেখেন চোখ পেতে
গোপালবাবুর আদর খেয়ে শালিক গেলেন স্বগ্‌গেতে॥

আঁধার থেকে আলোর দিকে

শ্রীঅশোককুমার সরকার

সে অনেক দিন আগেকার কথা, তখন আমরা কেউ হইনি। আমাদের বাবা মাও তখন জন্মান নি। সেই সময় ফ্রান্স দেশে এক মুচি ছিল। সে যা রোজগার করত তাই দিয়েই সে আর তার বৌ পেট চালাতো। বেশ চল্‌ছিল তাদের দিনগুলো। তাদের একটি ছেলে ছিল তার নাম "লুই"। তারা রবিবারে গীর্জ্জায় যেতো, দিনের বেলায় কাজ কর্ম্ম করত আর রাতের বেলায় নেচে গেয়ে আমোদ করত।

হঠাৎ একদিন ভগবান তাদের এই সুখের সংসারে বাদ সাধ্‌লেন। লুই ছিল বড় চঞ্চল। একদিন যখন সে বাবার কাছে কাজ শিখছিল সেই সময় হঠাৎ তার হাত থেকে একটা বড় ছুঁচ ফোস্‌কে গিয়ে বেচারা লুইয়ের চোখে প্রায় সবখানি ফুটে গেল! লুই চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। তার বাবা কাছে কোথায় ছিলেন চীৎকার শুনে ছুটে এলেন। লুইয়ের অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদে ফেললেন। তাড়াতাড়ি ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। তার একমাত্র ছেলে লুই তাকে বাঁচাতে হবে এই তার পণ। ডাক্তার এলো, লুইয়ের বাবা তার শেষ কানা কড়িটী পর্য্যন্ত ছেলের চোখের জন্য দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বেচারা সারা জীবনের মত অন্ধ হয়ে গেল।

এর পরের এক দিনকার ব্যাপার বলি শোনো। লুই একদিন একটা পুরাণো চামড়া নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে হাত দিয়ে বুঝতে পাল্লো যে, ছুঁচ ফোটানোর ফলে চামড়ার উল্টো দিকে উঁচু উঁচু বিন্দুর সৃষ্টি হয়েছে। এই ফুটকির আবিষ্কারই পৃথিবীতে এক নূতন ব্যাপার সৃষ্টি কোল্ল।

তখন কেউ মনেও করতে পারেনি যে এই ফুটকির জোরেই অন্ধেরা একদিন লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারবে। তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে অন্ধ যদি গরীব লোক হয় তা হলে তার জীবণ শুধু ভিক্ষে করেই কাটাতে হয়। আর সে যদি বড়লোক হয় তা হলে ঘরে বসে হাহুতাশ করা, এবং জীবনকে মরনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কামনা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু বহু বছর আগে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লুই যা আবিষ্কার করে ফেল্‌ল তার জের আজো চলেছে।

সেই এক মুহূর্ত্তে যে ফুটকি আবিষ্কার হয়েছিল, সেই ফুটকিগুলিকে নানাভাবে সাজিয়ে A. B. C. D অক্ষরে রূপান্তরিত কোরে ইংরাজী বর্ণমালার সৃষ্টি করা হোলো একে বলা হয় ব্রেল পদ্ধতি বা Braille System। অন্ধেরা আঙ্গুল দিয়ে সেই উঁচু ফুট্‌কীগুলোকে অনুভব করে ইংরাজী বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করল। তারপর অন্ধদের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের দেশেও প্রচলিত হোল। য়ুরোপ থেকে এক মিশনারী দল প্রথমে ভারতে এসে রাজপুর নামে এক জায়গায় ১৮৮৭ সালে প্রথম অন্ধ স্কুল খোলেন। Miss A. Sharp ছিলেন এখানকার শিক্ষয়িত্রী। সুতরাং ভারতবর্ষে অন্ধত্ব নিবারণের প্রথম সোপান তাঁরাই তৈরি কল্লেন। এরপর দক্ষিণ ভারতের পালম্‌কোটা ব'লে এক জায়গায় আর এক মিশনারি দলের নায়িকা Miss Asquith দ্বিতীয় অন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এই সময় ভারতের কোন দেশীয় ভাষায় ব্রেল (Braille) পদ্ধতি এখনও রূপান্তরিত হয় নি। সেই জন্যে দেশীয় লোকদের পক্ষে ইংরাজী শেখা ভীষণ কষ্টের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। এই সব দেখে শুনে সেই মিশনারী

ইংরাজী অক্ষর গুলোকেই ভারতীয় ভাষায় চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। এই যেমন "A" হোল "অ", "B" হোল "ব", "E" হোল "ই", "U" হোল "উ", "F" হোল "ফ", "G" হোল "গ", "H" হোল "হ" ইত্যাদি। যাই হোক ওদিকে এই রকম ভাবে শিক্ষা চলতে লাগলো। তখন আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন তদানীন্তন কালের 'দাসী' বলে একখানা কাগজে। এবং বর্ত্তমানে আমরা যে বাংলা "ব্রেল" দেখ্‌তে পাই, প্রায় তারি মত একটা নমুনা ঐ "দাসীতেই" প্রকাশ করেন।

এরপর শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ তাঁর বন্ধু মিঃ গার্থওয়েট সাহেবের কাছ থেকে ইংরাজী ব্রেল শেখেন এবং অন্ধদের জন্যে ১৮৯৭ সালে ১৫৪ নম্বর কড়েয়া রোডে অর্থাৎ এখন তোমরা যেটাকে পার্ক সার্কাস বল সেইখানে একটা স্কুল খোলেন। শ্রীযুক্ত শাহ যখন এই স্কুল খোলেন তখন সেখানে মাত্র একটী ছাত্র। এখানে তাঁকে নিজেই "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" অর্থাৎ তিনি নিজেই সর্ব্বশ্রেণীর স্কুলের মাষ্টারী ও স্কুলের যাবতীয় কাজ করতেন। তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, সেক্রেটারী এবং তিনি একাই কমিটী হ'য়ে স্কুলটীকে চালাতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অন্ধদের জন্যে কাজ সুরু করেছিলেন। এরপর কয়েকবছর পরে তিনি নিজেই অন্ধ হ'য়ে যান। স্কুলটি পরে আরো প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুত কালীচরণ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়।

এরপরে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে এই প্রতিষ্ঠানটীকে বেহালায় আনার জন্যে সহায়তা করেছিলেন। বেহালায় (বর্ত্তমান হিন্দুস্থান পার্কে) এসে এই বিদ্যালয় খুব উন্নতি লাভ করেছে। এই বেহালার বাড়ীতেই শ্রীযুক্ত শাহ পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমানে তাঁর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার শাহ মহাশয় এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁরি চেষ্টায় এই অন্ধ বিদ্যালয়ের বহু উন্নতি হয়েছে।

এখানকার অন্ধ ছাত্রেরা শুধু লেখাপড়া নয়, নানারকম হাতের কাজ শেখে, সঙ্গীত চর্চ্চা করে এবং স্কুলের বহু কৃতী ছাত্র পৃথিবীর নানা সভ্য দেশ থেকে ঘুরে এসে সমাজের নাম করা লোকেদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন। এই স্কুলে উপযুক্ত স্কাউট মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে একটি স্কাউট দলও গঠিত হোয়েছে।

এঁদের মধ্যে একজনকার কথা বলছি।

তোমরা নিশ্চই অন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়ের নাম শুনেছ। ইনি এই স্কুল থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ ক'রে ১৯৩৫ সালে এম, এ, এবং ১৯৩৬ সালে বি, এল, পাশ করেন এবং আমেরিকার কলম্বিয়া (Columbia) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয়বার এম, এ উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমানে সুবোধ বাবু "All India Light House for the Blind" বা "নিখিল ভারত অন্ধদের আলোক নিকেতন" নাম দিয়ে অন্ধদের জন্য নূতন পরিকল্পনায় আর একটী স্কুল খুলেছেন।

দার্জ্জিলিংএর রোদ সত্যি যেন সোনালী, সোনার মতনই ঝক্‌মকে। গাছের পাতাগুলি ঠিক্ যেন নীল আর সবুজ মখমল। ফগ্‌ও ঠিক্ বাংলাদেশের প্রান্তরের কুয়াসা নয়, পাতলা ঝক্‌ঝকে রূপোর পাত। উপত্যকায় ধব্‌ধবে সাদা মেঘ ঘুমিয়ে আছে, যেন রাশি রাশি বকের পালক! পাহাড়গুলি যেন ধোয়া মোছা বেগুনী রং করা। তার ওপরে হাজারো রঙের বিলাতী ধরণের কাঠের বাড়ীগুলি থাকে থাকে পাহাড়ের কোলে কোলে সাজানো—দূর থেকে দেখো—অবিকল জলছবি। প্রদীপের ভীষণ ভালো লাগে দার্জ্জিলিংকে। শহর চ'লে গেছে কত ওপরে—আর কত নীচে কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে—অত ঘুরে ঘুরে দেখা তার মতন ছোট ছেলের অসম্ভব, এইখান থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে, এই অব্‌জার্ভেটরী হিলের তলা থেকে, এই রেলিংএর ধার থেকে।

তার মতন ছোট ছেলের পক্ষে দামী আল্‌ষ্টারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নেপোলিয়নের মতন এম্‌নি দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই যথেষ্ট কায়দা আছে! আর বেশী সখ ভালো নয়।

ঐত' কত লম্বা লম্বা মেয়েরা লাল ওভারকোট আর কুচ্‌কুচে কালো আলষ্টার পরে হিল্‌উঁচু সাদা জুতো খট্‌খট্ ক'রে পাশ দিয়ে চ'লে গেল বল্‌তে বল্‌তে 'চমৎকার মুখখানা বাচ্চাটার লাভ্‌লি!' তার মানে কি? তাকে ভালো দেখাচ্ছে।

একটা মেম এসে তাকে আদর করলো, টফি দিয়ে, জড়িয়ে ধ'রে। সাহেবটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগ্‌লো সঙ্গের বুল্‌ডগটার মতন। ওরা ত জানে না তাকে খুন করা হবে!

প্রণববাবুর হাত ধ'রে বার্চ্চহিল্ পর্য্যন্ত সে গেছ্‌লো আজই সকালে। অনেক লোকজন পথে যাওয়া আসা করছে। তার ভয় করেনি। দরোয়ান ছিল সবসময়।

মাষ্টারমশাই তাকে বল্‌লেন—এরকম ক'রে থাকা তোমার চল্‌বে না এই অমানুষের মতন।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ছোট্ট ফেল্ট্ হ্যাট্‌টা নামিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, বুঝ্‌তে পারেনি কথাটা।

মাষ্টারমশাই বুঝিয়ে দিলেন—গায় জোর করতে হবে, মনে জোর আন্‌তে হবে। জিউজিৎসুর প্যাঁচ্ শিখ্‌তে হবে, কুস্তির প্যাঁচ্‌ও। আক্রান্ত হ'লে কী ক'রে আত্মরক্ষা করতে

বে তাও তোমার জানা চাই। তোমার দাদু তোমায় ভুল পথে চালাচ্ছেন। তুলোয় ঢাকা ঠাকুরের মতন রেখে দিলে তুমি চির অসহায় থেকে যাবে।'

দার্জ্জিলিংএর রোদে বার্চ্চহিলের মাথায় কথাগুলো যেন দৈববাণীর মত শোনায়।

প্রদীপের মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে।

মাষ্টারমশাই ব'লে চলেন—তোমাকে আমি অভিমন্যু ক'রে তুল্‌ব—মৃত্যুকে যে ভয় করে না। বাংলাদেশের সকল ছেলের যা হওয়া উচিত।

নাম্‌তে নাম্‌তে তিনি বলেন—অথচ হয়নি। ছেলে এদেশে মানুষ হয় না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে ধুতিপরা প্যাণ্টপরা কত ছেলে পাহাড় থেকে নেমে গেল, প্রদীপের চেয়ে অনেক বড়।

মাষ্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রদীপ বল্‌লে—ওরা?

ওরা কেউ মানুষ হয়নি।—গম্ভীর মুখে তিনি বল্‌লেন।

কেন বল্‌লেন—প্রদীপ বুঝ্‌তে পারলোনা। কত ইংরিজি কথা ওরা বল্‌ছে, হোটেলের কথা, হাসির কথা মজার কথা—ওরা কেউ মানুষ হয়নি? আশ্চর্য্য!

সেদিন দাদুর সঙ্গে মাষ্টারমশাইয়ের কী ভীষণ তর্ক—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা, যেন মারাত্মক ব্যাপার।

মাষ্টারমশাই বল্‌ছেন—আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি ওকে কি তৈরী করি দেখুন। দশটা বছর আমায় সময় দিন্।

দাদু বল্‌লেন—তোমার প্ল্যান্ কি বলো।

আমি ওকে মির্জ্জাপুরে নিয়ে যাব, সেখানে বড় বড় ওস্তাদের কাছে রেখে ওর শরীর কে ক'রে তুল্‌ব।

বলোনা গুণ্ডার কাছে গুণ্ডামি শেখাবে!

তাই যদি বলেন, তাই। ওর ফুলবাবু হ'য়ে ওঠা চল্‌বে না। অজীর্ণয় শরীর জীর্ণ, ওষুধ খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া ছেলে নিজের পক্ষেই একটা ভারস্বরূপ। আমাকে যখন গার্জ্জিয়ান টিউটর করেছেন, ছেড়ে দিন্ আমার হাতে।

আমি ত জমিদারী ছেড়ে অতদিন বাইরে থাক্‌তে পারব না। দাদু প্রতিবাদ করেন।

থাক্‌তে হবে না আপনাকে। আমি সব ভার নিলাম। আপনি কেবল টাকা পাঠিয়ে খালাস। আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।

প্রদীপের মন খারাপ হ'য়ে যায়। এমন সুন্দর দার্জ্জিলিং ছেড়ে কোথায় নোংরা মির্জাপুর! এত রং এত ফুল এত আলো এত হাওয়া—ভালো ক'রে সব ভোগ করা হ'ল না, কোনি যেতে হবে ছেড়ে দিয়ে?

সে বলে মাষ্টারমশাই, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না দার্জ্জিলিং ছেড়ে। কী সুন্দর ফু
এখানে, কী চমৎকার পাখী—

পাথরের মতন মুখ কঠিন ক'রে মাষ্টারমশাই জবাব দেন—জীবনটা শুধু ফুলের গন্ধ আ
পাখীর গান দিয়ে ভরা নয় প্রদীপ, বিশেষ ক'রে তোমার জীবন। একথা বোঝ্‌বার সময় এসেছে
শক্ত কাজ নীরস পথ তোমার জন্যে। আমি শুধু তোমায় পড়াতে আসিনি, গড়তে এসেছি
আমার অপূর্ণ কামনা তোমাকে দিয়ে সার্থক ক'রে তুল্‌ব। বাঙালীর ছেলের যা হওয়া উচি
কিন্তু হওনি, আমি তোমাকে তাই ক'রে আন্‌ব।

কিছুই বুঝ্‌তে পারে না প্রদীপ। তার ভয় করে। চোখে জল আসে। মন কে
করে। মাষ্টারমশাইকে ভালো লাগে না।

বিকেলবেলা দাদু বল্‌লেন—প্রণববাবু, আপনি যে ওদের চর নন, তার কি প্রমান
ওদের কাছে টাকা খেয়ে যে আমার বংশের শেষ সল্‌তেটিকে নিভিয়ে দিতে যাচ্ছেন না, কী ক'
বুঝব ?

প্রণববাবু বল্‌লেন—ছেড়ে দিলাম চাকরী। আজই। এই মুহূর্ত্তে।

—ছেড়ে দেবেন এই মাসিক দুশোটাকা আয়, বিনামূল্যে খাওয়া পরা ?

—হ্যাঁ। ধূলোর মতন পরিত্যাগ করলাম।

—তাহ'লে ত আর এক রাতও আপনার এখানে থাকা হয় না।

—সন্ধ্যের ট্রেনেই আমি চল্‌লাম। প্রদীপ যে আমার কী, আপনি জানেন না, তাই এ
বড় আঘাতটা দিতে পারলেন। এর পরে আর কোনো কথা চলে না।

ব'লে তিনি সুট্‌কেশ গুছোতে বস্‌লেন।

দাদু ওঘরে গিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা রগচটা লোক! দিই এক মাসের মাইনে বেশী।

এখানে প্রদীপের কি করা উচিত, সে ভেবেই পেলে না।

মাষ্টারমশাই না দার্জ্জিলিং, কে বেশী প্রিয় ?

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে ভালো ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

ক্রমশঃ

"মাগো, তোমার তেমন ছেলে—নইকো আমি মোটে!"

শ্রীসুধীরচন্দ্র গোস্বামী বি-এ, কাব্যতীর্থ, কাব্যভূষণ

(১)

অভাব বলে 'দাও মা', বলে
চাইব করপুটে,
মাগো তোমার তেমন ছেলে
নইকো আমি মোটে!

মায়ের ছেলে মায়ের বুকে,
মা'র সোহাগে থাকেই সুখে,
মা'র চুমোতে ছেলের মুখে
হাসির আলো ফুটে!

ছেলের কি যে অভাব আছে,
নাই অজানা মায়ের কাছে,
এ ছেলে তোর তাইনা যাচে,
দিয়েছ যাই জুটে!

অভাব বলে 'দাও মা', বলে
চাইব কর-পুটে,
মাগো, তোমার তেমন ছেলে
নইকো আমি মোটে!

(২)

হারা'য়ে মা'র স্নেহ ধারায়,
কোন্ ছেলে মা, মা-হারা প্রায়—
মর্ম্মমরুর সে সাহারায়
ছট্‌ফটিয়ে ছুটে!

রাখিস্ যদি দু'পায় ঠেলে,
কেড়ে আদর চায়না ছেলে
ক্ষুধায় কেঁদে এ প্রাণ গেলে
হেলার কালকূটে!

অভাব বলে— 'দাওমা', বলে
চাইব কর পুটে,
মাগো, তোমার তেমন ছেলে—
নইকো মোটে!

(৩)

অভাব মাঝে ডুবেই র'ব,
'দাও মা' বলে আর না ক'ব,
পূর্ণ ভাণ্ডার থাকুক তব,
চাইনা নিতে লুটে!

সইব মাগো, সকল ব্যথা,
কইব না মা, ব্যথার কথা,
চাইনা যেচে মা'র মমতা—
কেঁদেই কোলে উঠে!

অভাব বলে— 'দাও মা', বলে—
চাইব কর-পুটে,
মাগো, তোমার তেমন ছেলে
নইকো আমি মোটে!

"গ্যাস্"

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত

কোঁ-ওঁ……ওঁ……! কোঁ-ওঁ……ওঁ……! সাইরেন বেজে উঠ্‌লো!

মুহূর্ত্তের মাঝে কয়েকটি শত্রুপক্ষীয় প্লেন বোঁ……বোঁ……ক'রে মাথার উপর এসেই গোটাকতক পাক দিয়ে সহরটাকে চকিত ভীত সন্ত্রস্ত ক'রে দিয়ে গেল। ভয়ার্ত্ত সহরবাসীরা আশ্রয় নিলে শ্লিট্ ট্রেঞ্চে—শেল্টারে; এই বুঝি বোমার তাণ্ডবলীলা সুরু হ'লো শান্ত, ক্লান্ত, নিঝুম সহরের বুকের ওপর নিরীহ, দুর্ব্বল, অসহায় সহরবাসীর বুকের রক্ত নিংড়ে!

……কিন্তু কিছুক্ষণ একদম চুপ! ……হঠাৎ আবার বোঁ বোঁ ক'রতে ক'রতে প্লেনগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। এবার সাথে সাথেই শব্দ হ'লো—বোম্-ম্!……বোম্-ম্! ……বোম্-ম্! ……বোম্-ম্! কয়েকটি বোমা ফেটে পড়ে ছিট্‌কে প'ড়লো চারধারে; আরো কয়েকটা বোমা ফেটে প'ড়েই বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলো কুণ্ডলীকারে।

শ্লিট্‌ট্রেঞ্চে আশ্রিত সহরবাসী চম্‌কে উঠেই ভীতকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে ব'লে উঠলো-'গ্যাস্!' "গ্যাস্!"

……গ্যাস্‌ই ছড়িয়ে প'ড়েছে বায়ুর সাথে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধমান জাতি এই বিষাক্ত গ্যাস্ ব্যবহার ক'রেনি তার করাল মূর্তির তাণ্ডবলীলার কথা ভেবে বোধ হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যুদ্ধে ব্যবহার ক'রবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাই এই গ্যাসের কথা শুন্‌লে মানুষের শরীর শিউরে ওঠে অজানিত ভয়ের আশংকায়।

গ্যাসের জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত তার যে ইতিহাস রচিত হ'য়েছে—সেটা খুব ভালো ভাবে বিশ্লেষণ ক'রলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে গ্যাস্ প্রধানতঃ—ফস্‌জীন, ক্লোরীন, মাষ্টার্ড ও লিউইসাইট্—এই চার প্রকার রূপ নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

নামের মাঝে যেমন চারটি রূপ আছে, তেমনি আকারেও দু'টি রূপ আছে। একটি তরল এবং আর একটি বাষ্পীয়। তবে এ ছাড়াও আর এক আকারের আছে, যেটা দেখ্‌তে ঘন দানার মত। বাষ্পীয় গ্যাস আবদ্ধ থাকে বোমার ভেতর: বোমা ফেটে যাওয়ার পরই বায়ুর সাথে অবাধ গতিতে মিশে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্যে এ প্রকার গ্যাসের কার্য্যকরী ক্ষমতা কম। ক্ষমতা অল্প পরিমানে থাকার জন্যেই এ গ্যাসের আর একটি নাম দেওয়া হ'য়েছে—অস্থায়ী গ্যাস্। বায়ু যদি খুব জোরে প্রবাহিত হ'তে থাকে তবে অনেক সময় এই গ্যাস্ একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে চলে যায় কয়েক মিনিটের মাঝেই। তরল গ্যাস্ প্রথমেই ছড়িয়ে পড়ে মাটির ওপর এবং ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হ'য়ে বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে কার্য্যকরী হয়। এ জন্যেই এর কার্য্যকরী ক্ষমতা খুব বেশী এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে স্থায়ী গ্যাস্।

প্রকৃতির আবহাওয়ার ওপর গ্যাসের কার্য্যকরী ক্ষমতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যদি আবহাওয়া গ্যাসের ক্ষমতার অনুকুলে হয় তবে মানুষের দেহের ওপর স্থায়ী এবং অস্থায়ী, এই দু'রকম গ্যাস্

কয়েকটি বিশেষ ক্ষতিসাধন ক'রতে পারে। (১) বাষ্পীভূত হ'য়েই তা প্রথমে চেষ্টা ক'রে চোখ আক্রমণ ক'রতে। যদি সঠিকরূপে আক্রমণ ক'রতে পারে, তবে চোখ ফুলে ওঠে, ভীষণ জ্বালা যন্ত্রনা আরম্ভ হয়, পিট্‌পিট্ ক'রতে থাকে ও ক্রমাগত জল প'ড়তে থাকে। দৃশ্যমান সমস্ত কিছু বস্তু চোখের সমুখে ঝাপ্‌সা বলে মনে হয়। অবশ্যি এর ফলাফল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না যদি উন্মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুর মাঝে কিছুক্ষণ থাকা যায়। (২) বাষ্পীভূত অথবা তরল অবস্থায় যদি আমাদের দেহের সংস্পর্শে আসে শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণাযুক্ত ফোস্কা পড়ে এবং এ ফোস্কা অনেক দিন স্থায়ী হয়। (৩) বায়ুর সাথে মিশ্রিত হ'য়ে নিশ্বাসের সাথে নাকের ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ ক'রে। তখন নাক, গলা, শ্বাসনালীতে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং ঘন ঘন হাঁচির উদ্রেক হয়। এটারও কার্য্যকরী ক্ষমতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; অল্প একটু পরেই সমস্ত জ্বালা কমে যায়। (৪) নিশ্বাসের সাথে ফুস্‌ফুসে গিয়েই শ্বাসকষ্ট উপস্থিত করে। এ অবস্থা একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'লে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফুস্‌ফুস্‌কে ভয়ানকভাবে দূষিত ক'রে ফেলে।

এখন যে চারপ্রকার রূপ নিয়ে গ্যাস্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে—তাদের স্বরূপ ও ক্ষমতা আমরা নিম্নলিখিতরূপে দেখ্‌তে পাই। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব একটা কার্য্যকরী ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। (১) ফস্‌জীন্ (Phosgene):—আকাশে উড়ন্ত বিমান থেকে বোমার মাঝে এ ধরণের গ্যাস্‌কে আবদ্ধ ক'রে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। মাটির সংস্পর্শে বোমা ফেটে যাওয়ার পরই ধোঁয়ার মত কুণ্ডলীকারে বেরিয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আবার খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় ব'লে একে অস্থায়ী শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। উন্মুক্তস্থানে এ গ্যাসের ক্ষতির ক্ষমতা বেশী। আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ ক'রতে বিলম্ব হয় ব'লে সেখানে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। মানুষ যখন নিশ্বাস নেয়, তখন বায়ুর সাথে ইহা শরীরে প্রবেশ ক'রে এবং ক্ষতি সাধন করে। ফুস্‌ফুস্‌কেই প্রথমে আক্রমণ ক'রে নষ্ট ক'রে দেয়। সাথে সাথে কাশিও দেখা দেয়। চোখে লাগলে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে। এ ছাড়া ধাতব বস্তুও ক্ষয় করে। বায়ু খুব জোরে প্রবাহিত হ'লে অথবা বৃষ্টি হ'লে এর ক্ষতিসাধন ক'রবার ক্ষমতা খুব কমে যায়। মানুষ খালি চোখে এর কোন রং দেখ্‌তে পারে না; কিন্তু গন্ধ অনুভব ক'রতে পারে। গন্ধটা অনেকটা পোড়া আবর্জ্জনার মত।

(২) ক্লোরীন (Chlorine):—এ গ্যাস্‌ও ফস্‌জীনের মত বাষ্পাকারে থাকে এবং ওর মতই মাটিতে এলে বায়ুর সাথে ছড়িয়ে পড়ে। এটাকেও অস্থায়ী গ্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত করা হ'য়েছে। ইহাও ফুস্‌ফুস্‌কে আক্রমণ ক'রে অকর্মন্য ক'রে দিতে চেষ্টা করে। ধাতুর তৈরী বস্তুও নষ্ট করে। এ সমস্ত ছাড়া তুলার তৈরী পোষাক প্রভৃতিও নষ্ট করে। মানুষের খালি চোখে এর সবুজ রং ধরা পড়ে, গন্ধও অনুভব করা যায়—অনেকটা ব্লীচিং পাউডারের মত। (৩) মাষ্টার্ড (Mustard):—মাষ্টার্ড গ্যাসের বাংলা নাম হচ্ছে সরিষার গ্যাস। কারণ এটা সরিষার থেকেই তৈরী হয়। স্থায়ী শ্রেণীতে একে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। অন্যান্য গ্যাসের একটিমাত্র স্বরূপ আছে; কিন্তু এর দু'টি স্বরূপ। একটি তরল আর একটি বাষ্পীয়। দু'রকম অবস্থায় আছে ব'লেই দু'প্রকারের ক্ষতি ক'রে।

বিমানের সুমুখের ডানার দু'পাশে এই গ্যাস ছাড়বার জন্যে নলের মত যন্ত্র থাকে। সেই যন্ত্র থেকেই অবিরল ধারায় ছড়াতে থাকে। তিন শত ফুট ওপরে বায়ুর যে স্তর আছে, সেই স্তরের ভেতর বিমান উড়তে থাকে এবং সেখান থেকেই এ গ্যাস ছড়ায়।

মাষ্টার্ড গ্যাসের রং বাদামী রংএর মত। তরল অবস্থায় এর রং অনেকটা সরিষার তেলের মত—আর

বাষ্পীয় অবস্থায় এর কোন রং থাকে না ব'লে খালি চোখে দেখা খুবই কষ্ট। গন্ধ সরিয়ার তেলের মত; কিন্তু ঝাঁঝটা কাচা পেঁয়াজের মত।

তরল অবস্থায় ক্ষতি ক'রবার ক্ষমতা বাষ্পীয় অবস্থার চেয়ে অনেক কম। মানুষের শরীরে যখন এর ছোঁয়াচ্ লাগে, তখন জ্বালা-যন্ত্রনা হয় না বটে; কিন্তু শরীরের চাম্ড়া কিছু সময়ের মাঝে লাল হ'য়ে ফুলে ওঠে এবং একদিনের মাঝেই লাল স্থান ফোস্কায় পরিণত হয়। চোখে এর ছোঁয়াচ্ লাগ্লে ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হয়—আর চোখের সুমুখে সব কিছু ঝাপ্সা হ'য়ে ওঠে।

বাষ্পীয় অবস্থায়ও তরল অবস্থার মত শরীর লাল হ'য়ে ফুলে উঠেই ফোস্কা পড়ে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে থাকে; এমন কি এ রকম গ্যাসের ক্রিয়া বেশী হ'লে চিরজীবনের মত চোখকে হারাতে হয়। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিকারক হয় ফুস্ফুস্ আক্রমণ ক'রবার পর। ফুস্ফুস্ ক্রমশঃ দূষিত হ'য়ে ফুলে ওঠে এবং পরিশেষে কঠিন ব্যাধিতে আক্রমিত হয়। শ্বাসনালী দিয়ে যাবার পর সাধারণতঃ স্বরভঙ্গ হ'তে চায়।

পোষাক ভেদ ক'রতে মাষ্টার্ড গ্যাসের সময় লাগে পাঁচ মিনিট এবং জুতোর চামড়া ভেদ ক'রতে প্রায় আট ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। এই নির্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ২।৩ মিনিটের আগেই জল অথবা পেট্রোল দিয়ে মুছে ফেল্লে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ব্লীচিং পাউডারের সংস্পর্শে এর কার্য্যকরী ক্ষমতা অনেক কমে যায়।

(৪) লিউইসাইট্ঃ—এ রকমের গ্যাস্ও মাষ্টার্ড গ্যাসের মত দু'রকম অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়। এটাও খুব স্থায়ী শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত; কিন্তু মাষ্টার্ড গ্যাসের মত বেশী স্থায়ী নয়।

বাষ্পীয় অবস্থায় নাকে প্রবেশ করার পর ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হয়। অনেক সময় ফুস্ফুস্, চোখ ও নাক ভাল ভাবে আক্রমণ ক'রতে পারলে চিরজীবনের মত নষ্ট করে। তবে শরীরের চামড়ার বেশী ক্ষতি ক'রতে পারে না। তরল অবস্থায় চোখ আক্রমণ করে প্রথমে এবং বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। শরীরের নানা স্থানেও মাষ্টার্ড গ্যাসের ফোস্কা পড়ে যায় লাল হ'য়ে।

মানুষ খালি চোখে বাষ্পীয় অবস্থায় এর কোন রং দেখ্তে পায় না। তরল অবস্থায় এর কোন রং থাকে না ব'লে জলের মত দেখায়। মাষ্টার্ড গ্যাসের মত জল দিয়ে মুছে ফেল্লে একে শক্তিহীন করা যায়।

তাই মনে হয় যে এর পর যদি যুদ্ধমান জাতি এ নিয়ে তাণ্ডবলীলা ক'রে, তাহ'লে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের অনলে মানুষের অসংখ্য প্রাণ বিনা পরিশ্রমে নষ্ট হ'য়ে যাবে সেটা নিশ্চিত।.....

.....ততক্ষণে সাইরেণে মোক্ষ-ধ্বনি বেজে উঠেছে। শত্রুর প্লেনের আসবার আর কোন সম্ভাবনা নেই কিন্তু বায়ুর সাথে গ্যাস্ মিশে যাওয়ার জন্যে শ্লিটট্রেঞ্চে আশ্রিত ভয়ার্ত সহরবাসীর মাঝে কেউ কেউ সটান শুয়ে পড়ে কাত্রাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়—আর কেউ বা খোলা মাঠে চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে দৌড়াচ্ছে গ্যাসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

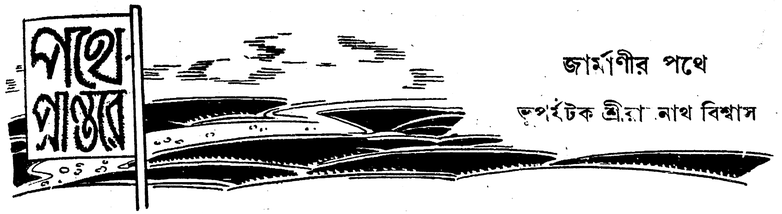

জার্মাণীর পথে

ভূপর্যটক শ্রীযুত নাথ বিশ্বাস

পূর্বে বলেছিলাম একজন ড্যাচম্যান্ আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছিল। এরূপ করে হাসা ভয়ানক অসভ্যতা। ঘর থেকে বের হয়ে যখন আমি ড্যাচম্যান্টির সামনে দাঁড়ালাম, তখন সে আমাকে কতকগুলি কথা বলে। লোকটির কথা শুনে আমার মাথা নত করতে হয়েছিল। তার কারণ কি সেই কথাটাই এখন বলছি।

ছোট বেলায় আমি লেখাপড়া মোটেই করিনি। তারপর যখন দেশ ভ্রমণ করতে বের হলাম তখন দরকার হল নানারূপ অভিজ্ঞতার। আমাকে সেই অভিজ্ঞতা ভ্রমণ পথেই যোগাড় করতে হয়েছিল। তোমরা অনেকেই হয়ত নাটক নভেল পুড়ে সময় কাটাও, কিন্তু যখন বিদেশে যাবে তখন দেখবে তোমাদের মত কিশোর কিশোরী কত রকমের বড় বড় বই হাতে করে রাতকে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা নানা রকমের জ্ঞান অর্জন করছে। আমাকেও ঐ ড্যাচম্যান্ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বলেছিল। আমি তার কথায় রাজি হই এবং সেদিনই তার সংগে একটি লেকচার হাউসে যাই। আমি ইংরাজি ছাড়া আর কিছু জানতাম না বলে লেকচারগুলি ইংরাজিতেই হয়েছিল। তারপর সেই লেকচার শুণে আমি কি বুঝেছি তাই পুনরায় বলতে বলা হল। এটা যেন একটা স্কুল। আমি যা শুনেছিলাম তাই বললাম। এখানে মনে রাখতে হবে, আমরা যেমন বাজে কথা বলে সময় কাটাই, ইউরোপের লোক সেরূপ বাজে কথা মোটেই বলেনা। যারা বাজে কথা বলে, তারা কিছুই গুছিয়ে বলতে পারেনা। আমি বাজে কথা বলা অনেকদিন ছেড়েছিলাম বলেই সকল কথার জবাব গুছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। ড্যাচম্যান্টি আমার কথা শোনার পর বুঝতে পেরেছিল আমি শুধু মাইল ভ্রমণ করিনি স্থানীয় সংবাদও সংগ্রহ করতে বেশ পরিশ্রম করেছিলাম।

পর্যটক যদি পথের দুপাশের দৃশ্যাবলীর কথা এবং কি খেল আর কি দেখল বলেই পর্যটক কাহিনী শেষ করে তবে তা ঠিক ঠিক পর্যটন বলে গণ্য হয় না। ভাবের আদান প্রদানও করতে হয়। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন হার হিট্লার জার্মাণী হতে কমিউনিষ্টদের নিপাত করছিলেন। তখন জার্মাণীতে পুরাদমে জাতীয় সোসিয়েলিজ্ম্ চলছিল। তারই ফলে যারা স্বাধীন ভাবের ভাবুক তাদের জার্মাণী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। হল্যাণ্ডেতে জার্মানী হতে নির্বাসিত অনেক ইহুদী এসে বসবাস করছিল। তারা ছিল সবাই শিক্ষিত। তাদের অবস্থা ছিল উন্নত ধরণের। সেজন্যই তাদের কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত।

লেক্চার শেষ হয়ে যাবার পর একজন শিক্ষিত জার্মান ইহুদী এসে আমার সংগে পরিচয় করেন এবং বলেন, 'এই দেখুন মশাই আমার পাসপোর্ট খানা। জার্মানী হতে বের হয়ে আসতে পেরেছি কিন্তু ইউরোপ ছেড়ে অন্যত্র যাবার আমার কোন উপায় নাই। এখানে কাজ পাওয়া যায় না, কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে আছি।" আমি সেই জার্মান ইহুদীকে বললাম, "আপনার জার্মান বলে পরিচয় দিয়ে জার্মানীতে থাকতে কোন আপত্তি আছে কি?

ইহুদী লোকটি আমার হাত ধরে বলল, "আমরা কখনও নিজেদের ইহুদী বলে পরিচয় দেইনা, আমাদের যে খৃষ্ট ধর্ম নয় তাও বলিনা, এরূপ অবস্থায়ও আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"

—"আপনাদের কেউ কি জার্মানদের কোন ক্ষতি করেনি ?"

—"একত্রে থাকতে হলে অনেকে অনেক কাজই করে, তা কি গ্রাহ্যের মাঝে আনতে ইয় ?"

ইহুদী ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি শুধু ভাবলাম যখন জার্মানীতে যাব তখন দেখব এবং জানব কেন জার্মানী হতে ইহুদীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন আবার বলছি এসব কথা ভ্রমণ কাহিনীতে না লিখলেও চলে, কিন্তু আমি অন্য ধরণের পর্যটক তাই আমি এসব কথা যদি না লিখি তবে ভাবব আমার ভ্রমণ কাহিনী লেখা সম্পূর্ণ হল না।

আমরা যে রুমটাতে বসেছিলাম সেই রুমটা সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। বাইরে এসে ঠাণ্ডা বাতাস বেশ করে টেনে পাইচারী করতে লাগলাম। কতক্ষণ হাঁটবার পর ঠিক করলাম আর দুটি দিন ভিয়েন্-এ কাটিয়ে জার্মানীর দিকে রওয়ানা হব। দুটো দিন ঘুমিয়ে কাটাই নি, দস্তর মত নানা বিষয়ের চর্চ্চা করতে হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকাল বেলা প্রাহার (প্রাগ্) দিকে যখন রওয়ানা হলাম তখন একজন ভিনিক্ যুবক আমার সংগে এসেছিল। কোন বড় নগরে অথবা শহরে সাইকেলে প্রবেশ করাটা বড়ই সোজা কিন্তু বের হয়ে আসা বড়ই কঠিন। যুবক আমাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য অনেক দূর এসেছিল। পথে তারও পথ ভুল হয়েছিল। সে একজন পুলিশের লোকের সংগে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। পুলিশের দোষ হল, লোকটি পথের কথা ঠিক ঠিক করে বলতে পারেনি। আমাদের দেশে যদি কোন পুলিশকে পথের সন্ধান জিজ্ঞেস কর তবে সে কথার জবাব দেয়না। তারপরও যদি কথা বল তবে সে হয়ত ধমক দিয়ে বলবে,—তেরা বাপকা নকর হে ? অর্থাৎ আমি তোমার বাবার চাকর নাকি ? অষ্ট্রিয়ান দেশের যুবকের পুলিশকে ধমকানি দেখে তখন দেশের পুলিশের কথা মনে হয়েছিল। যুবকটিকে বিদায় দিয়ে আমি হাই ওয়েতে এসে পড়লাম।

আমরা যাকে প্রাগ্ বলি স্থানীয় লোক তা না বলে প্রাহা বলে। আমি চলেছিলাম প্রাহার দিকে। ভিয়েন হতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত পঁচাশি মাইল পথ। ইচ্ছা করলে পঁচাশি মাইল পথ এক দিনেই যেতে পারতাম কিন্তু ষ্টকারু নামক একটা শহরে রাত কাটাব বলে ঠিক করলাম। এদিকে পথে চলতে বেশ ভাল লাগত কিন্তু শহরে পৌছবার পরই অসুবিধায় পড়তে হত। সে অসুবিধাটা কত বিপত্তি জনক তা বললেই বুঝতে পারবে।

ষ্টকারু - ষ্টকারুতে পৌছবার এক মাইল পথ বাকি ছিল, এরই মাঝে কয়েকজন লোক আমাকে দেখতে পেয়ে সাইকেল নিয়ে আমার পেছন নিল। তাদের আমার পেছন নিতে দেখতে পেয়ে আরও কতকগুলি যুবক এবং যুবতী তারাও পেছন নিল। আমি যখন শহরে পৌছলাম তখন আমার চারদিকে প্রায় পাঁচশত লোক একত্রিত হয়েছিল। এরূপ করে অনেক লোক একত্রিত হয়ে আমাকে সম্বর্দ্ধনা অনেক স্থানেই অনেক দেশের লোকই করেছে। কি করে জনতার হাত হতে রক্ষা পেতে হয় তাও আমি জানতাম। তাই কোথাও না থেমে একদম পুলিশ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পুলিশের সাহায্যেই হোটেল ঠিক করলাম।

হংগেরী অথবা পূর্ব অষ্ট্রিয়ার লোক কখনও আমার পেছন নেয়নি। এদিকে কিন্তু আসার পরই লোক আমার পেছন নিতে শুরু করল দেখে আমার নানা কথা মনে আসতে লাগল। তোমরা বোধহয় জাননা ইউরোপে ছেলে বুড়ো সবাই মিলে পলিটিক্স্ চর্চ্চা করে। যে অঞ্চলে কোনরূপ উত্তেজনা নাই তথায়ই বৈদেশিক পর্যটককে দেখলে আনন্দ করবার জন্য দলে দলে লোক বেরিয়ে আসে। কিন্তু যেখানে পলিটিক্স্ নিয়ে চর্চ্চা হয় অর্থাৎ কিছু ঘটবে বলে মনে হয়, সেখানে সর্বসাধারণ একদম চুপচাপ থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই জান চীনাদের মত শব্দ-প্রিয় জাত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই, কিন্তু ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি সাংহাই গিয়েছিলাম এবং তখন

দেখেছিলাম কোথাও কোন শব্দ নাই। রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমা, থিয়েটার এসব স্থানে চীনাদের দেখতেই পাওয়া যেত না। চীনারা আমাদের চেয়ে কম কথা বলে এটাও বোধ হয় তোমরা বেশ ভাল করেই জান কিন্তু সাংহাইএ দেখেছি চীনারা মোটেই কথা বলে না, চোখের ইংগিতে আপন আপন কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। জার্মানীতেও সেরূপ অনেক দৃশ্য দেখেছি।

ষ্টকারু শহরটা বেশ ছোট এবং পরিষ্কার। বিকাল বেলা শহর দেখতে বের হব এমন সময় হোটেলের মালিক আমাকে জানালেন যে কয়েকজন লোক আমার সংগে দেখা করতে চান। আমি তখন আমার রুমেতেই ছিলাম। লোক আসছে শুনে আমি মোটেই সুখী হইনি, কারণ এদিকে মুখ খুলে কথা বলা বড়ই মারাত্মক। প্রত্যেকটি কথার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এদিকে বসে থাকাও চলেনা।

গ্রেট বৃটেন বাদ দিয়ে সমুদয় ইউরোপটাকে 'কন্টিনেন্ট' বলে। কন্টিনেন্টে ইংরাজি ভাষা মোটেই চলেনা। ফরাসী ভাষারই চলন বেশি। সুখের বিষয় যারা আমার সংগে কথা বলতে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ইংরাজি বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেশের ভৌগলিক তথ্য, সামাজিক নিয়ম, ধর্মের বিভিন্নতা এসব প্রশ্ন নিয়েই আগন্তুকরা কথা বলেছিলেন বেশি সময়। আগন্তুকদের মাঝে দু একজন ইহুদীও ছিলেন। তাঁরাও আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দেইনি কারণ সেই প্রশ্নগুলি আমার প্রসংগের বাইরে ছিল।

এখন কথা হল, মধ্য ইউরোপের লোক বিদেশীকে দেখলেই কথা বলতে চায় কেন ? তার একমাত্র উত্তর হল, মধ্য ইউরোপে বিদেশীরা কম যায় এবং সেজন্যই সুদিনে মধ্য ইউরোপবাসী বিদেশীকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে ভালবাসে। অনেকেই হয়ত ভাবতে পার, আমাকে এমন কি প্রশ্ন করেছিল যার উত্তর দিতে আমি রাজি হইনি এবং সেই প্রশ্নগুলিই বা কি হতে পারে। যে সকল প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা আমার ব্যক্তিগত জীবন-চরিত নিয়ে, কারণ বৎসরের পর বৎসর ঘুরে বেড়ানটা তাদের মতে একটা বাহাদুরী নয়, এটা মনের একটা দুর্বলতা মাত্র। আমার মন দুর্ব্বল কি সবল তা আমার কাজকর্মই তার পরিচয় দেবে। প্রশ্নকারীরা আমার কাজকর্মের কিছুই দেখেন নি বলেই নানারূপ ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করেছিলেন। [ক্রমশঃ

বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের এই বইগুলি পড়ো।—

তরুণ তুর্কী—	১৸০
আজকের আমেরিকা—	২৷৷০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরণ বিজয়ী চীন—	৩৷৷০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	২৷৷০

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

কিশোরদের মনকে 'সুদূরের পিয়াসী' আর অভিযান বিলাসী করে গড়ে তোল্‌বার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে শিশু সাহিত্যের সব্যসাচী শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত ও সম্পাদিত

* অভিযান সিরিজ *

প্রতি মাসে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হবে। প্রথম প্রকাশ—সরস্বতী পূজোর দিন এখন থেকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হও। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ মাত্র।

অভিযান পাবলিশার্স

২০৩।২বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আজব হলেও গুজব নয়!

(সংগ্রহ)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

চড়ের চর্চ্চড়ি—

লিথুয়ানিয়ার এক অদ্ভুত রকমের খেলা, পরস্পরকে চড়ানো। দু'দল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়া তারপর এ ওর সাম্‌নের লোকটির গালে ঠাস্ করে' এক চড় বসায়, তারপর সেই লোকটি ফিরে একে ঘুরে কসায় এই রকম পরস্পর পরের পর চল্‌তে থাকে। একজন জোয়ান মর্দ্দ তার বলিষ্ঠ বাহু ঘুরিয়ে গায়ের সমস্ত জোর দি অপর জনকে চর্চ্চড়িত করছে—নিজেকে সবলে এবং স্বহস্তে অপরের গালে নিক্ষেপ করছে—যে সয় সে মহাশয়- কিন্তু বাহিরের কারো পক্ষে এ দৃশ্য দেখা সহজ নয়। যারা চড় খাচ্ছে না, তাদের পক্ষেই এই দেহ চর্চ্চা কঠি আরো! এই খেলায় আবার বাজিও ধরা হয়ে থাকে। যে বেশিক্ষণ হাত চালাতে পারে তারই জিত। ওস্তা চপেটাঘাতকারীদের কেউ কেউ ছত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চড় চাপড় চালিয়েছে এমন রেকর্ড আছে।

চৈনিক দেহচর্চ্চা—

চীনেও এই ধরণের দেহের পীড়াদায়ক খেলার চলন দেখা যায়। তবে তাদের হচ্ছে গালে চড়ানো ন পেটে গুঁতো মারা। এ ও পেটে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ধাক্কা মারে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই অঙ্গুষ্ঠ লীলা চল থাকে। যার পেটের মাংসপেশী শক্ত সেই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে আর টেঁকসই হয়ে জিতে যায়। যে আগে বল "হয়েছে বাবা, আর নয়, রক্ষা করো! এবার ক্ষমা দাও!"—তার হার। তবে এমনো দেখা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বি কারো মুখ দিয়েই ও কথা বেরয়নি—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ আর কি! কিম্বা পেট ফাটে তো মুখ ফোটে তাও হতে পারে!—অবশেষে দুজনেই পিলে ফেটে মারা পড়েছে।—

জাপানী হারিকিরির চৈনিক অনুবাদ আর কি!

কুকুরের অদ্ভুত বুদ্ধি—

বিলেতের চেশ্যায়ার অঞ্চলের ওয়েস্‌ট্ কির্‌বি নামক স্থানে টেল্‌স্ টাওয়ার নামে পঁচিশ ফুট উঁচু এক মনুমেণ্ট খুব বিখ্যাত। টেল্ নামের এক কুকুরের স্মৃতি-স্তম্ভ হচ্ছে ওটি। এই কুকুরটির বুদ্ধির খুব প্রসিদ্ধি ছিল একবার সে একলাই বহু দূর থেকে মাঝ খানের নদী পেরিয়ে নিজের বাড়ীতে এসে পৌচেছিল—যদিও সেই প তার আগে আর কখনো তাঁর যাতায়াত ছিল না।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই, তার মনিবকে হঠাৎ কি কাজে ওয়েস্‌ট্ কির্‌বি থেকে অনেক দূরে যেতে হয় যাবার সময়ে তিনি ট্রেনেই গেছলেন, সঙ্গে ছিল টেল্। ফেরার সময়ে তাড়া হুড়ায় বা ভুলক্রমে কুকুরকে ফে রেখেই চলে আসেন—কুকুর সেই খানেই থেকে যায় এবং তিনিও, এতদিনে হারিয়ে গেছে মনে করে', কুকুর কারো মুখ চেয়ে বসে' থাক্‌বার ছেলে কি? এই ভেবেই হয়ত) তার আশা ছেড়ে স্থান্।

কিন্তু দিস্ ওয়াজ্ এ ডিফারেণ্ট্ টেল্!—

টেল্ কিন্তু হারাবার ছেলে নয়—হারবার পাত্র ও নয় সে। বাড়ির উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে লিভারপুলের নদীর তটে এসে সে আট্‌কায়! যে সব ষ্টীমার সেখান দিয়ে যাতায়াত করছিল তাদের ওপর লক্ষ্য রাখে। তারপর যখন তাদের গ্রামের ফেরি ষ্টীমার এসে সেখানে এসে লাগে—কোন্‌টা তাদের গাঁয়ের কি করে' সে জানতে পারল সেই জানে—টুপ্ করে' সকলের অলক্ষ্যে তার মধ্যে সে উঠে পড়ে—উঠে এক জায়গায় ঘুপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকে। বিনা টিকিটে চুরি করে' যেতে হলে যে এই ভাবে যাওয়াই দস্তুর। কি করে' তার জানা হোলো তাও বলা যায় না। এম্‌নি করে' নদী পার হয়ে তার পরে সে আরো বহু পথ পায়ে হেঁটে বহুৎ পল্লী জনস্থলী পেরিয়ে অবশেষে একদিন বাড়ী পৌছে বাড়ী শুদ্ধ সবায় তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল—যে তাক্ ক্রমশঃ পাড়া থেকে দেশব্যাপী কালক্রমে ওই মনুমেণ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুকুরের অদ্ভুত বোকামি—

অবশ্যি একে প্রভুভক্তিও বলা যায়। এ আরেকটি কুকুরের কথা। যার কুকুর সে কোনো এক অপরাধের দায়ে ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়। যে আদালতে তার মনিবের বিচার হোতো সেখানে সে মনিবের সঙ্গে প্রত্যহ যেত। কিন্তু তোমাদের জানা আছে বোধ হয় যে বিচার কক্ষের মধ্যে কুকুরের প্রবেশের নিয়ম নাই। এই কারণে যে সময়ে লোকটির বিচার চল্‌ত আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে মনিবের জন্য সে অপেক্ষা করত। অবশেষে একদিন লোকটির সাজা হয়ে জেল হয়ে গেল—তিন মাসের জেল। দণ্ডিত অপরাধীদের আদালতের আলাদা অন্য পথ দিয়ে গাড়োয়া গাড়ী করে' কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে। এ লোকটিকেও তাই করা হোলো—কুকুরটি তা দেখতেও পেল না, জানতেও পেল না। কিন্তু সেই থেকে সে তিন মাস ধরে' সেইখানে প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করেছিল—এক পাও সেখান থেকে নড়েনি—প্রভুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত। তিন মাস পরে লোকটি জেল খেটে বেরিয়ে এলে তখন তাদের পুনর্ম্মিলন ঘটে ছিল, বলা বাহুল্য।

ভগবানের বিজ্ঞাপন—

বাবা বিজ্ঞাপনের এজেন্সিতে কাজ করেন আর আপিসের পরে বাড়ী ফিরে কেবল তাঁর বিজ্ঞাপনের গল্প।

ছোট্ট মেয়েটি ইস্কুল থেকে প্রাইজ পেয়ে ফিরেছে। আরো সব বইয়ের সঙ্গে একখানা রামকৃষ্ণ কথামৃত ও আছে সেই প্রাইজের মধ্যে!

"ও বইটা কি রে?" জানতে চেয়েছেন মা।

"ও কিছু না।" ঠোঁট্ উল্‌টে বল্ল মেয়েঃ "এতে খালি ভগবানের বিজ্ঞাপন।"

দিতে চাইলেও দেয়া যায় না!—

"বঙ্কু, মুখ নাড়চ যে বড়ো? এসে তো এখানে, তোমার মুখের মধ্যে কি আছে দেখি, দাও আমায়।"

স্কুল মাস্টার কড়া গলায় তাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন।

"দিতে পারলে খুব খুসি হতাম সার্। আমার মুখের মধ্যে যা, তা দেবার উপায় নেই। দেখানোও যায় না।"

"দেবার উপায় নেই, বটে? এক চড়ে বের করে' আন্‌ছি—দেখি কি আছে।"

"আজ্ঞে, আর কিছু না, দাঁতের ব্যথা।" বল্ল বঙ্কু।

ছড়ি যদি ছড়িয়ে যায়!—

বছর পঞ্চাশ আগে বার্ম্মিংহামে এক যুবক গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে ছড়ি বানিয়ে ছিলেন। তারপর বাড়ী ফিরে তাঁর পেছন দিককার বাগানে ছড়িটাকে অবহেলা ভরে' ছুঁড়ে ফেলে ছান্। পড়ার বেকায়দায়, ছড়িটা মাটির মধ্যে গিয়ে পুঁতে যায়। এখন সেই ছড়ি লম্বা চৌড়া এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সে-ই এখন কতো ছড়ির জন্মদাতা!

উপযুক্ত পুরস্কার—

একজন চীনেম্যান্ এক য়ুরোপীয়ের হারিয়ে যাওয়া একটা হাত ব্যাগ ফিরিয়ে দেয়। তাতে ছিল চার হাজার পাউণ্ড—পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি। উক্ত য়ুরোপীয়টি তাকে দশ শিলিং—পুরস্কার দিয়ে বাধিত করেছেন। বেড়ালের ভাগ্যে সিকেই ছেঁড়ে, সে কথা মিথ্যে নয়, কিন্তু এই শ্বেতাঙ্গটিও চিনে রাখবার মতো।

অ্যানাটমি কাকে বলে?—

একটি ছেলে, হাইজীনের খাতায়, অ্যানাটমি কি—সেই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে—

অ্যানাটমি হচ্ছে মানুষের দেহ; তার তিনটি ভাগ—মাথা, বুক আর পেট। মাথায় চোখ আছে এবং ঘিলুও আছে (যদি থাকবার হয়); বুকের ভাগে আছে ফুস্‌ফুস্ আর যকৃত; আর পেটের দিকে আছে, তার বাংলা জানি না, পাকস্থলী না, পাকিস্থান না কি ইংরাজীতে যাকে বলে bowels তাই। বাওয়েল্‌স্ সব শুদ্ধ পাঁচ প্রকার, যথা—a, e, i, o, u—এবং কখনো কখনো y এবং w।

যল্গু স্রোত কাহিনী

শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত

স্বামী তার ফিরে এসেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে···ইলিয়ার আনন্দ আজ আর ধরে না। ···ছোট বাগানটির মাঝখানে তাদের বাড়ী। ···বাগান আছে কিন্তু বাগানের অস্তিত্ব ছিল না একটুও। বাড়ীটা পুরোন তবুও দেখলে বোঝা যায় বাড়ীখানা ভালই ছিল এককালে···এখন তার স্থানে স্থানে ভাঙ্গা—চূণ সুরকি খসে পড়ে বাইরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে দিয়েছে—তবুও বড় বড় থামগুলো তার অতীতের সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দেয়। নাজিদের··· অত্যাচারে ইলিয়ারা উঠে এসেছে এইখানে।···

ইলিয়া আর তার স্বামী সেভিও বাইরের বারান্দায় বসেছিল—ছোট ছেলেটি তার বৃদ্ধ ঠা'মার কাছে বসে একটা বেড়াল নিয়ে খেলা করছিল একমনে। ···অস্তগামী সূর্য্যের আবছা আলো দু'জনের উপর অস্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।···সেভিও যুদ্ধের গল্প করে তার মাতৃভূমির—ইলিয়া মুগ্ধ হয়ে যায় তার স্বামীর বীরত্বে—তার হৃদয় আনন্দে অধীর হয়ে উঠে, সেভিও বলে: জান ইলিয়া, যত রক্ত রাশিয়ার বীররা তাদের মাতৃভূমির জন্য ঢেলে দিয়েছে—তার দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে তারা ··রাশিয়ার পরাজয় হয়নি কখনও আর হবেও না।···

অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে ইলিয়া: নাজিরা কতদূর এসেছে সেভিও?···

···তারা লেলিনগ্রাদ অধিকার করে নিয়েছে ইলিয়া তারপর আরও এগিয়ে এসেছে অনেকটা···উদাস ভাবে উত্তর দেয় সেভিও। ভীতা ইলিয়া স্বামীর কাছে সরে আসে। তারা লেলিনগ্রাদ পার হয়ে এসেছে সেভিও?···গ্রামে থাকলে খবর কিছুই পাওয়া যায় না। সেভিও সান্ত্বনা দেয়···তারা সরে যাবে নিশ্চয়ই—আমরা বাধা দিচ্ছি খুব···

ইলিয়ার বিশ্বাস হয় না সেভিওর কথা। মনে হয় সেভিও—তার স্বামী তার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে, বলে: তুমি সত্য করে বলো সেভিও তারা এখান থেকে কত দূরে আছে?···তুমি বলো, আমি একটুও ভয় পাব না···তুমি জান আমি রাশিয়ার মেয়ে; ভয় আমাদের মজ্জাগত নয়।···

সেভিও একটু গম্ভীরভাবে বলে: এখান থেকে পচিশ মাইলের মধ্যে তারা আছে—তবে ভরসা মাঝের বড় নদীটা···। একটু শিউরে ওঠে ইলিয়া—মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে এসেছে তারা। সভয়ে বুকের মাঝে তুলে নিয়ে ছেলেটাকে···অজ্ঞাতসারে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।···সেভিওর কোলে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে বলে: তুমি তো কালই আবার চলে যাবে যুদ্ধে···তার আগে তুমি একে আশীর্ব্বাদ করে যাও, ও যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদের ফুলের মত নিষ্কলঙ্ক হয়ে বেঁচে থাকে···

সেভিওর সবল হাতখানা ছেলের মাথায় নেবে এলো···

সন্ধ্যার বুকে তখন আবছা অন্ধকারের যবনিকা নেবে এসেছে। ইলিয়া উঠে গেল রান্না করতে, তার মনে জমাট একখানা মেঘ।···

···নাজির অত্যাচারে মাতৃভুমি আজ জর্জ্জরিত।···লক্ষ লক্ষ অসহায়কে তারা করেছে গৃহহারা··· আহতদের আর্ত্ত চিৎকারে রাশিয়ার আকাশ বাতাস আজ ভারী হয়ে গেছে।···

সেভিওর সুন্দর মুখখানা প্রতিশোধের তীব্র বাসনায় বিকৃত হয়ে ওঠে···পাশের ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসে ঝিল্লীর রব।

বুম্! বুম্!!—গুড়ুম্!!!

গভীর নিশিথে সুপ্ত পল্লীগুলির বুকে উঠ্‌লো ক্রন্দনের একটা আর্ত্ত রব···তারপরেই চল্‌লো নাজির ধ্বংসলীলা! কালো পুরু পর্দা রাশিয়ার আকাশ থেকে খসে পড়্‌লো—রাত্রির অন্ধকার ধ্বংসের ব্যাভিচার হয়ে ওঠে লাল···

মায়ের বুকে ছেলে কেঁপে ওঠে ভয়ে···ভীতা মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।···ওধারে নিদ্রিতা বৃদ্ধা ভয়ে লেপটা মাথার উপর তুলে দেন—এ ডাক তো তার অজানা নয়···এ যে মরণের ডাক।···

···ও ঘরে ঘুমিয়ে ছিল বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র সেভিও, সসব্যস্তে সে ঘরে ছুটে এলো ইলিয়ার কাছে—দেখলো ইলিয়া ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। কম্পিতা ইলিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সেভিও বলে: ভয় পেয়েছ ইলিয়া? অনেকটা সাম্‌লে নেয় ইলিয়া, বলে: না সেভিও।···

কিছুক্ষণ কাটে নিস্তব্ধে···সেভিও বলে: আমায় যেতে হবে ইলিয়া···

সভয়ে শিউরে ওঠে ইলিয়া: কোথায় যাবে তুমি?

—যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে···নাজিরা আক্রমণ চালাচ্ছে—তারা অগ্রসর হচ্ছে···আমার দেশের আহ্বান এসেছে, আমায় যেতে হবে। চোখের জল মুছে অস্ত্রসস্ত্রে স্বামীকে সাজিয়ে দেয় ইলিয়া—সে যে রাশিয়ার মেয়ে···তার চোখে তো অশ্রু মানায় না···

আবার গর্জ্জে উঠল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রণদেবতা!!

সেভিও ব্যস্ত হয়ে উঠে। অশ্রুর মাঝে স্ত্রী-পুত্রকে চুম্বন করে বৃদ্ধার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে যায় মরণের আহ্বানে সাড়া দিতে···

সেভিওর গমন পথের পানে দৃষ্টি মেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ইলিয়া···সারারাত সারাদিন ধরে চলে ধ্বংসের লীলা অবিশ্রান্ত ভাবে।··· নিরাশ্রয়দের হাহাকার···আহতদের আর্ত্ত চিৎকার---নাজি সৈন্যদের জয়ধ্বনির মাঝে কম্পিত হৃদয়ে অভুক্ত অসহায় ছেলেটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে সে···। আবার ধরণীর বুকে দেখা দিল সন্ধ্যা···নাজির জয়োল্লাসে রাশিয়ার আকাশ ওঠে কেঁদে···কালের কপোল তলে বুঝি বা সব লোপ পেয়ে যায়···

এমন সময় খবর এলো সেভিও যুদ্ধের বেদীতে প্রাণ বলি দিয়াছে। ইলিয়া মাটিতে পড়ে মূছিত হয়ে!

···কতক্ষণ কেটেছে ঠিক মনে নেই তার; কাদের অট্টহাসিতে তার মূর্ছা কেটে যায়···চোখ তুলে দেখে তার ঘরে কতকগুলি নাজিসৈন্য···ওপাশে রক্তাক্ত বৃদ্ধার মৃতদেহ সৈন্যদের পায়ে তলায় লুটিয়ে···

মুহূর্ত্তে ইলিয়া শিউরে ওঠে ··নিদ্রিত ছেলেটিকে বুকের মাঝে তুলে নিয়ে কেঁদে ওঠে···আমায় লাঞ্ছিত বা হত্যা করো—ক্ষতি নেই···কিন্তু স্বামীর শেষ চিহ্ন ছেলেটিকে তোমরা কেড়ে নিও না—

তার কান্নায় পাষাণও বোধ হয় নড়ে ওঠে কিন্তু নাজিদের মন গলল না। তারা অট্টহাসিতে ফাটিয়ে তোলে ঘর; তারপর মায়ের কোল থেকে একমাত্র সন্তানকে ছিনিয়ে এনে সঙ্গিনের মুখে ধরে···

···থাম! পেছন থেকে কে বজ্রকণ্ঠে আদেশ করে। সবাই ফিরে দেখে—তাদের সেনাপতি স্বয়ং···

সৈন্যদের হাত থেকে ছোট ছেলেটিকে কেড়ে নেয় সেনাপতি···তারপর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় তার নরম দু'খানি গাল···তার মনে পড়ে যায় তার সন্তানের সহাস্য মুখখানা···

মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা সন্তানকে মায়ের কোলেই তুলে দেয় সৈনিক শ্রেষ্ঠ।

নাজি সেনাপতির পাষাণ হৃদয়েও আজ বই.ছ ফল্গু স্রোত।

দুর্ভিক্ষের বাজারে হাসির আমদানী! শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও তরুণ রায়ের হাসির গল্পের বই—

'কারুক্ষ হাত দেখিও না'

অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট, চমৎকার গেট্‌আপ, নিদারুণ হাসির গল্প, বইটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।
এ মাসেই বাজারে পাবেন।

দাম মাত্র ॥৵০

আধুনিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক সম্প দিত সচিত্র ছোটদের
সাপ্তাহিক পত্রিকা, আমরা ফাল্গুন মাস হতে প্রকাশ করছি।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। আমাদের গল্প প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের বাড়ী চিঠিতে ফলাফল জানান হোয়েছে। যাঁরা এখনও চিঠি পাননি সত্বর আমাদের চিঠি দিন।

*** অজানা সাহিত্য পরিষদ ***

১০।১, এলগীন রোড, কলিকাতা।

চিঠির বাক্স

আমার বন্ধুরা!

চিঠির বাক্স খুলেই তোমাদের একটি ভাই সাধনচন্দ্র বসুর একটি চিঠি পেলাম। চিঠিটা তাই প্রথমেই তোমাদের উপহার দিছি। "···সারা বিশ্বের উপর বিপর্য্যয় নেমে এল···যা ছিল বিস্ময়ের কল্পনা তা হল বাস্তব। অনেক দিনের মানুষের আশা কল্পনার উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেল। যারা এ ঝড় সহ্য করতে পারলো না, তাদের এ পৃথিবী থেকে সরে যেতে হলো।···কঠিন সংগ্রামের এ জীবন। এই প্রবাহের মধ্যে কত পুরান জীবন ভীরুর মত, কত পুরান জীবন বীরের মত অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে সৃজন করে দিয়ে গেল নূতন বীরত্বের প্রেরণা। কিন্তু তবু কি একটুও নূতন সৃষ্টি এলো? এলো তো শুধু পরিবর্ত্তন। ···এ পরিবর্ত্তনের কাল শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে সেই পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে শান্ত, সুস্থির। কত আলো, কত বাতাস তার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো।···সে যেন মিষ্টি দিনের পৃথিবী···সে অনাগত দিন আসছে কি দিদিভাই?···"

তোমাদের সঙ্গে আমিও আশায় তাকিয়ে আছি সেইদিনের প্রতীক্ষায়। যেদিন আসবে সেই শান্ত, সুস্থির পৃথিবী,—যে পৃথিবীর বুকে হানাহানি, রক্তারক্তি নেই—সে পৃথিবীর বুক নির্ম্মমভাবে বিদীর্ণ করা হচ্ছে না। সেই সুন্দর সবুজ পৃথিবী আর সাম্যের যুগ···কবির ভাষার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছা হয়—

আত্মা আমার চেয়ে আছে যেন মেলি অনন্ত আঁখি
মহেন্দ্রক্ষণ উদয় ঊষার আরো কতদিন বাকী?

দেবব্রত চ্যাটার্জ্জি (২০৫৫) জব্বলপুর। সাধনকুমারের চিঠি পর তোমার পেনসিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা মিষ্টি চিঠি চমৎকার, ওতে তোমার মনের সব কথা জানা যায়। রংমশালের সব কথা রংমশালেই লেখা আছে, ভালো করে দেখে নিও। তোমার ছোট পিসিমা যে খুব ভাল তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। **সুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায়** (১৯৭৩) বোলপুর। তোমাদের লেখা যা আমরা পাই তা নির্ব্বাচন করে ছাপানর ভার সম্পাদক মহাশয়ের অথবা পরিচালক মহাশয়। যদি মনোনীত হয় তাহলে নিশ্চয় ছাপা হবে। লেখার নকল রাখবে—কারণ ছাপাখানা বা সম্পাদকীয় দপ্তরে বড্ড ভূতের উপদ্রব। যাঁদের ঠিকানা চাও রংমশালের C/o. চিঠি লিখলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বোলপুরে অন্য গ্রাহক থাকে আলাপ করতে চাও একথা জানিয়ে দিচ্ছি, তারাই জানাবে। **অসীম দেব গোস্বামী** (১৬৮২) কলিকাতা। তুমি যে লেখনীবন্ধু কাকে চাও বা সেটা বুঝতে পারোনি কেন তা বুঝলাম না। আমিই কথাটা পড়ে হতাশ হয়ে পড়েছি। গ্রাহক-দের মধ্যে যে অপর গ্রাহকের সঙ্গে আলাপ করতে চায় সে ষ্ট্যাম্প পাঠিয়ে ঠিকানা নিয়ে পত্র লিখে 'লেখনী বন্ধু' করে নেয়—অবশ্য ইচ্ছা করলে পরে তারা নিজেরা 'সাক্ষাৎবন্ধু'ও হতে পারে,—সেটা তাদের ইচ্ছা। গ্রাহক গ্রাহকের সঙ্গে এবং গ্রাহিকা গ্রাহিকার সঙ্গে আলাপ করবে। **সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ** (২০৪৯) কুলনা। তোমাদের চিঠি পড়ে কিছু বুঝলাম না। তোমরা যদি কার্ত্তিক মাস থেকে গ্রাহক হয়ে থাক তাহলে পেয়ে আগের মাসের রংমশালগুলি পাবে? বিশেষ সংখ্যাগুলি এত বেশী বিক্রি হয়েছে যে আর নেই। আষাঢ় বা ভাদ্র সংখ্যা না পেলে যদি চলে তাহলে টাকা পাঠাও। **অজিতকুমার সেনগুপ্ত** (১৯৩১) গুঠিয়া।

তোমার চিঠিতে যে চিত্র দেখলাম এরকম চিত্র কোলকাতার রাজপথে অহরহঃ দেখছি ভাই, তোমরা ছোট হলেও তোমাদের কাজ ছোট নয় একথা মনে রেখো। যেটুকু তোমার ক্ষমতা তুমি তাই করো। **প্রবোধচন্দ্র বসু** (১৭৭৪) মেদিনীপুর। তুমি লিখেছ রংমশালের সমস্ত বিভাগই পরিপূর্ণতার ভারে ভরপুর···ঠিক তার পরেই খাগড়া থেকে রথীনের চিঠি অনুযোগে, অভিযোগে—দুর্য্যোগ বাধিয়ে তুলেছে। আমরা কি করবো বলতো? **সুধীর দাস,** সিটি ক্লাব—দিল্লী। তোমাদের প্রীতির অর্ঘ্য আমরা সসম্মানে গ্রহণ করেছি। 'দরিদ্রের কুটীরেই সেই মহামানবের আবির্ভাব হবে' গুরুদেবের একথা মনে রেখে কাজ করো। তোমাদের পিছনে আমার শুভকামনা আছে জেনো। লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে গেছে। **বিনীতা ঘোষ** (১৪৮৯) কোলকাতা। ভাই, তোমাদের বাড়ীর দুঃসংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলাম। সান্ত্বনা যদি মন থেকে না পাওয়া যায় বোন—কেউ দিতে পারে না, তুমি তো তোমার দাদুর মত হতে পারো—তিনি যে গুণের অধিকারী ছিলেন—সেগুলির সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ যোগ রেখো। **সমরেন্দ্র, নীলিমা, উমা চক্রবর্ত্তী,** আজমীর। তোমরা দুঃখ পেলে সে দুঃখ আমারও লাগবে যে! ভুল বোঝার পালা শেষ হয়েছে তবে আর ওকথা কেন? ষ্ট্যাম্প পাঠাও তাহলেই বন্ধু পাঠান হবে। **পার্ব্বতী বাগ্‌চি, নমিতা, মমিতা রায় চৌধুরী** (কুষ্টিয়া)। রংমশালের সব কথা ওর গায়েই লেখা আছে, দেখে নিও। **বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী** (২০৩৭)। সম্পাদক মহাশয়কে গল্প লিখতে বলেছ নিশ্চয় তিনি লিখবেন। লেখাগুলি বিচার হলে ফলাফল দেখতে পাবে। **রেবা গাঙ্গুলী** (৪৭৮) লাকসার। সুজাতা রক্ষিতের কোনো খবর আমরা জানি না। ইন্দিরাদি জিজ্ঞাসা করেছেন কি সেলাই তোমরা জানতে চাও? কাঁটার না সূঁচের অথবা অন্য কিছু? **গোপালচন্দ্র পাল** (১৯৬৩) উত্তরপাড়া। তোমার পাঠান টাকা আমরা পেয়েছি। ঐ সংখ্যাগুলি পাঠান হয়েছে আশা করি এতদিনে পেয়েছ। **রণজিৎ ঘোষ** (১৭১১) জাজান ছুলির ওষুধ গঙ্গামাটি—একথা মাকে জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারতেন—ডাক্তারী ওষুধ যদি চাও ডাক্তারের পরামর্শ নিও। সাধারণভাবে আমরা বহু জায়গায় দেখেছি গঙ্গমাটীতে কাজ হয়েছে। নাম আর ফটো ও দুটোই আমার নেই! **নির্ম্মলকুমার রায়** (১৮৭০) কলিকাতা। এক বাড়ীতে একই কাগজের একজনের বেশী গ্রাহক হওয়া সম্ভব নয় সেইজন্য আমরা ঠিক করেছি গ্রাহক নম্বরটা তাদের সকলের নামের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া। গ্রাহক নম্বরের তারতম্যের যে প্রশ্ন করেছ তা লিখে বোঝান যাবে না ওরকম হয়। গ্রাহকদের চিঠির উত্তর এই বাক্সে দেওয়া হয়—পৃথকভাবে হয় না। অভাবীদের সাহায্য সম্পর্কে তোমার মত সত্যই প্রশংসনীয়। সব গ্রাহকই তো বড় নয়—ছোটও আছে—লেখা একটু ভাল হলেই আমরা ছাপাই তাদের উৎসাহ দেবার জন্য। তবে 'অচল'গুলো কেমন করে 'সচল' করা যায়, বিচারটা আমাদের উপরেই রাখা উচিত। আশাকরি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ? **বিনয়কৃষ্ণ বসু** (২০০৭) বোলপুর। তুমি তো একজন বোলপুরের অধিবাসী—ইচ্ছা করো তো সুনীলের সঙ্গে আলাপ করো। **সাধনচন্দ্র বসু** (১০২৩) তোমার দ্বিতীয় পত্রে দেখলাম, বাংলাদেশের বিভিন্ন ছড়া, রূপকথা, ঘুমপাড়ানি গান, বাউল গান, কবি গান —তুমি সংগ্রহ করেছ, রংমশালের বন্ধুদের এবিষয়ে সাহায্য করতে বলেছ, তারা তোমায় সাহায্য করবে কেমন করে, আমি বুঝতে পারছি না,—তাহলে তাদের আগে তো তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হবে আমাদের কাছ থেকে। **'ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি'**র সম্পর্কে আমি অনেক লেখা পেয়েছি। তোমাদের মনে আছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটদের আসর থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছিল—এ চিঠিগুলি সেই সংক্রান্ত। এবারে স্থানাভাব, পরের বারে সেগুলি তোমাদের উপহার দেবো। **সত্যেন্দ্রনাথ কার্ত্ত**

(পাটনা), **নীহার চক্রবর্ত্তী** (রায়গঞ্জ,) **ধীরেন চন্দ্র চৌধুরী** (চট্টগ্রাম), **বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য** (মোগলসরাই), **অমিয়া চট্টোপাধ্যায়** (পুরুলিয়া), **অশোকচন্দ্র গুহ** (আমানতগঞ্জ) তোমাদের মতামত জানানর জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। **রথীন মজুমদার** (খাগড়া) পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমার দীর্ঘপত্রের উত্তর দেবো। **প্রীতিকণা কর** (বিষ্ণুপুর), **স্মৃতি, হাসি, মনুদা, সাধন** (নোয়াখালি) তোমরা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করো। আমার স্নেহ ভালবাসা সকলে গ্রহণ করো।

শুভার্থিনী,
দিদিভাই

চলন্তিকা

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশনের প্রারম্ভে অধ্যাপক হীলের নেতৃত্বে রয়েল সোসাটির একটি বৈঠক হয় এবং এতদ্বারা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এই প্রথম রয়েল সোসাইটির একটি সভায় পরিগণিত হয়। ইংলণ্ডের বাইরে রয়েল সোসাইটির অধিবেশন এই প্রথম। এই অধিবেশনে অধ্যাপক ভাবা ও স্যার ভাটনগর রয়াল সোসাইটির চার্টার পত্রে স্বাক্ষর করেন। এঁরা দুজনেই রয়েল সোসাইটির নূতন সভ্য। তোমরা জানো আরো চারজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রয়েল সোসাইটির সভ্য—প্রঃ মেঘনাদ সাহা, সি, ভি, রমন, কৃষ্ণান ও বীরবল সাহনী। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হবে নাগপুরে এবং তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর।

গত ১৫ই জানুয়ারী দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টিন প্রদেশে সান্ জুয়ান্ সহরে এক অতি ভীষণ ভূমিকম্প হয়। প্রথম সংবাদেই প্রকাশ, কমপক্ষে ৫০০০ লোক মারা গিয়েছে, ততোধিক আহত এবং বাড়ীঘরদোরের শতকরা ৯০ ধ্বংস হয়েছে। সান্ জুয়ানে এখন আলো নেই, জল নেই এবং সহরবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। তিন মিনিট ক্যালব্যাপী ভূমিকম্প হয়েছিল, লোকজন ঠিক কত হতাহত তা জানা যায়নি, যারা বেঁচে গিয়েছে তারা মাঠে পার্কে তাঁবুতে বসবাস করছে। সান্ জুয়ান্ ছাড়াও, আর্জ্জেন্টিনার আরো কয়েকটি জনপদেও ভূমিকম্প হয়েছিল।

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধে রুশ লাল বাহিনীর কসাক টহলদারী সৈন্যদল কয়েকস্থানে প্রাক্তন রুশ-পোল্যাণ্ড সীমান্ত ভেদ করে পোলিস-ইউক্রেনের ভেতর দিকে অগ্রসর হয়েছে। ৯ই জানুয়ারীর এক সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ যে লালসেনা পোলাণ্ডের সার্নি প্রদেশের ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে

হাজির হয়েছে এবং পোলাণ্ড সীমান্তের ৩৫ মাইল ভেতরে প্রবেশ লাভ করেছে। লাল ফৌজ কর্তৃক পোল্যাণ্ড সীমান্ত অতিক্রম করায় যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কে লণ্ডনস্থিত পোলিশ গভর্ণমেণ্ট প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে তাঁরা আশা করেন তাঁদের দেশের সাধারণতন্ত্রের স্বার্থ ও অধিকারের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভুলবেন না। সোভিয়েটও এক ইস্তাহারে এর সদুত্তর দিয়েছেন।

রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্ব্ব-ভারতীয় ফাইনাল খেলায় বাংলা দল হোলকার দলকে দশ উইকেটে সগৌরবে পরাজিত করেছে। হোলকার দল ভারতের নাম করা দল তাই অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন বাংলার হার হবে। কিন্তু বাংলা দল অভূতপূর্ব্ব ভাল খেলা খেলে হোলকার দলকে রীতিমত শোচনীয় ভাবে পরাজিত করলেন। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল হোলকার চিরদিন মনে থাকবে এবং বাংলার ক্রিকেট উৎসাহীরা এর বিজয় স্মৃতিতে বহুদিন খুসী থাকবেন। বাংলা দলের বিশেষ দুজন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তারা হলেন পি সেন ও কে ভট্টাচার্য্য। পি সেন একাই অতি সহজে ১০২ রাণ তুলেছিলেন। এঁর "ব্যাটিং" দেখে অনেকে বিশ্বাস করেন যে এই তরুণ খেলোয়াড়টি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন গণ্য হবেন। কে ভট্টাচার্য্যের মারাত্মক "বোলিং"ও হোলকার দল চিরদিন মনে রাখবে। তৃতীয় দিনে হোলকার দলের খেলা চমৎকার হয়েছিল। এর পর বাংলা দল খেলবে হায়দ্রাবাদ বা মাদ্রাজ ক্রিকেট দলের সঙ্গে। আমরা আশা করি বাংলা দল হোলকারের বিরুদ্ধে যে গৌরব অর্জ্জন করেছেন হায়দ্রাবাদ, বা মাদ্রাজ দলের বিরুদ্ধেও সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন।

১৯৪৪ সালেই যে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটবে, এই রকম আশ্বাস বাণী আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সমর নীতিজ্ঞ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে ১৯৪৪ সাল এই মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর। আমরাও প্রার্থনা করি এই সালেই এই নিষ্ঠুর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটুক। কয়েকদিন আগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৪৪ সালেই বর্ত্তমান যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্দ্ধারণকারী কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলেছেন। আমাদের দেশেও যুদ্ধোত্তর কালের বিধি ব্যবস্থার নানা আলাপ আলোচনা চলছে। ভারতবাসীদের নিবেদন এই যুদ্ধোত্তর কালের দেশের বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য আগে দেশের নেতাদের একত্র করা উচিৎ, কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিৎ, যার দ্বারা তাঁরা সকলে মিলে নিজেদের অভিজ্ঞ জ্ঞানে দেশকে শান্তি ও স্বাধীনতার পথে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। জাতীয় নেতাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে কোন বিধি ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হবে না।

নূতনা ধাঁধা

*** আজব প্রশ্ন ***

(বুঝিয়ে উত্তর দাও)

(১) শোনা যায়, ঈগল পাখীরা শিশুদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, সত্যি না মিথ্যে? (২) এরোপ্লেনের পক্ষে কি পিছন করে ওড়া (fly backwards) সম্ভব? (৩) ব্যাঙ কি তার চামড়ার ভেতর দিয়ে জল খেতে পারে? (৪) পিঁপড়ে কি তার পা দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারে? (৫) আরবরা কালো ঘোড়ার চেয়ে সাদা ঘোড়া পছন্দ করে কি তারা বেশী জোরে দৌড়তে পারে বলে, না গরম বেশী সহ্য করতে পারে বলে, না খায় কম ও দেখতে সুন্দর বলে? (৬) জমাট আঁধারে কে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার দেখতে পায়—পেঁচা, বাদুড়, না নেকড়ে? (২০শে মাঘের মধ্যে উত্তর পৌছান চাই)

*** গত মাসের ধাঁধার উত্তর ***

যখন কোন বড় বাগানের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়াই, তখন আমরা কি দেখি? দেখি লাল, নীল, গোলাপী, বেগুণী, হলদে ও সাদা রং বেরঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফুটে আছে থাকে থাকে কত রকমের ফুল। তাদের কারুকে দেখে মনে হয় রামধনুকের বাণ-ভরা তূণ, কারুর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রুপোলী জোছনার ঢেউ, কারুর বুক গড়া ঠিক প্রভাতী রোদের কাঁচা সোনায়।

*** নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম ***

সাধনা ও রেণুকা বিশ্বাস, চট্টগ্রাম; শিবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সনৎকুমার মজুমদার, খুলনা; গৌড়েন্দুবিকাশ রায়, আগরতলা; মায়া ও দিলীপ গুপ্ত, লক্ষ্ণৌ; রথীন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা; প্রীতিকুমার কর, বিষ্ণুপুর; অতীন্দ্রনাথ দত্ত, তেজপুর; প্রদ্যোৎকুমার কুণ্ডু, কলিকাতা; সাধনচন্দ্র বসু, কলিকাতা; অশোকচন্দ্র গুহ, বরিশাল; রেণু, বেবী, রথীন্দ্র ও সতী মৈত্র ইত্যাদি, রাজসাহী; গোপাল, জয়ন্ত ও চিন্তামনী পাল, উত্তরপাড়া; গৌরী ও ঝরণা দেবী, মুঙ্গের; যুথিকা মুখার্জ্জি, কলিকাতা; লক্ষ্মীনারায়ণ, গুণধর ও শ্রীচরণ, জোতকেশব; বেলারাণী গাঙ্গুলী, শ্রীহট্ট; ইরেন, জয়ন্ত, মনোজ ও রাধাশ্যাম পাল, ঘাটাল; রণজিৎ ও দুলাল বিশ্বাস, চট্টগ্রাম; ঝরণা দত্ত, কলিকাতা; অসীম দেব গোস্বামী, কলিকাতা; বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, মোগলসরাই; শঙ্করপ্রসাদ মজুমদার, খুলনা; নীহার চক্রবর্ত্তী, দিনাজপুর; বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; সুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায়, বোলপুর; বটকৃষ্ণ মাঝি, বুড়ুল; জ, ম, দা, পাটনা; বীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণ, মানকাচর; সুকুমার চন্দ্র নাথ, জামশেদপুর; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর; মা, ছোটদি, সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ প্রভৃতি, কুমিরা; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, নমিতা, সবিতা ও গীতা বসু প্রভৃতি, উখড়া; প্রফুল্লবালা সাধুখাঁ, উত্তরপাড়া; অরুণ, অমিতা ও তপনকুমার বসু, বহরমপুর; মঞ্জুশ্রী ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি, বেনারস; রমা, লীলা, ও টীপু ও কান্তিরঞ্জন ঘোষ, নোয়াখালী।

*** একটি-ভুল উত্তরদাতাদের নাম ***

গোপালচন্দ্র ধারা, ভদ্রেশ্বর; ভজনসিংহ নাহার, দুমকা; অরুনউদয় সিংহ ও বিভারাণী সরকার প্রভৃতি, বরিশাল, লানি, গৌতম ও মীরা প্রভৃতি, কলিকাতা।

পৃথিবীর
মেঘলোক
নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)

দক্ষিণারঞ্জন

পৃথিবীর
সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

ইহার পরাগনিন্দিত সূক্ষ্মতা ও মাতোয়ারা গন্ধে আপনারা ব্যবহার করিয়া সুখী হইবেন। শুধু সামান্য একটু পাফে করিয়া লাগাইয়া দেখুন আপনার বর্ণে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে!

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত ও নানাবিধ রঙে যথা ন্যাচারালে, র‍্যাচেল নং ১ ও ২ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :—হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল লিমিটেড্‌, কলিকাতা

দখিণ হাওয়া

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

যেখানে পাহাড় সমুদ্দুরে তুলছে মাথা
গন্ধজমানো চন্দনবনে কাঁপছে পাতা
ঢেউয়ের ফণায় আঁধারে ঘনায় তারার হাসি
আসি সে দেশের পাখীর পাখার বাজায়ে বাঁশী!

জাগো জাগো গো প্রজাপতি! বন মুকুল!
কোথা ঘুমন্ত চাঁপা দুরন্ত! বোন্ পারুল!
মাটীর নীচে কি কাঁদছ একাকী সবুজ স্বর?
ওগো অঙ্কুর! ভাঙ্গো ভঙ্গুর মাটী কঙ্কর!

ওঠ গো ওঠ শোনাও নবীন গল্প বলা
নৈলে, কোকিল উকিল আমার, থামায় গলা?
সাজাও ঘোড়া, দিগন্তরে বেরিয়ে পড়ি,
'আমরা এলেম!' 'আমরা এলেম!' বাজাও ঘড়ি!

রূপকথা

কাঞ্চনমালা

রঞ্জিতভাই

সাতদিন সাতরাত মহারাজের চোখে ঘুম নেই।

নিঝুম রাতের ঘুম ভেঙে যায় এক গভীর তারাভরা আকাশে……দূরে নীল পাহাড়ে সারি প্রহরীর মতো ঝিমোয়, দেওদারের শুকনো পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোস্নার রুপোলী আলো লুকোচুরি খেলে যায়। মহারাজের চোখে স্বপ্নের আবেশ···কাঞ্চনমালার কুহেলী স্বপ্ন ?

রতনগড়ে জনমানবের সাড়া নেই। গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন। শুধু মহারাজ জাগ্রত !

—কুহু ! কুহু ! কুহু ! রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় কে যেন দুষ্টুমি কোরে ডাকলো।

মহারাজ চমকে উঠলেন। এই নিশুতি রাতে কে এমন মধুরস্বরে গান করে ?

—কুহু ! কুহু ! কুহু ! রতনগড়ে অকাল বসন্ত জেগেচে ! আবার কে মিহি গলা ডাকলো : জাগ্রত হও বন্ধু—চোখ মেলে চাও।

মহারাজ চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন ঐ চন্দ্রমল্লিকার দিকে···তাঁর স্বপ্ন সার্থক হোলো ? রতনগড়ে আবার কাঞ্চনমালা এসেচে ! আবার এলো ঐ নীল আকাশের পরী—ঐ শোনো তার সুললিত গানের সুরেলা……

মহারাজ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন : কাঞ্চনমালা ! কাঞ্চনমালা !

—স্থির হয়ে দাঁড়াও। কাঞ্চনমালা বললে : চুপ্ কোরে শোনো আমার কথা। আমার কাছে তুমি অপরাধী জয়সিংহ, সেকথা জানো ?

—অপরাধী ? মহারাজের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধূলোর মতো আকাশে মিলিয়ে গেলো।

কাঞ্চনমালা গম্ভীর সুরে বললে : হ্যাঁ। তুমি মস্ত এক অপরাধ করেচো জয়সিংহ, সেজন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে। শোনো : আকাশের পরীরা কোনোদিন মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে না। পথ ভুলে আমি এসেছিলাম রতনগড়ে—কথা ছিলো : সাত রাজ্যের কেউ সেকথা জানবে না। সেকথা তুমি শোনোনি—দেশময় সাড়া এনে দিয়েচো যে, রতনগড়ে রাজপ্রাসাদে এসেচে কাঞ্চনমালা ! তাই সেই মূহুর্ত্তে কাঞ্চনমালা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে···শুধু পড়ে এক ভাঙ্গা পাথরের মূর্তি—সে আমার মূর্তি নয়—আমার প্রেতাত্মা। আ

জানি : পৃথিবীর মানুষ অবহেলাভরে সুখস্বপ্নকে বিসর্জন দেয়, নির্বোধের মতো খেলাঘর রচনা করে। সেই ভুলের জন্য তোমাকে শাস্তি নিতে হবে জয়সিংহ।

—আমায় ক্ষমা কর, আমায় মুক্তি দাও কাঞ্চনমালা ! মহারাজ অভিভূতের মতো বলেন।

—স্থির হও ! আমাদের দেশে ক্ষমা নেই ! আমরা ভালবাসি, স্নেহ করি, দয়া করি—আমরা প্রীতির ডালি নিয়ে, কাজল ঘুমের আবেশ নিয়ে স্বপ্নসাগরে ভেসে বেড়াই, কিন্তু ক্ষমা করি না। অপরাধী চিরদিনই শাস্তি মাথা পেতে নেয়। শোনো তবে : বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী—। সেই নদীর পাশে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে বনের মেয়ে—বনমালা। আজ থেকে সাত বছর পরে তার গর্ভে যে রাজপুত্র জন্ম নেবে—সেই হবে রতনগড়ের আসল রাজা। আর দুষ্মন্ত—না-না দুষ্মন্ত নয়……সে শয়তানের বাচ্চা···। পাগলের মতো মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাঞ্চনমালার শেষ কথাগুলো ভেসে এলো দূর থেকে : কিন্তু তার হাতেই তোমার মৃত্যু হবে মহারাজ···আর দুষ্যন্ত সেই রাজপুত্রের হাতেই নিহত হবে···সেদিন রতনগড়ে আবার আসব···আসব···

কিন্তু মহারাজ সেকথা জানলেন না।

সেই মূহুর্ত্তে ডাক পড়লো অন্দরমহলে রাজমন্ত্রী চন্দ্রকেতুর। মহারাজ আদেশ দিলেন : শোনো চন্দ্রকেতু ! বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী, তার পাশে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে এক বনের মেয়ে—নাম তার বনমালা। আজ এই মূহুর্ত্তে সেপাই নিয়ে গিয়ে তাকে আমার কাছে বেঁধে নিয়ে এসো—যাও—। চন্দ্রকেতু বললে : জো হুকুম মহারাজ।

মহারাজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন : যাও—এখুনি দুষ্মন্তকে পাঠাও বনমালাকে বন্দী করে আনবার জন্যে···যাও—যাও—। চন্দ্রকেতু সেলাম জানিয়ে চলে এলো সেখান থেকে।

মহারাজ ভাবচেন : কে এক বনের মেয়ে, তার ছেলে কিনা হবে এই রতনগড়ের রাজা ? না-না, সে কোনদিনই হতে পারে না। কিন্তু এসব কথা সত্য হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কই ? মহারাজ বিচলিত হয়ে পড়েন···অনর্থক বনমালাকে বন্দী করার কোনো অর্থই তিনি খুঁজে পান না···তিনি আদেশ ফিরিয়ে নিতে যান···কিন্তু কোথায় চন্দ্রকেতু ?

এদিকে দুষ্মন্ত হুকুম শুনে মনের আনন্দে রওনা হোলো রূপবতী নদীর দিকে। নদীর ধারে পৌঁছুতে তার বেলা হয়ে গেলো—শিরশির ঝিরঝির বাতাস মাঝ-আকাশের বুকে বইতে সুরু হোলো। বনমালা সেই মেদুরসন্ধ্যায় ঘরে বসে দোলনচাঁপার মালা পরে গুণগুণ করে গান গাইছিলো···এম্নি সময় রাজকুমার দুষ্মন্ত সেখানে গিয়ে হাজির।

—তোমার নাম বনমালা ? দুষ্মন্ত হেসে জিগেস কোরলে।

—কেন তুমি কোন্ দেশের লোক ? বনমালা অবাক হয়ে জিগেস কোরলে।

দুষ্মন্ত বললে : আমি রতনগড়ের রাজকুমার। মহারাজের হুকুম : রূপবতী নদীর

ধারে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে এক বনের মেয়ে, নাম তার বনমালা। সেই বনমালাকে চাই—রাজপ্রাসাদে তোমার ডাক পড়েচে।

বনমালা আনন্দে নাচতে নাচতে বললে: বেশ বেশ—চল, আমি যাব তোমার সংগে দোলনচাঁপার মালা থেকে একটি চাঁপা ঝরে গেলো!

দুষ্মন্ত বনমালাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ফিরে এলো রতনগড়ে।

মহারাজ বনমালাকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন! বনের মেয়ের এম্নি রূপ···এ দেহসুষমা? আদেশ দিলেন: তুমি ভুল করেচো দুষ্মন্ত, আজ থেকে বনমালা রতনগড়ে মহারাণী! সাতরাজ্যের লোকদের ডাকো···আনন্দ-উৎসব চালাও আবার রতনগড় জেগে উঠুক—!

বনমালা খুশীতে মহারাজের বুকে মুখ লুকোলে। কিন্তু দুষ্মন্ত চমকে উঠলো। মহারাজ একি কোরলেন? রাগে, ঘৃণায়—প্রতিহিংসায় তার চোখে মহাবন্যা এসে পড়লো।

মহারাজ ডাকলেন: চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু আড়াল থেকে সব শুনে নিয়েচেন। মহারাজের সামনে এসে সেলাম জানালেন। মহারাজ বললেন: যাও চন্দ্রকেতু, সবাইকে খবর দাও, কাল আবার রতনগড়ে আনন্দ-উৎস সুরু হোক্—আজ থেকে বনমালা রতনগড়ের মহারাণী···

চন্দ্রকেতু বললেন: মহারাজ, আপনি কি বলচেন?

এবার উত্তর দিলো বনমালা: কিছু না মন্ত্রীমশায়। কাল রতনগড়ের রাজপ্রাসা শুভ-বাসর বসবে, তার আয়োজন করুনগে—

চন্দ্রকেতু কালোমুখ কোরে ফিরে এলো। না—এর প্রতিশোধ চাই! সেইদিন রাত্রে চন্দ্রকেতু দুষ্মন্তকে ডেকে বললেন: শোনো দুষ্মন্ত, আজ রাত্রির মধ্যেই বনমালাকে চিরদিনে মতো সরিয়ে ফেলতে হবে। নয়ত কাল ভোরে সাত রাজ্যের লোক সব জেনে ফেলবে।

দুষ্মন্ত জিগেস কোরলে: কী কোরতে হবে বলুন।

চন্দ্রকেতু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন: আমাদের পূর্বদিকের ঐ সাতমহলা নীলকুঠি বনমালাকে বন্দী কোরে রেখে দাও—যেন সূর্য্যের আলো সেখানে প্রবেশ কোরতে না পা তারপর—তারপর—প্রতিহিংসায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল কোরতে লাগলো।

সেই রাত্রেই দুষ্মন্ত মহারাজের ঘর থেকে ঘুমন্ত বনমালাকে বন্দী কোরে এ সেই সাতমহলা নীলকুঠির সবচেয়ে উঁচু যে ঘর—সেই অন্ধকার ঘরে বনমালাকে বন্দী কো রেখে গেলো। আর মহারাজের বিছানায় একটি ছোট্ট কাগজের টুক্‌রো ফেলে দিয়ে চ এলো চুপিচুপি—'মহারাজ, বনের মেয়ে কোনোদিন এতো সৌভাগ্যবতী হতে পারে ন বনমালা বনেই থাকতে চায়, রাজপ্রাসাদের কারাগারে আমার স্থান নেই। বিদায়!—বনমালা

দুষ্মন্ত আর চন্দ্রকেতু নিশ্চিন্দি হোলেন। কিন্তু বনমালার ঘুম ভাঙতেই সে ভয়া

আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। ভাবলে: মহারাজের একি খেয়াল? এমন কোরে আমায় বন্দী করার মানে?—

জ্যোৎস্না রাত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নীল কুয়াসা জমে আছে। চারিদিকে রূপোলী আলোয় ঝলমল করচে। বনমালার চোখে তন্দ্রার ঘোর নেমে আসচে···এম্নি সময় নীল আকাশের গায়ে ভাসতে ভাসতে কাঞ্চনমালা এসে ডাকলো—কুহু! কুহু!! কুহু!!!

সেই ডাকে বনমালার ঘুম ভেঙে গেলো।

কাঞ্চনমালা বললে: বন্ধু জাগো। আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো বনমালা—

বনমালা আনন্দে খুশী হয়ে বললে: কাঞ্চনমালা তুমি এসেচো ভাই—এদ্দিন পরে আমায় মনে পড়লো বুঝি?

কাঞ্চনমালা হেসে ফেললো এবার: জানো ভাই, সাত সাগরের পারে গহন অন্ধকারে আছে এক মেঠো-পথ। সেই পথে যেতে যেতে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে···চলে যাবে কংকাবতীর দেশে। সেখানে আজ মহা ধুমধাম—কংকাবতীর দেশের রাজকুমার গন্ধরাজের হবে বিয়ে। দেশে দেশে খবর গেছে—স্বয়ংবরা হবে—

—স্বয়ংবরা? বনমালা অবাক হোয়ে গেলো।

কাঞ্চনমালা বললে: হ্যাঁগো, স্বয়ংবরা হবে। এদেশে সবই এম্নি আশ্চর্য্য কাণ্ড! এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। দেশ দেশান্তর থেকে আসবে রাজকন্যেরা সাতরঙা ময়ূরপংখী চড়ে—আমাদের সেই স্বয়ংবরা সভায়। আর গন্ধরাজ মুক্তোমালা পরিয়ে দেবেন কোনো এক রাজকন্যের গলে।

—কে সেই রাজকন্যে? বনমালা জিগেস করে।

—জানো না বন্ধু! সভার সবাই চমকে চেয়ে দেখবে, গন্ধরাজ তাঁর হাতের মুক্তোমালা পরিয়ে দিয়েচেন বনমালার গলে!

—ইস্! বনের মেয়ের অমন স্বপ্নে কাজ নেই।

—না-গো-না! কাঞ্চনমালা বনমালার হাত ধরে বললে: ভয় নেই তোমার, দেখো গন্ধরাজ তোমার গলেই মালা দেবে। এসো, আমরা পালিয়ে যাই আজ কংকাবতীর দেশে—

—কেন?

—কাল ভোর হবার আগে দুষ্মন্ত তোমাকে মেরে ফেলবে জানো?

—আমার অপরাধ?

—কিছু নয় ভাই। রতনগড়ের মহারাণী হবে এক বনের মেয়ে—এ হেন শুভকথা তারা শুনবে কেন? দুষ্মন্ত মহারাজকে সরিয়ে রতনগড়ের রাজা হতে চায়। তাই, তোমায় সরিয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভাবনার কথা নেই।

—কী জানি ভাই, আমার যেন কেমন ভয় কোরচে : বনমালা ভীতকণ্ঠে বললে।

—এ ভাই শয়তানের দেশ। সেসব অনেক কথা···তোমায় পরে বলবো একদিন। এবার এসো—এই ফাঁকে আমরা পালাই।

এই বলে কাঞ্চনমালা বনমালাকে সংগে নিয়ে রওনা হোলো কংকাবতীর দেশে। আকাশের পশ্চিম কোণে পোহাতী-তারা দপ্‌দপ্‌ কোরে হাতছানি দিয়ে ডাকলো···এসে-এসো—

পরদিন ভোরবেলা রতনগড়ে ভয়ানক রকম সব কাণ্ড ঘটে গেলো।

মনের আনন্দে দুষ্মন্ত যখন চন্দ্রকেতুর দেওয়া চক্‌মকে ছোরাখানা নিয়ে এসে হাজির হোলো নীলকুঠির অন্দরমহলে—তখনও চারদিকে অন্ধকারের গাঢ় ছায়া আর বিদায়-রাত্রির আকাশ গম্ভীর। দুষ্মন্ত ভাবলে : আর ভয় কী? আজই বনমালার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে ঐ তার ছোরাখানার আঘাতে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! লীলকুঠির সাতমহলা বাড়ীর সবচেয়ে উঁচু ঘরে দুষ্মন্ত এসে দেখলো—ঘর একেবারে শূন্য—বনমালা নেই! সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো থরথর কোরে—সবাই যেন এক সংগে জোট পাকিয়ে হেসে উঠলো : হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—!

তবে বনমালা সত্যিই নেই? কিন্তু পালালো কেমন কোরে? কে তাকে পথ দেখালে? দুষ্মন্ত ভেবে কোন কূলকিনারা পেলো না। খবর এলো, নীলকুঠিতে বনমালাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চন্দ্রকেতু সেইকথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন : না-না-দুষ্মন্ত! বনমালাকে আমার চাই। তাকে এবার নিজের হাতে হত্যা কোরবো।

এদিকে রতনগড়ের রাজপ্রাসাদে আর এক অভাবনীয় কাণ্ড! মহারাজ জয়সিংহ ভোরে উঠে দেখেন বনমালা নেই! কোথায় গেলো বনমালা? রাজ্যময় আবার সাড়া পড়ে গেলো। বনমালা কোন্ দেশে উধাও হোলো? মহারাজ উন্মাদের মতো এবার শুধু ডাকেন : বনমালা! বনমালা! একদিন তাঁর মনে কি রকম সন্দেহ জাগলো। ডেকে পাঠালেন চন্দ্রকেতুকে। জিগেস কোরলেন : চন্দ্রকেতু, বনমালা কোথায় তুমি জানো?—চন্দ্রকেতু নীরব।

মহারাজ জলদ-কণ্ঠে চীৎকার কোরে উঠলেন : চন্দ্রকেতু। বলো—নিশ্চয় তুমি জানো বনমালা কোথায় আছে?—চন্দ্রকেতু তবু নীরব।

শেষে অধীর হোয়ে মহারাজ বললেন : বলো চন্দ্রকেতু—তোমায় অনুরোধ করচি আমি···

চন্দ্রকেতু এবার শুধু বললে : আমি জানি না মহারাজ!

—নিশ্চয় জানো শয়তান! বলো, বনমালা কোথায়? নয়ত তোমায় কারাগারে বন্ধ কোরে রাখবো—বলো—বলো, চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু যেন এবার সচেতন হোলো, নিজেকে প্রস্তুত কোরে নিলো। দুষ্মন্তও

আড়ালে বুকের ছোরাখানা বাগিয়ে ধরে শুধু সংকেতের অপেক্ষায় চুপ কোরে রইলো। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়···চন্দ্রকেতু নীরব অবনত মুখে শুধু সুযোগ খোঁজে।

মহারাজ ডাকলেন : এই কে আছে এখানে, চন্দ্রকেতুকে বন্দী করো!

কিন্তু কোনো প্রহরীর বদলে মহারাজের দিকে ছুটে এলো ছোরা হাতে দুষ্মন্ত, আর চন্দ্রকেতু সেই অবসরে ঘরের আলো দিলে নিভিয়ে! মহারাজ বাধা দিলেন : চোপ্‌রও শয়তান···কিন্তু তার আগেই দুষ্মন্ত তার চকচকে ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিয়েচে মহারাজের বুকে···! চন্দ্রকেতু সেই অবসরে দেশময় রাষ্ট্র কোরে দিলো যে, জয়সিংহ মারা গেছেন। আবার রতনগড়ে একদিন নহবৎ বাজলো—আনন্দ-উৎসব চললো···সবাই সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো : রতনগড়ের রাজা দুষ্মন্ত। আর মহারাজ জয়সিংহের সমাধির উপর লেখা এই বাণী :

কাঞ্চনমালা উধাও হোলো কোন্ আকাশের গায়,
বনমালার মৃত্যু হোলো সাতার কিনারায়!

* * * *

একটুখানি দাঁড়াও ভাই—কংকাবতীর দেশে আজ উৎসব হবে, তার আয়োজন কোরতে হবে আমায়।···এবার এসো·····

গন্ধরাজ হোলেন কংকাবতীর সাতরাজার মাণিক। বনমালাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হোলেন—অমন সুন্দরী রাজকন্যে তিনি নাকি জীবনে দেখেননি। কিন্তু বনমালা যে বনের মেয়ে গো? তা হোক্—

কাঞ্চনমালা বনমালার চিবুক নেড়ে বললে : কেমন? এবার তুমি বন্দী·····

—যাও দুষ্টু কোথাকার।

এম্নিভাবে মহা সমারোহে বনমালার সংগে গন্ধরাজের বিয়ে হোলো। আনন্দ ও হাসিতে কেমন কোরে সাতটি বছর কেটে গেলো, সে-গল্প আরেকদিন বলবো। আজ বনমালা খুব খুশী—কেন জানো? ওমা, তার কোলে ফুটফুটে ঐ ছোট্ট ছেলেটি কেগো? গন্ধরাজ তার নাম দিয়েচে : চঞ্চলকুমার।

কাঞ্চনমালা বলে : বড় দুষ্টু ছেলেটা। কিন্তু দুষ্মন্তের কথা মনে পড়তেই বলে ওঠে : না—রাজকুমার এম্নি নির্ভীক হওয়া ভালো।

সাতটি বছর পরে·····

কাঞ্চনমালা, গন্ধরাজ, বনমালা আর চঞ্চলকুমারকে সংগে নিয়ে এলো রতনগড়ে। ঝুপ্‌সী নদীর ধারে দেখা হোলো এক অতি দীনহীন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সংগে। এক সুদীর্ঘ বটছায়ার কোলে বৃদ্ধ ভিক্ষুক অতি ধীরে ধীরে এই কথা বললেন : আমায় ক্ষমা করো কাঞ্চনমালা—আমায় মুক্তি দাও!

কাঞ্চনমালা সেই শুনে তাঁকে চিনলো। বললে: মহারাজ, আমরা আজ তোমার দেশে এসেচি—এই গন্ধরাজ আর বনমালা, আর এ চঞ্চলকুমার, রতনগড়ের ভাবী রাজকুমার।

মহারাজ জয়সিংহ বললেন: বড় দেরীতে এসেচো মা! সন্তান চিরদিনই ভুল করে, সেজন্য কি ক্ষমা নেই? আজ সাতটি বছর ধরে তোমাদের অপেক্ষায় বেঁচে আছি। দুষ্মন্ত আর চন্দ্রকেতু আমায় হত্যা করবার চেষ্টা কোরেছিলো, কিন্তু পারেনি। আজ দুষ্মন্ত রতনগড়ের রাজা বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে যাও—প্রজারা পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়ায়—সারা দেশময় একটা আতঙ্ক। চন্দ্রকেতু আমার সংগে শয়তানি করেচে—তার প্রতিফলও সে পেয়েচে। ঐ দুষ্মন্ত সন্তান হয়ে চন্দ্রকেতুকে কারাগারে বন্দী কোরে তিল তিল কোরে বধ কোরেচে···আজ আমার দিন শেষ হোলো···এসো চঞ্চল, তোমার ললাটে জয়ের আশীষ এঁকে দিই।·····

মহারাজ চিরনিদ্রিত হোলেন। তারপর?

তারপর সেই খবর সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। প্রজারা ক্ষেপে উঠলো। গন্ধরাজ রতনগড়ে এসে যুদ্ধ ঘোষণা কোরলেন। দুষ্মন্ত এদিকে মহাবিপদে পড়লেন। আজ চন্দ্রকেতু নেই, কে তাকে সাহায্য কোরবে? অগত্যা বিনাযুদ্ধে তিনি রতনগড় ছেড়ে দিলেন ভয়ে। আজ সাত বছর পরে চঞ্চলকুমার হোলো রতনগড়ের নোতুন রাজা।

কিন্তু কাঞ্চনমালা কই? বনমালা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে গেলো।

আর দুষ্মন্তকে টেনে নিয়ে উন্মত্ত প্রজারা পথের মাঝখানে ফাঁসিকাঠে লটকে দিলো চঞ্চলের আদেশে। পাপের শাস্তি সে ভোগ কোরলো। কিন্তু কাঞ্চনমালা কই?

চঞ্চলকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে বেরিয়ে পড়লো কাঞ্চনমালার উদ্দেশ্যে···মলয়পুরের পাহাড়ের ধারে রক্তপলাশের বন···সেই বনের চপল-ঝর্ণার একপাশে সবুজ ঘাসের স্বপ্নশয্যা ···সেখানে এসো আমার সংগে···আস্তে আস্তে পা ফেলো···কাঞ্চনমালার ঘুম ভাঙিও না। সেই সবুজ গল্প—সবুজ এক স্বপ্নদেশ তোমাদের ডাকে: কুহু! কুহু!! কুহু!!! এসো-এসো-এসো···!

কবিতা

নিশীথের চাঁদ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

রজনী নিশীথে উঠেছিলো চাঁদ ফণি-মনসার বনে:
কাজল তিথির করুণ গভীর গহন গগন কোণে।
উঠেছিলো চাঁদ, ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ, নিমীলিত নীলায়নে।

আমি আর মিনু সবার গোপনে জেগেছিনু দু'জনাই:
বরফ-মাখানো ভারী হাওয়াগুলি উঁড়েছিলো সাঁই সাঁই;
কুয়াসা-মদির নীলাভ আঁধার রেশমী রোদেতে বোনা:
ছায়া পথ ভ'রে দুধালী ধূলোয় পরীদের আনা গোনা।
সুমুখের বিলে এক দুই ক'রে তারারা ঝ'রেছে, হায়—
আমরা সেক্ষণে দুটী:ভাই বোনে জেগেছিনু জানালায়।

হোথা উতরোল বনানী শ্যামল, হীরার প্রদীপ জ্বালা:
না জানি সে কোন্ জোনাকী-মেয়ের বদল হ'তেছে মালা।
উলুখড় বনে তাই 'উলু উলু' শিস্ উঠেছিলো এক—
কি ভালো সে রাত! দূরের গগনে বাঁকানো চাঁদের রেখ।

ঘুম ঝরে ঘরে, ঘরে আর বনে, বনে বনে, দেশে দেশে:
ওদিকে তখন ভেসে গেল মেঘ সুদূর মাঠের শেষে।
কালো হ'লো বিল, চাঁদিনী নিমীল, ধরণী কাঁদিলো, হায়:
মোরা শুধু জেগে, আমি আর মিনু ছলোছলো বেদনায়।

আবছায়া

শ্রীজ্ঞানদাস ভট্টাচার্য্য

পায়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে দেখা হল—বহুদিন পরে। এক মোটা সোটা ব্যস্তসমস্ত ভদ্রলোক আগাগোড়া একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিলেন। দায়ে পড়ে একটু পায়ের কাছেই জায়গা নেবার মতলবে একটি মৃদু ঠ্যালা দিতেই—"গ্যালো, যা—তুমি যতীন না?" শব্দে চমকে উঠলাম। তাইত বিনয় চোঙাটা এত মুটিয়েছে! তার হাসির ভাবটা বদলায়নি কিন্তু।

সে সুরু করলে—উঃ, ইস্কুল ছেড়ে আর তোর সঙ্গে দেখাই নেই, ইত্যাদি। প্রারম্ভিক আলাপের পর দুজনে দুজনের সাংসারিক পরিস্থিতি জেনে নিলাম। বিনয় কোথায় সঙ্গীত সম্মেলনে যাচ্ছে। আমি পরদিন বেলা বারটার আগে গাড়ী পাব না। যেহেতু দুজনেই আরামে শুতে পারবো না, গল্প আরম্ভ করলাম। কি করে জানি না আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার গৌরীবাবুর নিখোঁজ হওয়ার কথা উঠল—গয়ার কোনও সাধু সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর কথা আমার মনে হয়েছিল হয়ত।

ফাঁকা মাঠের ওপর মস্ত জমিতে ইস্কুল আর শ' দেড়েক ছেলে নিয়ে হোস্টেল। তারই সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন গৌরীবাবু। আমরা তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। গৌরীবাবু সংস্কৃত ব্যাকরণ আর ইতিহাস নিতেন। বিনয়, আমি আর মাখন বলে পূর্ব বঙ্গের একটী ছেলে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর অভেদাত্মা ছিলাম। শুক্রবার রাত্রে টিফিনের সময় কাছের বিরাট বাঁধটায় সাঁতারের শিক্ষা নিতাম মাখনের কাছে।

—সেদিনও শুক্রবারের সেকেণ্ড্ পিরিয়ড্ ছিল নারে যতীন?

—হ্যাঁ, যদ্দূর মনে পড়ে গৌরীবাবু ধাতুরূপ শেখাচ্ছিলেন, যেদিন মাখন খুব বকুনি খায় তাঁর কাছে।

—কেন বলত?

—আমাদের "স্মৃ" ধাতু শেখান হচ্ছিল না—একটা করে বাক্য লিখতে দিয়েছিলেন গৌরীবাবু। আমরা সবাই যে যার লিখে গেলাম, সে হতভাগা পেন্সিল চিবিয়ে কড়িকাঠ গুণছে। শেষে টিফিনের ঘণ্টা হতেই হড়বড় করে কি একটা লিখে দিয়ে দিল—তখনও গোটা কুড়ি খাতা বাকী পড়ে আছে। আমরা সবাই যারা লিখেছিলাম, 'অহং মম পিতরম্ পিতুর্বা স্মরামি' গোছের তাদের কিছু না বলেই গৌরীবাবু ছেড়ে দিলেন। দুচারজন যারা লিখেছিল, 'ভ্রাতরম্ অহং স্মরেৎ' গোছের তাদের ত গৌরীবাবু লম্বা লেকচার দিয়ে ঘণ্টার পনের মিনিটই পার করে দিলেন। তার পরেই ত সেই বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাখনা কি একটা বাজে মার্কা লেখাতে তিনি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন যেন।

—নারে, আমার বেশ মনে পড়ছে, মাখনার খাতাটা দেখেই গৌরীবাবু অজ্ঞান মতন হয়ে পড়লেন। একেবারে নিঃসাড়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে হাজির করলুম। তিনি তখন কি রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কার খাতা এটা?" মাখনা বল্‌লে, "আমার স্যার, কেন? কি

হয়েছে স্যার?" গৌরীবাবু একটি বিরাট থাপ্পড় তার গালে কষিয়ে খাতাটা ছুঁড়ে মারলেন, আর কাঁপতে কাঁপতে হোস্টেলে চলে গেলেন। সেদিন আর স্কুলেই এলেন না। আমি খাতাটায় দেখি না—পরিষ্কার নাগরীতে মাখনা লিখেছে—অপি স্মরসি পঞ্চানাং ন্যগ্রোধানাং মধ্যে কূপস্য ত্বম্? মাখনাও যেন হতভম্ব হয়ে ভাবছিল, তাইত। তাকে বললাম, তুই একি জবরদস্ত লিখেছিস? মানে কি? সে তখন আর কিছু বলতে পারলে না, কেবল বললে যে, তার কি যেন বট্ না অশথ গাছের মধ্যে অন্ধকার জায়গার ভেতরে একটা কূয়ার ছবি মনে এল আর সে তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছে।

সেদিন আর সাঁতার হল না। সন্ধ্যেবেলায় তার ডাক পড়ল গৌরীবাবুর কাছ থেকে। ভয়ে ভয়ে মাখনা গেল; খানিক পরে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল, বল্‌লে, স্যার গল্প বলবেন। শুনে অবাক। গৌরীবাবু চিরকাল চিত হয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ইতিহাসের বই পড়েন। তাঁর আবার আমাদের ওপর এত দয়া কেন? যাহোক গেলাম। মাখন আর আমাকে পুরোনো হিন্দুযুগের গ্রীক রাজাদের কত গল্প বললেন, একটা সোনার মোহর, বোধ হয় পাঞ্জাবের কোন ব্যাক্‌ট্রীয়ান রাজার হবে, তাঁর ঘড়ির চেনে গাঁথা ছিল দেখালেন। দেখলাম তাতে দাগা আছে: G. S., July 24, 1918—ঐ দিন ওটি তিনি রাওলপিণ্ডিতে পান। এই সব নানা কথার পরা মাখনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার বাড়ী কোথায়, ইত্যাদি। সে যখন জবার দিল যে পূর্ব্বঙ্গে, তখন তিনি সে কখনও পশ্চিমে গিয়াছিল কিনা জানতে চান। আমার বেশ মনে আছে এই কথাটা, কারণ মাখন হাওড়াও পেরোয় নি কোনও দিন শুনে তিনি যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন আজও সেটা ভুলিনি। তার পরেই তিনি আমাদের বেশ করে রুটি-মাখন-চা (তখন সিগারেটেরই মতন নিষিদ্ধ আর দোকানের খাবার তিনি খেতেন না) খাইয়ে বিদায় করে দিলেন। তাঁর এই অহেতুক আত্মীয়তায় হোস্টেলের সকলেরই অবাক লাগে।"

—তার পরের সপ্তাহেই ত গৌরীবাবু হঠাৎ গায়েব হন?

—হ্যাঁ, ফিরে শুক্রবারে আবার সেই টিফিনের আগের ক্লাস। তুই ত খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেলি। মাখন কিন্তু সেই কুঁড়ে। হঠাৎ আমার পেন্সিলের খোঁচায় তার ধ্যানভঙ্গ হল—লৃঙ্ বিভক্তির নমুনা আর মাখনের বিদ্যেয় কুলোল না। সাদা খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে দিয়েই সে বেরোল। সামনের মাঠে ছুটোপুটি করছি, দেখি গৌরীবাবু ফ্যাকাসে মুখে বেরিয়ে এসেছেন। ভাঙ্গা গলায় তিনি যেন অতি কষ্টে বললেন, লাল কালিতে তোমরা কেউ কিছু লিখেছ কি? আমরা সবাই সমস্বরে বললাম, না। উত্তর শুনে তাঁর মুখ গেল আরও শুকিয়ে। তাঁর হাত থেকে একটা লাল দাগওয়ালা পাতা পড়ে গেল। তিনি চলে গেলেন; কাগজটা উড়ে আমার কাছে আসতেই আমি টপ করে পকেটে পুরলাম। তোরা যখন ওকথা ভুলে গেলি, আমি চুপিচুপি সেটা বার করে দেখি লাল কালিতে লেখা—'যদি নস্ত্বং মহ্যমযাস্যশ্চেৎ তদা ত্বমেব তৃভ্যমগমিষ্যম্।' নীচে মাখনের দেবাক্ষরে এম. মজুমদার IX/12 লেখা।

সেদিনও সটান গৌরীবাবু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হেডমাস্টারমশায় নিজেই তাঁর খবর নিতে গিয়েছিলেন, শুনলাম গৌরীবাবু নাকি ইস্তফা দিতে চান, হেডমাস্টারমশায় তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন। পরদিন সকাল থেকে গৌরীবাবু নিখোঁজ।

—আরে সে ত জানি।

—হ্যাঁ, একটা কথা আমি আর মাখন ছাড়া কেউ জানে না! আমরা লুকিয়ে তখন নভেল পড়তে

শিখেছি, রাত দুটোয় উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে 'চীনের চক্র' জাতীয় সময়নাশক পড়ছি—এমন সময় একটা খুট করে দূরে শব্দ হল। শিউরে উঠে ভাবছি এই রাতে বুঝি রহস্য একটা কাছিয়ে এসেছে; হয়ত ছোরা হাতে গুণ্ডা এসেছে। এমন সময় মাখন চাপা গলায় ডাকল—যতীন, আয় আমরা দেখি কোথায় চোর এসেছে। আমরা দুজনে ভয়ে ও সাহসে মিশিয়ে দুরু দুরু বুকে বেরিয়ে দেখি একটা দরজা খোলা, আর হোস্টেলে আসবার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা দীর্ঘ মূর্ত্তি, তার পেছনে গৌরীবাবু নিঃশব্দে জোরে জোরে চলেছেন। আমরা উচ্চবাচ্য না করে শুয়ে পড়লুম। পরদিন সকালে শুনি গৌরীবাবু নেই। হেডমাস্টার মশায়ের বেতের ভয়ে সে রাতের কথা বেমালুম চেপে গেলাম। কাজ কি বাপু রহস্য রোমাঞ্চের কথা ফাঁস করে।

বিনয় আর আমি শীতের ভয়ে জড়সড় হয়েছিলাম। এবার হাত পা ছাড়াতে একটু উঠে পায়চারী করছি এমন সময় এক ভদ্রলোক পাশের আরাম চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "মাপ করবেন মশায়, আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম। বোধ হয় আপনার গল্পের শেষটা বলতে পারব। আমি গত সপ্তাহে দেওঘরে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি বাগানবাড়ী কিনেছি, সেটার সংস্কার করতে হবে। সেখানে নাকি এক তান্ত্রিক সাধুর পঞ্চবটী আসন ছিল। তার ভেতরে পুরোণো একটা কুয়ার মধ্যে দুটো কঙ্কাল পাওয়া গেছে।"

আমি অধৈর্য্য হয়ে বললাম, "আমার গল্পের সঙ্গে সম্বন্ধ কি মশায়?"

ভদ্রলোক বলে চললেন, "একটা কঙ্কালের কাছে মরচে ধরা লোহার চেনে ঝোলান ছিল ময়লা পয়সার মত জিনিষ। আমি সেটাকে মেজে ঘষে পরিস্কার করে দেখি সেটা খুব পুরোনো স্বর্ণমুদ্রা। তাতে ছুরি দিয়ে কাটা আছে—G. S. July 24, 1918.

ইংরাজীর ছায়ামুদরণে

মধু-অঞ্জলি

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

চঞ্চল বেণুবন কেঁপে আজ উঠ্‌লো,
ভুঁইচাঁপা রাঙা হ'য়ে ফুট্‌লো রে ফুট্‌লো—
অলিদল ছুট্‌লো,
উন্মনা বেণুবন কেঁপে আজ উঠ্‌লো।

বাতাসের দোল্‌নায় পাতাগুলি নড়্‌ছে,
দুল্‌লোড়ে ঝঝাপাতা ঝুর্ ঝুর্ ঝড়্‌ছে—
ঝোপঝাড় ভ'র্‌ছে,
ঘুম ভাঙা দোল্‌নায় পাতাগুলি নড়্‌ছে।

চুপ্ চাপ্ ব'সে ব'সে ভালো আর লাগে না,
দুনিয়ার কোনো কাজ কোনো ছবি আঁকে না—
কোনো স্মৃতি জাগে না,
নিশ্চুপ ব'সে ব'সে ভালো কিছু লাগে না।

ধুনুচির ধূপে মন ধুয়ে গেছে গন্ধে,
জীবনের তালে তালে হৃদয়ের ছন্দে—
পরাণের রন্ধে,
প্রভাতের ধূপে মন ধুয়ে গেছে গন্ধে।

মন্থর ঘ্রাণ আসে ভর করি' পবনে
বেণুবন হ'তে আজ যেন কোন্ স্বপনে—
জমা হয় স্মরণে,
ছন্দিত ঘ্রাণ আসে ভর করি' পবনে।

গল্প

পায়ের তলায় চাকা!

শ্রীশামুক

রোজ খবরের কাগজে নিশ্চয় এই রকম একটি বিজ্ঞাপন পড়ছো—'ছেলেটি লম্বায় আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। বয়স আন্দাজ ষোল কি সতেরো। (সবই 'আন্দাজ', ব্যাপার কি?)—পিছনে মাথার নীচে একটি কাটা দাগ। পরনে লাল সিল্কের ফুল-হাতা সার্ট ও ডোরা-কাটা নীল পাজামা। মাথায় অদ্ভুত এক সবুজ টুপি—টুপির ভিতর সম্ভব হাওয়া-বাঁশী লুকানো। (আবার সম্ভব?)—পায়ে একজোড়া নতুন গড়নের স্কেট। এ'কে গত দশই তারিখে বিকাল পাঁচটার পর ধর্ম্মতলার মোড় ও জগুবাবুর বাজার এই এলাকার মধ্যে বহুক্ষণ দেখা গিছলো। এর সম্বন্ধে সঠিক খবর পুলিশ অপিসে দিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

আবার ঐ একই কথা বারবার রেডিওতে ঘোষণা শুনছো প্রত্যহ। কেবল শেষে যোগ দিয়ে বলছে—'খবর পাওয়া মাত্র এই ঠিকানায় জানাবেন, অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র, এক নম্বর গার্স্টিন প্লেস, ফোন্ ছয় নয় আট সাত—মাপ করবেন—আট শূন্য।'

তোমাদের মধ্যে জোর বরাত-ওয়ালা কেউ কেউ হয়তো দেখে থাকবে ঐ দিনের ঘটনাটি নিজের চোখে, এবং দর্শক মাত্র হলেও প্রচুর যে আনন্দ পেয়েছ তাতে সন্দেহ নেই কোন। কিন্তু যাদের ভাগ্য তাদের দয়া করেনি সেদিন তাদের আসতে হবে আমার সঙ্গে, আমার চোখ দিয়ে দেখতে হবে, হাসতে হবে, আর হাততালি দিয়ে উঠতে হবে ঠিক তালে তাল মিলিয়ে। এস ক'টা দিন পিছু হটে গেলাম আমরা। দশই তারিখ—বিকাল পাঁচটা গির্জার ঘড়িতে বাজলো—ধর্ম্মতলার মোড়।

কালবৈশাখীর ঈশান কোণে ছোট এক টুকরো মেঘ দেখেছ ত', জানো কোথা থেকে আসে ও, আকাশের কোন সীমানা থেকে? জানে কেউ? তেমনি হঠাৎ আচমকা এল সে—লাল জামা গায়ে, ডোরাকাটা নীল পাজামা, মাথায় অদ্ভুত সবুজ টুপি, পায়ে বাঁধা স্কেট! একটি মিষ্টি সুর তাকে ঘিরে বাজে, যেন গলা ফুলিয়ে শিস দিচ্ছে কোন পাখী একদমে অনেকক্ষণ। ঐ আজব টুপির ভিতর লুকানো হাওয়া-বাঁশী, হাওয়ায় আপনি বাজে। ঠিক চৌমাথার উপর সে এসে দাঁড়ায় দু'হাত জোড় করে আকাশে তুলে, একেবারে স্থির—মানুষ নয় মাটির গড়া কোন মূর্ত্তি যেন!

পথে ব্যস্ত মানুষ চলতে ভুলে যায়, গাড়ী ঘোড়া থমকে দাঁড়ায়,—শহরের বুকে আছড়ে পড়া আওয়াজের ঢেউ চাপা গলায় বলে, চুপ চুপ।

স্তব্ধতা ভাঙ্গে, ধ্যান ভেঙ্গে যায়। কোমরে দু'হাত দিয়ে সে গড়িয়ে চলে এদিকে ওদিকে এক পায়ে দু'পায়ে জোড় পায়ে। গড়িয়ে চলা আবার নাচও কত ভাবে কত ভঙ্গিতে, শরীরের গতির স্রোত রয়ে বয়ে যায়। স্কেটের চাকা মাটিতে কত কি আঁকে লেখে—নক্সা হিজিবিজি। এবার দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে পাখীর গলা মেলে ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যায় পিছিয়ে আসে, নাশ ভঙ্গিতে হাত করে ধীরে ধীরে ঘোরে—জোরে ঘোরে—আরো জোরে

ঘোরে—পায়ের পাতার উপর ভর করে ভীষণ জোরে ঘোরে—বন্ বন্ বন্ যেন লেত্তির চাবুক খেয়ে লাটিম ঘুরছে বেপরোয়া!

হঠাৎ থেমে গেল। হাঁফায় আর হাসে—প্রাণ ভরে হাসে। চমক ভাঙ্গে সকলের। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে আসে, বুঝতে পারে ব্যাপার কি। খেলা দেখাচ্ছে, মজার খেলা। অনেকে হাত তালি দিয়ে উঠে—কেলাপ্ কেলাপ্। শহরের সেই আওয়াজের ঢেউ ছাড়া পেয়ে নিজের খুসি জানায়, হুম্ হুম্।

শহরের সময় বড় কম, ধৈর্য্য আরো অল্প। কতক্ষণ মজা করতে হবে? আর মজা করার জায়গা বুঝি এই বড় রাস্তার মোড়? মোটারগুলো এক সঙ্গে পিক পিক করে চলে—যাও হট যাও, বুড়ে ট্রাম ব্ল্যাং ব্ল্যাং করে বকে—পথ ছাড় বাপু, ঘোড়ারা পর্য্যন্ত চিহিঁহিঁ চীৎকার করে বলে উঠে—যেতে দাও বলছি।

ঘসা কাঁচের গোল শেড দেওয়া আলোর ত্রিশূলের নীচে সাদা ছাতা নড়ে উঠে। পুলিশ এতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে দু'হাত তুলে গৌর-নিতাই হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মোটা বুট ঠুকে এগিয়ে আসে এবার। সে পিছিয়ে যায়। পুলিশ হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় সেও হাত বাড়িয়ে ধরা দেয় বুঝি—না পিছিয়ে গেল। পুলিশ দৌড়ে কাছে যাবার চেষ্টা করে, সে গড়িয়ে গড়িয়ে পিছিয়ে সরে সরে যায়—আর হাসে।—দুজনে কি কাণামাছি খেলছে? ও মোড়ের পুলিশ সাদা লাইন দেওয়া গণ্ডির বাইরে এসে যায়, মাথার সাদা ছাতা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসে। দুদিকে হাতের ছাড়া পেয়ে গাড়ি মোটার যে দিকে খুশি চলতে থাকে ধমকাতে ধমকাতে খবরদার—এইও। ভারী মাথা দোতালা বাসগুলো নিজেদের বেতো শরীর হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়—ঝড় ঝড়। যত রাজ্যের লোক চারিদিকে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেয় চেঁচিয়ে, হো হো হাসে, হাততালি দেয়—কেলাপ্ কেলাপ্ হৈ হৈ আর রৈ রৈ। শহরের সেই আওয়াজের ঢেউ পাগলের মত দাপাদাপি করে বেড়ায়!

পুলিশের সঙ্গে কাণামাছি খেলা! বেয়াদপি। আরো দুটো পুলিশ কোথা থেকে ছুটে আসে, চারজনে তাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। সে দুজনার মধ্যের ফাঁটুকুর দিকে এগিয়ে যায় পুলিশেরা কাছাকাছি এসে রুখে দেয়, সড়াৎ করে সে সরে যায় অন্যদিকে—এদিকেও তাই। ফুড়ুৎ করে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে গেল কখন? পুলিশেরা নিজেদের বেল্ট আঁটতে আঁটতে থপ থপ করে দৌড়ায় পিছনে। পরের মোড়ে এসে পৌছে গেল। সেই এপাশে হোয়াইটওয়ের ঘড়ি, অন্যদিকে লিপ্টনের চা বিজলিতে জলে ও নেভে, তার সামনে। হ্যাঁ লিপটনের চা এক একটা অক্ষর জলে উঠতো আর সবকটা একসঙ্গে নিভে যেতো বটে কিন্তু আজকাল আর হয় না। এখন যদি রাতে জলে উঠে ত' লোভী জাপানীরা চা খেতে ছুটে আসবে যে!

যাই হোক এই মোড়ে এসে আবার সে গড়িয়ে বেড়ায়, বসে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গি করে, এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে কুম্ভিপাক খায়। দেখলে কি কাণ্ডখানা করলে সে? একজন পুলিশের মাথার ছাতা টুপ করে তুলে নিয়েছে! সেটা আঁকিয়ে বাঁকিয়ে নিজের মাথার উপর নাচিয়ে গড়িয়ে বেড়ায়। জমির উপর সার্কাসের তারের খেলা দেখাবার শখ হ'ল বুঝি?

এতক্ষণে শহরের মানুষগুলো বেশ মেতে উঠেছে। এই রঙ্গে ভিড় ফুটপাতে, সাজানো দোকানের সামনে, উপরে জানলার আনাচে কানাচে। অনেকে মোটর থেকে বাস থেকে নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে যায় দেখবার মত বৈকী। খেলা জমেছে, দর্শকদের নেশাও জমেছে খুব, শুধু পুলিশের দল খেয়ে যায় হিমসিম। দশ বারোটা লাল পাগড়ি মোরগের মত লাল ঝুঁটি মাথা নেড়ে ধরবার চেষ্টা করে—মনে হয় যেন তারাও খেলছে এই মজাদার খেলা একসঙ্গে।

সে এবারে চৌরঙ্গী দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে দক্ষিণমুখো, ভবানীপুরের দিকে, পিছনে থপ থপ করে দৌড়য় পুলিশেরা। দু'ধারে পড়ি ত' মরি করে ভিড় ঠেলে সঙ্গ রাখবার চেষ্টা করে মজা-দেখা মানুষ সব। এই শেষের দলটি যে চুপ করে ছিল না সে-কথা বলাই বাহুল্য।

যাদুঘরের ঠিক সামনে সে পাথর বনে যায়, একেবারে চুপ যেন ঐখান দিয়ে নড়বার কোন আশা আর নেই। টুপির ভিতর লুকানো হাওয়া-বাঁশী শিস দেয় আস্তে আস্তে। পুলিশেরা কাছে এসে যায়। যে দু'হাত বাড়িয়ে ধরে যেন ওদের বুকে করে নিতে চায়। আরো কাছে, এই এতটুকু ফাঁক দু'দিকের মধ্যে। সে পিছনে গড়িয়ে চলে তেমনি হাত বাড়িয়ে কিন্তু ঐ অতটুকু ফাঁক থেকেই যায়, কমে না।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হঠাৎ আসে খেলার আসল খেলোয়াড়েরা। দু'খানি মোটারে পুলিশসাহেব ও অনুচরবর্গ, দুটি মোটারবাইকে দু'জন লালমুখো সার্জ্জেন। পুলিশেরা মাথা কুটে স্যালুট দেয়। সে সোজা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ও মিটি মিটি হাসে, কর্ত্তারাও তাকে ভাল করে দেখে নেয়। মনে হয় পুলিশসাহেবও যেন ঠোঁট কুঁচকে হাসে। ভাবটা এই যে তুমি খেলা করতে চাও, বেশ আমরাও খেলোয়াড়ি খেলা দেখাবো—দাঁড়াও যাদু দেখাচ্ছি মজা।

এবারে নাকের সোজা দৌড়। সে উড়ে চলে, দুখানা মোটার দুটো মোটারবাইক পিছনে তাড়া করে। দাঁড়া পুলিশের দল থপ থপ দৌড়য় যেন আর কিছু করবার নেই বলেই দৌড়ায়। দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠে—হুররে, হাততালি দেয়—কেলাপ্ কেলাপ্ কেলাপ্!

মোটারদের ভারী মুশকিল, অন্য চলতি গাড়ি ঘোড়া বাঁচিয়ে বেসামাল পথিক এড়িয়ে চলতে হয়। সে একলা মানুষ, তার পায়ের তলায় চাকা—এঁকে বেঁকে পাশ কাটিয়ে জলের মাছের মত তীর বেগে ছোটে।

একটি মোটার থেকে এক মালা-দড়ি ছুটে এসে হঠাৎ তার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়! আশ্চর্য্য টিপ! সে খপ করে হাত দিয়ে দড়িটা চেপে ধরে কিন্তু তখন টান সুরু হয়ে গেছে হেঁইও, ডাঙ্গায় মাছ তোলার মতন। গাড়ির গতি মন্দ হয়ে আসে, টানের চোটে সে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়, আর রক্ষা নেই। গাড়ির ভিতর থেকে অনেকগুলি হাত বেরিয়ে আসে—চুলের মুঠি ধরবে বুঝি? সে টুপ করে বসে পড়ে কি কায়দায় খুলে ফেলে গলার ফাঁস, সোজা দাঁড়িয়ে উঠে ছাতাসুদ্ধ গড়িয়ে যায় বেপরোয়া।

তালি পড়ে, কেলাপ্ কেলাপ্! একটু ফাঁকা রাস্তা। মোটার দুখানা বেরিয়ে বেঁকে এগিয়ে গেল। পাশাপাশি চলে। একটি থেকে আরেকটিতে দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হয়। রাস্তার এধার থেকে ওধার দড়ির আড়াল করে মোটারের গতি কমতে থাকে। সে এগিয়ে আসছে আর দড়ি শক্ত হয়ে মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে—নীচে থেকে গলে না পালায়। তার কোমরের সমান সমান দড়ি ঠিক সামনে, পিছনে তাড়া করে মোটারবাইক ধর ধর। দর্শকদের অনেকের মুখ হাঁ হয়ে গেছে অজান্তে। সে পেটের কাছে জোড়া পা কুঁচকে লাফিয়ে পার হয়ে গেল! সাবাস—কেলাপ্ কেলাপ্!

মোটার রাস্তা ছেড়ে দেয়। এবারে মোটারবাইক দুখানা তেড়ে এগিয়ে আসছে, পাশে খুব কাছে এসে যায়। সে দু'হাত বাড়িয়ে দিল দু'দিকে যেন বন্ধুদের সঙ্গে হাত মেলাবে। লালমুখো সার্জ্জেনরা হাত বাড়িয়ে খপ করে হাত ধরে নেয়, অন্য হাতে সামনের চাকা সোজা রাখবার চেষ্টা করে।

উড়ে চলে তিনজনে হাওয়ায়, হাওয়ারই মানুষ ওরা। সে খাঁড়া সোজা উড়ে চলেছে, চোখ পিট পিট করছে, লালজামা পিঠের উপর ফুলকো লুচির মতন ফুলে উঠেছে, হাওয়া-বাঁশী একটানা শিস দিচ্ছে শী—শী, আর তার

মুখে ফুটেছে এক ভারী মিষ্টি হাসি। আকাশ ফাটিয়ে তালি পড়ে—দু'পাশ থেকে, উপরের জানলা থেকে, ট্রামের—গাড়ির—দোতালা বাসের ভিতর থেকে—কেলাপ্ কেলাপ্—থামতে চায় না—কেলাপ্ কেলাপ্।

জগুবাবুর বাজারের সামনেটা লোকে লোকারণ্য—গিজগিজ করছে মানুষ। খবরটি আগে ভাগে এখানে এসে পৌচেছে নাকি? মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ঐ দেখ আসছে, এবার আসছেরে।

বেশ আসছিল তিনজনে এক সারিতে হাত ধরাধরি করে। হঠাৎ হ'ল কি, সে রামচিম্‌টি দিল নাকি? সার্জ্জেনরা সড়াৎ করে হাত সরিয়ে নেয়, ক্রীচ ক্রীচ শব্দ করে ব্রেক কসে থামাবার চেষ্টা করে। পিছনের মোটারও এগিয়ে আসে গতি কমিয়ে দিতে দিতে।

সে? ঠিক উড়ন্ত ঘুড়ির মত গোঁৎ খেয়ে মানুষের ভিড়ের দিকে হঠাৎ বেঁকে যায়। জনতা হাঁ করে গিলে ফেলে তাকে। হারিয়ে গেল সে, লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, পুলিশের সেই সাদা ছাতাটি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে একলা!

এরপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি বাজারের ভিতর শাকের ঝাঁকা উজোড় করে দেখা হ'ল, কুমড়োর পিরামিড ধ্বংস করে খোঁজা হ'ল, আলু ধোবার বড় বড় ডাবার ভিতর হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে দেখা হ'ল,—সে নেই! অত মানুষের ভিড়ে কোথায় কোনদিকে গেল কেউ বলতে পারলো না!

এইখানেই আমাদের থামতে হবে। আর এগুবার জো নেই। কারণ এ কাহিনীর শেষ এখনো বাকী আছে। কাগজে যে বিজ্ঞাপন পড়ছো ও রেডিওতে যে ঘোষণা শুনছো রোজ, এসবের কোন সুফল হয়নি এখনো। তার মানে সে এখনো ধরা পড়েনি এবং ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাও দেখছি না!

তোমাদের দলের ঐ চালাক চন্দরের ভয়ানক বুদ্ধি দেখছি, ও ছেলে বাঁচলে হয়। জিজ্ঞাসা করছে,—আমি এ সমস্ত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানলাম কি করে, বাঃ!

আর একটু কাছে এগিয়ে এস চুপি চুপি জবাবটি দিয়ে দি কানে কানে,—আমিই হ'লাম সে! না না চমকালে চলবে না, কিন্তু ও নয়, শুধু শুনেই ভুলে যাও এখুনি যে—আমিই সে!

পাখী ও পালক

ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা

এ কথা বলা বাহুল্য যে পালক ছাড়া পাখী হয় না। পালক, পাখীর শুধু সম্পদ নয়, তার প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রকৃতির রাজ্যে পাখীর লক্ষণ স্বতঃ প্রকট অর্থাৎ জীবজগতে পাখীকে চিনে নিতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। সে যে রকম ধাঁচের পাখীই হোক আপামর-সাধারণ তার স্বতঃপ্রতীয়মান লক্ষণে তাকে পাখীই বল্‌বে, অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে না। আমার কথার মর্ম্ম আরও স্পষ্ট উপলব্ধি হবে সরীসৃপ কিংবা স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে পাখীর তুলনা ক'রলে। হাতী একটী স্তন্যপায়ী জন্তু, বাদুড়ও স্তন্যপায়ী; ক্যাঙ্গারুকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা দেখে থাক্‌বে—সেও একটী স্তন্যপায়ী জন্তু; সমুদ্রের তিমিকেও স্তন্যপায়ী বলা হয়। এই যে চারটে স্তন্যপায়ী জন্তুর নাম করা গেল, তাদের প্রত্যেকটিকে তোমরা স্বচক্ষে না দেখে থাক্‌লেও তাদের সম্বন্ধে বইতে পড়েছ এবং সেজন্য তাদেরকে স্তন্যপায়ী ব'লে মেনে নিয়েছ। কিন্তু ধর যদি এই চারটে জীবকে পাশাপাশি তোমাদের সামনে এনে দেওয়া যায়, তাহলে এদের পরস্পরের বৈসাদৃশ্য দেখে তোমরা ভড়কে যাবে। এমন কিছু সাম্য-লক্ষণ, স্বতঃপ্রতীয়মান হওয়া তো দূরের কথা, চেষ্টা ক'রেও তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে না, যাতে ক'রে এরা যে চারটিই একই শ্রেণীর জীব, এ সম্বন্ধে তোমাদের একটা পাকাপাকি ধারণা দাঁড়ায়। সরীসৃপদের ভিতরেও এই গোলমাল। সাপে কচ্ছপে মিল—অবশ্য আকৃতিতে—আছে কি? জীববিদ্যার কিভাবে তোমরা পড়েছ যে দুটাই সরীসৃপ। তা হ'লে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই মিল আছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই মিলের লক্ষণ ধরা পড়ে কি? ধরাপড়া মুস্কিল বটে। পাখী চেনা তোমাদের পক্ষে যত সহজ, এ সব জন্তুগুলোকে চেনা তত সহজ নয়। কেন নয়, তার উত্তর হ'চ্ছে শ্রেণীহিসাবে পাখী সাধারণের ভিতর যেরূপ একটা সমলক্ষণ স্বতঃপরিস্ফুট আছে, জীবরাজ্যের অন্য জীবজন্তুর ভিতর তা আদৌ নাই। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে পাখীর প্রধান লক্ষণ হ'চ্ছে তার পালক।

ইংরাজী প্রবাদটী তোমাদের জানা আছে—Fine feathers make fine birds অর্থাৎ যার যত পালকের বাহার সে তত সুন্দর পাখী। কিন্তু বাহারের চেয়েও পালক হ'চ্ছে পক্ষি-জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান। পালক আবরণ হিসাবে পাখীর দেহের তাপ সমানভাবে রক্ষা করে অর্থাৎ যাতে যে কোন কারণেই হোক সেই তাপের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি না হয়; কারণ তার ফল হবে পাখীর পক্ষে সাংঘাতিক। দেহতাপ রক্ষণশীল পালকে আবৃত থেকে পাখী তাই দেশকাল নির্ব্বিশেষে প্রকৃতির ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে প্রতিকূল অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যেও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন ক'রতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাখী একটি মেরুদণ্ডী জীব, রক্তের উষ্ণতা যার লক্ষণ; তার

দেহতাপের সমতার নড়চড় ঘটা চ'লবে না—পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়ার ঘাতপ্রতিঘাতেও নয়। পালককে তার দেহতাপের সাম্যরক্ষা ক'রতে হবে—সেই পালক তাই বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই, পদার্থবিদ্যার ভাষায় যাকে Non-conducting বলা হয়। তোমরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহে লোম জন্মায় ইহা নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রেছ। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য জায়গায় ছাগল, ভেড়া, গরুর দেহের লোম গরম জায়গার চেয়ে বেশী, এও তোমরা দেখে থাক্‌বে। প্রকৃতির ব্যবস্থায় এরূপ লোমের সার্থকতা হ'চ্ছে ঐ সকল জন্তুদের দেহের উত্তাপ রক্ষা করা। সরীসৃপেরা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, রৌদ্র, বাতাসের উপর নির্ভর ক'রে স্ব স্ব দেহের তাপসঞ্চয়ের জন্য। মাছ, ভেক প্রভৃতি জলজ জীবেরাও জলের তাপে দেহের তাপ অর্জ্জন করে। এখন ধর, হঠাৎ জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে প'ড়ল, তার পরিণাম কি হবে ঐ জীবগুলি সম্বন্ধে তা সহজেই অনুমেয়। পুকুরে মাছের মড়ক হঠাৎ ঘট্‌তে তোমরা দেখে থাক্‌বে। পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তন যে এর কারণ, এইবার তোমরা তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পরিষ্কার ধারণা ক'রতে পাচ্ছ যে নিদারুণ প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর নিজের দেহের তাপ ঠিক বজায় রাখতে পারে না বলে অনেক জীবকে প্রাণ হারাতে হয়। যে জীবগুলা মৃত্যুর হাত এড়াইবার জন্য পালিয়ে অনুকূল জায়গায় পৌঁছুতে পারে, তারা টিকে যায়। অধিকাংশ জীবজন্তুরই গতিবিধি ও বসবাস অনুকূল ভৌগলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাখীর বেলায় এর ব্যতিক্রম পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। পাখীর সর্ব্বাঙ্গে পালকের বিন্যাস ও সেই সমস্ত পালকের গঠন পাখীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবাধ ভ্রমনের পক্ষে বিচিত্ররূপে অনুকূল। পাখীর পালক সম্বন্ধে তাই কিছু বিস্তারিত আলোচনা ক'রতে চাই।

ধর, তোমাদের সাম্‌নে একটা পাখী আছে। তোমরা দেখছ সেই পাখীর দেহে আগাগোড়া পালকের আবরণ। নৈসর্গিক অবস্থায় পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের ভিতর পাখীটা রয়েছে। পাখীর তাপরোধক অর্থাৎ Non-conducting পালকের আবরণ বাহিরের বায়ুমণ্ডলকে তার দেহের সংস্পর্শে আস্‌তে দিচ্ছে না। পাখীটার পালকের বিন্যাসের ভিতরও একটা বায়ুস্তর আট্‌কানো আছে। সেই বায়ুস্তরও বাইরের মুক্ত বায়ুস্তরের সংস্পর্শে আস্‌তে পাচ্ছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে পালকের আবরণের দুধারে দুটো দুরকম বায়ুস্তর পাখীটার দেহের তাপ সমভাবে সংরক্ষণের সুবিধা ক'রেছে—যেন আমাদের গৃহস্থালির ভাষায় ব'লতে গেলে ডবল জানালার দ্বারা তাপ সংরক্ষণ হ'চ্ছে। পাখীর এমন শক্তিও আছে যে সে আপন চর্ম্মপেশীর ক্রিয়ার দ্বারা তার পালক ফুলিয়ে পালকের ভিতরকার বায়ুমণ্ডলের অধিকতর বিস্তার সাধন ক'রে শরীরের উত্তাপ ভালরূপে বজায় রাখতে পারে।

পাখীর সারা দেহে পালকের উল্লেখ করেছি। কিন্তু তোমরা হয়তো ব'লবে—কই পাখীর পায়ে তো পালক নেই? পালকের পরিবর্ত্তে চর্ম্মের ভাঁজ আছে এবং সেই ভাঁজ মাছের আঁশের মতো দেখা যায়। বাস্তবিক তোমাদের কথাটা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে পাখীবিশেষের পা পালকে মণ্ডিত থাকে। তোমরা পায়রার পায়ে পালক

দেখেছ; জাতভেদে পোষা মুর্গীরও পায়ে পালক আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পাখীর পা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পায়ের চর্ম্মস্তরের বাইরের ভাগ কঠিন ফুলো ফুলো বিন্দুতে পরিণত হ'য়ে রয়েছে এবং এগুলোই আঁশের মত দেখায়। কিন্তু পায়ের সেই ফুলো ফুলো আঁশের মত কঠিন চামড়াটার সংলগ্ন স্তরে একটু ভিতর দিক হ'তে পালকের উদ্গম সুরু হ'চ্ছে,—পালক যেমন বাড়তে থাক্‌বে, আঁশগুলো অল্প নীচে দেবে বা ব'সে যাবে। অবশেষে দেখা যাবে যে পালক পাখীর পায়ের আঁশের মত চর্ম্ম ভাঁজের উপর বিন্যস্ত হ'য়েছে। এই পরীক্ষা হতে আমরা বুঝি ঠিক যে চামড়ার আঁশগুলি পালকে পরিণত হ'য়েছে তা নয়; দুটোরই উৎপত্তি ঘ'টেছে একই জিনিষ হ'তে—যাতে ক'রে পালক ও আঁশকে তার দুটো অংশ বলা যেতে পারে। আঁশের জায়গাটা যখন বসে যেতে দেখা যায়, তখন মাত্র পালকই ভাল ক'রে ফুটে বেরোয়। এখন তোমরা বুঝতে পাচ্ছ যে আঁশ ও পালক এ দুটোর পরস্পর সম্বন্ধ কত নিবিড়। সরীসৃপের দেহ আঁশে ভরা এ তোমরা জান। তবে কি আঁশযুক্ত সরীসৃপের সঙ্গে পাখীরও সম্বন্ধ আছে? বাস্তবিক জীববিদ্যার গবেষণায় জানা গিয়েছে যে এক প্রকার সরীসৃপের মত জীব হ'তেই পাখীর আদি উৎপত্তি। এই সরীসৃপের মত জীবটীর কঙ্কাল মাটি খুঁড়ে বার করা হ'য়েছে। তার অস্থি-কঙ্কাল ও অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে আধুনিক পাখীর বেশ মিল আছে। তার মাথার খুলি শিরদাঁড়ার সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ—আধুনিক পাখীরও একটা একটা লক্ষণ। জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে তার সাম্‌নের পা দুটো পাখীর বেলায় দু পার্শ্বের দুটো ডানায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। বায়ুমণ্ডলে পাখীকে তার দেহভার নিয়ে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে হয়—এই উড়ে বেড়াবার শক্তি সে অর্জ্জন ক'রতে পেরেছে প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে কত যুগ-যুগান্তরের চেষ্টায়। তাতে তার অস্থি কঙ্কাল, পেশী প্রভৃতির কত পরিবর্ত্তন—কত বিবর্ত্তন ঘটেছে। তার বড় বড় হাড়গুলো ফাঁপা—বায়ুভরা; তার বুকের হাড় নৌকোর খোলের আকার গ্রহণ করেছে, বুকের পেশীগুলো বিপর্য্যয়ের বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও যে কত রকমের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ হয়েছে তা বলবার এখন অবসর নেই। মোট কথা, এর ফলে পাখী তার স্বীয় জীবনযাত্রার অনুকূল বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন ক'রে চলেছে। তার দেহের ওজন খুবই হালকা, দেহের তাপ খুবই বেশী—১১০-১১২° ডিগ্রী ফার্ণহীট, তার উড়বার শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতা খুবই আশ্চর্য্যজনক। পাখীর সবচেয়ে তীব্র গতি লক্ষ্য করা হ'য়েছে ঘণ্টায় ৮০ এমন কি ১০০ মাইল পর্য্যন্ত। তার দেহের পালক তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার পালকের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ। তাই পাখীকে তোমরা সুন্দর বল। কিসে সেই পালকের অপূর্ব্ব রং জন্মে, তা ব'লতে হ'লে অনেক সময় দরকার। পাখী পালক ছাড়ে তা হয়তো তোমরা জান। শিখীর পুচ্ছ আপনা-আপনি ঝ'য়ে পড়ে তোমরা লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে। সরীসৃপ ও পাখীর পরস্পরের মিল আরও আছে—যদি তাদের লাল রক্তকণা পরীক্ষা করা যায়। উভয়েই ডিম পাড়ে। পূর্ব্বেই বলেছি আদিম পাখীর উৎপত্তি সরীসৃপ হ'তে।*

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও'র বিদ্যার্থী মণ্ডলে পঠিত।

মেঘ আর ফগ্, ডালিয়া ফুল আর পাইন গাছ, রঙীন নগরী আর হিমালয় পাহাড় চিরদিন থাকবে—অন্য এক সময়ে এসে ভালো ক'রে দেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রণব বাবুর মতন মাষ্টারমশাই একেবারে চ'লে গেলে তার চেয়ে আফশোষের কী আছে ?—মন কেমন করতে করতে এই কথাই প্রদীপের মনে হল।

সে দাদুকে গিয়ে বললে—দাদু আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাব।

বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে দাদু বল্‌লেন—কোথায় যাবে ?

যেখানে উনি নিয়ে যাবেন।

দাদু কোনো কথা বল্‌লেন না। অনেকক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেও তাঁকে সাড়া দিতে না দেখে প্রদীপের আর তাড়া দিতে ভরসা হ'ল না, সে নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

মাষ্টার মশাইয়ের স্যুটকেস গোছানো শেষ হয়েছে, প্রদীপ কাছে গিয়ে বল্‌লে, আমাকে নিয়ে চলুন।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—সে হয় না প্রদীপ। পৃথিবীতে তোমার দাদুর চেয়ে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই জানবে। ভুল পথে চল্‌লেও তিনি তোমার শুভ কামনা করেন সব সময়ে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কিছু হ'তে পারে না। আমি চলে যাচ্ছি তাঁর উপর রাগ ক'রে নয়, তোমার ভালো কিছু এ অবস্থায় করতে পারব না ব'লে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে তোমার কল্যাণ করবার ক্ষমতা আমার নেই।

বিদায় নেবার সময়ে প্রদীপের মাথায় হাত দিয়ে তিনি ব'লে গেলেন—আমার পরে যে শিক্ষকই তোমার আসুন তাঁকে আমার মতনই ভক্তি করবে। আর আমাকে মনে রাখার কোনো দরকার নেই, আমার কথাগুলো মনে রেখে কাজ করলেই হবে।

শহরের আলো জ্বলে উঠেছে, হিম ও কুয়াসায় ঢাকা পথে প্রণব বাবু নেমে গেলেন।

ট্রেন ছাড়বার আর দেরী নেই—দাদু ঘড়ি দেখে বল্‌লেন।

হঠাৎ পাহাড়ী দারোয়ানের হাতে একখানি চিঠি লিখে ব'লে দিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যেতে।

প্রদীপ তখন শুতে যাচ্ছে দেখে অবাক্ হল মাষ্টারমশাই ফিরে এসেছেন। দাদুর মত বদ্‌লেছে। বল্‌লেন—চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা আশা করি মঞ্জুর করেছ মাষ্টার।' প্রদীপকে ছেড়ে দিলাম তোমার হাতে। ভেবে আমি আর পারি না।

পরদিন দিনের সূর্য্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়বার আগে শিলিগুড়ির প্রান্তরে ওরা নেমে এলো। তারপর উত্তরে এবং পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে, তারপর পশ্চিমে কত গ্রাম কত প্রান্তর দেখে গঙ্গায় ষ্টীমার ক'রে ওপারে অন্য রেল লাইনে চ'ড়ে গুরু শিষ্য আর পার্ব্বতী পৌছে গেল বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে।

সেখানে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে জাহ্নবীর গেরুয়া রঙের বিস্তৃত বালুচরে ঝিলিক্ মারা রোদ প্রদীপে বিষণ্ণ মন প্রসন্ন ক'রে তুল্‌লো ;

বিন্ধ্যাচল—মাইলের পর মাইল ছড়ানো। মাইলের পর মাইল সমতল ভূমি তার শিখরে। অরণ্যের পর অরণ্য, গুহার পর গুহা, ঝর্নার পর ঝর্না এবং গ্রামের পর গ্রাম।

সেখানে সে ঘোড়ায় চড়া শেখে, কুস্তি শেখে মির্জ্জাপুরী ওস্তাদের কাছে। সাঁতার শেখে বিন্ধ্যেশ্বরীর মন্দিরের ঘাটে। পড়া তৈরী করে দুবেলা নিয়মিত।

বিন্ধ্যাচলের লোকেরা ওকে জমিদারের নাতি ব'লে কেউ চেনে না, জানে গরীবের ছেলে ব'লে। এমন কি পোষাক আর ভাষায় বাঙালী ব'লেও চেনা যায় না, মনে হয় হিন্দুস্থানী। সে ছাতু খায়, চানা খায়, বাদাম খায়, কাঁচা ভুট্টা চিবিয়ে খায়, দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে খায়।

সে গাছে চড়ে, লাঠি ঘোরায়, বন্দুক ছোঁড়ে।

সূর্য্য ওঠার অনেক আগে তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। অন্ধকারের বুক থেকে আকাশ ও মাটির ছবি ধীরে ধীরে আলোতে কেমন ক'রে ফুটে ওঠে, স্বপনের রাজ্য থেকে জাগরণের দেশে আসা যায়, তার অনুভূতিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

নীচে দূরে গঙ্গা ধূধূ বালির চড়ায় যেন লক্ষ্মীর আলপনা এঁকে দিয়েছে। বিন্ধ্যাচলের পাহাড় থেকে পাহাড়ে সেই গঙ্গার হাওয়া ব'য়ে যায়।

যেদিন মেঘ ক'রে ওঠে কন্‌কনে বাতাস চলে, ঝরঝর বৃষ্টি নামে, গাছগুলির রং নানা রকমের দেখায়, সেদিন শুষ্ক কঠিন দেশে যেন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। সেদিন ঝর্নাগুলো ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন গঙ্গার সমস্ত বালুচর ডুবে যায় রাঙা জলে।

এক বছর বাদে প্রদীপকে আর চেনা যায় না। শরীর তার শক্ত হ'য়ে গেছে, মনে এসেছে সাহস। দুপুরের চড়চড়ে রোদ মাথায় নিয়ে, কিম্বা বৃষ্টি ঝরা অন্ধকার দিনে, সাপে ভরা রাতের রাস্তায় মাইল পার হয়ে যেতে পারে সে অনায়াসে।

একদিন—তখনো উষার আলো জাগেনি ভালো ক'রে, বিন্ধ্যাচলের মাথায় সমতল প্রান্তরে সেই অস্পষ্ট আলোয় পাৎলা অন্ধকারে প্রদীপ বেরিয়ে পড়েছে একলা! খানিকটা গিয়ে দেখলে আশ্চর্য্য জিনিস—দলে দলে হরিণ চরছে, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে। কোনো কোনোটার শিং ছোট গাছের শাখা প্রশাখার মতন নীচে নেমে যাওয়া আকাশের গায়ে ফুটেছে, কোনো কোনোটার বাদামী রং অল্প আলোয় চক্ চক্ করছে। যেই না ওর সাড়া পাওয়া, অম্নি দলের প্রথমটা দিয়েছে লাফ আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হরিণের পাল যেন সোণালী তরঙ্গের মতন দুলে উঠে সবুজের সমুদ্রে ডুবে গেল।

চল্‌তে চল্‌তে সে পেলে একটা সিঁড়ি, নেমে গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে পাতালপুরীর দিকে। অনেক নীচে ঘন অরণ্যের মাথা, সেইদিকে চেয়ে সে নেমে চল্‌ল। শুনেছে, কোথায় ডাকাতে কালী আছে, হাঁ-করা ভীষণ মুখ, সেই মুখের গহ্বরে একশোটা পাঁঠার রক্ত ঢেলে দিলে নিঃশেষে তলিয়ে যায়। ঐ দিকে ঐ গহন বনের মধ্যে, নির্জ্জন নিরালায়। আড়াই শো সিঁড়ি পার হ'য়েও মন্দিরের কোনো দিক পাওয়া গেল না। আরো আরো নীচে নাম্‌তে হবে। ভোরের পাখী তখন ঘুম ভেঙ্গে একে একে ডেকে উঠছে।

[ক্রমশঃ

বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের এই বইগুলি পড়ো।—

ভয়ঙ্কর আফ্রিকা—	২৷৷০	আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
আজকের আমেরিকা—	২৷৷০	মরণ বিজয়ী চীন—	৩৷৷০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০	ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০

লাল চীন— ১৷৷০

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

ছোটদের

ছড়ার গল্প

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

বাগানের মাঝে এক সুন্দর পুকুর,
চারি পাড়ে ফলগাছ ফলে ভরপূর।
ঘাটের দু'পাশে দুই আমের গাছেতে,
বড় বড় কত আম দোলে বাতাসেতে॥

ছেলেটি ঘাটেতে বোসে নীচের সিঁড়িতে,
শান দিতেছিল তার নিজের ছুরিতে।
কোথা থেকে পট্ করে মাছ মাথা তুলে,
কট্ করে কামড়ালে ছেলের আঙুলে॥

ছুরি ছুড়ে ফেলে ছেলে কাঁদে যন্ত্রণায়,
ছুরিখানা পড়ে এক আমের বোঁটায়।
শালিখ চরিতেছিল গাছের তলায়,
বোঁটা কেটে পড়ে আম তাহার মাথায়॥

ব্যথায় শালিখ পাখী আঁচড়ায় মাটি,
মাটিতে পিঁপিড়া বাঁধে ঘর পরিপাটি।
আঁচড়ে ভাঙ্গিল ঘর, রাগে ও হতাশে,
পিঁপিড়ার সারি সব ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥

গরুটি চিবায় ঘাস পুকুর পাড়েতে,
পিঁপিড়া কামড় দিল তাহার পায়েতে।
ল্যাজ তুলে হাম্বারবে গরু ছুটে যায়,
ভাঙ্গিল কলার গাছ গরুর ধাক্কায়॥

কত কাটি আনি মুখে কাকী ও কাকেতে,
যতনে বাঁধিল বাসা কলার গাছেতে।
গাছ সাথে ভাঙ্গে বাসা ডিম ছড়াছড়ি,
কা কা করে ওড়ে কাক ভয়ে ধড়ফড়ি॥

চলেছে রাজার হাতী রাজপথ দিয়া,
ঢুকিল কানেতে তার কাক দুটো গিয়া।
খড়মড় করে কানে হাতী গেল ক্ষেপে,
পড়িল গিয়ে বুড়ির কুঁড়েখানি চেপে॥

হাতীর চাপেতে কুঁড়ে হল চুরমার।
তিনকাল গেছে তার, কেহ নাহি আর,
উপায় না দেখে বুড়ি ভাবিয়া ভাবিয়া,
ডুবিয়া মরিল আহা কুয়াতে পড়িয়া

প্রশ্ন

বল দেখি ভেবে দেখে
কি হ'ল কিসের থেকে?
ছুরিটা কেন ছুড়িল?
আমটি কেন পড়িল?
শালিখের কি হইল?

পিঁপড়া কিসে রাগিল?
গরু কেন ছুটে যায়?
কার ডিম কে ছড়ায়?
হাতী কেন ভাগে ডরে?
বুড়ি কেন ডুবে মরে?

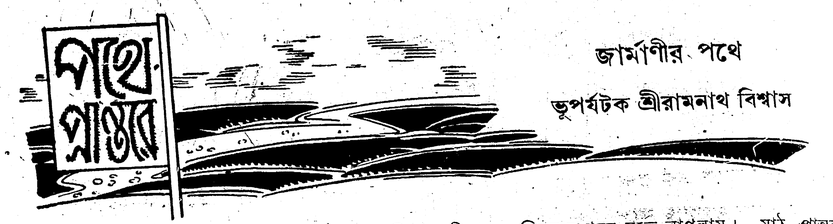

জার্মাণীর পথে

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

স্টকারু হতে বিদায় নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। মাঠ, প্রান্তর নদ-নদী সবই যেন সাজানো বলে মনে হতে লাগল। বেশ আরাম করেই পথ চলছিলাম। বিদেশে এসেছি একথা একবারও মনে হচ্ছিল না। তবে একটি কষ্টের কথা তোমাদের আমায় বলতেই হবে। এদিকের লোক দই, দুধ খুব কম খায় বলেই মনে হল। আমার আবার এসব না হলে চলত না। রেস্তোরায় গিয়ে বসবার স্থান পেতাম না। সবাই দাঁড়িয়ে বিয়ার খায়। এদিকের লোক পনীর বা "চীজ্" অধিক পরিমাণে খায়। যখনই কোন কৃষকের বাড়িতে যেতাম তখনই তারা চিজ্, ব্রাউন ব্রেড, পেঁয়াজ খেতে দিত। তারপর দিত একটি ছোট্ট পেয়ালা ভরে কফি। তাতে আবার দুধ দেওয়া হত না। এরূপ খাবার খেয়ে আমি মোটেই আরাম পেতাম না। সেদিন কোন মতে হলোবর্ণ (HOLLA BRUNN) নামক একটি ছোট্ট গ্রামে এলাম। গ্রামখানা পাহাড়ের উপর একটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। গ্রামে পৌছা মাত্রই বেশ ঠাণ্ডা মনে হতে লাগল। ঠাণ্ডায় থরথর করে কেঁপে একটি কাফে খানায় এসে দাঁড়ালাম। বাইসাইকেলটা বাইরে রেখেই ভিতরে গিয়ে এক পেয়ালা কাফির অর্ডার দিলাম।

তোমাদের কাছে এখন আমার কতকগুলি চালচলনের কথা বলতে বাধ্য হব। লোকচক্ষু এড়াবার জন্য আমি মামুলী পোষাকই পরতাম। রেঁস্তোরায় প্রবেশ করার পর কেউ টেরও পায়নি যে একজন বিদেশী লোক তাদের ঘরে প্রবেশ করেছে। যে ভাষায় কথা বলছিলাম তাও তাদের অপরিচিত নয়। আমি যখন কাফি খাচ্ছিলাম তখন অন্য আর একজন ভূপর্যটকও সে ঘরটাতে বসেছিলেন। তার মাথায় একটি টুপি ছিল। টুপিটিতে অনেক রকমের মেডেল ঝুলান ছিল। ভূপর্যটকের মাথার টুপিতে নানারূপ মেডেল ঝুলতে এই সর্বপ্রথম দেখলাম। কথা প্রসংগে তিনি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বললেন। তিনি কথা বলছিলেন "এস্পেরেন্ত" ভাষায়। আমি তার প্রায় কথাই বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের দেশে হিন্দুস্থানী যেমন প্রায় লোকই বুঝে, ইউরোপেও এস্পেরেন্ত ভাষা অনেকেই বুঝতে পারে। তোমাদের মাঝে যারা সংস্কৃত অথবা পালি ভাষা ভাল করে জানবে তাদের পক্ষে এস্পেরেন্ত ভাষা বুঝা কঠিন হবে না, কারণ এস্পেরেন্ত ভাষার গঠন হল সকল ভাষার আদি কথা হতে। ইউরোপের হংগেরী ভাষা ছাড়া আর সকল ভাষার সংগেই সংস্কৃতের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই আমি এস্পেরেন্ত বেশ বুঝতে পারতাম। বহুরূপী ভূপর্যটকের কথা যখন মন দিয়ে শুনছিলাম তখন বাইরে সাইকেলের পাংচার হবার একটা ফোঁস্ শব্দ শুনলাম। আমার সাইকেলের চাকাটা ফুটো হয়েছে কি না দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি, একটি বার তের বছরের ছেলে সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে হাত পা নেড়ে ইসারা করে বলল যে চাকার ভাল্‌বটা সে টেনে বার করতে গিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। টিউব ফেটেছে। আমিও জানতাম টিউব যখন পুরাতন হয় তখন হঠাৎ ভাল্‌বও বের করলে টিউব ও ফাটতে পারে। তোমরা যদি এই কাজটি করতে তবে অষ্ট্রিয়ান ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে কি? নিশ্চয়ই চম্পট দিতে। আর আমিও যদি ধরতে পারতাম তবে গালে ঠাস্ করে একটা চড়ও হয়ত মেরে দিতাম। কিন্তু স্বাধীন দেশে তা হবার যো নাই। ছেলে

মেয়েকে রাস্তা ঘাটে যদি কেউ শুধু শুধু মারে তা হলে আইন অনুসারে তাকে পেতে হয় সাজা। কোর্টে হয় জরিমানা। ছেলেমেয়েরা একটু দুষ্টামি করলে আমরা বলি, "কেন এমন করলি?" ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তার জবাব দিতে পারে না। এরূপ প্রশ্ন করার ফলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আপনা হতেই মিথ্যা কথা বলতে শেখে এবং ভবিষ্যতে একটি ওস্তাদ মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপ, জাপান আর আমেরিকায় যদি বাপ মা ছোট ছেলে মেয়েকে জিগেস করেন, "কেন এমন করলি" এবং অন্য কেউ তা শুনতে পায় তবে তাকে বিশেষ শাস্তি পেতে হয়। সুশিক্ষার কত সংগুণ বুঝলে ত? সুশিক্ষা এমনি হয় না। সর্বসাধারণকে প্রথম লেখা পড়া শেখাতে হয় তারপর বইএর মার তবে করণীয় উপদেশ দিয়ে দিতে হয়। এর উন্নতির পেছনে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা। দেশ যদি স্বাধীন না হয়, তবে আমি যা তোমাদের বলছি তা শুধু গল্পই থেকে যাবে, কাজে কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে না।

এখন কাজের কথায় আসছি। আমাদের বর্ণিত ছেলেটি আমাকে দেখে একটুও ভয় পেলেনা উপরন্তু এবং সাহসের সংগে তার নিজের দোষ স্বীকার করল যা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। তখনই সে আমার হাত ধরে তার কাকার দোকানের দিকে নিয়ে চল্‌ল। এবং সব কথা পণ্ডিতের মত বুঝিয়ে বলল। তার কাকা তখনই আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং আমার টিউব মেরামত করে দিলেন। ছেলেটির কাকা ছেলেটিকে কিছুই বললেন না, শুধু হেসে আমাকে বললেন, "ভাই-পো ভবিষ্যতে যে একটি ইন্‌জিনিয়ার হবে এটা যেন জেনে রাখি।" এখন বুঝতে হয়ত পেরেছ, ওর কত বালাই। স্বাধীন দেশের মানুষের মত হতে হলে সব চাইতে আগে ভূতের ভয়, মাস্টারের ভয়, মা বাবার বকুনির ভয় যা মনে আস্থানা গেড়েছে তা দূর করতে হবে।

গ্রামটি আমার কাছে সুন্দর লেগেছিল। ইচ্ছা হল এখানে কয়েক দিন থেকে যাই, তাই ঐ ছেলেটির সাহায্যেই একটি ছোট হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করি। হোটেলের মালীক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক বেশ ভাল রকমেই ইংলিশ বলতে পারতেন। বৃদ্ধার সংগে কথা বলে আমার সময় কেটে যেত। কখন কখন আমরা গ্রামের বড় বড় রেঁস্তোরাতে খেতে যেতাম। একদিন যখন আমরা গ্রামের বড় রেস্তোরাতে খেতে গিয়েছিলাম তখন একটি ইটালীয়ান হঠাৎ আমার কাছে এসে আমার পায়ের উপর তার পা দিয়ে চাপতে থাকে। দু একবার তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু সে আমার কথা শুনতে রাজি নয়। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "তুই আব্‌সিনী, আমার সামনে বসে কাফি খাবি তা কি করে হয়? এখান থেকে বের হয়ে যা।" আমি আর কথা না বাড়িয়ে তার গালে একটা চড় লাগিয়ে দিলাম এবং আর একটা দিতে যাচ্ছি অমনি সময় সে আমাকে ঘুসি মারে। তার ঘুসিটা আমার টুপির উপর লাগায় কপালটা শুধু ফুলেই গিয়েছিল, রক্ত বের হয় নি। টুপিটা মাথা হতে পড়ে যাওয়ায় সকলেই বুঝল আমি নিগ্রো নই। কিন্তু তা বলে আমি ছেড়ে দেবার লোকও নই। আমিও যেমন ভাবে লোকটাকে মারতে লাগলাম, সে ও তেমনি আমাকে মারতে লাগল। আমরা যখন লড়াই করছিলাম তখন আমার সাথের মহিলা সকলের কাছে চিৎকার করে বলছিলেন, আমি নিগ্রো নই আমি "ইণ্ড" অর্থাৎ ভারতবাসী। তাঁর কথা শুনে ইতালী দেশীয় লোকটি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে চায় কিন্তু আমি তাকে ছাড়িনি, সে রীতিমত ইউরোপীয় মতে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল, তারপর আমি তাকে বিদায় দিয়েছিলাম। তোমরা বোধ হয় জান, ইউরোপে লোকে পিস্তল সংগে রাখতে পারে, আমিও ভেবেছিলাম লোকটার কাছে অবশ্য পিস্তল আছে, তা বলে আমি ঘাবড়ে যাই নি। নিজের সম্মান বজায় রাখতে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। আমাকে যখন ভারতবাসী বলে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল অথবা

ইতালীয়ান লোকটি যখন আমাকে নিগ্রো ভেবেছিল তখন আমি আমার জাতের কথা বলেই রেহাই পেতাম, কিন্তু তা আমি করিনি এবং সেরূপ করা মহা অন্যায় কাজ। তাই আমি নিজেকে নিগ্রো স্বীকার করে নিয়েই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। ইজ্জত বজায় রাখতে গিয়ে যারাই প্রাণের মমতা করে তারাই কাপুরুষ এবং দেশ এবং জাতের শত্রু, এ কথাটা তোমরা নিশ্চয়ই জান।

এই ঘটনাটি ঘটবার পর আরও তিন দিন আমি ঐ গ্রামে ছিলাম। গ্রামের লোক আমাকে বেশ শ্রদ্ধা করত কারণ তারা দেখছিল আমি ও সৎ কারণে লড়াই করতে প্রস্তুত হতে পারি এবং লড়াইও করতে পারি। বড় রেঁস্তোরায় শুধু খাবার খেতে আমি যেতাম না, সেখানে একখানা "লণ্ডন টাইমস্" কাগজ আসত তাই পড়তে যেতাম। ইউরোপের সর্বত্র দেখতে পেয়েছি বড় বড় রেঁস্তোরাতে বিদেশের সংবাদ পত্র তারা রাখে। ইংলণ্ডে আরও অনেক সংবাদ পত্র আছে, কিন্তু লণ্ডন টাইমস্ ছাড়া আর কোন সংবাদ পত্র না রাখার একমাত্র কারণ হল, লণ্ডন টাইমস্ বৃটিশ সরকারের মুখপত্র। ইউরোপ ভ্রমণ করার সময় এই সংবাদ পত্র পাঠ করতে গিয়ে আমাকে অনেকদিন বিপদে পড়তে হয়েছে।

সুন্দর সহরটি যেদিন সকাল বেলা ছেড়ে এলাম সেদিন ছেলে বুড়া মিলে আমাকে বিদায় দিয়েছিল। সেই দৃশ্যই এখনও আমার মনে আছে। বাস্তবিকই সেই ছোট্ট গ্রামখানাতে যেন এখনও ফিরে গিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। হলোবার্ণ হতে রওয়ানা হয়ে ঘণ্টা পাঁচেক চলার পরই এল চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্ত। তোমাদের মাঝে অনেকেই ভুল করে চেকো-স্লোভাকিয়াকে যুগস্লাভিয়া বলে ফেল। আসলে যুগস্লাভিয়া বলে অন্য আর একটা দেশ আছে। যার ভ্রমণ কথা আমি পূর্বে লিখেছি।

সীমান্তে পৌছামাত্র অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত অফিসার চলে যেতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু চেক সরকারী অফিসারগণ আমার সাইকেলটা যেমন করে তল্লাস করতে লাগলেন যে তাতে মনে হল আমি যেন তাঁদের একজন দুষমন। অতি কষ্টে যেন আমাকে তাঁদের দেশে প্রবেশ করতে দিলেন।

কয়েক মাইল যাবার পরই সুন্দর পিচ ঢালা পথে এসে পড়লাম। সীমান্তের দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গেলাম। আমার সাইকেলখানা সন্ সন্ করে চলতে লাগল। কতক্ষণ যাবার পরই একটা গ্রাম পেলাম। গ্রামে শ্রী নাই। ঘরগুলি প্রায়ই কুৎসিত। পুরাতন টাইল খসে পড়ছে। পথগুলি প্রায়ই আমাদের দেশের পথের মত তেড়া। দু একটা খাবারের দোকানে গিয়ে দেখলাম সবাই বিয়ারই খাচ্ছে আর কোন খাবার নাই বললেও চলে। সেজন্যই সেই গ্রামটাতে না থেকে সাইকেল চালিয়ে নজ্‌মো নামক একটি শহরে আসি। নজ্‌মোর দুটি নাম। একটি অষ্ট্রিয়ান, অপরটি চেক্। চেক্ নামটি নতুন করে দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দা সবাই অষ্ট্রিয়ান। এখানে এসে আমি 'টলষ্টয় হোটেলে' উঠলাম। হোটেলটি এতদিন একটি সেনিটেরিয়াম ছিল। চেকদের শাসনে আসার পর এটা হোটেলে পরিণত হয়েছে। হোটেলের মালীক একজন সদাশয় লোক। তিনি হলেন জার্মান জু। জার্মান ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা তিনি জানেন না। অতি কষ্টে আমার আসার কারণ বুঝিয়ে বললাম এবং তিনি তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে একটি সুন্দর রুম দেখিয়ে দিলেন। সেই রুমখানা চমৎকার, এতই সুন্দর যে আমার রুমটা ছাড়তে ইচ্ছা হয়নি। অতি সুন্দর বিছানা, তাতে রয়েছে মুরগীর পাখার লেপ। ঠাণ্ডা কাছেই আসতে পারে না। মুরগীর পালকের লেপে যত গরম পাওয়া যায় আর কিছুতে তেমন গরম পাওয়া যায় না।

[ক্রমশঃ

কাহিনী

ছুটি

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

অন্ধকার—একেবারে বিদ্‌ঘুটে রকম অন্ধকার। চাঁদ দূরে থাক্ একটা তারাও মিটিমিটি জ্বলছে না। আকাশ ও জল এক হয়ে গেছে। দুহাত দূরের জিনিষও দেখা যাচ্ছে না। কে যেন নিষ্ঠুর হাতে পৃথিবীর গায় এক পোঁচ আলকাংরা লেপে দিয়েছে। এই অন্ধকার রাতে শ্রান্ত প্রকৃতিও বোধ হয় ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। দুরন্ত সমুদ্রও যেন কোন্ যাদুকরের মায়ার প্রভাবে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নাই তার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, নাই তার প্রাণের আবেশ। কে ব'লবে এই ঝিমিয়ে পড়া নিস্তরঙ্গ জলরাশী ক্ষেপে উঠে মানুষের মন কখন এসে জাগাতে পারে? নিশুতি রাতের এই অসীম নীরবতার মাঝে শান্তিভঙ্গ করে চলেছে দ্রুতগামী যাত্রিবাহী জাহাজখানি মূর্ত্তিমান অশান্তির মত। শোনা যাচ্ছে তার ইঞ্জিনের ঘস্‌ঘস্ আওয়াজ, চাকার ছপ্ ছপ্ শব্দ ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মত অবিশ্রান্ত একটানা। অন্ধকারের বুক চিরে সে ছুটেছে তার গন্তব্য পথ লক্ষ্য করে—যেন রূপকথায় রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে তেপান্তরের মাঠ দিয়ে অচিনপুরীর উদ্দেশ্যে তার রাজকন্যার খোঁজে।

জাহাজের ভেতরও লোকজনের সাড়াশব্দ বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ যাত্রীই নিজের নিজের ক্যাবিনে নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের যাত্রাপথ শেষ হয়ে এসেছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ বন্দরে ভিড়বে, আবার তারা কঠিন মাটির স্পর্শ পাবে। অন্তহীন একঘেয়ে নীল জল দেখে দেখে তারা হাঁপিয়ে উঠেছে—আবার তারা সবুজ গাছপালা ও রং বেরংএর বাড়ীঘর দেখতে পাবে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যেন তারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ঘিরে গেছে। তাদের ঘিরে কত আনন্দ কত উৎসব! ঘুমের মধ্যে তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত হাসির অপরিসীম তৃপ্তি। একজন ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে ব'লতে আরম্ভ ক'রল, "বন্ধুগণ, আপনারা যে সম্মান আজ আমাকে দেখালেন আমি তার অনুপযুক্ত। আমি···।" সে একজন উদীয়মান্ বক্তা, স্বপ্ন দেখছে তার দেশে প্রত্যাগমন উপলক্ষে তার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ডেক প্রায় জনশূন্য। দু চারজন খালাসী অশরীরি ছায়ামূর্ত্তির মত লঘু পদক্ষেপে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা কর্চ্ছে। ক্যাপ্টেন তাঁর ক্যাবিনে বিশ্রাম কর্চ্ছে। কিছুক্ষণ আগে পাইলট এসে জাহাজের ভার গ্রহণ করেছে। দৃঢ়হস্তে ষ্টিয়ারিং ধরে সে তাকে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে যাচ্ছে। আর খানিকটা পথ গেলেই সবার ছুটী—দীর্ঘ অবসর।···

—হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"আগুন, আগুন!" সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সাইরেন আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল—"হু-উ-উ—উ-উ-উ—উ-উ-উ—।"

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ একেবারে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক পায়চারী ক'রতে করতে নিজের মনেই ব'লতে লাগল, "তাইত! আগুন কেমন করে ধরল? যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে জাহাজ যে রক্ষা পাবে মনে হয় না!" তারপর ঘড়ি

দেখে আবার সে বিড়বিড় করে ব'ল্‌ল "এ যে ঘাটে এসে নৌকো ডুব্‌ল। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই ত জাহাজ জেটিতে লাগবার কথা।"

এদিকে পটপট্ ক্যাবিনের দরজাগুলো খুলে যাত্রীরা সব "কি হ'য়েছে? ব্যাপার কি?" ব'লতে বলতে বেরিয়ে পড়েছে। উত্তরের আর প্রয়োজন নাই। ততক্ষণে আগুন তার লেলিহান জিহ্বা মেলে জাহাজকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে চারদিক একেবারে দিনের মত আলো হয়ে গেছে। যাত্রীরা সব ক্যাপ্টেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে চলেছে, "ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, কোথা থেকে আগুন এল? কি হবে? অ্যাঁ? নেবান যাবে না? তবে কি জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে?—" এখানে ওখানে দুচারজন মহিলা মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ল। একজন বৃদ্ধা আকুলভাবে প্রার্থনা ক'রতে লাগ্‌ল, "প্রভু, তুমি দয়াময়—আমাদের রক্ষা কর।" শিশুরা ভয় পেয়ে তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ ক'রল। অনেকে পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি ক'রতে লাগল। কেউ কেউ লাইফ্ বেল্ট্ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ ক'রল। আবার কেউ কেউ "লাইফ বোট্, লাইফ বোট্" বলে চেঁচাতে লাগল।

ক্যাপ্টেন সবাইকে ইসারায় চুপ কর্ত্তে বলে পাইলটকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে ব'লল, "জন্—জন্ মেনার্ড! কোন আশা আছে কি?"

উপর থেকে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর এল, "কোন ভয় নেই, ক্যাপ্টেন, আমি ঠিক চালিয়ে নেব।"

এই আশ্বাসবাণী যেন মন্ত্রের মত কাজ ক'রল। নীচের জনতা মুহূর্ত্তে শান্ত হ'ল। মূর্চ্ছিতা নারীরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শিশুদের কান্না থেমে গেল। পুরুষেরা মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করতে আরম্ভ করল। আনন্দাতিশয্যে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। একজন প্রৌঢ়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব'লতে লাগ্‌ল, "জনি ইজ্ এ ডিয়ার—জনি ইজ্ এ ডার্লিং—বড় ভাল ছেলে—আহা, এমন আর হয় না—ও হাউ আই লাভ্ হিম্—গড্ ব্লেস্ হিম্—।"

হঠাৎ একজন যাত্রী চিৎকার করে বলে উঠ্‌ল—"ঐ যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই আমরা বন্দরে এসে পড়েছি। হুর্‌রে, আর ভয় নেই—চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌছে যাব। খুব বেঁচে গেছি বাবা।"

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল। "হাঁ, আলোইত বটে! বন্দরের আলোগুলি সার করে দাঁড়িয়ে আছে—কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঐ যে আবছা বাড়ীগুলোও দেখা যাচ্ছে—আরে ঐ ত গির্জ্জার চূড়োটা। ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন—"একজন ত ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরে নাচতে আরম্ভ ক'রল। একসঙ্গে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠ্‌ল। বৃদ্ধা নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল—চোখে তার আনন্দাশ্রু। মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে খেতে ব'ল্‌ল—"মাইডার্লিং—মাইডিয়ারেষ্ট্—।"—কতগুলো ছোকরা শিশ্ দিয়ে একটী জনপ্রিয় গানের কলি গাইতে লাগ্‌ল।

কিন্তু একি?—জাহাজ হঠাৎ এমন এলোমেলো চ'লতে সুরু করল কেন! তাইত! পাইলটের কি হোল? সে কি বেঁচে নেই? উত্তেজিত হয়ে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে ডাকল—"জন্—জন্—পাইলট, জন্ মেনার্ড—" কোন উত্তর নেই!

আগুন তখন ব্রিজের উপর জন মেনার্ডকে ঘিরে ফেলেছে। উত্তপ্ত হল্কা এসে তার মুখে চোখে লাগছে—রক্তিম শিখা তার মাথার ওপর ফণা ধরেছে—সমস্ত শরীর ঝলসে যাচ্ছে। ধোঁয়ায় দম আট্‌কে আস্‌ছে—উঃ

সে আর পারছে না—মাথা তার ঝিম্ ঝিম্ করছে—শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে—তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে অস্পষ্ট ছায়ার মত অনেক দূরের একখানি কুটীর—সেখানে তার স্ত্রী তার ছোট্ট ছেলেটীকে বুকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে—নাঃ মাথা সে আর ঠিক রাখতে পার্চ্ছে না—সব গুলিয়ে যাচ্ছে—ষ্টিয়ারিং থেকে তার হাত খসে পড়ছে—হুইলের উপর তার মাথা এলিয়ে প'ড়ল—

এমন সময় নীচে থেকে তার নাম ধরে ডাকে কে! অনেক কষ্টে সে মাথা তুলে নীচে ডেকের উপর তাকাল—ঐ যে ভীড়ের মধ্যে মায়েরা তাদের ছেলেদের বুকে আঁকড়ে ধরে আকুলভাবে ভগবানকে ডাকছে—অ্যাঁ তার ছেলে! তাইত, ওদের সবারই কোলে তারই ছেলেত! একি!—কি আশ্চর্য্য!—না, না তাকে পারতেই হবে—যেমন করেই হোক জাহাজ জেটিতে লাগাতেই হবে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে সে সোজা হয়ে ব'স্‌ল—দৃঢ়হস্তে আবার সে হুইল চেপে ধরল। দাঁতে দাঁত কামড়ে সে মাথা ঠিক রাখতে চেষ্টা ক'রল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে—গলা তার শুকিয়ে যাচ্ছে—চোখ তার ঠিক্‌রে পড়ছে—তবু তাকে পারতেই হবে।

অনেক কষ্টে দম নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন ভয় নাই—ভয় নাই—আমি পারব—আমি পারব।" নীচের জনতার কাছে এই অভয় বাণী বহুদূর থেকে ভেসে আসা আকাশ বাণীর মত মনে হল। আবার তাদের বুকে আশা ফিরে এল—মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। যাক্ বাঁচা গেল, পাইলট তবে ঠিক আছে।

জেটিতে পৌছাবার আগেই জাহাজ হঠাৎ ঝাঁকি মেরে থেমে গেল। জাহাজকে জলতে দেখে তীর থেকে বহু নৌকা এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। যাত্রীদের তখন উল্লাস দেখে কে? একে একে সবাই তারা নৌকাতে নেমে পড়ল। সবার শেষে নাম্‌ল নাবিকেরা।

খানিক দূরে যাবার পর বৃদ্ধা হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"সবাই নেবেছে—অ্যাঁ পাইলট কোথায়, পাইলট?"

তাইত! নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে সবাই তার কথা ভুলে গিয়েছিল—কারুর খেয়ালই হয় নি যে জন নামেনি।

ক্যাপ্টেন উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"এই নৌকো ঘুরোও, জন্ নাবেনি। তাকে আনতে হবে।"

এমন সময় ভয়ানক শব্দ করে বয়েলার বিস্ফোরণ হ'ল—জলন্ত জাহাজটী চুরমার হয়ে ডুবে গেল। জন্ মেনার্ড আর নাম্‌ল না। তার কাজ ফুরিয়েছে—চিরকালের মত তার ছুটি।

● সূর্য্যের দেহ থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে যে পরিমাণে তেজ বেরুচ্ছে তার ওজন প্রায় ৪০ লক্ষ মণ; এই হিসাবে সূর্য্যের আয়ুকাল ১৫ লক্ষ কোটি বছর। ●

পরম স্নেহের ছোট বন্ধুরা !

গতবারের কথামত এবারে প্রথমেই তোমাদের মতামতগুলি যা পেয়েছি তা জানিয়ে দিচ্ছি : কারণ প্রতিবারেই চিঠির উত্তর দেবার পর আর স্থানের সঙ্কুলান করতে পারি না। অথচ তোমাদের মতামতগুলি কত সুন্দর দেখো তো।—

"ছেটেদের যে সব কাগজে ছোটদের জন্য যে বিভাগ খোলা হয়েছে তাদের কথা আলাদা, ওতো শিশুদের নিজস্ব। কিন্তু বড়দের বইতে ছোটদের জন্য যে সমস্ত বিভাগ খোলা হয় তার বিষয় বলি। এটা খুবই সত্যি যে শিশুদের জন্য যত বেশী জ্ঞান বাড়াবার আয়োজন হয় ততই ভাল। এতে শিশুসাহিত্যের উন্নতি তো হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুরও অনুসন্ধিৎসু চিত্তের অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়, তাতে শিশুর জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে এরও সমাধান হওয়া উচিত, অনেক বইতে থাকে সিনেমা তারকাদের ছবি, বড়দের গল্প, তারই পাশে শিশুদের আসর। এতে এই ক্ষতি হয় যে শিশুরা নিজেদের কৌতুহল দমন করতে পারে না, এবং ছোটদের গল্পর থেকে বড়দের গল্প পড়বার ঝোঁক হয় বেশী। সে গল্প বুঝবার শক্তি তাদের হয়নি অথচ সে গল্প পড়ে তাদের তরুণ চিত্তে আঘাত লাগে, আর ফলও হয় বিপরীত। যে সাহিত্য শিশুমনকে উন্নত করতে পারলো না, তার সার্থকতা কোথায়? শিশুসাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে চাই শিশুমনের উন্নতি। এই সম্বন্ধে এই সমস্ত আসরের কর্তৃপক্ষদের সাবধান হওয়া উচিত। তাঁরা একদিক ভাল ভাবেই করেন কিন্তু সবদিকেই বিবেচনা করতে হবে!···যাতে শিশুসাহিত্যের উন্নতি হয়, তাদের জ্ঞানপিপাসু চিত্তের খোরাক জোগান হয়, শিশুসাহিত্য বলবান হয় সেইটাই হবে আমাদের আনন্দের কথা। বড়দের এদিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত।"—**অমিয়া চট্টোপাধ্যায়** (পুরুলিয়া)।

"···ছোটদের আসর খোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশুহৃদয়ে অনেক কৌতুহল জাগে, তা' নিবৃত্তি করতে অনেক সময় মা বাবারা পেরে উঠেন না বা অন্য উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দেন—এতে শিশুহৃদয় তৃপ্তি পায় না। এই তৃপ্তিসাধনের জন্য আজ যে মনিষীগণ সেইটী পরিকল্পনা করেছেন তা' আসর খোলার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আর তা ছাড়া, শিশুহৃদয়কে এই সমস্ত আসরের সাহায্যে যা শিক্ষা দেওয়া যায় তা স্কুলের পড়ার চেয়ে বেশী মনে থাকে। আমি নিজের স্কুলের পড়া কম করে পত্রিকাগুলো পড়তাম···তাই দেখা যায় পত্রিকা পেলেই ছেলে মেয়েরা লাফিয়ে ওঠে।···সুশীলকুমার মণ্ডলের সঙ্গে আমি একমত নই।···পরিচালকগণ এমন একটা নীতি অবলম্বন করবেন যাতে কেউ যেন এর প্রগতি প্রতিরোধ করতে না পারে।"—**বীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণ** (মানকাচার)।

"পৌষ সংখ্যায় 'ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি' নামে যে অংশটিতে মতামত আলোচনা করা হয়েছে তাতে আমি বলি, সে সত্যিই বড়দের পত্রিকার মধ্যে ছোটদের আসর থাকলেও আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ ছোটদের রচনার অনুপাত দেখতে গিয়ে পরিচালকরা অনেক সময় বড় বড় লেখা দিয়ে ছোটদের আসরের অনুপাতে সমান রাখতে পারেন না। আবার নয়তো এমন ছেলেমানুষের গল্প বা কবিতা পছন্দ করেন, সে আমাদের উপযোগীই হয় না। সব জায়গাতেই দেখি ছোটদের জন্য নানা আসর হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগই ষোল অথবা ১৫ বছর পর্য্যন্ত। অথচ তার ওপরের ছেলেমেয়ের জন্য কোন বিশেষ বিভাগই নেই। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে যদিও কিশোরদের প্রবেশাধিকার আছে; কিন্তু সেখানে দেখি অনেক বড়রাও প্রবেশ করেছেন।···" **ঝরণা দত্ত** (বালিগঞ্জ)

·····গ্রাহক-বন্ধু শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডলএর প্রস্তাবে শ্রীঅশোকচন্দ্র গুহ যে সমালোচনা করেছেন এতে আমিও একমত। যাঁরা এই আসরের পরিচালক তাঁরাই পারেন শিশুমনকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে, তাঁরাই শিশুমনের চাঞ্চল্যের পরিমাণ বুঝতে পারেন, তাই আজকাল শিশুদের আসর সবার আগে। তাদের মধ্যেই ভাবীকালের মহাপুরুষদের লুপ্ত প্রতিভা বিরাজমান।····· **রণজিৎ ও দুলাল বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম)

'ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি' উপস্থিত এই পর্য্যন্ত রইল। এখন এসো চিঠির ঝাঁপি খুলি :

নির্ম্মলকুমার রায় (১৮৭০) কলিকাতা, তোমার চিঠি ও কবিতাগুলি পেয়েছি কিন্তু দেরীতে পাওয়ার জন্য গত মাসে কিছু জানান সম্ভব হয়নি। তোমার লেখবার প্রচেষ্টা দেখে অত্যন্ত খুসী হলাম। আরো অনেক লেখো। যা লিখবে তা ছাপাতে হবে এমন ধারণা থাকলে লেখা ভাল করা যায় না ভাই। এই রকম লেখার অভ্যাস রাখলে ভবিষ্যতে তোমার লেখা ভাল হবে। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে একটু একটু পরিচয় আছে, কেননা তিনি রংমশালের একজন তো। কেন বলোতো? **নির্ম্মলেন্দু, নীলিমা রায়** (ত্রিপুরা), ভাই তোমাদের কবিতাগুলি সম্পাদক মশাই মনোনীত করেন নি। আরো লিখো এবং পাঠিও, আশাকরি প্রকাশ করতে পারা যাবে। লেখা যাদের প্রকাশ না হয় তাদের কিন্তু দুঃখ করা উচিত নয়, আরো ভাল লেখবার চেষ্টা করা উচিত—বুঝেছ? **আশেকোর রহমান খান** (ষোলঘর), ভাই তোমাদের চিঠি অনেকদিন পেয়েছি। রমু কোথায় আছে, তাকে রাগ করতে বারণ করো। তুমিও ভাই লক্ষী রাগ করো না। যাদের খবর জানতে চেয়েছ—তাদের খবর ভাল। **গোপাল** (৭৬৬) গৌহাটী, তোমার পরীক্ষা তো শেষ হয়ে এলো, ভালই হয়েছে আশাকরি। বেশ তো দেখা করো। **অজিত সেনগুপ্ত** (১৯৩১) উঠিয়া, তোমার চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম—যাক এরকম আর করো না কখনও। **গীতা** (১০১০) সরস্বতী পূজোর পর তোমার চিঠিটা পৌছেচে ভাই, সুতরাং কি করা যায় বলো? যাঁর কথা জানতে চেয়েছ তা ঠিক। **রেবা গাঙ্গুলী** (৪৭৮) লাকসার, ইন্দিরাদি'কে সেলাই শেখানোর জন্য দরবার বহুদিন থেকে করছি কিন্তু তাঁর আর সময়ই হচ্ছে না, অন্যায় কিন্তু। টুনুর নামটা তোমার নামের সঙ্গে যোগ করে গ্রাঃ নম্বর এক করে নিও।এক বাড়ীতে একই কাগজ দু'খানা যাওয়া যে সম্ভব নয় তা আমরা জানি বলেই এই নিয়ম করেছি। **মীরা** (১২৮৩) কোলকাতা, হঠাৎ দেখি রাজসাহীর স্থানে কোলকাতা। হাঁ ঠিকানাটা ঠিকই হয়েছে। চুলের জন্য ইন্দিরাদি'র সঙ্গে পাশের বাড়ীতে যেতে হবে। সত্যি ওঁর বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ। **অনাদিপ্রসাদ দাস** (২০৩২) কালনা। সরস্বতী পূজোর সময় যে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করেছ তাতে সত্যি কাজের মত কাজ হয়েছে। এতদিনের দুঃখ দারিদ্র্য এক নিমিষে একজনেরও দ্বারা কি দূর হয় ভাই। সম্মিলিত চেষ্টা থাকলে একদিন সফল হবেই। **বেলারাণী গাঙ্গুলী** (১৪০৬)। কৃতজ্ঞ থাকার কথাই আসে না। তোমাদের জানাবার কথা অভাব অভিযোগের কথার জন্য চিঠির বাক্স। তোমাদের পারিবারিক দুঃখ বিপদে আমিও আন্তরিক দুঃখিত। সে লেখা পাঠিয়েছিলে মনোনীত হলেই ছাপা হতো। ষ্টাম্প পাঠালে সাধনা ও রেণু বিশ্বাসের ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো। **সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৩৪৯) জামসেদপুর। তোমাদের নিজেদের পরিচালনায় 'সাহায্য সমিতি'র উন্নতি করবে। অল্প প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বিরাট রূপ নিয়ে দেখা দেবে। **তারাপদ স্থানপতি** (১৮৯১) যশোহর। হাতের লেখাটা সুন্দর। চারটী নামের মধ্যে।

শেষেরটা ভালো, সেইটা রাখতে পারো। কাকে তোমার ভাল লাগে জানালে নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো। **অসীমদেব গোস্বামী** (১৬৮২) কোলকাতা। এত লোক থাকতে দিদিভাই লিখবে ধারাবাহিক উপন্যাস? কখনও সে কলম ধরেনি? এমন ধারণাই বা হোল কেমন করে? যাহোক যাঁরা সত্যিই ভালো লেখেন—তাঁদের কথা এবং তোমার অনুরোধ পরিচালক মশাইদের কাছে পৌছে দেবো। **ঝরণা দত্ত** (বালিগঞ্জ)—তোমার গ্রাহক নম্বর তা ভাই আমরা দিতে পারবো না। তুমি একটা চিঠি পরিচালক মশাইকে লিখো তিনি জানাবেন। **রাধাশ্যাম পাল** (২০৩৬) মেদিনীপুর, **সত্যেন্দ্রনাথ কাঞ্জী** (১৮৭৪) পাটনা, **আশীষ দত্ত** (১৫৬৯) শ্রীহট্ট, **রথীন্দ্রনাথ মজুমদার** (১৫২৫) মুর্শিদাবাদ, **প্রীতিকনা কর** (১৯২৭) বিষ্ণুপুর, **বিভূতি চক্রবর্ত্তী** (?-২০৩৭), **অশোকচন্দ্র গুহ** (২০৪৩) বরিশাল, **ধীরেশ চৌধুরী** (১৯৫৮) চট্টগ্রাম, **মাখম বন্দ্যোপাধ্যায়** (রাজসাহী-?), **বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়** (২০৬১) বর্দ্ধমান, **প্রবোধ বসু** (১৭৭৪) মেদিনীপুর, **নীহার চক্রবর্ত্তী** (২০৩৩) রায়গঞ্জ, **নৃপেন দাস** (যশোহর-?), **সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ** (২০৪৯) খুলনা, **সাধন বসু** (১৫২৩) কলিকাতা।—তোমাদের চিঠি পেয়েছি, আগামী বারে তোমাদের জবাব আগে দেবো। তোমরা সকলে আমার আশীষ নিও। ইতি,

তোমাদের,

দিদিভাই

দুর্ভিক্ষের বাজারে হাসির আমদানী! শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও তরুণ রায়ের হাসির গল্পের বই—

'কারুক্ষে হাত দেখিও না'

অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপট, চমৎকার গেট্‌আপ, নিদারুণ হাসির গল্প, বইটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

এ মাসেই বাজারে পাবেন।

দাম মাত্র ॥৵০

আধুনিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক সম্পাদিত সচিত্র ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকা, আমরা বৈশাখ মাস হতে প্রকাশ করছি।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। আমাদের গল্প প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের বাড়ী চিঠিতে ফলাফল জানান হোয়েছে। যাঁরা এখনও চিঠি পাননি সত্বর আমাদের চিঠি দিন।

* **অজানা সাহিত্য পরিষদ** *

১০।১, এলগীন রোড, কলিকাতা।

চলতিকা

চীন ভারতের বন্ধুত্ব ঃ

চীন ও ভারতের বন্ধুত্ব শুধু আজকের নয়, অনেক অনেক দিনের। তোমরা সকলেই শুনে খুসী হবে যে চীনের বালক-বালিকারা চাঁদা তুলে ও তাদের হাতে তৈরী নানা শিল্প দ্রব্য বিক্রী করে কয়েক হাজার টাকা বাংলার দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এই সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে দল গঠন করেছে, বক্তৃতা দিয়েছে, চাঁদা তুলেছে ও কৃষক চাষাদের নিকট চীন ভারতের বন্ধুত্বের প্রচার করেছে। চুংকিং এর নিকটস্থ এক অনাথ মন্দিরের বালক-বালিকারা ১,১০০ ডলার চাঁদা তুলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। মাদাম চিয়াঙ কাইসেকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন চালান হয়েছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার ছেলে-মেয়েদের পক্ষ থেকে চীনা ছেলে-মেয়েদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলার ও চীনা ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব ও প্রীতি অক্ষয় হোক।

দিনের বেলায় ব্ল্যাক আউট ঃ

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পেরু প্রদেশের চিক্‌লায়ো নগর গত ২৪ জানুয়ারী সোমবার সকাল বেলা কয়েক মিনিটের জন্য রাত্রির কালো আঁধারে আবৃত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ সূর্য্যের আলো কয়েক মিনিটের জন্য পৃথিবীর ঐ অংশ থেকে বিদায় নিয়েছিল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছ আমরা পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণের কথাই বলছি। সমস্ত ব্যাপারটা সবশুদ্ধ প্রায় ৭০ মিনিট ছিল যদিও পূর্ণ গ্রহণ অর্থাৎ পুরোমাত্রায় ব্ল্যাক-আউট স্থায়ী ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। রাস্তায়, পার্কে, বাড়ীর ছাতে ছাতে হাজার হাজার লোক অবাক হয়ে সূর্য্য গ্রহণের এই দৃশ্য উপভোগ করেছিল। মেক্সিকো বিজ্ঞানিক অভিযানের নেতা মিঃ গাল্লো বলেছেন যে তাঁরা সূর্য্যের চারপাশে অগ্নি-শিখাময় এক অত্যুজ্জ্বল বলয় লক্ষ্য করেছেন। সকল বৈজ্ঞানিকই এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন তাঁরা অনেক ছবি ও মাপজোপ প্রভৃতি নিতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনার ফলে ভবিষ্যতে আমরা সূর্য্য সম্বন্ধে কিছু নতুন খবর শুনতে পাবো বলে আশা করছি।

১৫ বছর পরের ভারত ঃ

ভারতের অধিবাসীরা যাতে করে একটু ভাল ভাবে খেতে পরতে ও থাকতে পায় সেই উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে ভারতের আটজন স্বনাম ধন্য ব্যবসায়ী এক দীর্ঘ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব

করেছেন। ৫ বছর করে তিন ভাগে ১৫ বছর ধরে এই পরিকল্পনা চলবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হলে কি ফলাফল হবে তার আলোচনা করলে ব্যাপারটা তোমার কাছে হয়ত পরিষ্কার হতে পারে। প্রথমে বলে রাখি, এই পরিকল্পনাকে চালু করতে হলে সবশুদ্ধ ১০,০০০ কোটি টাকা লাগবে। ফলাফল হবে এই ঃ ১৫ বছর পরে লোক পিছু গড়ে আয় ডবল হবে, আয় মানে শুধু টাকা নয়, টাকা দিয়ে সুখ সুবিধা যা আমরা পাই তাও। যেমন, প্রতি বছর প্রতি লোক গড়ে ৩০ গজ কাপড় পাবে, থাকবার উপযুক্ত ঘর পাবে ৩০ স্কোয়ার ফিট, প্রত্যেকে চিকিৎসার সুবিধা পাবে, প্রাথমিক শিক্ষা পাবে, স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া পাবে। জাতীয় শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য কৃষি, কুটীর-শিল্প প্রভৃতি বিস্তার করলে ১৫ বছরে জাতীয় আয় আজকের তিনগুণ হবে। আজকের অবস্থায় আমাদের গড়ে, আয় খাওয়া দাওয়া থাকা এর কথা না বলাই মঙ্গল এবং আজকের তুলনায় উপরুক্ত ব্যাপার আমাদের কাছে স্বর্গ বল্লেও চলে। কিন্তু এই স্বর্গে পৌঁছতে হলে খরচ পড়বে ১০,০০০ কোটি টাকা। এই বিরাট মূলধন কেমন ভাবে সংগ্রহ হবে এবং পরাধীন দেশে কতদূর জাতীয়শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতির উন্নতি ও প্রসার সম্ভবপর হবে তাই ভাববার বিষয়। অনেকের ধারণা, দেশ স্বাধীন না হলে এ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হতে পারে না।

অলিম্পিক উৎসব ঃ

পাতিয়ালার নিখিল-ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে পাতিয়ালা (১২৯ পয়েন্ট), দ্বিতীয় বোম্বাই (৩৯ পয়েন্ট), তৃতীয় পাঞ্জাব (৩০ পয়েন্ট)। এই অলিম্পিকে পাতিয়ালার জয়জয়কার বলতেই হবে। অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধের হিড়িকে বেশীর ভাগ প্রদেশই তাদের মনের মত দল পাঠাতে পারেনি। যাই হোক, এই প্রতিযোগিতায় অনেক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। আমরা তার কয়েকটি দিলাম ঃ—

১০০ কিলোমিটার সাইকল্ রেস—৩ মিঃ ৪০ সেঃ (কর্ডার—বোম্বাই)
হাই-জাম্প—৬ ফিট ২½ ইঞ্চি (গুর্ণম সিং—পাতিয়ালা)
১০,০০০ মিটার সাইকল্ রেস (হিট)—৬ মিঃ ১০·২ সেঃ (আমিন—বোম্বাই)
৫০ কিলোমিটার হাঁটা—৫ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ৫·৮ সেঃ (ভাক্তাওয়ার সিং—পাতিয়ালা)
৩০০০ মিটার দৌড়—৮ মিঃ ৪৯·৫ সেঃ (চাঁদ সিং—পাতিয়ালা)
১৫০০ মিটার দৌড়—৪ মিঃ ৪·২ সেঃ (চাঁদ সিং—পাতিয়ালা)
হাতুড়ি ছোড়া—১৪৭ ফিট ১০ ইঃ (কিষেণ সিং পাতিয়ালা)

বক্সিং প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব এবং ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলা প্রথম হয়েছে। ৫০০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় বাংলা ১ম ও ২য় হয়েছে। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বাংলা আর কোন স্থান পায়নি।

রুদ্র-প্রকৃতি ঃ

সরস্বতী পূজা বাংলার ছেলেমেয়েদের একটি অতিপ্রিয় উৎসব। কিন্তু এবারের এ উৎসব বৃষ্টি ও ঝড়ে কোনরকমে যেন শেষ করতে হয়েছে। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ যেন বাংলা দেশকে অভিশপ্ত করেছে। হয়ত এর কোন একটা গূঢ় অর্থ আছে। হয়ত একটুমাত্রও আনন্দ উৎসব করবার সময় এ-নয়। বাখরগঞ্জ জেলায় ঐদিন ভয়ানক ঝড়ের দরুণ কচা নদীতে একটি বড় ষ্টীমার জলমগ্ন হয় এবং তার ফলে ৪২ জন যাত্রী মারা যায়।

স্বাধীনতা দিবস ঃ

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের নানাস্থানে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সভাসমিতিতে নানা বক্তৃতা ও সংকল্প করা হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা কল্পে আমরা দেশের কথা সদা চিন্তা করব, দেশসেবা করব ও মানুষ হব, এই সংকল্প আমাদের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। সেদিন রংমশাল কার্য্যালয়েও অনাড়ম্বরে একটি ছোট অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের একটি ছোট সভায় রংমশালের পরিচালক মহাশয়ের বক্তৃতার পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সভার উদ্বোধনে 'বন্দেমাতরম্' গানটি হয় এবং সভাশেষে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' এই গানটি করা হয়।

শব্দের চেয়েও দ্রুত ঃ

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে এক মার্কিন বৈমানিক নাকি ঘণ্টায় ৭৮০ মাইলের চেয়েও বেগে উপর থেকে একেবারে নাকে সোজা নীচে উড়ে এসে এক অদ্ভুত রেকর্ড করেছেন। শব্দের গতি ঘণ্টায় মাত্র ৭৮০ মাইল। এই মার্কিন বৈমানিক যিনি শব্দের চেয়েও আগে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, এঁর নাম এস্ হিউজ্।

* বিশেষ বিজ্ঞপ্তি *

আগামী বর্ষ হইতে রংমশালের বার্ষিক
সডাক চাঁদা ৩।০
ষাণ্মাসিক ২।০

দুর্মূল্যের বাজার এই সামান্য মাত্র চাঁদা বৃদ্ধিতে
আমাদের সহৃদয় সুকুমার গ্রাহক-গ্রাহিকারা
আশা করি কিছু মনে করিবেন না।

• নতুন খেলা •

(রঞ্জিতভাইর সৌজন্যে)

—"রূপোলী-মোহন চাঁদের গল্প যদি বলা যাক্ অম্নি হ'ল কেন, তবে শোনো বলি ঃ

নিখিল অবনীর সবুজাভ ঘাস-মাতার বুকে রবি-র আলো চিকমিক করে ; শরৎ-আকাশে নির্মেঘ নীল সমুদ্র। দূরে বঙ্কিম রেখায় পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোনো এক দেশে,—সুকুমার সূর্য্যের গোলাপী ঝর্না রায় জানায় ঃ বিবেক আনন্দময়! মানুষের চেষ্টার টান সত্ত্বেও ক্ষেত-চষার আদিম প্রবৃত্তি হার মেনেচে—এই পরাজয়ের গ্লানি কেদারনাথের মতো ভয়ংকর ও দুর্গম! তবু এহেন যাত্রা পথের মিল-তান চিরন্তন।

মনে পড়ে ঃ আজ হতে কদ্দিন আগে দুঃসাহসী নুট হামেসাই শেষটা কষ্ট পেয়ে মরলো। মৃত্যুর আগে তিনি স্বয়ং বলেচেন ঃ নুট সেই মোক্ষম ঘর-কে আপনার মত কোরে নিয়ে বহুদিন রোমে রইলেন। আর সে-কথাও ভোলবার নয়—সেই কালীদাসের গল্প, সেই চিত্তরঞ্জনময় মধু-চক্রের মৌমাছির গান! আমার বিশ্বাস নুট নিশ্চয়ই পারলে বাকী জেনে আসতেন!

তাই বলচি ঃ আজ রবির বাণী আমাদের কুসুমিত ঝোলা-কে বিদ্যুৎ-সাগরে ভাসিয়ে দিক্।"

এই আশ্চর্য্য চিঠিখানা আমার এক বন্ধু লিখেচে। এর মধ্যে পৃথিবীর **২৫ জন** শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মহাত্মানবদের নাম লুকিয়ে আছে। তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো, তারাই এই রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা কোরো। যার নির্ভুল হবে—তাকে একটি মজার পুরস্কার দেওয়া হবে। কেমন ?

এই নতুন খেলার নিয়মটা শোনো ঃ কথার ধ্বনির উপর জোর দিয়ে লুকানো-নাম বের কোরতে হবে। যেমন ঃ নুট হামেসা (Knut Hamson), কষ্ট পেয়ে মরলো (Christopher Marlow), শরৎ-আকাশে (শরৎচন্দ্র)।

—ঠিকানা ঃ দিদিভাই, "রংমশাল"।

রংমশালে আগামী বৎসর বৈশাখ থেকে শুরু হইবে—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

একটি রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর নূতন উপন্যাস

---

* গত মাসের আজব প্রশ্নের উত্তর *

(১) **মিথ্যে**—ঈগল পাখি শিশুদের ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে এরূপ ঘটনা এপর্য্যন্ত প্রমাণিত হইনি। (২) **সম্ভব**—যখন সামনের হাওয়ার জোর এরোপ্লেনের সর্ব্বাপেক্ষা গতির চেয়ে বেশী। (৩) **পারে**—ব্যাঙ তার চামড়ায় ভেতর দিয়ে জল শুষে নিতে পারে। (৪) **পারে**—জীবতত্ত্ববিদ্‌রা, বিশ্বাস করেন যে পিঁপড়েরা পায়ে পায়ে গন্ধের উদ্দেশে যেতে পারে। (৫) সাদা ঘোড়া গরম সহ্য করতে পারে বলে। (৬) জমাট অন্ধকারে কেউই পরিষ্কার দেখতে পায় না।

নির্ভুল উত্তর দিতে কেউ পারেন নাই।

---

* নূতন প্রশ্ন *

(বুঝিয়ে উত্তর দাও)

(১) সজারু তার গায়ের কাঁটা ছোড়ে—সত্যি না মিথ্যে ? (২) মাকড়ষার কামড়ে মানুষের কি মৃত্যু হতে পারে ? (৩) বাগানের শাকসব্‌জী চাঁদের দ্বারা কি প্রভাবিত হয় ? (৪) রেইল দ্বীপ (Island of Reil) কোথায় ? (৫) বক্তার কথা কে আগে শুকতে পায়—সভার পেছনের বেঞ্চে যারা বসে আছে তারা, না ৩০০০ মাইল দূরে রেডিওতে যারা শুনবে তারা ?

আগামী বছরের রংমশালের বিশেষ ধারাবাহিক আয়োজন ও আকর্ষণ ঃ—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের—নূতন উপন্যাস

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—ভূতপত্রীর পালা

পৃথিবীর মেঘলোক
নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
(ঠাকুরদাদার ঝুলি)

দক্ষিণারঞ্জনের

পৃথিবীর সবুজ সাথী
চিরতরুণ কথা
সবুজ লেখা
(শোভন চিত্রে)

—পৃথিবীর চিরসুন্দর বই—

ঠাকুরমার ঝুলি
বাংলার রূপকথা

ইহার পরাগনিন্দিত সুক্ষ্মতা ও মাতোয়ারা গন্ধে আপনারা ব্যবহার করিয়া সুখী হইবেন ! শুধু সামান্য একটু পাফে করিয়া লাগাইয়া দেখুন আপনার বর্ণে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে !

AVAILABLE IN NATURELLE, RACHEL, OCRE, MIDBLONDE ETC.
(1) FEARLESS QUALITY BOX
(2) POPULAR BOX

Havilland
FACE POWDER

ADVERTISER POST BOX 10803.
CALCUTTA MP 206

বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত ও নানাবিধ রঙে যথা ন্যাচারালে, র‍্যাচেল নং ১ ও ২ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।
প্রাপ্তিস্থান :—হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল লিমিটেড্‌, কলিকাতা

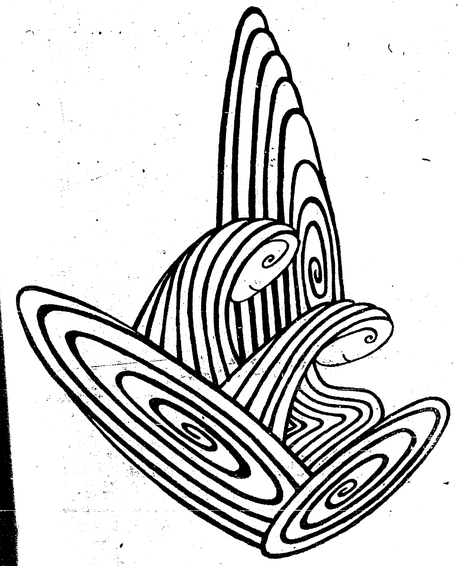

ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী
চোখে চোখে যাও।
এত চোখ ভরে দেবার
ঘুম কোথা পাও।

ছায়া ঢাকা কালো দীঘির
ঘুম টলমল
কাঁচা ঘুম সাঁঝের তারায়
কান্না ছলছল।

স্বপন মাখা ঘুম যেন
মেঘলা রাতে চাঁদ
সাত সাগর ছেঁচা ঘুম
অকূল অগাধ।

সব ঘুম জড় করে
তৈরী যাদুর তুলি
হাই তুলতে তর সয় না
ছুঁতেই পড়ি ঢুলি॥

লেখক : শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শিল্পী : শ্রীহরিভূষণ মৈত্র

রংমশালের কিশোর গ্রাহক শ্রীমান হরিভূষণের আঁকা ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী ছবিটি দেখে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতাটি রচনা করেছেন।

ছোটদের মন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ছোট ছেলেদের মন কোথায় হারায় ?
সে কি ওই আকাশের কোলে ?
হারায় কি ছায়াপথে—তারায় তারায় ?
নীহারিকাদের দেশে, তার কিনারায় ?
ফাঁকা আকাশের শেষে—গিয়ে ঠেকে যায়
দিগন্ত-চৌকাঠে ?
না কি পা বাড়ায়,
অন্ধকারের সেই শেষ ঠিকানায়—
সূর্য্য যেথায় মুখ খোলে ?

কোথায় যে যায়, কেবা জানে, ছেলেদের—
ছোট মেয়েদের মন !

তেপান্তরের দেশে রাজপুত্রের
যেথায় ভ্রমণ ?
ঘুমন্ত মেয়ে আছে আলো করে খাট—
জীয়ন-কাঠিতে মুখ তোলে ?
চাঁদের পরীরা যেথা বসিয়েছে হাট ?
তালপত্রের খাঁড়া দোলে ?
মনে মনে গেল বুঝি এরা ?

চল্ল আমার মন তাদের মনের
খোঁজে খোঁজে ঃ কোথা গেল ছোট্ট মেয়েরা ?

ওমা, এ কি, তারা দেখি লজেঞ্চুসের
দেশে গিয়ে হয়েছে হাজির !
চকোলেট্ আর আচারে জমিয়েছে ভিড় !
মনে মনে গেছে সেথা চলে' !···

কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছে পরীরা কখন্ !···
আকাশেরও ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা মন !···
আন্‌মনা হোলো কোথা ছেলেরা বাহির ?

যেম্‌নি পেয়েছে খোলা মনের কপাট,
ছেলেদের মন গেছে খেলবার মাঠে—
ফুট্‌বলে—কর্ণারে—গোলে ॥

মায়া-মুকুর

[একাঙ্ক নাটিকা]

রায়সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ

[একটী বালিকা—নাম দুরি—পড়িতে বসিয়াছে। তাহার পাঠ্যে এইরূপ লেখা আছে—

"ঘৃতকুমারীর মসৃণ পৃষ্ঠদেশস্থ ঘর্ম্মচর্চ্চিকাসমূহ কর্কশ প্রস্তর স্পর্শে সমুদ্গীর্ণ হওয়ায় প্রসেকী বিসর্পবৃন্দ প্রাদুর্ভূত হইল।"]

দুরি। দিদিমণি আজ যে পড়া দিয়েছেন, তা উচ্চারণই করতে পাচ্চি না, মুখস্থ করি কেমন করে ? [পাঠ আরম্ভ করিল] ঘৃ—ত কু—মারীর ম—সৃণ পৃষ্ঠ প্র—দেশস্থ ঘ—র্ম্ম—চ—র্চ্চিকা—[চক্ষু কপালে তুলিয়া ফালাইতে লাগিল] বাপ্—এ পড়তে আমার সাধ্যি নেই। "ঘৃ"— ফলা, "রি"—ফলা, "রেফ্"—এই আপদ তিনটে আমার জিবের ভেতর হুড়োমুড়ি লাগিয়ে দিচ্চে। এ আমার দ্বারা হবে না।

[তিরির প্রবেশ]

তিরি। তোর দ্বারা কী হবে না দুরি ?

দুরি। এই ক'টা লাইন পড়তে গিয়ে, ভাই হায়রান হয়ে গেছি।

তিরি। সে কি দুরি !

দুরি। এই ছাখ না। তুই যদি এক নিশ্বাসে এঁটে পড়তে পারিস, তবে, যা খেতে চাইবি, তাই খাওয়াব।

তিরি। কৈ দে—তবে পড়ি। দেখি হারি কি জিতি। [দুরি পাঠ দেখাইয়া দিল] ঘৃ—ঘৃ—ঘৃ—ঘৃত কু—কু—মারীর ম—ম—সৃ—সৃণ পৃ—পৃ—পৃ—ষ্ঠ প্র—প্র—প্র—প্র—দে—দে—শস্থ [সজোরে নিশ্বাস টানিতে লাগিল] ঘ—ঘ—ঘ—ঘ—ঘর্ম্ম চ—চ—চ—চ—

[নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল] না ভাই, আমার মুখ থেকে কিছুতেই বেরুবে না। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল]

দুরি। দেখি আর একবার মরি বাঁচি করে— ক—ক—ক—র্কশ প্র—প্র—স্তর স্প—স্প—র্শে স—স—স—মুদ—গী—গী—র্ণ [হাঁফাইতে লাগিল] কি হবে ভাই, নির্ঘাত যে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হবে ! বল্ ভাই, এ পড়া কি মুখস্থ হয় ?

[কালো কাপড়ে ঢাকা একখানি আর্শি লইয়া বিবির প্রবেশ]

বিবি। চুপ্ চুপ্ গোল করিস নি।

দুরি। হাতে কি ভাই ?

বিবি। সেই আর্শিখানা, আলমারি খুলে এনেছি। দাদা বাড়ী নেই।

তিরি। সেই আর্শিখানা ? যার কথা আমাদের বলেছিলি ? হাঁ ভাই সত্যি ?

বিবি। সত্যি। বলেছি ত', দাদাকে এ আর্শিখানি এক ভৈরবী মা দিয়েছিলেন। দাদা তখন গৌহাটীতে চাকরী করতেন। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে ভৈরবী মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। দাদা তাঁর সেবাশুশ্রূষা করে, তাঁকে আশ্রমে রেখে আসেন। সন্তুষ্ট হয়ে, ভৈরবী মা দাদাকে এই আর্শিখানি দেন।

তিরি। এ আর্শিতে যে নিজেকে দেখবে, সেই অপরের কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবে ? কেউ দেখতে পাবে না ?

বিবি। হাঁ। কিন্তু ভাই, কাউকে যেন বলিস্ নি। দাদা বলতে বারণ করেছেন। বল্, কাউকে বলবি নি।

তিরি। না, বলবো না।

বিবি। দুরি ?

দুরি। আমিও বলবো না।

বিবি। কেউ জানে না। আর্শি লুকিয়ে এনেছি, আজ পরখ করবো বলে।

তিরি। তোর দাদা এতে মুখ দেখেন নি ?

বিবি। হাঁ। দেখে একমাস অদৃশ্য হয়েছিলেন ; শেষে ভৈরবী মা মন্তর পড়ে যেমন ছিলেন তেমনি করেছিলেন।

দুরি। তুই দেখবি বলছিস্ কিন্তু অদৃশ্য হলে কে মন্তর পড়ে শুধরে দেবে ?

বিবি। কেন, ভৈরবী মা।

তিরি। বলিস কি বিবি ? কতদূরে—সেই কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে কে ভৈরবী মাকে খবর দেবে ?

বিবি। আর্শির উল্টো পিঠে একটী জবাফুল রেখে, তিনবার ফুঁ দিলেই ভৈরবী মা এসে হাজির হবেন।

দুরি। তাহলে ভাবনা নেই বটে।

বিবি। আমার ভয়, ভাই, যদি ভুলে যাই।

তিরি। এই সামান্য কথা ভুলে যাব ?

বিবি। দাদা বলেছেন, সব কথা মনে থাকে, কিন্তু অদৃশ্য হলে ঐ কথাগুলো মনে থাকে না। বলেছি না, এক মাস দাদা অদৃশ্য হয়েছিলেন।

দুরি। আমাদের তিনজনের মধ্যে কারও মনে পড়বে না ?

বিবি। কি জানি ভাই, ভয় খুব ; কিন্তু আর্শি না দেখেও থাকতে পারছি না।

দুরি। এক মতলব মাথায় এসেছে। একখানা কাগজে মস্ত বড় জবাফুল এঁকে, দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখ। আর একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে তিনবার "ফ"এ চন্দ্রবিন্দু "ঊ" লিখে ঐ জবাফুলের পাশে রেখে দাও। এই দুখানা ছবি যে কেউ দেখলেই, মনে পড়ে যাবে।

[বিবি উৎসাহে দুরিকে জড়াইয়া ধরিল]

বিবি। বাঃ—তোর কি বুদ্ধি ভাই, এখনি এঁকে আর লিখে ফেলি আয়। দেখ্ হঠাৎ কেউ যেন এসে না পড়ে। দাদা পশ্চিমে গেছেন, তাই রক্ষে। খিলটা দিয়ে আয়।

[তিরি দুয়ারে খিল লাগাইল। পরে তিন বন্ধুতে মিলিয়া জবাফুল ও তিন ফুঁ'র ছবি আঁকিয়া ফেলিল]

বিবি। এই পেরেকে আর্শি—[আর্শি ঝুলাইল]

এই পেরেকে জবাফুল ছবি—[জবাফুলের ছবি ঝুলাইল]

এই পেরেতে তিন ফুঁ রইল—[তিন ফুঁ'র কাগজ ঝুলাইল]

এইবার আর্শিতে তিনজনেই একসঙ্গে মুখ দেখব। তিনজনেই একসঙ্গে আর্শির দিকে তাকাই। এক—দুই—তিন—

[আর্শির আবরণ খুলিয়া তিনজনেই আর্শি দেখিল। ক্ষণপরে...

* * *

দুরি। ভাই বিবি কোথায় তুই ?

বিবি। তুই কোথায় ? তোকেও দেখতে পাচ্চি না !

তিরি। আমাকে দেখা যাচ্ছে ?

বিবি ও দুরি। কৈ না।

তিরি। আমিও তোদের কাউকে দেখতে পাচ্চি না। ভাই আমার বড় ভয় পাচ্চে—কান্না আসছে।

বিবি। চুপ—আর্শিখানা ঢেকে দি ; খোলা রাখা হবে না।

[বিবি আর্শি ঢাকিয়া দিল]

দুরি। এখন কি করবি ? ঘরে থাকবি, না বাইরে যাবি।

বিবি। বাইরে যাব।

দুরি। সেই ভাল। লোকে ভয় পায় কিনা, একবার পরখ করা হবে।

তিরি। শেষকালে মার খেয়ে মরবো নাত' ?

দুরি। তবে এলি কেন হতভাগি !

বিবি। ঘরের দুয়ার খুলে দি।

[দুয়ার খুলিয়া যেমন বাহির হইল অমনি নেপথ্যে, অতি সন্নিকটে, গানের শব্দ পাইয়া, তিনজনে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। চৌকা, পাঞ্জা ও ছক্কা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

[গীত]

সাঁঝ সকাল বেলি
তিন সখি মিলি
আয়, আয়, বলি
বেড়াই ঘুরি—
কাঁহা প্রাণ সখি
বিবি, দুরি, তিরি,
দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দাও।
এনেছি গন্ধ
এনেছি ছন্দ
হিয়ার আনন্দ লহরী ;
এস, এস, এস,
হাসিরাশি লয়ে
কেন মিছে সরে যাও, কেন বা লুকাও।

[ঘরে তিন কোণ হইতে বিবি, দুরি, তিরি একসঙ্গে শব্দ করিয়া করতালি দিল এবং তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল]

চৌকা। কোথায় ? এখানে ত' কেউ নেই ?

পাঞ্জা। মনে হল কারা ছুটে চলে গেল।

ছক্কা। আশ্চর্য্য ভাই, এই ছিল কোথায় লুকাল ? ওঃ—আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি ? রোসো ত'—ধরছি তোমাদের। চৌকা, পাঞ্জা, এইবার—আমি থাকি এই দিকে ; পাঞ্জা, তুই যা ঐ দিকে ; চৌকা তুই থাক দালানের দুয়ারে ; দেখি তিন সখি যান্ কোথায়।

[বিবি, দুরি ও তিরি গান ধরিল। গানের সহিত করতালি]

[গীত]

আছি বল্‌লে মিছে কথা
নেই বললে তাই—
বলতে পারিস আমরা কোথা—
তবে চালাক ভাই।
কাছের মানুষ পাসনে দেখতে
কেমন সবার চোখ ?
কিসে কাটবে সর্ব্বনেশে
এমন নেশার ঝোঁক।

[গীতান্তে নবাগতা তিন সখির পৃষ্ঠে কীল ও চড় পড়িল ; তাহারা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ভয়ে "ওগো বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিবি, দুরি, ও তিরি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এই দৃশ্যে পরপর পট পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দৃশ্যগুলি যথাক্রমে লিখিত হইল—

১। বই শ্লেট লইয়া বালিকারা পথে যাইতেছে—কে যেন সেগুলি কাড়িয়া লইয়া, অন্য স্থানে রাখিয়া পলাইয়া গেল।

২। একটী বালিকা চুল বাঁধিবার উপক্রম করিতেছিল—সহসা আর্শিখানি শূন্যে উড়িল। পরে তাহার চুল ধরিয়া কে টানিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

৩। খাবারের দোকানে জুতা এবং জুতার দোকানে খাবার অদল-বদল হইয়াছে দেখিয়া দুই দোকানদারে ঝগড়া বাঁধিয়া গেল]

বিবি। ও ভাই দুরি পালাই চল্।

দুরি। ঠিক বলেচিস্—আর নয়—শেষে মার খেতে হবে।

তিরি। ওই শোন গোলমাল—একদল মেয়ে চীৎকার করতে করতে আসছে।

[বিবি, দুরি ও তিরির প্রস্থান। চৌকা, পাঞ্জা ও ছক্কার দ্রুত প্রবেশ, সঙ্গে আরও সাতটী বালিকা]

চৌকা। কিসের গোলমাল ভাই ?

১ম বালিকা। দিন দুপুরে ভূত ! আমার বই শ্লেট কেড়ে নিয়ে কে যে পালিয়ে গেল—কিছুই

বুঝতে পারলুম না। শুধু দেখলুম বই শ্লেট শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। ও মা! শেষে দেখি না রাস্তায় পড়ে রয়েছে।

ছক্কা। বুঝলি, পাঞ্জা, এ কাজ আর কারুর নয় আমাদের সেই—

২য় বালিকা। কে? কে? বলত'—আমি একবার দেখে নেব তাদের!

পাঞ্জা। কি জানি ভাই—ঠিক ত' জানিনা; আমরা খুঁজছি তাদের, আমাদেরও দাগা দিয়েছ কিনা। ভূত কেন হবে, দিনের বেলায় ভূত ত' কখন শুনি নি।

৩য় বালিকা। তোমরা ত' খুঁজচ—চল না তোমাদের সঙ্গে যাই।

পাঞ্জা। এস। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য—ফুলবাগান

[বিবি, দুরি, তিরি, একটী ফুলবাগানে প্রবেশ করিয়া, সাজি হাতে ফুল তুলিতেছে। বাহিরের লোক কেবল মাত্র সাজি দেখিতে পাইতেছে]

[গীত]

চাঁপা, চামেলি, বেলা
আলো সনে করে খেলা
দেখবি যদি, আয় ছুটে
ত্বরা করে আয়—
যূথিকা ফুলের রাণী
ভরে দেছে সাজি খানি
বকুল আকুল হয়ে
মালা গেঁথেছে;
মল্লিকা, মালতী হাসি
ফুটে আছে রাশি রাশি
গোলাপের গরব বড়
আদর পেয়েছে।
কত আর দেরী করি
চল ভাই ঘরে ফিরি
এ-খেলা লাগে না ভাল
লোকে ভয় পায়।

[বালিকাগণ বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিল—ঐ যে, ঐ যে, সাজি দেখা যাচ্ছে; লোক নেই—ধর, ধর, ধর!]

[হাসিতে হাসিতে বিবি, দুরি, তিরির পলায়ন। সাজি লক্ষ্য করিয়া বালিকাগণ পিছু পিছু ছুটিল]

চতুর্থ দৃশ্য—কক্ষ

[বিবি, দুরি ও তিরির প্রবেশ]

বিবি। দুরি, মন্তর মনে আছে? আমার ত' কিছুই মনে নেই।

দুরি। আমারও মনে পড়ছে না।

বিবি। তিরি, তুই ভাই চেষ্টা করে দেখ।

তিরি। আমার কিছুতেই মনে আসছে না।

বিবি আর্শিখানা কই?

দুরি। নেই ত'।

বিবি। কেউ নিয়ে গেল নাকি?

দুরি। মা তুলে রাখেন নি ত'?

বিবি। মা—মা—মা—

নেপথ্যে। বিবি ডাকচিস্? কেন?

বিবি। মা, আর্শিখানা তুলে রেখে দিয়েছ?

নেপথ্যে। সেখানা যে তোর দাদার। ও আর্শিখানা নিয়েছিলি কেন?

বিবি। মা, আর কিছু তুলে রেখে দিয়েছ?

[নেপথ্যে কোলাহল; পরে বালিকাগণের প্রবেশ]

নেপথ্যে মা। এই ঘর থেকে বিবি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল; আমি কিন্তু তাকে ঘরে ঢুকতে দেখি নি।

চৌকা। সাজি ছিল হাতে?

নেপথ্যে মা। ঐ যে—ঐ কোণে—মেঝেতে পড়ে রয়েছে; সাজি তিনটেতে ফুল।

পাঞ্জা। এই ঘরে বিবি, দুরি, তিরি রয়েছে—কিন্তু দেখা যাচ্চে না কেন?

নেপথ্যে মা। ওমা! সে কি কথা?

বিবি। হাঁ মা সত্যি কথা। তোমরা কেউ আমাদের দেখতে পাচ্চ না—পাবেও না।

[মা, এই কথা শুনিয়া "ওগো বাবাগো—কি হলো গো"—বলিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন]

ছক্কা। তুমি চুপ কর মা—আমরা দেখছি।

[মা, নেপথ্যে চাপা গলায় কাঁদিতে লাগিলেন]

চৌকা। আমি দোরে খিল দিয়ে, খিলের ওপর মাথা রেখে দাঁড়াই।

পাঞ্জা। আমরা হাত ধরাধরি করে গান গাই। দেখি, পারি কি হারি।

[গীত]

কোন্ কোণে তিন জনে
আছ তোমরা জানিনা;—
কিসের তরে লুকোচুরি,
সে কথাও বুঝি না।
লুকিয়ে রেখে আপন কায়া
ছড়িয়ে দিলে একি মায়া—
আর কেন ভাই, দাওনা ধরা
পালাতে ত' পারবে না।

[হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গীত]

[ঘুরিতে ঘুরিতে একটী বালিকা—নাম—ছবি—সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধরেছি—ধরেছি—ধরেছি—ঐ যাঃ—পালিয়ে গেল"—]

চৌকা। কাকে ধরেছিস্ ছবি?

বিবি, দুরি, তিরি। মা, মা, ছবি নিয়ে এস—এক্ষুনি আমাদের দেখতে পাবে। শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—

[পুনরায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটী বালিকা, নাম জবা, বলিয়া উঠিল, ধরেছি—ধরেছি এদিকে, এদিকে ঐ যাঃ পালিয়ে গেল]

পাঞ্জা। কে পালাল, ভাই জবা?

বিবি, দুরি, তিরি। মা—মা—শিগ্‌গির জবা ফুল আন—

[পুনরায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটী বালিকা বলিয়া উঠিল, "ও বাবাগো চোখে আঙুল দিয়ে পালিয়ে গেল উঃ গেলুম"]

ছক্কা। চল্—চল্—চল্—চোখে তিন ফুঁ দিয়ে সারিয়ে দিচ্চি।

বিবি, দুরি, তিরি। মা—মা—মন্তর পেয়েছি—শিগ্‌গির আর্শি আর জবা ফুল—

নেপথ্যে মা। এই নে, জবা ফুল আর এই নে আর্শি।

[তৎক্ষণাৎ বিবি মার হাত হইতে আর্শি ও জবা ফুল লইয়া আসিল]

[নেপথ্যে মা ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ও বাবা গো, একি হলো গো, কে আমার হাত থেকে ফুল আর আর্শি কেড়ে নিলে গো"]

বিবি। মা, মা, চুপ করো। আমি বিবি। আমি নিয়ে এলুম।

নেপথ্যে মা। ওমা, কি হবে মা—আমি যে তোকে দেখতে পাচ্ছি না। [ক্রন্দন]

বিবি। এক্ষুনি দেখতে পাবে; কেউ নড়ো না—চুপ্—চুপ্

[আর্শির পৃষ্ঠে জবাফুল রাখিয়া তিনটী ফুঁ দিবামাত্র শ্বেতবস্ত্রাবৃতা ভৈরবী আবির্ভূতা হইলেন]

ভৈরবী। [প্রথম মন্ত্র]
ঘরে বাইরে যে কেউ আছ
ঘুমিয়ে পড় সবে।
ভৈরবী সিদ্ধমন্ত্র
উচ্চারিবে এবে।

[তিনবার ফুঁ দিবামাত্র সকলে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল]

[দ্বিতীয় মন্ত্র]
রক্তজবা, মনলোভা,
যাঁর চরণে শোভে,
তাঁর নামে অচেতন,
হয়ে যাক্ সবে।

[চারিদিকে কৃষ্ণতিল ছড়াইলেন]

[তৃতীয় মন্ত্র]

ছোট খাট্ তিনটী মেয়ে,
বরাত তাদের কু—
আশির পিঠে জবা রেখে,
দিতে না'রল ফুঁ ।
শক্তির আধার,
জননী আমার,
করেন যদি দয়া,
নিমেষেতে টুটে যা'বে
অদৃশ্যের মায়া ।

[ভৈরবী জবাফুল উঠাইয়া মাথায় দিলেন ; চতুর্দ্দিকে চাহিলেন এবং ফুঁ পাড়িয়া করতালি দিলেন—পরে অদৃশ্য হইলেন । বালিকারা জাগরিত হইয়া, চক্ষুর উপর হাত বুলাইতে লাগিল]

বিবি । মা, মা এবার দেখতে পাচ্চ—
সকলে । হাঁ—হাঁ—ঐ তো—

[পটক্ষেপন]

[গীত]

[বিবি, দুরি ও তিরি ব্যতীত সকলে]

স্বপ্ন না সত্যি এটা
মায়া মুকুর খেলা,
কি হলো ভাই আগাগোড়া,
সারা দুপুর বেলা ।

বিবি, দুরি, তিরি । সত্যির সঙ্গে স্বপ্ন মেশা
স্বপ্নের সঙ্গে সত্যি
কায়ার সঙ্গে ছায়া যেমন
রক্তের সঙ্গে পিত্তি ।

সকলে মিলিত কণ্ঠে । কিসের লজ্জা
কিসের দুঃখ
কিসের অভিমান
ধর ভাই হাত ধর
চলুক শুধু গান ।

[হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গান চলিল]

* এই নাটিকাটি বিষ্ণুপুরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শিবদাস বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক প্রথম অভিনীত ।

কবিতা

খুকুর কৈফিয়ৎ

শ্রীতড়িতকুমার ঘোষ

মাগো !

ইস্কুলে যে বলিস্ যেতে
কেমন কোরে যাই ?

বাবা যদি থাক্‌তো ঘরে
যেতাম না হয় যা হোক কোরে,
সারাটি দিন একলা র'বি
ভাব্‌না কি মোর নাই ?
ইস্কুলে মা
কেমন কোরে যাই !!

পিট্‌পিটে ওই পিঁপ্‌ড়ে গুলো,
তেলেপোকার ছানা—
দেখিস্ নি কী তেড়ে আসে,
শোনেনা মোর মানা !—
কাম্‌ড়ে যদি দেয় মা তোরে
"জল" দেবে কে অসুধ্ কোরে
বোতল্ ভ'রে ?—

খুকু ছাড়া বোলবে কে মা
কাঁদিসনিরে !—না !—না !!

রোদ যদি তোর পড়ে মুখে
কাঁদায় তোরে ঘরে ঢুকে,
দুপুর বেলা কে মা তোরে
হাওয়া দেবে জোরে জোরে
আদর কোরে ?—

'চুপ' করিয়ে চুম্ খেয়ে বল্
বোল্‌বে কে ভয় নাই ?.....
কোথাও যাবার জো আছে মোর ?
—কেমন কোরে যাই !!—

দেখ্‌দিকি তুই মনে কোরে,
সেই যে—সেদিন পিছ্‌লে পড়ে'
আছাড় খেলাম জলের ধারে
—পুকুর পারে,—

—বুকের 'পরে—
ছুটে গিয়ে তুল্‌লি মা তুই
তুল্‌লি ধ'রে ?—
বুকের পরে !
বিপদ থেকে বাঁচ্‌লো খুকু,
তোর সে "খুকু" তাই !
সেই কথা তোর একটুখানী—
এটুক্ মনে নাই ?

তুই যদি গো অম্‌নি কোরে
কল্‌সী নিয়ে যাস্‌মা পড়ে'—
উঠিস্ কেঁদে—"খু—ক্—উঃ"—বলে'
চোকের জলে,—

—খুঁজিস্ মোরে
শুন্যচোকে খুঁজিস্ কেবল
খুঁজিস্ পড়ে' !
খুঁজিস্ মোরে ?—
কেই বা তখন তুল্‌বে তোকে
যখন খুকু নাই ?—
ইস্কুলে মা
কেমন কোরে যাই !!

কালিদাসের বিদ্যালাভ

শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত

নাম ? হাঁ একটা ছিল বই কি ! বেশ জমকালো রকমের নাম—যেমন বসন্তসমীর বা অনঙ্গমঞ্জরী অথবা শরদেন্দু নিভাননা এই রকম গোছের একটা কিছু।

মহাপরাক্রান্ত কুন্তল রাজার ঝিয়ারি তিনি। কিন্তু সাজসজ্জা বিলাস বিভ্রমের দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। কেবল পুঁথি পত্র লেখনী মস্যাধার নিয়েই তাঁর খেলা ধূলো ; সর্ব্বক্ষণ বিদ্যাচর্চ্চা করার ফলে সাবেক নাম গেল চাপা পড়ে—নাম রটল—বিদ্যা।

বিদুষী বটে। বিশ্বের যাবতীয় শাস্ত্র সবই কণ্ঠস্থ। রাজার একটি মাত্র মেয়ে—রূপের খ্যাতি জগৎ জোড়া, কাজেই দেশ বিদেশ থেকে বহু রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সদাগরপুত্র পাত্রের পুত্রের আমদানী হল। পেল না কিন্তু কেউ। বিদ্যাবতী রাজকন্যা তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা জুড়ে দিলেন, পণ করলেন, যে তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে তারই গলায় মালা দেবেন।

এল অবিশ্যি অনেকেই কিন্তু হারাতে কেউ পারল না, হেরেই ফিরে গেল।

অনেক দিন ধরে অনেক অপমান সয়ে অনেকগুলি কুমার উঠল বিদ্রোহী হয়ে ; বিবাহ ক্ষেত্রে ছিল প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু প্রত্যাখ্যানের এক তারে বাঁধা পড়ে একতাবদ্ধ হয়ে উঠল সবাই। এক তানে যে সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠল সেটি দাম্ভিকা রাজকুমারীকে জব্দ করে প্রতিশোধ নেওয়া !

গৃহহীন সম্পদহীন নির্ব্বোধ মূর্খ কালিদাসকে তারা অনেক খুঁজেই আবিষ্কার করল এবং বহু ছলনা চাতুরি করে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহটি ঘটিয়ে দিল।

মূর্খ হলেও কালিদাসের রূপ ছিল অনন্য সাধারণ ; সেই অনবদ্য রূপশ্রী দর্শনে রাজা ও কুমারী বিদ্যা দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই জন্যই হয়ত কাজটা সহজ হল। বিবাহান্তে নব দম্পতি বাসরে প্রবেশ করলেন। রাজকন্যা বিদ্যা বহুক্ষণ প্রতিক্ষা করে রইলেন—কালিদাস মধুর আলাপ করবেন সেই প্রত্যাশায়—কালিদাস কিন্তু রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য্য দেখে এমনই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, যে তাঁর আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না।

তার ভ্যাবাচাকা ভাবকে গুনীর ভাব সমাধি ভ্রম করে কন্যা সসম্ভ্রমে সম্বোধন করলেন, "প্রভু, চলুন আমার মহলে—" হতবুদ্ধি কালিদাস মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু পিছু চললেন।

দুজনে ছাদে এসে দাঁড়ালেন—নির্মেঘ নীলাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—কৌমুদী স্নাতা সুসজ্জিতা রাজকন্যাকে যেন দেবকন্যা বলে ভ্রম হচ্ছিল।

কালিদাস থমকে দাঁড়ালেন। একবার চাইলেন চাঁদের পানে, একবার নব বিবাহিতা স্ত্রীর পানে—বোধ হয় চাঁদের মতই মনে হচ্ছিল মুখখানি—কিন্তু প্রকাশ করে বলবার মত ভাষাত নেইই, হয়ত তুলনা করবার মত বুদ্ধিও নেই। রাজকন্যা আর একবার প্রত্যাশিতা হলেন এখুনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য মধুর আলাপনে তাঁর কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত হবে বুঝি—নাঃ বৃথা আশা ! স্বামীকে বাক্যবিমুখ দেখে আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে ঘরেই চললেন।

প্রথমেই গ্রন্থ, নানা রকম কাব্য অলঙ্কার দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তকে ঘরটি পূর্ণ—মহামূর্খ কালিদাসকে এই ঘরটি কিছুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারল না। স্খলিত পদে এই ঘর তিনি অতিক্রম করে চললেন, বিস্ময়াপন্না রাজকন্যা ধীরে ধীরে তাঁর অনুগমন করলেন। পরেই বাদ্যগৃহ—কত রকমের যন্ত্রাদি সুশৃঙ্খলায় সুসজ্জিত সেগুলিও কালিদাসকে চঞ্চল করল না, তাঁর ভাবলেশহীন মুখের একটি পেশীও কম্পিত হতে না দেখে বিদ্যা আশ্চর্য্য হলেন।

এ-কী ধরণের গুনী! এ যে কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেয় না। হতাশ হয়ে শেষে চিত্রগৃহে প্রবেশ করলেন, সেখানে কত না মহারথী বীরগণের প্রতিকৃতি, কত যুদ্ধের ছবি, কত হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্য অভিনয় নিপুণ চিত্রকরের তুলিকা চালনায় বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই সমস্ত পৌরষের জলন্ত নিদর্শন দেখে আজন্ম গ্রামে প্রতিপালিত যুবকটির চোখে ভীতির ভাব ফুটে ওঠে। বেচারী ভয়ে ভয়ে সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সমুখেই প্রাচীর জুড়ে সীতাদেবীর জন্ম চিত্র। মিথিলাপতি জনক রাজা প্রকাণ্ড দুটি বৃষকে যোজনা করে হল্ চালনা করছেন, কর্ষিতা ভূমিতে সদ্যোজাতা জানকী। এই চিত্রটি দর্শনে কালিদাসের আনন্দের সীমা নাই, স্থান কাল ভুলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আহা কি সুন্দর বলদ দুটি!" পরক্ষণেই যশোদা দেবীর গো দোহন আলেখ্যটির প্রতি তীব্র বিস্ময়ে বাক্‌শুন্যা বিদ্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বলে উঠলেন—"দেখ দেখ কি সুন্দর গাই……অমন একটি আমি পাই……তা সের পাঁচেক হয় নিশ্চয়…" স্তম্ভিতা রাজকন্যা বল্লেন, "তুমি গাই দুইতে পার?"

এবার আর উত্তর দিতে কালিদাসের একটুও দেরী হয় না। বড় মনের মত ব্যাপারটা হয়েছে কিনা—এক গাল হেসে বল্লেন—"তা আর পারি না! ঐ করেইত এত বড় হয়েছি আমি।"

বুদ্ধিমতী বিদুষী বিদ্যা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝলেন রাজন্যবর্গ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে প্রতিশোধ নিতে এই কাণ্ডটি করেছেন। মাথার ভেতর তাঁর আগুণ জলে উঠল।

যত দিন বাঁচতে হবে ততদিন এই মূর্খটাকে নিয়ে হাড়ে নাড়ে জলতে হবে, তার চেয়ে এখুনি শেষ করি। বাতায়নের কাছে সরে গিয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে বল্লেন,—"শোনো।" হাসি মুখে কালিদাস কাছে গেলেন—"কি?" রাজকন্যা বল্লেন—"নীচে দেখ কি ওটা?"

কালিদাস দেখবার চেষ্টা করতেই বিদ্যা তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দিলেন।

এখন দৈবক্রমে নীচেই উদ্যানের প্রান্ত সীমায় ছিল মহামায়ার মন্দির—তারই চত্বরে এসে কালিদাস হুমড়ী খেয়ে পড়লেন আর পতনের ফলে তাঁর জিহ্বাটি দাঁত দিয়ে কেটে গিয়ে জগন্মাতার পাদপদ্মে ছিটকে পড়ল। মহামায়া ভারী খুসী—কে এমন ভক্ত আমার, যে নিজের জিভ্ কেটে আমার চরণে অঞ্জলী দেয়, এর কামনা ত পূর্ণ করতে হয়।

তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হয়ে দেবী বল্লেন—"বৎস, প্রসন্নাহস্মি, যথাভিলষিতং বরং গৃহাণ—" মাকালী দেবী-মনিষ্যি—তিনি দেব ভাষাতে বললেন অর্থাৎ সংস্কৃতে—মুখ্যু কালিদাস তা বুঝবেন কেমন করে, মনে করলেন কে তাঁর এমন দশা করলে তাই বুঝি দেবী জানতে চাইছেন—সকাতরে বল্লেন—'বিদ্যা।' সুপ্রসন্না দেবী বল্লেন—'তথাস্তু'!

কালিদাসের বিদ্যালাভ হ'ল।

মুদ্রা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

(সংগ্রহ)

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

টাকা পয়সা বিনিময়ের হার হিসাবে স্থিরীকৃত ধাতুখণ্ড মাত্র—এ আমরা জানি। কিন্তু তার উপর নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করে দেবার যে একটা রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে তার বিষয়ে আমরা কতটুকুই বা জানি! এরই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আজ বলবো।

ভারতবর্ষে, গ্রীসে, চীনে এই তিনটি দেশেই প্রথম চিত্রিত বা লেখ-যুক্ত মুদ্রার রীতি বিভিন্নকালে উদ্ভূত হয়। অন্যান্য দেশে সোনা রূপা তোল করেই বিনিময়ের কাজ চালানো হ'ত। এ তিনটি দেশেও মুদ্রা তোল করা হ'ত। ধাতুখণ্ডে নানা চিত্র দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে ধাতুর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়কগণের ঘোষণা প্রকাশ করা। সুপ্রাচীন যুগে, ভারতবর্ষে কেবল কতকগুলি বিশেষ চিহ্নছাড়া মুদ্রায় কোন প্রাতকৃতি বা পুরাচিত্র অঙ্কিত হত না। পাতলা চতুষ্কোণ তামা বা রূপায় ফুল পাতা, হাতী, সিংহ বা ষাঁড়ের দুই চারিটা ছোট্ খাটো রেখা-চিত্র মাত্র মোহরের ছাপের মতন করে মেরে দেওয়া হ'ত। এই সব রূপ বা চিত্র টাকায় থাকত বলে টাকার নাম ছিল "রূপ্য" বা "রূপ্যক"—যা থেকে আমাদের বর্ত্তমান "রূপা" শব্দের উৎপত্তি। ভারতের কিছু আগেই গ্রীক জাতি তাদের মুদ্রায় যে ধরণের চিত্র অঙ্কিত করত—তার চমৎকারিত্বের তুলনা হয় না। নানা গ্রীক দেবতার মুণ্ড অতি মনোহর ভাবে অঙ্কিত হয়ে গ্রীক মুদ্রাগুলোকে শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন করে রেখেছে। হেমেম্, আপোল্লোন, জেউস, হেরা, অ্যাথেনা প্রভৃতি দেবদেবী, আরেথুসা, এউবোইয়া প্রভৃতি অপ্সরার অতি মনোহর প্রতিকৃতিময় চিত্র, গ্রীক যোদ্ধা বা মল্লের মূর্তিতে গ্রীক মুদ্রা, শিল্প সৌন্দর্যের চিরন্তন আধাররূপে বিদ্যমান। গ্রীক রীতির অনুপ্রেরণার ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুন্দর চিত্রময় মুদ্রার রীতি প্রবর্তিত হয় ভারতে। রোমের মুদ্রাও গ্রীসের অনুকরণে তৈরী হয়। পরে খৃষ্টানী-সভ্যতা গ্রীসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে সমর্থ হয় যদিও, অধুনা ইউরোপে আবার এ বিষয়ে চেতনার লক্ষন দেখা যাচ্ছে।

নানাভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফরাসীরাও তাদের মুদ্রায় কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করে। সাধারণতঃ গ্রীক ভাবের পুণরাবৃত্তিই এই-সব মুদ্রা-চিত্রে দেখা যায়। ফ্রান্সের Oudine বলে শিল্পীর পরিকল্পিত Concord দেবীর মুখ বহুদিন ধরে ফ্রান্সের মুদ্রাকে সৌন্দর্যের একটা স্থায়ী শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছে। এর পরে ড্যুপ্যুই অঙ্কিত ফরাসী-মাতার মূর্তি, রোতি অঙ্কিত শস্যবপনকারিণী নারীর মূর্তি—ফরাসীরা নিজেদের মুদ্রায় চিত্রিত করে।

ফ্রান্সের মত ইটালীর মুদ্রাতেও নানা রকমের সুন্দর সব চিত্র পাওয়া যায়। কোনটিতে দেবী ইটালিয়ার মূর্তি, কোনটিতে চার ঘোড়ার রথে বিজয়া দেবী, কোথাও 'সিংহবাহিতা ইটালী জননী, কোনটিতে যবের শীষ, কোনটিতে বা ফুলের উপরে মৌমাছি। ইটালী রাজার মুখও কতকগুলি ইটালীয় মুদ্রাতে দেখা যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়া,—ছোট্ট দেশটি। কিন্তু এদের মুদ্রা প্রমাণ করে—এ-দেশের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পপ্রাণতা যথেষ্টই রয়েছে। নিকেলের চেক-মুদ্রায় একদিকে কাটা শস্যের গোছা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দেশলক্ষীর প্রতীক স্বরূপ এক নারী মূর্তি। যে শিল্পী এ-ধরণের ভঙ্গিতে আঁকা মূর্তিটির পরিকল্পনা করেছেন—তার নামটি

তলায় স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন রাজবংশের চিহ্ন—দ্বি-লাঙ্গুলে সিংহ মূর্তি আর দেশের নাম "Ceskoslovenska Republika" লেখা রয়েছে। দশ ক্রাউনের মুদ্রাগুলিও এই ধরণের। একদিকে কল-কারখানার নিশানা হিসাবে হাতুড়ী আর যন্ত্রের চাকা, অন্যদিকে কৃষিজাত দ্রব্য—এই নিয়ে দেশমাতৃকার উপবিষ্ট মূর্তিটি মুদ্রায় অঙ্কিত রয়েছে। তিনি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন সন্তানগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করছেন—এমনি প্রাণবন্ত সজীব ছবিটি। চল্লিশ ক্রাউনের মুদ্রায় আছে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য—তিনটি মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

জার্মানীর মুদ্রাগুলির কয়েকটি ছাড়া বাকী সবগুলিতেই কোন নৈপুণ্য পাওয়া যায় না। কেমন যেন মামুলী, বিশেষত্বহীন বলেই মনে হয়। হাঙ্গেরীয় মুদ্রায়ও তেমন কোন বিশেষত্ব বা শিল্প প্রাণতার প্রমাণ বা তেমন কোন সৌন্দর্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেশের নাম, মূল্য আর প্রথম স্তেফাণের মূর্তি—এই মাত্র।

স্বাধীন পোলাণ্ড ফ্রান্সের প্রেরণায় কতকগুলি সুন্দর মুদ্রা বের করেছে। দেবী পোলানিকার (পোলাণ্ড মাতা) মূর্তি। পোলাণ্ডের পরলোক গত প্রেসিডেণ্ট পিলসুদস্কির মুখ—এইগুলি বাস্তবিকই অপরূপ।

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা তাদের নতুন মুদ্রা তৈরী করেছে। একদিকে বীণা অন্যদিকে বিভিন্ন মুদ্রায় দেশের নানা পশুপক্ষীর চিত্র, ঘোড়া, ষাঁড়, মুরগী, সামন মাছ, শূওর ইত্যাদি। জন্তুর চিত্র হিসেবে এ মুদ্রার নক্শাগুলো ভারী সুন্দর। আর এগুলি হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক মুদ্রার ভাবের অনুকরণ।

বৃটিশ জাতি এসব ব্যাপারে সৌন্দর্যের বড় একটা ধার-ধারে বলে মনে হয় না। ইংরেজের মুদ্রায় সেজন্যে কোন রকমের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ব্রোঞ্জের পেনি আর হাফ্-পেনিতে ত্রিশূলধারিণী ব্রিটানিয়া লক্ষীর মূর্তি থাকে। এই মূর্তি প্রাচীন রোমান মুদ্রায় প্রাপ্ত রোমা দেবীর প্রতিকৃতির নকল। সোণার গিনির আর হাফ্ গিনির পেছনে থাকে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দেবতা সেণ্ট জর্জের অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত মূর্তি, ঘোড়ার পায়ের তলায় একটি ড্রাগন মরণাহত অবস্থায়। এই চিত্রটির পরিকল্পনা একজন ইতালীয় চিত্রকরের।

ইংরেজ প্রচলিত ভারতের মুদ্রায় ভারতের কোন বৈশিষ্ট্যকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকায় রাজা চতুর্থ উইলিয়মের আর রাণী ভিক্টোরিয়ার টাকায় খালি ফারসীতে "য়ক্ রূপ্ য়হ্" এইটুকু মাত্র লেখা থাকত। রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিযুক্ত টাকায় এই ফারসীটুকুও সরিয়ে নেওয়া হয়—এই টাকার পেছন দিকের নক্শাও ইউরোপীয়। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের টাকায় পেছন দিকে দুধারে মৃণাল সহ পদ্মের গোছা দিয়ে ভারতীয়ত্বের একটু চিহ্ন আনবার চেষ্টা হয় আর ফারসীতে "য়ক্ রূপয়হ্", "হ্শৎ আনহ্" এই সব লেখা আবার বসানো হয়। পঞ্চম জর্জের মুদ্রার পেছন দিকের চিত্রে ফারসীটুকু বজায় আছে, আর একটি নক্সা—ভারতের প্রতীক পদ্মফুল, ইংল্যাণ্ডের প্রতীক গোলাপ ফুল, স্কট্ল্যাণ্ডের মিসল্ ফুল, আয়ার্ল্যাণ্ডের তেমাথা শ্যামরক অঙ্কিত আছে। ভারতের মুদ্রায় ভিন্দেশের প্রতীক যে কেন দেওয়া হয়েছে সেটুকু আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলে আমাদের মন খুশী হয়ে উঠে। তবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের মুদ্রায় সৌন্দর্য আর বৈশিষ্ট্য দুইই রাখবার চেষ্টা হবে—এ আশা করা যায়।

হারানিধি

বেগম সালেমা খাতুন

নিষ্ঠুর এক যাযাবর জাতি তীর আর ধনু হাতে,
বানর মারিতে এসেছিল দেশে গ্রীষ্মের এক প্রাতে!
এতোটুকু এক বানর-তনয় ব্যথাতুর অসহায়,
আমারি গৃহেতে পশিল আসিয়া, চোখে জলধারা হায়!
মাতাপিতা তার গেছে বুঝি ম'রে নিঠুর অত্যাচারে,
অসহায় শিশু মানুষের মতো শরণ নিয়েছে দ্বারে!
মুখে নাই কথা, ভয়ে কাঁপে তনু ধরিতে যাইলে করে,
হাত যোড় করে মানুষের মতো বিহ্বল-অন্তরে।
তবু কোন মতে ধরিয়া তাহারে তুলিয়া লইনু কোলে,
গায়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিনু কোন ভয় নাই বলে।

কাছে কাছে করে মানুষ করিনু নাম দিনু হারানিধি,
মানুষেরি মতো সব কিছু ওর বুক ভ'রে দিল বিধি!
দিনদিন শত চপলতা যেন সহিবারে হলো দায়,
দুষ্টুমি ওর এইটুকু তনু ছাড়ারে উঠিতে চায়!
তবু ওরে আমি বড় ভালেবাসি সন্ধ্যার প্রাক্কালে,
বিছানায় বসি টিপে দিত পা' হাত বুলাইত ভালে!
সেদিন দুপুরে দুষ্টুমি ভরে ঘোষেদের ওই ছাতে,
রেশমের শাড়ী শুকাইতে দেখে ছুটে যায় আঁখিপাতে
হাতে তুলে নিয়ে দেখে চেয়ে যবে হরষ-আকুল-শিরে,
তাড়া পেয়ে শেষে পলাইতে যেয়ে শাড়ীখানি গেল ছিঁড়ে।

অশোভন শত গালাগালি শুনে যত দোষ দেখি তার,
হাতে পায়ে বেঁধে নিয়ে গেনু তারে বহু দূরে নদী পার।
জঙ্গলে এক ছেড়ে দিয়ে শুধু কহিলাম একবার,—
'ঘরে এসে আজ মায়া দিয়ে বেঁধে নিজ দোষে হ'লি' বার!
অসহায় ছিলে সেই শিশুকালে, আজ হইয়াছ বড়,—
'হারানিধি' আজ হারানিধি হ'য়ে বনে বনে ঘুরে মর!'
গৃহে ফিরে এনু মন তবু যেন কেঁদে ওঠে বার বার,
জ্ঞানহীন্ জীব দোষ করিয়াছে, এই কি শাস্তি তার?
বসিয়া বসিয়া কত ভীরুকথা তোলপাড় করে মন,—
উন্মনা হ'য়ে ঘর পানে তার চেয়ে থাকি অনুখন!

দুটি দিন পরে থাকিতে নারিনু নিজে গেনু সেই বনে,
দেখি হারানিধি হারা হ'য়ে গেছে কোথায় সংগোপনে।
ভার মনে শেষে বাড়ী ফিরে এসে দেখিলাম দ্বার পাশে,
হারানিধি এসে মাথা নত করে বসে আছে মোর আশে!
কাছে আসিতেই পা' দুটি জড়ায়ে চায় মোর মুখপানে;
ছলছল চোখ কি যে কয় তার, ভগবান্ তাহা জানে।
বুকে তুলে নিয়ে কহিলাম ধীরে—'এলি ফের হেথা ঘুরে!
জানি রে পাগল আমারে ছাড়িয়া থাকিতে নারিবি দূরে!
সেই শিশুকালে ঘরে এসেছিলি কচি-কিশলয়-মুখ,
তাই ছেড়ে দিতে এমন করিয়া কেঁদে ওঠে আজ বুক!'*

* আমরা নিরতিশয় দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে রংমশালের প্রিয় লেখিকা বেগম সালেমা খাতুন মাত্র কয়েকদিন আগে টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর। তাঁর শেষ লেখা এই কবিতাটি তিনি রংমশালে দান করে অমর লোকে চলে গিয়েছেন।—সঃ।

রূপকথা

বুদ্ধিমান মরুভূমি

শ্রীরূপক

আকাশের যখন জন্ম হয়েছিল, সে অনেকদিন। পৃথিবী তো তখন ছিলই না! চারিদিকে শূন্যের মাঝখানে প্রকাণ্ড মরুভূমি খাঁ খাঁ করত। সেই মরুভূমির ওপর ভীষণ ঝড় আসতো। মেঘের কালো ধূলো উড়ে সব অন্ধকার হয়ে যেতো। পথিকরা পথ খুঁজে পেতো না। মাঝে মাঝে দুর্ভীক্ষ আর মহামারী আসতো। এসব ব্যাপারে স্বর্গের লোকেরা খুব ভয় পেতো। তারা গিয়ে একদিন সম্রাটের দরবারে সব কথা জানালো। সম্রাট তখন রক্ত-প্রবালের রাজসিংহাসনে বসে রাজকবির নতুন কবিতা শুনছেন। বাইরে থেকে কোলাহল শুনে বললেন—ব্যাপার কি? সকলে এসে রাজাকে অভিবাদন করে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করলো। সব শুনে রাজা গম্ভীর হলেন। বল্লেন—কোতোয়ালকে ডাকো। সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল এসে হাজির। চড়া মেজাজে রাজা বল্লেন—তোমরা কি কিছুই দেখবে না? রাজ্যটা কি ছারখারে যাবে? দণ্ডবৎ হয়ে কোতোয়াল জবাবদিহি করল—হুজুর! সব জেনেশুনেও আমাদের কিছু করবার নেই। এতো চোর নয় যে সাজা দেবো, দুষমণ নয় যে শায়েস্তা করবো! ফৌজ পাঠিয়েও কিছু হবে না। মরুভূমির সাথে তো আর যুদ্ধ চলে না। আমাদের মাপ করুন মহারাজা! রাজা ভেবে দেখলেন—তাইতো! কি আর করা যায়। মাথা চুলকে বল্লেন—শিল্পীদের ডাকো। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এলো। বল্লে—মহারাজ, হুকুম দিন, মরুভূমিকে ভেঙ্গেচুরে নতুন রাজ্য বানিয়ে দেবো। রাজা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বেজায় খুসী হয়ে সোণার থলি পুরস্কার দিলেন।

তারপর তিনশো বছর ধরে হাজার হাজার শিল্পী মিলে মরুভূমিকে পিটিয়ে ফাটিয়ে ইটপাথর খোদাই করে এক আজব রাজ্য বসালো। তিনশো বছর তিন মাস পর খবর এলো ভয়ানক ভূমিকম্পে সব ভেঙ্গে চৌচির। মরুভূমির নীচ থেকে দাউ দাউ আগুন উঠছে! প্রজারা ভীড় করে জানালো তাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আগুনের ফুলকি উড়ে আসছে, ইট-পাথর ছিটকে পড়ছে, বাড়ী-ঘর কাণা হয়ে যাচ্ছে। রাজা রেগে বল্লেন—ডাকো পণ্ডিতদের। পণ্ডিতেরা এলো দলে দলে। সাতদিন পুঁথিপত্র ঘেঁটে, সাতরাত্রি গবেষণা করে জানালো, মরুভূমির পেটে আগুনের শেকড় রয়েছে। আগুনের আগাছাগুলো খুঁড়ে ফেলতে হবে। জল ঢেলে ঢেলে তাদের গোড়াগুলো নিভিয়ে দেওয়া হোক। পণ্ডিতদের গবেষণায় রাজা উল্লসিত হলেন। সোণার আংটি খুলে পণ্ডিতদের উপহার দিলেন। তখুনি হাতিয়ারদের ডেকে হুকুম দিলেন। লক্ষ লক্ষ হাতিয়ার মিলে পাঁচশো বছর মরুভূমির আগুন খুঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। আগুন খোঁড়া হলে অজস্র মেঘের থলি করে জল ঢালা হল। মেঘের সেই পুরণো থলি থেকে আজও মাঝে মাঝে জল ঝরে। আমাদের এখানে বলে, বৃষ্টি পড়ে। এমনি করে মরুভূমির দৌরাত্ম্য অনেক কমে এলো। কিন্তু অনেকদিন পর হঠাৎ খবর এলো, জলে আর আগুনে ধাক্কাধাক্কি করে মরুভূমিটা উড়ে চলেছে, কোথায় গিয়ে পড়বে ঠিক নেই। রাজ্যে হাহাকার উঠল। রাজা বুঝলেন পাগলাটে মরুভূমিটা তাদের দিকে এলে

রাজ্যটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি রাজা জ্যোতিষদের ডেকে পাঠালেন। বড়ো বড়ো জ্যোতিষদের দল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। সাতদিন সাতরাত ছক ফেলে অঙ্ক কষে বল্লে—মরুভূমির ভেতর বোকা দৈত্য লুকিয়ে আছে। ওর বোকামিতেই ঘুতো গণ্ডগোল। তাছাড়া উড়ো মরুভূমিটা দক্ষিণপশ্চিম কোণ দিয়ে এদিকে আসতে সতেরো দিন লাগবে। মঘা নক্ষত্র থাকলে আরো তিন দিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রলয়-যোগ লিখছে। রাজা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—মাথাওয়ালা লোকদের ডেকে পাঠাও। দেশ খালি করে মাথাওয়ালা লোকেরা এল। পনেরো দিন সতেরো ঘণ্টা মাথা খাটিয়ে মত পেশ করল—বোকা দৈত্যের বুদ্ধি নেই বলে এতো ফ্যাসাদ। মরুভূমিতে বুদ্ধির বীজ বুনে দেওয়া হোক। খবর পেয়ে রাজ্যের লোক ধন্য ধন্য করল। রাজার ধড়ে প্রাণ এল। মাথাওয়ালা লোকদের সোণার মুকুট উপহার দিলেন। দলে দলে দুঃসাহসী সৈন্যেরা উড়ো-রথে তীরবেগে ছুটলো। চটপট মরুভূমির চারকোণে জোরালো বুদ্ধির বীজ বুনে দিয়ে এলো।

দেখতে দেখতে মরুভূমি বুদ্ধিমান হল। তার পাগলামির নেশা কাটল। চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। সে দেখল গোয়ার্ত্তুমি করতে গিয়ে নিজেই মারা পড়বে। কাজে কাজেই বোঁ বোঁ করে নিজের জায়গায় ফিরে এসে কিছুদিন চুপচাপ কাটিয়ে দিল। আস্তে আস্তে তার গায়ের ওপর অজস্র বুদ্ধির চারাগাছ জন্মালো। বুদ্ধিমান মরুভূমি ফন্দীবাজ হয়ে উঠল। ফলটা উল্টো দাঁড়াল। বুদ্ধির দৌলতে দৈত্যধার নিজের ভুল বুঝতে দেরী হল না। এখন সে আগের মতো সামনাসামনি উৎপাত করে না। ভালোমানুষের মতো খুব নিরীহ ভাব দেখায়। এদিকে কিন্তু তলে তলে স্বর্গরাজ্য ফুটো করবার মতলব পাকাতে থাকে। অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে বিষাক্ত লেজ দিয়ে স্বর্গরাজ্যের ভিত্ খুঁড়ে খুঁড়ে ফাঁপা করে দিতে লাগল, যাতে করে সবশুদ্ধ একদিন ভুস্ করে খসে পড়ে সেটা চৌচির হয়ে যায়। স্বর্গরাজ্যের গুপ্তচরেরা ব্যাপারটা হঠাৎ টের পেল।

তারপর সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড। পাড়ায় পাড়ায় কান্নাকাটি, হৈ হৈ, রৈ রৈ। প্রজারা এসে রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বিরাট রাজদরবার বসলো। পণ্ডিত, শিল্পী, জ্যোতিষ, মাথাওয়ালা, পাত্রমিত্র, কোতোয়াল, সেনাপতি সকলেই হাজির। রাজা প্রশ্ন করলেন। সকলেই চুপ। কারো মুখে কথা নেই। রাজাও চুপ করলেন।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলা কোথা থেকে এক সবুজ প্রজাপতি উড়ে এলো। সে এসে বল্লে—মহারাজ! রাজ্যের অমঙ্গল দেখে ছুটে এসেছি। আপনারা যা করেছেন তাতে সর্ব্বনাশ হয়েছে। বোকা দৈত্যটা বুদ্ধিমান হয়েছে। ভালো দিন দেখে মরুভূমিতে সবুজ ঘাসের নতুন শিস্ বুনে দিতে পারেন তো দুর্ব্বুদ্ধির নেশাটা কাটবে। তখন নিজের বোকামিতে দৈত্যটা নিজেই মারা পড়বে। রাজা লাফিয়ে উঠে প্রজাপতির গলায় পারিজাত ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের লোক হৈ হৈ করে মরুভূমিতে নতুন ঘাস বুনে এলো। কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধি হারিয়ে নিজের বিষাক্ত লেজ কামড়ে দৈত্যটা নিজেই মারা গেল। যাবার আগে সমুদ্রের জল তোলপাড় করে, ঝড় তুলে, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে সব তছ্নচ্ করে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে মরুভূমির বুকে কচি কচি ঘাসেরা হেসে উঠলো। একদিন ভোরবেলা স্বর্গরাজ্যের লোকেরা চেয়ে দেখলো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক আজব রাজ্য—**সবুজ পৃথিবী।**

কনভয়

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত

সন্ধ্যার কালোছায়া ধীরে ধীরে দুরন্ত সাগরের বুকে নেমে আসছে দিগন্তের দূরপ্রান্ত থেকে। সামুদ্রিক পাখীর অলস পাখার মৃদু ঝট্‌পট্ থেকে থেকে শোনা যায়। শুধু পশ্চিম দিগন্তে আব্‌ছা মিলিয়ে যাওয়ার ছবির ভেতর ছোট্ট একটা ধাতব নলকে ঢেউ এর সমতালে নাচ্‌তে দেখা যায় অনাবিল আনন্দে। ঘনায়মান শান্ত গাঢ় আঁধারের প্রারম্ভিক আয়োজন।

…চকিতে ধাতব নলটা জলের গভীরতায় আত্মপ্রকাশ ক'রলো সাগরের বুকে অনেকগুলো সোহাগের আত্মপ্রকাশের সাথে। একবার ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে তারা বৃত্তাকার পথে। কোন ব্যস্ততা কিংবা চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র নেই ওদের চলার গতিতে।…কিন্তু আচম্‌কা একটি জাহাজের বুকে শেষ কালো পর্দ্দা নেমে এলো তলদেশে টর্পেডোর আঘাতে। অন্য জাহাজগুলো মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে প'ড়লো চারদিকে—ফেল্‌তে সুরু ক'রলো জলবোমা বা ডেপ্‌থ্-চার্জ্জ। বুম্…বুম্…বুম্…একটির পর একটি ডেপ্‌থ্-চার্জ্জ ফেটে পড়ে সাগরের বুকে শত্রুর লুক্কায়িত সাবমেরিণকে ঘায়েল ক'রবার জন্য।…

…কিছুক্ষণ পর এক তর্‌ফা যুদ্ধের বিপুল শব্দ থেমে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া জাহাজগুলো আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। বিপন্ন যাত্রীদের তুলে নিয়ে সারি বেঁধে আগেকার ছবির মত চ'লতে থাকে ডুবন্ত জাহাজের সমাধি রচনার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে।…

এইরকম দল বেধে অনেকগুলো জাহাজের সাগর-পাড়ি দেওয়ার নাম কনভয়-প্রথা। আর বৃত্তাকার পথে চলমান ঐ জাহাজ সমষ্টির নামকরণ হয়েছে কনভয়। বিগত মহাযুদ্ধে এই কনভয়-প্রথার উৎপত্তি। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই কনভয়-প্রথা আরো প্রসার লাভ করেছে।

বিগত মহাযুদ্ধে জার্মান সাবমেরিণের গোপন টর্পেডোর ঘায়ে নীল সাগরের বুক থেকে যখন প্রত্যেকটি জাহাজ শেষ বিদায় নিচ্ছিল, সে সময়ই বৃটেনের নৌবিভাগের বড়ো কর্ত্তারা মাথা ঘামাতে সুরু ক'রলেন, কিভাবে জাহাজগুলোকে টর্পেডোর হাত থেকে রক্ষা করা যায়! তাঁরা বাণিজ্য জাহাজ আর একা ছাড়লেন না, তাদের রক্ষীর ব্যবস্থা করলেন। অনেকগুলো জাহাজকে দলবদ্ধ ক'রে একসঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। এছাড়া জাহাজের ভেতর শ্রেণীবিভাগ ক'রলেন। তার ভেতর থাকবে বাণিজ্য জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, ডেষ্ট্রয়ার ও বিমানবাহী জাহাজ। বাণিজ্য জাহাজগুলোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে বাকী রক্ষী জাহাজগুলো। এমনিভাবে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে কনভয়-প্রথা।

কনভয় চলাচলের সময় প্রত্যেক জাহাজকেই কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। দলের যে জাহাজটির গতি সবচাইতে কম—তার গতিকেই অনুসরণ ক'রে সবগুলো চলে। ভিন্ন ভিন্ন গতিতে কাউকে চ'লতে দেওয়া হয় না। এর একমাত্র প্রধান কারণ যে একটার গতি যদি বেশী হয় এবং আর একটায় যদি কম হয় তবে জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ লেগে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। দিনের বেলার চাইতেও রাত্রিতে এদের বেশী সতর্কতা অবলম্বন ক'রে যাতায়াত ক'রতে হয়। কোনও জাহাজের আলো যাতে একটুখানি বাইরে না আস্‌তে পারে, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়। এমনি কি, খোলা ডেকের ওপর সিগ্রেট্ খাওয়াও নিষেধ। একটি জাহাজ থেকে আর একটির দূরত্ব থাকে লম্বায় আধ মাইল। পাশে এর চাইতেও কম থাকে। শুধু চলার সময় নিজেদের এত কিছু নিয়ম মেনে চ'লতে হয়—এর ওপর শত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দৃষ্টি সন্ধানী ও সতর্ক রাখতে হয়। এতেই বোঝা যায় এদের চলাফেরার সময় প্রত্যেকের দায়িত্ব কতখানি বেশী! একটু ভুলচুক হ'লেই নিজেরই সমাধি রচনার সম্ভাবনা বেশী।

তিনপথে তিনরকমভাবে কন্‌ভয়ের ওপর আক্রমণ হতে পারে। আকাশ পথে বোমারু বিমানের নিক্ষিপ্ত বোমায়—সাগরের বুকে লুকানো সাবমেরিণের টর্পেডোর ঘায়ে—আর শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজের সামনাসামনি যুদ্ধে। এই তিনভাবে আক্রমণের মধ্যে বিমান দিয়ে আক্রমণের সময় কিংবা সম্মুখ যুদ্ধের কিছুটা সময় আগেই টের পাওয়া যায় শত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে। কিন্তু সাগরের গভীরতম অংশ থেকে সাবমেরিণ কনভয়কে আক্রমণ করার একমুহূর্ত আগেও জানা যায় না শত্রুর আগমনবার্তা। সে সময়ই সব চাইতে বেশী বিপদ ঘনিয়ে আসে। কারণ প্রথমতঃ ঠিক বোঝা যায় না, কোন স্থান থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং কাকে আক্রমণ ক'রবে। দ্বিতীয়তঃ সাবমেরিণ আক্রমণ ক'রে ভোরের ও সন্ধ্যার আব্‌ছায়া আলোর ভেতর। এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে ঐ সময়ের আলোতে সাবমেরিণ বিপক্ষের চোখ্‌কে ফাঁকি দিয়ে পেরিস্কোপের সাহায্যে সব কিছু দেখে নিতে পারে। তৃতীয়তঃ সাম্‌না সামনি যুদ্ধ হয় না ব'লে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

টর্পেডো জাহাজে আঘাত করলেই বোঝা যায় শত্রু কাছাকাছি এবং আক্রমণ সুরু হ'য়েছে। জাহাজ ঘায়েল হওয়ামাত্র বিপন্ন জাহাজ থেকে বাঁশী বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় শত্রুর আগমন-বার্তা। সাথে সাথে কনভয়ের ভেতর যে জাহাজগুলো পাহারাদার হিসেবে থাকে—সেগুলো মুহূর্তে খানিকটা সময়ের জন্যে চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ে। চলমান অবস্থাতেই বিপন্ন জাহাজের যাত্রীদের তুলে নিয়ে সুরু ক'রে ব্যাপক আক্রমণ। শত্রুর অবস্থান অনুমান ক'রে তীরবেগে ছুটে যায়—একটি একটি ক'রে জলবোমা বা ডেপ্‌থ্-চার্জ্জ ছুঁড়তে থাকে! ডেপ্‌থ্-চার্জ্জ ফেটে পড়ার সাথে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয় জলের ভেতর। সাবমেরিণ আয়ত্বের ভেতর থাক্‌লে ক্ষ্যাপা সাগরের বিক্ষুব্ধ আলোড়ন সহ্য ক'রতে না পেরে জলের ওপর ভেসে উঠ্‌তে বাধ্য

হয়। নয়তো জলের ভেতরই নষ্ট হ'য়ে যায়। তখন সাগরের বুকে তেলের ট্যাংক ফেটে প্রচুর তেল ভাস্‌তে থাকে। তা দেখেই অনুমাণ করা যায় যে সাবমেরিণ নষ্ট হ'য়েছে। আর যদি ভেসে ওঠে তাহ'লে যুদ্ধ জাহাজ ও ডেষ্ট্রয়ার থেকে কামান দাগিয়ে তাকে অকেজো ক'রে দেয়। এরপর জাহাজগুলো আবার দলবদ্ধ অবস্থায় চ'লতে সুরু ক'রে।

সাগরপথে পাড়ি দেওয়ার সময় পথে হঠাৎ শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ। বাণিজ্য জাহাজগুলোকে মাঝখানে রেখে বাকী জাহাজগুলো বৃত্তাকারে জোরে ঘুরতে থাকে। মুহূর্তে যুদ্ধ জাহাজের এবং ডেষ্ট্রয়ারের কামানগুলো সজীব হ'য়ে কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠে। উভয়ের ভেতর সুরু হয় গোলাগুলীর আদান প্রদান। এরপর বাণিজ্য জাহাজগুলোকে আড়াল ক'রে রেখে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। মিনিটে মিনিটে কামানের গোলা ছিট্‌কে বেরিয়ে শত্রুর যুদ্ধ জাহাজকে দূরে তাড়িয়ে দেয়—নয়তো ধ্বংস ক'রে ডুবিয়ে ফেলে।

আকাশ থেকে বোমারু বিমান আক্রমণ করবার সংগে সংগেই বিমানবাহী জাহাজগুলো বিশেষভাবে কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠে। বিমানবাহী জাহাজ থেকে জংগী বিমানগুলো তক্ষুনি আকাশে উড়ে যায়। দু'দলে যুদ্ধ বাধে মেশিনগানের গুলীতে। জংগীগুলোকে সহায়তা করে বিমান বিধ্বংসী কামান। কামানের মুখ থেকে সোজা ছুটে যায় বোমারু বিমান ধ্বংস ক'রতে।

কনভয়-প্রথায় জাহাজ চলাফেরার সময় যে একটিও খোয়া যাবে না বা নষ্ট হবে না, তা অবশ্যি বলা যায় না। কিন্তু এটুকু দেখা গেছে যে একাকী যাতায়াত ক'রলে যে পরিমাণ জাহাজ ডুবি হয়, কনভয়-প্রথায় পাঠালে জাহাজ ডুবির সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমে যায়।

বর্তমানে কেউ কেউ 'ব্যাফল্‌ওয়ালের' বাংলা নাম দিয়েছেন—বিফল প্রাচীর, তেমনি কনভয়ের নাম দিয়েছেন, 'কমভয়'। অর্থাৎ এভাবে বিপদের বহুলাংশ কমে গেছে কিনা!

বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের এই বইগুলি পড়ো।—

ভয়ঙ্কর আফ্রিকা—	২॥০	আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
আজকের আমেরিকা—	২॥০	মরণ বিজয়ী চীন—	৩॥০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০	ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০

লাল চীন— ১॥০

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

জগৎ-বার্ত্তা

শ্রীঅরুণকুমার দত্তগুপ্ত

সম্প্রতি জাপানীরা নাকি একপ্রকার জাহাজ তৈরী করছে যা আগাগোড়া হবে রাবারের! অবশ্য আমাদের জন্য খেলার রাবারের জাহাজ নয়,—আসল বড় জাহাজ। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে এসব জাহাজ তৈরী হবে। ডাচ ইষ্ট্ ইণ্ডিজ রাবারের জন্য প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমানে জাপানীদের অধীন। এই রাবারের জাহাজগুলি অন্যান্য জাহাজের মতই দেশ-বিদেশে মাল বহন করতে পারবে। এগুলোতে কিন্তু ইঞ্জিন থাকবে না। মালবোঝাই এই জাহাজগুলিকে অন্য জাহাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিজের বন্দর থেকে জাপানের অন্যান্য বন্দরে নিয়ে যাবে। তথায় সমস্ত মাল নামান হ'লে ঐ জাহাজগুলিকে পাড়ে তুলে রাখা হবে। তারপর ঐগুলিকে অংশ অংশ ভাগ করে কেটে তদ্বারা বিভিন্ন রাবারের নানাবিধ দ্রব্য তৈরী করা হবে। মন্দ নহে, একসাথে রথ দেখা ও কলাবেচা দুই-ই হবে।

সহরের বা পাড়াগাঁয়ের আবর্জ্জনা যে মানুষের কোনো কাজে লাগতে পারে, মানুষ তা' বহুদিন পর্য্যন্ত মনে করতেও পারেনি। মানুষ ভাবে, আবর্জ্জনার আবার দামই বা কি,—কি বা কাজে লাগতে পারে এসব ছাই ভস্ম বিশ্রী জিনিষ? কিন্তু সম্প্রতি এই তুচ্ছ আবর্জ্জনা থেকে অনেক জিনিষই প্রস্তুত হচ্ছে। এবং এ যুগে দাম হয়েছে তার অনেক বেশী। রাস্তার ধারে ময়লা-ফেলার টবে আমরা কত কি বাজে অকেজো বস্তুই না ফেলি। এই রকম দশ পনেরোটা টবের ময়লা একত্র সমাবেশ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাতে নেই এমন জিনিষই নেই,—নানাবিধ ধাতুখণ্ড হতে সুরু করে ছেঁড়া নেকড়াটুকু পর্য্যন্ত সব কিছুই ওর মধ্যে রয়েছে। ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম সহরের নাম হয়ত তোমরা শুনেছ। এই বার্ম্মিংহাম সহরে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর আবর্জ্জনা-ফেলা টবের আবর্জ্জনা একত্র সমাবেশ করে পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছিল যে, তাতে ৪ আউন্স সোনা, ১৭০ আউন্স রূপো, ৭ টন পিতল, ২ টন তামা, ১ টন সীসা, ২ টন এলুমিনিয়াম, ২ টন দস্তা ও নানাবিধ বস্তু রয়েছে। তাদের সমষ্টির মূল্য প্রায় ২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৭০০০৲ টাকা। মলমূত্র প্রভৃতি ময়লা যা' সহরের ড্রেনের মধ্যে, নদ-নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয় তা থেকে একপ্রকার ইট, টালি এবং জ্বালানি তৈরী হচ্ছে। এসব ময়লা সাররূপে ক্ষেতেও দেওয়া হয়। ছেঁড়া জামা-কাপড়ের টুক্‌রো সব চেয়ে বেশী ময়লা-ফেলা টবের মধ্যে দেখা যায়। ইংলণ্ডের সমস্ত ময়লা-ফেলা টবে বৎসরে ছেঁড়া মোজা, গেঞ্জি, পশমী জামা প্রভৃতির পরিমাণ প্রায় ১৯০০০ টন অর্থাৎ ৫৫০০০০ মণ। এসব ছেঁড়া জামা, মোজা প্রভৃতি থেকে আজকাল নূতন জামা, মোজা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। কাগজ ও পোষ্টকার্ড তৈরী করতেও এসব ছেঁড়া নেকড়ার প্রয়োজন হয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের চুলে সবচেয়ে সুন্দর পশম তৈরী হতে পারে। জার্ম্মাণীতে চুল কাটার দোকানগুলি থেকে প্রত্যহ রাশি রাশি চুল পশমের কারখানায় পাঠান হচ্ছে। নাপিত দিয়ে আমরা যে চুল কাটি, সেই চুল কখনো কাজে আসে এটা মনে করতে তোমরা পেরেছ কি? বর্ত্তমান যুগটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ও বিস্ময়ের যুগ।

শুনেছিলাম, মার্কিণ দেশে এক বৈজ্ঞানিক নাকি এমন একটী প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন আলোকরশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন যা' দ্বারা যে কোন বস্তুকে মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করা যায়। যদি ভূমিতল থেকে নেই রশ্মি আকাশস্থ শত্রুপক্ষের কোন বিমানপোতের উপর নিক্ষেপ করা হয় তবে তা' নিমেষে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে উদার বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্কার দ্বারা নরমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করা হবে এই আশঙ্কা করে নাকি আবার সব যন্ত্রপাতি নিজেই নষ্ট করে ফেলেছেন। ধন্য মার্কিনী মহত্ত্ব!

এক্ষণে জার্ম্মানরা যুদ্ধ করবার এক অভিনব পন্থা বের করেছে এই যে, তাদের অধিকৃত যে সব পোতাশ্রয়ে বড় বড় রণতরী বা অন্য জাহাজ বৃটিশ নৌবহরের ভয়ে আশ্রয় নিয়ে আছে, সেই সব পোতাশ্রয়ের মুখে সমুদ্র জলে প্রচুর পরিমাণ তৈল ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক জিনিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যাহাতে ঐ তৈল বাহির সমুদ্রে ছড়িয়ে নষ্ট না হতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যদি কখনো ঐসব পোতাশ্রয়ের মুখে শত্রুর রণতরী এসে হাজির হয় তবে ঐ জলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শত্রুমিত্র উভয়েরই ধ্বংস সাধন করা হয়।

টর্পেডো-বোমার কথাও তোমরা হয়ত কেউ কেউ শুনে থাকবে। এই বোমা ফেলার জন্য এরোপ্লেনকে নীচে নামতেও হবে না, 'এ-এ-গান্' এর সীমার বাইরে থেকে এই বোমা ফেলবার সঙ্গে বেতারের দ্বারা তাকে ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ বোমারু প্লেনটির সঙ্গে এই নিক্ষিপ্ত বোমার বেতারে যোগাযোগ থাকবে যতক্ষণ না বেতার বোমাগুলিকে তাদের গন্তব্য লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঠিক পৌঁছে দিচ্ছে।

আমরা জানতাম কাচ জলের চেয়ে ভারী, জলে তা ভাসে না। সম্প্রতি জলের চেয়ে হাল্কা অর্থাৎ জলে ভাসে এমন কাচ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই কাচের নাম—'ফোম্‌গ্লাস' বা ফেনা-কাচ; নরম বলে একে ছুরি কাচি দিয়ে কেটে দরকার মত যে কোন আকৃতিতে পরিণত করা যেতে পারে। এই ফোম-গ্লাসে বাড়ী ঘরদোর, নৌকো প্রভৃতি অনেক কিছু তৈরী করা যেতে পারে।

সভ্যতার সুরু থেকে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র গাছপালা পশুপাখী কীট থেকে প্রস্তুত হয়ে আসছে। এখন এক রকম দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে কয়লা, জল ও হাওয়া থেকে—এই পদার্থটি নাম নাইলন (Nylon)। পদার্থটি ইস্পাতের চেয়েও নাকি মজবুৎ, আবার মাকড়ষার জালের মত সুক্ষ্ম। কাচের পোষাকও নাকি বিজ্ঞানের দৌলতে প্রস্তুত হচ্ছে—কাচের যে সুতো বোনা হচ্ছে চুলের মত তা সরু এবং তাকে গুটিয়ে রাখা যায়।

মানুষ শীঘ্রই সূর্য্য শক্তিকে নিজের সংসারের অনেক কাজে লাগাতে পারবে। সম্প্রতি একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার নাম Solar Machine. কয়লা থেকে গৃহস্থ যে উপকার পায়, তার চেয়ে বেশী উপকার নাকি পাবে এই যন্ত্র থেকে। শুধু জল গরম নয়, হরেক রকম রান্নাবান্না করাও এই যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হবে।

সৌর-শক্তির প্রযোজনা সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। সূর্য্যশক্তি বা সূর্য্যালোক থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরী হতে পারে যার দ্বারা একদিন আমাদের বাড়ীঘরদোর রাত্রে বৈদ্যুতিক সূর্য্যালোকে আলোকিত হবে। গ্রীষ্মকালের সূর্য্য বাড়ীর ছাতে এক দিনমান যে শক্তি কিরণ দান করে, তার পরিমাণ সারা বছর গৃহস্থ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খরচ করে তার সমান সমান! যে ভাবে ও যে গতিতে বিজ্ঞানের গবেষণা বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আর দু' একশ বছরের মধ্যে আমাদের বাস্তব জগতের চেহারা একেবারেই বদল হয়ে যাবে।

জার্মাণীর পথে

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ইউরোপের অনেক দেশেই টলস্টয় হোটেল দেখতে পাওয়া যায়। টলস্টয় হোটেলগুলি একদম নতুন ধরণের হোটেল। টলস্টয় হোটেলে যাঁরা এসে থাকেন তারা সবাই প্রগতিশীল। সাধারণতঃ কমিউনিষ্টরাই এখানে এসে উঠে থাকেন। ইগ্‌লাউ (IGLAU) নামক শহরে এসে কোথায় গিয়ে উঠি তাই ভাবছিলাম। এদিকে আমার পেছনে অনেক লোক চলতে শুরু করেছিল। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে দেখে নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাড়িটা একটা ভাঙ্গা পথের পাশে ছিল। ১৯১৪ সালের পর হতে এই ছোট শহরটির কোনরূপ উন্নতি হয়নি, এমন কি ভাঙ্গা পথটাকে একটু মেরামত করা যে দরকার তা ও যেন কেউ বুঝতে চায় না। পথের অবস্থা দেখে আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড ঘরটার বারান্দায় কয়েকজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাদের মাঝে একজন এসে আমার

সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কথা একটাও আমি বুঝতে সক্ষম হইনি। ভদ্রলোক যখন কথা বলছিলেন আমি কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকিনি। সাইকেলটি ঘরের বারান্দায় উঠিয়ে একখানা চেয়ারে বসে পড়ি। বিদেশে কেন স্বদেশেও এরূপই করতে হয়। আমিও মানুষ তুমিও মানুষ, ঘরে আসতে দেবেনা কেন? তোমরা হয়ত বলবে অপরের বাড়িতে তাদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা আইন বিরুদ্ধ। এসব দুর্বলতাসূচক কথা এদেশেই আপনি এসে দেখা দেয়, ইউরোপে তা হয় না। এ সম্বন্ধে আমি আরও অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু বলব না, বললে তোমাদের হজম হবেনা।

আমি যখন চেয়ারে বসে আরাম করছিলাম, তখন একজন ভদ্রলোক এসে আমার সংগে কথা আরম্ভ করলেন। এই ভদ্রলোক জাতে ইংলিশ। তিনি আমার পরিচয় চাইলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় তোমরা নিশ্চয়ই জান যাকে বলা হয়—ভবঘুরে। আমাকে ভবঘুরে ভেবেই ভদ্রলোক বললেন, "এখানে থাকলে অনেক খরচ হবে তা দিতে পারবেন কি?" এক দিনে কত খরচ হবে তা জেনে নিয়ে ভদ্রলোককে বললাম যে নিশ্চয়ই তা দিতে পারব। আমি ভাবছিলাম আরও বেশি দিতে হবে, বললাম, "চলুন ত একখানা ঘর দেখিয়ে দিন?" ভদ্রলোক আমার সংগে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি ঘরের ভাড়া তাঁরই হাতে দিতে যাচ্ছি তখন তিনি আমাকে বললেন, তিনিও এক জন পর্যটক মাত্র, ভাড়াটা হোটেলের মালিককে দিলেই হবে। হোটেলের মালিক কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমাদের কথা শুনছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর হাতেই ভাড়া দিয়ে দিলাম। এত বড় সজ্জিত (furnished) ঘরটার ভাড়া মাত্র বার আনা দিতে হয়েছিল। সজ্জিত কথাটা বলেই একটা ইংলিশ শব্দ লিখেছি। ইউরোপে সজ্জিত ঘরের মানেই হল তাতে বিছানা রয়েছে, আলনা আছে ইত্যাদি। এজন্যই furnished কথাটা ব্যবহার করতে হল! এখন থেকে কিন্তু এই কথাটা আবার বলব না। যখনই সজ্জিত ঘর বলব তখনই বুঝতে হবে ঘরে বিছানা ত আছেই উপরন্তু আয়না, আলনা, ওয়াস ষ্ট্যাণ্ড সবই আছে।

ইংরেজ ভদ্রলোক বলেছিলেন তিনিও একজন পর্যটক তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং তার খরচই বা কেমন করে চলে? ভদ্রলোককে এসব কথায় নিরুত্তর দেখে আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল এবং অভদ্রভাবে তাঁকে কয়েকটি কথা বলতেও কসুর করিনি। প্রাগে যাবার পর পারী হতে প্রকাশিত দৈনিক টেলিগ্রাম নামক একখানা সংবাদ-পত্রে এক বিবৃতি দিয়ে অনেক কথাই বলেছিলেন, তাতে আমার নাম বলেন নি বটে, তবে এক জন উগ্রপ্রকৃতির ভারতীয় পর্যটকের কথা বলতে তিনি ভুলেন নি। তিনি ছিলেন নাকি এক জন লর্ড। তাঁর কি খেয়াল চেপেছিল তাই সাইকেলে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়ে পড়েন। তাঁর কপালে লেখা ছিলনা তিনি লর্ড, তাই আমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাননি বলে তিনিও বোধহয় দুঃখিত হননি আর আমার বলার মত কিছুই ছিলনা।

সন্ধ্যার পর কতকগুলি চেক যুবক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং ভারতে বৃটিশরা কিরূপে রাজত্ব করে তা জানতে চায়। এসব কথা বলতেও আমার কষ্ট হত, তাই কথা এড়বারই অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু চেক ছেলেরা ছাড়বার পাত্র নয়। তারা আবার এ হোটেলের লোকের সংগে এসে কথাবার্ত্তাও বলে। এদের কাছে মিথ্যা কথা বলাও চলবে না। তাই যতটুকু কম কথায় নিজের দুঃখের কথা বলে শেষ করা যায় তাই করলাম। তোমরা যে বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত হচ্ছ তা হয়ত বুঝতেই পারনা,

বিদেশের ছেলে মেয়েরা কিন্তু সেরূপ নয়, তারা পলিটিক্স্ নিয়ে বেশ মাথা ঘামায় এবং সেজন্য তাদের কাছে আবল তাবল বলাও চলেনা।

কথা প্রসংগে ঐ ছেলেদের আমি বলেছিলাম, "তোমরাও নামকাওয়াস্তেই স্বাধীন, প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাই তোমাদের ভালমন্দ দেখে থাকে।" আমার মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই একজন বলে উঠল, "সেজন্য আমাদের দেশে টলস্টয় হোটেলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, আমরা কমিউনিজম মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি এবং আমাদের দেশকে সোভিয়েটে পরিণত করারও চেষ্টা হচ্ছে।"

তারপরদিন যখন পথে বের হলাম তখন পূবের আকাশটা লাল রংএ ভরে গিয়েছিল। সবুজ গাছের পাতায় লাল রং পড়ে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পথের পাশের ফার্মহাউসগুলি থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। পথেরই পাশে ফলের বাগানের মজুরের দল তাদের জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে কাজ করছিল। তোমাদের মত সব ছেলে মেয়েরা পথে বেরিয়ে পড়ছিল। তাদের সোণালী চুল গোলাপী গালে পড়ে ভারী সুন্দর তাদের দেখাচ্ছিল! আমি ত তাদের সৌন্দর্য দেখছিলাম, তারা আমার কি দেখছিল তোমরা কেউ বলতে পার? তারা দেখছিল আমার সোলার টুপি যা তাদের দেশে কেউ ব্যবহার করে না, আর দেখছিল আমার মুখের রং। কেউ কেউ নিগার নিগার বলে চীৎকারও করছিল। যারাই নিগার নিগার বলে চিৎকার করছিল তাদেরই কাছে গিয়ে আমি বলছিলাম "নাই নিগার, হিন্দুইস্কি" এর মানে হল আমি নিগ্রো নই, আমি এক জন হিন্দু। মধ্য ইউরোপে আমাদের হিন্দু বলে। মধ্য ইউরোপের লোক আবার নিগ্রোদের ঘৃণাও করেনা, এ কথাটা তোমাদের জেনে রাখা উচিত। আমাকে যারা নিগার নিগার করে ডাকছিল তাদের মনে কোনরূপ পাপবুদ্ধি ছিলনা। যাদের উপনিবেশ আছে, যারা জাত বিচার করে চলে তাদের মুখ হতে যখন এসব কথা বের হবে তখন ভাববে ঘৃণা করেই কথাটা বলেছে! তোমাদের মাঝে অনেকেই এরূপ শব্দের ব্যবহার কর তা আমি জানি সেজন্যই অপরে যখন আমাকে অন্যায় কথা বলত তখন ঘরের বাইরের কথা একই সংগে মনে এসে আঘাত করত।

পথটা ছিল বেশ ভাল, তাই পীলগ্রাম (Pilgram) নামক স্থানে পৌছতে মোটেই কষ্ট হল না। পীলগ্রামের আশে পাশে অনেকগুলি কারখানা দেখতে পেয়ে ভাবলাম এটাই বোধ হয় বাটার কারখানা (Bata's Workshop) হবে। আমি কিন্তু এ কলকারখানাগুলি বাটার না টাটার, তার সন্ধান করিনি। আমি সন্ধান করেছিলাম এখানকার মজুরের অবস্থা।

মস্ত বড় কারখানা হাজার হাজার লোক তাতে কাজ করছে। আমি একটি মজুর নিবাসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঘরটার ভাড়া আমাদের দেশের ছয় আনার মত, তবে বেশ সুন্দর। নিকটস্থ খাবারের দোকানে গিয়ে খেয়েও ছিলাম, কিন্তু খাবার খেয়ে মোটেই তৃপ্তি পাইনি। সেজন্যই আরও একটু ভাল একটা রেঁস্তারায় গিয়ে খেতে বসলাম। এখানে মাখন, কপি সিদ্ধ, ডিমের বড়া যাকে অমলেট বলা হয় তা খেয়ে নিয়ে অন্য একটা দোকান হতে ক্রেসল মিল্‌শ (ঘোল) কিনে খেয়ে ছিলাম।

এ দিকে তিন রকমের ভাষা চলে। জার্মান, ফ্রেন্চ এবং চেক। চেকদের ভাষা অনেকটা রুশ ভাষার মতই। খাবার খেয়ে ঘরে এসে ভাবছিলাম এখানে রাতটা কাটিয়ে কালই এখান থেকে চলে যাব, হঠাৎ মনে হল একটা ওয়াটার প্রুফ কোট কিন্‌তে হবে অথবা চেয়ে নিতে হবে। পরের দিনটা এখানে ঠিক করার পরই বাইরে চলে আসলাম একটু বেড়িয়ে দেখবার জন্য। বেড়াব আর কোথায়? এখানে

অনেক কাফি হাউস আছে, নাচবার ঘর আছে তাতেই বেড়াতে লাগলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এখানকার মজুররা অতি অল্প মাইনে পায় নতুবা বিয়ারের দাম যা নেওয়া হয় এক্সচেন্‌জের হিসাবে একটি বড় গ্লাস বিয়ারের দাম মাত্র আমাদের দুই পয়সা হয়। এরূপ এক গ্লাস বিয়ারের দাম আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কমের পক্ষে দুই টাকা হবে। অন্যান্য খাবারের দামও ঠিক সেরূপই।

পরের দিন সকাল বেলা একটি দোকানে গিয়ে একটা ওয়াটার প্রুফ কোট দেখে তা খুলে গায়ে দিলাম। দেখলাম বেশ মানায়। কোটটা আর খুলে রাখলাম না, দোকানীকে তার দাম কত জিজ্ঞাসা করলাম। অবশ্য কথা বলতে হয়েছিল নিজের ভাষায়ই। দোকানী অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে তারপর কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দোকান হতে ঠেলে বের করে দিল। ওয়াটার প্রুফ কোটের দাম চাইলই না। আমিও তাই চেয়েছিলুম। ওটা গায়ে দিয়ে ফের সাইকেলএ উঠলাম এবং চল্‌লাম কারখানার দিকে। দরজায় দুজন লোক বসেছিল। তারা আমাকে একটু দেখেই পথ ছেড়ে দিল। আমি ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ বেড়ালাম তারপর একটা খোলা ময়দানে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম মজুরের দল আমারই কাছে বসে খাবার খাচ্ছে। এতগুলি লোক খাবার খাচ্ছে অথচ একটুও শব্দ হচ্ছে না দেখে আমার বেশ একটু আনন্দ হল। মনে হল এখানকার মজুরের আদবকায়দা আমাদের থেকে অনেক উঁচুস্তরের। আমাদের দেশে স্কুলকলেজের ছাত্রেরা যদি কোথাও গিয়ে বনভোজন করে এবং কাছে একটা লোক শুয়ে থাকে তবে সেই লোকটার সম্বন্ধে কত মন্তব্য করে তার ত কথাই নাই উপরন্তু লোকটার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে ছাড়েনা, এরূপ দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখেছি। ইউরোপীয় সভ্যতাকে গাল দেবার আগে নিজের কাজের একটু চর্চ্চা করা সমূহ দরকার।

এদের খাওয়া হয়ে গেলে আমি তাদের কাছে আমার ভিক্ষাপত্র বিলি করলাম এবং যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। যারা আমাকে সাহায্য করল তারা আমার দেওয়া ভিক্ষা পত্র আর ফেরত দিলনা, আর যারা সাহায্য করলনা তারা ভিক্ষাপত্র ফেরত দিয়ে গেল। ইচ্ছা করলেই ভিক্ষা পত্র গুলি ফেরত না দিলেও পারত, কিন্তু ইউরোপের মজুরের সাধারণ জ্ঞান থাকায় তারা সেরূপ অন্যায় কাজ করে না

সেদিন বিকালে আবার ভিক্ষাপত্র অনেক কাফেতে বিলি করলাম এবং অনেকগুলি টাকা পেলাম। পরের দিন সকালে রওয়ানা হয়ে আর একটি শহরের দিকে আগিয়ে যাবার পথে এসে দেখলাম হঠাৎ পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমিও অপেক্ষা না করে গ্রাম্য পথে প্রাগের দিকে রওয়ানা হলাম।

তিন দিন গ্রামে কাটাবার পর পথে দেখা হল এক জন হংগেরীয় লোকের সংগে। তাকে আমি এক খানা ভিক্ষাপত্র দিয়েছিলাম। সে ভিক্ষাপত্র খানা পাঠ করেই কি ভাবল, তারপর অন্য একজন লোককে কি বল্‌ল। সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেল। আমি এবং হংগেরীর লোকটি একজন চাষার ঘরে প্রবেশ করলাম। চাষা তখন ঘরে ছিলনা। তার স্ত্রী আমাদের খাবার টেবিলে বসিয়ে একটা বড় বাটিতে ভর্ত্তি করে পায়স, এক কাঁচের হাঁড়িতে দই এবং রুটি এনে রেখে দিয়ে কফি আনতে গেল। আমি এবং হংগেরীর লোকটি পেট ভরে তাই খেলাম। হংগেরীয় লোকটি আমাদের খাবারের জন্য দুটি পেংগো দিয়েছিল। খাবারের দাম যা নিল অতি অল্প। খাবার খেয়ে যখন আমরা সিগারেট ফুঁকছিলাম তখন অন্য লোকটি এক খানা লরী নিয়ে এসেছিল। আমরা গিয়ে সেই লরীতে বসলাম। লরীড্রাইভার প্রবল বেগে তার লরীখানা প্রাগের দিকে চালিয়ে দিল।

[ক্রমশঃ

দৌড়াদৌড়ির কথা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমাদের রজোগুণ বৃদ্ধি করাই হলধরচন্দ্রর পেশা। তিনি রজক। তাঁর ইচ্ছা হোলো, তাঁর গাধাটাকে নিয়ে একবার কলকাতা ঘুরে আসেন। নিজে তো দেখবেনই, গাধাটাকেও একবার সহরটা দেখানো তাঁর বাসনা—যাতে ওটা একটু মানুষ হয়। ওঁর প্রতিদিনের সহচর—চিরকালের সাথী—ও আর তিনি প্রায় এক সঙ্গেই চরে বেড়ান—পাশাপাশিই বল্‌তে কি। এবং তাঁর সমস্ত বোঝা ওর পিঠেই চড়িয়ে দেন অম্লানবদনে। এবং সেও তা বহন করতে কোনোদিন দ্বিরুক্তি করেনি। গাধারা কখনো দ্বিরুক্তি করে না—উক্তি করলে একবারই করে—একটানা করে।

কিন্তু গাধাটাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়ে আনতে তাঁকে যে বেগ পেতে হোলো তা আর কহতব্য নয়। হতভাগা হাঁট্‌তেই চায় না, যদি বা হাঁটে, এক পা হাঁট্‌তে প্রায় এক মিনিট লাগিয়ে দেয়। ট্রেন্ যে তার মুখ চেয়ে বসে' থাকবে না, এ জ্ঞানও হতভাগার নেই। কলকাতা দেখবার তার যে একটুও কৌতূহল আছে তাও বোধ হয় না।

বিশ্ব সংসারের প্রতি বীতরাগ এই নিস্পৃহ গাধাটিকে নিয়ে কোনো ক্রমে হলধরচন্দ্র ষ্টেশনে এসে তো পৌঁছলেন। এবং গাড়ীর কোন্ কাম্‌রায় ওকে স্থাপিত করা হবে জানতে চাইলেন ষ্টেশনমাস্টারের কাছে। জবাব পেলেন, পেছনের ভ্যানে। গাড়ীর সব পিছনে।

হলধরচন্দ্র তো গাধাটাকে যথাস্থানে সুরক্ষিত করে' নিজের কাম্‌রায় এসে বসেচেন; এবং ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হতে পাশের সহযাত্রীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "রেলগাড়ীটা কত জোরে দৌড়চ্চে মশাই?"

"তা, ঘণ্টায় ষাট মাইল্ তো হবে।"

"ঘণ্টায় ষাট্—মানে, মিনিটে এক মাইল্? বলেন কি?" হলধরচন্দ্র ভীষণ চম্‌কেই গেলেন: "আমার গাধা যে মিনিটে এক পাও হাঁটতে পারে না।"

"রেলগাড়ী আর গাধা কি এক হোলো?" সহযাত্রীরও কম চমক্ লাগে না: "গাধা তো রেলগাড়ী নয়—মানে কি—রেলগাড়ী তো আর গাধা নয়।"

"তা তো নয়।" বল্লেন হলধরচন্দ্র। "একেবারে আকাশ পাতাল পার্থক্য না থাকলেও অন্ততঃ ষাট মাইলের তফাৎ তো বটেই।"

এবং হলধরচন্দ্রকে ক্রমশঃ যেন খুসি হয়ে উঠ্‌তে দেখা গেল। এবং অবশেষে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"যাক্, এই ধাক্কায় যদি আমার গাধাটা একটু চট্‌পটে হতে শেখে—হাঁট্‌তে-দৌড়তে শিক্ষালাভ করে সেটা বড় কম লাভ হবে না। আমার পরিবারে—উঁহু—আমার বংশে—না না, তাও নয়—আমার সংসারে ঐ একটি মাত্রই গাধা। ওটা মানুষ হোলো না, এই আমার বড় দুঃখ। গাধাটাকে পিটেপাটে কিছুতেই ঘোড়া করতে পারিনি মশাই, এখন রেলগাড়ীর পাল্লায় পড়ে কায়দায় পড়ে যদি ওটা ঘোড়া হয়ে যায়!···দেখা যাক্!···গাধাটাকে সঙ্গে নিয়েই তো তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি!"

"তীর্থভ্রমণ?" সহযাত্রী হাঁ করে' তাকান্।

"কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতা একটা তীর্থ ছাড়া কি? তীর্থ না হোক্ দেশ তো বটে—দেশ ভ্রমণে বেরুনোও বল্‌তে পারেন।"

হলধরচন্দ্রের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। তাঁর সহযাত্রীর চোখ কিন্তু কপালে উঠে যায়: "আপনার গাধা কোথায়? তাকেও কি এই কাম্‌রাতেই তুলেচেন নাকি? কই, দেখতে পাচ্ছিনে তো।"

চারদিকে দৃক্‌পাৎ করে' সহযাত্রী পরিশেষে হলচন্দ্রের ওপরেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। সন্দিগ্ধ নেত্রেই তাকিয়ে থাকেন তিনি। এবং প্রায় যেন দেখতে পেয়েছেন এইরূপ একটা আভাস তাঁর কটাক্ষের মধ্যে উঁকি মারতে থাকে।

"আজ্ঞে না, এখানে তুল্‌তে দিল কই? বল্ল যে গাধার স্থান কখনো মানুষের পাশে হতে পারে না।" হলধরচন্দ্র আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লেন—সঙ্গীহারা হয়ে মনে হয় তাঁর প্রাণ যেন নেই, কেবল ধড়টুকুই এখানে পড়ে আছে। তাঁর প্রশ্ন হোলো: "কেন মশাই, কেন বলুন্ তো? মানুষের পাশে গাধার স্থান হতে পারে না—মানুষ কি এতই সামান্য? এতই অপদার্থ মানুষ? কেন, মানুষের মধ্যেও কি গাধা নেই? আপনিই বলুন্ না!"

এ কথার কোনো জবাব দেন না ভদ্রলোক। তিনি হয়তো হলধরচন্দ্রের কথার দৃষ্টান্ত দেখ্‌ছিলেন—হলধরচন্দ্রের মধ্যেই দেখছিলেন হয়ত। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে' বল্‌তে তাঁর সাহস হয় না। গাধা হলে হয়তো মুখের ওপরেই বলে দিতেন—কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্বে বাধে। তিনি বলেন: "গাধাটাকে কোথায় রেখে এলেন তাহলে?"

"কোথায় আর রাখব! যেখানে বল্ল সেখানেই। রেলগাড়ীর সব্বার পিছনে তাকে বেঁধে দিয়েছি। শক্ত লাগামের সঙ্গে আঁটা—পালাবার উপায় নেই। বল্‌ব কি মশাই, ইষ্টিশনের ওইটুকু পথ হেঁটে আসতে যা আমাকে নাকাল করেছে—কাঁদিয়ে দিয়েছিল আমায়। এখন? এখন কেমন? ঘণ্টায় ষাট মাইল্ করে' রেলগাড়ীর পিছু পিছু দৌড়তে হচ্ছে ব্যাটাকে—ছাড়ান্ নেই কিছুতে। মরুক্ ব্যাটা দৌড়ে এম্‌নি করে'—কলকাতা পর্য্যন্ত!"

চোখের দৌড়

শোনা গেছল, এমন এক একজন আছেন যাঁরা বারেক দৃক্‌পাৎ করলেই, বইয়ের পরিদৃষ্ট স্থলের পুরো অংশটাই তাঁদের চোখের ক্যামেরায় ফটোর মত ধরা পড়ে যায়—কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে একথা সত্য নয়। একবারের অত্যন্ত চকিত দৃষ্টিপাতে অক্ষরের এক-পঁচিশাংশ মাত্র ধরা পড়ে—তবে যদি দৃষ্টিক্ষেপের সাথে সাথে সামান্য একটু দৃষ্টি চালনা করা হয় তাহলে আরো কতিপয় অক্ষর দৃষ্টির জালে বন্দী হতে পারে। অসংখ্য লোকের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে কেবল একজনকে মাত্র এক কটাক্ষে, ছটা থেকে আটটা অক্ষর আত্মসাৎ করতে দেখা গেছে। এবং এও দেখা গেছে পাঠকরা পড়বার কালে অক্ষরের কেবল উপর-ভাগটাতেই দৃষ্টিপাত করে' থাকেন এবং যে কোনো বাক্যের তলার অর্দ্ধেকটা ঢেকে রাখলেও তা পাঠ করার পক্ষে কোনো বাধা জন্মায় না।

একেই বলে' পাঠক-পাঠিকার উঁচু নজর।

নাকের দৌড়

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, লিওনার্ড উইলিয়াম্‌সকে নিদ্রাকালে নাক ডাকানোর অপরাধে সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত করে' দেয়া হয়েছে। তার নাসিকা গর্জ্জনের এমন নাকি জোর যে তার জ্বালায় ক্যাম্পের আর সব সৈন্যের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছিল।

নাকের জন্য এযাত্রা মাথা বেঁচে গেল লোকটার। কিন্তু লোকটা তাতে খুব খুসী নয় নাকি। হ্যাঁ, আবার কেউ মৈনাককে সৈনিক হতে বোলো তখন!

দাঁতের দৌড়

"ওহে তুমি আসল হাতীর দাঁতের তৈরি বলে' যে জিনিসগুলো আমাকে বেচেছ, এখন পরীক্ষা করে' দেখা যাচ্ছে তা নয় আসলে ওগুলো নকল বলে' প্রমাণ হয়েছে।"

"তাই নাকি? তা—আমি কি করব মশাই? হাতীটা যে মাঝখানে তার দাঁত বাঁধিয়েছিল তা আমি কি করে' জান্‌ব বলুন্?"

উইলের দৌড়

পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার রিউয়ার্ড নাইস্ সম্প্রতি মৃত্যুর আগে যে উইল্ করে' গেছেন, এ পর্য্যন্তকার পৃথিবীর যাবতীয় উইলের মধ্যে সেইটিই হচ্ছে হ্রস্বতম। উইলের দ্বারা তাঁর চার হাজার পাউণ্ডের (প্রায় লাখ টাকা আয়ের) সম্পত্তি তাঁর খুড়তুত ভাই জ্যাকবকে তিনি উৎসর্গ করে' গেছেন। উইলে বলা হয়েছে: "জ্যাক্, এভ্‌রি থিং ইজ্ ইয়োর্‌স্।" ব্যস্!

একেই বলে একবাক্যে দেয়া।

চলতিকা

শ্রীমতী কস্তূরবাঈ:

গত মাসের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ শোক সংবাদ শ্রীযুক্তা কস্তূরীবাঈ গান্ধীর পরলোকযাত্রা। গত ৯ই ফাল্গুণ সন্ধ্যায় পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদ কারায় রাজবন্ধী অবস্থায় গান্ধীজির কোলে মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিঃস্বার্থ প্রেমে, ত্যাগে, সেবায় তিনি ভারত নারীর আদর্শরূপিণী ছিলেন। দেশ ও স্বামীর তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী পূজারিণী। নিঃশব্দে. নিঃস্বার্থে সর্ব্বত্যাগে মহিয়সী ছিলেন তিনি। স্বামীর আদর্শের অনুগামিনী হয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। বহু জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং নিঃশব্দে প্রফুল্ল চিত্তে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আজ সমস্ত ভারতবর্ষ শোকসন্তপ্ত। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

দেশের বাৎসরিক আয়ব্যয়:

সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের বাৎসরিক হিসেবপত্রের যে বাজেট বা বিবৃতি পেশ করেছেন, তাতে চল্‌তি বছরে ৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ এবং আগামী বছরে ৭৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখিয়েছেন। চলতি বছরের আয় মোট ২৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর ব্যয় ৩৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। আগামী বছরের আয় ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৩৬৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এই ঘাট্‌তি কমাবার জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। চা, কফি, ও সুপারীর ওপর প্রতি পাউণ্ডে দু আনা হারে বাড়তি শুল্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ট্যাক্স বৃদ্ধি ও নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করে নাকি আগামী বছরের ঘাটতি ২৩ কোটি ও ৫০ লক্ষ টাকা কমতে পারে। যুদ্ধের জন্যই ভারত সরকারের ব্যয় এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যয়ভার লঘু করবার জন্য যে ট্যাক্স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হয়েছে তার দ্বারা দুর্গত ভারতবাসীর ক্লেশ কতটা বৃদ্ধি পাবে সে বিষয় অর্থসচিবদের সুচিন্তা করা উচিৎ। যুদ্ধজনিত পণ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাংলা দেশকে রক্ষা করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন।

বিশ্ব ও বিদ্যা:

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে স্যার রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে ভারতের নব জীবন বা সংঘটন নির্ভর করে দেশের নব শিক্ষাবিধানের ওপর। অথচ যাঁরা শিক্ষক ও শিক্ষাগুরু দেশের এই শিক্ষা বিধানের পরিকল্পনায় তাঁদের আহ্বান করা হয়নি। যারা দেশের

ভাবী আশা ও ভরসা সেই ছাত্র ও তরুণদের চরিত্র ও আদর্শ গঠনে যাঁরা সহায়তা করবেন, দেশের শিক্ষাদীক্ষা পরিকল্পনাতে তাঁদেরই আগে আহ্বান করা উচিৎ। এই যুদ্ধ আমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থার বা অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ অসারতা প্রমাণ করেনি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার স্বরূপও প্রকাশ করেছে, এ কথা তিনি বলেন। তাঁর বক্তৃতার সারগর্ভ এই যে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ উপলব্ধি করে সেই আদর্শ কথায় ও কাজে ফলিত করলে বিশ্বসমস্যার মূল ব্যাধি বিদূরিত হবে।

খেলাধুলা ঃ

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল খেলায় বাংলা দল ১৪৪ রাণে মাদ্রাজকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। এর পূর্ব্বেও বাংলা দুবার ফাইনালে উঠেছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে তাঁরা রঞ্জি ট্রফি লাভ করে। সেই বছরে এই মাদ্রাজকেই বাংলা সেমি-ফাইনালে হারিয়েছিল। আন্তর্প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ফাইনালে বোম্বাই তিন গোলে গোয়ালিয়রকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

হাতির প্রতিহিংসা ঃ

হাতি কিরূপ নির্ম্মমভাবে প্রতিহিংসা নেয় তার এক খবর ধুবরী (আসাম) অন্তর্গত সালকেচা নামে একটি জায়গা থেকে প্রকাশ পেয়েছে। খিলা সুত্রধর বলে এক মাহুৎ বছর দুই আগে তার দন্তী হাতিটাকে একবার কোন কারণে ভীষণ প্রহার করে। এর কিছুদিন পরে সে অন্য এক মনিবের একটা হাতীর মাহুৎ নিযুক্ত হয়। একদিন (গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী) তার হাতীতে চড়ে খিলা সুত্রধর এবং তার আগের দন্তী হাতীতে চড়ে আর একটি মাহুৎ ঘরে ফিরছিল। এক জায়গায় তারা হাতী থামিয়ে গল্প করবার সময় যখন দন্তী হাতীটির মাহুৎটি খিলাকে সিগারেট দিচ্ছিল সে সময় দন্তী হাতীটা হঠাৎ খিলাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে মাটিতে নামিয়ে নির্ম্মমভার পদদলিত করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে। এমনিতে হাতি খুব ভালমানুষ ও বাধ্য কিন্তু মারধোর করলে যে সে চিরদিন মনে রাখে, এই সত্যি ঘটনাটি তার প্রমাণ।

নববর্ষে আগামী বৈশাখ থেকে রংমশালের
ধারাবাহিক আকর্ষণ
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
জয়ন্তের পুনরাগমন
একটি রোমাঞ্চকর রহস্যোপন্যাস

ক্রমশঃ অরণ্যের মাথা দেখা গেল, দীর্ঘ বনস্পতির চূড়াগুলি। ক্রমশঃ আম জাম কাঁঠালের সারি। ক্রমশঃ লতাপাতায় আচ্ছন্ন অন্ধকার বনভূমির মধ্যে যেন প্রদীপ ডুবে গেল। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটি, পাতা থেকে তখনো শিশির ঝ'রে পড়ছে, তখনো আকাশের আলো সেখানে এসে পৌছয়নি। কালীবাড়ীতে তখনো প্রদীপ জ্বলছে।

ভিতরে সে প্রবেশ করলো। অন্ধকারের মধ্যে মূর্ত্তি, যা শুনেছে, সেই রকমই বটে। প্রণাম ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে অঙ্গনে এক ভীষণ হাড়িকাঠ। দূর অতীতে গহন অরণ্যের মধ্যে কত নরবলি হ'য়ে গেছে ওখানে, গেছে কত অসহায় দুর্ব্বলদের প্রাণ নিষ্ঠুর মানুষের হাতে, মৃত্যু যে জল্লাদদের ছেড়ে দেয়নি। বাতাসে যেন সেই নৃসংতার স্মৃতি ভেসে আসে।

পথ আরো আরো নীচে নেমে গেছে। বিন্ধ্য পাহাড়ের জানুদেশ সেখানটা। ওপরে ওপরে চূড়ায় চূড়ায় রাঙা রোদ গাছের মাথাগুলোকে রঙীন ক'রে তুলেছে। নীচে আলো হয়ত দুপুরের মাঝামাঝি আস্‌বে।

জায়গাটা প্রদীপের ভালো লাগ্‌লো। বিন্ধ্য পাহাড়ের নীচে নীচে কত জায়গায় এম্‌নি কত রহস্য লুকানো আছে। খানিকটা গিয়ে একটা পরিষ্কার বাঁধানো কূয়া, বস্‌লো তার ধারে। সেখানটা একটু ফাঁকা।

একে একে লোকে জল নিতে আসে। কেউ স্নান ক'রে, কেউ মুখ ধোয়। হঠাৎ একটা ছোক্‌রা গোছের লোক জিগেস্ করলে—আপ্ কাঁহা রহেতে হেঁ?

—পাহাড় পর্।

—কাঁহা মুলুক আপ্‌কা? ব'লে দিলে প্রদীপ—গাজীপুর।

—আপ্ গাজীপুরওয়ালা? কোন্ গাঁও?

—চিতুর্ণপুর। তুম্ কাঁহা রহ্‌তে হো?

—হামারা বালিয়া জিলা ভাই, বনারস্ সে আগে। আপ্ ত মেরা দেশোয়াল্লি ভইল্।

বেশী কথা না বাড়িয়ে প্রদীপ ওপাশে উঠে গেল। অনর্গল মিছে কথাগুলো বলেই বা কী ক'রে?

লোকটা আর একটা লোকের কাছে স'রে গিয়ে বল্‌লে—ই কহ্‌তে হেঁ গাজীপুর রহ্‌নেওয়ালা, হাম্ শোচ্‌তে হেঁ এইসা কভি নেই হো সক্‌তে হ্যায়। উ হ্যায় বাংগালী।

সে লোকটা জবাব দিলে—বাংগালী কভি এইসা পায়জামা পিন্‌তে হেঁ? কেয়া কহ্‌তে হো ভাই? যো হোয় সো হোয়, হামারা ক্যা?

প্রদীপ ওপরে উঠে এলো। মাষ্টারমশাই বল্‌লেন—আদা ছোলা খাওনি, মেহনৎ করোনি ডন বৈঠক্ দিয়ে, কোথায় ছিলে?

যা যা হয়েছে, প্রদীপ বল্‌লে।

প্রণব বল্‌লে—আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও বেরিয়ো না। সময় সময় মিথ্যে কথা বল্‌তে হয়, কিন্তু কাঁচা কথায় বিপদ্ বাড়ে। কে কি মৎলবে তোমায় কোন্ কথা জিগেস্ করবে সব ধরতে পারা তোমার বয়সে সম্ভব নয়। চলো আজ পাখী শিকারে যাই।

দীর্ঘকাল নাতিকে না দেখে বিশ্বেশ্বরের মন হুহু করে। চিঠিতে খবর পান, মনিঅর্ডারে টাকা পাঠান, কিন্তু একবার দেখ্‌তে যাবার নাম করলে প্রণব নিষেধ করে—এখনো নয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি বেরোলেন। মাদুরা, রামেশ্বর, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, কুম্ভকোনম্, কন্যাকুমারী ঘুরেও মন স্থির হ'লনা। হয় কখনো, প্রদীপের কাছে যাঁর মনটি প'ড়ে আছে? একবছর কেটে গেছে, আরো একবছর কাট্‌লো।

একদিন তিনি কোনো নিষেধ না শুনে উত্তর ভারতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। এলেন কাশীতে। সেখানে দুদিনও থাক্‌তে পারলেন না। একদিন বাসে চ'ড়ে নাম্‌লেন মির্জ্জাপুরের ওপারে।

অপরাহ্নের আলো তখন ম্লান হ'য়ে আস্‌ছে। ঝুন্‌ঝুন ক'রে এক এক্কা এসে নীচে দাঁড়ালো, ডাক্ বাংলোর ধার থেকে দেখতে পেয়ে প্রদীপ বল্‌লে—কে এলো মাষ্টার মশাই।

প্রণব বল্‌লে, কত ভাড়াটে আছে, তাদেরই হয়ত কেউ। চলো আমরা বাড়ী ফিরি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা, দাদু এসে হাজির।

দাদু বলেন—দাদু, প্রদীপ বলে—দাদু। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য খানিকক্ষণ।

প্রদীপের চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে তিনি খুশী হলেন ভারী। কল্পনাই করতে পারেন নি। পাথরের মতন শক্ত হয়ে গেছে ছেলে। সে কথা মুখে কিন্তু উচ্চারণ করতে পারলেন না, পাছে নজর লেগে যায়।

প্রণব বল্‌লে—কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না আপনি। দুবছর আমরা এখানে আছি, কেউ জান্‌তে পারেনি আমাদের পরিচয়। আপনি এসেই বোধহয় সর্ব্বনাশ হ'ল।

—কিসের সর্ব্বনাশ?

আরেকটা এক্কার ঝুন্‌ঝুন আওয়াজ শুনিয়ে প্রণব বল্‌লে—বুঝ্‌তে পারলেন? ঐ? এলো আপনার সঙ্গে সঙ্গে চর।

সাবধানে থাকো তোমরা।

সাবধান অবশ্য ওদের হ'তেই হ'ল। বিন্ধ্যাচলের মাথায় অনেক, অপরিচিত মুখ এদিকে ওদিকে দেখা গেল সকাল থেকেই।

সেদিন আবার ওদের টাণ্ডা ফল্‌স্ যাবার কথা ছিল। ভয়ে ত যাওয়া বন্ধ করা যায় না, দুখানা টাঙ্গা দুপুরবেলা আনানো হ'ল।

একটাতে দাদু আর পার্ব্বতী, আরেকটাতে গুরু শিষ্য। 'টাঁড়োয়া দরী' দেখতে ওরা চল্‌লো, যেমন সকলে যায়।

আখ্‌ড়ার কাছে এসে একবার ওস্তাদজীকে খবর দেওয়া হল, তিনি মুরুব্বিয়ানা ক'রে বললেন—কেয়া ডর লাগ্‌তা হ্যায়? ডর্‌নেকো কাম নেহি।

নির্জ্জন দীর্ঘপথ বিন্ধ্যগিরি শ্রেণীর গায়ে গায়ে। ঝর্ণা যেখানটা ঝ'রে পড়ছে, সেখানটা আরো উপভোগ করবার জিনিস। ঘুরে ফিরে খানিকটা দেখা হ'ল। জলখাবার আনা হয়েছিল, ব'সে ওরা খাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো।

দাদু চেয়ে দেখ্‌লেন।

হাতের লাঠির দিকে চেয়ে প্রণব বল্‌লে—আস্‌তে দিন যে আসুক্। কী প্রদীপ? ভয় করছে? প্রদীপ বল্‌লে, লাঠি আমারো আছে।

খাবার শেষ হবার আগেই কিন্তু লাঠিয়ালরা ওদের ঘিরলো, মোটর থেকে যারা নেমেছিলো। এদেরও লাঠি ঘুরে উঠ্‌লো।

চক্ষের নিমেষে। বিদ্যুতগতিতে।

প্রণব দুজনকে কাৎ করলে।

ছেলেমানুষ প্রদীপও একজনকে।

চতুর্থজন প্রণবকে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো, তিনজনে মিলে প্রদীপকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলেছে। ফিরে দেখ্‌বার আগে মোটরে ষ্টার্ট দিলে। মরীয়া হ'য়ে প্রণব তার বিপক্ষের বুকে প্রচণ্ড ঘা বসালে।

ওরা সাতজন এসেছিল।

মোটর তখন ধূলোর আড়ালে মিলিয়ে গেছে। যে দুটো মাথা ফেটে পড়েছে সে দু'টো মুসলমান। প্রদীপ যাকে জখম করেছে, সে হিন্দুস্থানী। শেষ যেটাকে মাটিতে ফেলেছে সেটার জাত্ বোঝা মুস্কিল চেহারা দেখে। কোনটারই কথা বল্‌বার ক্ষমতা নেই, কাৎরাচ্ছে করুণভাবে। একটা জল চাইলে।

প্রণব তখন ছুটে বেরিয়ে পড়লো হতভম্ব বিশ্বেশ্বরবাবুকে সঙ্গে টেনে সাদা ঘোড়ার টাঙ্গায়।

কথা বল্‌বার মতন অবস্থা নয়, তবু বল্‌লে, আপনার জন্যেই এই সর্ব্বনাশটা ঘট্‌লো, কেন আপনি এলেন? আমরা বেশ ছিলাম।

বিশ্বেশ্বরবাবু কথা বল্‌লেন না। তাঁর বলবার কিছু নেই। তাঁর মনে হল তিনিই যেন ওর দুর্গ্রস্থ। জীবনে যত পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হল না?

মোটরে ওঠবার সময়ে শেষ চীৎকার শুনেছেন তিনি প্রদীপের—দাদু ও দাদু!

অসহায় দাদু কিছুই করতে পারলেন না। বন্দুকটা সঙ্গে থাক্‌লে এখনো সোজা হ'য়ে ছুড়তে পার্‌তেন, তাতে টায়ারটা অন্ততঃ ফাট্‌ত।

আর বন্দুক ত তুলে রাখবার জন্যে হয়নি, এম্‌নি চোর ডাকাতদের শেষ করবার জন্যেই সরকার থেকে দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্টের দায় কমে, ঝঞ্ঝাট কমে।

আফ্‌শোষ ক'রে লাভ নেই এখন। দীর্ঘ ধূলিধূসর বঙ্কিম পথ দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত শূন্য পড়ে আছে, মোটর দূরের কথা, জনমানবের দেখা নেই। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা প্রহরীর মতন নিশ্চল হ'য়ে আছে।

[ক্রমশঃ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী বৈশাখে **রংমশালের** নবম বর্ষের শুভারম্ভ। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন যে যাঁদের চাঁদা এই চৈত্র মাসেই শেষ হয়ে গেল, তাঁরা যেন অবিলম্বে নূতন বছরের চাঁদা মণি-অর্ডার যোগে বা লোক মারফৎ রংমশাল কার্য্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। মণি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। ২৩শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল) আমাদের কাছে চাঁদা পৌছালে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। যে সব গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের চাঁদা আমরা ঐ তারিখের মধ্যে পাবো না, তাঁদের রংমশালের বৈশাখ সংখ্যা **ভি পি** করে পাঠানো হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে ভি পি ফেরৎ না দেন। আশা করি আমাদের সকল গ্রাহকগ্রাহিকাগণই নূতন বছরেও রংমশালের গ্রাহক থাকবেন।

আমরা নূতন গ্রাহকগ্রাহিকাদেরও আহ্বান করছি। রংমশালের বর্ষারম্ভ বৈশাখ হতে। **বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩।০** এবং **ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ১৸০**; নীচের ঠিকানায় চাঁদা পাঠাতে হয়। রংমশালের অন্যান্য খবর নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য। ইতি, ১লা চৈত্র ১২৫০

শাখা অফিস ঃ—

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন। বিকাল ৪-৬টা।

(২) ইন্দিরা দেবী, ৪০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। সকাল ৮-১১টা।

পরিচালক—রংমশাল কার্য্যালয়। ৯১।১১এ, টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

স্নেহের বন্ধুরা!

বর্ষ শেষ! কিন্তু দুর্গত জীবনের শেষ কি এইখানে? চারিদিকে নিরাশা আর দুঃখের ছায়া কিন্তু এই দুঃখ নিরাশাই কি জীবনের একমাত্র সম্বল করবো? বাধা আসুক, বিপদ আসুক, আসুক ঝড় ঝঞ্ঝা, জানি স্থির জানি: সব দূর হয়ে আবার আলোর প্লাবন বইবে দিক দিগন্তে। তাই ধৈর্য্য ধরে আছি, নিরাশার ভিতর আশায় বুক বাঁধি আর কিশোর বন্ধুদের বলি: ভাই, ধৈর্য্য ধরো, কাজ করো, শিক্ষা গ্রহণ করো—আগামী যুগকে সুন্দর করার জন্যে।

প্রতিভারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮) বৈঁচি, তোমার প্রথম চিঠি আমি পেলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না বা সহজে হয় না। সব কাজের জন্য নিজেদের আগে যোগ্য করা দরকার, যোগ্যতা এলেই ফল পাওয়া যায়।

নির্ম্মলকুমার রায় (১৮৭০) কলিকাতা, এই দেখো তোমার চিঠির জবাব। লেখা দু'টা আরো ভাল হওয়া দরকার, এরপর যখন লেখা পাঠাবে প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠিও, এ দু'টি মনোনীত হয়নি ভাই।

মণিমালা (৫৭৭) তুমি লিখেছ 'সুদূর প্রবাসে' চলে এসেছি। কোথায় গেছ এবং অন্যান্য জানাবার যা কিছু দরকার কিছু তো বলনি—? যেখানে তোমার এখন ভাল লাগছে না, কিছুদিন পরে দেখবে ওর মত ভালো আর কিছুই লাগছে না, তাই হোক একথা আমিও বলি। তোমরা রংমশালের বন্ধু, তোমাদের শুভেচ্ছায় সে জয়যুক্ত হোক।

গীতা দে (১৫৯৪) কটক, ভাই তোমার দীর্ঘ পত্রটি পড়লাম অত্যন্ত মন দিয়ে। তোমাদের উপর দিয়ে যা বিপ্লব চলেছে, এর তো কোনও প্রতিকার মানুষের হাতে নেই, শুধু বলছি সমব্যথার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করো। আর যাঁর কথা লিখেছ, কেন তোমরা সেজন্য উতলা হচ্ছো, অমঙ্গলের পিছনে মঙ্গল আছে একথা ভুলো না। খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলেই হবে তবে দেরী হতে পারে।

তোমাদের বহু চিঠি এসেছে যা কেবল ধাঁধার উত্তর নিয়ে—আমাকে উদ্দেশ্য করে হলেও আসলে সেই ধাঁধার উত্তর। আমরা অনিবার্য্য কারণের জন্য এবার ধাঁধার উত্তর জানাতে পারলাম না, যাদের ঠিক হয়েছে তাদের নাম নতুন বছরে দেখতে পাবে। 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি' এই পর্য্যায়ে আরো কয়েকটি লেখা পেয়েছি, সে কথা বিশেষ করে দেবব্রত ও সত্যব্রত ঘোষ, রমলা মান্নাকে জানাচ্ছি।

পুরাতনকে বিদায় দিচ্ছি এবং আমিও তোমাদের কাছে এ বছরের মত বিদায় নিলুম। ইতি,

তোমাদের

দিদিভাই

ভাবী গৃহিণীর বৈঠক

শ্রীইন্দিরা দেবী

বোনেরা!

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর আজকে তোমাদের বৈঠকে এলুম। তোমাদের খবর পাশের বাড়ী হতে দিদিভাইএর কাছে প্রতিমাসে রীতিমত পাই, তোমরা অনেকেই খোঁজ করেছ, কেউ কেউ চিন্তিতও হয়ে উঠেছ দেখলুম। তোমাদের ভাবনা চিন্তার ভিতর আমার স্থান আছে একথা জেনে ভাল লাগে।

ভাবীগিন্নির বৈঠকে তোমরা কেউ কেউ ফরমাস করেছ নতুন ধরণের সেলাই শেখাতে, কেউ চেয়েছ নতুন ধরণের প্যাটার্ণ। কিন্তু আজকে ওসব আলোচনা আগামী বছরের জন্যে তুলে রেখে দিলাম। এসব আলোচনায় নতুনত্ব কি আছে? আজকে বছরের শেষ—আর ওসব নিয়ে আলোচনা করলুম না এজন্য রাগ করো না।

বছরের শেষ মাসে তোমাদের সঙ্গে আরো নতুন করে আরো নিবিড় করে আলাপ করতে চাই, জানতে চাই তোমাদের জীবনের সমস্যা, অসুবিধাগুলো। আমিও ছিলুম তোমাদের মত ছোট, আমাদের জীবনে সমস্যা ছিল বহু কিন্তু বন্ধু ছিল না, মুখ ফুটে সবাইকে সব কথা বলতে পারতাম না।

একটা সেলাই লিখে দেওয়া, একটা প্যাটার্ণ বলে দেওয়া, একটা রান্না শিখিয়ে দেওয়া কি বন্ধুর সব কাজ শেষ? এই করলেই কি আমাদের সংসার ও সমাজের ভাবীগিন্নিরা ভাবীকালের যোগ্যা হয়ে উঠবে?

জীবনে আছে নানা সমস্যা, নানা অসুবিধা, এসব সমস্যা আর অসুবিধাগুলো দূর করা দরকার। দরকার জীবন থেকে জঞ্জাল দূর করা। এই জঞ্জাল, এই অসৌন্দর্য্য, এই অনিয়ম, অসংযম এই মিথ্যাচারের জন্যে আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে ওঠেনি, তাই জীবনে এসে দেখা দিয়েছে নানা বিপত্তি, নানা দুর্য্যোগ। আমি চাই আমাদের জীবনে যে বিপত্তি ঘটেছে তোমাদের জীবনে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা যেন তোমাদের সুন্দর জীবনকে অসুন্দর না করে তোলে। মুখের বন্ধু নয়, মনের মিতালী পাতাতে চাই।

নানানতরো অভাব অসুবিধার ভিতর বাস করতে হচ্ছে আমাদের। জীবনধারণ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের ভিতর দেখা দিয়েছে নানা অনাচার অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি তার বিষাক্ত নখরাঘাতে জাতীয় জীবনকে জর্জ্জর ও মরণাপন্ন করে তুলেছে, বাইরে রয়েছে সশস্ত্র বিদেশী বন্ধুর ছদ্মবেশে।

যেদিকে তাকাও দুঃখের ও দৈন্যের ছবি চোখে পড়বে। দেশের মুষ্টিমেয় যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, বিলাসে থাকে তাহলেই কি দেশ ভাল আছে সুখে আছে বিবেচিত হবে? বড় যারা তারা হয়েছে স্বার্থপর, মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থপরতায় দেশের স্বার্থ বিপন্ন ও জনসাধারণ ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে যখন নতুন করে ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলছে, নতুন যুগের আবির্ভাব আশায় ক্লিষ্ট জনসাধারণ দিন গুনছে, মার খাচ্ছে, মরছে, তখন দেখি আমাদের স্বার্থ বড় হয়ে উঠেছে, নিজেদের নিয়ে নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গের জাগতিক সুখ সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে আমরা বৃহৎ স্বার্থ বলি দিচ্ছি, বিপন্ন করছি। সর্ব্বত্রই বড়দের এই চেহারা তোমাদের চোখে পড়বে। তোমরা যখন বড় হবে তখন বর্ত্তমান কালের বড়দের পোষাক কি তোমরা গায়ে দেবে? তোমাদের প্রত্যেক কাজের ভিতর থাকবে কি স্বার্থের পূতিগন্ধ? তোমাদের চোখের দৃষ্টিতে পড়বে বর্ত্তমানের বড়দের স্বার্থ সঙ্কীর্ণ চোখের ছায়া? এককের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে বলি দেবে কি বৃহতের স্বার্থ?

বছরের শেষ মাসে ভাবীকালের গিন্নিদের জীবনে কোন ছায়া পড়ে তারই সতর্কবাণী রেখে গেলাম তোমাদের মাঝখানে। কথায় নয় কাজের মধ্যে দিয়ে আসুক আমার উত্তর, আসুক তোমাদের জবাব।

নূতন ধাঁধা

আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে লাল ও সবুজ এই দুরকমের বাস পরপর যায়। প্রত্যেকেই ঘণ্টায় পাঁচবার যায় তার নির্দ্ধারিত একই সময় অন্তর অন্তর। অর্থাৎ লাল বাস ঘণ্টায় যেমন ৫ বার যায় তার সময় মত, তেমনি সবুজ বাসও যায়। এখন, আমি আর দুলু খাওয়া দাওয়া করে লাল বাস্‌টা ধরবো ঠিক করলাম কারণ লাল বাস্‌টা আমাদের ভাল লাগে। একটা লাল বাস আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে দুপুর ১টা বেজে ৪৭ মিনিটে যায়। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর দুজনেই পড়লাম ঘুমিয়ে। জেগে উঠে কটা যে বেজেছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। কারণ দুলুর কাছে ঘড়ি ছিল না এবং আমার ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যা হোক, লাল হোক বা সবুজ হোক যে বাস আগে পাবো তাই ধরতে আমরা রাস্তায় দাঁড়ালাম। আমি বলে উঠলাম—প্রথমে নিশ্চয় সবুজ বাস আমাদের কপালে আছে। দুলু বলে উঠলো—বরঞ্চ উল্টো। লাল বাস আগে আসারই সম্ভাবনার অনুপাত—২:১। দুলু ঠিক বলেছে। এখন তোমরা বল—ঘণ্টার কত মিনিট পরে লাল বাসগুলো আমাদের রাস্তা দিয়ে যায়?

গত মাসের প্রশ্নের উত্তর

(১) মিথ্যে—সজারু কাঁটা ছোঁড়ে বা ছুঁড়তে পারে না। (২) না—মাকড়ষার কামড়ে অবশ্য কিছু না কিছু বিষ থাকে, বড় মাকড়ষার বিষ কিছু বেশী। Black Widow নামে যে মাকড়ষা, শোনা যায় তার কামড় সাংঘাতিক। (৩) হয় না—চাঁদের আলো এত ক্ষীণ যে তার প্রভাব শাক সবজীর ওপর কিছু নেই বললেই হয়। (৪) মস্তিষ্কের (brain) একটি অংশের নাম Island of Reil (৫) ৩০০০ মাইল দূরে রেডিয়োতে লোকেরা শুনবে আগে কারণ রেডিয়োর "ছোট ঢেউ" এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল আর শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১১০০ ফিট।

আনন ঘোষালকে চেনো?

সত্যিকারের ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ, যাঁর সতর্ক দৃষ্টি পাহারা দেয় কলকাতা সহরে ও সহরতলীতে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, তাঁরই নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী রংমশালে বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হবে। বৈশাখের রংমশালে তিনি লিখবেন—

টপ্‌কা ঔগী

স্কুল কলেজের ছেলেরা এই টপ্‌কাওয়ালাদের হাতে কেমন করে ঠকে, তারই বিচিত্র কাহিনী।

রংমশালে আগামী বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হইবে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ভূতপত্রীর পালা

• নবীন লেখক লেখিকাদের আমন্ত্রণ •

গতমাসের রংমশালে আমরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করব বলে আভাস দিয়েছিলাম। এ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা চিঠি পেয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতির অভাবে আমাদের সাপ্তাহিক প্রকাশ করা বন্ধ রইল।

আগামী বৈশাখ থেকে "অজানা-গ্রন্থমালা" নামে প্রতি মাসে মাসে একটি করে বই প্রকাশিত হবে। প্রতিমাসের গোড়ায় যেমন তোমরা মাসিক পত্রিকা হাতে পাও, ঠিক সেই রকম এ বইগুলিও পাবে। মাসিক পত্রিকা না হয়ে, এ গুলি হবে বাংলা কিশোর সাহিত্যের এক একজন নাম করা লেখকের লেখা পুরো বই। শিবরাম চক্রবর্ত্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীকান্ত গুহ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যাঁদের লেখা তোমরা পড়তে সব চেয়ে ভালবাসো—ডিটেক্‌টিভ্, হাসির, ভূতের, দুঃসাহসের, জ্ঞান বিজ্ঞানের যে ধরণের গল্প তোমরা পড়ে সব চেয়ে আনন্দ পাও সেই সব গল্প—এক একটি বৃহৎ গল্প বা উপন্যাস—তোমাদের প্রিয় লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে আমরা প্রকাশ করব। প্রতি বই বা "অজানা-গ্রন্থমালা"র প্রতিটি সংখ্যার দাম হবে চার আনা—বারোটি বই বা পুরো বছরের চাঁদা দু'টাকা আট আনা।

এখন তোমরা সকলেই জান, আমাদের আদর্শ "কাঁচা হাতের কাঁচা লেখা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা"। আমরা চাই আমাদের এ গ্রন্থমালার সম্পাদনা গ্রাহক-গ্রাহিকার সকলের মিলে করা। **প্রতি মাসে আমাদের পরিষদে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সভা বসান হবে।** সেই গ্রাহকরাই ঠিক করে দেবে যে পরবর্ত্তী সংখ্যায় কোন্ লেখকের কি প্রকার গল্প নেওয়া হবে। **আমরা তোমাদের লেখা এই গ্রন্থমালায় নিয়মিত প্রকাশ করব।** তোমরা নিজেরাই যদি সভায় নিজেদের লেখা পছন্দ কর তাহলে সেই লেখা প্রকাশ করা হবে। **এ ছাড়া প্রতি "গ্রাহক মিলনীতে" ছোট ছোট নাটকার অভিনয়, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি তোমাদের দিয়ে করিয়ে "গ্রাহক-মিলনীকে" সুমধুর করে তোলা হবে।** প্রতি গ্রাহক মিলনীতে একজন স্বনামধন্য কবি বা সাহিত্যিককে সভাপতি হিসাবে নিমন্ত্রণ করে আনা হবে। এই "অজানা গ্রন্থমালা" তোমাদেরই হাতে আমরা ছেড়ে দিলাম। **আমাদের প্রস্তাবে যারা রাজী আছ এবং গ্রাহক হয়ে এই গ্রন্থমালা চালাবার ভার নিতে চাও, তারা আমাদের চিঠিতে জানাও।** কারণ খুব বেশী সংখ্যক এ ধরণের গ্রাহক আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। যাদের চিঠি আমরা প্রথম দিকে পাব তাদেরই বৈশাখ মাসের প্রথম সংখ্যা V. P. P. করে পাঠিয়ে দেব।

• অজানা সাহিত্য পরিষদ •

১০।১ এলগিন রোড, কলিকাতা।